নব্যভারত

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

অষ্টম খণ্ড ১২৯৭।

২১০/৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত কার্য্যালয় হইতে
প্রকাশিত

কলিকাতা,
৬/১ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন, যোড়াসাঁকো,
"কলিকাতা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" যন্ত্রে শ্রীচণ্ডীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র।

নব্যভারতের অষ্টম খণ্ডের সূচী।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

নব্যভারত।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সম্পাদিত।

দশম খণ্ড—১২৯৯।

২১০।৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, নব্যভাবত কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কলিকাতা,

১৭নং রঘুনাথ চাটুয্যের ষ্ট্রীট, "মণিকা যন্ত্রে" শ্রীহরিপদ পাল দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৩৲ তিন টাকা মাত্র

নব্যভারতের দশম খণ্ডের সূচী।

" নবীন বুলি — W '

নব্যভারত

(অষ্টম খণ্ড ।)

সাহে[illegible]রণের দিনে !

মানুষ যে পথে প্রতারিত হয়, সে পথে পুনঃ পা ফেলিতে সে কিছু সশঙ্কিত। কিন্তু আশার উত্তেজনা আবারও তাহাকে সে পথে লইয়া যায়, আবারও প্রতারণায় ফেলে। এইরূপ বারম্বার প্রতারিত হইলেও মানুষ আশার কুহকে আবার ভোলে। এ ভুল—মহাভুল। কিন্তু জীবন-মমতা থাকিতে এ ভ্রমের হাত হইতে কেহই নিষ্কৃতি পায় না। আশারও বিরাম নাই, ভুলেরও কূল কিনারা নাই। মানুষ দিবা-নিশি ভুল বুঝিয়া, ভুলে মজিয়া, ভুলকেই আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হইতেছে। আশ্চর্য্য লীলা !!

দ্যূতক্রীড়ার ছলনায় ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির রাজ্যধন সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াও বুঝিলেন না, প্রতিনিবৃত্ত হওয়া উচিত। আবার পাশার দান ফেলিলেন—ক্রমে আপনাদিগকে পর্য্যন্ত বনবাসী করিলেন। মহাভারতের এই প্রহেলিকার তবুও একটা মহা অর্থ অভিব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু আমরা যে কেন বারম্বার প্রতারিত হইয়াও পুনঃ সেই পথেই পা ফেলিতেছি, নিজেরাই বুঝি না। সময়ের ফের, মানুষের দুর্ব্বুদ্ধি!

* নূতন বর্ষ সমাগমে আবার সবলে হাল খাতা বাঁধিলেন। নিকাশপত্রে দেখা গিয়াছে কেবল লোকসান,—কিন্তু তবুও আবার বাজার গরম হইয়া উঠিতেছে। মানুষ যত ঠকিতেছে, নূতন নূতন ভেল্কির উপায় উদ্ভাবনে ততই ব্যতিব্যস্ত হইতেছে। বুঝিতেছে না যে, প্রতারণার পরিণাম প্রতারণাই, কিন্তু তবুও ইহারই আশ্রয় লইতেছে। উপহারের চোটে সাহিত্যের বাজার গরম হইয়া উঠিতেছে। গতবৎসরে যে শূন্য পাইয়াছে, সে শূন্যের জোরেই আজ আবার আশায় নব মাতোয়ারা। সংসার, বলিহারি তোর ভেল্কির কুহক !!

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কেন নিরাশাই বা কিসে? এদেশ যে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জাতীয় মহাসমিতির এই মহামেলার দিনে কেন আক্ষেপ কর? আশার কথা শুন, চাহিয়া দেখ, ভারত কত উন্নতির দিকে চলিয়াছে। আন্দোলনে ভারত যেন ইংরাজের কাছাকাছী হইয়াছে, আর ভাবনা কিসের?

একদিকে যতই আশার তুরি-ভেরির শব্দ শুনিতেছি, ততই আমরা গভীর নিরাশার মধ্যে নিমগ্ন হইতেছি। বস্তু

আশা করিয়া মহাত্মা বিপণের প্রবর্ত্তিত স্বায়ত্ব-শাসন আহ্বান করিয়াছিলাম, আজ তাহাতেও গাঢ় নিরাশার ছবি দেখিতেছি,—প্রভুত্ব ঘোষণায়, আত্ম কলহে, নানা কূট তর্কে, ঝগড়া বিবাদে বৃথা দিন কাটিয়া যাইতেছে, সমষ্টিতেও দেশের উন্নতি হইতেছে না। এমন যে জাতীয় মহাসমিতি, ইহাও মনোমিলনের ক্ষেত্র না হইয়া এখন মনোভঙ্গের কারণে পরিণত হইতে চলিয়াছে,—ভিক্ষানীতির ধুয়া এখন বিলাত পর্য্যন্ত ছুটিয়াছে। এই অধঃপতিত জাতির আশা ভরসা ইহাতেও বড় একটা দেখিতেছি না। আমরা দুটি প্রশ্নের মীমাংসা না পাইয়া ভগ্ন-মনোরথ হইয়াছি। পৃথিবীর জাতীয় উন্নতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া দেখিয়াছি, জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন না করিয়া কোন জাতি উন্নতি লাভ করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত পাই নাই। ধর্ম্মের উন্নতি সাধন না করিয়াও কোন জাতি পৃথিবীর মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাহা স্থায়ী করিতে পারিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু ভারতে এ সকল কল্পনার স্বপ্ন বলিয়া উপেক্ষিত। আশা কোথায়?

সে দিন একখানি সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছিলাম, গত ১০ বৎসরে ইংরাজি ভাষা এত উন্নতি লাভ করিয়াছে যে, আর আর সকল ভাষাকে পরাস্ত করিয়া আপন শিষ্যের সংখ্যা দ্বিগুণিত, ত্রিগুণিত করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ইংরাজি ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ জাতির প্রভুত্ব পৃথিবীতে দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে। প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক ও রোমক; আধুনিক ফরাসি, মুসলমান, কি ইংরাজ, যে কোন জাতির কথাই বল না কেন, ধর্ম্ম ও ভাষার উন্নতির দিনেই এই সকল জাতির আধিপত্য দেখা যায়, এবং তাহার অপকর্ষের দিনেই অবনতি পরিলক্ষিত হয়। ভারতবর্ষ—দিন দিনই ধর্ম্মচ্যুত, দি... তাঁর ভাষাচ্যুত হইয়া পড়িতেছেন। এখন পাশ্চাত্য ধর্ম্ম, এখন পাশ্চাত্য ভাষা ভারতবর্ষকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। শনৈঃ শনৈঃ এখন লোক সকল ইংরাজ অধিকৃত হইয়া পড়িতেছেন। কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে, কি জ্ঞানে, কি সভ্যতায়—ভারতবাসী, শিক্ষিত ভারতবাসী, এখন ষোল আনা সাহেবী-কৃত। ইহা ভাল কি মন্দ, সে বিচার [illegible]া ফল নাই। তবে ইহা ঠিক যে, এ দেশের আপামর সাধারণ লোকশ্রেণী হইতে শিক্ষিত শ্রেণী, এখন ক্রমে ক্রমে বড়ই দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছেন। কি জ্ঞানে, কি সভ্যতায়, নিম্ন শ্রেণী হইতে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী দিন দিন বহু দূরে সরিতেছেন, কাযেই সহানুভূতির বাজারটায় দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই রহিয়াছে। ঢাকার "শক্তি" আক্ষেপেই করুন, আর যাহাই করুন, নিম্নশ্রেণীর রক্ষার জন্য "শিক্ষালয়" (School) কি "অর্থালয়" (Bank), কোন আলয়ই মধ্যবর্ত্তী লোকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে না। ইহাকে যদি জাতীয়তা গঠনের প্রথম সোপান বলিতে চাও, বল। পর-মুখ-প্রত্যাশীর দলকে যদি ভারতগগনের উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে অভিনন্দন দিতে চাও, এবং বাড়ীতে নিমন্ত্রণ সভা না গঠন করিয়া ম্লেচ্ছের হোটেলে সুরা-পূর্ণ গ্লাসের মধ্যে স্বাস্থ্য পানের ব্যবস্থা করিয়া সম্মান বৃদ্ধি করিতে চাও, কর। আমরা এ সকলে কোন আশার কথা পাঠ করিতে না পারিয়া নববর্ষের প্রথমে কেবল নিরাশার ক্রন্দন তুলিয়া অস্থির হইতেছি। হিতৈষণা, তুই আমাদিগের জন্য একটুও আশা রাখিলি নে?

কাল আদমীর বুলি লইয়া যাদের ব্যবসা, এই ঘোর সাহেবীকরণের দিনে তাহাদের আর আশা ভরসা কোথায়? তোমার

কাল মুখের মলিন বুলি—W C. Banerjeeই বল, এবং P. M Mukerjeeই বল, পড়িতে বসিয়া আপন আপন গৌরব নষ্ট করিতে পারেন না। "বাঙ্গলা ভাষাটা রাখ কেন? ইংরাজি ভাষার ভারতের জাতীয় ভাষা হওয়ার যতটা সম্ভব, আর কোন ভাষার তেমন সম্ভব নাই"—কত বে-নামী, অ নামী লেখক, আমাদের সপিণ্ডীকরণ করিয়া, সঞ্জীবনী প্রভৃতি কং্রেস-প্রমুখ পত্রিকার এই কথা [illegible] করিয়া "হাম বড়" বলিয়া পরিচয় দিতে সাহসী হইতেছেন। সেই ভয়ে, বুঝিবা, প্রচার নীরব হইলেন, নবজীবন সভয়েও দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, যোগেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র—এখন নীরব ভাষার সাধন করিতে বসিয়াছেন। আর রমেশচন্দ্র আর্য্য ইতিহাস, সময় বুঝিয়া ইংরাজিতে লিখিতেছেন,—এবং কেহ কেহ রামায়ণ মহাভারতকে ইংরাজি করিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছেন। উন্নতি ত এক দিকে হয় না,—সকল দিকেই সাহেবীকরণের ছটা! ইহাকেই প্রকৃত উন্নতি বলে। নব আমেরিকা, নব অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় ভারতবর্ষও নাকি জাতি ধর্ম্ম ভাষা ভুলিয়া একদিন স্বাধীন ইংরাজ হইয়া যাইবে। আমরা, এই প্রাচীন অধঃপতিত জাতি, মহাত্মা হার্বার্ট স্পেন্সরের (Survival of the Fittest) উপযুক্ততার মতের খাতিরে জীবলীলা সাঙ্গ করিয়া ইংরাজের উদরস্থ হইয়া যাইব? তাই সাহেবীকরণের বাজারে আনন্দের রোল উঠিয়াছে!

বাঙ্গলা কাগজের গ্রাহক জুটে না, যাহার জুটে, সেও মূল্য পায় না। 'বাঙ্গলা কাগজ কেহ পড়ে না, যাহারা পড়ে, তাহারাও সাধারণের ঘৃণার জিনিস। বাঙ্গলা ভাষা আফিস হইতে উঠিয়া গিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে না,—দেশের সভা সমিতিতে চলে না;—জাতীয় মহা সমিতিতে গ্রাহ্য নয়, বরং ঘৃণ্য; এমন বাঙ্গলা ভাষা যে পড়ে, সে ঘৃণার জিনিস হইবে না? জানি না, কোন্ আশায় জমীদার পঞ্চায়ৎ সভা এই চাষার ভাষা, এই অসভ্যদের ভাষাটা গ্রহণ করিয়া জাতীয়তা-হীনতা দেখাইয়া সাহেবীকৃত বাঙ্গালীর শ্রদ্ধা হারাইতে বসিলেন! এই ভাষাতে যে কথা বলে, সে অসভ্য; যে পত্র লেখে, সে অসভ্য, যে বক্তৃতা করে, সে আরো অসভ্য। যে এই ভাষার পোষকতা করে, এই ভাষার সংবাদ পত্র বা সাময়িক পত্র পাঠ করে, বা কোন পুস্তক ক্রয় করে, সে ঘোরতর মূর্খ। এই জন্য একটা কথা উঠিয়াছে,—"বাঙ্গলা পুস্তক কিনি মেয়েদের জন্য।' কটকে একজন বন্ধুকে নব্যভারতের গ্রাহক হইতে বলায়, তিনি উত্তর করিয়াছিলেন "মেয়েদের জন্য বামাবোধিনী লইতেছি, তাহাই তাহারা পড়িয়া উঠিতে পারে না—তাহাদের আর সময় কই?" এই অত্যাদার ঘৃণার ভয়েই, বুঝিবা যাহারা পত্রিকা গ্রহণ করে, তাহারাও মূল্য দেয় না। এমন অপকর্ম্ম করিয়া কি লোকের নিকট বলা যায়!

এ সকল কি অত্যুক্তি প্রলাপ বকিতেছি? যাঁহারা দেশের প্রকৃত অবস্থা জানেন, তাঁহারা কখনও একথা বলিবেন না। তোমাদের হিতৈষী-শ্রেষ্ঠ প্যারীমোহন, ও বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া, মুন্সেফ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহাদের আমলাগণ পর্য্যন্ত, দুই দশজন বাদে প্রায় সকলেই, বাঙ্গলা ভাষাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। যে দু পৃষ্ঠা ইংরাজি পড়িয়াছে সেও, যে কখন ইংরাজি স্পর্শও করে নাই, সেও। ইহার পরিচয় এদেশে প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গ-দর্শন, আর্য্যদর্শন, প্রচার,

উঠিল কেন? বান্ধব, নবজীবন যায় যায় হইয়াছে কেন? পত্রিকার মূল্য যে আদায় হয় না, তাহার পরিচয়—"বঙ্গবাসীও উপহার ঘুষ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন!" এমন দেশ-ব্যাপী ঘৃণার স্রোত আর কোন দেশে কখনও দেখা যায় নাই। ধন্য সাহেবীকরণ!

ভাষাতে চূড়ান্ত সাহেবীকরণ দেখাইলাম। ধর্ম্মে কি সাহেবীকরণটা কিছু কম? একদিন মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন যে, "এই কলিকাতায় এমন বড় লোক নাই, যিনি উইলসনের বাড়ীর খানা খান না।" ভাল মন্দ বিচারের ভার, পাঠকগণের হাতে, আমরা অবস্থাটাই জানাইতেছি। শশধর, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন, কৃষ্ণপ্রসাদ—যে দেশের ধর্ম্মের তত্বটাকে বক্তৃতার বিষয় করিয়া পাদরী সাহেবের ন্যায় ব্যবসা চালাইতেছেন, সে দেশের ধর্ম্ম কত দূরে যাইয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, ভাবাও কঠিন। আমরা এই সকল মহাত্মাদের প্রতি ঘৃণা দেখাইতেছি না, তবে এই কথা বলিতেছি, ধর্ম্মটাকে বক্তৃতার আসরে নামাইয়া ইঁহারা হিন্দুধর্ম্মের অগৌরব করিতেছেন, অধিকারী ভেদে উপদেশ দেওয়ার অমূল্য তত্বকে ডুবাইয়াছেন,—ধর্ম্মকে বৃথা হুজুগে পরিণত করিয়াছেন। ফল যাহা হওয়ার, খুব হইতেছে,—মিথ্যা, প্রবঞ্চনা—পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শোচনীয় অবস্থাকেও কেহ কেহ উন্নতির অবস্থা বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন! মোটের উপর কি হইতেছে, কেমনে বলিব? কিন্তু এ কথা বলিতে পারি যে, আমরা দিন দিন চরিত্রহীন হইয়া এক অপকৃষ্ট জীবের সৃষ্টি করিতেছি। যাক্, সে সকল দুঃখের কাহিনী বলিয়া আর কাজ কি?

এইরূপ ঘোরতর সাহেবীকরণরূপ নিরাশার ঘনঘটার মধ্যে পড়িয়াও নব্যভারত কি—আশায় রহিয়াছে? ১২৯৬ সালের গভীর শোকের পরও আবার মাথা তুলিতেছে কেন? কেহ কেহ এই প্রশ্ন তুলিতে পারেন। যে দেশে ভাল কাজেও সহানুভূতি প্রকাশ করিবার বন্ধু জুটে না, কর্ত্তব্য-পালনে একটু সাহায্য মিলে না, চরণ ধরিলেও প্রসন্ন মুখের হাসি টুকুও উপহার পাওয়া যায় না, সে দেশে আবার এই "নব্যভারত" থাকে কেন?—উত্তর—ইহাও মহাভুল।

মহামতি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, বুঝিয়াও ফিরিতে পারেন নাই,—আমরা কর্ত্তব্য-প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ, বুঝিয়াও ফিরিতে পারিতেছি না। ... দাঁড়াই বা কোথা? যদি ধর্ম্ম যায়, ভাষা যায়,—ভারতের আর বাকী থাকে কি? কি লইয়া থাকিব? কার মাথায় থাকিব? বুঝিতেছি, দিন দিন সাহেবীকরণেরই জয় হইতেছে, তবুও একটু একটু আশার কুহকে না মজিয়া পারিতেছি না। কালে আমরা কেহই থাকিব না—জানি, কিন্তু আজই নব্যভারত তুলিয়া দিতে পারিতেছি না। এ এক মহা ভ্রান্তির ঘোর। ধন জন প্রাণ—সব এদেশের কর্ত্তব্য-পালনে ফেলিয়া দিয়া শেষে পলায়ন করিব। কন্যা শোকের দারুণ আঘাতে, সাহেবীকরণের গভীর নিরাশার কশাঘাতে, বন্ধুবান্ধবগণের সহানুভূতি ও দয়া-শূন্য এই কর্ত্তব্যরূপ মহাশ্মশানে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, সকল তীব্র বাণ সহ্য করিয়া করিয়া শেষে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। নব্যভারত তারপর আর মাথা তুলিবে না। সেই দিন—সাহেবীকরণের ষোল কলা এই ভারত-শ্মশানে রাজত্ব করিবে। সেই দিন "বঙ্গবাসীর" গভীর হাহাকার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কাহারও চক্ষে আর বিন্দুমাত্র জলও পড়িবে না, হার্বার্ট স্পেন্সার সাহেবের জয় জয় কারে চতুর্দ্দিকে পরিপূর্ণ হইবে।

ধর্ম্ম।

পৃথিবীতে যে সকল ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দু, এই চারিটীই প্রধান। বয়সে হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধ, ঋষিরা ইহাকে মানব ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তদপেক্ষা তরুণ বৌদ্ধ, [illegible]পেক্ষা খ্রীষ্টান ও সর্ব্বাপেক্ষা মুসলমান। প্রত্যেক ধর্ম্মেরই সংস্থাপনকর্ত্তাদিগের এই অভিপ্রায় ছিল যে, ক্রমে ক্রমে সমগ্র মানব জাতি তদীয় ধর্ম্মের অনুসরণ করিবে, জগতে আর বৈষম্য হইবেনা,বা থাকিবে না, কিন্তু ঘটনার কি কুচক্র। কাহারও উদ্দেশ্য সফল হয় নাই প্রত্যেক সাধু চেষ্টায় মানুষ যেন স্পর্দ্ধা করিয়া নূতন নূতন ভেদ উদ্ভাবন পূর্ব্বক সেই সেই ভেদ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

এক্ষণ পৃথিবীর জন সংখ্যার যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমনি রেল, ষ্টীমার ও টেলিগ্রাফের প্রসাদে সমস্ত মানব জাতি বহুল পরিমাণে এক পরিবার ভুক্ত হইয়া পড়িতেছে। আমেরিকা, আফ্রিকার প্রশ্নের উত্তর করিতেছে, ম্যাঞ্চেষ্টার চিনকে কাপড় পরাইতেছে। জ্ঞানের চর্চ্চা খরতর বেগে চলিতেছে; চিনবালক আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতেছে, অষ্ট্রেলিয়ার লোক বার্লিনে যাইয়া শিক্ষা লাভ করিতেছে। একই ব্যক্তি একবৎসরের মধ্যে কিয়ৎকাল নিউইয়র্কে, কিয়ৎকাল জেডোয় ও কিয়ৎকাল কলিকাতায় বক্তৃতা দিতেছে। ইহাতে মতামতের যে একটা অদ্ভুত ঝটিকা উপস্থিত করিয়াছে,তাহার ফলাফল অনুমান করা সহজ নহে।

মানব জাতি স্বভাবতঃ বড়ই স্থিতিশীল, সুন্দর হইলেও একটা পরিবর্ত্তের প্রস্তাব করিলেই অমনি কেহ তাহা গ্রহণ করিতে চাহে না, যদি তাহা চাহিত,তাহা প্রত্যেক নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের উন্মাদিনী ভাষা ও স্বর্গীয় প্রকৃতিতে জগৎ গলিয়া এতদিন এক ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া যাইত। আজ মত সম্বন্ধে সমস্ত পৃথিবী ব্যাপিয়া যে ঝটিকা বহিতেছে, তাহাতে অতীত দেখিয়া ভবিষ্যতের অনুমান না করিয়া অনেকে আশা করিতেছেন যে, কাল ক্রমে সমগ্র পৃথিবী এক ধর্ম্মাক্রান্ত হইবে, কিন্তু সেই এক ধর্ম্ম কোন্ ধর্ম্ম হইবে, এবং সেই ধর্ম্মোপদেষ্টা জগৎ গুরুর কোন দেশে আবির্ভাব হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

ধর্ম্ম সম্বন্ধে এসিয়াই এপর্য্যন্ত জগতের গুরুত্ব করিয়া আসিয়াছে, ইউরোপ বল, আমেরিকা বল, আফ্রিকা বল, সকলেই এসিয়ার শিষ্য, কিন্তু সেই এসিয়ার অবস্থা এখন শোচনীয়। যে ভারতবর্ষ নিসৃত ধর্ম্ম এক্ষণও পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোকের অবলম্বন, সেই ভারতবর্ষ এক্ষণ ইংলণ্ডের কুক্ষিগত। ভারতসন্তান সব জীর্ণ শীর্ণ, ফেরুপালের ন্যায় ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মস্তকে মনীষা নাই, হৃদয়ে তেজ নাই, বিজয়ীদিগের এরূপ অনুগত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদিগের চালে চলিতে, তাহাদিগের খানা খাইতে ও তাহাদিগের পরিচ্ছেদ পরিতে অসীম প্রীতি অনুভব করিতেছে। এই প্রকারের ভবিষ্যৎ, অন্ধ অবিমৃষ্যকারী, কেন্দ্র-ভ্রষ্ট প্রায় সমস্ত উচ্চ

লোক। তারপর, ভারত কেবল যে পরাধীন, এমত নহে। বিভক্ত লম্বোদর গজানন পুঞ্জকে বক্ষে ধারণ করিয়া একরূপ অধিকারীশূন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আজ ইংরেজের অধীনে আছে, অতঃপর রুস লই বার জন্য লালাইতেছে, কিছুদিন রুসের পরিচর্য্যা করিলে পর জার্ম্মানি ফরাসী প্রভৃতি অপরাপর প্রতাপান্বিত জাতিরা যে কিছু কাল আধিপত্য না করিবে ছাড়িবে, তাহার নিশ্চয়তা কি? যে জাতি এরূপ পরসেবা নিরত, পরপদানত, তাহার দ্বারা জগতের ধর্ম্ম-সমীকরণ সম্ভবনীয় কি?

মুসা, যীশু ও মহম্মদের জন্মদাতা আরব তুরস্কও এক্ষণ ওষ্ঠাগতপ্রাণ, ইউরোপে তাহারা "রুগ্ন" নামে অভিহিত, রাজ্যের উত্তরের কথকাংশ রুস লইয়াছে, দক্ষিণ পশ্চিমের একটা বৃহৎ অংশ ইংরেজ প্রায় উদরস্থ করিয়াছে, বিনাদোষে আমির শের আলিকে লর্ড লিটন নষ্ট করিল, আমরা তাহাকে প্রাণ ভরিয়া অভিনন্দন দিলাম। কাল যদি শুভ্র বীর সমস্ত তুরুস্ক গ্রাস করেন, তাহাতে অভিনন্দন দিব না কি? তুরস্কের এইরূপ শোচনীয় দশা; চীন আত্মরক্ষণে সমর্থ হইলেও একটা সম্রান্ত শক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কারন, কাল তাহার শরণাগত থিবকে বিনাপরাধে ইংরাজে মারিয়া খাইল, চীন চাহিয়াও দেখিল না। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত, বৌদ্ধেরা হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করাতে ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। ব্যবহারের দোষে ইংরেজেরা আমেরিকা হইতে নিষ্কাসিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে ইংরেজ ও আমেরিকার ধর্ম্মের কোন বৈষম্য ঘটে নাই, বরঞ্চ সময়ে সময়ে প্রগাঢ় বন্ধুতা দৃষ্ট হইয়াছে, এজন্য অনুমান করি, বৌদ্ধের সহিত হিন্দুর মনোমালিন্য এখন নাই, তাহারা তীর্থ দর্শনে গয়ায় আসিয়া অনেক হিন্দুর নিকট যত্ন পাইয়া থাকে। তুরস্ক, পারস্য, আফগান, ইহারাও একধর্ম্মী, ইহাদিগেরও যথেষ্ট বন্ধুতা আছে। দুটী প্রবল এসিয়া-বাসী জাতির একত্র সমাবেশ হইয়াছে। ইহা এসিয়ার পক্ষে একটী অতিশয় উজ্জল ভাবী-শুভ চিহ্ন হইতে পারে, এজন্য আমি কেবল স্বদেশের ভাবনা ভাবিতে ইচ্ছা করি, আমার স্বদেশীয়দিগকেও আমি গললগ্নকৃত বাসে এই পথের পথিক হইতে অনুরোধ করি।

মহাসমুদ্রের নিকট নদী সকল যেমন তুল্য, ঈশ্বরের নিকটও নানা ধর্ম্ম তদ্রূপ। এক বৃষ্টির জল কূপে, সরোবরে ও নদীতে পড়িয়া কূপোদকাদি নানা প্রকার নাম ধারণ করে, কিন্তু সেই জল যখন সৌরকরে পরিশুদ্ধ হইয়া বাতাসভরে ঊর্দ্ধে গমন করে, তখন তাহার নাম-ভেদ বৈষম্য থাকে না, ধর্ম্মও সেইরূপ শ্রেণীবিশেষকে আশ্রয় করিয়া নানাবিধ নাম গ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু পরিশুদ্ধ হইলে তাহারও নাম-পার্থক্য থাকে না, সুতরাং কোন ধর্ম্মের দোস-সংস্কারের যে আবশ্যক হইয়াছে, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। আবশ্যক হইয়াছে, ব্যক্তিদিগের আত্ম-সংস্কারের। আমি ইহা অবগত আছি যে, ধর্ম্মভেদ হইতে সৌহার্দ্দের বাধা জন্মিয়াছে, অপরাধী স্বধর্ম্মীকে লোকে যেরূপ ব্যগ্রতার সহিত সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে, নির্দ্দোষ বিধর্ম্মীকে সেরূপ করে নাই, কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই ব্যক্তিদিগের,

স্বভাবের দোষ; ধর্ম্মের দোষ নহে। কারণ অপরাধীর সাহায্য করিতে কোন ধর্ম্মের অনুমতি নাই।

কিন্তু ব্যক্তিদিগের সংস্কার সাধন করা সহজ ব্যাপার নহে, এজন্য মহাত্মা রামমোহন রায় জগতের ধর্ম্ম সকলের সন্ধি-স্থান অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অবতারণা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে মহাত্মা নানক চৈতন্যও ঠিক সেই উদ্দেশ্যে শিখ ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব ও শিখের উন্নতি এখন রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

ধর্ম্মের ইতিহাসে ইহা একটী অখণ্ডনীয় সত্য যে, কোন ধর্ম্ম সংস্থাপকই একাকী সেই ধর্ম্মের পূর্ণাবয়ব গঠন করিতে সমর্থ হন নাই। মার্ক, লুক, জন না আবির্ভূত হইলে যীশুর নাম কেহই শুনিতে পাইত না, আবুবেকের, ও ওমর প্রভৃতি না হইলে মহম্মদের নাম লোপ পাইত। চৈতন্য ও গুরুগোবিন্দের বংশ পরম্পরায় যদি তাহাদিগের সদৃশ ধর্ম্ম ভাবাপন্ন, মহাপুরুষের আবির্ভাব হইত, তাহা হইলে তত্তৎধর্ম্মের অধিকার নিশ্চয়ই প্রসারিত হইত। ব্রাহ্মধর্ম্ম একরূপ সদ্যজাত ধর্ম্ম, এখনও উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি গঠিত হয় নাই, কি ভবিষ্যৎ উহার অদৃষ্টে লিখিত আছে, তাহা আমি অনুমান করিতে সাহস করিনা; কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, যদি রামমোহন রায়ের শিষ্যদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর কেশব বাবুর ন্যায় উপযুক্ত শিষ্যের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে উহা বিস্তার লাভ করিতে পারিবে, কিন্তু যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে কালক্রমে উহায় শিখ, বৈষ্ণবাদি শ্রেণীভুক্ত হওয়া কেহই নিবারণ করিতে পারিবেন না।

মুসলমান ধর্ম্ম নিরাকারবাদের লীলা ভূমি, কিন্তু কোরাণে সাকার কল্পনার আভাস ও স্পষ্টতঃ দেবতাদির কল্পনা আছে। সুরা এরাকের ষষ্ঠপঞ্চশত্তম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, "পরমেশ্বর ৬ দিবসে স্বর্গলোক ও ভূলোক সৃজন করিয়াছেন ও তৎপরে সিংহাসনে বসিয়াছিলেন।" আবার ঐ সুরা এরাকের ৪৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, "স্বর্গ নরকের মধ্যে এরাকের (বিযোজক ক্ষেত্র বা প্রাচীরের) উপরে পুরুষ সকল আছেন, তাঁহারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার কর্ম্মানুসারে চিনিবেন এবং স্বর্গবাসের যোগ্যদিগকে সলাম করিবেন।" এই পুরুষ সকল অবশ্যই দেবলোক। তার পর "জিবরিল" (স্বর্গের কর্ত্তা), "মেকাইল" (শস্যের কর্ত্তা), "এস্রাফিল" (কেয়ামত জানাইবার জন্য শৃঙ্গহস্ত পুরুষ), "রদব" (জলস্থলের কর্ত্তা), "মালাক" (নরকের কর্ত্তা), ইহারাও ফেরেস্তা অর্থাৎ দেবতা। "আজাজিল" (শয়তান) বোধহয় হিন্দু শাস্ত্রের অবিদ্যা। এতদভিন্ন মহম্মদ, ইব্রাহিম প্রভৃতি নবী ও অনেক পীর প্যাগম্বরের উল্লেখ আছে।

হিন্দুশাস্ত্রে পাঁচ প্রকারের উপাসনা নিরূপিত আছে, মুসলমানদিগেরও ঠিক সেইরূপ কার্য্য দেখিতে পাই, যথা;—

(১) অভিগমন, অর্থাৎ দেবমন্দিরের মার্জ্জন ও অনুলেপন। মুসলমানেরা জুম্মা ঘর মার্জ্জন ও অনুলেপন করিয়া থাকেন।

(২) উপাদান—গন্ধপুষ্পাদি পূজোপকরণের আয়োজন, মুসলমানেরা তণ্ডুল, দুগ্ধ মিষ্টান্নাদির আয়োজন করিয়া থাকেন।

(৩) ইজ্যা—পূজা—মন্ত্র দ্বারা পুষ্প ও অন্যান্য উপকরণের

সমর্পণ। মুসলমানেরা মন্ত্রদ্বারা পুষ্পোপকরণ সমর্পণ করিয়া থাকেন।

(৪) স্বাধ্যায়—শাস্ত্রপাঠ, মুসলমানেরা শাস্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন।

(৫) যোগ—দেবতানুসন্ধান, মুসলমানেরা ঈশ্বরের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

কোরাণ আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে, মহম্মদের ঈশ্বর ভক্তি দেখিয়া না আর্দ্র হয়, এরূপ পাপাত্মা ভূতলে নাই, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তাঁহার অসীম দয়া ও অনন্ত শক্তির কথা, হৃদয়ের অন্তস্তলীর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে পৃথিবীতে যদি কেহ ঈশ্বরকে জানিতে পারিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মহম্মদ সেই পরম-সৌভাগ্যশালী মহাপুরুষদিগের একজন। যে আর্য্য শাস্ত্র শুক নারদাদি ভক্ত চূড়ামণিদিগের গৌরব মালায় পরিপূর্ণ, ভক্তপ্রবর মহম্মদের নাম সেই শাস্ত্রে সন্নিবেশিত করিবার উপযুক্ত।

বৃহস্পতি বলিয়াছেন—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানি প্রজায়তে"

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ঈশ্বরের জীবন্ত গ্রন্থ। ইহার সহিত মিশাইয়া শাস্ত্রকে অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। বাক্‌পাণি পাদ ও পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী মনুষ্যের কর্ম্মেন্দ্রিয়, অর্থাৎ ইহা ব্যতিরেকে মনুষ্য কর্ম্ম করিতে পারে না, কিন্তু ঈশ্বর ইহার অভাবেও কর্ম্ম করিতে সমর্থ। যথা শ্রুতি—"আপনি পাদো জবনো গৃহীতা, পশ্যত্য চক্ষু স শৃণোত্য কর্ণঃ স বিশ্বং বেত্তি,নহি তস্য বেত্তা, তমাহু রগ্র্যঃ পুরুষ প্রধানম।" আমরাও দেখি, তাঁহার বায়ু বিনাপদে মহীতলে ভ্রমণ করিতেছে, তাঁহার মাধ্যাকর্ষণ বিনাহস্তে ফল ফুল টানিয়া লইতেছে, তাঁহার তাড়িত বিনাহস্তে ভূমণ্ডলে সংবাদ সকল বিতরণ করিতেছে। তিনি অবশ্যই এ সকল নহেন, কারণ আমরা ইহাদিগের হ্রাসবৃদ্ধি অনুভব করিয়া থাকি, সুতরাং ইহারা অন্য পদার্থ। তবে অপানি পাদো—ইত্যাদি কাহার সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে? ঐ বায়ু তেজ ও মাধ্যাকর্ষণের ব্যাপক যে শক্তি, সেই শক্তির সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, সেই শক্তিই ঈশ্বর। যিনি ঐ ক্ষুদ্র সকল কণাকে দৃঢ় ভাবে সম্বন্ধ রাখিয়াছেন, তিনিই এই মহীতলকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং তিনিই এই সৌরজগতের নিয়ন্তা ও অনন্তব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা।

এক্ষণে কথা হইতেছে, সেই শক্তির স্বরূপ কি? যদি ধরাতলে কেহ এই শক্তির তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই বর্ত্তমান মানবজাতির আদিপুরুষ মহর্ষিগণ; আমাদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয় এই যে তাঁহারা আমাদিগের প্রতি স্নেহ পরবশ হইয়া বেদ, শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র ও দর্শনাদি নানা শাস্ত্র রাখিয়া গিয়াছেন; অতএব আমরা তাঁহাদিগের শাস্ত্রেই শক্তিতত্ত্ব অন্বেষণ করিব।

শ্রুতি বলেন—

একো দেব সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বভূতাধিবাসঃ, সাক্ষীচেতঃ, কেবলোনির্গুণশ্চ।

সকলের আদিবীজ তিনি, যিনি সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত ও সর্ব্বব্যাপী, কর্ম্মের অধ্যক্ষ, চিত্তের সাক্ষী অথচ নির্গুণ।

এই আদিবীজকেই অন্যান্য শাস্ত্রে ত্রিগুণাতীত নির্লিপ্ত কূটস্থ চৈতন্য বলিয়া

নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইঁহার স্বরূপ চিন্তার অতীত, মনের অকল্পনীয়; ইনিই সেই বেদোক্ত তুরীয়াতীত ব্রহ্ম, শ্রুতিতে যাঁহার সম্বন্ধে "যতঃ বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" উক্ত হইয়াছে, ইনিই সেই নির্গুণ ব্রহ্ম।

ঋষিরা এই নির্গুণ ব্রহ্মকে উপাসনার অবিষয় বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। যাঁহারা যোগ শাস্ত্রোক্ত সংযমী নির্ব্বিকল্প সমাধির অধিকারী, তাঁহারাই তাঁহার সত্বা অনুভব করিতে পারেন।

এই নির্গুণ ব্রহ্মের দুটি ভাব আছে, (১) পুরুষভাব, (২) প্রকৃতিভাব। এই প্রকৃতিকেই বেদান্তে পরমাণু ও পাতঞ্জলে মায়া বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রকৃতি হইতে সত্ব, রজঃ, তম, এই ত্রিগুণের উৎপত্তি হয়, এবং প্রকৃতি পুরুষ এই উভয়ের যুক্ত ক্রিয়ায় এই ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে। প্রকৃতি গুণের আশ্রয়, সুতরাং সগুণ, পুরুষও প্রকৃতির সহিত জড়িত, সুতরাং সগুণ, কিন্তু আশ্রয় দোষে সগুণ বলিয়া নিজে সগুণ নহে। গীতায় মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন,—

"প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদি উভাবপি
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃত সম্ভবান।'

মুণ্ডকোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, সমান বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলংস্বদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি।"

অর্থাৎ সুন্দর পক্ষ যুক্ত দুইটী এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, তাহার একটী পিপ্পল অর্থাৎ কর্ম্মজন্য ফলভোগ করেন, অন্যটী নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন মাত্র করেন।

প্রকৃতি পুরুষাত্মক ব্রহ্ম অবশ্যই সগুণ ব্রহ্ম; নির্গুণ ব্রহ্মের যখন উপাসনা হয় না, তখন সগুণ ব্রহ্মই আমাদিগের উপাস্য ঈশ্বর। আমরা জগতে (মাধ্যাকর্ষণে, তাড়িতে ও অন্যান্য পদার্থে) যত প্রকার শক্তি দেখিতে পাই, সে সমুদয়ই গৌণভাবে সেই নির্গুণ ব্রহ্মাত্মক কিন্তু মুখ্যভাবে প্রকৃতি পুরুষাশ্রিত। নির্গুণ ব্রহ্ম যখন আমাদিগের দুরধিগম্য, তখন এই জগতের অব্যবহিত কারণ স্বরূপ প্রকৃতি পুরুষরূপী ঈশ্বরকে (আত্মাকে বা গডকে) উপাসনা করা ব্যতিরেকে আমাদিগের গত্যন্তর নাই। এই সমন্বিত প্রকৃতি পুরুষই বেদে "আত্মা" শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহাকে কি প্রকারে লাভ করা যায়, তৎসম্বন্ধে কঠোপনিষদে উক্ত হইয়াছে।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যোঃ ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূংস্বাং।"

অর্থাৎ প্রবচন, মেধা বা শ্রুতি দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না, যে তাঁহার প্রার্থী হয়, তাহারই নিকটে তিনি স্বীয় রূপ প্রকাশ করেন।

অতএব এক্ষণ কথা হইতেছে এই, আমাদিগের প্রার্থী হইতে হইবে কি প্রকারে? সেই প্রকৃতি পুরুষ সমন্বিত ব্রহ্ম অবশ্যই নিরাকার। আমি শব্দে কখনই আমার এ দেহ নহে। যখন জন্মের পূর্ব্বে এ দেহ আমার ছিল না, মৃত্যুর পরেও আমার থাকিবে না, তখন এই দেহ কদাচ আমি হইতে পারি না। আরও ইহা দ্রষ্টব্য যে, দৃশ্য ও দ্রষ্টা কখনও এক হইতে পারে না। আমার এই হস্ত আমি দেখিতেছি; দেখিতেছে যে সে কখনও হস্ত হইতে পারে না, অতএব যে দেখিতেছে সেই আমি

অর্থাৎ জীবাত্মা। পুরুষপ্রকৃতি স্বরূপ আত্মাকে এই জীবাত্মার জানিতে হইবে। কিন্তু নিরাকার আত্মাকে আমি কি প্রকারে জানিব ?

এ বিষয় চিন্তা করিবার পূর্ব্বে একবার জীবাত্মার জ্ঞানের সীমা সকল পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। ইহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, মনের যে জ্ঞান আছে, জীবাত্মারও সেই জ্ঞান আছে, কিন্তু মনের সমস্ত জ্ঞানই এই শরীরের দ্বারা লব্ধ। যাহা শরীর দেখায় নাই, শুনায় নাই, জানায় নাই, মন তাহা জানে না, সুতরাং জীবাত্মার বর্ত্তমান জ্ঞান সকলই সাকার-লব্ধ কিন্তু জ্ঞান যত সকলই নিরাকার, অতএব প্রতিপাদিত হইতেছে যে নিরাকার জীবাত্মা নিরাকার জ্ঞান লাভ করিয়াছে সাকার দেহের দ্বারা।

আবার দেখা যাউক, নিরাকার আত্মজ্ঞান ভিন্ন জীবাত্মা অন্য কোন নিরাকারের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে কি না এবং যদি করিয়া থাকে, তবে তাহা লাভ করিয়া থাকে কি প্রকারে ? এ অনুসন্ধানে দেখা যাইতেছে যে, জীবাত্মা সুগন্ধ, সুস্বাদ, সুস্বর, ইত্যাদি নানা প্রকার নিরাকার দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে এবং তাহা লাভ করে তত্তৎগুণের আধার স্বরূপ দ্রব্যের দ্বারা, অতএব নিরাকার আত্মজ্ঞান তদুপযোগী সাকার ব্যতিরেকে লাভ হইতে পারে না।

এক্ষণ কথা হইতেছে, আত্মজ্ঞানের উপযোগী সাকার কি ? আত্মজ্ঞানত প্রকৃতি পুরুষরূপী এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত, এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকারে অবলম্বন করা যাইতে পারে ? সুতরাং অবলম্বনীয় হইতেছে ইহার কোন একটা অংশ ; সেই অংশ মৃত্তিকা, ধাতু, প্রস্তর কাষ্ঠ, অগ্নি, বিষ্ঠা, গোবর, গুল্ম, জীব, লতাদি, সকলই হইতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত বস্তু অবলম্বন করিতে হইলে দেখা যায় যে, ইহার মধ্যে কতকগুলি বিভৎসাত্মক দাহকরী, ক্ষণক্ষয়শীল, বিকৃতিপ্রবণ, সুতরাং যে সকল দ্রব্য এ প্রকারের দোষাশ্রিত, তাহা অবশ্যই বর্জ্জনীয়। ঐ সকল বাদ দিলে রহিল মৃত্তিকা, ধাতু, প্রস্তর ও সারবান কাষ্ঠ সকল। আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের তৃতীয় সূত্রে পূজ্য দ্রব্যের এই সকল গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "দারুজা কামদা, সৌবর্ণা ভক্তি মুক্তিপ্রদা, রাজতা স্বর্গদা, তাম্রময়ী আয়ুর্বর্দ্ধিনী, কাংস্যা আপদ্ধন্ত্রী, পৈতলি শত্রুনাশিনী, শৈলাসর্ব্বভোগপ্রদা, স্ফাটিকী দিপ্তীদা, মৃণ্ময়ী মহাভোগপ্রদা।

মূর্ত্তি বা প্রতিমা বলিলে দ্রব্য বুঝিত হইবে, সেই দ্রব্য পিণ্ড, বর্ত্তুল বা দেহাকারে গঠিত হওয়াতে কোন ইতর বিশেষ নাই। আবাহন বিসর্জ্জন সম্বন্ধে কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহারা বলেন "সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে আবার আহ্বান কেন ?" ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে দুইটী উক্তি আছে, ইহার কোনটীকেই কেহ মিথ্যা বলিতে পারেন না।

(১) সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম

(২) যতঃ ইমানি ভুতানি যায়ন্তে

যখন দ্বিতীয়টী উক্ত হয়, তখন ভুত হইতে তাঁহাকে পৃথক্ ভাবা হয় ; ইচ্ছা করিলে তিনি যে পৃথক্ হইতে পারেন না, ইহা কে বলিতে পারে ? সুতরাং সেই পৃথক স্থলে আবাহন দূষনীয়, হইতে পারে না। স্থিরতর মূর্ত্তির প্রতি আবাহন বিসর্জ্জা

নিষিদ্ধ, কারণ একবার আবাহন করা হইয়াছে।

ধর্ম্ম সাধনের যে প্রবল বাধা কি, তাহা আজ কালকার লোকের জানিবার সুবিধা নাই, কারণ ধর্ম্ম এক্ষণ লোকের ওষ্ঠাগ্রে কিম্বা লেখনীর উপান্তে অবস্থিত, নির্দ্দোষ বক্তৃতা দিতে কিম্বা নির্দ্দোষ প্রবন্ধ লিখিতে পারিলেই ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হওয়া যায়, কোন অনুষ্ঠানের আবশ্যক করে না। এজন্য ধর্ম্ম সাধনের বাধা জানিবার কোন উপায় নাই, কিন্তু ধর্ম্মের বর্ণ পরিচয় যিনি অভ্যাস করিয়াছেন, তিনিও ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, সুদৃঢ় ধর্ম্ম বিশ্বাস লাভকরা একটী অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। আজ যিনি ঘোর আস্তিক তিনি কাল যে ঘোর নাস্তিক হইবেন না, ইহার নিশ্চয়তা কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। প্রবলতর তার্কিকের পাল্লায় পড়িয়া পরিবর্ত্তিত হইতে সচরাচর দেখা যায়, ইহা ব্যতীত মনের বিচারে নিজে পরিবর্ত্তিত হওয়াও কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই প্রকারের মত বিপর্য্যয়ের শঙ্কট পিতামহেরাও অবশ্যই অনুভব করিয়াছিলেন, এবং নিশ্চয়ই এই রকমের পর্য্যায় নিবারণের নিমিত্ত সাধনার সোপান স্বরূপ কয় কাণ্ডের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা" অর্থাৎ সাধকদিগের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্ম নিজেই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। পৃথিবীর লোকে হিন্দুর ছত্রিশ কোটি দেবতা শুনিয়া হাসে, কিন্তু প্রত্যহ আমরা চক্ষু সমীপে ব্রহ্মের যে কোটি কোটি বিকাশ-স্বরূপ মূর্ত্তি দেখিতেছি, তাহা দেখিয়া কেহ হাসে না। যে যে মূর্ত্তিতে তিনি এ পর্য্যন্ত মানব জাতিকে কৃতার্থ করিয়াছেন, তন্ত্র তাহার শতাংশের একাংশও বর্ণনা করিতে পারে নাই। এক্ষণও ভক্তেরা স্বপ্নযোগে কত মূর্ত্তি দেখিয়া থাকেন, তাহা তুমি আমি মিথ্যা বলিলে ভক্ত শুনিবে কেন?

উপাসনায় সাকারের আবশ্যকতা অস্বীকার করা অতিশয় সহজ ব্যাপার, কিন্তু যে ঋষিরা ব্রহ্ম নিরূপণের পরাকাষ্ঠা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মের নিরাকার নির্গুণ ভাব ভূয়োভূয়ঃ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারাই আবার কেন সাকারোপাসনার ব্যবস্থা দিলেন, ইহা চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। বেদে সাকারবাদ নিরাকারবাদ, দুইই আছে।

ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের অষ্টমাষ্টকে
"দুর্গেষু বিষম ঘোরে, সংগ্রামে রিপুসঙ্কটে
অগ্নিচৌর নিপাতেষু, দুষ্টগ্রহ নিবারণে
দুর্গেষু বিষমেষু ত্বাং সংগ্রামেষু বনেষুচ
মোহয়িত্বা প্রপদ্যন্তে তেষাং মে অভয়ংকুরু।"

যজুর্ব্বেদে শিব অম্বিকার উল্লেখ আছে, কেনোপনিষদে "উমাহৈমবতী", মুণ্ডকোপনিষদে "কালী করালী" কৈবল্যোপনিষদে "উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং", তৈত্তিরীয় আরণ্যক "উমাপতয়ে" আত্মপ্রবোধোপনিষদে "নারায়ণায় শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরায়" আছে।

বিশুদ্ধ ব্রাহ্মমতের ব্রাহ্ম ও হিন্দুমতের ব্রাহ্মতত্ত্বজ্ঞানে তুল্য পদবীস্থ কিন্তু ব্রাহ্মমতের ব্রাহ্মকে সাধনাপথে অনেক গুপ্ত বিবরে পড়িতে হয়, সময় সময় পথ হারাইয়া অন্ধকারে হাতড়াইতে হয়। কিন্তু হিন্দুকে যে পথে যাইতে হইবে, তাহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, সে পথ বহু সাধুজন পৃষ্ঠ পদে পদে উপদেশপূর্ণ প্রশস্ত রাজপথ। অন্য ধর্ম্মীরও সে পথ অবলম্বনের কোন বাধা নাই।

হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অন্য সকল ধর্ম্মের অবলম্বীদিগের মানুষ ফুসলইয়া নিজধর্ম্ম লইবার রীতি আছে, নিউটেষ্টামেণ্টের সেণ্টমাথুর অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৩য় প্যারায় জনসাধারণকে ব্যাপটাইস হইবার উপদেশ আছে ও আর বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতিরেকে মুক্তি নাই। সুরা আলো এমরাণের ৮৭ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে "যে ব্যক্তি এছলাম ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম অন্বেষণ করে, তাহার সেই ধর্ম্ম গৃহীত হইবে না, সে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদিগের একজন।" হিন্দুশাস্ত্রে এরূপ কোন উক্তি দেখিতে পাই না, হিন্দু সমাজেরও অন্য ধর্ম্মকে প্রবেশ করাইবার প্রশস্ত পথ নাই। হিন্দুর ইহাই ইচ্ছা যে, মুসলমান উত্তম মুসলমান হন, খ্রীষ্টান উত্তম খ্রীষ্টান হন, হিন্দু উত্তম হিন্দু হন। এ সম্বন্ধে মহর্ষি ব্যাস গীতায় বলিয়াছেন—

"শ্রেয়ান স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বানুষ্ঠিতাৎ"
"স্বভাব নিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং"

মনু বলিয়াছেন,

"যেনাস্য পিতরোজাতা যেন জাতা পিতামহা
স্তেন যায়াৎ সতাংমার্গং তেনগচ্ছন্নরিষ্যতি।"

অর্থাৎ পিতৃ পিতামহগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, সে পথে গেলে কেহ দোষভাগী হয় না। স্বধর্ম্ম ত্যাগ দ্বারা স্বজনের মনস্তাপ সংঘটন করিবার বিশেষ কোন আবশ্যক দেখা যায় না। এবিষয়ে ব্যাস বলেন,—

"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ
সর্ব্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমেনাগ্নি রিবাবৃতঃ।"

মানুষ লইয়া টানাটানি করাটা নিশ্চয়ই কলুষিত কালের লক্ষণ, এক্ষণ নিজে বুঝিবার অপেক্ষা অন্যকে বুঝাইবার আবশ্যক অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিজের মুক্তিলাভ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণ যেন কেবল অন্যকে মুক্ত করিতে পারিলেই কার্য্য সমাধা হয়, পাদরীদিগের উদ্দেশ্য এই কি? না, ইহার নাম রাজনৈতিকক্ষেত্রের সহিত ধর্ম্মক্ষেত্রের একীকরণ। ঈশ্বর লইয়া যুদ্ধ হইলে যাহারা ন্যূন সংখ্যক, তাহারা পরাস্ত হইয়া নিরীশ্বর হইয়া যাইবে, এ ভয় নয় ত? কেমন করিয়া জ্ঞানবান্ লোকেরা একপ কার্য্যের অনুমোদন করেন, তাহা আমরা বুঝিনা, আমরা উত্তম স্বধর্ম্ম নিরত লোক দেখিলেই আনন্দিত হইতে ইচ্ছা করি এবং ধর্ম্ম-বিরোধ একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সকলে একস্বরে বলিতে চাই, "সত্যং পরং ধীমহি।"

শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

চৈতন্যচরিত চৈতন্যধর্ম্ম। (৩৪শ)।

(সন্ন্যাসান্তে)

এই পরিচ্ছেদের লিখিত বিবরণে বৈষ্ণব গ্রন্থকারদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য মঙ্গল ও ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত আছে, চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের বৃত্তান্ত তাহা অপেক্ষা কিছু বিভিন্ন। আমরা প্রথমোক্ত গ্রন্থকারদিগের অনুবর্ত্তী হইয়া বক্তব্য বিষয় বলিয়া পরে শেষোক্ত গ্রন্থ দ্বয়ের মত ব্যক্ত করিব।

সন্ন্যাসের নিশা প্রেমানন্দে অতিবাহিত হইল। গৌরের প্রেমতরঙ্গে পড়িয়া কঠোর বৈরাগী ভারতী গোঁসাইও নাকি কাঁদিয়া বিভোর হইলেন, তাঁহার দণ্ড কমণ্ডলু কোথায় পড়িয়া রহিল, গুরু শিষ্যে হাত ধরাধরি করিয়া, কখন কোলাকুলি করিয়া নাচিয়া কৃষ্ণানন্দে বিভোর হইলেন। শীত কালের দীর্ঘযামিনী কোন দিক দিয়া পোহাইয়া গেল, কেহ টের পাইলেন না। রজনী প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্নের পাদবন্দনা করিয়া বলিলেন, "পিতঃ আপনি নবদ্বীপে গমন করুন, আমার শোক-বিহ্বলা জননী ও প্রাণের বন্ধুবর্গকে আমার সন্ন্যাসের কথা বলিয়া বলিবেন, "যে যদিও কর্ত্তব্যপালন জন্য আমি বনগমন করিতেছি, তথাচ তাঁহাদের অন্তর হইতে আমি কখনই দূরে থাকিতে পারিব না। আর আপনি, আমার পিতা যখন স্মরণ করিবেন, আমার দেখা পাইবেন।" আচার্য্যরত্নাদি শোকবিহ্বলচিত্তে কাঁদিতে কাঁদিতে নবদ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং দিবাবসান সময়ে শচীগৃহে উপনীত হইয়া বৈষ্ণবমণ্ডলী সমক্ষে সর্ব্বকথা খুলিয়া বলিলেন। গৌরের গমন হইতে এই তিন দিন পর্য্যন্ত নবদ্বীপ-নগর বিষাদ ধাম হইয়াছে। ভক্তমণ্ডলী মৃতকল্প শচী মাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া গৌরগুণকীর্ত্তন করিয়া কতই কাঁদিতেছেন। মা শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া আছেন, প্রভাত-সময়ে গৌর যাইবার সময় বাড়ীর অবস্থা যেরূপ ছিল, সেইরূপ সকল বাসি হইয়া পড়িয়া আছে, তিন দিন পর্য্যন্ত কেহ জলবিন্দু স্পর্শ করেন নাই। এক্ষণে আচার্য্যরত্নের কথায় তাঁহাদের শোকাবেগ শতগুণ বৃদ্ধি হইল এবং নানাভাবে সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতপ্রমুখ ভক্তগণ শোকে আত্মহারা হইয়া জীবনান্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। পরক্ষণেই প্রত্যাদিষ্ট হইলেন যে আত্মহত্যারূপ পাপে নিমগ্ন হইবেনা। অল্প সময় মধ্যেই গৌরের সঙ্গে পুনর্মিলন হইবে। তখন তাঁহারা আপনাদের ভীষণ প্রতিজ্ঞা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এইরূপে বিষাদের কালিমায় নবদ্বীপের আকাশ ছাইয়া ফেলিল। দুঃখ বিষাদে মগ্ন হইয়া ভক্তমণ্ডলী কালের কুটিল গতির দিকে চাহিয়া থাকিলেন।

এ দিকে আচার্য্যরত্নকে বিদায় দিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনগমনে উদ্যত হইলেন। ভারতী গোস্বামী গৌরের প্রেমমন্ত্রে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাঁহার গমনোদ্যোগ দেখিয়া বলিলেন "আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। এখানে একাকী থাকিয়া কি করিব? তোমার সঙ্গে সংকীর্ত্তনানন্দে সুখে দিন কাটিয়া যাইবে। প্রেমানন্দের কণা পাইলে আর শুষ্ক জ্ঞান যোগ ভাল লাগেনা।" গৌরচন্দ্র অনুমতি দিলে অগ্রে ভারতী মধ্যে নূতন সন্ন্যাসী, পশ্চাতে নিত্যানন্দ মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। গৌর তখন নবজীবনের নবভাবে বিভোর। পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী যেমন পিঞ্জর হইতে বাহির হইতে পারিলে প্রমুক্ত আকাশে সুখপূর্ণ উৎসাহে বিচরণ করিতে থাকে, তেমনি সংসার পিঞ্জর কাটিয়া গৌর-পাখী আজ ব্রহ্মাণ্ডের সুপ্রশস্ত পথে বাহির হইয়াছেন, সংকীর্ণতার নীচ সীমা

আজ তাঁহার পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে, প্রাণে অসীম অনন্তের ছায়া পড়িয়াছে, প্রেমের জলন্ত অনল ধক ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, এবং এত দিনে প্রাণ নাথের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে পারিবেন বলিয়া আনন্দসাগরে বুক ভাসিয়া যাইতেছে, গৌর আত্মহারা হইয়া ভাগবতের নিম্নোক্ত শ্লোক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন,—

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অনন্তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাংঘ্রিনিষেবয়ৈব।"

পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের অবলম্বিত পরমাত্ম নিষ্ঠা আশ্রয় করিয়া মুকুন্দ চরণ সেবা দ্বারা আমি দুস্তর অন্ধকার উত্তীর্ণ হইব।"

ভ্রাতৃগণ। সংসার মোহ উত্তীর্ণ হইতে হইলে পূর্ব্বতন মহর্ষিদিগের অবলম্বিত পরমাত্ম নিষ্ঠাই সার। পরমাত্মাতে নিষ্ঠা স্থাপিত না হইলে তাঁহার চরণ সেবার অধিকার জন্মে না। অতএব তোমরা এখন অনুমতি কর, আমি নিভৃতে যাইয়া পরমাত্মনিষ্ঠা অভ্যাস করি। "এই বলিয়া অনুরাগ ভরে গৌরচন্দ্র দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। বন্ধুগণও তাঁহার সঙ্গে ছুটিয়া চলিলেন। এদিকে অপরূপ মূরতি নূতন সন্ন্যাসী দেখিয়া নগরের বহু সংখ্যক নর নারী তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন এবং গৌরের তৎকালের জ্বলন্ত বৈরাগ্য ও প্রেম অবলোকন করিয়া তাঁহার মাতা পত্নীর কথা স্মরণ করিয়া কত রূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, গৌরচন্দ্র তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অতি মধুর ভাবে নিম্নলিখিত উপদেশ দিলেন।

"ভাই সব। গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গৃহ ধর্ম্মে মনোযোগ কর। কিন্তু দেখো—যেন সংসারে আসক্ত হইও না। পবিত্র কর্ত্তব্য জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে সকল ধর্ম্ম সমারম্ভ কর। অনুদিন হরি নাম সংকীর্ত্তন কর এবং কৃষ্ণ গত প্রাণ হও। আমি প্রার্থনা করি, শুকাদির ও দুর্লভ প্রেম যেন তোমাদের লাভ হয়।" লোক সকল প্রেমানন্দে গদ গদ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া চলিল।

দেখিতে দেখিতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বন্ধুগণ রাঢ় ভূমিতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। রাঢ়দেশের উচ্চ ভূমি সকল পরম সুন্দর, সুপ্রশস্ত প্রস্তরের চারিদিকে অশ্বত্থবৃক্ষরাজি সারি সারি শোভা পাইতেছে, গাভীগণ মহানন্দে বিচরণ করিতেছে দেখিয়া গৌরের বৃন্দাবন ভাবাবেশ হইল এবং মত্ততার সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন। মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ কীর্ত্তন জুড়িয়া দিলেন। নাচিতে নাচিতে প্রভু বলিলেন, বক্রেশ্বর যে বনে তপস্যা করিতেছেন, আমি সেইখানে যাইয়া নিভৃতে কৃষ্ণনাম করিব। এই বলিয়া নবসন্ন্যাসী উদ্ভ্রান্ত নৃত্য কীর্ত্তন করিতে করিতে পশ্চিমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। বেলা অবসান হইল দেখিয়া ভক্তগণ তাঁহাকে লইয়া এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিলেন, এবং কিছু জলযোগান্তে সকলে গৌরকে বেষ্টন করিয়া ব্রাহ্মণের বাহির বাড়ীতে শয়ন করিয়া থাকিলেন। রজনী তৃতীয় প্রহরের সময় নিত্যানন্দ জাগরিত হইয়া দেখেন, গৌরচন্দ্র শয্যায় নাই। অত্যন্ত ব্যস্তমনা হইয়া তিনি আর আর সঙ্গীদিগকে জাগাইলেন এবং সকলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাঁহার

অন্বেষণে বাহির হইলেন। গ্রামখানি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া তাঁহারা প্রান্তর ভূমিতে গমন করিলে নৈশ নিস্তব্ধতাভেদ করিয়া সুদূর হইতে বিলাপযুক্ত রোদনধ্বনি তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। শব্দ তত সুস্পষ্ট না হইলেও তাঁহারা গৌর কণ্ঠবিনির্গত বলিয়া তাহারা বুঝিতে পারিলেন এবং শব্দানুসারে গমন করিয়া লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইলেন। প্রভাতীয় ক্ষীণালোকে ভক্তগণ দেখিতে পাইলেন, নির্জ্জন প্রান্তর ভূমিতে বসিয়া সেই নবীন সন্ন্যাসী চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া "কৃষ্ণরে প্রভুরে ওরে কৃষ্ণ মোর বাপ" বলিয়া কাঁদিতেছেন, তাহার গভীর বিলাপধ্বনি নৈশ আকাশে প্রতিধ্বনিত হইয়া দিক্‌মণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিতেছে, এবং সাক্ষাৎ বৈরাগ্য প্রতিমূর্ত্তি ধরিয়া যেন তাহার রক্ষায় নিযুক্ত আছে। ভক্তগণ তাঁহার তদানীন্তন শোকে বিষাদের ভাব দেখিয়া কাঁদিয়া ব্যাকুল হইলেন। মুকুন্দ অবসর বুঝিয়া মধুর কণ্ঠে সংকীর্ত্তন গাইতে আরম্ভ করিলেন। রসময় হরিনাম শুনিবা মাত্র গৌরের ভাব পরিবর্ত্তন হইল। তিনি অমনি উঠিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে গাইতে গাইতে, নাচিতে নাচিতে এই অপূর্ব্ব ভক্তগণ ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। হরি সংকীর্ত্তন কাহাকে বলে, তখন কেহ জানিত না। যে গ্রামের পথ দিয়া যাইতে লাগিলেন, নরনারী সকল অবাক্ হইয়া তাঁহাদের ভাব গতিক দেখিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের কথা লইয়া গ্রামে গ্রামে কতই আন্দোলন চলিতে লাগিল। এই রূপে রাঢ় দেশ ধন্য করিয়া বিশ্বম্ভর বক্রেশ্বরের আশ্রমাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। চারিক্রোশ মাত্র পথ অবশিষ্ট আছে, হঠাৎ তাঁহার গতি ফিরিল। যাইতেছিলেন পশ্চিমাভিমুখে, হঠাৎ পূর্ব্বাস্য হইলেন। সঙ্গীগণ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর করিলেন, আমাকে নীলাচলে যাইতে হইবে, জগন্নাথ প্রভুর আদেশ হইয়াছে যে শীঘ্র নীলাচলে চল। ভক্তগণ তাহা শুনিয়া পরম সুখী হইলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, যখন ইতি পূর্ব্বে পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনিয়া শচী মাতা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসান্তে তিনি কোথায় থাকিবেন। গৌর তখন জননীকে কিছু ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই, এই মাত্র বলিয়াছিলেন যে, তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, জননীরে মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া যাইবেন, বিশ্বরূপের ন্যায় নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবেন না। ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাদিগের এই এক বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় যে, তাঁহারা চিরদিনই প্রিয়তমের শ্রীমুখের আজ্ঞার আজ্ঞাকারী। সেই আজ্ঞায় মরিতে হয়, সেও ভাল, তথাচ পৃথিবীর কথায় সহস্র লাভ হইলেও তাহারা তাহা মানিতে প্রস্তুত নহেন। এক মাত্র ভগবদাদেশেই ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ জীবনান্তকারী বিপদকেও গ্রাহ্য করেন নাই। মহর্ষি ঈশা বুক পাতিয়া ক্রুশের আঘাত লইয়াছিলেন। আর তাহাতেই গৌরকে পথের ভিখারী করিল। যাহা হউক, প্রত্যাদেশের অভ্রান্তবাণী আজ তাঁহার ভবিষ্যতের বাসস্থান যেই নির্ণয় করিয়া দিল, অমনি মত্ত মাতঙ্গের গতি ফিরিল। মেষ শিশুর ন্যায় আদেশের নির্দ্দেশানুসারে তিনি গঙ্গাভিমুখে প্রতি নিবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে গ্রামবাসীদিগের কাহারও মুখে হরিনাম না শুনিয়া গৌরের হৃদয় বড় ব্যথিত হইল। তিনি বলিলেন,

"এই কয়েকদিন ভারত এই দেশে বেড়াইতেছি, কিন্তু হায়! কাহারও মুখে একবার "কৃষ্ণ হেন নাম" শুনিতে পাইলাম না, কি পরিতাপের বিষয়"। এই ভাবে যাইতে যাইতে গৌরচন্দ্র সঙ্গীদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া কিছু অগ্রগামী হইলেন এবং ধ্যানানন্দে বিভোর হইয়া গভীর সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক এক স্থানে যাইয়া নিমীলিত নেত্রে নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। তাঁহার সঙ্গীগণ নিকটবর্ত্তী হইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গেলেন। তাহারা দেখিলেন, কয়েক জন গরুর রাখাল স্তিমিত নেত্র বিশ্বম্ভরকে বেষ্টন করিয়া হরিবোল বলিয়া হাতে করতালি দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছে। মধ্য স্থানে দাঁড়াইয়া চৈতন্য প্রভু নামানন্দে ভাসিতেছেন। তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ হইলে এই ব্যাপার দেখিয়া মহাসুখী হইলেন এবং দেশবাসীদিগের মুখে হরিনাম না শুনিয়া তাঁহার প্রাণে যে কষ্ট হইয়াছিল, তাহা অপনীত হইল। সহাস্য মুখে গৌরচন্দ্র রাখাল বালকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখান হইতে গঙ্গা কত দূর?" বালকগণ উত্তর করিল এক প্রহরের পথ।

গঙ্গা নিকটবর্ত্তী শুনিয়া গৌরচন্দ্র গঙ্গাবগাহনের জন্য দৌড়িতে লাগিলেন। সঙ্গের ভক্তগণ কেহ তাহার সঙ্গে চলিয়া উঠিতে পারিলেন না। কেবল নিত্যানন্দ তাঁহার দেহ রক্ষায় ব্যগ্র হইয়া কোন মতে মতে তাঁহার সঙ্গে যাইতে পারিলেন। প্রায় সন্ধ্যাসময়ে উভয়ে গঙ্গাতীরে পৌঁছিলে গৌরচন্দ্র মনের সাধে অবগাহন উদর পূরিয়া গঙ্গাজল পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। গঙ্গা দর্শনে তাঁহার প্রেমাবেগ প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি গঙ্গার স্তব পড়িতে পড়িতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। "ব্রহ্মরূপের দ্রবভাবরূপিনী গঙ্গে, তোমার জল প্রেম রস স্বরূপ, উহা পানে স্নানে অশেষ পাপ দূরীভূত হইয়া কৃষ্ণ প্রেম লাভ হয়। জগতের মঙ্গলের জন্যই তোমার মর্ত্ত্যে আগমন।' ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া কেনা গঙ্গার ভাবে মুগ্ধ হইয়াছে। প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ হইবেন না কেন? নিত্যানন্দের সহিত গৌর সেই নিশা সে গ্রামে যাপন করিলে প্রভাতে অনুবর্ত্তী ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হইলেন। তখন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন "নিতাই! আমার বিরহে মা ও শ্রীবাসাদি ভক্ত মণ্ডলী ম্রিয়মান হইয়া আছেন, তুমি শীঘ্র নবদ্বীপে গমন করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত কর এবং আমার আগমন সংবাদ দিয়া বলিও যে আমি তাঁহাদের দর্শনাপেক্ষায় শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে অবস্থিতি করিতেছি। এখান হইতে শান্তিপুর বেশী দূর নয়, আমি গঙ্গা পার হইয়া ভক্ত হরিদাসের আশ্রমে ফুলিয়া নগর দর্শন করিয়া শান্তিপুরে যাইব। তুমি ইতি মধ্যে নবদ্বীপ হইতে মা ও বন্ধুদিগকে লইয়া আচার্য্য ভবনে আগমন করিও।" এই বলিয়া সকলে একত্রে গঙ্গা পার হইলেন এবং নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া গৌরচন্দ্র ফুলিয়া অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

এই তো গেল চৈতন্যভাগবত গ্রন্থকার প্রমুখ গ্রন্থকারদিগের মত। ইহাদিগের মতে সন্ন্যাসযাত্রা হইতে এপর্য্যন্ত দ্বাদশ দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে চরিতামৃতে ও চন্দ্রোদয় নাটকে "কিছু অন্যরূপ বর্ণনা দেখা যায়। চরিতামৃতের মতে

সন্ন্যাস গ্রহণান্তে প্রেমে উন্মত্ত হইয়া গৌরচন্দ্র বৃন্দাবনে যাইবার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পশ্চাতে নিত্যানন্দ, আচার্য্য-রত্ন ও মুকুন্দ এই তিনজন মাত্র অনুগমন করিলেন। কবি কর্ণপূর বলেন যে, সঙ্গে কেবল মাত্র নিত্যানন্দই ছিলেন; আচার্য্য রত্নকে পূর্ব্বেই বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মহাপ্রভু প্রেমে আত্মহারা হইয়া তিন দিন দিবা রাত্রি রাঢ় দেশের মধ্যে দৌড়াইয়া বেড়াইয়া ছিলেন। গোপবালকদিগকে বৃন্দাবনে যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিলে, নিত্যানন্দের শিক্ষামত তাহারা তাঁহাকে গঙ্গাতীরের পথ দেখাইয়া দিয়াছিল। চরিতামৃতকার বলেন যে, এইখানে নিত্যানন্দ আচার্য্যরত্নকে নবদ্বীপে পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন যে, "শচীমাতা ও ভক্তগণকে লইয়া তিনি শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে যাইবেন। আমি কোন রূপে প্রভুকে ভুলাইয়া তথায় গমন করিব।" এইরূপে আচার্য্য-রত্নকে বিদায় দিয়া নিত্যানন্দ প্রেম-মুগ্ধ গৌরচন্দ্রের সম্মুখে যাইয়া দর্শন দিলেন। গৌর বিস্মিতের ন্যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীপাদ গোঁসাই। আপনি কোথায় যাইবেন?"

নিত্যানন্দ উত্তর করিলেন "তোমার সঙ্গে বৃন্দাবনে যাইব।"

জিজ্ঞাসা— বৃন্দাবন কত দূরে?

"এই যমুনা দর্শন কর" বলিয়া নিতাই গৌরকে গঙ্গাতীরে আনিলেন। এবং কোন আগন্তুককে দেখিতে পাইয়া তাঁহাদের আগমন-সংবাদ অদ্বৈতের সমীপে প্রেরণ করিলেন। এদিকে গৌরচন্দ্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গঙ্গাকে যমুনা জ্ঞান করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। এবং স্নান মার্জ্জন করিয়া আর্দ্র কৌপিনে নাম কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতি মধ্যে অদ্বৈতাচার্য্য সবান্ধবে নূতন কৌপিন বহির্ব্বাস লইয়া নৌকারোহণে আগমন করিয়া নবীন সন্ন্যাসীর রূপ ও ভাবমধুরী দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র অদ্বৈতকে তদবস্থায় দেখিয়া বিস্মিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আমি বৃন্দাবনে আসিয়াছি, তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

অদ্বৈত ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, "প্রভু। তুমি যেখানে, সেই বৃন্দাবন। আমার সৌভাগ্য, তোমার আমার দেশের গঙ্গাতীরে আগমন হইয়াছে।" এই বলিয়া আচার্য্য কাঁদিতে কাঁদিতে গৌরকে শুষ্ক কৌপীন পরাইয়া দিলেন। বিশ্বম্ভর বলিলেন, "বুঝিয়াছি, নিত্যানন্দ আমাকে বঞ্চনা করিয়া যমুনা দর্শনচ্ছলে এই গঙ্গাতীরে আনিয়াছেন"।

অদ্বৈত বলিলেন, "শ্রীপাদের কথা মিথ্যা নয়। যুক্ত বেণী প্রয়াগ হইতে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী তিনে সম্মিলিত হইয়া এক ধারে প্রবাহিত হইতেছে, তন্মধ্যে গঙ্গার মধ্যে সরস্বতী পূর্ব্বে ও যমুনার ধারা পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে। তুমি যখন সেই পশ্চিম পারে অবগাহন করিয়াছ, তখন যমুনায় স্নান করা হইয়াছে। চারি দিন উপবাসী রহিয়াছ, এক্ষণে এই নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া আমার বাড়ীতে এক মুঠা রুকা শুকা ভাত খাইতে হইবে।

নিতাই হাসিতে হাসিতে বলিয়া উঠিলেন "রুকা শুকার কর্ম্ম নয়। চার চারি দিন উপবাসী আছি, ভোজনের আয়োজনটা ভাল না হ'লে তোমার বাড়ী যাওয়া হইবে

না।" অদ্বৈত পরিহাস করিয়া বলিলেন, "কেন তোমার আবার উপায় কিসের? যেখানে যাও, তোমার পূজা না হলে কি ছাড়?"

নিতাই উত্তর করিলেন "আর পেটপূজা! উনি না হয় হরি-প্রেমরস পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন, আমার তো আর রস কম নাই, আমি কি খেয়ে বাঁচি বল দেখি? উনি দণ্ড নিয়ে দিন রাত্রি মাঠে মাঠে ঘুরছেন, আমার এ কি দণ্ড যে আমি না খেয়ে না শুয়ে পেছে পেছে ঘুরে মরি।"

অদ্বৈত মনে মনে নিত্যানন্দের অকৃত্রিম ও সরল সৌহার্দ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন "এখন চল্ বামনা পেটে পিটে যাহা যেখানে হয় খেতে পাইবি এখন।" এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে সকলে গৌরকে লইয়া নৌকারোহণে পর পারে চলিয়া গেলেন। এ বৃত্তান্তে ভুলিয়া যাইবার কথা নাই। এবং সন্ন্যাস হইতে শান্তিপুরে আগমন পর্য্যন্ত চারি দিন রাত্র অতিবাহিত হইয়াছে।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

ব্যষ্টি না সমষ্টি।

"Ich dien"—* "আমি সেবক।"

হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, ইউরোপ ব্যক্তিত্ব-প্রধান ও ভারত সমাজপ্রধান দেশ, কিন্তু একটু ভিতরে প্রবেশ করিলেই ঠিক বিপরীতভাব নয়নগোচর হয়। একান্নবর্ত্তী পরিবারাদি নানাপ্রকার বাহ্যিক বন্ধনের চিহ্ন থাকা সত্বেও কঠোর অত্যাচার সামাজিক দৌরাত্ম্যের অধীনস্থ ভারত সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিত্বপ্রধান, নিজকে লইয়াই সবাই ব্যস্ত, অপরের কথা ভাবিবার অবকাশ নাই; ইউরোপে সব রকমে ষোলআনা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহিত আবাল বৃদ্ধ বনিতা আপনার আপনার পায়ের উপর দাঁড়াইয়া থাকিলেও, সমাজের জন্য, দেশের জন্য এমন কি সময়ে সময়ে পৃথিবীর সীমান্তস্থিত পরদেশী জনসমাজের হিতের জন্য বিস্তর লোক প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সমগ্র মানবজাতির, অন্ততঃ অধিকাংশের অপার্য্যমানে দেশের, নিতান্ত পক্ষে আপন সমাজের কল্যাণ সাধন প্রত্যেক জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, সরল-জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনানুসারে যথাসাধ্য ঐ পথে চলা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

অনেকে বলেন, ধর্ম্মের (formulated

* প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের শিরোভূষণে "ইশ ডীন" এই দুইটী জর্ম্মান শব্দ উজ্জ্বল অক্ষরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের এক জন সাধারণ ধনী এরূপ বাক্য কখন সহ্য করিবেন না—"আমি সেবক? আমি চাকর? ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ আমার সেবায় রত, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল আমার পদতলে, আমি আবার কাহার সেবক হইব?"—বাবুর কথা এই। আর পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাট 'সংসারের সেবক' বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, পরম গৌরব বোধ করেন। পূর্ব্ব পশ্চিমে এতই তফাৎ।

religion) শাসনাভাব হইলে মানব আপন আপন পাশব প্রবৃত্তি অনুসারে যথেচ্ছাচারী হইবে, পরস্পরে গলাকাটাকাটি করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিবে না; সুতরাং যেমন তেমন একটা ধর্মের ভয় ব্যতীত ঠিক রাখিতে পারা সম্ভব নয়। অপরদিকে ঐরূপ সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মত যে অনৈসর্গিক অমানুষী শক্তির কল্পনা দ্বারা শাসনের কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না, কঠোর প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী সমাজ আপনার অবস্থা আপনি করিয়া লইবে; যাহারা সাধারণের ক্ষতি করিয়া বা অশান্তি জন্মাইয়া আপনাদের নিকৃষ্ট স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, বা চেষ্টা পাইবে, তাহাদের দমন বা দূরীকরণ অবশ্যম্ভব। ইঁহারা বলেন, কেবল পুণ্যপ্রতাপ জাতীয় সমুন্নতির একমাত্র কারন, (Righteousness alone exalteth a nation), যে সমাজে পরস্পরের মধ্যে অসদ্ভাব, অপ্রত্যয়, হিংসা, দ্বেষ, যেখানে হিতের জন্য কোন একটী সামান্য স্বার্থও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নয়, এমন ভীরু, হীন, জঘন্য-স্বার্থপরতার দুর্গন্ধময়-অন্ধকূপস্বরূপ, আত্মঘাতী সমাজের বিনাশ অনিবার্য্য। যদি কোথাও অত্যন্ত দূষিত কদর্য্য সমাজ বিদ্যমান দেখা যায়, স্থির জানিতে হইবে, উহা দ্বারা অলক্ষিত ভাবে কোন শুভ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতেছে, নতুবা এতদিন নিশ্চয় লোপ পাইত। চোরেরও ন্যায়বোধ ও কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে। প্রত্যহ নরশোণিতে কলঙ্কিতহস্ত মহাপাপগ্রস্ত, সুবিখ্যাত দস্যু রত্নাকরের পাষাণসম কঠিন হৃদয়েও বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যজ্ঞান এরূপ দৃঢ় ছিল যে, কেবলমাত্র তাঁহাদেরই জন্য এতাদৃশ নৃশংস কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। অপরের সঙ্গে সম্যকপ্রকারে সম্বন্ধ-বিরহিত নির্লিপ্তাবস্থায় একরূপ সম্ভবে না। আমার উপর যাহাদের দাবী আছে; এমন কতকগুলি লোকের সঙ্গে সংস্রব ব্যতীত নিরবচ্ছিন্ন স্বতন্ত্রভাবে আমার ব্যক্তিত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা অসম্ভব। ঈশ্বর * ভিন্ন সমস্তই আপেক্ষিক, সুতরাং অন্যের সহিত তুলনা বা সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের নির্দ্দেশ পাওয়া যায় না। ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মত-বিশ্বাসের ধর্ম্ম সংসার হইতে একেবারে গেলে কতকগুলি পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী,— অনেক বিষয় যাহা দৃঢ় সংস্কার বশত এখন ঘৃণার চক্ষে দেখি, তখন নির্দ্দোষ বলিয়া বোধ হইবে; যে কার্য্যের দ্বারা কাহারও কোন প্রকার অসুখ বা ক্ষতি হয় না, অথচ কেবল একটা ভ্রান্তমত ও অন্ধবিশ্বাস হেতু এখন দোষের বলিয়া বোধ হয়, সেগুলি তখন কাহারও আপত্তির বিষয় হইবে না, বরং অনেক সময় প্রয়োজনীয় বোধ হইবে। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, খ্রীষ্ট, পল, নানক, চৈতন্য প্রভৃতিকে তাঁহাদের জগৎ-পূজ্য মহোচ্চপদ হইতে নীচে নামাইবার কোন কারণ উপস্থিত হইবে না, কিন্তু বুদ্ধ, কপিল, মিল, কোমৎ, ব্রুণো, স্পাইনোজা প্রভৃতিকে নাস্তিক বলিয়া সংসার এখন যে ভাবে দেখিতেছে, তদপেক্ষা

* শাস্ত্রকারগণ বলেন, ঈশ্বর আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য বিশ্ব সৃষ্টি করেন। যখন একাকী ছিলেন, তখন ব্যক্তিত্বহীন অব্যক্তাবস্থা; আপন কানকে আপনি জানিতেছিলেন, জীবকে সঙ্গী ও অংশী করিয়া সুখী হইলেন। (যদিও এমতে অনেক তর্ক উপস্থিত হইতে পারে।)

অনেক উন্নত ও পূজার্হ বলিয়া স্বীকার করিতে দ্বিধা করিবে না। একমাত্র সামাজিক হিত সম্বন্ধে (the greatest good for the largest number) উপযোগীতানুসারে নির্ব্বিশেষে সকল কার্য্যের বিচার সংসারে বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে। যাহারা সমাজে অশুভ বা অহিত কার্য্য করিবে, তাহাদের সংশোধন চেষ্টা প্রথম, পরে সমাজের মর্য্যাদা ও জীবনরক্ষার্থ, যে কোন উপায়ে হউক, দণ্ডশাসন সমুচিত। বিলক্ষণ দেখা গিয়াছে, যে জাতি বা সমাজ দ্বারা সংসারে ক্রমাগত অমঙ্গল আনীত হইয়াছে, তাহার অনিবার্য্য পরিণাম ধ্বংস, হাজার পবিত্রার ধর্ম্মমত থাকুক, এবং ব্রত, নিয়ম, যাগ, যজ্ঞাদি বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপের ঘটা যতই হউক, কিছুতেই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে নাই, কারণ, একজনের জন্য দশজন ভুগিতে পারে না, এই উৎকৃষ্ট নিয়ম পৃথিবীর আদি কাল হইতে সমান তেজের সহিত ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে।

অনেক ধর্ম্ম-প্রচারক, ধর্ম্মযাজক এবং ইহলোক ফেলিয়া রাখিয়া পরলোকের জন্য ব্যস্ত ধর্ম্মব্রতধারী মহোদয় বলেন যে, ঈশ্বরপূজা অর্থাৎ, কেবল ধ্যান ধারণা জপ তপাদি, আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা সারিয়া সময় থাকিলে মানুষের সেবা, জীবের প্রতি প্রেম ইত্যাদি অল্পাবশ্যকীয় বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া যাইতে পারে। নচেৎ আত্মার মুক্তির জন্য ও সকল ছোট কাজ সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনীয়। অনন্ত ভগবান তাঁহার প্রিয় সাধুসন্তানগণ দ্বারা বারম্বার সংসারে প্রচার করিয়াছেন, "জীবে দয়া, নামে রুচি, মানব-সেবা, তিন এক সঙ্গে চাই, কোনটী কম হইলে চলিবে না"। "আমার এই ক্ষুদ্র সন্তানগুলির মধ্যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকরটীর প্রতি যদি কোন প্রকার ত্রুটি হইয়া থাকে, তাহা আমার প্রতি হইয়াছে জানিবে"। "যে তাহার ভ্রাতাকে ভালবাসিতে না পারে, যাহাকে চর্ম্ম চক্ষুতে নিয়ত দেখিতেছে, কি প্রকারে ঈশ্বরকে প্রেম করিবে, যিনি কখন তাহার নয়নগোচর হন নাই ?" এই সকল ভগবান বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, ঈশ্বর-দাস্য ও মনুষ্য-সেবা অভিন্ন,—যে ভগবদ্ভক্তি ঊর্দ্ধ হইতে নীচে নামিয়া নরলোকের পরিচর্য্যায় রত না হয়, তাহা অসম্পূর্ণ, অসার, অলীক, এবং যে ভ্রাতৃসেবা পৃথিবী হইতে উচ্চে উঠিয়া স্বর্গীয় পিতার আরাধনায় পরিণত না হয়, তাহাও অপূর্ণ, ভ্রান্ত, অশুদ্ধ।

ইহ জীবনে কোনই ফল নাই, এ কথা দুই জনের মুখে বেশ সাজে, পরিতৃপ্ত অথচ অসন্তুষ্ট ভোগবিলাসাশ্রয়ী এবং ত্যাগী বাতাতপ-সহিষ্ণু সন্ন্যাসী। প্রথম ব্যক্তি বলেন, বিলাস ভাল কিন্তু বড় শীঘ্র ফুরাইয়া যায়, সুখটুকু উত্তপ্ত পারদের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া শেষ হিসাবে দুঃখের ভাগ বেশী দাঁড়ায়, সুতরাং জীবন অসুখ ও অমঙ্গলের কারণ মাত্র। বিরক্ত বৈরাগী, বিলাসীর সমস্ত কথা স্বীকার করিয়া উপরন্তু বলেন, এ শরীরে যখন বাসনা তৃপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই, তখন ইহাকে কষ্ট দিয়া ভবিষ্যতের আশা রাখাই যুক্তি-সঙ্গত। ক্ষুদ্রতা বশত ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে দেখিবার অসামর্থ্য হেতু উভয়েরই রূপ সঙ্কুচিত ও অসঙ্গত মত; ছোট বড় সর্ব্ব প্রকার বাসনার সম্বন্ধ যে সমাজের সঙ্গে, ব্যক্তির সঙ্গে নয়, ইহা দুই জনেরই লক্ষ্য নাই।

"স্থূল দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে সংসারে সুখাপেক্ষা দুঃখের ভাগ অনেক বেশী বোধ হয়। তাই কবি গাইয়াছেন,

"Count o'er the joys thine hours have seen
Count o'er thy days from anguish free
And know whatever thou hast been,
'T is something better not to be."

কবি কেন? চিন্তাশীল মানুষ মাত্রেই দৈনিক হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর বিশ্রাম কালীন চারিদিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "এত খাটিয়া কি লাভ হইয়াছে?" প্রতিধ্বনি স্পষ্ট উত্তর দেয়, "কিছু না। সমস্তই গিল্‌টী, ফাঁপা, মানুষ কেবল হাওয়ার পশ্চাতে ছুটিতেছে। পুরাকাল হইতে এই রূপ জিজ্ঞাসা চলিয়া আসিতেছে। ভারতের দর্শনাদিতে ত পিষ্ট পেষিত হইয়াছে, কর্ম্ম প্রধান পাশ্চাত্য জগতেও কম হয় নাই। * কিন্তু সমস্তই হতাশের ব্যক্তিগত বিলাপ মাত্র। নিরাশা হইতে সন্দেহের উৎপত্তি, এবং সংশয় বহু কাল পোষিত হইলে অবশেষে অশিববাদ (Pessimism) ও নাস্তিকতায় লইয়া ফেলে। এই ভয়ঙ্কর প্রবল স্রোতে গা ভাসান দিয়া (অজ্ঞাতসারে) শুপনর (Schopenhauer) হীন (Heine) লিন (Lenau) ভন হারমান (Von Hartmann), বায়রণ (Byron) শাটো ব্রিয়া (Chateau Briaud) প্রভৃতি কত দেশের কত অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহামহোপাধ্যায়, হিংস্র জন্তু পূর্ণ, ঘোরতিমিরাচ্ছন্ন, ঝঞ্ঝা-তাড়িত, বিপদসঙ্কুল অবিশ্বাস-সাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গলের বিভীষিকা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান নাই। ইঁহারা যদি, মানব সমাজের ক্রমোন্নতি, ও নরলোকের দুঃখ দূরীকরণের জন্য সভ্য জগৎ দ্বারা যে সকল উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেন, নিরাশার কোনই কারণ ছিল না।

* অতি প্রাচীন কালে মিদাস নৃপতির (Midas King of Phrygia) প্রশ্নোত্তরে বনদেবতা সিলিনস (Satyr Silenus) বলিয়াছেন, পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ না করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আর যদি জন্ম হয়, যত শীঘ্র মরিতে পারা যায় ততই মঙ্গল। বর্ত্তমান যুগে কবি বায়রণ (Byron) ঈশ্বরদ্রোহী আদম-পুত্র কেইনের (Cain) দোহাই দিয়া জীবনসম্বন্ধে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

"———I was unborn:
I sought not to be born, nor love the state
To which that birth has brought me
* * * * *
* * * They have but
One answer all questions, 'T was *his* will,
And *he* is good." How know I that? Because
He is all powerful, must all good too follow?
I judge but by the fruits—and they are bitter—
Which I must feed on for a fault not mine"

হইতে পারে, সুখ অপ্রাপ্য সামগ্রী, অন্তত প্রয়াস দ্বারা, তাই বলিয়া যাহাতে দুঃখ দূর বা হ্রাস হয়, এরূপ চেষ্টা কোন

ইহার পূর্ব্বে মানফ্রেডের (Manfred) মুখ দিয়া বলিয়াছিলেন, "But grief shall be the instructor of the wise, sorrow is knowledge,—" ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, "the gloomy heat of an unbounded and exuberant despair becomes at last oppressive to us." বায়রণ সম্বন্ধে গেটের এই কথা খুব পাকা।

অংশে দোষের বহিস্কৃত হইতে পারে না। চারিদিকের দুঃখ দারিদ্র্য দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, বহু জীবের জীবন ভারবহ ও বিফল (hardly worth the living), কিন্তু ঐ সকল শোচনীয় অবস্থার অসুখের এমন অনেকগুলি কারণ দৃষ্ট হয়, যাহা ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ দ্বারা অনায়াসে নিরসন হইতে পারে। নৈতিক উন্নতির সঙ্গে কতকগুলি অন্তর্হিত হওয়া অবশ্যম্ভব, কিন্তু মৌলিক বহু আছে, যাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া কপর্দ্দক-হীন দুঃখী দরিদ্রের নিজের সাধ্যায়ত্ত কিছুতেই নয়। অন্ধ অসহায়তা ও দারুণ নিঃসম্বল অবস্থা, এই দুই মুখ্য কারণের নিরাকরণ জন্য গরিব কাঙ্গাল ভাইগুলিকে সতৃষ্ণ নয়নে সৌভাগ্যশালী জ্যেষ্ঠ সহোদরগণের মুখের দিকে সর্ব্বদা তাকাইয়া থাকিতে হয়, অথচ সহস্রে একবারও সম্যক সহানুভূতি পাইতে দেখা যায় না। আমার বাড়ীতে লুচি মণ্ডার ভিয়ান বসিয়াছে, দশ দিন ধরিয়া সহস্র সহস্র বন্ধু বান্ধব যোড়শোপচারে ভোগ পাইতেছেন, উপস্থিত গরিব, দুঃখী, অনাথ, অসহায়, কাঙ্গাল, ফকির, কুকুর, বিড়ালের সঙ্গে বসিয়া পাতের ত্যক্ত সামগ্রী দ্বারা অনন্ত জঠর শীতল করিতেছে, কিন্তু আমার প্রাসাদের ঠিক পার্শ্বস্থ পর্ণকুটীরে উত্থানশক্তি রহিত রুগ্ন পিতা মাতা দুইটী শিশু-সন্তান লইয়া তিন দিন অনাহারী, খোঁজ খবর লইবার কেহ নাই, আমার লোক জনের অবকাশ কোথা? এরূপ মর্ম্মভেদী দৃশ্য সংসার আর কত দিন দেখিবে, জানি না। ধরা অত্যাচারাক্রান্ত হইয়াছে, সতর্কতার আবশ্যক, আর কিছুর জন্য না হউক, শান্তির জন্য; পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে এক একটী ফরাসি বিপ্লব বাঞ্ছনীয় নয়।

মোহজনিত স্বার্থপরতা হেতু সংসারে উন্নতি অবরুদ্ধ রহিয়াছে, ইতিহাস এপর্য্যন্ত আদর্শ সমাজ দেখাইতে পারে নাই; সুতরাং মানব জীবন কতদূর সুখের, প্রকাশ পাইবার অবকাশ উপস্থিত হয় নাই। একবার মনের মত সুবাতাস পাইলে এই সামাজিক জীবন-তরি যে কোন সুখ-বন্দরে পঁহুছে, পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পূর্ব্বে জীবনের উপযোগীতার বিরুদ্ধে মীমাংসা করা নিতান্ত দোষের। যদি কোন অশিববাদী আপত্তি করেন, কবে জগতের সুখ হইবে, সে আশায় আমাদের সান্ত্বনা হয় কৈ? মানব প্রেম সম্বন্ধে তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিতে হইবে। নিম্ন জগতে ধাড়ি শাবকের জন্য প্রাণ দিতেছে, বংশ রক্ষা করিতে গিয়া, জানিয়া শুনিয়া নিজে নিধন হইতেছে; আমাদের মধ্যে পুত্র পৌত্রের ভোগের জন্য লোকে তাল নারিকেল রোপণ করিয়া যাইতেছে; বিষয় সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া সন্তানগণকে দিয়া যাইতে পারিলে সবাই সুখী। এই রূপ নানা বিষয় দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অন্যের হিতের জন্য চেষ্টা ব্যতীত মানুষ নিজের প্রকৃত সত্তা (True Self.) উপলব্ধি করিতে অক্ষম। তাই সহস্র মোহাচ্ছন্ন হইলেও মানুষ ভাবে, "আমার অবর্ত্তমানে ছেলে পিলের কি হবে?" এই পরার্থ ভাবনা পরিবার মধ্যে উদ্ভূত হয়, বিশ্বে বিস্তীর্ণ হইবার জন্য, চতুর্দ্দিকে যত ছড়াইতে পারিবে, ততই জীবনে সুখ। প্রসারিত বক্ষ উদার পরার্থপর ও সঙ্কুচিত হৃদয় ক্ষুদ্র স্বার্থপরের ভিতরে দেখিবার অবকাশ

পাইলে এই সত্যের উজ্জ্বলতা বিলক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। তখন বুঝিতে পারা যায়, "The Happiest life is one which is largely concerned with the life of others, one in which a man's thoughts are taken away form himself and fastened upon the needs and interests of those about him" শুধু সুখ দুঃখের কথা নয়। আচার্য্যগণের মতে ও রূপ না করিতে পারিলে মহা পাপ, এমন কি নিজের আত্মার পরিত্রাণের জন্য অতিরিক্ত পরিমাণে ব্যস্ত হইয়া যিনি পরের মঙ্গল চিন্তার অবকাশ পান না, তিনি সম্যক অপরাধী। ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান তিন কালের লোক সমষ্টি আমাদের, এবং আমরা এই সমস্তের সামান্য অংশ মাত্র,—এই মুক্তিপ্রদ মহামন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে পরিত্রাণ কোথায়? ক্ষুদ্র পরমাণু হইতে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সকলের নিকট আমাদের শিক্ষা করা উচিত যে

"To cut the link of brotherhood, by which
One common maker bound me to the kind."

অনৈসর্গিক, সুতরাং সর্ব্বতোভাবে দুঃখ বিপদের কারণ। "Fellowship is heaven, and lack of fellowship is hell. fellowship is life, and lack of fellowship is death" ইহাই আমাদের জপমালা হওয়া শ্রেয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

কবিতার দর্পণ।

(Goethe's Muse's Mirror এর অনুবাদ।)

সাজাইতে চারু অঙ্গ কবিতা সুন্দরী—
প্রভাতে তটিনীকূলে দেখিছে বিচরি',
কোথা স্থির নীর রাশি স্বচ্ছ সুবিমল!
বহে যায় প্রবাহিনী, বক্র চোলে যায়,
কবিতার প্রতিবিম্ব জলেতে মিশায়
আবর্ত্তে তরঙ্গ ভঙ্গে হইয়া চঞ্চল!!
ক্রোধে দেবী, নদীকূল ছেড়ে চোলে যায়,
বিদ্রূপ করিয়ে নদী, কহিল তাহায়,—
"বুঝিলাম ঠিক যাহা, চাহ না দেখিতে;
তোমার স্বরূপ ছবি আমারি দর্পণে।"
কিন্তু তার কথা দেবী, না তুলি শ্রবণে,
স্বচ্ছ সরসীর তীরে দাঁড়ালু নিভৃতে,
আনন্দে নেহারি জলে রূপ আপনার,
গুঁজিল খোঁপায় ফুল স্বর্ণ কর্ণিকার।

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

একটি নক্ষত্রের প্রতি।

"Love is a star, never sleeping,
ever bright"

কি আঁধারে কি আলোকে—সকল সময়,
সুন্দর মধুর তুমি উজল আকাশে।
বিরক্তি, বিনাশ নাই, নিত্য অক্ষয়;
শ্রান্ত পান্থ পায় পথ—তোমার বিকাশে।
নিদ্রা নাই জেগে আছ—চির জাগরণ;
অন্তরে প্রবেশ যার, তা'রেও জাগাও।

অসীম সৌন্দর্য্য কাঁর কর বিকীরণ,
অজ্ঞানতা জড় ভাব অন্তরে লুকাও।
শ্রান্ত আত্মা শান্তি পায়—পরশে তোমার,
জীবনের ক্ষুদ্র আশা ভুলায় সাধাই।
সসীম জগত ধরে অসীম আকার
যেতে সে অনন্ত পানে আপনা হারাই।
পরশেনা ও চিরোজ্জ্বল আলোক যেখানে,
চির অমানিশা সেথা, মরুভূমি শত।
হেরি এই 'বিশ্ব রূপ' তোমার নয়ানে,
তুমি আছ বলে আছি, আছে এক্ষণত।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভুল ভাঙ্গা।

একদিন স্বপনে ডুবিয়া
ভাবিতাম স্বরগ ধরণী,
একদিন অমানিশি কোলে
ভ্রম হ'ত চাঁদিনী যামিনী।
একদিন রবিযার বুকে
দেখিতাম বসন্তের হাসি,
গাছে গাছে ফুটিত কুসুম,
বাজিয়া উঠিত দূরে বাঁশী।
দেখিতাম জোছনায় মাখা
সুশ্যামল সুখময় ধরা,
বিকশিত প্রণয়ের বুকে
সুখ শান্তি স্বপনেতে ভরা।
হায় সেই সুখের স্বপন,
কেন আজ ভাঙ্গিল আমার?
প্রেম ভরা হৃদি গুলি হায়
দেখিলাম কপট আগার।
দেখিলাম সুখের সাগরে
তরঙ্গে তরঙ্গে পাপের প্রবাহ,
ভাবিতাম ভালবাসা যারে,
সেও শুধু হৃদয়ের মোহ।
ডুবে গেল বিষাদ সাগরে
ধীরে ধীরে পূর্ণিমার শশী!
সংসারের কুটিল কটাক্ষে,
মিশে গেল হরষের হাসি।
চিনিলাম কেন এ ধরণী?
কেন হায়, ভাঙ্গিল স্বপন?
ডুবে গেল বিষাদ সাগরে
কল্পনার নন্দন কানন।

শ্রীপ্রমীলা বসু।

কবি।

শারদ চাঁদিনী নিশি বহিছে মৃদুল বায়,
আকাশে মধুর শশী হেসে হেসে ভেসে যায়।
তরু লতা ফাঁক দিয়ে শ্যামল ধরার পরে
ঘুমের কুহক নিয়ে চাঁদের কিরণ ঝরে।
কোকিল কুহরে 'কুহু' ফুল বাসে ছায় দিক,
সুনীল গগন গায় তারা গুলি ঝিক্ মিক্।
পিয়ে কুসুমের মধু, বিমল জ্যোছনা ধারা,
স্বভাবের কোলে ব'সে ভাবে কবি মাতোয়ারা!
ঢলু ঢলু আঁখি দুটী, আবেশে মুদিয়া আসে,
হৃদয় তটিনী পরে স্বপন লহরী ভাসে।
কল্পনার সাথে প্রাণ যেন কোন্ মেঘ পুরে,
মাখিয়া শিশির কণা বেড়াইছে ঘুরে ঘুরে।
কত সাধ কত ভাব, কুসুম রেণুর মত,
হৃদয়ে সমীর সহ পশিতেছে অবিরত।
দূরে দূরে, ছায়া পথে কে যেন গাহিছে গান,
অলখিতে সুর তার ছুঁয়েছে কবির প্রাণ।
কি যেন মাধুরী ছবি ভাসিছে আঁখির পাশে,
প্রতিচ্ছায়া যেন তার প'ড়েছে হৃদয়াকাশে।
নেহারি জগতে আজ কি এক স্বপন পারা,
আপনার মাঝে কবি আপনি হয়েছে হারা!!

শ্রীবিনয় কুমারী বসু।

শিশু।

কত মহাকাব্য তোর ও মুখে বিকায়ে যায়,
কত ঈশা কত মুসা প'ড়ে আছে তোর পায়।
কত শরতের চাঁদ ও মুখেতে নিতি ওঠে,
কত বসন্তের ফুল ও মুখেতে নিতি ফোটে।
নীলিম নয়ন দুটী নির্ম্মল ললাট তলে,
শিখাইছে সারধর্ম্ম জগতে সংসারী দলে।
ও ললাট পবিত্রতা শান্তির মঙ্গল ঘট,
চিতার কলঙ্ক-লেখা আঁকে নি ও চারু পট।
বুকে ধূলি, মুখে ধূলি, ধূলি শিরোপরে রয়,
এখনও না জানিস্ ও যে ধূলি ধূলিময়।
কাল কাকা রাঙা কাকা যে ডাকে পসারি কর
ঝাপরি পড়িস্ তুই তাহারি বুকের'পর।
সরলতা শুভ্রবাসে আবরিত সর্ব্বকায়,
'আঙা কাপোল' 'আঙা জামা' ভূমে—
গড়াগড়ি যায়।
আমরা সংসারী নর, কি কব লজ্জার ক'থা—
বুকে ঢাকা কপটতা মুখে মাখা সরলতা।

আমার কোলের চাঁদ আকাশের চাঁদ-সনে,
কে দেয় তুলনা? তার দয়া কিরে নাই মনে।
কঠিন পাষাণ চাঁদ সদা দগ্ধ রবিকরে,
আমার ননীর চাঁদ নিঃশ্বাসে উনিয়ে পড়ে।
সুধা আছে ওর কাছে লোকে বলাবলি করে
আমার সোনার চাঁদে কথায় অমৃত ঝরে।
মূক আকাশের চাঁদ জড়পিণ্ড প্রাণহীন।
আমার কোলের চাঁদ হাসে গায় সারাদিন।
আহাঁরে স্বর্গের জীব। তোর কি তুলনা আছে।
চুণী পান্না চাঁদ ফুল নিভে যায় তোর কাছে।
দেখাতে স্বর্গের শোভা পাপাসক্ত নরগণে,
পাঠায়ে দেছেন বুঝি বিধি তোরে এ ভবনে।
অথবা বেড়াতে ছিলি একাকী বিমান-পথে,
পথ ভুলে এসেছিস্ আমাদের এ জগতে।
তাই বুঝি শিশু! তুই এমন লাবণ্যধার,
এ জগতে নাহি মিলে একটী উপমা যার।

কিন্তু হায় আমাদের দরশ পরশে তুই,
হইবি মোদেরি মত, বাকী মাত্র দিন দুই।
যে দিন শিখিবি তুই দর্পণে দেখিতে মুখ;
সে দিন হইতে তোর ফুরাবে লাবণ্যটুক।

শ্রীশ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রার্থনা।

দেবতাগো। ভেঙ্গে দাও দেহের বন্ধন,
দুটী প্রাণ এক সাথে দাও মিলাইয়া;
সহিতে পারিনা আর বিরহ বেদন—
বিরহ রজনী এবে-যাক পোহাইয়া!
তিল তিল করি নিশি পশিতেছে প্রাণে,
তিল তিল করে প্রাণ যেতেছে ভাঙ্গিয়া;
প্রাণের—উদয় গীতি নিরাশার তানে—
তিল তিল করি বুঝি যেতেছে মরিয়া।
বাসনা হৃদয়ে মোর ছিল কোনদিন।
বাহিতে সংসারে বসি সুখের জীবন,
সে আশা ফুরায়ে গেছে, হয়ে গেছে লীন—
সংসার হয়েছে এবে—কণ্টক কানন।
পারিনা খেলিতে আর এ ভবের খেলা—
চাহিনা হইতে বন্দী—দেহ কারাগারে,
দেবতাগো। দাও দাও, মিলাইয়ে মেলা—
দেহ কারাগার মোর—যাক ভেঙ্গে চুরে।
এক আশা ছিল প্রাণে সংসার মাঝারে—
সেই আশা যদি দেব। গিয়াছে ভাঙ্গিয়া;
তবে আর কেন মায়া জীবনের তরে—
জীবনের সূত্র মম—দাওগো কাটিয়া!
আঁধারে হেরিয়ে আলো পড়িনু ঝাপায়ে।
ভেবেছিনু কাছে গেলে আলোকিবে প্রাণ,
কোথা হতে ঝড় এল, দিল নিবাইয়ে—
ভেঙ্গে চুরে গেল মোর—আশার স্বপন।
দেবতাগো! ভেঙ্গে দাও দেহের বন্ধন,
দুটী প্রাণ এক সাথে দাও মিশাইয়া,
সহিতে পারিনা আর বিরহ বেদন—
বিরহ রজনী এবে—যাক পোহাইয়া।

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাস।

ইন্দ্র-চন্দ্র সংবাদ।

(৮ম)

২৮শে মার্চ্চ, Houses of Parliament, Westminster, পার্লামেণ্ট মহাসভাগৃহ। রাত্রি ৮-টার সময় House of Commons সভাগৃহে উপস্থিত হইলাম। আয়র্লণ্ডের জমীসংক্রান্ত আইনের কোন প্রশ্ন লইয়া বিতণ্ডা চলিতেছিল। ১৮৩৪ খ্রীঃ অব্দের ১৬ অক্টোবর তারিখে পুরাতন গৃহ অগ্নিদগ্ধ হয়। ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দের ২৭শে এপ্রেল তারিখে ভিত্তি স্থাপিত হইয়া ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে এই নূতন গৃহ প্রস্তুত হয়। সমগ্র মহাসভাগৃহ একখানি গ্রাম বলিলে চলে, প্রায় ২৫ বিঘা জমি ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান। সর্ব্বোচ্চ ধ্বজা (tower) ২৩৫ হাত উচ্চ, এইখানে ৫৬০ মণের একটী ঘণ্টা ঝুলিতেছে। গৃহমধ্যে প্রকাণ্ড হল গ্যালারি প্রভৃতি ১৪টী। সম্ভ্রান্ত বৃহৎ পরিবার বাস করিতে পারেন, এরূপ ৮টী মহল (official residences)। সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত ৩২টী কমিটী ঘর। এতদ্ব্যতীত পুস্তকালয়, আফিস, খানা-কামরা প্রভৃতি যে কত, বলা যায় না। সর্ব্বশুদ্ধ ৬০০ ভাগে (apartments) বিভক্ত। সুবিশাল ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের শাসন কার্য্যের উপযুক্ত সভাগৃহ, সন্দেহ নাই। গৃহাভ্যন্তরে পিট (Pitt), ফক্স্ (Fox) প্রভৃতি বহু মহাজীবের শ্বেত মর্ম্মরময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত। এ স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র জীবের সাধ্যাতীত। সুতরাং কবির এই কয়টী কথা দ্বারা শেষ করিলাম।

> "The echoes of its vaults are eloquent,
> The stones have voices, and the walls do live,
> It is the house of memory"
> Maturin

৩০ শে মার্চ্চ, University Boat race, কালেজের বাইচ। চারিদিকে বসন্তের হাওয়া ছুটিতেছে, পৃথিবীর নরনারী, পশুপক্ষী, এমন কি অচেতন (?) উদ্ভিদ-জগৎ পর্য্যন্ত হর্ষে পুলকিত-তনু। স্ফূর্ত্তির বাতাস শীত-পীড়িত সংসারে নূতন জীবন সঞ্চার করিয়া অভিনব সুন্দর দৃশ্যাবলী দ্বারা জীবলোককে অনুপ্রাণিত করিতেছে। কিন্তু ভাই। দেশের বসন্তের কিছুই এখানে দেখা যায় না, ঋতুরাজের সেই প্রাণপাগলকারী ঔদাস্যময় আধিপত্য এখানে খাটে না,—ব্রিটীশরাজের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে সৌরজগতের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেব পর্য্যন্ত সর্ব্বদা জড়সড়, বসন্ত কোন্ ছার,—সেই তমাল তরুর নবীন পত্র, প্রস্ফুটিত কিংশুক পুষ্পসকল, সুগন্ধ বাতাবিলেবু ফুল, সুমিষ্ট সৌরভ প্রচার দ্বারা চতুর্দ্দিক আমোদিতকারী বিকশিত আম্রমুকুল, সুললিত চন্দ্রপ্রভা, চন্দনতরুসঙ্কুল মলয়াচল-সম্বন্ধী ফুরফুরে দক্ষিণ পবন, সুকোমল হরিতপত্র-শোভিত বৃক্ষোপরি ক্রীড়মাণ কোকিল-কলাপের শ্রবণ-মনবিহ্বলকারী সুমধুর কুহুরব, একল ইউরোপে সম্ভোগ করা স্বপ্নের অগোচর ব্যাপার। আর শুনিতে পাওয়া

যায় না, বসন্তরাগে গীত শরীর মন অবসাদক জয়দেবের গান ;—

"ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে

"মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কুজিত কুঞ্জকুটীরে।

"বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে,

"নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥"

যে বসন্ত ঋতু সমাগমে ভারতে রতি ক্রীড়াহেতু নিকুঞ্জবনে কৃষ্ণসকাশে সত্বর যাইবার জন্য সখিগণ রাধিকাকে

"রতিসুখসারে গতমভিসারে মদন মনোহর বেশং

"ন কুরুনিতম্বিনি গমনবিলম্ব নমনুসর তং হৃদয়েশং॥

"ধীরসমীরে যমুনাতীরেবসতি বনে বনমালী।

"পীতপয়োধর পরিসরমর্দ্দন চঞ্চলকর যুগশালী॥"

বলিয়া উত্তেজনা করিতেছেন, সেই সময়ে পৃথিবীর প্রধান নগর লণ্ডনের লোক কবি বার্জিলের (Virgil) সহিত "Cundti adsint, meriloegue expectent proemuia palmoe." (আইস, সকলে উপস্থিত হই, এবং উপযুক্ত পুরস্কার আশা করি।) গান গাইতে গাইতে কলেজ বাইচের জন্য বিশেষ উদ্যোগী। ইংলণ্ডের চক্ষুস্বরূপ অক্সফোর্ড (Oxford) ও কেম্ব্রিজ (Cambridge) বিশ্ববিদ্যালয়ের বাছা বাছা ১৬ জন বলিষ্ঠ যুবক (তন্মধ্যে লর্ড আম্থিল (Ampthill এক জন) ক্ষেপনী চালনায় শক্তি ও নৈপুণ্য প্রকাশ দ্বারা বীরত্বের পরিচয় দিবেন, ইহারই জন্য এক মাস হইতে নানাবিধ আয়োজন। মানসিক উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক বল বিক্রমাদির বিকাশের প্রতি যাহাদের এরূপ লক্ষ্য, তাহাদের জাতির উন্নতি না হইবে কেন? শুধু শরীর বা মনের বর্দ্ধন দ্বারা প্রকৃত উন্নতি লাভ অসম্ভব, যুগপৎ উভয়ের পুষ্টিসাধন প্রত্যেক বিজ্ঞজাতির বাঞ্ছনীয় ও কর্ত্তব্য। আর্য্যদিগের অভ্যুদয় কালে হঠযোগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। প্রাচীন গ্রীকগণ এ বিষয়ে ইউরোপের আদর্শ স্থল। বর্ত্তমান সময়ের ইউরোপ ও আমেরিকা, বিশেষ জন্বুলিয়া ইহা বিলক্ষণ বুঝেন। *

অক্সফোর্ডের চিহ্ন ঈষৎ নীল, কেম্ব্রিজের ঘন নীল। আবাল-বৃদ্ধ বনিতা,—দোকানী, পসারি, গাড়োয়ান, রাস্তার মুটে, গরিব দুঃখী সন্তানগণ, (Children of the gutter) পর্য্যন্ত সবাই দুইয়ের এক প্রকারের ফিতা (Ribbon) গলার বন্ধ (Neckti) বা ফুল (Rosette), পরিয়াছে, এমন কি, যাহারা কেম্ব্রিজ অক্সফোর্ড কোথায়, বা বিশ্ববিদ্যালয় কাহাকে বলে, কোন কালে জানে না † নৌকায় কখন চড়ে

* এই কালেজ বাইচ ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে স্থাপিত হয়। সেই অবধি এ পর্য্যন্ত হিসাব করিলে অক্সফোর্ডের একবারের জিত আছে। গত চরিবার ক্রমাগত কেম্ব্রিজের জয়।

† Grand daughter -Grand ma, What they mean by these light and dark blue?

Grand-mother,—Eton and Harrow are going to row a cricket match.

বালিকা নাতিনী।—ঠাকুর মা! এই সব ঈষৎ নীল ও ঘন নীলের মানে কি?

বৃদ্ধা পিতামহী।—ইটন ও হ্যারো (লণ্ডনের নিকটস্থ দুইটি এণ্ট্রেন্স স্কুলের নাম) ব্যাটবলের বাইচ খেলিবে।

কলেজ বাইচ সম্বন্ধে অনেকের এইরূপ জ্ঞান।

নাই, বাইচ কখনু দেখে নাই, তাহারা পর্য্যন্ত এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া তচ্চিহ্ন ধারণ করিতে ছাড়ে নাই। কত লোক কেম্ব্রিজের উপর, কত লোক অক্সফোর্ডের উপর রাশি রাশি টাকা বাজি রাখিয়াছে। †

নানাদিক হইতে নানাবঙ্গের লোক নানা প্রকার যানে ও পদব্রজে প্রাতঃকাল হইতে বাইচ স্থলাভিমুখে ধাবমান। বেলা ১০ টার মধ্যে পাট্‌নি (Putney) হইতে মোর্‌লেক (Mortlake) পর্য্যন্ত সাড়ে চারি মাইল নদীর দুইধার লোকে লোকারণ্য। বাইচের ৩ ঘন্টা পূর্ব্বে ওয়েষ্টমিনিষ্টর সেতু. (Westiminister Bridge) হইতে মোর্‌লেক পর্য্যন্ত ৫ ক্রোশ নদীবক্ষ নানা শ্রেণীর নানা সাজের বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতী, বালক, বালিকা পূর্ণ, বৈদ্যুতিক, বাষ্পীয় হইতে গাধাবোট পর্য্যন্ত, নানা রকমের জলযানে আকীর্ণ। জলযান সমূহ মধ্যে, কেম্ব্রিজের একখানি, অক্সফোর্ডের এক খানি, শালিস (Umpire) একখানি ও সংবাদ পত্রের একখানি বিশেষ গাম্ভীর্য্যের সহিত ধীরে ধীরে উজান বাহিয়া মোর্‌লেকাভিমুখে যাইতেছে। ব্যবসায়ীগণ বিজ্ঞাপন প্রচারোদ্দেশে নানা প্রকার নৌকা নানা ছন্দে সাজাইয়া লোকের চিত্তাকর্ষণে যত্নবান। তীরে ৭।৮ জায়গায় প্রায় ২০ হাজার দর্শকের জন্য দাঁড়াইবার ও বসিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, দেখিতে দেখিতে সকল স্থান পূর্ণ হইয়া গেল, টিকিটের মূল্য ২৲ হইতে ১৫৲।

নির্দ্দিষ্ট কালে বেলা ৪ টার সময় সুন্দর সুস্থ সবল ১৬ জন দাঁড়ীসহ অতি পরিষ্কার দুইখানি ছোট ডিঙ্গি পাট্‌নি হইতে ছাড়িল। ১০ মিনিটের মধ্যে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। যে রূপ শান্ত সমাহিত ভাবে, গাম্ভীর্য্য ও মর্য্যাদার সহিত আসন রক্ষা করিয়া দাঁড় ফেলা হইতেছে, দেখিলে বোধ হয় না যে, কোন প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বীতা আছে। আর আমাদের দেশের বাইচে সপ্তর্ষির উন্নতি করত দাঁত মুখ সিট্‌কাইয়া আসন হইতে এক হাত উচ্চে উঠিয়া সজোরে দাঁড়ে ধারা দ্বারা জল ছিটাইয়া নদী তোলপাড় না করিলে বিক্রম প্রকাশ হয় না। যেখানে বিধাতার কৃপা বর্ষে, সেখানে নিম্বও সুমিষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। অল্পক্ষণ পরে প্রচারিত হইল, কেম্ব্রিজের জিত, ১০ হাত আগে; পাট্‌নি হইতে মোর্‌লেক পঁহুছিতে ২০ মিনিট ১৪ সেকেণ্ড লাগিয়াছে। যেমন শেষ হইল অমনি আমরা ঘরে ফিরিলাম, পথে দেখি বাইচের সমস্ত বৃত্তান্ত সহ বহু সংবাদ পত্র বাহির হইয়াছে। দেখ ভাই! কি ভয়ানক এই উদ্যম।

এই অংশে স্থলে ৪।৫ লক্ষ লোকের উৎসাহ, উদ্যম, বিমল প্রফুল্লতা দেখিয়া বড় আনন্দ পাইলাম। এরূপ বিরাট জনতার এ প্রকার আমোদ আহ্লাদ প্রকাশ দ্বারা দেশের যুবকবৃন্দকে শারীরিক ব্যায়ামাদির সম্বন্ধে যে পরিমাণে উৎসাহ প্রদান করা হইল, তাহার ফল অতি উপাদেয় এবং সেরূপ উৎসাহ সহস্র সহস্র পুস্তক বা উপদেশ দ্বারা কখন সম্ভব না। আর একটী বড় সুখ

---

† এখানকার লোক বাজি রাখিতে খুব মজবুত। এই বাইচ উপলক্ষে ৮।১০ কোটী টাকার খেলা হইয়া গেল। আমাদের হোটেলের আমি ছাড়া আর সবাই কোন একপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ৫।৬ জন বাজিও রাখিয়াছিলেন। ঘোড়দৌড়, বাইচ, পার্লামেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচন প্রভৃতি ব্যাপারে খুব বাজির ধুম।

প্রদ ভাব এই সময়ে মনে হইল। শুনিয়াছি, পুরিতে জগন্নাথের মন্দিরে পাণ্ডাদের বালকগণ দেবতার সম্মুখে করযোড়ে প্রার্থনা করে, "সংসার সুখী কর, ঠাকুর।" বাস্তবিক ইহা অপেক্ষা উচ্চ কামনা মানুষ প্রকাশ করিতে পারে না। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা-প্রধান দেশের দেবমন্দিরে "ধনং দেহি, পুত্রং দেহি" র স্থানে এরূপ উদার উন্নত প্রার্থনা সম্ভবে, পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল না, তাই সংবাদটী শুনিবা মাত্র হৃদয় রাজ্যে এক অভিনব আনন্দ তাড়িত-বেগে সঞ্চারিত হইয়াছিল। কথাগুলি প্রাণে এত মিষ্ট লাগিয়াছে যে, যখন তখন মনে হয়, এবং প্রাণ ভাবিয়া উচ্চারণ করিলে বিপুল সুখ পাই। এই প্রকাণ্ড জনতার সমারোহে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইলাম, এত লোককে একত্রে পবিত্র সুখ সম্ভোগ করিতে দেখিলে নিজে কি অতুল অনির্ব্বচনীয় সুখ পাওয়া যায়। যদি সমগ্র সংসার এই ভাবে চিরসুখী হয়, সুরলোক ইহার নিকট নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

সাঁওতাল কাহিনী।

যে দিকে সূর্য্যের উদয় হয়, সে দিকে মনুষ্যের জন্ম হইয়াছিল। প্রথমে কেবল জল ছিল, জলের নীচে মাটী ছিল। ক্রমে রাঘব বোয়াল কাঁকড়া চিংড়ী প্রভৃতি জলজন্তুর সৃষ্টি হয়, তাহার পরে পক্ষীর সৃষ্টি হয়। পক্ষীগণ জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইত, কিন্তু আহার পাইত না। তখন ঠাকুর কুম্ভীর চিংড়ীমাছ ও বোয়াল মাছের সাহায্যে সমুদ্রের নীচের মাটী উপরে তুলিতে চেষ্টা করিলেন। তাহারা কেহই সফল হইল না। এই অপরাধে বোয়াল মাছের আঁইস হয় না। তখন ঠাকুর কচ্ছপকে জলের মধ্যে পায়ে শিকল বাঁধিয়া রাখিয়া দিলেন। একটা কেঁচো সেই কচ্ছপের উপর লেজ রাখিয়া মুখ দিয়া সমুদ্রের তল হইতে মাটী তুলিয়া মলদ্বার দিয়া সেই মাটী কচ্ছপের উপর জমা করিল। তাহাতে পৃথিবী সৃষ্টি হইল। ঠাকুর মই দিয়া সেই মাটী সমান করিয়া দিলেন। মই দিয়া যে মাটী ভাঙ্গিল না, তাহাই পাহাড় হইল।

জমী সমান হইলে ঠাকুর তাহাতে বেণাবীজ বপন করিয়া দেন। ক্রমে অন্যান্য বৃক্ষ জন্মে, বেণা বনে হংসডিম্ব হইতে নর নারী উৎপন্ন হয়। বড় ঠাকুরের আদেশে পাখী দুটী আপনারা যাহা খাইত, তাহার রসে তুলা ভিজাইয়া নর নারীর মুখে চাপিয়া দিত। এইরূপে শিশু দুটী বড় হইলে তাহারা পূর্ব্ব দিকে হিহিড়ী পিপিড়ী দেশে নর নারীকে রাখিয়া প্রস্থান করিল। এই নর নারীর নাম পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ী। সামা ঘাসের বীজে তাহারা জীবন ধারণ করিত। তখন তাহাদের পরিধেয় ছিল না, লজ্জাও ছিল না।

লিটা তাহাদিগকে ভাতে বাখর মিশাইয়া মদ প্রস্তুত করিতে শিখাইয়া দেয়।

এবং মারং বুরুকে (বড় পর্ব্বতের প্রেত) উৎসর্গ করিয়া মদ খাইতে পরামর্শ দেয়। তাহারা সেই উপদেশমত মদ প্রস্তুত করিয়া তিনটী শালপাতের দোনায় মদ রাখিয়া এক দোনা মারং বুরুকে দিয়া দুই দোনা দুজনে খায়। এবং উন্মত্ত অবস্থায় সহবাস করে। রাত্রি প্রভাত হইলে তাহারা আপন নগ্নতায় লজ্জাবোধ করে। তখন বট পত্র পরিধান করিয়া নগ্নতা নিবারণ করিয়াছিল।

পিলচু বুড়া ও পিলচু বুড়ীর সাত পুত্র ও সাত কন্যা হয়। বুড়া যুবা পুত্রদিগকে লইয়া শীকারে যাইত ও বুড়ী কন্যাগণকে লইয়া শাক তুলিত। শাক তুলা শেষ হইলে একদিন যুবতীরা চাপাকিয়া নামক বট বৃক্ষের তলে বিশ্রাম করিয়া ঝুরি ধরিয়া ঝুলিতে নাচিতে এবং গাইতে লাগিল। ইত্যবসরে যুবকেরা একটী মৃগ শিশু লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইল এবং ক্রমে যুবতীগণের সহিত নাচিতে লাগিল, ক্রমে বয়স মত এক একজন এক এক জনাকে বাছিয়া লইল। যখন তাহারা আপনি পছন্দ করিয়া লইল, বুড়া বুড়ী কোন আপত্তি করিল না। তাহাদের অনেক সন্তান সন্ততি হইয়াছিল। কিন্তু আর কেহ সগোত্র বিবাহ করিতে না পারে, এজন্য গোত্র বা পারিশ ভিন্ন হইল।

প্রথমে সাত গোত্র হইয়াছিল (১) হাঁসদা (২) মুর্ম্মু (৩) কিস্কু (৪) হেম্ব্রোম (৫) মাড়ণ্ডী (৬) সরেণ (৭) টুডু। সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সে দেশ ছাড়িয়া তাহারা খোজকামান দেশে প্রস্থান করে। এখানে তাহাদের অনাচার বৃদ্ধি হইলে ঠাকুর অগ্নি জল বর্ষণ করিয়া সকলকে নাশ করেন। কেবল যাহারা হারাতা পর্ব্বতের গুহায় আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারাই রক্ষা পাইয়াছিল। কিছু কাল হারাতা পর্ব্বতের নিকট বাস করিয়া শেষে শশানবেড়ার বিস্তৃত মাঠে যাইয়া বাস করে। এখানে আর ৫ পাঁচটী পারিশের নিয়ম হয়।

(৮) বাসকে (৯) বেসরা (১০) পাঞ্জরিয়া (১১) চঁড়ে এবং (১২) বেদেয়া। এই বেদেয়া পারিশের লোক এখন আর দেখা যায় না।

"হিহিড়ী পিপিড়ীরে বোন জনমলেন
খোজকামান রে বোন খোজ লেন
হারাতারে বোন হারা লেন
শশানবেড়ারে বোদ জাতে না হো।"

শশানবেড়া হইতে সাঁওতালেরা হুরপি দেশে এবং তথা হইতে জঙ্গলের মধ্য দিয়া সিংদুয়ার গিরিসঙ্কটে পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আইরে দেশে আসে, তথা হইতে কায়েণ্ড, কায়েণ্ড হইতে চাঁই দেশে আইসে। চাঁইদেশে আসিয়া তাহারা অনেক দিন বাস করিয়াছিল। অনন্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইলে সাতনদী চাম্পা দেশে উঠিয়া যায়। এখানে শত্রু আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য এক একটী গড় নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে এক এক পারিশ বাস করিত। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কিস্কুরা রাজা ছিল, মুর্ম্মুরা পৌরহিত্য করিত, সরেণেরা প্রহরীর কার্য্য করিত, হেম্ব্রোমেরা যুদ্ধে যাইত, মারাণ্ডীরা ধনপতি, টুডুরা বাদ্যকর এবং বাস্কেরা ব্যবসা করিত। এইরূপে অন্যান্য পারিশের একএকটি কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। চাম্পা দেশে তাহারা বহুযুগ ছিল, তজ্জন্য চম্পাকে সাঁওতালের আদিম নিবাস বলিয়া উল্লেখ করে। এখান হইতে (হিন্দু) খেরো-

যায় সাঁওতালেরা রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে লঙ্কায় গিয়াছিল। তদবধি অনেক দিন পর্য্যন্ত দিকু (বিদেশী)দিগের সহিত তাহাদের কোন বিবাদ হয় নাই। সাঁওতালেরা জঙ্গলে ও দিকুরা মাঠে বাস করিত। কিন্তু ভবিষ্যতে দিকুদের সহিত অনেক বার বিবাদ হইয়াছিল। "আমরা অরণ্য পরিষ্কার করি, দিকু আসিয়া কাড়িয়া লয়।

"যদি সাহেবেরা তাহাদের সপক্ষতা না করিত, এতদিনে আমরা তাহাদিগকে গঙ্গা পারে তাড়াইয়া দিতাম।" একবার দিকুরা চাম্পাগড় জয় করিয়াছিল, সাঁওতালেরা পুনরায় তাহা কাড়িয়া লয়। এই সময় দিকুরা এই গানটী করিয়াছিল।

দাদায়া ইনদান সিন মন্দান সিন
দাদায়া ছুটালন চাম্পাকা গড়
বহিন গে না কাঁদো না খিজো
বহিন গে হাতে কা শাঁকা বিচৈ।
বহিন গে কানেকা সোণা বিচৈ।
বহিন গে তাউ হোনা লেবো চাম্পাকা গড়।

চম্পা হইতে সাঁওতালেরা তোড়ে পোখোরী বাহা বান্দেলায় উঠিয়া যায়। এখানে থাকিবার সময় মৃত দেহ দাহ করিবার ও জলে অস্থি দিবার কিম্বা বিবাহে স্ত্রীলোকদের মাথায় সিন্দুর দিবার প্রথা তাহাদের মধ্যে ছিল না। তখন মৃত দেহের কবর হইত। এ প্রথা পরে তাহারা হিন্দুদের নিকট শিক্ষা করিয়াছিল।

কেহ কেহ বলে, "মুসলমানদিগের ভয়ে সাঁওতালেরা তোড়ে পোখেরী বাহা বন্দেলা হইতে জোনা জশপুর পলাইয়া যায়। সেখানে অধিক দিন থাকিতে না পারিয়া খাষপাল বেলগুঞ্জত পলায়ন করে। এখান হইতে, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে যায়। কেহ শিখার দেশে, কেহ নাগপুরে যায়। শিখার দেশে ইহারা ছাক্রা পর্ব্ব শিখে। শিখার দেশে স্থান অভাব হইলে টুণ্ডি দেশে উঠিয়া যায়। অজয় পার হইতে পূর্ব্ব পুরুষ নিবারণ করিয়াছিল, কিন্তু পেটের জ্বালায় সে নিয়ম ভঙ্গকরিয়াই সাঁওতাল দেশে আসিয়াছি, এখন আবার কোন দিকে চলিয়া যাইব।"

বাহ্মণদের পথে অনেকে গঙ্গা পার হইয়া গিয়াছে। জানিনা ঠাকুর কোন দোষে আমাদিগকে শাস্তি দিতেছেন। কেহ কেহ বলে, চম্পা হইতে সাঁতদেশে গিয়া বাস করিয়াছিল বলিয়া ইহাদের নাম সাঁত বা শান্ত হইয়াছিল, তাহা হইতেই সাঁওতাল নাম হইয়াছে। অন্যেরা বলে, সাঁওতালিতে বাস করিয়াছে বলিয়া ইহাদের নাম সাঁওতাল হইয়াছে। অনেকের বিশ্বাস, পশ্চিম দিক হইতে সাঁওতালেরা এখানে আসিয়াছে। সাঁওতাল পরগণার পূর্ব্ব নাম ভুড়ুক দেশ। আরমানদের ন্যায় সাঁওতালেরা আপনাদিগকে হোড় বা মনুষ্য বলিয়া ডাকে। হোড় বীরহোড় মুণ্ডা, বা কুড়ুম্বী চম্পা বাস কালে সকলকে খেরয়ার বলিত। ক্রমে কুড়ুম্বীরা দিকু হইয়া কুর্ম্মী হয় এবং বীর হোড়েরা বানরের মাংস খাইয়া পতিত হয়। সাঁওতালও দিকুর মিশ্রণে সিংহ ঘাটোয়াল জাতির সৃষ্টি। এই জাতীয় মাধো সিংহ চাম্পা হইতে সাঁওতালদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিল।

কয়েক বৎসর হইল পাবশোণ্ডার ভাগবত মাঝি (সাঁওতাল) স্বজাতীয়দিগকে শূকর ও কুক্কুট মাংস পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু হইতে শিখাইয়াছিল। তদবধি সাঁওতালেরা সাধু বা সাফা, খুটা এবং বেদিয়া এই তিন শ্রেণী হইয়াছে। সাফা সাঁওতালেরা হিন্দুর মত আচরণ করে।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়চৌধুরী।

মহাত্মা জর্জ মুলারের জীবনচরিত।

প্রথম অধ্যায়।

বাল্য জীবন।

ব্রিষ্টলের নিকট এ্যাসলিডাউনের উপরে নির্ম্মিত অনাথাশ্রম নামক সুন্দর অট্টালিকা শ্রেণী দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পাঁচটী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকায় দুই সহস্রের অধিক অনাথ বালক বালিকা প্রতিপালিত হইতেছে। এই আশ্রমগুলি তাহাদিগের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা জর্জ্জমুলারের দয়া ও সহৃদয়তার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কিন্তু বাস্তবিক মুলারের শৈশব ও যৌবন কাল কোন অসাধারণ কার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ নহে। মুলার নিজ বিবরণীতে স্বীকার করেন যে, তাঁহার বাল্য জীবন অতি গর্হিত কার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছে। পরিণামে সেই সকল স্মরণ করিয়া তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়াছিলেন।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের সপ্তবিংশ দিবসে প্রুসিয়া দেশের অন্তর্গত ক্রপেনষ্ট্যাড নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে জর্জমুলার কলেবর পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতার নাম হার মুলার। হার মুলার রাজ সম্পর্কীয় কোন কার্য্য করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। মুলারের পাঁচ বৎসর বয়ক্রম কালে তাহার পিতা তাঁহাকে হিমারসলবেন লইয়া যান। ক্রপেনষ্ট্যাড হইতে হিমারসলবেন দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

জর্জের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। হার মুলার অধিক বেতন না পাইলেও পুত্রদিগকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ দিতেন। পুত্রগণ টাকা খরচ না করিয়া সঞ্চয় করিবে এবং এইরূপ সঞ্চয় করা অভ্যাস থাকিলে অর্থ ব্যবহারে পটু হইবে, এই আশায় তিনি তাহাদিগকে বহুল পরিমাণে অর্থ দিতেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা অযথা ব্যয় করিয়া ফেলিতেন, এবং পিতার বিরক্তিভাজন হইতেন ও তাঁহার নিকট মধ্যেমধ্যে শাস্তি প্রাপ্ত হইতেন।

একাদশ বর্ষে জর্জের পিতা জর্জকে বিশ্ববিদ্যালযের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করণাভিপ্রায়ে হ্যালবারষ্ট্যাডের ক্লাসিকেল বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন। জর্জ উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই তাঁহাকে পুরোহিতের কর্ম্মে নিযোজিত করিবেন, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। সুতরাং তিনি তাঁহার পুত্রকে সম্পূর্ণ শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন।

মুলারের স্বকীয় বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এই সময়ে তিনি পাঠে সম্পূর্ণ অমনোযোগী হইয়া ছিলেন ও উপাসনায় তাঁহার কিছু মাত্র অনুরাগ ছিল না। মুলারের পিতা বোধ হয় মুলারকে পরজীবনে সুখী দেখিবার জন্য তাঁহাকে পৌরহিত্যে বিনিয়োগ করিতে বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পৌরহিত্যের দায়িত্ব ও যোগ্যতার বিষয় একবারও স্মরণ করেন নাই। মুলার পিতার অভিপ্রায়ানুযায়ী জার্ম্মেনীর পুরোহিত হইতে না পারিলেও, ঈশ্বরেচ্ছায় এরূপ মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, যাহা প্রচলিত সময়ের কোন ধর্ম্মযাজক করিতে সমর্থ হন নাই।

পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে জর্জ মাতৃহীন হইলেন। মাতার আদর্শ যে মুলারের জীবনের কোন উন্নতি সাধন করিয়াছিল, এরূপ বোধ হয় না। কিন্তু মাতৃবিয়োগ হওয়ায় মুলার অবশ্য শোকবিহ্বল হইয়াছিলেন। তিনি অল্পদিন মধ্যেই মাতার মৃত্যুশোক বিস্মৃত হইলেন এবং অল্প বয়সেই তিনি পান্থনিবাসে যাইয়া তাস ক্রীড়া ও সুরাপানে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হওয়ায় ধর্ম্মমন্ত্রে দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইল। দীক্ষাগ্রহণের পর কিছুদিনের জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতাপিত হইলেন। কিন্তু অসৎসঙ্গের কুহকে পড়িয়া তিনি পাপ হইতে নিস্কৃতি লাভের উপায় একেবারে বিস্মৃত হইলেন। এবং এরূপ ভাবে সময় ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন যে, পরে সেই সকল স্মরণ করিয়া তাঁহাকে অনেক মর্ম্মপীড়া পাইতে হইয়াছিল। কুসঙ্গে থাকিয়াও বালক মুলার বিবেকের দংশন হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি উদ্ধারের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, নূতন স্থানে গিয়া নবসহচরগণের সহিত মিলিত হইলে তাঁহার চরিত্র সংশোধিত হইতে পারে। দীক্ষার পর তিনি কিছুদিন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। শেষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইলেন। তিনি বলেন—"এ সময় আমি পরমপিতা পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিতে শিখি নাই, তাঁহাকে জীবনের ধ্রুবতারা জ্ঞান করি নাই বলিয়া আমার সকল প্রতিজ্ঞা কথায় পর্য্যবসিত হইল। আমি ক্রমেই অসৎ হইতে লাগিলাম।"

এই সময়ে মুলারের পিতা ম্যাকডিবর্গের নিকট স্কোনবেক নগরে একটী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। জর্জ তাঁহার পিতার নিকট তাঁহাকে হ্যালবারষ্টাডের স্কুল হইতে ছাড়াইয়া ম্যাকডিবর্গের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার পিতা কয়েকটী অসৎ বালকের সঙ্গ পরিত্যাগ করাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন, এবং হীমারসলবেনে একজন গ্রীক্‌রোমক ইত্যাদি ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতের অধীনে রাখিয়া দিলেন।

ষোড়শ বর্ষ বয়সের সময় একদিন মুলার ব্রানসিক্ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তথায় সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিলেন। একটী হোটেলে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত বড়মানুষী ধরণে আহারাদি করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সমস্ত টাকা খরচ হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহাকে অর্থের বিনিময়ে উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ দিতে হইল। আর একবার উলফেনবাটেলের হোটেলে ইহা অপেক্ষা অধিক বিপদে পতিত হন। এইবার তিনি তাঁহার দেয় টাকা না দিয়া হোটেল হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করায় পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইলেন, এবং রাজদ্বারে দণ্ডিত হইলেন। অবশেষে তাঁহার পিতার প্রেরিত অর্থ আসিয়া পৌঁছিলে, হোটেলের ঋণ পরিশোধ হইল, জর্জ মুক্ত হইলেন। তিনি বাটী প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহার পিতা তাঁহাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। পূর্ব্বকৃত পাপ সকল স্মরণ হওয়ায় তাঁহার অন্তর অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে

লাগিল। তিনি এরূপ পরিশ্রম সহকারে বিদ্যাভ্যাসে রত হইলেন যে, অল্পদিনের মধ্যেই ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন ও জর্ম্মান ভাষায় এবং অঙ্ক বিদ্যায় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। কয়েক মাস অত্যন্ত পরিশ্রমের পর, তিনি নর্ডহেমনে প্রেরিত হইলেন এবং তথাকার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। সার্দ্ধদ্বিবৎসর কাল এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া, মুলার হিব্রু ও গ্রীক্ ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন। এই সময় এরূপ পরিশ্রম করিতেন যে, প্রত্যহ প্রাতে চারি ঘটিকার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত পুস্তক পাঠ করিতেন।

এক্ষণে মুলারের বয়ঃক্রম বিংশতিবৎসর। তাঁহার এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল যে, তিনি নবজীবন লাভ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার শত শত পুস্তক সমন্বিত একটি সুন্দর পুস্তকাগার ছিল। কিন্তু তাঁহার এক খানিও ধর্ম্মপুস্তক ছিল না। তিনি অন্যান্য সহচরগণের সহিত বৎসরে দুইবার খ্রীষ্টীয় ভোজে (Lords Supper) উপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু বাহ্যিক পরিবর্ত্তনে কোন ফল দর্শিল না। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন;—"আমি এক্ষণে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক হইয়া উঠিলাম। অধিকন্তু আমি কতদূর দুর্বিনীত হইয়া ছিলাম, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। আমি লোকের নিকট হইতে অনেক টাকা ঋণ করিলাম। ঋণ গুলি পরিশোধ করা আমার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইল, এমন কি সেগুলি পরিশোধ করিবার আদৌ উপায় ছিল না, কারণ পিতা আমাকে আমার ভরণ পোষণের উপযোগী অর্থ ব্যতীত অধিক আর কিছুই দিতেন না। এক দিন পিতার নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া আমার কয়েকটি বন্ধুকে তাহা দেখাইলাম। পর দিন আমি আমার বাক্সের তালা ভগ্ন করিয়া, যেন কতই ভীত হইয়াছি এই ভাবে, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের গৃহে দৌড়িয়া গিয়া বলিলাম 'কে যেন আমার টাকা চুরি করিয়াছে!' কয়েকটী বন্ধু আমাকে উদ্বিগ্ন দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আমি যত টাকা চুরি গিয়াছে ভাণ করিয়াছিলাম, তত টাকা আমাকে দিলেন। এই ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় কিছুদিন আমার উত্তমর্ণদিগের মুখ বন্ধ করিবার সুন্দর উপায় হইল।

মুলার পরিণামে এই সকল দুষ্কর্ম্মের জন্য অনেক কষ্ট পাইয়াছিলেন। তাঁহার পীড়ার সময় অধ্যক্ষের পত্নী অনেক দিন তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। সেই হেতু তিনি অধ্যক্ষ-পত্নীর সম্মুখে স্বচ্ছন্দে দাঁড়াইতে পারিতেন না, কারণ তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বের প্রতারণার কথা মনে পড়িত। যাহা হউক, তিনি এই বিদ্যালয় ছাড়িয়া হল-বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করিলেন। কিছু দিন পরে তিনি এই বিদ্যালয়ের সভ্য হইলেন এবং সম্মান-সূচক প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর তিনি জর্ম্মানীর ধর্ম্মমন্দিরে প্রচারক হইবার ক্ষমতা পাইলেন। এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তিনি তাঁহার চরিত্র সংশোধনে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। কারণ, সচ্চরিত্র না হইলে কোন প্রদেশের লোক তাঁহাকে যাজক কার্য্যে মনোনীত করিবে না। প্রুসিয়াতে কোন যাজক সম্মানের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না। ইহা বিদেশ

করিয়া মুলার যাজকতা কার্য্যের উপযোগী শিক্ষা আরম্ভ করিবার সময়ে অনেকগুলি প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা বিফল হইল। হল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়াই পূর্ব্বকার কুকার্য্য সকল অনুসরণ করিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে সমস্ত অর্থব্যয় করিয়া ফেলিলেন, পরে বস্ত্র এবং ঘড়ি বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া পাশকাদি ক্রীড়ায় প্রমত্ত হইলেন। এই রূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল।

কখন কখন মুলার ও কয়েকটী সহপাঠী একত্র হইয়া সমস্ত মূল্যবান পুস্তক বন্ধক রাখিয়া দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। একবার ভ্রমণে তাঁহারা ত্রয়োশ্চত্বারিংশ দিবস অতিবাহিত করেন। মুলার স্বীকার করেন যে, তিনি নিজের খরচ কমাইবার জন্য সাধারণের টাকা হইতে কিছু কিছু আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, ভ্রমণকালীন যে অর্থব্যয় হয়, তাহার হিসাব বুঝাইবার সময় অনেক গুলি অসত্য বলেন। বোধ হয়, যে কয় সপ্তাহ মুলার বাটীতে ছিলেন, সে সময় অত্যন্ত মনে কষ্ট পাইয়া ছিলেন এবং অনুষ্ঠিত পাপাচরণের জন্য অনুতাপ-দাহন অনুভব করিয়া সৎ হইবার জন্য অন্তরের সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পরন্তু বিদ্যালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া সে সমুদয় প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় দুষ্কর্ম্মে রত হইলেন।

এখন হইতে তাঁহার সকল পাপ ও ত্রুটী সত্বেও তাঁহার জীবনের যথার্থ পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল। মুলার বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিলেন। তিনি পুরোহিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, ইতি মধ্যেই ধর্ম্ম প্রচারে অনুমতি পাইলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করেন নাই।—বাস্তবিক ধর্ম্ম পুস্তকের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ অতি অল্পই ছিল। তিনি বলেন, জগৎপিতা জগদীশ্বর তাঁহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত জীবনের পাপ সকল তাঁহার সম্মুখে সাজাইয়া রাখিয়া ছিলেন, এবং তাঁহার বিবেক কে এরূপ তাড়না করিয়াছিলেন যে, তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। এপর্য্যন্ত তিনি ধর্ম্মপুস্তকের উপদেশ শ্রবণ করেন নাই, অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে জীবন অতিবাহিত করিতে অভিলাষী কোন ধর্ম্ম যাজকের সহিত সাক্ষাৎ করেন নাই। মুলার উদ্দেশ্য-বিহীন হইয়া কখন লেখা পড়ায় অবহেলা করিতেন, কখন বা পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইতেন, আবার কোন কোন সময় অনুষ্ঠিত অসদাচরণের বিষয় আন্দোলন করিয়া, পরিণামে সাধু ও সজ্জন হইবার নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেন। এই রূপে তাঁহার বাল্য ও যৌবনের সমগ্র সময় অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার বাল্য-জীবন কোন ক্রমেই আশাপ্রদ ছিল না। চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের নিকট ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বোধ হইয়াছিল যে, এই অলস ও অনুতবাদী বালক, এই আমোদপ্রিয় দুঃশীল ছাত্র একদিন ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য, সহৃদয়-শ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মভীরু, প্রার্থনাশীল খ্রীষ্টিয়ান প্রবর বলিয়া পরিগণিত হইবে। মুলার এই সকল ঘটনা স্বকীয় দৈনন্দিন বিবরণীতে লিখিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তাঁহার এই সকল ঘটনাবলী উল্লেখের উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার ন্যায় অবস্থাপন্ন যুবকগণ উৎসাহিত হইবে এবং ঈশ্বরানুগ্রহে হতাশ হইবে না। যে মহান পরমেশ্বর

তাঁহাকে পাপের অন্ধকূপ হইতে পুণ্যময় জ্যোতিতে আনিয়াছেন, সেই ঈশ্বরের মহিমা প্রকটিত করাও অপর এক উদ্দেশ্য। তাঁহার সমস্ত ইতিহাস উপদেশে পূর্ণ, কারণ বাল্যকালে চিন্তাশূন্য ও অসৎ কার্য্যানুরক্ত হইলেও, তিনি করুণা উপাসনাশীলতা ও পরোপকারের নিমিত্ত প্রথিত-নাম হইয়াছেন। অধিকন্তু পূর্ব্বে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে এবং পরে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইবে, সে সকল সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে, কারণ এই সকল ঘটনা তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত।

শ্রীরাখাল চন্দ্র মিত্র।

মাঘভট্ট।

সংস্কৃত ভাষা, পুরাতন ও অপ্রচলিত হইলেও, আজ কাল দেশীয় বিদেশীয় কৃত বিদ্যমাত্রেই এই ভাষার অসাধারণ মাধুর্য্যে বিমুগ্ধ। কি প্রাচীন কি নব্য শ্রেণী, কে না ইহার রসাস্বাদন করিতে পারিলে কৃতার্থম্মন্য হন? সেই সংস্কৃত ভাষায় যে সকল মনীষা-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মাঘভট্ট এক জন সুবিখ্যাত। এই কবির এতদূর সৌভাগ্য যে মাঘের শিশুপালবধ কেন, যাঁহারা কোন দিন কোন ভাষার কোন কাব্যের রসাস্বাদন করেন নাই, তাঁহারাও মাঘের নাম ধ্বনিত হইবামাত্র আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। এই কবির সম্বন্ধে কতকগুলি শ্লোক ও শ্লোকাংশ শিষ্ট সমাজে প্রচলিত, সেগুলি এই, যথা,—"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থ গৌরবং। নৈষধে পদ লালিত্যং মাঘেসন্তি ত্রয়োগুণাঃ॥ অপিচ। কাব্যেষু মাঘঃ কবি কালিদাসঃ। অপিচ। তাবদ্ভা ভারবে র্ভাতি যাবন্মাঘস্য নোদয় ইত্যাদি।

এই কবির জীবনচরিত আলোচনা করা অপেক্ষা ইঁহার কৃত কাব্যের আলোচনায় সমধিক ফল, কেননা ভারতীয় কোন কবির বা গ্রন্থকারের ধারাবাহী ইতিবৃত্ত পাইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং সামান্য কিঞ্চিৎ অবগত হইয়া সমস্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লেখা অপেক্ষা অন্য প্রকার উপন্যাস লেখা বরং ভাল। আমাদের দেশে মাঘ নামে যে কাব্য প্রচলিত, উহার প্রকৃত নাম শিশুপাল বধ, মাঘভট্টের রচিত বলিয়া মাঘনামেই সচরাচর পরিচিত। শিশুপাল বধ বিংশতি সর্গ বিভক্ত। এই কাব্য বীররস প্রধান, ইহার নায়ক কৃষ্ণ, প্রতিনায়ক শিশুপাল। চেদিরাজ শিশুপালের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া দেবতারা, দেবর্ষি নারদকে কৃষ্ণের নিকট দ্বারকায় প্রেরণ করিলেন। নারদের মুখে পিতৃস্বস্রীয় ভ্রাতা শিশুপালের অত্যাচার কাহিনী শুনিয়া দ্বারকা-পতি কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং দেবর্ষিকে বিদায় দিয়া ইহার প্রতি-বিধানের জন্য বলদেব ও উদ্ধবকে ডাকিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। শেষে স্থির হইল, ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে শিশুপালকে বধ করা হইবে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের দূত নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া আসিয়াছিল। কৃষ্ণ সপরিবারে ইন্দ্রপ্রস্থ

যাত্রা করিলেন, পথি মধ্যে রৈবতক পর্ব্বতে কিছু কাল বিহার করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলেন। ভীষ্মের পরামর্শে কৃষ্ণকেই যজ্ঞীয় অর্ঘ্য প্রদত্ত হইল। তাহাতে শিশুপাল ও তৎপক্ষীয় রাজন্যবর্গ কুপিত হইয়া উঠিল, এবং ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা আর কৃষ্ণকে শিশুপাল গালি দিতে লাগিল। পরে উভয় পক্ষের দূতের মুখে কথোপকথন হওয়ার পর যুদ্ধারম্ভ হইল। সেই যুদ্ধে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক শিশুপাল নিহত হইল।

এই মহাভারতীয় ঘটনাই মাঘকাব্যের মূল, সামান্য বিবরণ অবলম্বন করিয়া কবি বিস্তৃত কাব্যরচনা করিয়াছেন। দেখা যাউক, এই কবি কত দিন হইল এই কাব্যরচনা করিয়াছেন। এই তত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য পুরাতন কোন লেখকের বাক্য উদ্ধৃত করিবার সম্ভাবনা নাই, অনুসন্ধানের চক্ষে পাঠ করিলে বলা যাইতে পারে, যে কালিদাস ও ভারবির পরে এবং নৈষধকারের পূর্ব্বে মাঘকবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। প্রমাণের জন্য নিম্নে রঘুবংশ ও মাঘ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

প্রসাধিকালম্বিত মগ্র পাদ
মাক্ষিপ্য কাচিদ্দ্রবরাগমেব।
উৎসৃষ্ট লীলাগতিরাগবাক্ষা
দলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান॥ ৭।

কালীদাস, রঘুবংশ, ৭ম সর্গ।

দাসী আলতা পরাইতেছিল, কোন মহিলা আর্দ্র অলক্তযুক্ত অগ্রপাদ আকর্ষণ করিয়া লইয়া দ্রুতগতি গবাক্ষ পর্য্যন্ত গমন করায় (অঙ্গ দর্শনের আকাঙ্খায়) সমস্ত পথ অলক্ত চিহ্নিত হইয়াছিল।

ব্যতনোদপাস্য চরণং প্রসাধিকা
করপল্লবাদ্রসবশেন কাচন।
দ্রুতযাবকৈকপদচিহ্নিতাবনি
প্পদবীং গতেবগিরিজা হরার্দ্ধতাং॥১৩।

মাঘ, শিশুপালবধ ১৩শ সর্গ।

দাসী বেশবিন্যাস করিতেছিল, কোন মহিলা (হরির দর্শন লালসায়) কৌতূহল বশতঃ অধীর হইয়া দাসীর হস্ত হইতে চরণ টানিয়া লইয়া হরার্দ্ধদেহা গৌরীর ন্যায় আর্দ্র অলক্ত দ্বারা গবাক্ষ পর্য্যন্ত পথ চিহ্নিত করিয়াছিল।

এই দুইটী শ্লোকের মর্ম্ম পাঠ করিয়া কেনা বলিবেন যে, কালিদাসের শ্লোকটি আদর্শ আর মাঘের শ্লোকটী উহারই অনুকরণ-প্রসূত। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, মাঘ যে ভারবির পরবর্ত্তী, তাহার প্রমাণ কি? এ বিষয়ে মতভেদও অলক্ষিত হয়। তথাপি মাঘ যে পরবর্ত্তী, তাহা প্রদর্শন করা তত কঠিন নহে। যদিচ মাঘ ও ভারবির কাব্য এক প্রণালীতে লিখিত, এবং উভয়েই মহাভারত হইতে প্রায় একপ্রকার ঐতিহাসিক মূল পরিগ্রহ করিয়াছেন, তথাপি ভারবির ভাষার সারল্য ও বর্ণনার সংক্ষিপ্ততা প্রভৃতিই প্রাচীনতার হেতু। মাঘ কবি ভারবির সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়াছেন। ভারবিতে যেমন ব্যাসের সহ যুধিষ্ঠিরাদির সাক্ষাৎকার ও দ্রৌপদীর ওজস্বিনী বক্তৃতা, বনবিহার, জলবিহার, ইন্দ্রকিল পর্ব্বতের বর্ণনা, কিরাতরূপী মহাদেবের সহ অর্জ্জুনের সংগ্রাম, পাশুপতাস্ত্র লাভ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে, মাঘেও অবিকল ঐরূপ কৃষ্ণের সহ নারদের সাক্ষাৎকার, বীররসের অবতারস্বরূপ বলদেবের তেজস্বিনী

ঋতু, বনবিহার, জলবিহার, রৈবতক পর্ব্বতের বর্ণনা, শিশুপালের সহ কৃষ্ণের যুদ্ধ ও শিশুপালবধ। এমন কি, ভারবি গ্রন্থারম্ভে শ্রী শব্দপ্রয়োগ করিয়াছেন। মাঘও তাহাই করিয়াছেন. ভারবির প্রথম সর্গ বংশস্থবিলছন্দে রচিত, মাঘেরও প্রথম সর্গ উক্ত ছন্দেই লিখিত। অনেক স্থলে ভারবির ভাব মাঘে অনুকৃত হইয়াছে। কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল, তাহাতেই একথা বেশ বুঝা যাইবে।

তথাপি কল্যাণকরীং গিরং তে
মাং শ্রোতুমিচ্ছা মুখরী করোতি ॥ভারবি॥

তাহা হইলেও মঙ্গলময় আপনার বাক্য শ্রবণের ইচ্ছাই আমাকে বলাইতে বাধ্য করিতেছে।

তথাপি শুশ্রূষুরহং গরীয়সী
গিরোঽথবা শ্রেয়সি কেনতৃপ্যতে। মাঘ।

তথাচ আপনার গরীয়সী বাক্যপরম্পরা শ্রবণে আমি অভিলাষী, কল্যাণবিষয়ে কে তৃপ্ত হইতে পারে।

যদিচ মাঘ তাঁহার ঊর্দ্ধতন কবিদিগের অনুকরণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা যায় না। তিনি অনন্ত জলরাশি সমুদ্রের ও সর্ব্ববিধ সুষমার আকর রৈবতক পর্ব্বতের যেরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়।

মাঘের ধীরোদাত্ত নায়ক কৃষ্ণ নৃপতিগণের আধার, মহাভারতে কৃষ্ণের সহস্র কূটনীতির পরিচয় থাকুক, কিন্তু মাঘের কৃষ্ণ সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, যেন সর্ব্ববিধ রাজোচিত গুণ তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে। মাঘের বলদেব বীররসের জলন্ত ছবি, সতেজে প্রদীপ্ত অগ্নিরাশির ন্যায় বিরাজমান। পৃথিবীর মধ্যে তিনি বিক্রমে কাহাকেও গ্রাহ্য করিতেছেন না, পৃথিবীর রাজন্যবর্গ তাঁহার নিকট তৃণবৎ। মাঘের উদ্ধব ইউরোপের জর্মান বিষমার্কের ন্যায় মন্ত্রনা-কুশল ও ধীর, কিন্তু ইংলণ্ডীয় মন্ত্রী বার্কের ন্যায় ভবিষ্যদ্বক্তা। মাঘ তাঁহার ভীমকে যে বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। সেরূপ তেজস্বিতা ও মহত্বের ছবি কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না। যমক ও অনুপ্রাস সৃষ্টিতে মাঘ অসাধারণ ক্ষমতাশালী। ভট্টিকাব্যের লেখক ভট্টিকবি ব্যতীত তাঁহার তুল্য শব্দালঙ্কারের মাধুরী কেহই দেখাইতে পারেন নাই। কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

নব পলাশ পলাশ বনং পুরঃ
স্ফুট পরাগ পরাগত পঙ্কজং।
মৃদু লতান্ত লতান্ত মলোকয়ৎ
স সুরভিং সুরভিং সুমনোভরৈঃ ॥
নব কদম্বরজোরুণিতাম্বরৈ
রধি পুরন্ধ্রি শিলীন্ধ্র সুগন্ধিভিঃ।
মনসি রাগবতাং মনুরাগিতা
নব নব বন বায়ুভিরাদধে।
জগতি নৈশ মশীতকরঃ করৈ
র্বিয়তি বারিদবৃন্দ ময়ন্তমঃ।
জলজরাজিষু নৈদ্রমদিদ্রব
ন্নমহতা মহতাঃ কুচ নারয়ঃ ॥

৬ষ্ঠ সর্গ, মাঘ।

যে উচ্চ কবিহৃদয়ের পরিচয় দিয়া মাঘ প্রাচীন পণ্ডিতগণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন এবং প্রাচীনেরা যাঁহাকে সংস্কৃত কবিগণের সর্ব্বোচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন, তাহার পরিচয় মাঘ ১৬শ সর্গের ২১ হইতে ৩১ শ্লোকে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা হইতে দুটী মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

সুকুমার মহো লঘীয়সাং
হৃদয়ং তদ্গতমপ্রিয়ং যতঃ।
সহসৈব সমুদ্গিরন্ত্যমী
ক্ষপয়ন্ত্যেব হি তন্মনীষিণঃ॥ ২১।

উপকার পরঃ স্বভাবতঃ
সততং সর্ব্বজনস্য সজ্জনঃ।
অসতামনিশং তথাপ্যহো
গুরুহৃদ্রোগকরী তদুন্নতিঃ॥ ২২।

২১ শ শ্লোক হইতে ২৫ শ শ্লোক ভিন্ন ৩১ শ্লোক পর্য্যন্ত বঙ্গানুবাদ এইঃ—

আহা লঘুব্যক্তিদের অন্তঃকরণ কি ক্ষুদ্র? যে হেতু হৃদয়স্থ অপ্রিয় ভাব গুলি তাহারা সহসা প্রকাশ করিয়া ফেলে, কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিরা উহা অতিযত্নে গোপন করেন।২১। সাধু শীল ব্যক্তি সর্ব্বদা সকলের উপকারী, তথাপি তাঁহার উন্নতিতে অসাধুদিগের হৃদয়ে সন্তাপ উপস্থিত হয়, কি আশ্চর্য্য॥২২। অন্যের উন্নতি হইলে উত্তম ব্যক্তিরা কিছুমাত্র ব্যথিত হয়েন না, মধ্যম শ্রেণীর লোকেরা কিঞ্চিৎ সন্তপ্ত হইলেও মনোভাব গোপন করেন, কিন্তু অধম ব্যক্তিরা তাহাদের পরশ্রীকাতরতারূপ অসদ্ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলে।২৩। রৌদ্র বা তাপ নাশে অক্ষম ফলহীন বা প্রয়োজন-বিরহিত পুষ্প কিম্বা সদাশয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক ত্যক্ত অবিদ্যমান-রূপিণী গগনলতিকার ন্যায় খলতা কেন বিজ্ঞব্যক্তি অবলম্বন করিবেন।২৪। মহান্ ব্যক্তিরা ক্রোধকে জয় করিয়াছেন, ক্রোধ লঘুব্যক্তিকে বলে জয় করিয়াছে, অতএব পরাজিত ক্রোধ কর্ত্তৃক অভিভূত দুর্ম্মতি ব্যক্তির সহ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি-দের আবার প্রতিদ্বন্দ্বীতা কি? ।২৬। অসাধুদিগের উদ্ধত বাক্যে কি কখন মহান্ ব্যক্তিদের গৌরব নষ্ট করিতে পারে? ধূলি দ্বারা আচ্ছন্নমণির মহামূল্যত্ব কি দূর হয়॥২৭। অন্যের পরিতোষ জন্মাইতে পারে, যাহার এমন কোন গুণ নাই, সেই লঘুব্যক্তিই অন্যের দোষ কীর্ত্তন করিয়া আত্মীয় জনকে পরিতুষ্ট করিতে ইচ্ছা করে।২৮। অসাধুরা নিজের দোষ অতিমহৎ হইলেও স্বভাবতঃই উহা দেখিতে পায় না, কিন্তু অন্যের দোষ দর্শনে সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং আত্ম-প্রশংসায় বড় প্রগল্‌ভভাষী, অপিচ অন্যের প্রশংসার অবসর উপস্থিত হইলেই মৌনাব-লম্বন করিয়া থাকে॥২৯। উন্নতমনা ব্যক্তিরা অন্যের দোষ প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়াও উহা চিরকালের জন্য গোপনের নিমিত্ত অতিশয় নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু আত্মগুণ প্রকাশের জন্য কোনই কৌশল করেন না॥৩০। মহাত্মা ব্যক্তি সর্ব্বলোকে প্রখ্যাত আত্মগুণ কেনই বা প্রকাশ করিবেন, ক্ষুদ্রব্যক্তির গুণের বক্তা অন্য কেহ নাই, তজ্জন্যই সে আত্মপ্রশংসা নিজেই করিতে বাধ্য হয়॥৩১॥

মাঘ, কবি ছিলেন বলিয়া যে বিজ্ঞান বা দর্শন শাস্ত্র জানিতেন না, এমন নহে, তিনি স্বরচিত গ্রন্থে বিজ্ঞান ও দর্শনজ্ঞতার সুন্দর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। দিবসে গগনাবলম্বী নক্ষত্রগণ কেন অদৃশ্য হয়, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে ইউরোপীয় বিজ্ঞান খুজিবার আবশ্যক হয়, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই, কবি উক্ত বিজ্ঞান না জানিয়াও উহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ন দৃশে ভাস্কর রুচাংহি নযঃ
সতমীস্তমোভিরভিগম্যতত্তাং।
দ্যুতিমগ্রহো দগ্রহ গণোলঘবঃ
প্রকটি ভবন্তি মলিনাশ্রয়ঃ॥

৯ম সর্গ, মাঘ।

যে গ্রহগণ সূর্য্যের কিরণে দিবসে পরিলক্ষিত হয় না, সেই গ্রহগণ অন্ধকারময়ী রজনী প্রাপ্ত হইয়া দীপ্তিলাভ করিয়া থাকে, ক্ষুদ্রেরা প্রায়ই নিকৃষ্টের আশ্রয়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। *

মাঘ প্রথম সর্গে সাঙ্খ্যমতাবলম্বী হইয়া কৃষ্ণকে প্রকৃতি ও পুরুষের অন্যতর পুরুষ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। যথা,—

উদাসিতারং নিগৃহীতমানসৈ
গৃহীত মধ্যাত্ম দৃশা কথঞ্চন।
বহির্ব্বিকারং প্রকৃতেঃ পৃথক্‌বিদুঃ
পুরাতনং ত্বাং পুরুষং পুরাবিদঃ॥ ৩৩।

১ম সর্গ, মাঘ।

পূর্ব্বজ্ঞ কপিলেরা তোমাকে পুরাতন পুরুষ বলিয়া জানেন, সংযতচেতাঃ যোগীরা তোমাকে অধ্যাত্মনয়নে কথঞ্চিৎ সাক্ষাৎকার করিয়াছেন। তুমি উদাসীন (অর্থাৎ প্রকৃতি স্বার্থ প্রবৃত্ত হইলেও তুমি স্বয়ং অপ্রাকৃত বলিয়া প্রকৃতি কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট) এবং বিকার হইতে বহিঃস্থ ও মহদাদি হইতে পৃথক্॥

মাঘকৃত শিশুপালবধ পাঠ করিয়া যেমন আনন্দ, তেমন ক্ষোভও উপস্থিত হয়। যদি ১৯শ সর্গের একাক্ষরী, দ্ব্যক্ষরী, সমুদ্গ, গোমূত্রিকাবন্ধ, অতালব্য, নিরোষ্ঠ্য, অসংযোগ, অর্থত্রয়বাচী; সর্ব্বতোভদ্র, প্রভৃতি রচনা করিয়া তিনি মূল্যবান্ সময় ও চিন্তা ব্যয় না করিতেন, তাহা হইলে মাঘকৃত আরও কত কাব্য পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিতাম! পূর্ব্বতন কবিদিগের রুচি প্রদর্শনের জন্য কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

একাক্ষরী।

দাদদো দুদ্দদুদ্দাদী
দাদাদো দূদদীদদোঃ।
দুদ্দাদং দদদে দুদ্দে
দদাদদদদোঽদদঃ॥ ১১৪।

সর্ব্বতোভদ্র।

স	কা	র	না	না	র	কা	স
কা	য	সা	দ	দ	সা	য়	কা
র	সা	হ	বা	বা	হ	সা	র
না	দ	বা	দ	দ	বা	দ	না। ২৭।

১৯শ সর্গ মাঘ।

এই চিত্রময় শ্লোকটীর যে দিক হইতেই পাঠ করা যাউক না কেন, এক রূপ অর্থ উদ্ভাবিত হইবে।

উদ্ধৃত দুইটী কবিতা ও ষষ্ঠ সর্গের কয়েকটী কবিতায়, শব্দের বৈচিত্র্য ব্যতীত তত ভাবের মাধুর্য্য নাই, সুতরাং অনুবাদ করা নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীনেরা মাঘকে কালিদাস ভারবি অপেক্ষা উচ্চতম স্থান প্রদান করিলেও ফলতঃ তিনি এই উভয় কবির নিম্নে ও অন্যান্য কবির উচ্চে আসন পাইবার যোগ্য। সংস্কৃত সাহিত্য সংসারে কালিদাস অদ্বিতীয়, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, তাঁহার নিম্নেই ভারবি, কারণ মাঘের বর্ণনার আতিশয্য প্রভৃতি যে সকল দোষ আছে, ভারবিতে উহা নাই—"ভারবেরর্থ গৌরবং" এই কথাটী পক্ষপাত শূন্য ও সার্থক। কিন্তু যদিও মাঘ সংস্কৃত সাহিত্যের তৃতীয় কবি কিন্তু ভবভূতি ভিন্ন অন্য কেহই তাঁহার নিকটে আসন পাইবার যোগ্য নহে। নৈষধকার শ্রীহর্ষ তাঁহার অনেক নিম্নবর্ত্তী। শিশুপাল বধের শেষ ভাগে কবির যে বংশাবলী লিখিত হইয়াছে, উহা হইতে আমরা প্রবন্ধান্তরে মাঘ ভট্টের আবির্ভাব কাল ও সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রকটনের চেষ্টা করিব।

শ্রীশরচ্চন্দ্র কাব্যশ্রয়।

---

* সূর্য্য কিরণে নক্ষত্রগণের অদৃশ্য হওয়ার বিষয় ভাস্করাচার্য্য কৃত সিদ্ধান্ত শিরোমণি (প্রাকৃতিক বিজ্ঞান) নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

ত্রিপুরারাজ্য, বর্ত্তমান মহারাজা ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কুকিদিগের অত্যাচার কাহিনী বর্ণন করিব বলিয়া আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। কুকিদিগের জাতীয় ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা আমাদের অভিপ্রায় নহে। সুতরাং রণ-দুর্ম্মদ কুকিদিগের দ্বারা ব্রিটীস ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে যে সকল লোমহর্ষণ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, এস্থলে তাহাই সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। *

ভাষাতত্ত্বালোচনা দ্বারা অনুমিত হইয়াছে যে বাঙ্গালার পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বতবাসী মানবগণ সকলেই এক বংশ সম্ভূত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে তিব্বতি ব্রহ্মবংশজ বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইহাদিগকে "লৌহিত্য" বংশজ বলিয়া উল্লেখ করা সঙ্গত বোধ হইতেছে। এই লোহিত্য বংশের একটি প্রধান শাখা "তাঊংতা" শব্দে আখ্যাত হইয়া থাকে। তাঊংতাগণ অনেকগুলি শ্রেণী বা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা, মরুং (ত্রিপুরা,) রিয়াং, বাংখল চিলু, পৈতু, খজাক (খচাক) তাঙ্গন, কামহাউ, হাউলং, সাইলু, সিন্ধু প্রভৃতি। পূর্ব্বকালে তাঊংতা বংশীয় মরুংগণ বিশেষ পরাক্রমশালী ছিল। ত্রিপুরার মহারাজ মরুংজাতির সরদার। সুতরাং পরাক্রমশালী মরুংদিগের সাহায্যে তিনি সমস্ত তাঊংতা বংশকে স্বীয় করতলস্থ করিয়াছিলেন। তাঊংতা বংশীয়দিগের মধ্যে মরুংদিগকে ত্রিপুরা ও অন্যান্য মানবগণকে বঙ্গবাসীগণ কুকি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু কাছাড়বাসীগণ ইহাদিগকে লুচাই নামে পরিচিত করিতেন, আমাদের রাজপুরুষগণ কাছারীদিগের নিকট হইতে "লুসাই" শব্দটী গ্রহণ করিয়াছেন।

মুসলমানদিগের সহিত অবিশ্রান্ত কলহ করিয়া যখন ত্রিপুরেশ্বর দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন, তখন ত্রিপুররাজবংশীয়গণ আত্ম কলহ দ্বারা রণ দুর্ম্মদ কুকিদিগকে অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। বিগত শতাব্দীর অন্তভাগে ইহার সূত্রপাত হয়। তদবধি দুর্দ্দান্ত কুকিগণ পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিক্রম করিয়া বঙ্গীয় সমতলক্ষেত্রে প্রবেশ করত নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া আসিতেছে।

রামগঙ্গা ও দুর্গা মানিক্যের কলহ কালে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে পৈতু কুকিগণ ত্রিপুরা আক্রমণ করে। তৎকালে ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট সৈন্য দ্বারা ত্রিপুরেশ্বর রামগঙ্গা মাণিককে সাহায্য না করিলে রামগঙ্গা সপরিবারে কুকিদিগের দ্বারা নিহত হইতেন।

১৮২৪—১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কালে শম্ভুচন্দ্র ঠাকুরের প্ররোচনায় কুকিগণ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কুকিগণ ত্রিপুরা রাজবংশীয় রামকানু ঠাকুরের সহিত সম্মিলিত

* কুকিদিগের অত্যাচার কাহিনী বিস্তৃত ভাবে লিখিতে গেলে এক বৎসরের নব্যভারতেও তাহার স্থান সঙ্কুলন হইবে কিনা সন্দেহ, এজন্য আমরা সংক্ষেপে লিখিতে মনস্থ করিয়াছি।

হইয়া ত্রিপুরার অন্তর্গত থণ্ডল পর্য্যন্ত নর-রুধীরে পৃথিবী রঞ্জিত করিয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত লোমহর্ষণ ঘটনাগুলি এবং তৎপরবর্ত্তী আরও কয়েকটী ঘটনা প্রধানত পৈতু কুকি দ্বারা হইয়াছিল, এজন্য এস্থলে আমরা তাহাদের রাজবংশের একটী বংশাবলী অঙ্কিত করিতেছি। বিগত শতাব্দীর অন্তকালে পৈতু কুকির প্রধান সবদার শিব্‌বুত্ত ২৫ হাজার কুকি পরিবার লইয়া স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার উত্তর পুরুষদিগের মধ্যে অদ্যাপি কেহ কেহ স্বাধীন রহিয়াছে; অন্যেরা ত্রিপুরেশ্বরের অধীনতা স্বীকার পূর্ব্বক তাহাদের জাতীয় প্রথা অনুসারে কর প্রদান করিয়া থাকে।

রাজা শিব্‌বুত্ত।
    |
রাজা চুংপুল
    |
রাজা লালকুলিম
    ├── রাজা লালপুইমি
    │   ├── রাজা লিন্দু
    │   │   └── রাজা লালহলুন
    │   ├── রাজা লারু
    │   │   └── রাজা লালছোকলা
    │   │   ├── রাজা মুবাছুইলাল *
    │   │   └── ডুকিনীপুব
    │   └── রাজা বুতাই
    │   └── রাজা লালমিসিং
    └── রাজা কুজাশির
         └── রাজা বুত্তাই
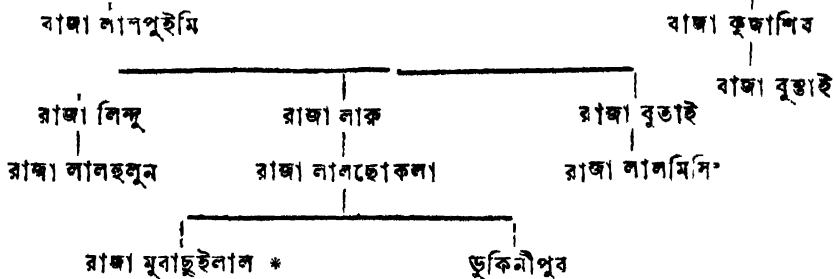
১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের অন্তভাগে পরাক্রমশালী পৈতু কুকিসবদার লারুর মৃত্যু হয়। তাহার উপযুক্ত পুত্র লালছোকলা পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য উপযুক্ত রূপ সম্পন্ন করিবার জন্য মানস্থ করিলেন। এরূপ এক জন পরাক্রমশালী বীরের শ্রাদ্ধ কার্য্য কখনই নরমুণ্ড ও দাসদাসী ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না। বিশেষত ব্রিটীস রাজ্যের অস্ত্র শস্ত্র বিহীন অধিবাসী না হইলে নরমুণ্ড কিম্বা দাসদাসী সংগ্রহের সুবিধা হয় না। সুতরাং বীরবর লালছোকলা ত্রিপুরা পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ এপ্রিল রাত্রে শ্রীহট্টের অন্তর্গত প্রতাপগড় পরগণার মধ্যগত কচুবাড়ী নামক গ্রাম আক্রমণ করিয়া ২০টি নরমুণ্ড ও ৬টি দাসদাসী সংগ্রহ করিলেন। শ্রীহট্টের মাজিষ্ট্রেট এই লোমহর্ষণ ঘটনার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। গবর্ণমেণ্ট অত্যাচারকারীগণকে ধৃত করিবার জন্য ত্রিপুরার মহারাজকে লিখিলেন, মহারাজ ত্রিপুরেশ্বরদিগের চিরঅভ্যস্ত প্রথানুসারে উত্তরে লিখিলে যে, "ইহারা তাহার অধীনস্থ নহে।" * কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পুনর্ব্বার মহারাজকে অত্যাচারী কুকিদিগকে ধৃত করিবার জন্য লিখিলেন। অগত্যা মহারাজ বাধ্য হইয়া একজন দারোগাকে ১০ জন বরকন্দাজের সহিত লাল ছোকলাকে ধৃত করিবার জন্য প্রেরণ

---

* মুবছাইলালের রাণীরাহ্নথাঙ্গী সুবিখ্যাত "লুসাই" সবদার ছকপুঁলালের ভগিনী।

* অনেক সময় ত্রিপুরেশ্বর কুকিদিগকে তাহার অধীনস্থ নহে বলিয়া গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ প্রকার অবস্থায় মণিপুরেশ্বরগণ ইহা কখনও স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ইঙ্গিত পাইলেই কুকিদিগের দমনজন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়া আপনাদের রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতেই রাজ্যের বর্ত্তমান আয়তন ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বিগুণ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এরূপ উত্তর প্রদান পূর্ব্বক ত্রিপুরেশ্বরগণ তাহাদের 'রাজ্য' নিজেরাই খর্ব্ব করিয়া লইয়াছেন।

করিলেন। ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণ তৎসংবাদ শ্রবণে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। ইহাকে তাঁহারা একটী প্রহসন বলিয়া মনে করিলেন।

প্রবন্ধ-লেখক ইহা বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, কুকিরাজ লাল ছোকলা কিয়ৎ পরিমাণে ত্রিপুরেশ্বরের অধীন ছিলেন। লালছোকলার পুত্র মুবছইলালের নাম পাঠকগণ মৎপ্রণীত ত্রিপুরার ইতিবৃত্তে দেখিতে পাইবেন।

গবর্ণমেণ্ট ত্রিপুরেশ্বরের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে লিখিলেন যে, আগামী ১লা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে প্রকৃত অত্যাচারীকে ধৃত করিয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ না করিলে ব্রিটিস সৈন্যদল তাঁহার রাজ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যাচারকারীকে ধৃত করিবে। এই ঘটনার পর ত্রিপুরেশ্বর ৪জন কুকি অপরাধীকে ২৭ জন সাক্ষীর সহিত শ্রীহট্টের মেজেষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাহারা মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রকাশ করিল যে, তাহারা ইহার কিছুই অবগত নহে। এই সকল ঘটনায় কিছু কাল অতিবাহিত হইল, অবশেষে নিরূপিত ১লা ডিসেম্বরে কাপ্তেন ব্লেকউড একদল পদাতি সৈন্য লইয়া ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করত লাল ছোকলার গ্রাম অবরোধ করিলেন।

ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষগণের রিপোর্টে প্রকাশ যে, ৪ঠা ডিসেম্বর লালছোকলা কাপ্তেন ব্লেকউডের হস্তে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু প্রবন্ধলেখক বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছেন যে, ত্রিপুরেশ্বর অনৈক (সেনাপতি কেলি কেরিঙ্গী) লালছোকলাকে ধৃত করিয়া ব্লেকউডের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টে লাল ছোকলার বিচার হয়। সেই বিচারে লাল ছোকলা দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইয়াছিল।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কুকিগণ শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত স্থানে ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিল, দেড়শতের অধিক প্রজা তাহাতে বিনষ্ট হইয়াছিল। এই সংবাদ গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হইলে কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মহারাজ গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে, এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড তাহার রাজ্য মধ্যে হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে হস্তক্ষেপ করিবার, গবর্ণমেণ্টের কোন অধিকার নাই। কিছু কাল এই কথা লইয়া গণ্ডগোল চলিয়াছিল। অবশেষে কাপ্তেন ফিসারের মানচিত্র দ্বারা ঘটনা স্থানে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত নির্ণীত হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের সৈন্যগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিল। তৎপর মহারাজ এই দুর্বৃত্তদিগের দমন জন্য আর কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে লিন্দু, খচাক ও লুসাই প্রভৃতি কুকিগণ, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও কাছার দেশে প্রবেশ করিয়া অনেক গুলি লোকের প্রাণ সংহার ও কয়েকখানি গ্রাম ভস্মীভূত করিয়াছিল। এই সময় কুকিগণ প্রায় ৪২ জন লোককে ধৃত করিয়া লইয়া যায়।

আমাদের গবর্ণমেণ্ট কুকিদিগের দ্বারা এই রূপ জ্বালাতন হইয়া তাহাদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে মনস্থ করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে যখন কর্ণেল লেষ্টার সৈন্য লইয়া কাছার হইতে কুকিদিগের বাসস্থানাভিমুখে যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময় পূর্ব্বদিক হইতে

প্রায় ৪০০ কুকি চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে ও কাছারের দক্ষিণদিকস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে আর একদল কুকি শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাতু থানার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের চিরঅভ্যস্থ নরহত্যা গৃহ দাহ প্রভৃতি কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়া পলায়ন করে। লাতুর নিকটবর্ত্তী স্থান ত্রিপুরা-রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া মহারাজ বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিলেন, এবং আক্রমণকারী কুকিগণও ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ বলিয়া প্রকাশ হইয়াছিল।

কর্ণেল লেষ্টারের যুদ্ধ যাত্রার ফল মোটের উপর এই হইয়াছিল যে, বিখ্যাত কুকি সরদার সুকপাইলাল গবর্ণমেণ্টের আনুগত্য স্বীকার করত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট কুকিদিগের এই সকল স্বীকৃত বাক্যের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করিলেও আমরা এই সকল অসভ্য বর্ব্বরদিগকে কিছু মাত্র বিশ্বাস করিতে পারি না। যাহা হউক, ইহার পর প্রায় দশবৎসরকাল কুকিদিগের দ্বারা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য কোন ঘটনা হয় নাই। কেবল ১৮৫০—৫১ সালে চট্টগ্রামের সীমান্ত কতকগুলি গ্রাম কাঠুরিয়া কুকিগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। যাহা হউক, আমাদের গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সীমান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য এই সময় যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয়, তন্মধ্যে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য জেলা করিয়া তথায় এক জন ইংরাজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সংস্থাপন করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে খণ্ডলের বিখ্যাত হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়। আমরা বাল্য কালে এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ যাহা শ্রবণ করিয়াছি, অদ্যাপি তাহা স্মরণ করিলে দুঃখে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। পাঠকগণ, সেই দুঃখের কথা কি বলিব। কানপুরে বিদ্রোহী সিপাইগণ যে লোমহর্ষণ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিল, তাহা অনন্তকাল ইতিহাস পটে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। কিন্তু কানপুরের হত্যাকাণ্ডের দ্বিতীয় অভিনয় স্বরূপ খণ্ডলের হত্যাকাণ্ডের বিবরণ কতজন পাঠক অবগত আছেন? আমাদের কর্ত্তৃপক্ষগণের বিজ্ঞাপনীতে এই ঘটনা এই রূপ সামান্য আকারে বর্ণিত হইয়াছে।

"Early in January 1860 reports were received at Chittagong, of assembling of a body of 400 or 500 Kookis at the head of the River Fenny, and soon the tale of burning villages and slaughtered men gave token of the work they had on hand On the 31st January, before any intimation of the purpose could reach us, the Kookis, after sweeping down the course of the Fenny, burst into the plains of Tipperah at Chagalneyah, burnt or plundered 15 villages, butchered 185 British subjects, and carried off about 100 captive."

এই ভীষণ হত্যাকাণ্ড অবলম্বন করিয়া রাধা মোহন নামক জনৈক গ্রাম্য কবি একটি গীতি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। আমরা বাল্য কালে ইহা শ্রবণ করিয়াছি। সেই কবিতা সম্পূর্ণ রূপে এক্ষণে আমাদের স্মরণ নাই। * তাহার

* এই কবিতার কিয়দংশ যাহা স্মরণ আছে, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল;—
শুন সর্ব্ব সাধু ইহার নির্ণয়,
যেন মতে খণ্ডলেতে কাটাকাটি হয়।

সারাংশ মাত্র স্মরণ রহিয়াছে। তৎকালে যাহারা পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহাদের নিকট এই ঘটনা যেরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে, এইস্থলে তাহাই প্রকাশ করা গেল।

দেখ মাঘ মাসে শনিবারে শ্রীপঞ্চমী ছিল।
মুনশীর থীল বাজারে বাবু ধুরন্ধর * আছিল।
সেদিন প্রভাত কালে,
করেছিল পূজার আয়োজন,
চিনি শর্করাদি যত লয় মন।
পূজা আরম্ভিল, হেন কালে প্রমাদ ঘটিল।
অকস্মাৎ তিপ্রাকুকি এসে দেখা দিল।
তারা দাও সেল হাতে, বন্দুক কান্ধে
দেখিতে ভয়ঙ্কর।
দেখে প্রাণ ভয়ে কাঁপে কালা ভুজঙ্গর।
রণে প্রবেশিল।
যারে পায় কাটিয়ে ফেলায়,
অবনিতে কাটা পরি ধূলাতে লুটায়।
রুধির আবেশিল।
আকাশেতে উড়িছে শকুন। ঘর নিচয় লুঠ করি চালে দেয় আগুন।
তারা খন্তা নিল, কুড়ল নিল আর নিল দাও কাঁচি,
সিন্ধুক ভাঙ্গি কাপড় নিল ভাল ভাল বাচি।
* *
ঠিক দুপর বেলা হল পুড়ে মুনশী বাড়ী।
সেদিন ফিরে যায়। রাত পোহাল ছিল রবিবার।
কাটা গ্রামে কাটি আসি সেল পুনর্ব্বার।
* * * *
চৈলেছে কোণা পাড়া।
কোণা পাড়া যেতে তারা করেছে গমন।
বাউমালীর † কোলে আসি দিল দরশন।
দেখে গুণাগাজি,
গুণাগাজি এল সাজি, সিপাই সঙ্গে করি।
তিপ্রা কুকি ফিরাইল, বন্দুক আওয়াজ করি।

* কাপ্তেন ধরণীধর সিংহ, ত্রিপুরেশ্বরের এক জন সৈন্যাপতি।
† বাউমালী নদী।

মুনশীরথীল নামক গ্রামস্থ বাজারে ত্রিপুরেশ্বরের জনৈক সেনাপতি—কাপ্তেন ধরণীধর সিংহ কতিপয় সৈন্যের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। ১৬ই মাঘ শনিবার শ্রীপঞ্চমী পূজা ছিল। কাপ্তেন তাঁহার সজীয় অস্ত্রশস্ত্রাদি ধৌত ও পরিষ্কার করিয়া পূজার জন্য সুসজ্জিত করিয়া রাখিলেন। এই সময় সংবাদ আসিল যে, ৪০০। ৫০০ কুকি নিকটবর্ত্তী গ্রাম আক্রমণ করিয়াছে। কাপ্তেন মহাশয় এই সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র অস্ত্রাদি লইয়া পলায়ন করিলেন। কুকিগণ নির্ব্বিঘ্নে গৃহে অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক গ্রামবাসীদিগকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। যে সকল রমণী শিশু সন্তানের সহিত কুকিদিগের হস্তে ধৃত হইল, কুকিগণ সেই সকল শিশুকে মাতার বক্ষ হইতে কাড়িয়া লইয়া শূন্যে নিক্ষেপ করত নিম্নে সুতীক্ষ্ণ সেল ধারণ করিয়া শিশুগুলিকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। হতভাগিনী জননীগণ এই রূপ নিষ্ঠুরতার সহিত অপত্য নিধন দর্শনে নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কুকিগণ পুরুষ মাত্রকেই নির্দ্দয়তার সহিত হত্যা করিয়া যুবতী রমণীগণকে পশুর ন্যায় বন্ধন করত আপনাদের সঙ্গে লইয়া চলিল। তাহারা এই রূপে ১৫ খানা গ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত ও ১৮৫ জন মনুষ্যের প্রাণ সংহার করত প্রায় একশত জন মনুষ্যকে বন্ধন করিয়া লইয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, তন্মধ্যে অধিকাংশ স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ যুবতী। এই ১৫ খানা গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া তাহারা যে সমস্ত স্বর্ণ, রৌপ্য, ও লৌহ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাই লইয়া গিয়াছিল।

এই সময় গুণাগাজি নামক গ্রামস্থ এক জন প্রধান ব্যক্তি চতুর্দ্দিকস্থ পল্লি সমূহ

অনুসন্ধান পূর্ব্বক প্রায় ২৫।৩০টি বন্দুক সংগ্রহ করিয়া বাড়িনালী নদীর তটে কুকিদিগকে আক্রমণ করে। কুকিদিগের অধিক বন্দুক ছিল না, সুতরাং তাহারা বন্দুকের মুখে নদী পার হইতে সাহসী না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। বিশেষত কুকিগণ প্রায়ই সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হয় না। গুণাগাজি এরূপ সাহস অবলম্বন না করিলে যে আরও কত গ্রাম ভস্মীভূত এবং কত লোক কুকিদিগের দ্বারা বিনষ্ট হইত, তাহা কে বলিতে পারে ?

জেলা ত্রিপুরার মেজিষ্ট্রেট সাহেব এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র কতিপয় সৈন্য খণ্ডলাভিমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কেবল মাত্র কুকিদিগের অত্যাচারের জলন্ত চিহ্ন প্রত্যক্ষ করিলেন। কুকিগণ ইহার পূর্ব্বেই জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিল।

এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমাদের কর্ত্তৃপক্ষগণ যাহা অবগত হইয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

"It was at first supposed that this extended movement on the part of these tribes was directed by certain near relatives of the Tipperah Raja, and was intended to involve that chief in trouble with the English Government But it was afterwards ascertained, with considerable certainty, that the main instigators of the invasion were three or four Hill Tipperah refugees, Thakurs who had lived for sometime among Kookis, and who took advantage of the ill feeling caused by an attack made by the Raja's subjects upon some Duptung Kookis, to excite a rising, that unfortunately became diverted to British territory. Driven by the Raja from his dominions, these men had formed alliance among the various Kooki tribes of the interior, and year by year villages, supposed to be friendly to the Raja, had been attacked and plundered, vague rumours of which disturbances had reached our ears Some of the Raja's own subjects, moreover, exasperated by his constant exactions, were believed to have invited the Kookis to ravage his territories."

উল্লেখিত ভীষণ হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ আমরা যাহা অবগত আছি. পাঠকগণ তাহা শ্রবণ করুন। ত্রিপুরার পার্ব্বত্য প্রদেশে রিয়াং নামক সম্প্রদায় আছে, ইহারা কুকিদিগের ন্যায় তত ভীষণ প্রকৃতি না হইলেও, নিতান্ত নিরীহ জাতি নহে। রিয়াংগণ খণ্ডলের বাঙ্গালী মহাজনগণ হইতে সর্ব্বদা টাকা কর্জ লইত। পার্ব্বত্য প্রদেশে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন প্রায় দুই তিন বৎসর শস্য জন্মে নাই। সুদে আসলে অনেক টাকা হইয়া দাঁড়াইল। মহাজনেরা সর্ব্বদা রিয়াংদিগকে টাকার জন্য তাগাদা করিত। তাহারা ইহা অসহ্য বোধে ডুখাং ও অন্যান্য কুকিদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া এই কার্য্য সম্পাদন করে। ইহাতে কৃষ্ণ চন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতি রাজ বংশীয় কয়েক জন ব্যক্তি সংসৃষ্ট ছিলেন। মতান্তরে পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বতবাসী রতনপুইয়া নামক 'সরদারও ইহাদের সহিত যোগ দিয়াছিল।

কুকিদিগের অত্যাচারে যে সকল খণ্ডবাসী সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট

তাহাদিগকে ১৩৭০০ টাকা ক্ষতি পূরণ স্বরূপ প্রদান করেন। ইহার অর্দ্ধাংশ ত্রিপুরেশ্বর হইতে আদায় করা হইয়াছিল।

গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত ভীষণ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার মানসে তৎ পর বৎসর শীতকালে একটি যুদ্ধ যাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে (১৮৬১ খ্রীঃঅঃ জানুয়ারিতে) ও একদল কুকি ত্রিপুরেশ্বরদিগের প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করে। উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরের একটী সেনানিবাস ছিল। তাহাতে এক জন হাওলদার ও ২৫ জন সিপাই থাকিত। ইহারা কুকিদিগের নাম শ্রবণ মাত্র, "মেগেজিন" ফেলিয়া পলায়ন করে। কুকিগণ সেই মেগেজিনরে বারুদ ও গুলি গোলা প্রাপ্ত হইয়া প্রবল বিক্রমে উদয়পুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী দুই খানা গ্রাম ও একটি প্রকাণ্ড রাজার ভস্মীভূত ও কতকগুলি লোকের প্রাণবধ করিয়া পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করে। তথায় চাকমা সরদার কালিন্দী রাণীর অধিকৃত কয়েক খানা গ্রাম অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের একদল পুলিস সৈন্যের সহিত তাহাদের একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধ কুকিগণ বিশেষ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পর্ব্বতে পলায়ন করিয়াছিল।

এই সকল ঘটনার পর কুকিদিগকে বিশেষ রূপে নির্য্যাতন করিবার মানসে ত্রিপুরেশ্বরের সহিত উপযুক্ত পরামর্শ করিবার জন্য কাপ্তান গ্রেহাম সাহেব আগড়তালায় প্রেরিত হন। সেই সকল বৃত্তান্ত ইতিপূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে।

তৎপর বৎসর বর্ত্তমান মহারাজ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। (১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে) চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে কিম্বা ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণাংশে কোন গণ্ডগোল হয় নাই, কিন্তু উত্তরাংশে শ্রীহট্ট জেলার সীমান্তবর্ত্তী স্থানে আদমপুরের বিখ্যাত হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়।

ইতি পূর্ব্বে পৈতু কুকির যে বংশাবলী প্রদর্শিত হইয়াছে, পাঠকগণ তাহাতে দেখিতে পাইবেন যে, লাল ছোকলারপুত্র মুরছুইলাল বিখ্যাত লুসাই সরদার ছুকপাইলালের ভগিনী ভানুইথাঙ্গীকে বিবাহ করেন। কোন কারণ বশত মুরছুই লাল স্বীয় পত্নী ভানুইথাঙ্গীকে অপমানিত করেন। উপযুক্ত ভ্রাতার উপযুক্ত ভগিনী সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় ভ্রাতা ছুক পাইলালকে তৎ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তাহাতেই কুকিদিগের মধ্যে একটি গোণ্ডগোল উপস্থিত হয়। মতান্তরে মুরছুইলালের সহিত ভানুথাঙ্গীর বিবাহ কালে, কন্যার যৌতুক প্রদান করিবার জন্য আদমপুর আক্রমণ করিয়া কতকগুলি দাস দাসী সংগ্রহ করা হইয়াছিল। প্রকৃত ঘটনা যাহাই হউক না কেন, মুরছুইলাল, ছুকপাইলাল, রাংবুং ও লালহুলন নামক ৪ জন কুকিরাজা সম্মিলিত হইয়া ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্গত কতকগুলি গ্রাম ও শ্রীহট্টের অন্তর্গত আদমপুরের নিকটবর্ত্তী তিন খানা গ্রাম অগ্নি দ্বারা দগ্ধ ও কতকগুলি লোক নির্দ্দয় ভাবে হত্যা ও কতকগুলি লোক বন্দী করিয়া লইয়া যায়। এই ৪ জন সরদার মধ্যে মুরছুইলাল ও রাংবুং ত্রিপুরেশ্বরের অধীনস্থ এবং ছুকপাইলাল সম্পূর্ণ স্বাধীন, লালহুলুন মুরছুইলালের খুল্লতাত ভ্রাতা ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আদমপুরের হত্যাকাণ্ডের পর ১৮৬২-

৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেন্টে বলে ও কৌশলে কুকি সরদারদিগকে বাধ্য করিয়া পূর্ব্বসীমান্তে শান্তি সংস্থাপন করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছিলেন।

পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের তদানীন্তন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট গ্রেহাম রতন পুঁইয়ার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। তৎ কালে ইহা অবধারিত হয় যে সীমান্ত প্রদেশে শান্তি রক্ষার জন্য গবর্ণমেন্ট প্রতি বৎসর রতন পুঁইয়াকে ৪০০ টাকা, হাউলংদিগের ৮০০ টাকা ও সাইলো কুকিগণ ৮০০ টাকা বার্ষিক প্রদান করিবেন।

উত্তরদিক কাছারের ডিপুটী কমিসনর ষ্টুয়ার্ট সাহেব বিখ্যাত সরদার ছকপাইলাল ও মোল্লা সরদার বনপুইলালের সহিত সামান্ত প্রকারের সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সুকপাইলাল গবর্ণমেণ্টের আনুগত্য স্বীকার করত শান্তি রক্ষা করিলে তাহাকে বার্ষিক ৬০০ টাকা গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রদত্ত হইবে, এরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল।

আদমপুরের হত্যাকাণ্ডের সময় কুকিগণ যে সকল স্ত্রীলোককে ধৃত করিয়া লইয়া যায়, তন্মধ্যে কয়েকটি পালাইয়া কাছাড়ে উপস্থিত হইয়াছিল। অন্যান্য স্ত্রীলোক গুলিকে কুকিগণ বিবাহ করে।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে কুকিগণ নানা প্রকার উৎপাত আরম্ভ করে। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, তাহারা বাঙ্গলার সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ করে নাই।

১৮৬৫ এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কুকিগণ বঙ্গীয় সমতল ক্ষেত্রে কোন অত্যাচার করেনাই। কিন্তু তৎকালেও যে তাহারা তাহাদের চিরঅভ্যস্থ কার্য্যে বিরত ছিল, এমত নহে, কারণ সেই সময় তাহারা আত্ম কলহে নিযুক্ত ছিল। সৌভাগ্য বশত আমাদের কর্তৃপক্ষগণের সতর্কতায় তাহারা সমতল ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হয়নাই।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চমাসে প্রায় ৫০০ শত হাউলাং তাহাদের রাক্ষস বৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষগণ রতন পুঁইয়ার দ্বারা এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র চট্টগ্রামের পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষার জন্য যত্নবান হইলেন। হাউলংগণ সেই দিকে সুবিধা প্রাপ্ত না হইয়া ত্রিপুরা রাজ্যাভিমুখে ধাবিত হইল। সৌভাগ্যবশত হাউলংগণ এবার ত্রিপুরা রাজ্যে কোনরূপ উপদ্রব করিতে সক্ষম হয় নাই।

১৮৬৮—৬৯, ৬৯—৭০, ৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে ক্রমান্বয়ে তিন বৎসর কুকিদিগের অত্যাচার কার্য্য সমভাবে চলিয়াছিল। কাছাড়ের চা ক্ষেত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত যে সময় যেস্থানে সুবিধা পাইয়াছে, সেই সময় সেই স্থানেই তাহাদের চির অভ্যস্থ গৃহ দাহ,নর হত্যা প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা আপনাদের রাক্ষস বৃত্তি চরিতার্থ করিতে কিছু মাত্র ত্রুটি করি নাই। আমাদের গবর্ণমেন্ট এই সকল অত্যাচার নিবারণ জন্য যথাসাধ্য যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। কাছারও পার্ব্বত্য,চট্টগ্রামে সৈন্য স্থাপন করিলেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে কি হইতেছে, সেই রাজ্যের পূর্ব্ব দিকস্থ দুর্দ্দান্ত কুকিদিগের সহিত ত্রিপুরেশ্বর কি রূপ ব্যবহার করিতেছেন, গবর্ণমেন্ট তাহার নিগুঢ় সংবাদ কিছুই প্রাপ্ত হয় না। অথচ দুর্দ্দান্ত কুকিজাতিকে দমন জন্য আশু একটী যুদ্ধযাত্রার

তোমার সুখের লাগি,
কি না পারি হা অভাগি !
প্রাণ ল'য়ে তুচ্ছ খেলা,হেসে হলাহল দাও।

---

(২)

বেহাগ খাম্বাজ—আড়া।

যত--কর উপহাস,
ভাঙা প্রেম জোড়া দিতে মিছে এ প্রয়াস।
যে স্বপন গেছে দূরে,
সে নেশা আর কি ফিরে !
ওড়া পাতা আরো ওড়ে লাগিলে বাতাস।

---

(৩)

খাম্বাজ—মধ্যমান।

সুখ সাধে প ড়ে দুখ-ফাঁদে
অবোধ মন সদা কাঁদে।
ভাবিয়া না পায় কিছু কি দিয়ে পরাণ বাঁধে।
বোঝেনি বিভল মন—
প্রেমে আছে বিস্মরণ,
স্বপনেতে জাগরণ, দহন শীতল চাঁদে।

---

(৪)

বাগেশ্রী—আড়া।

ফিরিতে হইবে যদি মিলন-সাগরে এসে,
তা হলে এ খর-স্রোতে কে সাধে—
আসিত ভেসে !
উজানে আধেক বাই,
হৃদে আর বল নাই।
কেমনে ফিরিয়া যাই, সে চির-বিরহ-দেশে।
মিছে ভাঙা গিরি বাঁধা,
মিছে ত্যজা গুহা-আঁধা,
ভালবেসে ছিল কাঁদা সেই যদি আগে শেষে।

---

(৫)

টোরি, কাওয়ালী।

আর—সহেনা যাতন,
ধরণী হয়েছে পুরাতন।
হেরি উষারূপ-রাশি
মনে পড়ে তার হাসি,
বিধু-কোলে সে বিধু-বদন।
হেরিলে কাননে ফুল
মনে পড়ে সেই ভুল,
সে আকৃতি, সে প্রীতি-নয়ন।
কাঁপে বায়ু ফুল বাসে
মনে হয় সেই শ্বাসে,
বিহগ কূজনে সে বচন।
নবীনতা-হারা ধরা,
স্মৃতি পুরাতনে ভরা !
দাও ভেঙে এ ধরা এ মন—
ওরে রে মরণ।

---

(৬)

সর্ফর্দা, আড়া।

কাটে না সময় আর, আসেনা মরণ,
বেঁচে আছি—পড়ে আছি জড়ের মতন।
কিছুতে বসেনা আশা,
ধরা যেন পর-বাসা;
কোথা পর-ভালবাসা,কোথা সে স্বপন !
কোথা সে সুখের সাধ,
সাধের সে অবসাদ,
সাধা-সাধি কাঁদা-কাঁদি বাঁধিতে জীবন;
স্রোত হারা নদী মত,
প'ড়ে আর রব কত !
শুকাতেছি পলে পলে, মরিব কখন ?

৭

ঝিঁঝিট, মধ্যমান।

কাঁদিব কত আর
বাঁধিব কত হিয়ে—
যাতনা সুধু সার
আপনা পরে দিযে।
বোঝে না পরে মন,
খোঁজেনা পর জন (এ মন),
কেমন দুখ-পণ
স্বপন-খেল নিয়ে
কাঁদিব কত আর।

৮

সাহানা, যৎ।

সুধু-আঁখির পিপাসা,
হ'তো যদি আজি হায় আমার এ ভালবাসা।
কত ফুল, কত ছবি,
আধ শশী, নব রবি,
কত গিরি, কত নদী মিটাত নয়ন-আশা।
এ যে রে প্রাণের ভুল,
অকাল মরণ-মূল।
শূন্য পানে চেয়ে চেয়ে শূন্য প্রাণে —
কাঁদা-হাসা।
নহে আঁখির পিপাসা
আমার এ ভালবাসা।

৯

পিলু, যৎ।

রাজ-পথ দিয়ে ধীরে পথিক গেলো।
মুখ-পানে চেয়ে তার, কার মুখ মনে এলো?
মানুষ মানুষ কাছে
কি বাঁধনে বাঁধা আছে।
সে আছে সবার পাছে, একি স্মৃতি, একি—
খেলো!
মোরে সুধু দূরে রাখি,
সে আছে সবারে ঢাকি,
যা দেখি তারেই দেখি, "একি; বেঁধা—
মারা-শেল।

১০

হাম্বির, কাওয়ালী।

কোথা তুমি ধ্রুব-তারা।
অকূল বিরহ মাঝে আমি আজি লক্ষ্য হারা।
গরজে নিরাশা-ঝড়,
অভিমান কড়-কড়,
ডোবে ডোবে হৃদি তরী, ঝর ঝর নিন্দা-ধারা।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

উৎকল-ভ্রমণ।

(পুরীর রাস্তা ও পিপ্‌লী চটী।)

সেই উত্তপ্ত ধূলিময় রাস্তা দিয়া, ফাল্গুন মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রের তেজ মাথায় করিয়া গাড়ী ঈষৎ শব্দ করিতে করিতে চলিল। পূর্ব্বদিনের অর্দ্ধাহার বা অনাহার, রাত্রের দারুণ পথ-কষ্ট, প্রাতের ভ্রমণ—এ সকলে শরীর অবসন্ন হওয়ারই কথা। এক গাড়ীতে দুই জন, এক জন পীড়িত—গাড়ীর পার্শ্ব ১॥,১৳ হাত বই নয়—তাতে শরীর অবসন্ন, তাতে

চলিল। রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় আর একটী চটীতে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া অল্প বিশ্রাম করা হইল, এবং কিয়ৎ কাল পরেই গাড়ী ছাড়া হইল। গরুভাযাদের আহার খড় ও কুড়া (কুণ্ড) অথবা চূর্ণীকৃত তুষ। এই কুড়া সকল চটীতেই প্রায় পাওয়া যায়। কুড়া জলে মিশাইয়া দিলে গরু-ভায়ারা মহাহ্লাদে তাহা উদরস্থ করে। ইহাতে অধিক সময়ও লাগেনা আছে, অথচ গরু খুব সবল ও সুস্থ থাকে। সমস্ত রাত্রি গাড়ী চলিল। বেলা আটঘটিকার সময় রাস্তায় যাত্রীর ভিড় বাড়িল। বেলা বৃদ্ধির সহিত ক্রমে ক্রমে বুঝিলাম, আমরা পুরীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছি। যাত্রীগণের আনন্দ, উৎসাহ দেখিয়া মোহিত হইলাম, আপনাদিগের ধর্ম্মজীবনকে শত ধিক্কার দিলাম। জগন্নাথের মন্দির দেখিলেই যেন সকল কষ্ট দূর হইবে—এই আশায় তাহারা—সকল কষ্ট, ভুলিয়া তীরবেগে রুধিরাক্ত পায়ে ছুটিয়াছে। কেহ ছিন্নবস্ত্র জড়াইয়া পায়ের রক্ত নিবারণ করিতেছে, কেহ মস্তকে মলিন বস্ত্রে রৌদ্রের তেজ নিবারণ করিতেছে,—পথকষ্টে শরীর জীর্ণশীর্ণ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু তবুও তাহাদের মুখ প্রসন্ন। এমন দৃশ্য দেখিলেও নবজীবন লাভ হয়। আমরা জীবনে আর কখনও এমন দৃশ্য দেখি নাই। জীবন যেন এই পবিত্র দৃশ্য দেখিয়া ধন্য হইল। ক্রমে জগন্নাথমন্দিরের গগনস্পর্শী চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল। সর্ব্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত নিশান গগনে বাহু তুলিয়া তুলিয়া তুলিয়া যেন যাত্রীদিগকে কত আশার কথা বলিয়া ডাকিতেছে। যখন মন্দিরের নিশান ও শ্বেত চূড়া দৃষ্টিগোচর হইল—তখন চতুর্দ্দিক হইতে মহা কল্লোলে "জয় জগন্নাথ" শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল। সে যে কি আনন্দের ব্যাপার, সে যে কি উৎসাহের সংবাদ, ভাষায় ব্যক্ত হয় না। আমরা যাত্রীগণের মূর্ত্তিতে ধর্ম্মজীবনের অনন্ত তত্ত্ব পাঠ করিতে করিতে সেই শ্রেষ্ঠতীর্থাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। জনতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, নানা রূপ বেশধারী পাণ্ডাদের যাতায়াত বাড়িতে লাগিল, অনেক অনেক ছোট ছোট মন্দির সকল দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। এই রূপ মহা সুখ উপভোগ করিতে করিতে, গাড়ী ৯ টার সময় আঠারনালার নিকট পৌঁছিল। লোকে বলে এবং হণ্টার সাহেবের পুস্তকে লেখা, আঠার, কিন্তু দুটী রাখাল বালকের কথানুসারে গণিয়া দেখিয়াছি, এই প্রকাণ্ড পুলে আঠার খিলানের পরিবর্ত্তে ১৯টী খিলান আছে। এই পুলটী মারহাট্টাদিগের কীর্ত্তিস্তম্ভ। এত বড় পুল পুরীর রাস্তায় আর নাই। সমস্ত খিলান গুলি প্রস্তর নির্ম্মিত। কখনও যে ধ্বংস হইবে, মনে হয় না।

সাহিত্য-বাজার। (৩)

(সংবাদ ও সাময়িক পত্র।)

গত দুইবারে সাহিত্যের উন্নতি ও অবনতির কথা বলিয়াছি, কিন্তু সংবাদ ও সাময়িক পত্রের কথা কিছুই বলি নাই। সংবাদ ও সাময়িক পত্র সাহিত্য-বাজারের অতি প্রয়োজনীয় জিনিস, জাতীয় অভ্যুত্থানের মূলশক্তি। সর্ব্বদেশের জাতীয় ইতিহাস পাঠ করিলে দেখা যায়, সংবাদ ও সাময়িক পত্র ভিন্ন কোন দেশ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। এজগতে সাময়িক পত্রের ন্যায় জাতীয় ভাণ্ডার পুষ্টপোষক আর দ্বিতীয় নাই। এই অত্যাবশ্যকীয় জিনিস বাঙ্গালায় কেমন উন্নতিলাভ করিতেছে বর্ত্তমানে তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। পত্রিকাদি সম্বন্ধে সময়ে সময়ে মতামত প্রদানের জন্য আমরা বিশেষরূপ অনুরুদ্ধও হইয়া থাকি। কিন্তু নানা কারণে এ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল আমরা কোন কথা বলি নাই। কিন্তু সাহিত্যের উন্নতি, অবনতি সম্বন্ধে আলোচনা [illegible] মধ্যে এ সম্বন্ধে দুইচারিটী কথা [illegible] প্রস্তাবটা

অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। অতি অরুচিকর হইলেও, সেই জন্য, এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। পূর্ব্বে সংবাদ পত্রের বর্ষ-সমালোচনায় এ কার্য্যটী এক রূপ নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু, কি জানি কেন, এখন কোন সংবাদ-পত্রকেই এসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতে দেখি না। ইহার কারণ কি, জানিনা। অন্যের প্রশংসা অসহ্য, অন্যের উন্নতি-ঘোষণা নিজের পক্ষে অনিষ্টকর, অথবা অন্যকে ভাল বলিলে নিজে ছোট হইতে হয়, সেই সকল কারণ ঘটা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু কোথাও যে এরূপ ঘটে না, তাহাও বলা কঠিন। এই সকল কারণেই হউক, বা অমনোযোগিতার জন্যই হউক, সময়ের অল্পতা প্রযুক্তই হউক, অথবা লোকের অপ্রিয় হইবার ভয়েই হউক,— এখন আর বর্ষ-সমালোচন কালে সম্পাদকগণ সংবাদ ও সাময়িক পত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেন না। অমুক বাঙ্গা জাগিল, কি অমুক বাঙ্গা মরিল, ইহাপেক্ষা সাহিত্য সেবক ও জাতীয় উন্নতি প্রয়াসী দিগের পক্ষে, কোন প্রত্রিকার কিরূপ অবস্থা হইল, কোন্ কাগজ নূতন সৃষ্ট হইল, কোন্ কাগজ প্রাণত্যাগ করিল, এই সকল সংবাদ অধিক আকর্ষণের জিনিস। আমাদের দেশে পত্রিকার উন্নতিহইতেছে না কেন? অনেক কাগজই অসময়ে প্রাণত্যাগ করে কেন, এ সকল তত্ত্বের আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এখন এ সম্বন্ধে অনেকেই নীরব। অন্য সকলকে নীরব থাকিতে দেখিয়া আমাদেরও নীরব থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া শেষ করিয়া ছাড়া উচিত, বিবেচনায়, এই কার্য্যে প্রবৃত্তি হইলাম।

মানুষ যেসকল কাজ করে, সেসকল কাজেরই একটা লক্ষ্য বা একটা উদ্দেশ্য থাকে। পৃথিবীতে যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া যশোমন্দিরে স্থায়ী-আসন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের লক্ষ্য বাল্যকালেই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। পৃথিবীতে যত বড় বড় সম্পাদক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকল সম্পাদকই একটা লক্ষ্যস্থির করিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমাদের দেশটা কিছু স্বতন্ত্র ভাবে চলিয়াছে। এদেশে লক্ষ্য স্থির অতি অল্প ব্যক্তির হইয়াছে। স্রোতে ভাসমান তৃণ বা বায়ুতে উড্ডীয়মান ধূলিকণার ন্যায় আত্ম-লক্ষশূন্য আমাদের দেশের বহু লোক ঘটনা-স্রোতে গা ভাসাইয়া চলিয়াছেন। পরিণাম কেহ ভাবে না, কেহ গণে না। লক্ষ্য স্থির করিয়া অগ্রসর হওয়া যে উচিত, একথা বড় একটা গণনার বিষয় নয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিতে বসিলে, এত অকৃতকার্য্যতা আমাদের দেশের ভাগ্যে ঘটিত কিনা, সন্দেহ।

ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে, লক্ষহীনতা বশতই আমাদের দেশের সংবাদ-পত্র বাজারের এত হীনাবস্থা। সম্পাদকীয় কার্য্যটা একটা সখের জিনিসের ন্যায় হইয়াছে। অনেকের পক্ষেই এটা একটা জীবনের ব্রত নয়। কোন রূপ ব্রত গ্রহণ করিলে অল্পে কেহই ছাড়ে না। বাঙ্গালীর গ্রাহকগণের ঘোরতর ঔদাসীন্য এসম্বন্ধে আছে বটে, কিন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিতে গেলে বলিতেই হইবে, দোষ গ্রাহক অপেক্ষা দায়িত্বহীন সম্পাদকগণের অধিক। এই দোষেই অনেক কাগজ দুই এক মাস পরেই উঠিয়া যায়। নাম কিনিতেও ইচ্ছা, অথচ দায়িত্ব বোধ নাই, উপযুক্ত আয়োজন নাই, অর্থবল নাই। এরূপ হইলেউন্নতি হইবে কেন, বলত?

অনেক ভাল কার্য্যের সূত্রপাত এদেশে হইয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞান-সভা ভিন্ন একটারও ভাল ফল ফলে নাই। বেঙ্গল ব্যাঙ্কিং করপোরেসন হইতে আরম্ভ করিয়া ইণ্ডিয়ান লিগ, রিপন-মেমোরিয়াল-কমিটি প্রভৃতির অকৃতকার্য্যতা স্মরণ করিলে মনে হয় না, কুষ্ঠাশ্রম (Leper Asylum) ভিক্টরের স্থায়ী মেমোরিয়াল কমিটির দ্বারা সংস্থাপিত হইবে। সকল কাজেই অপরিণামদর্শিতা, বাহ্যাড়ম্বর ও চিন্তাহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া, যে লক্ষ্য স্থির করিয়াকাজ করে, সে অকৃতকার্য্য হইবে কেন,

মোটেই বুঝি না। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই যেন উদ্দেশ্য-হীন লক্ষ্যহীন। জাতীয় সাহিত্যের যাহারা সেবক, তাঁহারা সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। যাঁহারা দেশের উন্নতির জন্য প্রাণমনোবাক্য পরিশ্রম করিতেছেন তাঁহারা সকলেই শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু বলিতে দুঃখ এবং লজ্জা হয়, বৎসরের মধ্যে কত [illegible] অভ্যুত্থান হয় আবার পতন হয়, কেহ সাহিত্য সেবক জন্মগ্রহণ করেন, চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে, আবার অন্তর্হিত হন, খুঁজিয়া আর তাঁহাদের পাওয়া যায় না। বৎসরের মধ্যে কত নূতন কাগজ জন্মগ্রহণ করে, কত [illegible] ত্যাগ করে, ভাবিলে বিস্ময়ে [illegible]। গ্রাহকেরা টাকা দেন না, [illegible] করেন না, বন্ধুগণ সহানুভূতি প্রকাশ করেন না, একথাও সর্ব্ববাদীসম্মত, জানি, [illegible] কি ব্রত গ্রহণ করা উচিত? দোষ গ্রাহকদের, না চিন্তাবিহীন [illegible] সম্পাদকগণের? গত [illegible] চিন্তাবিহীন কত সম্পাদক [illegible] যে জীবনলীলা শেষ করিয়াছেন, [illegible] সংখ্যা নাই। দুই দশদিন [illegible] জন্য কেন যে এরূপ কার্য্যে সকলে ব্রতী হন, বুঝি না। বর্ত্তমান সময়ে দেশের এরূপ অবস্থা উপস্থিত যে, কোন নবসহযোগীকে জন্ম গ্রহণ করিতে দেখিলে আর আনন্দ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয় না,—কখন তাহার পতন হয়, এই কথাই মনে জাগে। যে সকল সহযোগীগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্থির লক্ষ্য ব্যক্তি অনেক আছেন। কেহ কেহ লক্ষ্য পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এমনও আছেন। কেহ কেহ লক্ষ্যশূন্য হইয়া রহিয়াছেন, এমনও আছেন। সমসাময়িক ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া বড় [illegible], এবং তাহা সকলের প্রিয় [illegible]। আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে [illegible] অবস্থা যথাযথরূপ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব, কোন পত্রিকার দ্বারা দেশের কিরূপ উপকার হইয়াছে। দাম্ভিক-জন, ভাষা-জ্ঞান-হীন, অন্যের অনিষ্টকারী "দাম বড়", যে সকল সম্পাদক বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা একার্য্যে [illegible] হইবেন জানি। কিন্তু তাঁহাদের [illegible] জন্য আমাদের কোনই উপায় অবলম্বনের পথ নাই।

ফুলরেণু।

বিরহ।

মিলন হইতে দেবি! এবক বিরহ ভাল,
দেখিব বলিয়া আশা মনে থাকে চিরকাল।
নিরাশা নাহিক জানি,
সদা শুনি দৈববাণী,
মৃত সঞ্জীবনী ভাষা-"বাসি ভাল! বাসি ভাল!"
যে দিকে—যে দিকে চাই,
তোমারে দেখিতে পাই,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব বিশ্ব-রূপে করে আ'ল।
মিলনে বিরহ ভয়,
আকুল করে হৃদয়,
চুম্বিতে চমকি উঠি,নিশি বা পোহায়ে গেল।

সামান্য নারী।

সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ?
শূন্য ক'রে গেছে যেন সমস্তটা প্রাণ?
একটু গিয়েছে হাসি,
একটু গিয়েছে কান্না,
একটু আঁখির জলে মাখা অভিমান!
একটু চুম্বন গেছে,
একটু নিশ্বাস দীর্ঘ,
একটুকু আলিঙ্গন—তৃণের সমান!
যা গেছে সে ক্ষুদ্র গেছে,
প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড আছে,
তবে যে ভরে না কেন তার শূন্য স্থান?
সামান্য নারীটা তার কত পরিমাণ?

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম। [৩৭শ]

সার্ব্বভৌমোদ্ধার।

নিত্যানন্দাদি সিংহদ্বারে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই শ্রীচৈতন্য অচৈতন্যাবস্থায় সার্ব্বভৌমভবনে নীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আসিয়া লোকমুখে ঐ বৃত্তান্তের কথক কথক আভাস যাহা শুনিতে পাইলেন, তাহাতে আর বুঝিতে বাকী থাকিলনা যে, মহাপ্রভুকে লক্ষ্য করিয়াই লোকে ঐসব কথা বলিতেছিল। তাঁহারা সার্ব্বভৌমের বাড়ীর উদ্দেশে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় মুকুন্দদত্ত সেই পথে গোপীনাথ আচার্য্যকে আসিতে দেখিতে পাইলেন। গোপীনাথ নবদ্বীপের বিশারদের জামাতা ও সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি। ইনি মহাপ্রভুর এক জন ভক্ত ও তত্ত্বজ্ঞ, মুকুন্দের সহিত পরিচয় ছিল। মুকুন্দকে দেখিতে পাইয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন "বা। তুমি এখানে কবে এলে? প্রভু কোথায়"? মুকুন্দ উত্তর করিলেন, "প্রভু সন্ন্যাস করিয়া আমাদের লইয়া নীলাচলে আসিয়াছেন এবং আমাদের পাছে ফেলিয়া একাকী জগন্নাথ দর্শনে আসিয়াছিলেন। লোক মুখে শুনিয়া বুঝিতে পারিতেছি, তিনি জগন্নাথ দর্শনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া গিয়াছেন। এখন অন্য কথা কহিবার অবসর নাই, শীঘ্র তুমি আমাদের ভট্টাচার্য্যের বাড়ী দেখাইয়া দাও।" গোপীনাথ তাঁহাদিগকে লইয়া সার্ব্বভৌমের বাড়ীতে গেলেন, যাইতে যাইতে পথে মুকুন্দ নিত্যানন্দাদির সহিত গোপীনাথের পরিচয় করিয়া দিলেন। সার্ব্বভৌম-ভবনে মহাপ্রভুকে অজ্ঞানাবস্থায় শয়ান দেখিয়া সকলে দুঃখিত হইলেন। সার্ব্বভৌম আগন্তুকদিগের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া স্বীয়পুত্র চন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিয়া জগন্নাথ দর্শনে পাঠাইলেন। দর্শনান্তর সকলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মুকুন্দ মহাপ্রভুর কর্ণমূলে সুস্বরে হরিসংকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন, তিন প্রহরকাল পরে গৌর সিংহ হরিনাম শ্রবণে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন। তখন বেলাবসান হইয়াছে। সকলে মহানন্দে সমুদ্র-স্নান করিয়া আসিলে সার্ব্বভৌম মহাপ্রসাদ আনাইয়া সকলকে পরিতোষ রূপে ভোজন করাইলেন। খাইতে খাইতে গৌরচন্দ্র আনন্দোল্লাসে বলিতে লাগিলেন, 'আমাকে অনেক করিয়া লাফরা তরকারী দাও, আর সকলকে তুমি যথেষ্ট পিঠাপানা ও ছানাবড়াদি দাও।' সার্ব্বভৌম সেকথা না শুনিয়া তাঁহাকে সকল প্রকার প্রসাদ অতি যত্নের সহিত ভোজন করাইলেন। ভোজনের সময় অনেক কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল। গৌর নিতাইকে বলিলেন, "তোমাদের ছাড়িয়া আসিয়া আমি জগন্নাথ দর্শন করিলাম, জগন্নাথ দেখিয়া আমার মনে ইচ্ছা হইল, ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে হৃদয় মধ্যে রাখি, এই ভাবিয়া ধরিতে গিয়াছিলাম, তাহার পর কি হইয়াছে, জানিনা।" নিত্যানন্দ বলিলেন, "সৌভাগ্য ক্রমে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য

সেখানে ছিলেন, তোমাকে মূর্চ্ছিতাবস্থায় তুলিয়া এখানে আনিয়াছিলেন। তাই তোমার জীবন রক্ষা হইয়াছে।' সার্ব্বভৌম বলিলেন, আর আপনি একাকী দর্শনে যাইবেন না, গোপীনাথ, তুমি ইহাকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যহ দর্শন করাইয়া আনিও।

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "আজ হইতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, জগন্নাথ দর্শনে আমি মন্দিরের অভ্যন্তরে যাইবনা, বাহিরে গরুড় স্তম্ভের পাশে দাঁড়াইয়া দেখিব।" আচমনান্তে গৌরকে বিশ্রামস্থানে উপবিষ্ট করাইয়া সার্ব্বভৌম গোপীনাথের সহিত নিকটে যাইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। "গোসাঁইর পূর্ব্বাশ্রম কোথায়?" সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন। গোপীনাথ বলিলেন "নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের ইনি কনিষ্ঠ পুত্র, ও নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর দৌহিত্র, নাম বিশ্বম্ভর।' ভট্টাচার্য্য গৌরকে বলিলেন "নীলাম্বর আমার পিতা বিশারদের সহাধ্যায়ী। জগন্নাথও তাহার মান্য ছিলেন, সেসম্বন্ধে আপনি আমার গৌরবের পাত্র, বিশেষতঃ যখন আপনি সন্ন্যাস লইয়াছেন, তখন বিশেষ পূজনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।" শ্রীচৈতন্য বিষ্ণু স্মরণ করিয়া বলিলেন, আপনি আমাকে এরূপ বলিবেন না, আপনি জগৎ গুরু, বেদান্তাধ্যাপক, মহা পূজনীয় ব্যক্তি। আমি বালক সন্ন্যাসী, সদসৎ জ্ঞান হীন, আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনার নিকট আমার কত শিখিবার আছে, আজ হইতে আমি আপনাকে গুরুস্থানে বরণ করিলাম, আমাকে শিষ্যজ্ঞানে উপদেশ দিবেন।

সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য কি?

গৌর উত্তর করিলেন, বাহিরের উদ্দেশ্য জগন্নাথ দর্শন, কিন্তু জগন্নাথ তো আর আমার সঙ্গে কথা কহিবেন না। আমার আসিবার মূল উদ্দেশ্য, আপনি এখানে আছেন বলিয়া। আপনাতে ভগবানের শক্তি পূর্ণরূপে অবস্থিত। আমি আপনার সংসর্গে থাকিয়া উপকৃত হইব বলিয়া এখানে আসিয়াছি। কিরূপ আচরণ করিলে আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম বজায় থাকিবে, আর সংসার মায়ায় না পড়িতে হয়, কি খাইব কি অধ্যয়ন করিব? এই সব বিষয় আমাকে শিক্ষা দিতে হইবে।

সার্ব্বভৌম গৌরের মধুর সম্ভাষণে মুগ্ধ হইয়া অধিক আত্মীয়তা করিয়া বলিতে লাগিলেন "তুমি আমার বয়ঃ কনিষ্ঠ, তোমাকে তুমি সম্বোধন করিতে পারি। কিন্তু তথাচ তুমি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, গৃহীদিগের বন্দনীয়, ভয় হয় এরূপ করিলে দাসকে অপরাধী হইতে হয়।"

গৌর বলিলেন, তাতো পারিবেনই। তাহা না করিলে মনে করিব আপনি আমাকে ভাল বাসিতেছেন না।

সার্ব্বভৌম।—তোমার সকলই মিষ্ট লাগিতেছে। তোমাতে আজ যে ভক্তির উদয় দেখিলাম, নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তোমাতে ভগবানের বিশেষ কৃপা অবতীর্ণ হইয়াছে। অচিরে যে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি পরম সুবুদ্ধি হইয়া একটী অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ বলিয়া মনে হয়।

চৈতন্য। কি বিষয়, নিঃসঙ্কোচ চিত্তে বলুন।

সার্ব্বভৌম।—সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে কেন? বিবেচনা করিয়া দেখ, মাথা মুড়াইয়া স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইলে কি লাভ, লাভের মধ্যে আর কিছু হউক আর না হউক, প্রথমেই

অহঙ্কারটা বিলক্ষণ হইয়া থাকে। সন্ন্যাসী কাহারও নিকট মাথা হেঁট করেনা, অথচ মহাসম্মানিত ভক্তগনেরও প্রণাম লইতে ভয় করেনা। যদি বল মাধবেন্দ্রাদির ন্যায় মহা মহা ভক্তগণও তো সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাহারা তো কই অহঙ্কৃত হন নাই। তাহার উত্তর এই যে, তাঁহারা জীবনের শেষ ভাগে গ্রাম্যরস ভোগ করিয়া ও ঔদ্ধত্যকে বিনাশ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে আসিয়াছিলেন। তোমার নবীন যৌবন এ বয়সে তো সন্ন্যাসী হওয়া উচিত নয়।

শ্রীচৈতন্য বিনীত ভাবে বলিলেন "মহাশয়! আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া মনে করিবেন না, বাস্তবিক আমি সেরূপ কোন অভিপ্রায় লইয়া সন্ন্যাসী হই নাই। কৃষ্ণের বিরহে অস্থির হইয়া শিখা সূত্র ফেলিয়া দিয়া ঘরের বাহির হইয়াছি। অহঙ্কার বিনাশের জন্যই আমার শিখা সূত্র ত্যাগ। এখন আপনার নিকটে আমার এই প্রার্থনা যে যাহাতে আমার সন্ন্যাস ধর্ম্ম বজায় থাকে, সেরূপ উপদেশ দিবেন।

সার্ব্বভৌম বলিলেন, "আমাদের বাড়ীতে প্রত্যহ বেদান্ত পাঠ হইয়া থাকে, তুমি তাহা শুনিবে। সন্ন্যাসীর বেদান্ত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। আর আমার বাড়ীতে তোমাদের থাকিবার বড় সুবিধা হইবে না। আমার মাতৃস্বসার বাড়ী খুব নির্জ্জন স্থান, সেই খানে তোমাদের বাসা করিয়া দিব।" এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য গোপীনাথকে গৌরের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাজ্ঞানী পণ্ডিত, কিন্তু ভক্তি রাজ্যের কিছুই জানিতেন না। তাই তিনি গৌরের প্রকৃত মহত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া বাৎসল্য ভাবে তাহার আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য এত উপদেশ দিলেন। গোপীনাথ নিগূঢ়তত্ত্ব জানিতেন। তিনি কিছু না বলিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন এবং ভট্টাচার্য্যের মাসীর বাড়ীতে গৌরের বাসস্থানাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া কালের গতি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোপীনাথ আচার্য্যের সহিত জগন্নাথের শয্যোত্থান দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভবনে আসিয়া দেখিলেন, ভট্টাচার্য্য বেদান্ত পড়িয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাঁহার ছাত্রবৃন্দ মণ্ডলাকারে বসিয়া মনোযোগের সহিত শুনিতেছে। শ্রীচৈতন্যকে দেখিয়া সার্ব্বভৌম বলিলেন, "ভাল হইয়াছে, তুমি আসিয়াছ, সন্ন্যাসীর পক্ষে বেদান্ত শ্রবণ করা কর্ত্তব্য, তুমি সাবহিতে বেদান্ত শ্রবণ কর আর প্রতিদিন এই সময়ে পারায়ণ হইয়া থাকে, আমার অনুরোধ, তুমি প্রত্যহ আসিবে।" শ্রীচৈতন্য অতি বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন 'আপনি আমাকে যেরূপ স্নেহ করিতেছেন, তাহাতে আপনি যাহা বলিবেন, আমার পক্ষে তাহাই কর্ত্তব্য। এই বলিয়া মনোযোগ সহকারে বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনিতে লাগিলেন। সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল, চৈতন্যদেব প্রত্যহ নীরবে বেদান্ত শুনিলেন, অথচ ভাল মন্দ কিছুই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন না। অষ্টম দিনে সার্ব্বভৌম জিজ্ঞাসা করিলেন "সাত দিন পর্য্যন্ত বেদান্ত শুনিলে, কই কিছুই তো জিজ্ঞাসা করিলে না, কিছু বুঝিতে পারিতেছ কি না, জানিতে পারিলাম না।"

গৌর উত্তর করিলেন, আপনার আজ্ঞায় সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য ধর্ম্ম বলিয়া শুনিতেছি,

আমার বেদান্ত অধ্যয়ন নাই। সুতরাং আপনার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছি না।

সার্ব্বভৌম বলিলেন "যে বুঝিতে পারে না, তাহার তো জিজ্ঞাসা করা উচিত? তুমি সাত দিন পর্য্যন্ত শুনিলে, অথচ কোন প্রশ্নই করিলে না, কি জানি তোমার মনে কি আছে।"

গৌর এবারে লৌকিক বিনয় ছাড়িয়া কহিলেন "ব্যাসসূত্রের অর্থ অতি পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে, কিন্তু আপনার ব্যাখ্যায় সে অর্থ প্রকাশ পায় না। সূত্রের অর্থ সুস্পষ্ট করিয়া প্রকাশের জন্য ভাষ্যের প্রয়োজন, যদি সেই ভাষ্যে সূত্রার্থকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তবে ভাষ্যের প্রযোজন কি? আপনার ভাষ্যে মুখ্যার্থ ছাড়িয়া দিয়া গৌণার্থ কল্পনা করিতেছে।"

সার্ব্বভৌম অতীব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি প্রকারে?" গৌর বলিতে লাগিলেন "বেদান্তের উদ্দেশ্য ব্রহ্ম নিরূপণ করা। সেই ব্রহ্ম অতি বৃহৎ বস্তু. তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা জীবের জ্ঞানাতীত। তবে সৃষ্টিরাজ্যে তিনি যত টুকু আপনাকে প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, আমরা তাঁহার কৃপায় তাহারই অত্যল্প মাত্র বুঝিতে পরি। কিন্তু যে অনন্ত শক্তি, শুদ্ধ মুক্ত অনাবৃত অবস্থায় সৃষ্টাতীত হইয়া আছে, তাহারই নাম নির্ব্বিশেষ বা নিরাকার ব্রহ্ম, তাঁহার আমরা কি বুঝি?" সার্ব্বভৌম বাধা দিয়া বলিলেন, "সৃষ্টি তো মিথ্যা, অবিদ্যা বা মায়া বিজৃম্ভিত, মায়া ছুটিয়া গেলে জীব ও ব্রহ্ম একই। তিনি ভিন্ন কি জগতে আর কিছু আছে?"

গৌর। তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই সত্য, কিন্তু তাঁহারই ইচ্ছায় এই সৃষ্টি লীলা, এই হৃদয়-নিহিত আত্মজ্ঞান। কে বলিল, সৃষ্টি মিথ্যা বা কল্পিত জ্ঞান মূলক, সৃষ্টি কল্পনা নহে, তবে তাহা নশ্বর মাত্র।

সার্ব্বভৌম। তিনি ভিন্ন যদি জগতে আর কিছু নাই, তবে বল দেখি, সৃষ্টি জ্ঞান কল্পিত হয় কি না?

গৌর। কার কল্পনা, সকল কল্পনার অতীত যিনি, তাঁহাকে কি মিথ্যা জ্ঞানের আকর ভূমি বলিবেন?

সা। কখনই নয়।

গৌর। তাহা যদি না হইল, তবে একটু চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি এই কল্পনা জ্ঞান যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, সে ব্রহ্মের সহিত এক হইয়াও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হয় কি না?, আমরা তাহাকেই জীব বলি। এবং এই জীব সৃষ্টি রাজ্যে ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ।

সার্ব্বভৌম বিচক্ষণ পণ্ডিত। গৌরের এই সুযুক্তি পূর্ণ কথায় জীবতত্ত্ব যে ঈশ্বর তত্ত্বের সহিত অভিন্ন হইয়াও ভিন্নাত্মক, তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "আচ্ছা তাহাই না হয় হইল। কিন্তু তাহাতেও তো প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। তুমি যাহাকে সৃষ্টি লীলা বলিতেছ, কে বলিল, তাহা সত্য"?

গৌর। আত্মজ্ঞানই তাহার সাক্ষী। নানা বৈচিত্র পূর্ণ এই ব্রহ্মলীলা আত্মতত্ত্বেই নিহিত। ব্রহ্ম আপনিই লীলা রূপে বাহিরে, আত্মারূপে অন্তরে এবং ব্রহ্মরূপে সকলের মূলে। একের মধ্যে কি সুন্দর বৈচিত্র্যময় দ্বৈত ভাব ও দ্বৈত্যের মধ্যে কি অনির্ব্বচনীয় সামঞ্জসীভূত একত্ব। বলুন দেখি, ইহাতে কার না প্রাণমন গলিয়া যায়। এহেন ঐশ্বর্য্যময়, পরিপূর্ণ ভগবান্‌কে আপনি কোন্ সাহসে শুষ্ক নিরাকার নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বলিতে চান্।

সার্ব্বভৌম গৌরের ব্যাখ্যাতে মুগ্ধ হই-

লেন, কি বলিবেন স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন, "তবে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য নির্ব্বিশেষ বাদ কেন শিক্ষা দিলেন ?"

গৌর। কেন শিক্ষা দিলেন, জানি না, শুনিয়াছি, তিনি নাকি বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া মায়া-বাদ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজের মত অন্যরূপ ছিল। এই বলিয়া শ্রীচৈতন্য শঙ্করাচার্য্যের রচিত নিম্নোদ্ধৃত বচনটী ব্যাখ্যা করিলেন।

"যদ্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীয স্ত্বম্।
সামুদ্রোহি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রোর্ন তরঙ্গে।"

"হে নাথ। ভেদজ্ঞান অবগত হইলে যদিও সৃষ্টিতে ও তোমাতে প্রভেদ থাকেনা, তথাচ আমি তোমারই রচিত, তুমি কখনও আমার রচিত নও। সমুদ্রেরই তরঙ্গ হইয়া থাকে, তরঙ্গের কখন সমুদ্র হয় না।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন, তাহাই যেন হইল। কিন্তু শ্রুতিতেও নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ রহিয়াছে।

গৌর উত্তর করিলেন, যেমন নির্ব্বিশেষ তত্ত্বের উল্লেখ আছে, তেমনি সবিশেষ তত্ত্বের কথাও আছে। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান ধরিয়া বুঝিতে গেলে, শাস্ত্রের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় না। সমগ্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও অভিপ্রায় বুঝাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। শ্রুতি যেমন বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ, হস্ত পদাদি শূন্য, তাঁহার ইন্দ্রিয় নাই, নাম রূপ উপাধি বিহীন, নীল লোহিতাদি বর্ণ বিহীন, শুদ্ধ সত্ত্বা চৈতন্য ময়, তেমনি অনেক স্থানে বলিয়াছেন, তিনি তেজোময়, অমৃতময়, রসস্বরূপ, পরমসুন্দর, সহস্র সহস্র তাঁহার মস্তক, সহস্র সহস্র তাঁহার হস্ত পদ ? তিনি সর্ব্বত্রগামী, সকলই গ্রহণ, দর্শন ও শ্রবণ করেন। সচ্চিদানন্দরূপ, ন্যায় বান্ বিধাতা, পরম পুরুষ, পরমাত্মা, ইহার প্রকৃত তত্ত্ব এই বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টাতীতে তিনি নির্গুণ নির্ব্বিশেষ, আর সৃষ্টি সম্বন্ধে সবিশেষ সগুণ, পরম পুরুষ ভগবান্। আমরা সৃষ্টি সম্বন্ধীয় জীব, সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্বে প্রকাশিত ব্রহ্ম স্বরূপেই আমাদের বিশেষ অধিকার।

সার্ব্বভৌম গৌরের তত্ত্বজ্ঞানের গভীরতা অনুভব করিয়া, পূর্ব্বে তাঁহাকে বালক সন্ন্যাসী জ্ঞানে যেরূপ উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, সেভাব আর রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির উদয় হইল। ভট্টাচার্য্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "তবে কি সৃষ্টিকার্য্যের সহিত ব্রহ্মের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, তাঁহার সৃষ্ট প্রকৃতিই সব করিতেছে, তবে আর তাঁহার বিধাতৃত্ব মানিবার প্রয়োজন কি ?"

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, বিধাতৃত্ব না মানিলে চলিবে কেন ? সৃষ্টি লীলার মধ্যেই তো বিধাতৃত্ব, "যাহা হইতে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাহাদ্বারা সুরক্ষিত হয় এবং অবশেষে যাহাতে লয় হইয়া যায়," এই যে ব্রহ্ম লক্ষণ বেদে নিরূপিত হইয়াছে, ইহাতেই তো তাঁহার বিধাতৃ শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন পালন লয় যিনি করিতেছেন, তাঁহাকে বিধাতা বলিবেন না কেন ?

সার্ব্বভৌম এরূপ তর্ক যুক্তি পূর্ব্বে আর কখন শুনেন নাই। তিনি আজন্ম মায়াবাদী, ভাষ্য পড়িয়া মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদকেই ব্রহ্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণে চরম সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, অন্যদিকে তাঁহার চিন্তা

শ্রোত কখন আকৃষ্টই হয় নাই। এক্ষণে গৌরের নিকট এই কথা শুনিয়া, তাঁহার অন্তরে আর এক চিন্তাজাল খুলিয়া গেল ও নানা তত্ত্ব জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা তাঁহাকে না হয় বিধাতা বলিয়াই মানিলাম, কিন্তু তাঁহার শক্তি অনন্ত, কোথায় কোন্ ভাবে কি প্রকারে তাঁহার শক্তি কার্য্য করিতেছে, আমরা তাহার কি জানি? দয়া, করুণা, শান্তি, পবিত্রতা, কামক্রোধাদি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, ইচ্ছা, ভৌতিক, জৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আরও কত অজ্ঞেয় শক্ত্যাদি সকলই তো তাঁহার শক্তি, ইহাদিগের আবার অনন্ত বৈচিত্র্য, অনন্ত বিভেদ, অনন্ত সমাবেশ, এসব ভাবিতে গেলে আত্মহারা হইতে হয়, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারা যায়না। সে অবস্থায় শক্তিমানের পার্থক্য কিরূপে বুঝিব, শক্তি হইতে কি তিনি ভিন্ন?

গৌর বলিলেন, শক্তিতত্ত্বে তাঁহার প্রকাশ, কিন্তু শক্তি ও তিনি এক নহেন। শক্তি হইতে তাঁহাকে অভিন্নাত্মক মানিতে গেলে আবার নির্ব্বিশেষ তত্ত্বেই আসা গেল, প্রশ্নের মীমাংসা কিছুই হইলনা। প্রথমে আপনি যে নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সে না হয় সত্তা নির্ব্বিশেষ, আর এ শক্তি নির্ব্বিশেষ। ফল একই রূপ, উপাসনা তত্ত্ব কি কর্ম্মের দায়িত্ব, ইহার কোনটীই সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু তাঁহাকে যদি সকল শক্তির কেন্দ্র স্থান বলিতে পারা যায়, তবে মীমাংসার বিষয় সুখসাধ্য হয়। সূর্য্যের একটী একটী কিরণকে যেমন সূর্য্য বলা যায় না, তাহা সূর্য্যের অত্যল্প প্রকাশ মাত্র, তেমনি ব্রহ্মের এক একটী শক্তিকে ব্রহ্ম বলা অযৌক্তিক, সে সব শক্তিতে ব্রহ্মের প্রকাশ মাত্র।

সার্ব্বভৌম। তাঁহাতে তবে কোন শক্তি কিরূপে লীলা করিতেছে, তাহা কেমন করিয়া বুঝিব?

চৈতন্য। পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি, অনন্তের অনন্তশক্তি জীবের বোধাতীত, সৃষ্টি রাজ্যে তাঁহার যত শক্তি প্রকাশ হইয়াছে, তাহাও কেহ সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তবে আত্ম-তত্ত্বে তাঁহার প্রকাশ; যাহার যেমন জ্ঞান ও অধিকার, শাস্ত্র ও গুরু উপদেশে যে যতদূর আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, সে তত টুকুই জানিতে পারে। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অনন্ত অচিন্ত্য শক্তির মধ্যে তিনটী প্রধান চিচ্ছক্তির বিষয় আমরা জানিতে পারি। তিনি যে সৎবস্তু অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমানাবস্থায় নিত্য কাল আছেন, এই শক্তির নাম সন্ধিনী, ইহাতেই দিকদেশকাল সমস্ত সৃষ্টি প্রকাশিত। তিনি কিছু অচৈতন্য জড় বস্তু নহেন, চিরজীবন্ত জাগ্রত পুরুষ, এই শক্তিকে সম্বিত শক্তি বলা যাইতে পারে। আর ব্রহ্মের যে শক্তিতে প্রেম, আনন্দ আশ্রিত, তাহার নাম হ্লাদিনী শক্তি। এই তিন শক্তিকেই অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি বলা যায়। উহা ব্রহ্ম স্বরূপে চির প্রকাশিত। আর জীব শক্তি তটস্থা, উহা কেবল সৃষ্টি কালেই ব্রহ্ম স্বরূপে প্রকাশিতা হইয়া থাকে, সৃষ্ট্যান্তে নিদ্রিতাবস্থায় থাকে। অবশেষে মায়া শক্তি বহিরঙ্গা, তাহা ব্রহ্ম হইতে প্রকাশ হইয়া ব্রহ্ম রূপকে স্পর্শ অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বরূপের উপর আধিপত্য বিস্তার না করিয়া দূরে থাকে। সৃষ্টি লীলার উপরই ইহার প্রভাব। ইহার অর্থ এই যে, সচ্চিদানন্দ পুরুষের সৎ, চিৎ, আনন্দ শক্তি তাঁহার ইচ্ছায় অতি অপূর্ণ রূপে সৃষ্টিতে প্রকাশিত হইয়াছে, এই অপূর্ণ শক্তি হইতে অপূর্ণ জ্ঞান, আবার অপূর্ণ জ্ঞানেই ভ্রান্তি বুদ্ধি। ইহারই নাম মায়া। সুতরাং মায়ার প্রভাব

ব্রহ্মের স্বরূপে থাকিতেই পারে না। মায়াবাদ ভাষ্যে মায়াকে অবস্তু বলা হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে ইহা অবস্তু নয়, অসম্পূর্ণ জ্ঞান মূলক মাত্র। এমন যে ঐশ্বর্য্যময় ভগবত্তত্ত্ব, ইহাকে আপনি কোন্ সাহসে নিঃশক্তি নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বলিতে চাহেন? যে প্রভুর ঐশ্বর্য্যের অন্ত নাই, প্রেমের অন্ত নাই, জ্ঞানের অন্ত নাই, যাঁর চিচ্ছক্তিবিলাস ভক্ত হৃদয়ে কত সুখ-তরঙ্গ তুলিয়া দেয়, যিনি মায়া কল্পনার অতীত, আপনি কোন্ প্রাণে তাঁহাকে মায়ামুগ্ধ জীবের সহিত অভেদ বলিতে সাহস করেন?

সার্ব্বভৌম। তবে তাঁহার রূপ কি?

চৈতন্য। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়, লীলাবিলাসী। পূর্ণানন্দ বিগ্রহ কল্পনার বিষয় নয়, প্রত্যক্ষ-সাধ্য। শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত পাষণ্ডী। বুদ্ধ বেদ মানে নাই বলিয়া তাহাকে নাস্তিক বলিয়া থাকেন, আর শ্রীবিগ্রহ না মানিলে যে ভাষণতর নাস্তিকতায় লইয়া যায়, তাহা দেখিতেছেন না কেন? এক আপত্তি করিতে পারেন যে, বিকার না হইলে সৃষ্টি হয় না, ঈশ্বর কি তবে বিকারী হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন? এ আপত্তি অতি অকর্ম্মণ্য। অচিন্ত্য অভাবনীয় শক্তি যাঁহার, তিনি কি সৃষ্টি করিয়াও অবিকারী থাকিতে পারেন না? মণির কথা কি শুনেন নাই, স্বর্ণ প্রসব করিয়াও যেমন মণি তেমনি অবস্থায় যদি থাকিতে পারে, তবে বিচিত্র কর্ম্মা ভগবান্ কি সৃষ্টি সত্ত্বেও মায়াতীত থাকিতে পারেন না। ভ্রান্তি জ্ঞান মূলক বিবর্ত্তবাদ মত কোন মতেই টিকিতে পারে না।

সার্ব্বভৌম অনেক বিচার বিতণ্ডা করিয়াও গৌরের সূক্ষ্ম যুক্তির নিকট পরাস্ত হইলেন। শ্রীচৈতন্য অবশেষে ভট্টাচার্য্যকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ভগবানের সহিত আমাদের চিরসম্বন্ধ, ভক্তি সেই সম্বন্ধ জ্ঞান বুঝাইয়া দেয়, আর প্রেমই প্রয়োজন, অর্থাৎ মানবজীবনের উদ্দেশ্য। ধর্ম্মের যদি কিছু উদ্দেশ্য থাকে, তবে তাহা প্রেম। বেদ বাক্যে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায়। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য অবাক্ হইয়া শুনিতেছিলেন দেখিয়া গৌর বলিলেন "ভট্টাচার্য্য, বিস্মিত হইও না, ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ, আত্মারাম মুনিগণও ভগবানে ভক্তি করিয়া থাকেন। এই বলিয়া তিনি ভাগবতের পশ্চাল্লিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিলেন।

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে,
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীংভক্তিমিত্থংভূত গুণোহরিঃ।"

ভগবানের এতাদৃশ গুণ যে, যাঁহারা আত্মারাম ঋষি ও মৌনব্রতাবলম্বী, যাঁহাদের সমস্ত হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহারাও তাঁহাকে অহেতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এই শ্লোক শুনিয়া বলিলেন "এই শ্লোকের অর্থ শুনিতে আমার বড় বাঞ্ছা, কৃপা করিয়া আপনি এই শ্লোকটী ব্যাখ্যা করুন্।"

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, আপনি মহা পণ্ডিত, আপনি আগে ব্যাখ্যা করুন্ শুনি, পরে আমি যা জানি, বলিব।

সার্ব্বভৌম তখন আপনার পাণ্ডিত্য বলে শ্লোকের নয় প্রকার অর্থ করিলে চৈতন্য প্রভু, "আপনার এ ব্যাখ্যা ব্যতীত শ্লোকের আরও অভিপ্রায় আছে" বলিয়া শ্লোকের একাদশ পদের সহিত আত্মারাম শব্দ মিলাইয়া অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে সার্ব্বভৌমের ব্যাখ্যার একটীও ছুঁইলেন না। গৌরের ব্যাখ্যার

মুধ্যা তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের শক্তি ও গুণের অচিন্ত্য প্রভাবে শুকসনকাদি সিদ্ধসাধকগণও মুগ্ধ হইয়া যান, অন্যের কি কথা। তখন ভট্টাচার্য্য পরম বিস্মিত হইয়া পূর্ব্বে চৈতন্য প্রভুকে বালক বলিয়া যে উপেক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার জন্য মর্ম্ম বেদনা পাইলেন এবং আপনার মূর্খতাকে ধিক্কার দিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর বোধে স্তবস্তুতি করিয়া শরণাপন্ন হইলেন। কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেব তখন ভট্টাচার্য্যের প্রতি কৃপা করিয়া প্রথমে চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ ও পরে দ্বিভুজ মুরলীধর রূপ দেখাইয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সার্ব্বভৌমের তখন দিব্য জ্ঞান লাভ হইল এবং নাম, প্রেম ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি সকল বুঝিতে পারিয়া এক দণ্ডের মধ্যে এক শত শ্লোকে চৈতন্যস্তব রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ও প্রেমে উন্মত্ত হইয়া হাসিতে, কাঁদিতে, নাচিতে নাচিতে শ্রীচৈতন্যের পদ ধরিয়া বলিলেন, "প্রভো! ধন্য তোমার শক্তি, তর্ক শাস্ত্র পড়িয়া পড়িয়া আমার হৃদয় লৌহ পিণ্ডের ন্যায় কঠিন ছিল, তাহাতেও যখন প্রেমভক্তি দিয়া গলাইয়া দিলে, তখন জগৎ উদ্ধার করা তোমার পক্ষে অতি সামান্য ব্যাপার বলিতে হইবে। গোপীনাথ আচার্য্য পূর্ব্ব হইতেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এক্ষণে সুযোগ পাইয়া মহাপ্রভুকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, সেই ভট্টাচার্য্যের তুমি কি অবস্থা করিলে?" গৌর বলিলেন "তুমি ভক্ত, তোমার সঙ্গ গুণে জগন্নাথ দেব ইঁহাকে বিশেষ কৃপা করিলেন।"

পরদিন অরুণোদয়কালে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য জগন্নাথ দর্শন করিয়া ও পূজারী প্রদত্ত মালা মহাপ্রসাদ লইয়া সার্ব্বভৌম ভবনে আসিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর আগমন বার্ত্তা পাইয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া তাঁহার বন্দনা করিয়া বসাইলে গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌমের হাতে মহাপ্রসাদান্ন দিলেন; ভট্টাচার্য্যের তখন স্নান, সন্ধ্যা, দন্ত ধাবনাদি প্রাতঃকৃত্য না হইলেও তৎক্ষণাৎ সেই প্রসাদান্ন ভক্ষণ করিয়া বলিলেন "শুষ্কই হউক, আর পর্য্যুসিতই হউক, অথবা বহুদূর দেশ হইতে আনীতই হউক, মহাপ্রসাদ পাইলেই ভোজন করিবে, কালাকাল বিবেচনা করিবে না।" এই কথা শুনিয়া গৌরের আনন্দের সীমা থাকিল না। তিনি ভট্টাচার্য্যকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। স্বেদ, কম্প, অশ্রুতে উভয়েই ভাসিতে লাগিলেন।

তখন প্রেমাবিষ্ট গৌরচন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "আজ আমি ত্রিভুবন জয় করিলাম, আজ আমার নিকট বৈকুণ্ঠের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, আজ আমার সকল অভিলাষ পূর্ণ হইল। ভট্টাচার্য্য বেদ ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া মহাপ্রসাদ খাইলে, ইহার চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে? আজ তুমি নিষ্কপটে শ্রীকৃষ্ণ চরণ আশ্রয় করিলে, আজ তোমার ভববন্ধন ছিন্ন হইল, মায়া বিদূরিত হইল। না হ'বে কেন? যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবচ্চরণাশ্রয় করেন, স্বয়ং ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাদের মায়া হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন।" সেই হইতে ভট্টাচার্য্যের পাণ্ডিত্যাভিমান দূরে গেল, শুদ্ধাভক্তির উদয় হইল। তিনি এখন হইতে ভক্তি শাস্ত্র বিনা অন্য শাস্ত্রের আলোচনা ছাড়িয়া দিলেন।

সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরাঙ্গকে সাধনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি নাম সংকীর্ত্তনই পরম সাধন উপদেশ দিয়া বলিলেন, "আপনাকে

তৃণ হইতেও নীচ বিবেচনা করিয়া ও তরু হইতেও সহিষ্ণু হইয়া নাম সাধন করিতে হইবে, নইলে নাম গুণ স্ফুরিবে না। মান, অভিমান, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, বুদ্ধি, ধন, জন সম্পদ সকলই প্রভুর চরণে অর্পণ করিয়া নাম সাধন করিতে হইবে।" সার্ব্বভৌম ভাগবতের একটী শ্লোকের শেষ পদে 'মুক্তিপদ' স্থানে 'ভক্তিপদ' পাঠ ফিরাইয়া আবৃত্তি করিলেনঃ—

'তত্তেঽনু কম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো,
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং ;
হৃদ্ বাগ্বপুর্ভির্ব্বিদধন্নমস্তে
জীবেতয়ো ভক্তিপদে সদায়ভাক্, ॥

হে প্রভো। তোমার কৃপা কবে হইবে? এই আশাপথ প্রতীক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি অনাসক্ত চিত্তে স্বীয় কর্ম্ম ফল ভোগ করিয়া জীবন ধারণ করেন, তিনিই উত্তরাধিকারের ন্যায় তোমার ভক্তি পদে দায়াধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন 'মুক্তিপদ' পাঠ পরিত্যাগ করিয়া 'ভক্তিপদ' বসাইলে কেন?

ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন "ভগবদ্ভক্তি বিমুখের মুক্তি তো পুরস্কার নয়, দণ্ড স্বরূপ। কারণ সে ঈশ্বরের সাযুজ্য পাইয়া লীন হইয়া যায়, সেবা সুখাদির অধিকার পায় না। ভক্ত সেবা ব্যতীত মুক্তি চাহেন না। ব্রহ্ম সাযুজ্য তাঁর নিকট ঘৃণার সামগ্রী। সুতরাং এমন স্থলে মুক্তিকে দায়াধিকার করিলে ভক্তের প্রতি অন্যায় করা হয় কিনা?

চৈতন্য বলিলেন, মুক্তি পদের যে ব্যাখ্যা করিলে, তাহা ছাড়া উহার অবাস্তব অর্থ আছে। মুক্তিপদ, বলিতে স্বয়ং ভগবান্‌কে বুঝায়। বহুব্রীহি সমাস কর না কেন?

সার্ব্বভৌম। তবু ও পাঠ লইতে পারি না। কারণ উহা দ্ব্যর্থ দোষযুক্ত। মুক্তি শব্দটা শুনিতেই ভক্তের ঘৃণা ও ত্রাস জন্মে। ভক্তি শব্দ বলিলে কেমন আনন্দ হয়।"

চৈতন্য দেব এই কথায় আনন্দে হাসিতে লাগিলেন। নগরে রাষ্ট্র হইয়া গেল, মায়াবাদী পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য চৈতন্য কৃপায় পরম ভক্ত হইয়াছেন। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, "লোহাকে স্পর্শ না করাইলে স্পর্শ মণির গুণ টের পাওয়া যায় না। যখন কঠোর জ্ঞানী সার্ব্বভৌমের ভক্তি লাভ হইল, তখন ইনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, সন্দেহ নাই।" সেই হইতে উৎকল রাজের অভীষ্ট দেব কাশীমিশ্র ও নীলাচলের প্রধান প্রধান লোক শ্রীচৈতন্যের শরণাপন্ন হইল। তাঁহার যশে চারিদিক্ পূর্ণ হইয়া গেল।

ইহার পর একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য জগদানন্দ ও দামোদর পণ্ডিতকে নিজ বাটীতে ডাকিয়া মহাপ্রভুর জন্য উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ দিলেন এবং স্বরচিত দুইটী শ্লোক একখানি তালপত্রে লিখিয়া জগদানন্দের হাতে দিয়া বলিলেন "প্রভুকে দিও"। দুই জনে প্রসাদ ও পত্রী লইয়া বাসায় প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, মুকুন্দ দত্ত দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি জগদানন্দের হাত হইতে পত্রীখানি লইয়া পাঠান্তে বাহিরের ভিতের গায়ে শ্লোক দুইটী লিখিয়া রাখিলেন। পরে জগদানন্দ পত্রী লইয়া মহাপ্রভুকে দিলে তিনি পাঠ করিয়া বিরক্তি সহকারে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কিন্তু ভক্তগণ ছাড়িবার পাত্র নহেন, তাহারা ভিত্তির লিখিত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া কণ্ঠস্থ করিলেন, ও সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া দিলেন। শ্লোক দুইটী এই :—

"বৈরাগ্য বিদ্যা নিজ ভক্তি যোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ;
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরীরধারী
কৃপাম্বুধি র্য স্তমহং প্রপদ্যে।"
"কালান্নষ্টং ভক্তি যোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণ চৈতন্য নামা
আবির্ভূত স্তস্য পদারবিন্দে,
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ।"

যে অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষ, বৈরাগ্য বিদ্যা ও ভক্তি যোগ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রূপে দেহধারী হইয়া প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই কৃপানিধির আমি শরণাপন্ন হই।

কাল দোষে নষ্ট নিজ ভক্তি যোগ প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম ধারী হইয়া যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পদারবিন্দে চিত্তভৃঙ্গ গাঢ় রূপে অধিষ্ঠান করুক্।

কথা কিছু অসংলগ্ন হইয়া উঠিল। গৌরের অসামান্য প্রতিভা ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানময়ী শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনিয়া পরাজিত ও মুগ্ধ হইয়া যিনি ষড়্ভুজ দেখিতে পাইলেন ও ঈশ্বর জ্ঞানে শত শ্লোকে গৌরচন্দ্রের কতই স্তব করিলেন, তাঁহার রচিত উপরোক্ত শ্লোক দুইটী দেখিয়া চৈতন্য দেব বিরক্তি সহকারে কেন ছিঁড়িয়া ফেলাইলেন, তাহা বুঝা যায় না। পত্র ছিঁড়িয়া ফেলায় যদি কিছু অর্থ থাকে ত সে এই যে, উহাতে গৌরকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। গৌরচন্দ্র আপনাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিচয় দিতে ঘৃণা করেন। কিন্তু যদি তিনি ঘৃণা করিয়া পত্রই ছিঁড়িয়া থাকেন, তবে পূর্ব্বে শত শ্লোকে আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া বর্ণনা করিতে অনুমোদন করা সম্ভব হয় না। আর যিনি ঈশ্বরাবতার রূপে বর্ণিত হইতে সঙ্কুচিত হন, তিনি ঈশ্বর পরিচায়ক ষড়্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন, ইহাও অসম্ভব কথা।

তাইতে মনে হয়, ষড়্ভুজ রূপ প্রদর্শন ও ঠিক্ সেই সময়ে সার্ব্বভৌমকৃত শতক রচনা অতিরিক্ত বর্ণনা। পরবর্ত্তী কালে সার্ব্বভৌম শতক রচিত হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। যাহা হউক, চৈতন্য ভক্তগণ বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত শ্লোক দুইটী ভক্তের কণ্ঠমণিহার; ইহাতে সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঢক্কা বাদ্যের ন্যায় বিঘোষিত হইয়াছে।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

ইউরোপীয় মহাদেশ। [১]

(Continent)

৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮৮৯। আমরা তিন জন ভারতবাসী বেলা ১টার সময় রেলযোগে লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া ডোভারাভিমুখে (Dover) যাত্রা করিলাম। অনেক বিখ্যাত পর্য্যটক বলেন, লণ্ডন ও ডোভারের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের ন্যায় সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীর আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বাস্তবিক, সমতল শস্য-শোভিত ক্ষেত্র, উদ্যান ও হরিত বর্ণ তৃণাচ্ছাদিত মখমলের ন্যায় কোমল ও পরিষ্কার ভূমিখণ্ড, এরূপ অবিচ্ছিন্ন একটানা ভাবে আর কোথাও দেখি নাই। নিয়মিত সময়ে ডোভরে পঁহুছিয়া তথায় ৭।৮ ঘণ্টা কাল অব-

স্থিতি করত রাত্রি ১০টার পর প্রণালী (Strait of Dover) পার হইবার জন্য জাহাজে উঠি। ডোভর (Dover) ও ক্যালের (Calais) মধ্যে সমুদ্র ২৫ মাইল মাত্র পরিসর। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট তারিখে সুবিখ্যাত সন্তরক ওয়েব সাহেব (Captain Webb) পূর্ব্বাহ্ণ ১০টা ৪ মিনিটের সময় আরম্ভ করিয়া ২১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে এই ১২॥ ক্রোশ সাঁতরাইয়া পার হন।

প্রায় ২ ঘণ্টাকাল জাহাজে কাটাইয়া রাত্রি দুই প্রহরের পর ক্যালে বন্দরে পঁহুছিলাম। ডোভার হইতে ক্যালে উপস্থিত হইলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, ইংলণ্ডের ও ফ্রান্সের বায়ুতে কত খানি প্রভেদ। ঐ টুকু প্রণালী, দুই প্রতিবেশী জাতিকে বিভিন্ন প্রকৃতি করিয়া রাখিয়াছে। ধীর শান্ত অবিচলিত ইংরেজ সমাজ হইতে ঝুপ করিয়া সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, শিথিল ভাবাপন্ন, কোলাহলময় ফরাসি রাজ্যে উপনীত হইলে, সহজেই তারতম্য উপলব্ধি হইবার কথা। লাটিন জাতি মাত্রে (পোর্ত্তুগিজ, স্পেনীয়, ফরাসি, ইতালীয়) অনেকটা আমাদের মত উচ্ছ্বাসাধীন (emotionally effusive)। ডোভরে যেমন চুপচাপ, ক্যালেতে তেমনি হট্টগোল। এমন কি, নবাগত জন বুল পর্য্যন্ত মাটীর গুণে কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত। আট্‌লান্টিক সাগরে ভাসমান এই ক্ষুদ্র দ্বীপ টুকুর যে কি মহিমা, প্রত্যক্ষ না দেখিলে বুঝা কঠিন।

গাড়ীতে উঠিয়া দেখি, দুই কোণে দুই জন ফরাসি ভদ্রলোক চারি জনের জায়গা জুড়িয়া হাত পা ছড়াইয়া নাক ডাকাইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। গাড়ী ছাড়িল। গাড়ীতে দুই জন মাত্র ইংরেজ, আর কেহ বুঝিতে না পারে, এই জন্য এক জন ঘুমন্ত ফরাসিকে লক্ষ্য করিয়া অপর ব্যক্তিকে হিন্দিতে বলিলেন, "জারা উন্‌কো তো দেখিয়ে যো কি কোণে মে বয়ঠে হ্যায়।" এই কথায় আমরা তিন জনে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ করিলে, সম্বোধিত সাহেব, আমাদের সহিত আলাপ আরম্ভ করিলেন। তখন আমরা পাঁচ জন যে এক দেশের লোক, পরস্পরের মধ্যে এই ভাব সংস্থাপিত হইল। কথাবার্ত্তায় জানা গেল, তিনি ব্রহ্ম দেশে জঙ্গল বিভাগে চাকরি করেন, অন্য জন ভারতে কাজ করেন, বোধ হইল সিবিলিয়ান, কারণ অপেক্ষাকৃত গম্ভীর প্রকৃতি, কেবল ফ্রান্সের হাওয়ায় ও আমাদিগকে ঠিক চিনিতে না পারিয়া ওরূপ বলিয়া ফেলিয়াছেন। কোন প্রকারে রাত্রি যাপন পূর্ব্বক প্রাতঃকালে পারিসে (Paris) উপস্থিত হইলাম। মাসাধিক পারিসে বাস করিয়া প্রদর্শনী (Universelle Exposition) ও নগরের যাহা দেখিলাম, তাহা সম্যক দূরে থাকুক, কিয়ৎপরিমাণে বর্ণনা করাও আমার পক্ষে অসাধ্য ব্যাপার। যাহা হউক, যতটুকু পারি, নিম্নে ব্যক্ত করিতেছি।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে পারিস নগরে স্থানীয় দ্রব্য জাতের প্রথম প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পর ফ্রান্সে ১২টী প্রদর্শনীর ক্রমান্বয়ে অধিষ্ঠানের পর ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের পারিস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে সমগ্র পৃথিবীর সামগ্রী প্রথম একত্রিত হয়। ২৩ বৎসর পরে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সুবৃহৎ ট্রোকাডেরারো গোল ঘর (Trocadero) নির্ম্মাণ সহ আর একটী উচ্চ শ্রেণীর প্রদর্শনীর পরে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ এই মহামহা প্রদর্শনী। বিগত শত বৎসরে ফ্রান্স, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সভ্য জগৎ সর্ব্ববিধ উন্নতির সোপানে কতদূর উঠিয়াছে, ইহা তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে

নিঃশব্দে ধীরে ধীরে আরম্ভ হইয়া ১৪ই জুলাই তারিখে অদম্য মনবলের (moral strength) বিপুল তেজের সহিত পারিসের দুর্ভেদ্য খাশ রাজ কারাগার, ভুবন-বিখ্যাত বাস্তীল (Bastille) ধ্বংস পূর্ব্বক, জীবন্ত ভাবে প্রকাশ পাইয়া, ইউরোপীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক জগতে মৌলিক পরিবর্ত্তন আনয়ন দ্বারা নব-জীবন সঞ্চারকারী ফরাসি বিপ্লব যথেচ্ছাচার রাজশক্তির মূলে দারুণ কুঠারাঘাত করে। সেই চিরস্মরণীয় ঘটনার শত বার্ষিক উৎসব এই সার্ব্বজনীন প্রদর্শনী, এবং তাহার স্মরণ চিহ্ন উহার শিরোভূষণ এই বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ 'লা তুর এফেল' (La Tour Eiffel)। ৬ খণ্ডে বিভক্ত সমগ্র প্রদর্শনী ২২টী ফটক সহ ১৭৩ একর জমি ব্যাপিয়া বিরাজমান, উত্তরাংশে এফেল স্তম্ভ।

এফেল স্তম্ভ।

এফেল স্তম্ভঃ—ইহার সহিত পৃথিবীর অন্যান্য অংশের উত্তুঙ্গ স্তম্ভহর্ম্ম্যাদির তুলনাই হয় না। নিম্নের তালিকার দ্বারা উহার ভয়নাক উচ্চতা কতক উপলব্ধি হইবে।

পারিসের	এফেল স্তম্ভ	(Eiffel Tower)	৬৫৭ হাত উচ্চ।
আমেরিকার	ওয়াশিংটন স্তম্ভ	(Washington Column)	৩৭০ „ „
জর্ম্মণির	কোলোন গির্জ্জা	(Cologne Cathedral)	৩৪৮ „ „
ফ্রান্সের	রোয়েন গির্জ্জা	(Rouen Cathedral)	৩৩২ „ „
মিসরের	প্রধান পিরামিড	(Great Pyramid)	৩১৯ „ „
জর্ম্মণির	ষ্ট্রাসবর্গ গির্জ্জা	(Strasburgh Cathedral)	৩১০ „ „
রোমের	সেণ্ট পিটর	(St Peter's Church)	২৯০ „ „
লণ্ডনের	সেণ্ট পল গির্জ্জা	(St. Paul's Church)	২৬৯ „ „
পারিসের	ইনভালিড্‌স	(Invalides)	২৩১ „ „
দিল্লীর	কুতুব মিনার	(Kutub Minar)	১৫৯ „ „
পারিসের	নটর ডাম গির্জ্জা	(Notre-Dame)	১৫০ „ „
„	প্যান্থিয়ন	(Pantheon)	১১৬ „ „
কলিকাতার	মনুমেণ্ট	(Ochterlony Monument)	১১০ „ „

পারিসের এফেল স্তম্ভ কুতুব মিনার অপেক্ষা চারিগুণ ও কলিকাতার মনুমেণ্ট অপেক্ষা ছয়গুণ উচ্চ, কি ভয়ানক ব্যাপার। ইহার নির্ম্মাণে ১৮২০০০ মণ লৌহ, আড়াই লক্ষ পাউণ্ড অর্থ, বিপুলমস্তিষ্ক মহাত্মা এফেলের অঙ্কবিদ্যা ও ইঞ্জিনিয়ারি, এবং কত শত লোকের নিরত আড়াই বৎসর কাল-ব্যাপী মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম ব্যয় হইয়াছে। (১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি ভিত্তিস্থাপন হয়, এবং ১লা মে ১৮৮৯ সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হয়)। ভিন্ন মাপ ও গঠনের ১২ হাজার খণ্ড লৌহ ৭০ লক্ষ ছিদ্রে ২৫ লক্ষ পেরেক দ্বারা জোড়া হইয়াছে। পরস্পরের সহিত ঋজু ও পরিমাণ মত ছিদ্র গুলি করিতে এবং ঠিক উহাদের প্রমাণ পেরেক, স্ক্রুপ গজালাদি গড়িতে যে কিরূপ উচ্চশ্রেণীর কারিগরি ও হিসাব কিতাব আবশ্যক হইয়াছে, তাহা অব্যবসায়ী দর্শক সহজে বুঝিতে পারেন

না। তার পর, ঝড় বাতাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য এমন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সাজাইয়া গাঁথিয়া তুলিতে হইয়াছে যে, দশ দিকের যে দিক হইতে তুমুল তুফান আসুক না কেন, কোন অংশে একটুও ধাক্কা না লাগাইয়া কেবলমাত্র গায়ে হাত বুলাইয়া চলিয়া যাইবে। যত গুলি পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে, এক থোকে বিন্যস্ত করিতে পারিলে ী হইতে চূড়ায় গিয়া ঠেকে। সুতরাং সব রকমে সুধীরব একেল মহাত্মা একটী সুবর্ণ স্তম্ভ খাড়া করিয়াছেন।

গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত ১৭৯২ ধাপের গোলসিঁড়ি। অনেকে পদ ব্রজে উঠিতেছেন, কিন্তু অধিকাংশ কলের (lift) দ্বারা উন্নীত হইয়া দুই প্রকার আমোদ সম্ভোগ করিতেছেন। তিন থাকে তিনটী কল, সুতরাং তিনবার তিন স্থানে প্রবেশ ও বাহির হইতে হয়। এত ভিড় যে প্রত্যেক স্থানে দেড়, দুই ঘণ্টা উমেদারী না করিলে কলে প্রবেশ করিতে পাওয়া দুষ্কর।

মাটী হইতে ১২২ হাত উচ্চে ১১০ হাত পরিসরের ৪টী প্রকাণ্ড খিলানের উপর প্রথম তালা * স্থাপিত। প্রথম তালা একখানি গণ্ডগ্রাম বলিলে চলে,—৪টী হোটেল (Restaurant), প্রত্যেকটীতে ৪০০ লোক বসিয়া খাইতে পাবে, এমন ব্যবস্থা। ৪টী বাহিরের খণ্ডে (Gallery) এক হাজার করিয়া লোক বেড়াইতে পাবে। দুই হোটেলের মধ্যবর্ত্তী প্রত্যেক খণ্ডে ৪০০ লোক ধরে। এই হিসাবে প্রথম তালায় অনায়াসে ৬৪০০ লোকের সমাবেশ হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন মল মূত্র ত্যাগের স্থান, অনেক গুলি দোকান এবং ডাকঘর ও তার আপিস এই থাকে স্থাপিত। এখান হইতে চারিদিকের দৃশ্য অতি মনোরম, বিশেষ সন্ধ্যার পর দক্ষিণদিকস্থ নীচেকার ভূমি খণ্ডের ছবির নিকট পরীস্থান পরাস্ত মানে,—নানা বর্ণের মনোহর পুষ্পাদি শোভিত, উজ্জল হরিদ্বর্ণ, সুকোমল তৃনাচ্ছাদিত মাটীতে ঘাসের উপর খুব কাছে কাছে সাজান বৈদ্যুতিক আলোক মালা-পরিবেষ্টিত,নবীন শয্যার ন্যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছক-কাটা ভূমি, চারিদিকে বহুবিধ বহু সংখ্যক, প্রকাণ্ড, মধ্যম, ছোট পুত্তল সুরুচি অনুযায়ী স্থাপিত, তন্মধ্যে আসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, সহচর, সহচরী, সাজ সরঞ্জম সহ রমণীরূপে বিরাজমানা, দীপ্তিমান (chemically illuminated) শ্বেত, পীত, লোহিত, সবুজ নানা রঙ্গের জল প্রস্রবনী বিবিধ প্রকারের ফোয়ারার ক্রীড়া, চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শ্বেতকায় নরনারীর নিবিড় জনতা ও সুসজ্জিত বৈদ্যুতিক প্রভাযুক্ত প্রদর্শনী গৃহাদি, এবং ঠিক সম্মুখে যাদুময় ভূমিখণ্ডের অপর প্রান্তে অত্যল্প দূরে, অট্টালিকা সমূহের মধ্যস্থলে তাড়িত আলোকমালা দ্বারা বিশিষ্টরূপে পরিশোভিত কেন্দ্রস্থগৃহ দোম্‌সান্ত্রাল (Dome Centrale); বিপরীতদিকে ৫।৬ রশি তফাতে অগণ্য আলোকিত নৌকা, ষ্টিমার, ভাসমান বিহার-ভবন, হোটেল ও স্নানাগার এবং সেতু সমূহ বক্ষে করিয়া আঁকাবাঁকা সেইন নদী (La Seine) প্রবাহিত; পরপারে ঠিক সম্মুখে, কিঞ্চিৎ দূরে, প্রদর্শনীর অন্তর্গত,

* ইহার গায়ে চারিদিকে বড় বড় উচ্চ অক্ষরে (নীচে দাঁড়াইয়া বেশ পড়া যায়) ব্রোকা (Broca)), ভলটেয়ার (Voltaire), কুবীর (Cuvier), রোসো (Rousseau) প্রভৃতি (৭২ জন) মহামহোপাধ্যায় ফরাসি পণ্ডিতগণের নাম অঙ্কিত। একটীও রাজা, বাদশাহ, উজীর, আমীরের নাম নাই।

কোয়ারা বরুণা ও তাড়িত দীপমালা শোভিত ট্রোকাডেরায়ো গোলঘর বিশাল মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান ;— উল্লিখিত সমস্ত দৃশ্য বহু আনুষঙ্গিক (যাহার বর্ণনা এ ক্ষুদ্র কলমে বাহির হইল না) সহ এই ১২২ হাত উচ্চ স্থান হইতে যে কি এক অভূতপূর্ব্ব, অপার্থিব, অনির্ব্বচনীয় শোভা প্রকাশ করিতেছিল, তাহা "বাক্যে নাহি বলা যায়", স্মরণে প্রাণ পাগল হয়। ফরাসিদিগের সতেজ, সুপরিস্ফুট, সৌন্দর্য্যানুভব বৃত্তি (wonderfully developed æsthetic faculty) ও শোভাপ্রিয়তার বিষয় যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা সহজে বুঝিতে পারেন, সুন্দর জিনিস মনোহর ভাবে সাজাইয়া দর্শকের চিত্ত হরণ করিতে উঁহারা কেমন পটু। ফরাসি হিসাবে সাজাইবার তারিফের কিঞ্চিৎ পরিচয় জুবেয়ার মহাশয় (M. Joubert) ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দের কলিকাতা প্রদর্শনীতে দিয়া আসিয়াছেন। বিদেশীয়ের ব্যাপারে এক জন সাধারণ সাজ-শিল্পী যেরূপ হাত দেখাইয়াছিলেন, তাহা দ্বারা পাঠক মহোদয় কতক উপলব্ধি করিতে পারিবেন, বহু বড় বড় শিল্পকুশল বিখ্যাত কারিকর যারা নিজের দেশে নিজেদের সর্ব্বপ্রধান ব্যাপারে কতদূর উচ্চশ্রেণীর নিপুণতা ব্যবহার দ্বারা অনুপম শোভা সম্পাদন করত চূড়ান্ত বাহাদুরী প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাদের হাতে যেমন তেমন জিনিষ কেবল সাজানের গুণে বিলক্ষণ সৌষ্টব প্রকাশ করে ; এখানে ত সবই সুন্দর, আবার যথাসাধ্য সুন্দরভাবে সাজান। যে বন্ধুচয় সহ একত্রে এই মহাব্যাপার পরিদর্শন করিয়াছি, তাঁহারা এই দুর্ব্বল লেখনী প্রসূত বর্ণনা পাঠে বেশ বুঝিতে পারিবেন, ক্ষমতার অভাব হেতু শতাংশের একাংশও বর্ণনা করিতে পারিলাম না। সেই অনুপম লাবণ্যের ভাব হৃদয়ে প্রস্তরাঙ্কিত রহিয়াছে, বাহিরে দেখাইবার শক্তি নাই ; কি করিব ? কবি কন্‌গ্রিবের (Congrieve) সঙ্গে এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইতে হয়।

"Hard is the task, and bold the advent'rous flight,
"Of him, who dares in praise of beauty write;
"For when to that high theme our thoughts ascend,
"'Tis to detract, too poorly to commend."

আপশোষ এই যে ভারতের শতাধিক লোকও দেখিতে পাইল না। যাঁহারা ইংলণ্ডে ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ যান নাই। হায়! হায়! এ জীবনে আর ওরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইব না, এই দুঃখ। আমেরিকানেরা ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে টক্কর দিয়া মহামেলা করিবে, কিন্তু আট্‌লাণ্টিক পারে ফরাসি বাহার কোথায়, এবং ওরূপ সাজাইবে কে ? ফরাসিদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, "সংসারে একটীমাত্র পারিস," (Il n'y a qu'un Paris dans le monde) দ্বিতীয় অসম্ভব।

—Qun a vis Paris
A ren vis.

অর্থাৎ যে পারিস দেখে নাই, সে কিছুই দেখে নাই। ইহা পক্ষপাতের কথা নয়, প্রকৃত পক্ষেই তাই। ইংরেজ ও মার্কিন পর্য্যন্ত বাধ্য হইয়া স্বীকার করেন "Paris is the pleasure garden of the world" :— পারিস পৃথিবীর প্রমোদ-কানন *। তাই বলি, আবার যদি কখন ফরাসিরা "এক্‌স্‌পোজিসিওঁ" দেখায়, তবেই জগতের লোক পুনরায় নয়ন মন তৃপ্ত করিয়া সুখী হইবে।

* ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি বহুদেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ মধ্যে মধ্যে পারিসে আমোদ করিতে আসেন। প্রিন্স অব ওয়েলস প্রত্যেক বৎসর যান।

প্রথম তালা হইতে আর একটী কলে উঠিয়া দ্বিতীয় তালায় যাইতে হয়। দ্বিতীয় তালা ২৫০ হাত উচ্চে। এখানেও অনেক গুলি পানাহারের ঘর (refreshment bars) ও ফিগারো (figaro) নামক সচিত্র সংবাদ-পত্রের(Illustrated Newspaper)ছাপাখানা, এবং কতকগুলি দোকান। এই স্থানে ১৫০০ লোকের সহাবস্থানের ব্যবস্থা। এখান হইতে চারি দিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে, কিন্তু অস্পষ্ট; নীচেকার দৃশ্য অদ্ভুত, অবর্ণনীয়।

ত্রিতল ৫৭৮ হাত উচ্চে। এখানে ৫০০ লোকের স্থান হয়।* ডাকঘর তার আপিস ও কয়খানি দোকান আছে। এখান হইতে চারি দিকে ৪০ ক্রোশ নজর যায়, কিন্তু নিতান্ত অস্ফুট। ইহার উপর ৮১ হাত উচ্চে চূড়া (campanile)। সেখান পর্য্যন্ত উঠিতে গেলে একেল সাহেবের অনুমতি লইতে হয়। এই ৮১ হাতের মধ্যে ৪র্থ স্তবকে তাঁহার আপিস ও তিনটী বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রকোষ্ঠ (laboratory)। একটী জ্যোতিষের (Astronomy), অপরটী চিকিৎসা শাস্ত্র (Physic) ও আকাশতত্ত্ব (Meteorology); তৃতীয়টী জীবতত্ত্ব (Biology) ও বায়ুবিজ্ঞান (Micrografic study of the air) সম্বন্ধীয়। আকাশ ও বায়ু পরীক্ষার এমন উপযোগী স্থান এ পর্য্যন্ত ঘটে নাই; এ যাবত যত উচ্চে প্রক্রিয়াদি হইয়াছে, কোথাও সম্পূর্ণ অবিমিশ্র বিশুদ্ধ বায়ু পাওয়া যায় নাই; মহোচ্চ পর্ব্বত শিখরেও উদ্ভিদ ও মৃত্তিকা সমুদ্ভূত বাষ্প সংস্রব দোষ এড়াইতে পারা যায় না।

চূড়াখণ্ড বা কাম্পানিলের শিরোদেশে ও অভ্যন্তরে দুইটী প্রকাণ্ড তাড়িত দীপ। এই আলোক* ২০ ক্রোশ দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহাতে ৭ মাইল দূরবস্থিত সঁজারমাঁ-অঁ-লা (Saint Germain-en-Laye) নগরের রাজপথে সংবাদপত্র পড়িতে পারা যায়। প্রতি রবিবারে সন্ধ্যার পর বেশ অন্ধকার হইলে ১৫ মিনিটের জন্য সমস্ত স্তম্ভ রক্তবর্ণ বহ্নি (Bengal Lights) দ্বারা প্রজ্বলিত করা হয়।

সর্ব্বোপরি স্তম্ভ শিখরে ফরাসি সাধারণ তন্ত্রের (Republique Francaise) স্বাধীনতা (Liberte), সাম্য (Egalite), ও ভ্রাতৃভাব (Fraternite) ব্যঞ্জক ত্রিবর্ণ (tricolor) পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীয়মান। ইহা লক্ষ্য করিয়া ফরাসি বিজ্ঞান সভার (Academie Francaise) সভ্য কবিবর সলি-প্রুধোম (Sully-Prudhomme) বিজ্ঞান সমিতির ভোজের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "প্রত্যেক ফরাসির গৌরব বোধ করা উচিত যে, পৃথিবীর সকল দেশের পতাকা অপেক্ষা ফরাসি পতাকা বহু উচ্চে উড্ডীয়মান। ইহা দ্বারা আমাদের শৌর্য্য বীর্য্যের না হউক, অদম্য উচ্চাশার পরিচয় দেয়, সন্দেহ নাই।"

একেল স্তম্ভ হইতে দেশ সম্বন্ধে চর্ম্ম চক্ষুতে যেমন বহুদূর দেখিতে পাওয়া যায়, কাল সম্বন্ধেও তদ্রূপ মানসনয়নে পশ্চাতের শতাব্দিব্যাপী ভূত-তমসাবৃত অলক্ষ ব্যাপার সকল দৃষ্ট হয়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বাস্তীল

---

* সুতরাং উচ্চস্থ মানুষ ও কর্ম্মচারী পরিচারকা দিগ সংখ্যা (২০০০) শুদ্ধ একত্রে দশ হাজার লোক অক্লেশে বিচরণ করেন। একটী ছোট খাট নগর বলিলেই চলে।

"* It represents the transmuted energy of engines of 500 horse power."　　Stead

ধ্বংসের সঙ্গে "৮৯র সাম্যনীতিব" (Le-principes de'89) অভ্যুত্থান, জাতীয় সভা (L'assemblee National) সংস্থাপন, সকল মনুষ্যের সমান সত্ব সম্বন্ধীয় বিস্তারিত ঘোষণা (Declaration des droits de C'homme); ১৭৯০ :—সমাজেব উচ্চ-নীচ বিভাগ নিরসন (Abolition de la noblesse), ১৭৯১ :—রাজপ্রস্থান ও বন্দীভাবে পুনরাগমন; ১৭৯২ :—দাঁতঁ (Danton), মারা (Marat) ও রোবস্পিয়রের (Robespierre) অভ্যুদয় ও প্রাধান্য, রাজপদের প্রত্যাখ্যান (Abolition de la royante), বিখ্যাত সেপ্টেম্বর হত্যা, ১৩০০ সহস্র নরবলি, ১৭৯৩ :—সিংহাসনচ্যুত রাজা ষোড়শ লুইয়ের বিচার ও প্রাণদণ্ড, নররাক্ষস মারাবধ এবং তৎসঙ্গে অনুপম রূপ যৌবন ও সুমহোচ্চ হৃদয়-বিশিষ্টা মারাহন্তা দেবী কুমারী কর্দেব (Charlotte Corday) বিচার ও প্রাণদণ্ড, নিরাশ্রয়া বিধবা রাজমহিষীর মেয়র হেবেয়ার (Nebert) কর্তৃক অপমান, অন্যায় বিচার ও প্রাণদণ্ড, প্রকৃত দেশহিতৈষী প্রধান দ্বাবিংশতি *(Girondins) নিধন, অতুল রূপলাবণ্যসম্পন্না, বিদ্যাবতী, তীক্ষ্ণপ্রজ্ঞা সাধ্বী রোলাণ্ড-পত্নীর (Madame Roland) প্রভৃতি অন্যান্য অত্যাচার ও প্রাণদণ্ড, ১৭৯৪ :—ভ্রাতৃশোণিতপিপাসু দুরাত্মা হেবেয়ার, দাঁতঁ ও রোবস্পিয়রের ক্রমান্বয়ে প্রাণদণ্ড ও বিপ্লবের বলহ্রাস, ১৭৯৫-৯৭ :—নেপোলিয়নের ক্রমোন্নতি :—১৭৯৮, আলী † বোনাপার্টের মিসর লীলা;—১৮০৪ নেপোলিয়ন সম্রাট; ১৮১২ মস্কো (Moscow) বিভ্রাটের পর সিংহাসনচ্যুতি ও এল্‌বা (Elba) প্রয়াণ; ১৮১৫ :—পুনরাগমন, শত দিবসব্যাপী (The Hundred day) ব্যাপার ও নেপোলিয়ন রবির চির অস্ত; অষ্টাদশ লুইর পুনরাবির্ভাব; ১৮৪৮ :—দ্বিতীয় বিপ্লব ও লুই নেপোলিয়নের অধীনে দ্বিতীয়বার সাধারণ তন্ত্র স্থাপন, ১৮৫২ :—জ্যেষ্ঠতাতের পদানুসরণ দ্বারা ক্রমে তৃতীয় নেপোলিয়ন নামে সিংহাসনাধিকার; ১৮৭০ :—জর্ম্মানদের সহিত যুদ্ধ ও আত্মসমর্পণ, ইহার ৪ দিন পরে তৃতীয় সাধারণ তন্ত্র স্থাপন, ১৮৭০-৭১ :—দুই বারে ৫ মাস ব্যাপী জর্ম্মান সৈন্য কর্তৃক পারিস বেষ্টন (seige) ও অধিবাসীগণের নানা প্রকারে দারুণ অভাব ও ক্লেশ, সন্ধি ও শান্তি সংস্থাপন; মোসিও টিয়ার্সের (M. Thiers) শাসন হইতে আরম্ভ করিয়া মাক মেহন (Mac Mahon) গাম্বেটাদির (Gambetta) প্রাধান্য ও বর্ত্তমান সময়ের মহাত্মা কার্ণোর (M. Carnot) সভাপতিত্ব,—এই সকল ঘটনা জীবন্তভাবে মানসিক দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব আনয়ন করে। বাস্তবিক কলিযুগে বিধাতার বিশেষ বিধান স্বরূপ ফরাসিবিপ্লব তুমুলকাণ্ড যেমন সভ্য জগতের ইতিহাসের শীর্ষস্থানীয় ব্যাপার, তৎ স্মরণ চিহ্ন অতুল কীর্ত্তিস্তম্ভ, অভ্রভেদী একেল টাওয়ারও তেমনই তাহার উপযুক্ত।

* ইঁহারা বলিদানের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেশের হিতকামনায় প্রফুল্লচিত্তে সমস্বরে গান গাইয়াছিলেন।

† মুসলমানদের প্রীত্যর্থ এই নাম গ্রহণ করা হয়, উঁহাদের হৃদয়াধিকার উদ্দেশে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের নিন্দা করিতেও ত্রুটি করিতেন না।

মহারাজা দলীপসিংহ।

একেল স্তম্ভের নিকটবর্ত্তী একটী হোটেলে দৈবসংযোগে বিখ্যাত সোবরাঁও সমরক্ষেত্রের সজীব ধ্বংসাবশেষ পঞ্জাবকেশরী প্রবল

পরাক্রান্ত নরপতি রণজিৎ সিংহের পুত্র 'মহারাজা' দলীপসিংহের সহিত পরিচয় হইল। ইহাকে প্রদর্শনীর অন্তর্গত করিয়া লওয়া, কোনরূপে অসঙ্গত হয় না। যে প্রদর্শনী বিশ্বসংসারের জড়, চেতন, স্থাবর, জঙ্গম, উদ্ভিদাদি নানা প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার একত্রিত করিয়া বহুবিধ বিষয়ে অসংখ্য উপায়ে পৃথিবীকে বিবিধ জ্ঞান বিতরণ করিতেছে, তাহাতে সিংহাসনচ্যুত শিখরাজকে পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অস্থৈর্য্য-বিজ্ঞাপক জীবন্ত বিদ্যমান সাক্ষীরূপে জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিলে বিশেষ শিক্ষা লাভেরই কথা। সুতরাং এক্জিবিশনের সকল দৃশ্যের মধ্যে ইহাকে একটী প্রধান দৃশ্য গণ্য করিতে হয়। ইনিও প্রতিষ্ঠাবধি নিয়মিতরূপে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে এই নির্দ্দিষ্ট হোটেলের (Spiers and Pond's Grillroom) বারাণ্ডায় সস্ত্রীক বা বন্ধুবান্ধব সহ আরামের সহিত বসিয়া আহারাদি করেন। এটী ইংরেজের হোটেল, এখানে ভারতীয় বাটিকায় (Le pavillon Indien) নিযুক্ত কলিকাতার খানসামা দ্বারা প্রস্তুত পোলাও প্রভৃতি ইচ্ছা করিলে পাওয়া যায়, তাই রোজ এই খানেই আহার করেন। সাক্ষাতের পর দিন আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্ব্বিধ দ্রব্যাদি দ্বারা পরিতোষ করত থিয়েটারে লইয়া যান। আরও কয়দিন দেখা হয়, এবং এক দিন বাসায় গিয়া সাক্ষাৎ করি, সেই দিন ভারতেশ্বরীর নিকট পত্র এবং শিখদিগের প্রতি ঘোষণাপত্রের (manifesto) মুদ্রিত নকল ও তাঁহার হীরামাণিকমুক্তাশোভিত রাজবেশের ফটোগ্রাফ দেন। প্রথম স্ত্রীর বিয়োগে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন; ইনিও ইংরেজ মহিলা। 'মহারাণী'র কথাবার্ত্তায় বুঝা গেল, উহাঁর মত নয় যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত পুনর্ম্মিলিত হন।

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে ইংলণ্ডে ফিরিতে পরামর্শ দেওয়ায় দলীপসিংহ বলিলেন "আল্‌জিয়র্স (Algiers) দেশে এক পয়সার একখানা রুটি খাইয়া অজ্ঞাতবাসে দিন যাপন করিব, তবু ইংরেজের অর্থ আর গ্রহণ করিব না।" এ সকল বাতুলের কথা, এরূপ "চোরের উপর রাগ করিয়া মাটীতে ভাত খাওয়া", দারুণ পাগলামি বই কি? তাঁহার পঞ্জাব পুনঃ প্রাপ্তির প্রয়াস, "মুণ্ডমালার দন্তবিকাশ, খেলারামের ভারত উদ্ধার," বামনের চাঁদে হাত দিবার প্রয়াস মাত্র। এরূপ জাগন্ত স্বপ্ন যেন কোন মানুষকে আচ্ছন্ন না করে। পশ্চিমের সূর্য্য পূর্ব্বে গেলেও বর্ত্তমান রাজদণ্ড টলিবার নয়। নিজেও বলিলেন, রুশিয়া, ফ্রান্স তাঁহাকে কণিকামাত্র আশা ভরসা দেওয়া দূরে থাকুক, ইঙ্গিতে ব্রিটিশ সিংহের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের পরম মঙ্গল হেতু বিধাতার বিশেষ বিধানে জন বুল ভারত অধিকার করিয়াছে, এবং এখনও বহুকাল অক্ষুণ্ণভাবে ভোগ করিবে। বিধিলিপি মনুষ্য কি প্রকারে খণ্ডন করিতে পারে। পাঠক মহোদয়, ভাবিয়া দেখুন, ভারতীয় রাজার অধীন হইয়া পুনরায় দ্বাদশ শতাব্দীতে পশ্চাদ্গমনাপেক্ষা ভীষণতর নরকভোগ আমাদের পক্ষে আর কি হইতে পারে। চারি লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি রণজিৎ পুত্রের পক্ষে যৎসামান্য হইতে পারে, কিন্তু যখন এই ৩৭।৩৮ বৎসর কাল উহাতে সন্তুষ্ট হইয়া কাটাইয়াছেন, এখন আপত্তি করিলে ফল কি? উপযুক্ত পুত্রদ্বয় ত তাঁহার অনুগামী হয় নাই, মাতৃহীন কন্যা দুইটী অল্প বয়স্কা, অবলা,

কাজেই পিতার সঙ্গে রহিয়াছে। মহারাজের বাল্যকালের অভিভাবিকা সহৃদয়া উচ্চমনা লেডি লোগিন (Lady Login) বলেন, তাঁহার প্রতি ন্যায় ব্যবহার হয় নাই, এবং তাঁহার বর্ত্তমান অবস্থাতে তিনি বিশেষ দুঃখিত। আমরাও কোমল হৃদয়া দয়াবতীর সঙ্গে সন্তপ্ত, কিন্তু উপায় কি? তাঁহার বর্ত্তমান উদ্যোগের সহিত সহানুভূতি কেহই প্রকাশ করেন না, আমরাও উহাকে সম্পূর্ণ বিকৃত মস্তিষ্কের কাজ বলি। যে শাসন প্রণালীতে "রাজার মা" বাস্তবিকই "ভিক্ষা মাগে",—স্বয়ং ব্রিটিশসাম্রাজ্যের অধীশ্বরীকে পুত্র পৌত্রের ভরণ পোষণের জন্য "Honorable Guardians of the National purse" "জাতীয় ধনভাণ্ডারের মান্যবর অভিভাবকগণ সমীপেষু" বলিয়া কমন্স সভায় আবেদন করিতে হয়, এবং বহু ওজর আপত্তি তর্ক বিতর্কের পরে অতি কষ্টে প্রার্থনা খণ্ডিত ভাবে (conditionally) গ্রাহ্য, সেখানে আমাদের রাতীল 'মহারাজের' তামাদী দাবী কি আশা করিতে পারে, সহজেই বুঝা যায়। দশ জনের পেট কাটিয়া এক জনের ভুঁড়ি পূরণ, আর অধিক দিন চলিতে পারে না। "Laborare est orare" (শ্রমই পূজা) মহামন্ত্রে সংসারের আপাদমস্তক সকলের দীক্ষিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

যাহা হউক, মহারাজের নিকট একটা বিশেষ বিষয়ের পরিচয় পাইয়া বড় সুখী হইয়াছি। ১২ বৎসর বয়সে পঞ্জাবের রত্নসিংহাসন হইতে নামিয়া ইংলণ্ডের স্কুল-ছাত্র হন, এখন বয়স ৫০।৫১, এ যাবতকাল প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ প্রভৃতি বড় বড় লোকের সংসর্গে বরাবর ইংরেজ মহলেই ফিরিয়াছেন, সুতরাং মাতৃভাষা ব্যবহার করিবার অবকাশ খুব কম পাইয়াছেন, অথচ পরিষ্কার হিন্দীতে কথা কহেন, এমন কি "ফলানী ঢেকান" পর্য্যন্ত বিস্মৃত হন নাই। আর আমাদের দেশীয় ভ্রাতারা তিন দিন তামসের জল খাইয়া মাতৃভাষা সম্বন্ধে একেবারে তমসাচ্ছন্ন হন। বড় দুঃখের বিষয়, বড় লজ্জার কথা। স্বদেশ ও মাতৃভাষা সহজে ভুলিবার সামগ্রী নয়। যিনি সহজে এই দুইটি বিস্মৃত হন, তাঁহাকে ঘোর বিকারগ্রস্ত জানিতে হইবে। [ক্রমশঃ]

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

আজ কারে মনে হয়?

(১)

আজ কারে মনে হয়?
মেঘে ঢাকা দশ দিশি, ভেদ নাই দিবানিশি
অবিরল ঝরে জল অন্ধকারময়!
আজ কারে মনে হয়?

(২)

চপলা চমকে ঘন,
ঘন ঘন গরজন,
কে জানে আমার কেন আঁখি জলময়!
আজ কারে মনে হয়?

(৩)

ভিজিতেছে তরুলতা,
কাঁপিতেছে ফুল পাতা,
নীরব নিঝুম এই উপবনময়।
আজ কারে মনে হয়?

(৪)

পিছনে ধানের খেত;
বেঙ ডাকে গেঁত্ গেঁত্,
ভাসিয়া যেতেছে মাঠ জলে জলময়।
আজ কারে মনে হয?

(৫)

সমুখে পুকুরে জল,
কুমুদ কহ্লার দল,
ভাসিয়া রয়েছে তাহে রক্ত কুবলয।
আজ কারে মনে হয়?

(৬)

বাগানের এক পাশে,
কেতকী কুসুম হাসে,
ভাদরে বিদেশী যেন বিদরে হৃদয।
আজ কারে মনে হয়?

(৭)

'মেউয়া' ডাকে 'পিপী' ডাকে,
বক উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে,
দিক্‌বালা পরিয়াছে রজত বলয়!
আজ কারে মনে হয়?

(৮)

একটু দেখিনা আলো,
আকাশ তরল কালো,
অনন্ত গলিয়া যেন গেল সমুদয়।
আজ কারে মনে হয়?

(৯)

ভিজা বুক ভিজা মন,
ভিজে গেছে দু'নয়ন,
সমস্ত পৃথিবী শুদ্ধ ভিজা সমুদয়।
আজ কারে মনে হয়?

(১০)

পরবাসে—বনবাসে,
এ ভরা ভাদর মাসে,
কে থাকে বরষা দিনে একা এ সময়?
আজ কারে মনে হয়?

শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস।

সুখ ও দুঃখ।

পৃথিবীর যে দিকে চাই, সে দিকেই আমরা দুইটী অবস্থা দেখিতে পাই। চঞ্চল পৃথিবীর পরিবর্ত্তন নিয়তই চলিতেছে;—এক দিকে ভাঙ্গিতেছে, আর একদিকে গড়িতেছে। সমুদ্র মধ্য হইতে দৈবাৎ পর্ব্বত উৎপন্ন হইতেছে, আবার দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ ফল পুষ্প সমন্বিত ভূমিখণ্ড জলগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। যখন গোধূলিকালে আকাশের দিকে সমুদ্রবক্ষ হইতে দৃষ্টিপাত করি, তখন একটীর পর একটী করিয়া নানা রঙ্গে রঞ্জিত কত প্রকার সুন্দর দৃশ্য দেখিতে পাই। সে সকল কবিরাও বর্ণনা করিতে পরাস্ত হইয়া যান। আবার যখন সেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ঘোর ঘনঘটায় পূর্ণ হয়, সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ সকল ক্রীড়া করিতে থাকে এবং প্রবল বেগে বহিয়া উহাদের মধ্যে ভীষণ রূপ

আনয়ন করে, তখন সেই সকল পরিবর্ত্তন কি বিস্ময়কর বোধ হয়! বাহ্য প্রকৃতির সহিত আমাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া আমরা এই সকল পরিবর্ত্তনে কখন সুখ, কখন দুঃখ অনুভব করিয়া থাকি। এই সুখ দুঃখ মনুষ্যের শিক্ষা ও মনের গঠনের ইতর বিশেষের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। সাধারণত লোকে আলোক ও সুন্দর দৃশ্য হইতে সুখ পাইয়া থাকে, কিন্তু চিন্তাশীল মনুষ্যেরা অন্ধকার ও পৃথিবীর ভীষণ পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাহাদের চিন্তাস্রোত প্রবাহিত করিয়া এক প্রকার সুখ সম্ভোগ করেন। সুখের অর্থ অমিশ্র সুখ নহে, কেননা পৃথিবীতে তাহা মনুষ্যের ভাগ্যে ঘটেনা। অবস্থা বিশেষে এক জনের সুখ আর এক জনের দুঃখে এবং এক জনের দুঃখ অন্য জনের সুখে পরিণত হয়। দুঃখ ক্লেশ ও যন্ত্রণার অংশ অল্প হইলেই আমরা সুখের অবস্থা বলি। সন্তোষকর সুখপ্রদ সামগ্রী সঞ্চয় ও অসন্তোষকর দুঃখজনক সামগ্রী দূরীকরণে মনুষ্য সর্ব্বদা ধাবিত হইতেছে। আমাদের মনোমধ্যে সুখ-দুঃখ-বোধ নামে যে দুইটী বৃত্তি আছে তাহার একটী অর্থাৎ সুখ-বোধ বৃত্তিকে আমরা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে চরিতার্থ করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত এবং দুঃখ-বোধ বৃত্তিকে একেবারে বিনাশ করিতে এবং উহার উত্তেজক পদার্থ অপসারিত করিতে আমরা সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া থাকি।

সুখ দুঃখকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, —শারিরীক ও মানসিক, কতকগুলি নিবার্য্য, কতকগুলি অনিবার্য্য। কতকগুলি আমরা স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া থাকি, কতকগুলি আমাদের জীবন ধারণের আনুষঙ্গিক নিয়ম বলিলেই হয়, কেন না, সেই সকল ভিন্ন আমাদের জীবন রক্ষা কখন সম্ভবে না। মানসিক উন্নতি ও অবনতিতে যে সুখ ও দুঃখ, তাহা আমাদের সৃষ্ট; সদগ্রন্থ পাঠে যে সুখ এবং তাহার অভাবে যে দুঃখ, তাহা এই শ্রেণীর। ক্ষুৎপিপাসার পরিতৃপ্তিতে যে সুখ এবং তাহার অতৃপ্তিতে যে দুঃখ, তাহা আমাদের জীবন ধারণের আনুষঙ্গিক নিয়ম। সভ্যতার স্রোতে পড়িয়া আমরা অনেক প্রকার কৃত্রিম সুখ দুঃখের সৃজন করিয়াছি। সাধারণত নিম্নলিখিত অবস্থায় আমরা সুখ পাই, যথা— পেশী সঞ্চালন, পরিশ্রমের পর বিশ্রাম, ইন্দ্রিয় সকলের সুস্থ অবস্থা, পরিমিত ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগ, ক্ষুৎপিপাসার পরিতৃপ্তি, মিষ্ট আস্বাদ, সুগন্ধ আঘ্রাণ, কোমল ও ঈষদুষ্ণ বস্তুর স্পর্শ, তাল মান সমন্বিত শ্রুতিমধুর শব্দ, নানা বর্ণে রঞ্জিত দৃশ্য সকল, আলোক, কারারুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভ, আশ্চর্য্য নূতন ব্যাপার দর্শন, কোমল বৃত্তি সকলের পরিচালনা, দাম্পত্য প্রণয়, মাতৃ ও পিতৃ স্নেহ, বন্ধুত্ব, শ্রদ্ধা ভক্তি, আত্ম প্রসাদ, প্রশংসা, শক্তি, প্রভুত্ব, আধিপত্য, প্রতিশোধ পাইবার ক্ষমতা, জ্ঞান, মানসিক শক্তি সঞ্চালন, সঙ্গীত, চিত্রবিদ্যা, কবিতা, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, সহানুভূতি, নীতি ও জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, ধর্ম্ম, সমাজ, জীবন ধারণ ইত্যাদি। নিম্নলিখিত অবস্থায় আমরা ক্লেশ, দুঃখ বা যন্ত্রণা পাইয়া থাকি, যথা, পেশীর ক্লান্তি, শরীরের কোন যন্ত্রের বিকার এবং রোগসমূহ, শীতলতা, বিস্বাদ, দুর্গন্ধ, অন্ধকার, অত্যন্ত আলোক, ইন্দ্রিয় সুখের অতৃপ্তি, স্বাধীনতার পর রুদ্ধ অবস্থা, সকল প্রকার ভয়, শোক, স্নেহ ও ভালবাসার সামগ্রী হইতে বিচ্ছেদ, লজ্জা প্রাপ্তি, অবিচ্ছেদে এক রূপ অবস্থায় থাকা, আত্ম অবনতি ও অপমান.

শক্তিহীনতা, দাসত্ব স্বীকার, প্রতিশোধ লইতে অপারগ হওয়া, অজ্ঞানতা, কদর্য্যতা, অসুস্থতা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, মূর্খতা, নীচতা, মৃত্যু ইত্যাদি। এই সুখ দুঃখের অবস্থা হইতে কেহ ইচ্ছা করিলে সম্পূর্ণ রূপে উহাদের অতীত হইতে পারেন না। ইচ্ছা করিলে আজীবন কেহ দুঃখ ভোগ করিয়া কাটাইতে পারে না; তাহাকে কিছু না কিছু সুখের অংশ লইতেই হইবে। সেই রূপ দুঃখও মনুষ্যের অনিবার্য্য ঘটনা। অসম্পূর্ণ মনুষ্য, কোন বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন না। পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থায় দুঃখ যন্ত্রণার অতীত হওয়া মনুষ্যের পক্ষে প্রার্থনীয় কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। অনেকে হয়ত এ কথা শুনিয়া হাসিতেছেন, অথবা ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীদিগের ইহা প্রলাপবাক্য বলিয়া উপহাস করিতেছেন। এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা পৃথিবীতে এই দুঃখের অস্তিত্ব আছে বলিয়া ঈশ্বরের তিনটী স্বরূপে সন্দেহ করেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর একাধারে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান ও দয়াময় হইতে পারেন না। তিনি দয়াময় ও সর্ব্বশক্তিমান হইলে কেন জীবের দুঃখ দেখিয়া মোচন করেন না? আর সর্ব্বজ্ঞ হইলে তিনি কেন পৃথিবীকে এরূপ ভাবে সৃজন করিলেন না, যাহাতে জীবগণ দুঃখের অতীত হইত? ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, হয় তিনি নির্দ্দয়, নয় তিনি জীবের দুঃখের প্রতি উদাসীন। পৃথিবীর গঠন প্রণালী যেরূপ দেখা যায়, তাহা হইতে অন্যরূপ ঈশ্বর কেন করিলেন না, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা অক্ষম। তবে আমরা এ কথা বলিতে পারি যে, পৃথিবী যেরূপ সৃজিত হইয়াছে ও ক্রমান্বয়ে সৃজিত হইয়া আসিতেছে, (আমরা এরূপ বিশ্বাস করি যে, পৃথিবীর সৃজন ক্রিয়া প্রত্যহ চলিতেছে) তাহাতে বর্ত্তমান সুখ দুঃখের অবস্থা জীবন রক্ষার্থে নিতান্ত প্রয়োজন।

উক্ত মতাবলম্বীদের মধ্যে জনষ্টুয়ার্ট মিল এক জন প্রধান। মনে করা যাউক, আমরা সর্ব্বশক্তিমান, দয়াশীল ঈশ্বরের সহিত জগতের সুখ দুঃখের অস্তিত্বের সমন্বয় করিতে আপাতত অক্ষম। কিন্তু সেই জন্য কি ইহা সিদ্ধান্ত করা যাইবে যে, পৃথিবীতে এমন কোন সত্য নাই, যদ্দ্বারা ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমান ও দয়াময় স্বরূপের সহিত সুখ দুঃখের অস্তিত্বের কোন সমন্বয় আদৌ হইতে পারে না। সর্ব্বশক্তিমানের অর্থ কি? যে শক্তি দ্বারা সকল বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে, অথবা সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, তাহাকে সর্ব্বশক্তিমান শক্তি বলা যায়। এবং যাহা কিছু চিন্তায় সম্ভব হয়, তাহাই বস্তু বা কার্য্য বলা যায়। কিন্তু পানদোষ শূন্য মাতাল, সাধু চোর, চতুর্ভুজ সমন্বিত পঞ্চভুজ, দুই পার্শ্বে পর্ব্বত শূন্য উপত্যকা, ইত্যাদি আমাদের চিন্তায় সম্ভব হয় না। যদি কেহ বলেন, ঈশ্বর একটী ত্রিভুজ দুইটী সরল রেখার দ্বারা নির্ম্মাণ করিতে পারেন না, সুতরাং তিনি শক্তিহীন, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে অজ্ঞান বা বাতুল ভিন্ন অন্য কিছু মনে করি না। যেমন দুইটী সরল রেখার দ্বারা একটী ত্রিভুজ নির্ম্মাণ সম্ভব নহে, সেইরূপ সুখোৎপত্তির উপাদান যে দুঃখ হইতে পারে না, এ কথা কে সপৎ করিয়া বলিতে সাহসী হইবেন? সুখ দুঃখের সহিত এরূপ সম্বন্ধ থাকা যে একেবারে অসম্ভব, তাহা আমরা বিশ্বাস করি না। ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমানতা স্বরূপ তাঁহার দয়ার ন্যায় অন্য স্বরূপ দ্বারা বিধিবদ্ধ নহে, তাহা কে বলিতে পারে? ইহা ধ্রুব সত্য যে,

ঈশ্বর তাঁহার বৃত্তের পরিধির সকল স্থানেই সৎ।

স্কোপেনহার, হার্টম্যান ও লিওপারডাই প্রভৃতি পণ্ডিতেরা পৃথিবী কেবল দুঃখের আগার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। দুঃখ ও নৈরাশ্যের প্রাদুর্ভাব, রোগের আধিক্য এবং যন্ত্রণার সর্ব্বব্যাপিত্ব দেখিয়া পৃথিবীর বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি প্রায় সকলেই অসন্তুষ্ট, সুতরাং দুঃখই পৃথিবীর আদি ও অন্ত, এই মত প্রচারিত হইয়াছে। দুঃখবাদীদের অন্তত একটী মত ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা যে সকল দুঃখ, যন্ত্রণা ও অশুভ ঘটনার উপর আপনাদের ভিত্তিস্থাপন করেন, সেই সকলই অনেক সময় মানবের হিত সাধন করিয়া থাকে, ইহা কেবল কথার কথা নহে, অথবা ঈশ্বরানুরাগী ধার্ম্মিকদের হৃদয়ের ভাব নহে। যতই আমরা এ বিষয়ে আলোচনা ও চিন্তা করি, ততই আমরা দেখিতে পাই যে, অমিশ্র অশুভের অস্তিত্ব নাই। ঘোর বিপদের মধ্যে আমরা কিছু না কিছু শুভ দেখিতে পাই। এবং ইচ্ছা করিলে দুঃখকে আমরা সময়ে সময়ে সুখে পরিণত করিতে পারি। স্পেন্সার তাঁহার First Principles of Rıligıon and Scıence নামক পুস্তকেও এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রবল ঝড়, ধ্বংশের অবতার। ইহার অনিষ্টকারী শক্তি সকলেই বিদিত আছেন। কিন্তু এই ঝড়ের আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে আমরা কতক শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান দেখিতে পাই। ইহার দ্বারা বায়ু পরিষ্কৃত হয়, রোগ নিবারিত হয়, এবং ফল সস্য উৎপাদনকারী বৃষ্টি হইয়া থাকে। যন্ত্রণা ও কষ্ট যদিও সর্ব্বব্যাপী, তথাচ ইহার মধ্যে আমরা কিছু না কিছু শুভ দেখিতে পাই।

প্রথমত বেদনা বা যন্ত্রণা, আমাদের জীবন রক্ষার্থে বিশেষ কার্য্য করিয়া থাকে। অগ্নির দহনে যদি আমরা জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব না করিতাম, অস্ত্রের দ্বারা আমাদের মাংসবিদ্ধ হইলে যদি আমরা কোন যন্ত্রণা বোধ না করিতাম এবং দুর্গন্ধে যদি আমাদের কোন কষ্ট অনুভব না হইত, তাহা হইলে আমাদের বর্ত্তমান শরীর গঠন লইয়া জীবিত থাকা অসম্ভব হইত। এরূপ অবস্থায় আমরা সর্ব্বদা মৃত্যু যাচিয়া লইতাম এবং আসন্ন বিপদও আমরা বুঝিতে পারিতাম না, অথবা যখন বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন উপায় নাই, তখনই আমাদের চৈতন্য হইত। অজ্ঞান সন্তানেরা অগ্নিতে হস্ত পোড়াইয়া, অস্ত্রে হস্ত কাটিয়া, অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া কষ্ট পাইতেছে, সত্যবটে, কিন্তু এই সকল দ্বারা তাহারা আত্ম রক্ষা শিক্ষা পাইয়া থাকে। আমাদের শিক্ষা তিন প্রকারে হয়, দেখিয়া, শুনিয়া ও ঠেকিয়া, কিন্তু শেষোক্ত প্রকারে যে শিক্ষা হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা স্থায়ী। স্বভাবের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া আমরা অনেক সময়ে অবিলম্বে শাস্তি পাই না বটে, কিন্তু অল্পে অল্পে স্বভাব আমাদের চৈতন্য করিয়া দেয়, যখন আমরা তাহার ইঙ্গিত গ্রহণ না করি এবং নিয়ম ভঙ্গ বিরত না হই, তখন উহা আমাদিগকে কর্কশস্বরে লাঞ্ছনা করে। ইহাতেও যদি আমরা উহার আদেশ গ্রহণ না করি, তাহা হইলে শীঘ্র আমরা যথাবিহিত শাস্তি পাই। যদিও তাহার সতর্কতা ও শাস্তি আমাদের পক্ষে কষ্টদায়ক, তথাপি ইহারই দ্বারা আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবন রক্ষা হইয়া থাকে। কষ্ট যন্ত্রণা, শোক ও দুঃখ যে কেবল দৈহিক বা শারিরীক নিয়ম রক্ষার্থে কার্য্য করে, তাহা নহে, কিন্তু ইহাদের দ্বারাই

মানসিক পবিবর্ত্তন ও চরিত্রেব বিকাশ সাধিত হইয়া থাকে। ইহাব একটি দৃষ্টান্ত এখানে উদ্ধৃত হইল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইতালীর অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। নগববাসীবা সকলেই কোন না কোন দস্যু দলভুক্ত, অরাজকতার এক শেষ, আততায়ীবা অবাধে তাহাদের দুরুত্তি চবিতার্থ কবিত। আহত ব্যক্তিরা বিচারপ্রার্থী হইলে সফল হইত না। এই সময়ে ইতালীব দুইটী যুবক পবস্পরেব কত আশা ও উন্নতির কথা বলিতে বলিতে এক দিন সন্ধ্যাকালে পথিমধ্যে ভ্রমণ কবিতেছিলেন, দৈবাৎ জ্যেষ্ঠটি কনিষ্ঠকে বাখিয়া কোন কার্য্য বশত স্থানান্তবে গমন কবিলেন, কিন্তু ফিবিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, ভ্রাতাব শোণিত-সিক্ত মৃত শবীর ধূলায় লুণ্ঠিত বহিয়াছে। এই ঘটনায় তাঁহাব জীবনকে সম্পূর্ণ রূপে পবিবর্ত্তিত করিল। ইহাতে ইতালীব উদ্ধাব-কর্ত্তাব জন্ম হইল। সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব নাম রিয়াঞ্জি, তিনি বলিয়াছিলেন, "Will they not give us justice , time shall show So saying he bent his lead over the corpse, his lips muttered, as if with some prayer or invocation, and then rising, his face was as pale as the dead beside him, but it was no longer pale with grief.

From that bloody clay, and that inward prayer , Cola De' Rienzi rose a new being. With his young brother died his own youth. But for that event, the future liberator of Rome might have been but a dreamer, a scholar or a poet, a man of thoughts not of deeds."

ইতিহাস হইতে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। স্বার্থত্যাগ, আত্মজ্ঞান, সাহস, বিক্রম, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদগুণ কোন কালে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভিন্ন সম্পূর্ণ বিকশিত হয় কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাঁহাবা কষ্ট সহ্য কবিয়াছেন, তাঁহাবাই বলবান। যাঁহারা নিজ শরীবে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা পর দুঃখ ও যন্ত্রণা নিবাবণ কবিতে ও তাঁহাদেব সহিত সহানুভূতি কবিতে সক্ষম। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, ব্যক্তিগত দুঃখ ও যন্ত্রণাই পবস্পবেব আনুকূল্যেব প্রস্রবণ। অন্যেব দুঃখ নিবাবণ কবিতে যাইযা নিজেব দুঃখ অনেক পবিমাণে পবিবর্ত্তিত হইযা থাকে। কষ্ট ও যন্ত্রণা হইতে অন্য প্রকাব উপকারও হইয়া থাকে, ইহাব দ্বারা কেবল যে দুঃখী ও যন্ত্রণাভোগীকে বল দেয় এবং তাহাকে পবিত্র করে, তাহা নহে, কিন্তু ইহাব দ্বারা আশ্রয়দাতাব হৃদয়ে সহানুভূতি ও পবোপকারেব ভাব উদ্দীপন কবিয়া দেয়। Oliver Wendell Holmes সুন্দব রূপে বলিযাছেন যে, দীর্ঘকালব্যাপী বোগগ্রস্ত বন্ধুব সেবা শুশ্রূষা কবিলে যেমন শ্বেত শ্মশ্রু ও কেশ আনয়ন কবে, তেমনই ইহাতে হৃদয়কেও শুভ্র বা পবিত্র করে। মনুষ্য জীবনেব ইতিহাসে আমবা দেখিতে পাই যে, যাহাদেব জন্য আমরা কষ্ট ভোগ কবি, তাহাদেব প্রতি আমবা অধিক অনুবক্ত হই। গর্ভধাবণ, প্রসব কালীন বেদনা, এবং সন্তান লালন পালনে মাতার যে কষ্ট ও চিন্তা হইয়া থাকে, তাহাই সন্তানেব প্রতি অকৃত্রিম স্নেহেব মূল। পূর্ব্বে যাহা কথিত হইল, তাহাতে কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, দুঃখ কষ্টেব সকল গুরুত্ব ভেদ করিতে আমবা স্পর্দ্ধা করিতেছি। তবে ইহা বলা যাইতে পাবে যে, উপযুক্ত চিন্তার দ্বারা আমরা ইহাব অন্ধকারাচ্ছন্ন পথকে কিয়ৎ পরিমাণে আলোকিত করিতে সমর্থ হই। এই বিচারে আমরা নিম্নলিখিত উপসংহারে উপনীত হই।

১। পৃথিবী কেবল সুখের অথবা কেবল দুঃখের আগার নহে, সুখ দুঃখ দুইই সকল মনুষ্যের অনিবার্য্য ঘটনা।

২। যেমন আমরা জ্ঞান, বিদ্যা ও ধর্ম্মের আলোচনায় পৃথিবীর বাহ্যবস্তুর অতীত কত নূতন সুখের আগার সৃজন করিয়া থাকি, সেইরূপ নূতন প্রকার দুঃখও আমরা সৃজন করি।

৩। দুঃখকে যেরূপ অপ্রিয় বস্তু বলিয়া আমরা সাধারণত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকি, প্রকৃত পক্ষে উহা সেরূপ অহিতকর সামগ্রী নহে। বর্ত্তমানে পৃথিবীর যেরূপ গঠন ও বাহ্য বস্তুর সহিত আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা অনুভব করিলে দুঃখ যন্ত্রণা আমাদের জীবন রক্ষার্থে কতক পরিমাণে আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়।

৪। দুঃখ কষ্ট হইতেই ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, স্বার্থত্যাগ, সাহস, বিক্রম, সাহানুভূতি, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ অধিক স্থলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এখন দেখা যাউক, সুখ বৃদ্ধি ও দুঃখ হ্রাস করিতে হইলে আমাদের কি করা কর্ত্তব্য। যখন দেখিতেছি যে, দুঃখ অনিবার্য্য, যেখানে কেন আমরা যাইনা, যতই কেন আমরা সুখ অন্বেষণ করি না, আমাদের বিষয় কার্য্য যতই কেন ভাল রূপে নির্ব্বাহ করিনা, তথাচ অসম্পূর্ণ মনুষ্যের দুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার নাই, শারিরীক বা মানসিক কষ্ট কতক পরিমাণে সহ্য করিতে হইবেই হইবে। অনেক সময় আমরা আমাদের নিজেদের উপর বিরক্ত হই। প্রতিজ্ঞা পালনে অক্ষম হইলে, আশানুযায়ী উন্নতি লাভ করিতে না পারিলে, আত্মগ্লানি আসিয়া আমাদিগকে ম্রিয়মাণ করে। দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণা দাবি দিকে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যদি আমরা উহাদিগকে ইচ্ছা পূর্ব্বক বহন করি, ইহারা আমাদিগকে বহন করিবে এবং আমাদের ঈপ্সিত স্থানে লইয়া যাইবে। যদি আমরা অনিচ্ছা পূর্ব্বক উহা বহন করি, উহা আমাদিগের উপর আধিপত্য প্রকাশ করিবে এবং আমরা উহার ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িব, অথচ উহার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব না। একটী অপ্রিয়কর অশুভ বস্তু আমরা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া দেখিতে পাই যে, অপর একটী গুরুতর অশুভ আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহা এ পর্য্যন্ত কোন মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই, তাহার হস্ত হইতে কেমন করিয়া আমরা পরিত্রাণ পাইব? এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। ধার্ম্মিক লোকদেরও দুঃখ অল্প নহে। যতই তাঁহারা উন্নতি লাভ করেন এবং ঈশ্বর প্রেমে অনুরক্ত হন, ততই তাঁহার বিচ্ছেদে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেন।

দুঃখের সময় ঈশ্বরের প্রেম-মুখ যেরূপ সুমিষ্ট বোধ হয়, এমন আর কোন সময়ে নহে। যখন সমস্ত পৃথিবী আমাদের বিমুখ হয়, আমরা নিঃসহায় ও নিরাশ্রয় হইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করি ও নয়নাশ্রু বিসর্জ্জন করি, তখন অনুতাপিত হৃদয় কত না সুখ পায়। তখনই বলি, দুঃখই পরিত্রাণের মূল মন্ত্র। যখন দুঃখ আসিয়া আমাদিগকে অধিকার করে, তখন শত্রুরা আর আমাদিগকে আক্রমণ করে না। দুঃখই মনুষ্যের হৃদয়ের বল বৃদ্ধি করে।

বেন (Bain) তাহার মেণ্টাল ও মরাল সায়েন্সে নিম্নলিখিত কয়েকটী নিয়ম, সুখ লাভের পক্ষে আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১) কোন সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে হইলে, সুখের কারণ সম্পূর্ণ নূতন হওয়া আবশ্যক। যথা জননীর প্রথম সন্তান। নূতন প্রেমের যে সুখ, তাহা পুনরায় লাভ করা যায় না।

(২) প্রত্যেক সুখের কিয়ৎ কাল নিবৃত্তি থাকা আবশ্যক, নতুবা উহা সুখ বলিয়া বোধ হইবে না। আমরা কোন আহ্লাদ বা সুখ কেবল কিছু কালের জন্য সম্ভোগ করিতে পারি, তাহার অতিরিক্ত আর পারি না। সুখোৎপত্তির কারণ কিছু কাল বিরাম থাকা আবশ্যক।

(৩) অনবরত সুখে থাকিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তির নানা প্রকার সুখের বস্তু থাকা আবশ্যক, এই সকল বস্তু যত বিভিন্ন হইবে ও ক্রমান্বয়ে মনুষ্যের আয়ত্বাধীন হইবে, ততই সুখ বৃদ্ধি হইবে। কোন সুর যতই কেন সুমিষ্ট ও সুশ্রাব্য হউক না, উহা একাধিক্রমে শুনিলে কখনই সুখ লাভ হয় না। যন্ত্রণা হইতে মুক্তি অধিকন্তু সুখের একটী উপায়, যথা, রোগের পর সুস্থতা লাভ। মনের কোন উদ্বিগ্নতা বা ম্লানতার অবসান। মারিভয় হইতে মুক্তিলাভ। বহুকালের ঈপ্সিত অথচ অতৃপ্ত সুখ প্রাপ্তি। সুখ লাভ করিতে হইলে পূর্ব্বে কষ্ট বা দুঃখ ভোগ করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা নহে, কিয়ৎ কাল সুখের বিরামই সুখভোগের পক্ষে যথেষ্ট। খাদ্য, শরীর সঞ্চালন, সমাজ ও সঙ্গীত প্রভৃতি হইতে আমরা যে সুখ পাই, তাহার মধ্যে মধ্যে বিরাম আবশ্যক। এইরূপ বিরামের পর সুখই যথার্থ নির্দ্দোষ সুখ। কিন্তু ইহাও ধ্রুব সত্য যে, দুঃখ কষ্টের পর আমরা যে সুখ পাই, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং অত্যন্ত প্রখর।

(৫) পরিশ্রমের কষ্ট লাঘব করিবার জন্য পরিবর্ত্তনও উপকারী। সম্পূর্ণরূপে ক্লান্ত না হইলে, এক প্রকার কার্য্যে পরিশ্রান্ত হইলে, অন্য প্রকার কার্য্য করিতে আমরা সক্ষম হই। মানসিক পরিশ্রমে ক্লান্ত হইলে, আমরা শারীরিক পরিশ্রমে সক্ষম হই। চিন্তাতে বিরত হইয়া, পাঠ বা কার্য্য করিতে পারি। বিজ্ঞান হইতে বিরত হইয়া, সাহিত্য বা চিত্রবিদ্যার আলোচনা করিতে সক্ষম হই। স্বয়ং কোন কার্য্য করিয়া ক্লান্ত হইলে, অন্যের সাহায্যে কার্য্য করা যায়।

(৬) স্বভাবদত্ত সুখ ব্যতিরেকে আমরা সুখের স্থান বৃদ্ধি করিতে পারি। জ্ঞান ও ধর্ম্মের আলোচনা ও উৎকর্ষ লাভই এই শ্রেণীর মধ্যে প্রধান। প্রকৃতি ও মনুষ্য জীবনের গূঢ় তত্ত্ব জানাই জ্ঞানের উদ্দেশ্য।

আমরা দেখিতেছি যে, সচরাচর যেরূপ মনে করিয়া থাকি, দুঃখ আমাদের সেরূপ অহিতকর সামগ্রী নহে। বরং আমরা অনেক সময় উহার ভিতর আমাদের হিতকর সামগ্রী লুকায়িত রহিয়াছে, দেখিতে পাই। সুতরাং সন্তুষ্ট চিত্তে আমাদের সকল অবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। দুঃখের অবস্থায় হৃদয়ে বল সঞ্চয় করিয়া নূতন উৎসাহ ও বীর্য্যের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের পক্ষে শ্রেয়। এবং সুখের সময় সাবধান পূর্ব্বক পদক্ষেপ করা উচিত। কেন না, সুখ দুঃখ উভয়ই আমাদের পরীক্ষার অবস্থা, উভয়ই আমাদের সহজে বিপথে লইয়া যাইতে পারে, এবং বোধ হয়, সুখের সে ক্ষমতা দুঃখের অপেক্ষা অধিক। সেই জন্য এক জন বিজ্ঞলোক বলিয়াছেন :—

"The trials of prosperity
As that of adversity
Must be guarded against."

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মিত্র।

মহারাষ্ট্র।

(৩)

থলঘাট দেখিতে হইবে বলিয়া প্রাতঃকালে পুনা হইতে রেল পথে যাত্রা করা হইল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে কথিত স্থানে গাড়ী আসিল। বোরঘাটের ন্যায় থলঘাটে পর্ব্বতের উপর দিয়া লৌহ-পথ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বোরঘাট শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনুমান হইল। রাত্রি ১০টার সময় নাসিক রোড ষ্টেসন হইতে টাঙ্গাযোগে তিন ক্রোশ যাইয়া উপাধ্যায়ের বাটীতে বাসস্থান পরিকল্পিত হইল। এই নাসিক দক্ষিণবাসীদের কাশী। কথিত আছে, শ্রীরামচন্দ্রানুজ এই স্থানে সূর্পনখার নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া জনস্থানের নাম নাসিক হইয়াছে। এখানে গোদাবরীকে গঙ্গা কহে। এই থান হইতে ৮ ক্রোশ দূরবর্ত্তী চক্রতীর্থ হইতে গোদাবরী উৎপন্ন হইয়া মহারাষ্ট্র, নিজাম রাজ্য, সরকার প্রদেশ দিয়া বঙ্গসাগরে পতিত হইয়াছে। দৈর্ঘ্য ৪৫০ ক্রোশ হইবে। বাটীর জল যেমন পয়ঃপ্রণালী দিয়া বাহির হইয়া বাটী পরিষ্কার রাখে, পৃথিবীর জল নদী দিয়া বহিয়া সেইরূপ ধরা পবিত্র করে। উৎপত্তি স্থান নিকট বলিয়া এখানে গোদাবরীর পরিসর ও গভীরতা অল্প। সে জন্য স্নান প্রভৃতির সুবিধা করণার্থ কুণ্ড ও প্রণালী নির্ম্মাণ করিতে হইয়াছে। স্থান বিশেষ উচ্চ নীচ হওয়ায় জলের পতন সুন্দর দেখায়। নদীর উভয় পারে বসতি ও দেবমন্দির, সুতরাং জল ভাঙ্গিয়া কুণ্ডের আলবালের সাহায্যে পার হইতে হয়। নানা স্থানের রাজগণ দেবালয় স্থাপন করিয়াছেন। মন্দিরের গঠন বহুবিধ। আমরা অতি আগ্রহের সহিত পঞ্চবটি দর্শন করিতে গেলাম, সেখানকার দৃশ্য অতি অকিঞ্চিৎকর। অতি অল্প দিনের পাঁচটী বটবৃক্ষ সমীপে এক খানি খোলার ঘরে সীতাদেবীর গহ্বর আছে। রামচন্দ্র যে রথে আরোহণ করিয়া অযোধ্যা হইতে আসিয়াছিলেন, ভক্তগণ অদ্যাপি এখানে তাহা দেখিতে পান। নাসিকের গোদাবরী তীর অতি রমণীয়। নগরে দর্শনীয় কিছু নাই। অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া জ্ঞান হইয়াছিল, কাশীর ন্যায় মনোরম নদীতীর জগতে আর নাই। এক্ষণে দেখিতেছি, নাসিক সে বিষয়ে হীন নহে। এখানে আমার চক্ষে কোনও কোনও বিষয় কাশীর গঙ্গাতীর অপেক্ষা সুন্দর দেখাইল। এখানকার গঙ্গার প্রবাহ সংকীর্ণ, সেজন্য উভয় পারে ঘট্ট ও মন্দির রচিত হইয়া বারাণসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময়ী মরাঠী ব্রাহ্মণ-ললনা সতত গোদাবরী কূল আলো করিয়া রহিয়াছেন। গৃহদেবীগণকে স্নানের পর পূজাদি করিতে প্রায় দেখা যায় না। গৃহকর্ম্মেই ব্যস্ত থাকেন। দিবাভাগে যে কোন সময়ে তীর্থ দর্শন করিতে যাও, দেখিবে, নাইরা বস্ত্র ধৌত করিতেছেন ও দূরে থাকিলে সোপানের উপরংবস্ত্র-তাড়নের পট

পট শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। নদীর তট এক স্থানে পর্ব্বতময়, সেই থানে পাহাড় কাটিয়া সোপান খোদিত হইয়াছে। চন্দ্রমা-শালিনী সন্ধ্যাকালে তদুপরি উপবেশন করিয়া দেবালয়ের রৌশনচৌকি শুনিতে শুনিতে এবং রামকুণ্ডের উপর প্রদত্ত দীপমালার জল মধ্যে নিক্ষিপ্ত রশ্মি নিরীক্ষণ করিয়া কাশীর অহল্যা বাইয়ের ঘাট মনে আসিল। কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে মহাদেব ত্রিপুরাসুর বধ করেন। তজ্জন্য গোদাবরী তট দীপ-আলিতে মণ্ডিত হইয়াছে ও দেওয়ালির উপঢৌকন দারুকাম অর্থাৎ পটাকা রমণী হস্তে পর্য্যন্ত শব্দায়মান হইয়া আনন্দলহরী তুলিতেছে। কপালেশ্বর রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতির অদ্য রাত্রে শিঙ্গার বেশ হইয়াছে। বহু নরনারী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। রাম লক্ষ্মণের মন্দিরে দুইটী অশ্ব সজ্জিত করিয়া সেবার জন্য বিগ্রহের সম্মুখ বর্ত্তী প্রাঙ্গণের দুই পার্শ্বে রাখা হইয়াছে। নদী তীরে শিবলিঙ্গের উপর পিত্তলের শিব মূর্ত্তি বসাইয়া দিয়াছে। আতুর সন্ন্যাসীদের সমাধিস্থান মার্জ্জিত করিয়া সন্তানগণ দীপ দিয়া উজ্জ্বল করিয়াছেন। পঞ্চ দ্রাবিড়দিগের মধ্যে প্রথা আছে, প্রাচীন গৃহস্থ মোক্ষ লাভ করিবার জন্য মৃত্যুকালে শঙ্করমার্গানুযায়ী সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেণ। সেই কারণে নাসিকে দুই চারি জন দণ্ডি থাকিলেও বহু সমাধি (গঙ্গাতীরে) দৃষ্ট হয়। কপুরথলার রাজার ইংলণ্ড যাইতে ইডন নগরে মৃত্যু হয়। তাঁহার শব গোদাবরী তীরে যে স্থানে দাহ করা হইয়াছে, তথায় একটী বেদী নির্ম্মিত হইয়াছে ও অন্য স্থানে তাঁহার স্মরণার্থ ইংরাজী প্রথানুযায়ী মন্দির রচিত হইয়াছে। এই স্থানে ফল মূল বিক্রয়ের হট্ট সমাবেশ হইয়া থাকে।' পর পারে সাপ্তাহিক হট্ট হয়। নদী তীরে আসিলে, সুতরাং, এ জনপদের সকল লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার জন সংখ্যা ২২৪৩৬।

পাণ্ডুলেনা অবশ্য দর্শনীয়। প্রথমতঃ বিবেচনা করিয়াছিলাম যে, পর্ব্বতে আরোহণ করিতে সমর্থ হইব না। বোধিসত্ত্বের কৃপায় চটি জুতা পায়ে থাকিলেও উঠিতে পারিলাম। আমি যত গুলি পর্ব্বত-খোদিত দেবালয় দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা দুরারোহ। ইহাতে অনেক গুলি বিহার নির্ম্মিত হইয়াছে। তদ্ অভ্যন্তরে নানাবিধ বৌদ্ধ মূর্ত্তি অধুনা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দেবতা হইয়াছেন। একটি কন্দরের বাহিরে পালি অক্ষরে অতি বিস্তৃত লিপি উৎকীর্ণ দেখিলাম। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর তাহার অর্থ প্রচার করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম কালে এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। এই লিখনে ভূমি প্রভৃতি দানের উল্লেখ আছে এবং যে অঙ্ক আছে, তাহা খ্রীষ্টীয় ১১৮ হইতে ১২০ দৃষ্ট হয়। বিদেশীয় পণ্ডিত কহেন, অশোকের অনুশাসন লিপির পূর্ব্বে লিখন প্রথা দৃষ্ট হয় নাই। উক্ত অক্ষর আমেনিয়ম বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন। ভারতীয় সকল প্রকার অক্ষরই সেমেটিক বর্ণমালা হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে। যাহারা ধর্ম্মে ইহুদি, দর্শন শাস্ত্রে গ্রীক্, রাজনীতিতে রোমান ও নীতি শাস্ত্রে স্যাক্সন্ জাতিকে উত্তমর্ণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ন্যায় পরদ্রব্যগ্রাহী ব্যক্তি যদি কহেন, আমাদিগের জ্যোতিষ গ্রীকদিগের নিকট শিক্ষিত ও লিপিকার্য্য আরমানিদের কাছে পাইয়াছি, তাহা সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। পাণ্ডুলেনায় একজন "ঘাটির" সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনি বোধ হয় প্রহরী, কিন্তু আমাদের

কাছে পাণ্ডার দাবি করিতে লাগিলেন। এ সকল মঠে আর বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। কলিকাতার একজন পীতবাসা যতিকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়াছিলাম। তিনি নেপালি বৌদ্ধ, তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করায় কহিলেন, শাক্য বংশ স্বাতিধর্ম্ম-ভিক্ষু। তিনি প্রত্যহ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ঘাটে স্নান পূজা করিতে আসেন। শেষগর্ভ নামক শালগ্রাম শিলার গাত্রে চন্দনের সহিত কুঙ্কুম কর্পূর প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া ভগবান বুদ্ধের মূর্ত্তি লেখনী দ্বারা অঙ্কিত করেন। তদনন্তর পাঞ্জিকা উদঘাটন করত তিথি নক্ষত্রের উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করা হইলে গন্ধপুষ্প অক্ষত সহকারে পূজা হইয়া থাকে। এক প্রকার সুগন্ধ চূর্ণের বর্ত্তি দ্বারা আরতি শেষ করিয়া " দেব লোকং গচ্ছ " প্রভৃতি কথিত হয়। ইত্যাকার অর্চ্চনাকে ভিক্ষু মহাশয় রত্নমণ্ডল সমাধি কহেন। শালগ্রামের গাত্রে বুদ্ধ মূর্ত্তি অঙ্কিত হইল দেখিয়া বোধিসত্ত্বকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া জ্ঞান হইল। শালগ্রাম শিলা এক প্রকার ত্বগাধার দেহ (Mollusca), শিরঃপদী (Cephalo poda), বর্গের বহু কোষ্ঠী (ammoniteda) জীবের দেহাবশেষ মাত্র। গঙ্গাপুরা নামক স্থানে গোদাবরীর একটি জল প্রপাত দেখিতে যাত্রা করা হইল। পাহাড়ের উপর হইতে অনেক নীচে, সুতরাং প্রবলবেগে জলরাশি উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করিয়া মহাশব্দে পতিত হইয়া ফেনিল হইয়া উঠিতেছে, সেই জন্য এই প্রপাতের নাম দুধস্থলি হইয়াছে। মন যদি অতি নীরসও হয়, তথাপি জলের এই উচ্ছ্বাসের সহিত হৃদয়কে উথলিয়া উঠিতে হইবে। বারিধারা ক্ষুব্ধ হইয়া যে স্থানে পতিত হইয়া নয়ন ভুলাইতেছে, সেখানে অবতরণ করিয়া কিছুক্ষণ নীরবে শিলাতলে উপবেশন করত ছবিখানি হৃদয়ে আঁকিতে চেষ্টা করিলাম। একজন জালিক জলের পতন-মুখে মৎস্য ধরিতে লাগিল।

ত্র্যম্বক ক্ষেত্র নাসিক হইতে ১০ ক্রোশ। এতদ্দেশীয় লোকের ভ্রম আছে যে, গোদাবরী শৈল-দুর্গোপরি উডুম্বরী মূলে উৎপন্না হইয়াছেন এবং সেই জন্য উক্ত স্থানের নাম গঙ্গা দ্বার ও তন্নিম্নে সেই অনুসারী কুশাবর্ত্ত প্রভৃতি স্থান তীর্থজীবিগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে। বাস্তবিক গৌতমী গঙ্গা এস্থানে উদ্ভূতা হন নাই। এখান হইতে যে ধারা বহির্গত হইয়া পয়ঃপ্রণালী দিয়া যাইতেছে, তদ্দ্বারা নালার কঙ্কর সিক্ত হইতেছে না। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায়, এখানে গঙ্গা গুপ্তা হইয়া যাইতেছেন। আমরা যখন ত্রি-অম্বকে পৌঁছিলাম, তখনও কার্ত্তিকী পূর্ণিমার উৎসব শেষ হয় নাই। ত্র্যম্বকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে গণ্য। ব্রাহ্মণেতর বর্ণ এবং পট্ট বস্ত্র পরিহিত না হইলে ব্রাহ্মণগণও দেব সমীপে উপস্থিত হইতে পারে না। বাজিরাও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ত্র্যম্বকেশ্বরের সুবৃহৎ মন্দির দর্শন করিয়া, প্রকৃত প্রস্রবনের উপর শয়ান শেষশায়ী প্রভৃতি অনেক বিগ্রহ যুক্ত চৌদিকে মণ্ডপ বিশিষ্ট উৎসজল পূর্ণ কুশাবর্ত্ত নামক মনোহর কুণ্ড-সমীপে মহামরী দেবীর বলি প্রেরণ দেখিতে উপস্থিত রহিলাম। এ গ্রামে তিন সহস্র লোকের বাস। প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট একমুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া অন্নপাক করা হইয়াছে। এক খানি গরুর গাড়ীতে ভাত বোঝাই দিয়া তাহার উপর রক্তবর্ণ চূর্ণ প্রক্ষেপ করিয়া ইক্ষুদণ্ড ও প্রজ্জ্বলিত মশাল

প্রোথিত করিয়া দিলে, অগ্নিহোত্রী ও দেশমুখ সেই স্থানেই দেবিকে বলি [ভাতের গাড়ী] নিবেদন্ করিয়া দিলেন। যুগন্ধরের উপর একটী নারিকেল ভগ্ন করিয়া বাদ্যোদ্গমের সহিত শকট পরিচালন করা হইল। বলি গ্রামের বাহির দিয়া আসিয়া, তবে জানপদ গণ অদ্য ভোজন করিতে পারিবেন। পাণ্ডা গণপতি শঙ্কর শুকুল মহাশয়ের বাটীতেই আমা দের আহার করা স্থির হইল। আমার সহচর বিদেশীয়ের অন্ন গ্রহণ করিবেন না বলিয়া "মুরমুরে"[মুড়ী] ও পেঁড়া খাইলেন। উপাধ্যায় পত্নীরা পরিবেশন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ পাতের উপর দুই তিন প্রকার চাট্নি একটী বধূ দিয়া গেলেন। অন্য জনে প্রত্যেক পাত্রে একটি করিয়া দোনা রাখিয়া দিলেন। তৃতীয় যাতা অন্ন আনিলেন। ভাত অতি অল্প পরিমাণে দিতে দেখিয়া ভাবিলাম, এ দেশের লোকের আহার কি এত কম? আমাদের গ্রাম্য ভাষায় যাহাকে ডাবু বলে, সেই হাতায় করিয়া চাপিয়া এক হাতা ভাত পাতের উপর উল্টাইয়া ঢালায় মাথাটী গোল হইয়া রহিল, যে দোনা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে তরল ঘৃত প্রদত্ত হইলে এবং অধি কাংশ ব্যঞ্জন দিলে পর ভোজন আরম্ভ হইল, যে উপকরণটি ওদনের সহিত মুখে দেওয়া যায়, হয় কটু নতুবা অম্ল। এত ঝাল যে কিছুতেই আমি গলাধঃকরণ করিতে সমর্থ হইলাম না। পরিবেশন কারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "তুপ" চাই। আমি বুঝিতে না পারায়, কি বস্তু প্রশ্ন করায়, তিনি কহিলেন, ঘৃত। ভোজনের প্রথম অবস্থায় ঘৃত আব-শ্যক হয় জানি, সুতরাং কহিলাম, না। তাহার পর "পোলি" দিয়া গেল। সিদ্ধ বুটের ডাল শর্করা যোগে দলিয়া যে রুটিতে পুর দেওয়া হয়, তাহার নাম "পুরন্-চ্যা পোলি"। উষ্ণ ঘৃতে নিমজ্জিত করিয়া তাহা খাইতে হয়। পুনর্ব্বার ঘৃত আনিলে আমি ঘি চাহিয়া লই-লাম, এবং পোলি দ্বারা উদর পূরণ করিলাম। যে পোলি পরিবেশন হইতেছিল, তাহাও উষ্ণ। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, রুটি মহা রাষ্ট্রীয়দের প্রধান খাদ্য, এই জন্য ভাত অল্প করিয়া প্রথমে দিতে হয়। একটি বৌ ক্লান্ত হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, বাইজি তুমি আহার করিতে কেন বস নাই। তিনি কেবল, না, কহিলেন। পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক আহার করিতেছিলেন, তিনি কহিলেন, ইনি দের রাণী, অর্থাৎ কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী, কে অগ্রে উঁহাকে দিবে? পুনায় একদিন মরাঠী আহার করিয়াছি, তাহার উপকরণ ও চুক্র আমাদের পক্ষে অখাদ্য। সুপ ও শাক একত্রে —কচু শাক কুটিয়া দিয়া ডাল রন্ধন হইয়া ছিল। তাহা এত ঝাল যে, দুই একবারের অধিক মুখে দেওয়া সম্ভব নহে। অকিঞ্চিৎকর কড়ী খাইয়া দেখিলাম। একটি চুক্রের অত্যন্ত গুণ শুনিলাম, তাহার নাম সার। পাচক কহিলেন, এদেশে সকলে ইহা পাক করিতে জানে না। ইহা কর্ণাট দেশীয় সামগ্রী। ইহাতে আবার ঔষধের কাজ হয়, জ্বর হইলে সার উপকারী। এই অমূল্য বস্তু জিহ্বায় প্রদান করিয়া দেখিলাম, পক্ক তিন্তিড়ী গুলিয়া লঙ্কা সহযোগে ধনিয়া শাক বাসিত করা হইয়াছে। সেদিন অম্ল ও কটু রস বিহীন ডাল ভাতে পাইয়াছিলাম, বলিয়া কিছু ওদন উদরস্থ করিতে পারিলাম। স্বাদ গ্রহণের জন্য একখানি জওয়ারা ও আর এক খানি গোধূমের রোটিকা দিয়াছিলেন। জওয়ারার রুটি দেখিতে মলিন, কিন্তু গোধূম অপেক্ষা

মিষ্ট। রুটি ঘি মাখা নহে, কিন্তু দুধে ফেলায় ময়ানের ঘৃত ভাসিতে লাগিল। বাজরীর রুটি তৃতীয় স্থানীয়, কৃষাণ প্রভৃতি এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকে তাহা দ্বারা জীবন ধারণ করে। চৌধরি নামক এদেশের এক তরকারি আমরা পুনা ও বোম্বাইতে বাঁধিয়া খাইয়াছি। শিখরেণ বড় প্রসিদ্ধ খাদ্য, দধি জলহীন করিয়া সর্ক্বা, এলাফল এবং এবং কুঙ্কুম মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়। আমরা বাজারে ক্রীত যে শিখরেণ খাইয়াছি, তাহা বিশেষ সুখাদ্য নহে। অনেক হিন্দুর চা ও কাফি-পানিয়ের দোকান বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে আছে। ত্র্যম্বকে গঙ্গাদ্বারের ৩২টী সোপান উঠিয়া "ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধর্ম্মখ্যাতা চে মালক" রঘুনাথ বাপু শাস্ত্রী কবীশ্বর "ধর্ম্মপেটী" লইয়া বসিয়া আছেন। তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিনী কর্ত্তৃক প্রস্তুত চা পান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, এবং বিদায় কালে কহিলেন, আমার বাটীতে পান সুপারি লইতে যাইও।

শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত।

প্রাচীন-বংশ-বিবরণ [৩য়]

[৭ খণ্ড, ১১ সংখ্যার পর]।

মরীচি ও কলা, পূর্ণমাস, বিরজ ও বিশ্বগা।

কোন কোন মতে ব্রহ্মার মানসানুসারে মরীচি প্রভৃতি, স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রত্ব স্বীকার করেন, এই জন্য সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমারের ন্যায় তাঁহারাও ব্রহ্মার মানসপুত্র বলিয়া খ্যাত। মহর্ষি মরীচি, কর্দ্দম মুনির ঔরসজাত ও দেবহুতির গর্ভোদ্ভূত কলার পাণিগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, কলার অপর নাম কলাবতী। কলার গর্ভে ও মরীচির ঔরসে কশ্যপ ঋষি ও পূর্ণমাস সম্ভূত হন। পূর্ণমাসের বিরজ ও বিশ্বগা দুই সন্তান।

কশ্যপ ও নিধ্রুব-কন্যা।

কশ্যপ নামে এক অসাধারণ জ্যোতির্ব্বেদা ছিলেন। জ্যোতির্ব্বিৎ কশ্যপ, ও মরীচিসুত কশ্যপ, দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি, কি এক ব্যক্তি নিঃসংশয় বলা কঠিন। অনেকের মতে মরীচিপুত্র কশ্যপই জ্যোতির্ব্বিদ্যা জানিতেন। অপর কাহার কাহারও মতে কশ্যপ-গোত্রীয় অন্য এক জন জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। শেষোক্ত মত সবিশেষ যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীত হয়। মহাভারতের বনপর্ব্বে বর্ণিত আছে, কৌশিকী-নাম্নী তটিনীর তীর-সান্নিধ্যে ভগবান্ কশ্যপ মুনি "পুণ্য" নামক আশ্রমে তপস্যা করিতেন। কৌশিকী নদী, গঙ্গার উপনদী, উহা প্রাচীন গৌড়দেশের সীমার অন্তর্গত। মহাভারতের রাজধর্ম্ম পর্ব্বাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে, যখন পরশুরাম, কশ্যপকে তাঁহার অধিকৃত স্থান দান করেন, তখন ঋষিবর কশ্যপের ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে হয়। কেন না, তথায় তাঁহার বাসোপযোগী স্থান নাই। তদনুসারে পরশুরাম, দাক্ষিণাত্যের সমীপস্থ সমুদ্রতটে

গমন করেন (৭)। কশ্যপের আত্মজ কাশ্যপ, তাঁহার নামান্তর শণ্ডিল। দ্বিতীয় পুত্র বিবস্বান্। বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনু। বৈবস্বত মনু হইতেই চন্দ্রবংশ ও সূর্য্যবংশের উৎপত্তি। একমাত্র ঋষিপ্রবর কশ্যপ হইতেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হন। কশ্যপের সংস্রবে কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ভারদ্বাজ প্রভৃতি অনেক গোত্র সম্ভূত হইয়াছে। তিনি নৈঞ্রবসুতাকে ধর্ম্মপত্নীপদে গ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয়, অদ্যাপি নৈঞ্রবাত্মজার প্রকৃত আখ্যা জানিতে পারা গেল না। নৈঞ্রব-তনয়া ব্যতিরিক্ত দক্ষের ঔরসোদ্ভূত ও প্রসূতির গর্ভজাত অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রভা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু, এই ১৩ তের পত্নী ছিলেন। এতদ্ভিন্ন আর কোন বনিতার অস্তিত্ব জ্ঞাত নহি। কশ্যপনন্দন কাশ্যপই, সূর্য্য-সারথি বলিয়া বর্ণিত। অরুণ ও অনরু, তাঁহার নামান্তর। তিনি গরুড়ের জ্যেষ্ঠ।

জ্যেষ্ঠা পত্নী অদিতির গর্ভে ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু, এই দ্বাদশ পুত্র জন্মে। ইঁহারা সাধারণতঃ আদিত্যগণ নামে খ্যাত। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ত্বষ্টার পুত্র। দ্বিতীয়া বনিতা দিতির সন্তান হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। হিরণ্যকশিপুর প্রহ্লাদ, সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, শিবি ও বাস্কল ৫ পাঁচ পুত্র। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন, তৎপুত্র বলি। বলির তনয় বাণ। ইঁহারাই দৈত্য বলিয়া খ্যাত। তৃতীয়া ভার্য্যা দনুর গর্ভজাত অপত্যেরা, দানব আখ্যায় সর্ব্বত্র পরিজ্ঞাত। চন্দ্র ও সূর্য্য নামে দনুর দুই আত্মজ ছিল। বাতাপি, দনুর পৌত্র। অগস্ত্য মুনি কর্ত্তৃক বাতাপির ধ্বংস হয়। কশ্যপের চতুর্থ বনিতা কালার বহু তনয়। সকলেই অসুর মধ্যে গণনীয়। কালার অপর নাম কাষ্ঠা। পঞ্চম পত্নী দনায়ুরও ৪ চারি সন্তান—বিক্ষর, বল, বীর ও বিত্র এবং পুলোমা নাম্নী এক সুতা। ভৃগুর সহিত ঐ কন্যার বিবাহ হয়। কশ্যপের ষষ্ঠ জায়া সিংহিকার রাহু, সুচন্দ্র, চন্দ্রহন্তা ও চন্দ্রপ্রমর্দ্দন ৪ চারি সন্ততি। সপ্তম ভার্য্যা ক্রোধা ও নবম ভার্য্যা বিশ্বার বিষয়ে বক্তব্য নাই। কশ্যপ ঋষির অষ্টমা প্রিয়তমা প্রভা। তাঁহার অপত্যের মধ্যে সুর, গন্ধর্ব্ব ও অসুরের উৎপত্তি দেখা যায়। বিশ্বাবসু ও ভানু এই পুত্রদ্বয়, দেবতা বলিয়া খ্যাতাপন্ন। গন্ধর্ব্বের ভিতর অপ্সরাও এক স্বতন্ত্র শ্রেণী। ইহার তাৎপর্য্য এই, পুরুষেরা গন্ধর্ব্ব ও স্ত্রীগণ (কেশিনী, রম্ভা, তিলোত্তমা, মিশ্রকেশী, বিদ্যুৎপর্ণা, অলম্বুষা ও মনোরমা ইহারা) অপ্সরা নামে পরিচিত। দশম সহধর্ম্মিণী বিনতার অরুণ ও গরুড় ২ দুই পুত্র। একাদশ ভার্য্যা কপিলা (৮) হইতে অমৃত, বিপ্রজাতি প্রভৃতি উৎপন্ন হন। দ্বাদশ প্রণয়িনী মুনির পুত্রেরা সর্পজাতি। ত্রয়োদশ জায়া কদ্রু। তিনি অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলার, কর্কট ও শঙ্খ, এই অষ্ট নাগের জননী।

---

(৭) গচ্ছ তীরং সমুদ্রস্য দক্ষিণস্য মহামুনে।
ন তে মদ্বিষয়ে রাম। বাস্তব্যমিহ কর্হিচিৎ॥
ততঃ শূর্পারকং দেশং সাগরস্তস্য নির্ম্মমে,
সহসা জামদগ্ন্যস্য সোঽপরান্ত-মহীতলং॥
শান্তিপর্ব্ব, রাজধর্ম্ম, ৪৯।—৬৬ ৬৮।

(৮) কপিলা নাম্নী অপর এক মহিলা অতি প্রসিদ্ধ। তিনি আসুরিক পত্নী। আসুরি, কপিলের শিষ্য। আসুরির শিষ্য পঞ্চশিখ, কপিলার নিকট তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা করেন।—শান্তিপর্ব্ব, ২১৮ অধ্যায়।

কশ্যপ ঋষি, বেদ-শাস্ত্রের কোন কোন অংশ প্রণয়ন করেন। চরণবুহ্য, শৌনক-প্রণীত প্রাতিশাখ্য, শৌনক-প্রণীত বৃহদ্দেবতা, আর্য্য-বিদ্যাসুধাকব, মধুসূদন সবস্বতীর প্রস্থানভেদ প্রভৃতি গ্রন্থে বেদেব বিশেষ বিশেষ বিভাগাদি পাঠে এবং ঋগ্বেদ সংহিতাব "সর্ব্বানুক্রমণিকা", আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র ইত্যাদি ঋষি-বিবচিত গ্রন্থাধ্যয়নে ঋক্‌-প্রণেতা ঋষিবর্গেব নামাদি জ্ঞাত হওয়া যায়। কশ্যপ ঋষি, বেদেব যে যে ভাগ প্রণয়ন করেন, তত্তাবৎ বেদব্যাস-সংগৃহীত ঋগ্বেদ-সংহিতায় নিবদ্ধ আছে। ঋগ্বেদ-সংহিতায় মণ্ডল, অনুবাক, সূক্ত, ঋক্‌ প্রভৃতি পারিভাষিক শব্দ দৃষ্ট হয়।

"মণ্ডল, অনুবাক, সূক্ত ও ঋক্‌ কাহাকে বলে, সহজ করিয়া না বলিলে, অনেকেই বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া, এস্থলে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখিত হইতেছে। সর্ব্বাগ্রে মূল বেদ পদার্থটি কি, বলা আবশ্যক। যখন লেখার সৃষ্টি হয় নাই, তাহার কত শত যুগ পূর্ব্বে যে, বেদেব উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। সাহেবেরা বেদেব সময়-সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করুন না কেন, বেদ যে অতি প্রাচীন, তাহা আমাদের দেশের কোন কোন বেদজ্ঞ পণ্ডিতে সাব্যস্ত করিয়াছেন। সে যাহা হউক, প্রথমাবস্থায় বেদশাস্ত্র, ঋষিগণের ও তাঁহাদিগেব শিষ্য-পরম্পরার মুখে মুখে অভ্যস্ত হইত। এই জন্যই বেদ-বিদ্যার অন্য এক নাম শ্রুতি, অর্থাৎ শ্রবণ-পরম্পরায় আগত শাস্ত্র। এখন যেমন আমবা ৪ চাবি বেদ বলিয়া জানিতেছি, ঐরূপ সময়ে এবং তাহাব বহু পরেও বেদ, ঐ রূপে বিভক্ত ছিল না। তখন পদ্য, গদ্য ও গান, এই ৩ তিন মাত্র ভাগ ছিল। তাহাও সুশৃঙ্খলা ক্রমে বিন্যস্ত থাকিত না। পদ্য-গদ্যকে তান-মান-লয়-স্বব-সংযোগে পাঠ করাতে, ১ একটী ভাগ হয়, তাহারই নাম গান। এই রূপ ভাবে বহুকাল গত হইলে পর, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, সমস্ত শ্রুতি সঙ্কলন পূর্ব্বক তাহা চারি অংশে বিভক্ত করেন। বেদকে ব্যাস (অর্থাৎ বিভাগ) কবাতেই, তাঁহার বেদব্যাস (অর্থাৎ বিভাগ-বেদ-কর্ত্তা) আখ্যা হইয়াছে। তাবৎ পদ্য ভাগকে ঋক্‌, গদ্য ভাগকে যজুঃ কহে এবং পদ্য বা গদ্য ভাগকে সুরে গীত করিলে, তাহাকে সাম বলে। অথর্ব্ব ঐ ৩ তিনেব সমষ্টি। এইরূপে বেদ ৪ চারি খণ্ডে বিভক্ত হয়। * * * ঋগ্বেদের প্রত্যেক কবিতা বা শ্লোকেব নাম ঋক্‌। কয়েকটী ঋক্‌ লইয়া একটী অনুবাক হয়। কয়েকটী অনুবাক লইয়া, এক একটী মণ্ডল হয়। সমগ্র ঋগ্বেদ-সংহিতা এইরূপ ১০ দশ মণ্ডলে বিভক্ত। মণ্ডলকে পরিচ্ছেদ, অনুবাককে অধ্যায়, সূক্তকে প্রকবণ এবং ঋককে শ্লোক বা কবিতা বলিয়া বুঝিলেও, কোন ক্ষতি নাই।" (৯)

কশ্যপ মুনি মহোদয়, ত্রিষ্টুপ্‌, দ্বিপদা, গায়ত্রী, পঙ্‌ক্তি, বৃহতী ও সতোবৃহতী, এই ছয় প্রকার ছন্দে অগ্নি, বিশ্বদেব ও পবমান (অর্থাৎ ক্ষরণশীল) সোমের বৃত্তান্ত ১০১ এক শত একটি ঋকে কীর্ত্তন কবিয়াছেন। ব্যাসদেব, কশ্যপের রচিত অংশ সমুদায়, ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম, অষ্টম ও নবম মণ্ডলে নিবেশিত করিয়াছেন। উল্লিখিত তালিকা-সম্বন্ধে ঐ স্থলে কিঞ্চিৎ বলা বিধেয়। ৮ অষ্টম মণ্ডলের ২৯ উনত্রিশ সূক্তের রচনা-বিষয়ে ঋষিদের মধ্যেই মতান্তর লক্ষিত হয়। কাহারও কাহারও মতে উক্ত সূক্ত, বৈবস্বতমনু-

(৯) মৎপ্রণীত প্রাচীন আর্য্য রমণীগণের ইতিবৃত্ত, ৮৯ ও ৯০ পৃষ্ঠা দেখ।

প্রণীত। ৯ নবম মণ্ডলের ১০৭ সপ্তাধিক শততম সূক্তটি কেবল কশ্যপ ঋষির সঙ্কলিত নয়, কশ্যপ, ভরদ্বাজাদি ৭ সপ্তর্ষি কর্তৃক সঙ্কলিত।

কশ্যপ মহোদয়ের বিরচিত বেদ-মন্ত্রের তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

কোন্ মণ্ডল	কোন্ সূক্ত	ঋকের সংখ্যা	দেবতার নাম	ছন্দের নাম
১। প্রথম মণ্ডল	৯৯ সূক্ত	১ একটি	অগ্নি	ত্রিষ্টুপ
*২। অষ্টম মণ্ডল	২৯ সূক্ত	১০ দশটি	বিশ্বদেব	দ্বিপদা
৩। নবম মণ্ডল	৬৪ সূক্ত	৩০ ত্রিশটি	পবমান সোম	গায়ত্রী
৪। ঐ	৬৭ সূক্ত	৩ তিনটি	ঐ	ঐ
৫। ঐ	৯১ সূক্ত	৬ ছয়টি	ঐ	ঐ
৬। ঐ	৯২ সূক্ত	৬ ছয়টি	ঐ	ত্রিষ্টুপ
৭। ঐ	১০৭ সূক্ত	২৬ ছাব্বিশটি	ঐ	বৃহতী, সতোবৃহতী, *দ্বিপদা
৮। ঐ	১১৩ সূক্ত	১১ এগারটি	ঐ	পঙ্ক্তি
৯। ঐ	১১৪ সূক্ত	৪ চারিটি	ঐ	ঐ

১০১ একশ এক

কশ্যপ-প্রণীত কতিপয় ঋকের বঙ্গানুবাদ পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

"সর্ব্বভূতজ্ঞ বহ্নির উদ্দেশে আমরা সোম অভিষব করিতেছি। আমাদের উপর যাহারা বিপক্ষবৎ ব্যবহার করে, বহ্নি। তাহাদের অর্থনাশ করুন। নৌকার সাহায্যে যেমন নদী উত্তীর্ণ হওয়া যায়, আপনি আমাদিগকে সমস্ত ক্লেশ হইতে নিস্তার করুন। আপনি আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিন।
—[১ মণ্ডল, ৯৯ সূক্ত, ১ ঋক।]

"ক্ষরিত হইতেছে, এ প্রকার সোমের আধারে যিনি শুশ্রূষা করেন, যিনি, তাঁহার মনোমত কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তিনিই সৌভাগ্যবান্। হে সোম। ইন্দ্রের নিমিত্ত তোমার ক্ষরণ হউক।—[৯ মণ্ডল।]

"হে কশ্যপ ঋষি। মন্ত্র-রচয়িতারা যে সকল স্তোত্র প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন পূর্ব্বক তুমি স্বীয় বাক্য বর্দ্ধিত কর। সোম রাজাকে প্রণিপাত কর। তিনি যাবতীয় উদ্ভিদের মধ্যে প্রধান।"—[ঐ মণ্ডল।]

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

ভক্তিকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২৪৩। ভক্ত, এক সুন্দর পুরুষ কিম্বা এক সুন্দরী স্ত্রী মূর্ত্তি দেখিলে বলেন যে, যেমন ইহার বাহিরে দেখিতেছি অনিত্য মনোহর দৃশ্য, তেমনি করে ইহার অন্তরের নিত্য মনোহর শোভা প্রকাশিত হইয়া ইহার ব্যবহারে দীপ্তিমান হইবে!

২৪৪। লম্পট পাপী অপেক্ষা কুলটা পাপীয়সীর মূর্ত্তি অধিকতর জঘন্য ও ঘৃণিত, কারণ ঐরূপ পাপী অপেক্ষা ঐ রূপিণী পাপীয়সী জন সমাজের অধিকতর অনিষ্টোৎপাদন করে।

২৪৫। জ্ঞান চক্ষে ঈশ্বর নিরাকার ও ভক্তি চক্ষে তিনি সাকার রূপে দৃষ্ট হন। জ্ঞানী উপাসক ভোজনে বসিবার পূর্ব্বে মঙ্গলময়ের নিকট পশ্চাৎ লিখিত রূপে প্রার্থনা করেন, হে মঙ্গলময়। তোমারই মঙ্গল বিধানে এই অন্ন ব্যঞ্জনাদি পাইতেছি। তোমারি মঙ্গলময় চরণে সকৃতজ্ঞচিত্তে প্রণাম করিয়া উহা গ্রহণ করি।

ভক্ত উপাসক ঐ কালে যাহা বলিয়া প্রার্থনা করেন, তাহা এই,—মা গো, তুমি অন্নপূর্ণারূপ ধারণ করিয়া নিজ হস্তে এই সকল অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া তোমার এই পাপী সন্তানের ক্ষুধা তৃষ্ণার শান্তির জন্য এখানে অধিষ্ঠান হইয়াছ। মা গো, তোমার স্নেহময় চরণে শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, বিশেষ নির্ভরতা ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তরে প্রণাম করিয়া তব প্রসাদ অন্ন পান গ্রহণ করি। ...মায় রক্ষা কর। আমার শরীর, মন সুস্থ ... পবিত্র কর।

এই দুই প্রার্থনার মধ্যে প্রভেদ হৃদয়ঙ্গম করিলে, প্রথম উল্লিখিত কথা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইবে।

২৪৬। প্রকৃত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম তিনি, যাঁহার জীবন নানা সদনুষ্ঠানে পবিত্র ও উন্নত হয়। এ প্রকার পবিত্রতা ও উন্নতি বিনা সামাজিক অনুষ্ঠানের কিছু মাত্র গৌরব নাই। নিত্য জীবনের উন্নতি অবহেলা করিয়া অনিত্য জীবনের উন্নতির জন্য লোকে সচরাচর বড়ই ব্যস্ত। ব্রাহ্মেরা সেই পথের পথিক হইলে তাঁহাদিগের নিশ্চয় প্রভূত অনিষ্ট ঘটিবে। নিত্য জীবনের উন্নতি অবহেলা করিয়া যিনি অনিত্য জীবনের জন্য ব্যস্ত, তিনি অতি ভ্রান্ত ও মোহিত।

২৪৭। যিনি হন যত মাটি, তিনি হন তত খাঁটি।

২৪৮। যে উদ্দেশে যাহার সৃষ্টি, তদন্যথাচরণই তদীয় শ্রীহীনতা, তাহাই পাপ, তাহাই অপবিত্রতা।

২৪৯। যাহা ইহলোকে, পরলোকে, অনন্ত জীবনে নিরবচ্ছিন্ন সুখের কারণ হয়, তাহাই পবিত্রতা। যাহা অনন্ত সুখাবহ, তাহাই পবিত্রতা।

২৫০। এ প্রদেশে বিবাহের পর বিবাহিত পুরুষ যে নারীর পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার পতি, স্বামী, ভর্ত্তা প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। এই সকল শব্দের অর্থ প্রভু। বিবাহিতা স্ত্রীর প্রভু তাঁহার স্বামী বিনা আর কেহ নাই। তিনি তাঁহার সেবায় কায়মনো-

বাক্যে যাবজ্জীবন নিযুক্ত থাকিবেন। তাহাই তাঁহার ব্রত। সে ব্রত পালনে তিনি পবিত্রতা ও কৃতার্থতা লাভ করিবেন। স্বামী-পূজা সম তাঁহার কোন ব্রত নাই।

২৫১। ব্রাহ্মধর্ম্ম মার্জ্জিত ও বুদ্ধি সম্পন্ন উন্নতমনা ও প্রেমিক হৃদয়বান ঋষিদিগেরই গ্রহণোপযোগী ধর্ম্ম। সর্ব্বসাধারণে ইহা গ্রহণে অসমর্থ। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম ঋষি ধর্ম্ম নামে অভিহিত হওয়া উচিত। কবে যে সর্ব্বসাধারণে ইহা গ্রহণে যোগ্য হইবে, তাহা সেই পূর্ণ জ্ঞানময় ও অনন্ত মঙ্গলময়ই জানেন।

২৫২। মঙ্গলময় কত রূপে কত প্রকারে তাঁহার ভক্তদিগকে দর্শন দেন। তন্মধ্যে সচরাচর দুইটি দৃষ্ট হয়। একটি এই যে, তিনি তাঁহার রচনায় তাঁহার গুণ প্রকাশে দেখা দেন। অপরটি বড় দুর্লভ। সেটি এই, তাঁহার ভক্তের প্রাণে তিনি তাঁহার জ্যোতি অত্যাশ্চর্য্য রূপে প্রকাশ করেন। যে তাহা ভোগ করিয়াছে, সে তাহা জানে।

২৫৩। ভক্তজীবন পবিত্রতার ভিখারী। তিনি কেবল শব্দগত, শারীরিক, মানসিক, বাচনিক ও আধ্যাত্মিক পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টি রাখেন না। তিনি এ সকল বিষয়ক পবিত্রতা লাভের জন্য তাঁহার বাসগৃহ ও তৎস্থিত দ্রব্যাদি ও পরিধেয় বস্ত্র অলঙ্কারাদির পবিত্রতা চাহেন। তিনি তাঁহার বাসস্থানের চতুর্দ্দিকের পথাদি ও প্রতিবেশীদিগের পবিত্রতার জন্য যত্নযুক্ত হন্। তিনি অর্থ ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয়-ব্যবহারে পবিত্রতা রক্ষার জন্য বড়ই কাতর হন্। তিনি সামাজিক পবিত্রতা ভোগের জন্য সদাই চিন্তিত। তাঁহার আহার, পানীয় ও সেবনীয় বায়ুর পবিত্রতার জন্যও তিনি কাতর। পবিত্রতাময় তাঁহার জীবন। এরূপ জীবনই সার্থক।

২৫৪। ক্রোধ, ভক্ত জীবনের যেরূপ বিষম শত্রু, তাহাতে তাহার আক্রমণ হইতে ভক্তের আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। যে যে উপায়ে তাহা করিবার সম্ভাবনা, তন্মধ্যে পরম পবিত্র স্বরূপের বর্ত্তমানতা সর্ব্বক্ষণ অনুভব করা সর্ব্বপ্রধান। তাহার পর ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও প্রশান্ত ভাব সর্ব্বদা ধারণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ শরীর ও মনের সুস্থতা ও পবিত্রতা যাহাতে রক্ষা পায়, তাহার উপযোগী অবস্থায় অবস্থিতি করিবার বিশেষ রূপে চেষ্টা করা উচিত। জীবন্ত ঈশ্বরের প্রেম সম ঐ শত্রু দমনের উপায় নাই।

২২৫। অহঙ্কার, অসত্য মূলক। সুতরাং উহা মানব হৃদয় মনকে অসত্যে, অন্ধকারে ও মৃত্যুতে লইয়া যায়। ধর্ম্ম সাধনের উহা বিষম শত্রু। অজ্ঞানান্ধকারাবৃত ক্ষুদ্র মনেতে উহা স্থান পায়।

২৫৬। অর্থলোলুপ ব্যক্তিই যথার্থ দরিদ্র। তাহার ধন থাকিতে ধন নাই। সে সর্ব্বদাই ধন লালসার অধীন হইয়া ধনাগমের জন্য চিন্তিত ও ব্যস্ত। তাহার ধন তৃষ্ণার কিছুতেই শান্তি হয় না। সে কি সৎ কি অসৎ উপায়, যে কোন প্রকারে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিলেই সন্তোষ লাভ করে। এ প্রকার ব্যক্তির লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু হইবে, আশ্চর্য্য কি? সেই পাপাত্মাই দরিদ্র।

২৫৭। যখন তব ও মথ হেরি
তখন সব দুঃখ পাশরি।

২৫৭। পরমাত্মাই মানব প্রাণের পরম ও নিত্য ভোগ্য। তিনিই তাহার পরম বাস স্থান। তাঁহাসই পবিত্র সহবাস মানবাত্মার

নিত্যানন্দ, নিত্য শান্তি ও নিত্য মঙ্গল। সেই অনাদি, অনন্ত, সত্য, নিত্য, একমেবাদ্বিতীয়ং, মঙ্গলপূর্ণ, স্বয়ম্ভূ ও স্বপ্রকাশের পবিত্রতম ও শোভনতম চরণে মানব প্রাণ একীভূত ও বিলীন হইয়া নিরাপদে থাকিবে, নিত্যকাল ভোগ করিবে তাঁহার অজস্র ও অনন্ত মঙ্গলামৃত বর্ষণ। সেই অদ্বিতীয় বিনা নিত্য সত্তা আর কিছুই নাই।

২৫৯। যে হয় পরের ভালর জন্য যত ছোট, সে হয় যথার্থত তত বড়।

২৬০। মানুষের নিকট সকল আশা হয় না পূরণ, প্রাণনাথের মঙ্গল অভিপ্রায় সাধন কারণ।

২৬১। সরোবর তীরে ঘোর অন্ধকারে সজ্জীভূত আলোক মালা তদীয় জলে প্রতিবিম্বিত হইলে, যেমন তাহা অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হয়, সেই রূপ ভক্তি-সরোবরে ভক্তনাথের পবিত্রতার জ্যোতি তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইলে, উহা পরম রমণীয় মনঃতৃপ্তিকর শোভা ধারণ করে।

২৬২। ধর্ম্মরাজ্যে সচরাচর দুই দল সুন্দর বেশধারী লোক দৃষ্ট হয়। এক দল গড়িতেছে ও অপর দল ভাঙ্গিতেছে। গড়া ও ভাঙ্গা, এই দুই কার্য্যের জন্য তাহাদিগের মধ্যে নিরন্তর দেবাসুরের যুদ্ধ চলিতেছে। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, মনু, ঈশা, মূষা, বুদ্ধ, মহম্মদ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি মহাত্মাগণ গঠন কার্য্যের জন্য ব্যস্ত ছিলেন, এবং তাঁহাদিগের মত ঐ কার্য্যে যাঁহারা এখনও বহুযত্ন সহকারে নিযুক্ত হইতেছেন, তাঁহারাই দেব পদ বাচ্য, তাঁহাদিগের জীবনই ধন্য। আর যে সকল ভদ্র বেশধারী ভ্রান্ত মানব সন্তান দেবতাদিগের বহু আয়াসে গড়া সামগ্রী ভাঙ্গিবার জন্য সদাই চিন্তিত ও চেষ্টান্বিত, তাহারাই অসুরের নীচ পদে অবনত। তাহারাই ধর্ম্মরাজ্যে দস্যু, দানব, রাক্ষস, বানর। তাহারা আপনারা অবিশ্বাসী ও ঈশ্বর ভক্তিতে বঞ্চিত হইয়া দুর্ব্বল ও অর্ব্বাচীন ভক্তিরসপানার্থীদিগের নব কোমল বিশ্বাস ও ভক্তি-কলিকা অপহরণ ও তাহাদিগের হৃদয় মধুময় ভক্তি ও শান্তিবিহীন করিয়া থাকে। এই পাপাত্মাদিগকে মঙ্গলময় সুমতি দিন ও তাহাদিগের দুর্গতি নিবারণ করুন।

২৬৩। একমেবাদ্বিতীয়ং বিনা কেহই পারেন না, মানবাত্মাকে পাপ হইতে মুক্তি ও অনন্ত মঙ্গল দান করিতে। ইহা তাঁহার অদ্বিতীয় স্বরূপের উজ্জ্বল মহিমা। তিনি ভিন্ন মানবের নিত্য জীবনের ভোগ্য পরমানন্দ, পরমামৃত, পরম শান্তি, পরম পবিত্রতা প্রভৃতি পবিত্রতর রসবর্ষণ করিবার কাহারও সাধ্য নাই। দেবপদ বাচ্য তাঁহার উন্নত সন্তানগণেরও তাহা করিবার ক্ষমতা নাই। যাহা নিত্য জীবনের ভোগ্য, তাহা মেলে কেবল সেই অদ্বিতীয় সত্য, নিত্য মঙ্গলময়ের অনুপম চরণ পূজায়। আর কোথাও তাহা পাওয়া যায় না।

২৬৪। আমি যেন সকলকে দেখি ভাল ;
কেবল আপনাকে দেখি কাল॥

২৬৫। যাহার জীবন জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলিত জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান, ভক্ত তাহারই নাম।

যে হয় ভক্তনাথের অনুপম চরণগত প্রাণ,
সেই পায় ভক্তের মধুময় নাম।

যে সেই জ্ঞানময়ের উজ্জ্বল জ্ঞানকিরণে ভক্তির মনোরম পবিত্র উদ্যানে করে সদা বাস, তাহারই জীবন হয় ভক্তিময়।

যে পায় মঙ্গলময়ের রচিত অগণ্য অতুল-

নীয় পদার্থ গুণে তাঁহার মঙ্গলপূর্ণ দর্শন, তাহারই হয় ভক্তিরসাভিষিক্ত সুখের জীবন।

যে জানে, সে নিজে কিছুই নয়, করে সে সকল সুখ ভোগ কেবল মঙ্গলময়ের কৃপায়, ভক্ত নামের যোগ্য সেই জন হয়।

মান, অভিমান, অহঙ্কার, অহংজ্ঞান যে করিয়াছে বিসর্জ্জন, তাহারই হয় সজ্জনগণের অভিলষিত ভক্তজীবন।

যে তৃণ সম বিনীত, যাহার বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণুতা, তাহারই জীবনে লক্ষিত হয় ভক্তের যোগ্যতা। চিন্তা, বাক্য ও ব্যবহারে, যাহার প্রাণ সহিতে নাহি পারে ভক্তনাথের অবমাননা, সেই বুঝিয়াছে ভক্ত জীবনের গৌরব ও মর্য্যাদা।

নানা শারীরিক ও মানসিক দুঃখ ক্লেশে যাহার মন প্রাণ থাকে মঙ্গলময়ের মঙ্গলপূর্ণ চরণতলে, অবাতকম্পিত দীপ শিখার ন্যায় স্থিরীভূত, তাহারই জীবন ভোগ করে ভক্তের অমৃতময় শান্তিপূর্ণ বিমল সুখ। সর্ব্বত্যাগী হইয়া যে করে মঙ্গলময়ের মঙ্গল পূর্ণ অমৃতময়, অভয় চরণে নিরন্তর বাস, তাহাতেই পূর্ণ হয় ভক্ত জীবনের সর্ব্বোচ্চ অভিলাষ।

২৬৬। নিরাকার পূর্ণব্রহ্ম বাহ্য বস্তুতে যে রূপে হন দৃশ্যমান, তদপেক্ষা উচ্চতর রূপে তিনি মানব আত্মাতে দৃষ্ট হন। স্বরূপত তিনি মানব চিন্তার অতীত।

২৬৭। পূর্ণব্রহ্ম বিনা পূর্ণতা লাভের কাহার অধিকার নাই। মানব আত্মা চিরোন্নতিশীল। অনন্তকাল তাহার উন্নতির পর উন্নতি লাভ হইবে। উন্নতির শেষ কখনই হইবে না। পূর্ণ ও অদ্বিতীয় স্বরূপ চিরদিন তাহার সম্মুখে পূর্ণ অদ্বিতীয় রূপে দর্শন দিবেন।

২৬৮। পবিত্র স্বরূপের কৃপায় পবিত্র না হইলে কেহই তাঁহার শোভনতম রূপের পরমশোভা ভোগ করিতে পারে না।

২৬৯। যাহার চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে বিনয়, শ্রদ্ধা ও ভক্তি না পায় প্রকাশ, তাহার হয় না ভক্ত জীবন।

২৭০। ভক্ত দেখে তাহার পার্থিব পিতা ও মাতাকে, সেই নিত্য পিতা ও মাতার প্রতিনিধি স্বরূপ। সুতরাং তাঁহারাই তাহার পার্থিব পরম পূজনীয় গুরু।

২৭১। ভক্ত জানে যে, ভক্তনাথ করিবেন না তাহার পূজা গ্রহণ, যদি সে না করে তাঁহার প্রতিনিধিদিগের যথোচিত পূজা।

২৭২। ঈশ্বরেতে যাহার আছে ভক্তি, তাহারই হয় পিতা মাতায় ভক্তি। আবার যে করে তাহার পিতা মাতাকে ভক্তি, ঈশ্বরেতে তাহারই হয় ভক্তি। ভক্তির তৃপ্তি ঈশ্বরেতেই। যতদিন তাঁহাতে ভক্তি পরিচালিত না হয়, ততদিন তৎ প্রবৃত্তির তৃপ্তি কিছুতেই হয় না।

২৭৩। পাপ অতিশয় ঘৃণার্হ, কিন্তু পাপী অতি কৃপাপাত্র।

২৭৪। ভক্ত প্রতিদিন পিতা মাতার পাদস্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করেন ও তাঁহাদিগের পাদোদক পান করিবার পর আহারাদি করিয়া থাকেন।

২৭৫। ভক্ত গুরুজনদিগের কথার প্রতিবাদ করা নিতান্ত প্রয়োজন হইলে বিনীতভাবে মৃদুস্বরে নিজ বক্তব্য প্রকাশ করেন। তিনি কখন তাঁহাদিগের নিকট অপ্রিয় বচন কহেন না।

[ক্রমশঃ]

শ্রীকানাইলাল পাইন।

ঢাকার পুরাতন কাহিনী।

[দ্বিতীয় প্রস্তাব।]

গৌড়েশ্বর পালরাজগণ।

প্রাচীন কালে বর্ত্তমান বঙ্গদেশের পশ্চিম অঞ্চল এবং পূর্ব্ব অঞ্চল বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। এরিয়ান, ডাইওডোরাস্ ও টলেমি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থকারগণ বর্ত্তমান বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশকে গৌড ও অনুগঙ্গ প্রদেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সেন-বংশীয় মহারাজ বল্লাল সেনের সময়েও বর্ত্তমান বাঙ্গলাদেশের পূর্ব্বভাগ মাত্র 'বঙ্গ' নামে পরিচিত ছিল। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, এক্ষণে বাঙ্গলার যে অংশ পূর্ব্ববঙ্গ বলিয়া কথিত হয়, তাহার নামানুসারে সমস্ত দেশের নাম বাঙ্গলা হইয়াছে। 'বাঙ্গলা' দেশের নামে পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীনকালীয় প্রাধান্য ও গৌরব লক্ষিত হইতেছে।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় ভূপতিবর্গের সহিত পূর্ব্ববঙ্গের বিশেষ কোন সংশ্রব ঘটিয়াছিল বলিয়া স্পষ্টরূপে বোধ হয় না। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের অধ্যবসায় ও গবেষণায় পালরাজগণের যে কয় খানি প্রস্তরলিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের গৌড়েশ্বর ও গৌড়াধিপ উপাধিই দেখা যায়। তাঁহাদের শাসনবিস্তৃতির পরিচায়ক কোনও তাম্রশাসনাদি চিহ্ন পূর্ব্ববঙ্গে এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এতদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহাদের শাসনদণ্ডের অধীন ছিল না, অথবা পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহাদের আধিপত্য সবিশেষ বদ্ধমূল হয় নাই।

পক্ষান্তরে বুদলগাছির প্রস্তরস্তম্ভের প্রতিলিপি দৃষ্টে জানা যায় যে, পালবংশীয় রাজন্যবর্গ বঙ্গের বিষয় অনবগত ছিলেন না। নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরবমিশ্রের আদেশে এই প্রস্তরলিপি খোদিত হয়। তিনি বেদ-বেদাঙ্গ কাব্যজ্যোতিষাদি নানাবিধ হিন্দুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া বঙ্গদেশে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন *। ভাগলপুরের তাম্রশাসন পূর্ব্ববঙ্গবাসী মদ্যদাস নামক শিল্পকর দ্বারা উৎকীর্ণ হয় বলিয়া বোধ হইতেছে। মদ্যদাস সমতটের অধিবাসী ছিলেন, উক্ত শাসন-পত্রের শেষ শ্লোকে তাহা উল্লিখিত হই

* প্রস্তরলিপির ২০-২২ শ্লোকে গুরবমিশ্র প্রশংসিত হইয়াছেন। বঙ্গ শব্দ দ্বারা সমস্ত বঙ্গদেশ, কি পূর্ব্ববঙ্গকে বুঝাইতেছে, তাহা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। শেষোক্ত অনুমান সত্য হইলে, পালরাজগণের সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুধর্ম্মের সবিশেষ চর্চ্চা ছিল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আদিশূরের সময়ে এই পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান ঘটে।

নানাকাব্যরসাগমেষ্বধিগমো, নীতৌ পরা নিষ্ঠতা
বেদোক্তানুগমাদশৌ প্রিয়তমো বঙ্গস্য সম্বন্ধিনাং।
আসক্তি গুণকীর্ত্তনেষু মহতাং, বিখ্যাতবিজ্জ্যোতিষো
যস্তানল্পমতেরমেয়যশসো ধর্ম্মাবতারো নবঃ ॥ ২০ ॥

আদিশূর ও তৎপরবর্ত্তী সেনরাজগণের সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ হইতেই হিন্দুধর্ম্ম পুনরুত্থিত হইয়া, বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ও পালরাজগণের আধিপত্য কালক্রমে বিলুপ্ত করে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

যাছে *। এই উভয় লিপিই পালরাজগণের পূর্ব্ববঙ্গে শাসন প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তৃতির পরিচয় দিতেছে। এই অনুমান সত্য হইলে, পালরাজগণেব সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুধর্ম্ম অক্ষুণ্ণভাবে বিরাজিত ছিল, সংস্কৃত সাহিত্য ও শিল্পশাস্ত্রেব উৎকর্ষতার নিমিত্তও পূর্ব্ববঙ্গ সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ছিল—ইহা নির্দ্দেশ কবা যাইতে পাবে। আদিশূব ও তাঁহাব পববর্ত্তী সেনবাজগণেব আধিপত্য পূর্ব্ববঙ্গেই প্রথমত প্রতিষ্ঠিত হইযা, হিন্দুধর্ম্ম বিস্তাবেব সঙ্গে সঙ্গে কালক্রমে সমগ্র বঙ্গ ও গৌড়াদেশে সংস্থাপিত হয়।

পালরাজগণেব আধিপত্য অন্ততঃ কিছু কালেব নিমিত্ত যে পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, জনপ্রবাদও তাহা নির্দ্দেশ কবিতেছে। প্রবাদ আছে যে, পালবংশীয় যশপাল তালিপাবাদ পরগণাব অন্তর্গত মাধবপুবে, শিশুপাল ভাওয়াল পবগণাব অন্তর্গত কাপাসিয়াতে এবং হরিশ্চন্দ্র পাল বর্ত্তমান সাভাবেব সন্নিহিত কাঠীবাড়ীতে ‡ বাজত্ব কবিতেন। এই তিনটী স্থানই বর্ত্তমান ঢাকা জিলাব উত্তর অংশে অবস্থিত, ইহার কোন স্থানই ঢাকাব দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত নহে, কিম্বা আদিশূব ও সেনবাজগণেব বাজধানী সমতট ও রামপালেব নিকটবর্ত্তী নহে। ডাক্তাব হাণ্টাবেব মতে ইহাবা তিন জনেই পালবংশীয় ক্ষুদ্র সামন্ত রাজা ছিলেন। জনশ্রুতি ও 'পাল' উপাধি ভিন্ন ইহাদিগকে পালবংশীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিবাব অন্য কোনও কারণ পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পাবে যে, সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গ না হইলেও, অন্ততঃ ঢাকার উত্তব ভাগ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ পালবাজগণের শাসনদণ্ডেব অধীন ছিল। এই অনুমানেব উপব নির্ভব কবিযা এস্থলে পালরাজবংশের সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইল।

পালবংশীয় নৃপতিগণ সুপ্রাচীন মগধরাজ্যে প্রথমত রাজপাট সংস্থাপিত কবিযা, ক্রমে ক্রমে পশ্চিম ও উত্তব বঙ্গ এবং পূর্ব্ব বঙ্গেব কিয়দংশ পর্য্যন্ত আপনাদেব অধিকাব বিস্তৃত কবিয়া থাকিবেন। তাঁহাবা বৌদ্ধধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারা অন্য কোন স্থান হইতে আসিয়া মগধে উপনিবিষ্ট হইযা রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত কবেন, বা মগধই তাঁহাদের আদিম বাসস্থল, ইতিহাস তাহা এ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ কবিতে পাবে নাই। অঙ্গ (পূর্ব্ববিহাব), গৌড (পশ্চিম বঙ্গ), পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (উত্তববঙ্গ) এবং তীবভুক্তি বা ত্রিহুত (উত্তব বিহাব) লইয়া তাঁহাদেব বাজ্য সংগঠিত হয়। পুর্ণিয়া, মালদহ, রাজসাহী, রঙ্গপুব, দিনাজপুব ও বগুড়া তাঁহাদেব শাসনাধীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন * বাজ্যেব অন্তর্ভুক্ত

* শ্রীমতা মদ্যদাসেন শুভদাসস্য সূনুনা।
ইদং শাসনমুৎকীর্ণং সৎ সামতটজন্মনা॥

‡ কাঠীবাড়ীতে একটী প্রাচীন দীঘিকা ও উচ্চ মৃত্তিকাস্তম্ভ বর্ত্তমান আছে। স্তম্ভটী প্রায় পঁচিশ হাত উচ্চ। প্রবাদ আছে যে, এই উভয়ই রাজা হরিশ্চন্দ্রের নির্ম্মিত।

* খ্রীষ্টীয় ৬২৯ অব্দের মধ্যভাগে সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিয়াংসাঙ, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসূতি ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অবস্থা দর্শন ও সেই পবিত্র ধর্ম্মের উপদেশ শিক্ষা করিবার মানসে স্বীয় জন্মভূমি চিয়াংচু পরিত্যাগ করিয়া বহু আয়াসে নানা সঙ্কট অতিক্রম পূর্ব্বক স্থল পথে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। ইহার প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশীয় অপর প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ভারতের নানা স্থান পরিদর্শন করেন। ৬৩৭ হইতে ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভ পর্য্যন্ত তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্ব প্রধান তীর্থস্থান বিহার প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া

ছিল। মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) তাঁহাদের প্রধান রাজধানী ছিল। তাঁহাদের প্রস্তরলিপি ও তাম্রশাসন হইতে এই সকল বিষয় জানা যাইতেছে। মুঙ্গেরে দেবপাল দেবের ও ভাগলপুরে নারায়ণপাল দেবের প্রদত্ত দুই থানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। বুদ্দলগাছি ও আমগাছি নামক দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত দুইটী স্থানে পালরাজগণের নামাঙ্কিত দুই থানি শাসনপত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই উভয় শাসনলিপিই পদ্মা নদীর উত্তর তীরে পালবংশীয় নরপতিদিগের আধিপত্য বিস্তৃতির পরিচয় স্পষ্টাক্ষরে প্রদান করিতেছে। দিনাজপুর, রঙ্গপুর ও বগুড়া জিলায় পালরাজগণের কীর্ত্তি ও ক্ষমতার পরিচায়ক বহুতর নিদর্শন অদ্য পর্য্যন্তও বর্ত্তমান আছে বলিয়া বিজ্ঞবর ওয়েষ্টম্যাকট্ সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রঙ্গপুরের মহীগঞ্জ,—দিনাজপুরের মহীপুর, মহীনগর, মহীসন্তোষ ও মহীপালদিঘী পালবংশীয় সর্ব্বপ্রধান নৃপতির নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। দিনাজপুরের নয়নগর মহারাজ নয়পালের শাসনপ্রভাব ঘোষিত করিতেছে। দিনাজপুর জিলায় বর্দ্ধনকোটি (প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজধানী) অবস্থিত আছে। এই বর্দ্ধনকোটির প্রায় ৭০ মাইল উত্তরে রাজা ধর্ম্মপালের নির্ম্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। পাঁচবিবি থানার অন্তর্গত মহীপুরে মহীপালের এবং আটাপুরে উষাপালের আবাসবাটীর চিহ্ন লক্ষিত হয়। স্থানীয় অজ্ঞ লোকের নিকট ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব শুনিয়াছেন যে, যোগীঘোপায় রাজা দেবপালের প্রিয়তমা তনয়া বিমলাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। যোগীঘোপার নিকটস্থ অমারি নামক স্থানে রাজা দেবপালের আবাসবাটীর ভগ্নাবশেষ বহুতর ইষ্টকে পরিণত হইয়াছে। ইহার দুই মাইল দূরে চন্দিরা নামক স্থানে চন্দ্রপালের বাসস্থলীর চিহ্ন বিদ্যমান আছে। চন্দিরার সাত মাইল উত্তরে বুদলগাছির সুবিখ্যাত প্রস্তরস্তম্ভে নারায়ণ পালের মন্ত্রী গুরবমিশ্রের বংশাবলী অঙ্কিত রহিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের গবেষণায় পালরাজগণের সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তরলিপি ও শাসনপত্র আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সময়ানুক্রমে প্রদান করা আবশ্যক। এই সকল শাসনলিপির কোন কোন কোনটীর অংশ বিশেষ বিলুপ্ত হইয়াছে, কোন কোনটীর স্থানবিশেষ অবোধ্য ও অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে, কোন কোনটীর আদিম লিপি দূরে থাকুক, তাহার প্রতিলিপি পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়াছে। এতন্নিবন্ধন এই সকল লিপি হইতে বিভিন্ন পুরাতত্ত্ববিৎগণ ভিন্ন ভিন্ন

বৌদ্ধগয়া, কুশাগারপুর, রাজগৃহ ও নালন্দা প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ স্থান দর্শন করেন। নালন্দা হইতে হিরণ্য পর্ব্বত (মুঙ্গের?), চম্পা, (পাটলীপুত্র?) ও কজুঘির (রাজমহল?) হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে উপনীত হন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে তিনি ২০টী বৌদ্ধবিহার ও ১০০ বৌদ্ধমন্দির দেখিতে পান। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের বৌদ্ধ রাজার আশ্রয়ে কিয়ৎকাল বাস করিয়া, কামরূপের হিন্দুরাজা ভাস্কর বর্ম্মার রাজধানীতে (গৌহাটী?) উপনীত হন। কামরূপ হইতে সমতট, তাম্রলিপ্ত ও কিরণসুবর্ণ হইয়া উড়িষ্যায় গমন করেন। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ ভারতীতে 'হিয়াঙ্ সাঙের বাঙ্গলা ভ্রমণ' নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হইতেছে। তাঁহার প্রবন্ধে পূর্ব্বোক্ত স্থান সমূহের যথোচিত বিবরণ থাকা সম্ভবপর।

পূর্ব্বোক্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য কুশী হইতে ব্রহ্মপুত্র, এবং গঙ্গা হইতে হিমালয়ের পাদমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহার রাজধানী বর্দ্ধনকুঠী (রাজবাড়ী) নামে পরিচিত, ইহা করতোয়া নদীর তীরবর্ত্তী গোবিন্দগঞ্জের নিকটে অবস্থিত।

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে যে বিষম মতভেদ সংঘটিত হইয়াছে, বিলুপ্ত, বিনষ্ট, অবোধ্য ও অপাঠ্য শাসনলিপি হইতে তাহাব সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করা অসম্ভব হইয়া উঠিযাছে। এই সকল লিপিই বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়া, পালরাজগণেব আধিপত্যকালেও বাঙ্গলা দেশে সংস্কৃত সাহিত্যের যে সবিশেষ চর্চ্চা ছিল, তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ কবিতেছে।

১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস উইলকিন্স সাহেব মুঙ্গেরে পালরাজগণের প্রদত্ত এক খানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হন। ইতি পূর্ব্বে ১৭৮০ খ্রীঃ অব্দে বুদ্দলেব প্রস্তরলিপি তাঁহাব যত্নে আবিষ্কৃত হয়। এই শিল্পকুশল চিবস্মবণীয় মহাত্মা স্বহস্তে যে বাঙ্গলা অক্ষব সর্ব্ব প্রথম প্রস্তুত করেন, ঐ অক্ষবে ১৭৭৮ খ্রীঃ হল্‌হেড্ সাহেবেব প্রণীত বাঙ্গলা ভাষাব প্রথম ব্যাকবণ হুগলীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। সংস্কৃতবিৎ উইলকিন্স সাহেবেব নিকট বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা মুদ্রাযন্ত্র যেমন অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ আছে, ভাবতবর্ষ ও বাঙ্গলার ইতিহাসও সেইরূপ চুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে চিবকাল আবদ্ধ থাকিবে। প্রস্তরলিপি, তাম্রশাসন, নামাঙ্কিত মুদ্রাদির সাহায্যে ভাবতবর্ষেরইতিহাসের কত অপরিজ্ঞাত অংশ যে পুরাতত্ত্ববিৎগণের গবেষণায় প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার সংখ্যা কবা অসম্ভব। মহাত্মা উইলকিন্স সাহেবই এই বিষয়ে প্রথম পথ-প্রদর্শক বলিয়া ভাবতবর্ষ ও বঙ্গদেশ চিবকাল তাঁহার অবিনশ্বর নাম ও কীর্ত্তি স্মরণ পূর্ব্বক ভক্তি ও প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতার পরম পবিত্র পুষ্পাঞ্জলী তাঁহার উদ্দেশে প্রদান করিতে থাকিবে, সন্দেহ নাই।

মহাত্মা চার্লস্ উইলকিন্স মুঙ্গেরের তাম্রশাসনের অনুবাদ তাহার মর্ম্মালোচনাব সহিত সর্ব্ব প্রথম প্রকাশিত করেন। এই শাসনপত্র দ্বারা মহারাজ দেবপাল দেব স্বকীয় রাজত্বেব ৩৩ তম বর্ষের ২১শে মাঘ বোধ ভিক্ষুবত মিশ্রকে শ্রীনগবের (বর্ত্তমান পাটনা) অন্তর্গত মিসিক গ্রাম উপভোগার্থ নিষ্কর প্রদান কবেন। দাতা ও গৃহীতা উভয়েই বিহার প্রদেশে বাস করিতেন, উভয়েই বৌদ্ধ ছিলেন। সেই সময়ে মুদ্গগিরিতে (বর্ত্তমান মুঙ্গেরে) পালবাজগণেব রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহাতে রাজা দেবপালের পিতা ধর্ম্মপাল, মাতা রণ্না (কণ্নাং?) দেবী এবং পিতামহ গোপালের নাম উল্লিখিত আছে। ডাক্তার হাবনলি বলেন, ইহাতে বাজ্যপাল দেবপালেব পুত্র ও যুববাজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

১৭৮৫ খ্রীঃ উইলকিন্স সাহেব বুদ্দলের সুপ্রসিদ্ধ প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপির অনুবাদ ও বিবরণ প্রকাশ করেন। বুদ্দলগাছি বর্ত্তমান দিনাজপুব জিলাব অন্তর্গত পত্নীতলা থানা হইতে ১০ মাইল দূবে পূর্ব্বোত্তব কোণে অবস্থিত। এখানে পূর্ব্বে ইংবেজ কোম্পানিব আমলে এক বাণিজ্যকুঠী বিদ্যমান ছিল। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে বুদ্দলের প্রস্তরস্তম্ভ মহাত্মা চার্লশ উইলকিন্স কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথম আবিষ্কৃত হয়। এই স্তম্ভ মহারাজ নাবায়ণ পালেব মন্ত্রী বেদ বেদাঙ্গবিৎ গুরব মিশ্রের আদেশে নির্ম্মিত ও লিখিত হয়। ইহাতে মন্ত্রীব বংশাবলী বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গ ক্রমে পালবংশীয় তিন জন রাজার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে বোধ হয় যে, জামদগ্ন্যগোত্রজ এই মিশ্রবংশ পুরুষানুক্রমে পালবংশীয় নৃপতিবৃন্দের অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই প্রস্তরলিপির শেষ ছয়টী (২৩-২৮) শ্লোকের নানা স্থানের

অক্ষব বিলুপ্ত হওয়াতে, এই ভাগেব প্রকৃত ধর্ম্ম অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে, বীরদেবেব পিতা শাণ্ডিল্য মিশ্রবংশেব আদিপুরুষ। বীবদেবের পুত্র পাঞ্চাল। পাঞ্চালের পুত্র গর্গ। গর্গের পত্নীর নাম ইচ্ছা। গর্গের পুত্র দর্ভপাণিমিশ্র মহাবাজ দেবপালের মন্ত্রী ছিলেন। শর্কবা দেবীর গর্ভে দর্ভপানিব সোমেশ্বব নামে পুত্র জন্মে। সোমেশ্বরেব পত্নীব নাম তবল্লা দেবী। ইঁহার পুত্র কেদাব মিশ্র ৰাজা শূরপালেব মন্ত্রী ছিলেন। গৌড়েশ্বর দেবপাল ভুজবলে উৎকল, দ্রাবিড়, গুর্জ্জব ও হূন দেশে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত কবেন। কেদার মিশ্র দেবগ্রামেব বব্বা দেবীব পাণিগ্রহণ কবেন। তাঁহাব পুত্র গুবব মিশ্র সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিযা বঙ্গদেশে সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ কবেন। তিনি বাজা নাবায়ণ পালেব মন্ত্রী ছিলেন।*

১৭৯৪ খ্রীঃ সুপ্রসিদ্ধ জোনাথান ডাঙ্কান সাহেব বারাণসীর নিকটস্থ সারনাথ নামক বিবিধ বৌদ্ধ কীর্ত্তিকলাপপূর্ণ স্থানে পালরাজগণেব নামাঙ্কিত এক খানি প্রস্তবলিপি আবিষ্কৃত কবেন। ইহাতে মহীপাল, স্থিরপাল, বসন্তপাল ও কুমাবপাল—এই চাবি জন পালবংশীয় রাজাব নাম খোদিত আছে। এই প্রস্তবলিপি এক্ষণে কোথায় আছে, তাহা জানা যায় নাই। ইহাব অনুবাদ দৃষ্টে জানা যায় যে, গৌডেশ্বব মহীপাল বারাণসী ক্ষেত্রে ঈশান ও চিত্রঘণ্ট প্রভৃতি শত শত মন্দির নির্ম্মাণ কবেন। স্থিবপাল ও তাঁহাব কনিষ্ঠ ভ্রাতা বসন্তপাল বৌদ্ধধর্ম্মে সবিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদেব আদেশে ১০৮৩ সংবতাব্দেব ১১ই পৌষ গর্ভকুঠী সহ তথায় এক বৌদ্ধশৈল নির্ম্মিত হয়। এই স্থিবপাল ও বসন্তপাল বিহাব প্রদেশে বাজত্ব কবিযা গিযাছেন বলিয়া পুবাতত্ত্ববিৎগণ অনুমান কবেন। বাবাণসী পর্য্যন্ত গৌডেশ্বব পালবাজগণেব শাসন প্রভাব যে বিস্তৃত ছিল, তাহা এই প্রস্তবলিপি স্পষ্টাক্ষবে নির্দ্দেশ কবিতেছে। গৌডেশ্বর মহীপালেব রাজত্বেব মধ্যভাগে

---

* পালরাজগণের সম্বন্ধে যে কয়টী শ্লোক আছে, তাহার মূল মাত্র সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এস্থলে উদ্ধৃত হইল। অনুবাদ দ্বাবা অযথা প্রবন্ধেব অঙ্গ বৃদ্ধি হইবে ভাবিয়া তাহা প্রদান হইতে নিরস্ত রহিলাম।

খ্যাতঃ শাণ্ডিল্যবংশৈকো, বীবদেবস্তদন্বযে।
পাঞ্চালো নাম তদ্‌গোত্রে, গর্গস্তস্মাদজায়ত ॥ ১
পত্নীস্থা নাম তস্যাসীদ্ ইচ্ছয়াস্তর্বিবর্ত্তিনী।
॥ ৩
সূনুস্তয়োঃ কমলযোনিরিব দ্বিজেশঃ
শ্রীদর্ভপাণিরিতি নামনি সুপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৪
আরেবাজকোম্মত্তঙ্গজমদস্তিম্যচ্ছিলাসংহত
নীত্যা যস্য ভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ ॥ ৫
দিক্‌চক্রায়াতভূভৃৎপরিকরবিসরদ্‌বাহিনো দুর্বিলোকং
প্রাপ্য শ্রীদেবপালো নৃপতি রবসতাপেক্ষয়া দ্বারি যস্য ॥৬
দত্ত্বাপ্যনল্পং উড়ুপচ্ছবিপীঠমগ্রে
যস্যাসনং নরপতিঃ সুররাজকল্পঃ।
নানানরেন্দ্রমুকুটাঙ্কিতপাদপাংশুঃ
সিংহাসনং সচকিতঃ স্বয়মাসসাদ ॥ ৭

উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃতহূনগর্ব্বং
খর্ব্বীকৃতদ্রবিডগুর্জ্জবরাজদর্পং।
ভূপীঠমব্ধিরসনাভরণং বুভোজ
গৌড়েশ্বর শ্চিবমুপাস্য ধিয়ং যদীয়াং ॥ ১৩
যস্যাগ্রেষু বৃহস্পতিপ্রতিকৃতেঃ শ্রীশূরপালো নৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্র ইব প্রজা নতশিরা জগ্রাহ পূতপয়ঃ ॥ ১৫
কুশলো গুণান্ বিবেক্তুং বিজিতেষু যং নৃপঃ প্রপন্নং
হূনমতি (?)
শ্রীনারায়ণ পালঃ প্রশস্তিরপরা কিয়ত্যস্তেব ॥ ১৯

১৮৭৪ খৃঃ মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় বুদলের প্রস্তবলিপিব যে মূল প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত পংক্তিগুলি গৃহীত হইল।

এই প্রস্তরলিপি উৎকীর্ণ হয়, অনুমান করিয়া বহুমানাস্পদ ডাক্তার মিত্র ও কানিংহাম সাহেব প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিৎগণ পালরাজগণের সময় অবধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মূলের অভাবে এই লিপি হইতে পুরাতত্ত্ববিৎগণের কোন্ কথা কত দূর বিশ্বাস্য ও প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইবে, বলিতে পারি না।

১৮০৬ খ্রীঃ সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ কোলব্রুক সাহেবের প্রযত্নে দিনাজপুরের অন্তর্গত আমগাছিতে পালরাজগণের নামাঙ্কিত এক খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। কোলব্রুক সাহেব তাহার অনুবাদ মাত্র প্রকাশ করেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ ডাক্তার হারনলি রোমান অক্ষরে তাহার মূল স্বীয় মন্তব্যের সহিত প্রকাশিত করিয়াছেন। * ইহাতে পাল-রাজগণের বংশাবলি বিস্তারিত রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা হইতে একাদশ জন পাল বংশীয় নরপতির নাম জানা যাইতেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, ইহার নানা স্থানের অক্ষর বিলুপ্ত হওয়াতে, পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ইহার যথোচিত অর্থ নির্দ্দেশ সম্বন্ধে এক মত অবলম্বন করিতে পারেন নাই। এই মতভেদে পালরাজগণের পুরুষ-গণনা নিশ্চিত রূপে হইয়া উঠে নাই। শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার মিত্র মহোদয় ও বিজ্ঞবর ডাক্তার হারনলি সাহেবকে পরস্পর-বিরোধী দুই মতের প্রধান পরিপোষক বলিয়া স্বীকার করিলে অসঙ্গত হইবে না। আমরা ডাক্তার মিত্রের নির্দ্দেশকেই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলাম। আমগাছির শাসনপত্রের বিকৃত ও অস্পষ্ট মূল দৃষ্টে পাঠকবর্গ স্ব স্ব অভিমত নির্দ্ধারিত করিয়া লইবেন।

* আমগাছির সুপ্রসিদ্ধ তাম্রশাসনের প্রতিলিপি হইতে পালরাজগণের বিস্তীর্ণ বংশাবলী ভাগলপুরের তাম্রশাসনের সহিত মিলাইয়া, নিম্নে প্রকাশিত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে। সংস্কৃতবিৎ পাঠকগণ ইহা হইতে স্ব স্ব অভিমত নির্দ্ধারিত করিয়া লইতে, এবং প্রবন্ধলিখিত মতের সারাসারবত্তা নিরূপণ করিতে পারিবেন। ডাক্তর হারনলির মত আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে গ্রহণীয় বলিয়া বোধ হইতেছে না। বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন কি না, স্মরণ নাই।

স্বস্তি।

মৈত্রীকারুণ্য-রত্ন-প্রমুদিত হৃদয়ঃ প্রেয়সীং সংদধানঃ
সম্যক-সম্বোধিবিদ্যা-সরিদমলজল ক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্কঃ।
জিত্বা যঃ কামকারিপ্রভবমভিভবং শাশ্বতীং পাপ শান্তিং
স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোঽন্যশ্চ গোপাল দেবঃ॥ ১

লক্ষ্মীজন্মনিকেতনং সমকরোদ বোঢ়ুং ক্ষমঃ ক্ষ্মাভরং
পক্ষচ্ছেদভয়াদ্ উপস্থিতবতাং একাশ্রয়ো ভূভৃতাং।
মর্য্যাদা পরিপালনৈকনিরতঃ শৌর্য্যালয়োঽস্মাদভূদ্
দুগ্ধাম্ভোধি বিলাসহাসিমহিমা শ্রীধর্ম্মপালো নৃপঃ॥

(জিজেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীন্
উপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থ পিত্রে
চক্রায়ুধায়ানতিবামনায়॥)

রামস্যেব গৃহীতসত্যতপস স্তস্যানুরূপো গুণৈঃ
সৌমিত্রেরুদপাদিতুল্যমহিমা বাক্‌পাল-নামানুজঃ।
যঃ শ্রীমান্ নয়বিক্রমৈকবসতির্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে
শূন্যা শত্রুপতাকিনীভিরকরোদ একাতপত্রা দিশঃ॥ ৩

তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জগতীং পুনানঃ
পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পাল নামা।
ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে
যঃ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্যসুখান্যনৈষীৎ॥ ৪

(যস্মিন্ ভ্রাতুর্নিদেশাদ্ বলবতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ
সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুরমজহাৎ উৎকলানামধীশঃ।
আসাঞ্চক্রে চিরায় প্রণয়িপরিবৃতো বিভ্রদুচ্চেন মূর্দ্ধা
রাজা প্রাগ্জ্যোতিষাণাং উপশমিতসমিৎশঙ্কয়া যস্য চাজ্ঞা॥)

আমগাছির তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, 'মহারাজাধিরাজ' নয়পাল দেবের পুত্র 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্' বিগ্রহপাল দেব পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত কোটীবর্ষ গ্রামে দুই দ্রোণ ভূমি খোভূত দেবশর্ম্মাকে প্রদান করেন। দানগৃহীতা খোভূত (?) সামবেদীয় কৌথুমশাখাধ্যায়ী বেদান্তমীমাংসাব্যাকরণতর্কবিদ্যাবিৎ অকিঞ্চন দেবের পৌত্র ও অর্কদেবের পুত্র

শ্রীমান্ বিগ্রহপাল স্তৎসূনু-রজাতশত্রুরিব জাতঃ।
শত্রুবনিতাপ্রসাধনবিলোপিবিমলাসিজলধারঃ॥ ৫

(রিপবো যেন গুর্ব্বীণাং বিপদাং আস্পদীকৃতাঃ।
পুরুষায়ুষদীর্ঘাণাং সুহৃদঃ সম্পদামপি॥
লজ্জেতি তস্য জলধেরিব জহ্নুকন্যা
পত্নী বভূব কৃতহৈহয়বংশভূষা।
যস্যাঃ শুচীনি চরিতানি পিতুশ্চ বংশে
পত্যুশ্চ পাবনবিধিঃ পরমো বভূব॥)

দিক্‌পালৈঃ ক্ষিতিপালনায় দধতং দেহে বিভক্তাঃ শ্রিয়ঃ
শ্রীমন্তং জনয়ত তনয়ং নারায়ণং স প্রভুং।
যঃ ক্ষৌণীপতিভিঃ শিরোমণিরুচাশ্লিষ্টাঙ্ঘ্রি পীঠোপলং
ন্যায়োপাত্তং অলঞ্চকার চরিতৈঃ স্বৈরেব ধর্ম্মাসনং॥ ৬

ভাগলপুরের তাম্রশাসন রাজা নারায়ণপাল দেবের প্রদত্ত বিধায়, অতঃপর ১১-১৭ শ্লোকে নারায়ণপালের প্রশংসাবাদ লিখিত হইয়াছে। এই ষষ্ঠ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণ এই তাম্রশাসন অনুসারে 'শ্রীনারায়ণপালদেবম্ সুজৎ তস্যাং স পুণ্যোত্তরং' বলিয়া লিখিত হইয়াছে। ( ) চিহ্নের অন্তর্গত চারিটী অতিরিক্ত শ্লোক ভাগলপুরের শাসনপত্র হইতে উর্দ্ধৃত হইল।

তাপা—জলধিমূলগম্ভীরগর্ভে
দেবালয়ৈশ্চ কুলভূতরমস্য কক্ষৈঃ।
বিখ্যাতকীর্ত্তিরভবৎ তনয়শ্চ তস্য
শ্রীরাজ্যপাল ইত্যবনিলোকপালঃ॥ ৭
তস্য—ব ক্ষিতি—ন নিধিরিব সহসা রাজ্যকূটা—পে—
পুজ্যস্যোত্তুঙ্গমৌলে দুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যা প্রসূতঃ।
শ্রীমান———ভব্য—নৈকরত্ন—
——তিথবিতবর্গঃ সি—বিগ্রাংস্থকয়োঃ॥ ৮
যঃ স্বামিন রাজ্যগুণৈরনুমাসেবত
————প্রভুশক্তি লক্ষ্মী
পৃথ্বীং সপত্নীমিব নিজপত্র॥ ৯
তস্মাদ্ বভূব সবিতু র্বসুকোটিবর্ষী
কালেন চন্দ্র—ব বিগ্রহপালদেবঃ।

—পেন বিমলেন কলাৎপদেন
আবহিতেন পনিতো ভুবনস্য তাপঃ॥ ১০
ভবসকলবিলক্ষং সঙ্গবে বা প্রদর্পাৎ
অনধিকৃতবিলগ্নং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং।
————————ণসদ মা ভূৎ
————বনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ॥ ১১
তাজন তোষাসঙ্গং শিরসি কৃতপাদঃ
ক্ষিতিভৃতা বিবর্ণে সর্ব্বনাঃ প্রসভ—রিব রবিঃ।
ভব—ন্নং স্নিগ্ধপ্রকৃতিবসুবাগে—বসতিস্ম
বাধন্তঃ প্রথৈবজনি নয়পালো নরপতিং॥ ১২
পিতঃ সঙ্গনলে বনৈঃ স্মবরিপোঃ পূজা
——বিশ্রামে—ধিকারভবনং কঃ কৃতে বিদ্বিবাং।
মন্তবাং দ্বয়মাশ্রয়ঃ শিবপাস—পেঙ্গণ—ন্দবন
শ্রীমদ বিগ্রহপালদেব নৃপতিং————॥ ১৩
কৃতাসান্দ্রককপ্রজয়তাপ্রীকবং:————॥ ১৪

ইহা হইতে পালবংশীয় গোপালদেব, ধর্ম্মপাল ও বাকপাল, দেবপাল ও জয়পাল, বিগ্রহপাল, নারায়ণ পাল, রাজ্যপাল, শ্রী—পাল, বিগ্রহপাল, মহীপাল, নয়পাল ও বিগ্রহপাল—এই একাদশ জনের নাম যথাক্রমে উল্লিখিত দেখা যাইতেছে। নারায়ণপালের পরবর্ত্তী পালরাজগণ সম্বন্ধেই বিষম মতভেদ ও গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সুবিজ্ঞ ডাক্তর হারনলি ৭—১৪ শ্লোকে উল্লিখিত নামাবলী পুনরুক্তি মাত্র বলিয়া রাজা নারায়ণ পালের উত্তর পুরুষ ছয় জন রাজার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলোপ করিতে চাহেন। তাঁহার মতে দেবপাল ও নয়পাল, বিগ্রহপাল ও সুরপাল, মহীপাল ও ভূপাল অভিন্ন ব্যক্তি। তিনি রাজ্যপালকে দেবপালের পুত্র, বিগ্রহপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং মহীপালের পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার অনুমান অনুসারে ৯০৬—১০২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১২০ বৎসর কাল গোপাল হইতে নারায়ণপাল পর্য্যন্ত ছয় জন রাজা বাঙ্গলায় রাজত্ব করেন।

ছিলেন। এই শাসনপত্র বিগ্রহ পালের রাজত্বের দ্বাদশতম বর্ষের ৯ই চৈত্র তারিখে পোসলী গ্রামবাসী মহীধরের পুত্র শশীদেব কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হয়।

পোসলীগ্রামনির্য্যাত শ্রীমহীধরসূনুনা।
ইদং শাসনমুৎকীর্ণং শ্রীশশীদেবশর্ম্মণা॥

ইহা হইতে দেখা যায় যে, মুদ্গগিরি (মুঙ্গের) বিগ্রহ পালের শাসিত পৌণ্ড্র বর্দ্ধন রাজ্যের রাজধানী ছিল। এই শাসন পত্রে বৌদ্ধ গোপাল দেব পাল বংশের আদিম পুরুষ ও প্রথম রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ধর্ম্মপাল ও বাক্পাল নামে গোপাল দেবের দুই পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজ প্রভৃতিকে পরাজয় করেন বলিয়া ভাগলপুরের শাসনপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। কনিষ্ঠ বাক্পাল স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শাসনাধীনে প্রধান সেনাপতির কার্য্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক নানা দেশ জয় করেন। অপুত্রক ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পর বাক্পালের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবপাল স্বীয় পিতৃব্যের স্থলে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। দেবপাল পাল বংশীয় নরপতিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা জয়পালের প্রতি রাজ্যশাসনের গুরুভার অর্পণ করিয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। মুঙ্গেরের তাম্রফলকে বর্ণিত আছে যে, দেবপাল হিমালয় পর্ব্বত হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুদূর কাম্বোজ রাজ্য পর্য্যন্ত আপনার শাসন প্রভাব বিস্তার করেন। ভাগলপুরের শাসনপত্র অনুসারে তিনি উৎকল (উড়িষ্যা) ও প্রাগ্জ্যোতিষ (আসাম কি আল্লাহাবাদ?) রাজ্য আপনার শাসনাধীনে আনয়ন করেন। বুদ্দলের প্রস্তরলিপিতেও লিখিত আছে যে, গৌড়েশ্বর দেবপাল উৎকল, দ্রাবিড়, গুর্জ্জর ও হূনদিগের দেশ ভুজবলে পদানত করেন। বুদ্দলের প্রস্তরলিপিতে উল্লিখিত সুরপাল ও দেবপাল এক অভিন্ন ব্যক্তি কিনা, নিশ্চয় রূপে বলা যায় না। দেবপালের পর তাঁহার পুত্র বিগ্রহপাল (প্রথম) রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ভাগলপুরের শাসন পত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে জানা যায় যে, রাজা বিগ্রহপাল হৈহয় বংশীয় রাজকন্যা লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নারায়ণ পাল রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। মৃত্যুকালে নারায়ণ পাল কোন পুত্র সন্তান রাখিয়া যান নাই বিধায়, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজ্যকূটা (রাষ্ট্রকোটা?) পতির তনয়া ভাগ্যদেবীকে বিবাহ করেন। রাজ্যপালের পর তাঁহার অজ্ঞাত নামা পুত্র এবং তদনন্তর তাঁহার পৌত্র বিগ্রহপাল, (দ্বিতীয়) রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পর তাহার পুত্র মহীপাল, তৎপর মহীপালের পুত্র নয়পাল, তদনন্তর নয়পালের পুত্র বিগ্রহপাল (তৃতীয়) স্ব স্ব পিতৃবিয়োগের পর পৈতৃক রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। এই তৃতীয় বিগ্রহপালই আমগাছির শাসনপত্রে উল্লিখিত ভূমি খোভূত (?) দেবশর্ম্মাকে প্রদান করেন। এই শাসনপত্র হইতে পালবংশীয় একাদশ জন বিভিন্ন নৃপতির নাম জানা যাইতেছে। সুবিজ্ঞ ডাক্তার হার্‌নলি সাহেবের মতে ইঁহা হইতে গোপাল হইতে নারায়ণ পাল পর্য্যন্ত মাত্র ছয় জন রাজার নাম পাওয়া যায়।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিতবর রাজেন্দ্র লাল মিত্র ভাগলপুর হইতে রাজা নারায়ণ পালের প্রদত্ত একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হন।

ইহার প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম ও দশম শ্লোক আমগাছির শাসন লিপিতে প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। পালরাজগণের সম্বন্ধে যে কয়েক খান প্রস্তরলিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহাই সম্পূর্ণ ও অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। "এই শাসনপত্রের দ্বারা বিগ্রহপালের পুত্র পরম সৌগত (বৌদ্ধ) রাজা নারায়ণ পাল তাঁহার রাজত্বকালের সপ্তদশতম বর্ষের ৯ই বৈশাখ তীরভুক্ত (ত্রিহুত)প্রদেশের অন্তর্গত মকুতিকা নামে গ্রাম পাশুপত আচার্য্যের শিষ্য শিব ভট্টারককে প্রদান করেন। নারায়ণ পালের মন্ত্রী বেদ বেদান্তাদি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ভট্ট গুরব মিশ্র ইহা রচনা করেন। সমতটবাসী শুভদাসের পুত্র সুলেখক মঙ্গদাস কর্ত্তৃক ইহা লিখিত হয়। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, পাল রাজগণের শাসিত অঙ্গরাজ্য* পশ্চিমে ত্রিহুত ও পূর্ব্বভাগে সমতট (বাম-পাল) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ত্রিহুত পূর্ব্বকালে তীরভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। মুদ্গগিরিতে (মুঙ্গের) পালরাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী থাকিলেও পালরাজগণ হিন্দু ও বৌদ্ধ সর্ব্ববিধ প্রজাবর্গকে সমভাবে পালন করিতেন। হিন্দু শাস্ত্র-বিৎ ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট সম্মাননা ও সমাদর করিতেন, এবং উপযুক্ততা প্রদর্শন করিতে পারিলে উচ্চতম রাজকার্য্যে পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না হিন্দুপ্রজাদিগকে ন্যায়ানুসারে শাসন করিতেন। হিন্দু-শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, বলি ও দেবপূজাদি বহুবিধ কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্ত শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতবর্গকে ভূমি দান করিতেন, যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অধিকৃত রাজ্য মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। তাঁহারা স্থানে স্থানে জলাশয় খনন, অতিথিশালা ও ঔষধালয় স্থাপন করিয়া প্রজাবর্গের উপকার সাধন করিতেন।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

সুমুখী।

(নাট্য কবিতা)

প্রথম অঙ্ক।

(স্থান স্বর্গ—কৈলাস ধাম)

উমা, জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ।

জয়া।—দেবিগো, আনন্দময়ি, জগত-জননি,
বল শুনি কেন আজি বিরস বদন?
নয়ন-কৌমুদী ম্লান কেন ত্রিনয়নি?
দীপ্তভালে চিন্তা কেন করে সন্তরণ?

* ভঙ্গীক্রমে অঙ্গরাজ্যের নাম এই শাসনপত্রে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীকৃতঃ সুজনমনোভিঃ, সত্যায়িতঃ সহবাহনৈঃ শ্রীযৈঃ।
ত্যাগে ন যো স্বধয়াশু, স্তৈয়ং যেহঙ্গ রাজন্ কথাং॥ ১২
শ্রীপতিরকুষ্টকর্ম্মা বিদ্যাধরনায়কো মহাভোগী।
অজলসদৃশোঽপি ধাম্না যশ্চিত্রং নলসমশ্চরিতে॥ ১৩

রাজা নারায়ণ পাল বিদ্যোৎসাহী ও পণ্ডিতগণের আশ্রয় স্থল ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রী গুরব মিশ্র সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন সুকবি ছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতা ভাগলপুর ও বুদ্দলের শাসন লিপিদ্বয়কে অলঙ্কৃত করিয়া রহিয়াছে।

বেদান্তৈরসুগমতমং বেদিতা ব্রহ্মতত্ত্বং
যঃ সর্ব্বাসু শ্রুতিষু পরমঃ সার্দ্ধমঙ্গৈরপীতি।
যো যজ্ঞানাং সমুদিত মহাভূদক্ষিণানাং প্রণেতা
ভট্টঃ শ্রীমানিহ স গুরবো দুতকঃ পুণ্যকীর্ত্তিঃ॥

উছলিত সুধারাশি, শুকায় অধরে ;
একি কীট, একি ছায়া, পশিল অন্তরে ?
উমা।—সখীরে, সুধাও কেন কি দুঃখ উমার,
দেবত্বের সুখ বুঝি ঘুচিল তাহার।
আহারে জনক যার, পাষাণ, অচল,—
নহিল পরাণ তার নির্ম্মম নিশ্চল,
এই ক্ষোভ, এই দুঃখ উথলিছে বুকে,
কি কাজ জিজ্ঞাসি আর? তোরা থাক্ সুখে।
জয়া।—আতঙ্কে কাঁপে যে প্রাণ ওগো মহেশ্বরী,
আতঙ্কে যে স্বর্গ মর্ত্ত্য করে টলমল,
একবার ক্রোধে ধ্বংশ হল দক্ষপুরী,
যেতেছিল সুরপুরী প্রায় রসাতল,
আবার কি ক্ষোভ আসি গ্রাসিছে পরাণী ?
সম্বর এ অভিমান, ত্রৈলোক্য-তারিণি।
বিজয়া। আহা মরি, মহেশ্বরী কি দুঃখ তোমার ?
ত্রিদিব পূজিতা তুমি, ও রাঙ্গা চরণ,
কে আছে ত্রিলোকে যে না ধ্যায় অনিবার ?
সুরনর সবারি যে তুমিই শরণ।
হের ওই মর্ত্ত্যলোকে নরনারী শত,
পাদ্য অর্ঘ্য পুষ্পহারে পূজিছে তোমার,
যুক্ত করে নম্রশিরে স্তুতি গায় কত,
কতই দিতেছে ভক্তি প্রীতি উপহার।
ইন্দ্রের ধেয়ানে তুমি শচী তব পায়,
চতুর্ম্মুখে চতুর্ম্মুখ তব-গুণ গায়,
ওই শুন, ওই শুন, ডমরুর স্বরে,
তোমারি প্রেমের গীতি শিব গান করে।
উমা।—এমি শ্লেষ, একি নিন্দা, একি অপমান।
এই কিরে প্রিয় সখি উচিত তোমার ?
চাইনা নরের পূজা, চাইনা সম্মান।
প্রসন্ন নরের ভাগ্য দুঃখ দেবতার।
মানুষীর প্রেম-ধ্যানে মত্ত মহেশ্বর,
মহেশের মহেশ্বরী, উমা আর নয় !
আঁধার ছাইছে যেন কৈলাস শিখর ;
প্রদীপ্ত, আনন্দপূর্ণ, আজি লোকালয়।

তুচ্ছ ঘৃণ্য নরকের ধূলায় গঠিত,
ক্ষুদ্র মানুষীর শোভা এত মনোহর,
ভুলিয়ে দেবত্ব যাহে হ'ল বিমোহিত,
অনন্ত সৃষ্টির স্রষ্টা পরম ঈশ্বর।
এরূপ যৌবনে মোর মোহ আর কই ?
নরত্বে দেবত্বে ভেদ ঘুচিয়াছে সই।
জয়া।—বিষাদে পূরিছে প্রাণ, উপজে বিস্ময়।
কে গো সে মানবী দেবি, এত রূপ কার ?
পেয়ে যারে, জগন্ময়ি, তোমার প্রণয়
তেজিয়ে, করেন শিব মরতে বিহার ?
উমা।—হের ওই মর্ত্ত্য-লোকে ভারত উত্তরে,
আমার পিতার নামে নামাঙ্কিত গিরি,
ওরি পাদদেশে রাজ্য, "কোঁচ" নাম ধরে,
বহিতেছে ব্রহ্মপুত্র তিস্তা যারে ঘিরি।
জয়া।—আমরি কি চারুদেশ, সৌন্দর্য্যে অতুল
মরতে নন্দন বলি মনে হয় ভুল !
ছোট খাট দেশ খানি বেষ্টিয়া হেথায়,
সুরম্য কানন রাজি কিবা শোভা পায়।
বিজয়া।—(জয়ার প্রতি) শোভার মাথায় বাজ,
কি দেখিছ ছাই ?
(উমার প্রতি) বল দেবি, একি দৃশ্য দেখিবারে
পাই ?
ওইযে কানন পারে সুন্দর নগরী,
দিবসে ও কেন ওরে ব্যাপিয়ে শর্ব্বরী ?
জয়া।—তাইতো, তাইতো সই, একিরে বিস্ময়।
নাজানি হবে বা হোথা কি মহাপ্রলয়।
রবির প্রদীপ্ত তেজে দীপ্ত ধরাতল,
কেন অন্ধকার হোথা ছেয়ে অবিরল ?
উমা।—দেখিতেছ যে নগরী অন্ধকারময়,
ওইতো গো সখি, কোঁচ-রাজ রাজধানী ;
হোথায় পাইছে শোভা রাজার আলয়,
সে আলয়ে আছে এক দ্বিতীয়া ভবানী।
সুমুখী রাজার মেয়ে, অনূঢ়া ষোড়শী,
তাহারি প্রণয়ে মত্ত দেব মহেশ্বর।

স্বর্গে মর্ত্ত্যে কেহ নাই এ হেন রূপসী,
সৃষ্টির চরম নাকি ধরণী ভিতর।
পাছে কেহ স্বর্গপথে দেখিবারে পায়,
তাই দেব মায়াবল করিয়া বিস্তার,
ঢাকিয়া নগর খানি আঁধারের ছায়,
আনন্দে সদাই হোথা করেন বিহার।
আঁধার, প্রলয়-চিহ্ন নহে লো সজনি,
আছে হোথা চন্দ্র সূর্য্য দিবস রজনী।
বিজয়া।—জগৎ আরাধ্যা তুমি,সুর-নর-মাতা,
নরলোকে হবে দেবি, তব অপমান ?
আজ্ঞা দেহ, পৃথ্বী বুকে বসাইয়া জাঁতা,
ধূলায় ধরার করি বিনাশ বিধান।
কি ছার সে তুচ্ছ ধরা ? তোমার ঈঙ্গিতে,
ধূলি-চক্র কেন্দ্র রবি, যাবে রসাতলে,
বুধ, গুরু, শনৈশ্চর নিবিবে চকিতে,
আজ্ঞা দেও সৃষ্টি ধ্বংশ করিব সবলে।
তোমারি বিনষ্ট রিপু অসুরের মেদে
জনমিল যে মেদিনী, তারি কীটগুলি,
—একিরে একিরে স্পর্দ্ধা মরে যাই খেদে—
তোমারে করিবে তুচ্ছ, গর্ব্বে মাথা তুলি ?
ছিঁড়ি আকর্ষণ সূত্র, ফেলি পৃথ্বী ছুঁড়ি
অগ্নিময় সূর্য্যগর্ভে, যাক্ যাক্ পুড়ি।
তুমি যদি অপাঙ্গেতে চাহ ক্রোধভরে,
কার সাধ্য রাখে সৃষ্টি বলহে রুদ্রানি,
শিবের(ও) ত্রিশূল দেবি, টল মল করে,
তোমারি বলেতো বলী দেব শূলপানি।
উমা।—বিজয়ারে প্রিয় সই,ছিছি একি বাণী।
হলি কিবে আত্মহারা ক্রোধে অভিমানে ?
ত্রিলোকে পূজিত তিনি দেব শূলপাণি,
এ অনন্ত চারু সৃষ্টি যাঁহার বিধানে,
সর্ব্বলোকে পূজনীয় ত্রিশূল তাঁহার,
রয়েছে অনন্ত লোক যাহার আশ্রয়ে,
ভ্রমেও তাহার নিন্দা করিস্‌নে আর
প্রবেশিবে মহাপাপ ত্রিদশ আলয়ে।

আমারি কপাল পোড়া নিন্দ মোরে সই,
শিবের হউক সুখ, মোরা দুঃখে রই।
বিজয়া।—সত্য দেবি,অপরাধ হয়েছে আমার,
কিন্তু কি গো করিব না কিছু প্রতীকার ?
তোমারে করিয়া তুচ্ছ, হে দেবি সর্ব্বাণি,
কার সাধ্য হবে ভবে ভবের ভবানী ?
উমা।—যাহা খুসী প্রিয় সই,কর্ তোরা তাই,
সন্ন্যাস কুটীরে আমি শিব ধ্যানে যাই।
ধন্দরে ধূলাব ধূলা মানুষী সুমুখী,
যার রূপে, যার প্রেমে মহেশ্বর সুখী!

(প্রস্থান)

বিজয়া।—দেবীর সেবায় জয়া কর লো গমন।

(জয়ার প্রস্থান)

মর্ত্ত্যলোকে যাই আমি দেখি একবার,
দেখি সে কুঁচুনী মাগী রূপসী কেমন।
যাই যাই, সুমুখীর সাধিগে সংহার।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(সুমুখীর প্রমোদ ভবন)

সুমুখী।—এখনো কাঞ্চন শৃঙ্গ আলোকে ভাস্বর,
এখনো গেলোনা সূর্য্য অস্তাচল গায়।
এখন তো জনস্রোতে পূর্ণ এ নগর,
এখনো আকাশে—কই ? দেখা নাহি যায়।
কি দীর্ঘ দিবস। ধৈর্য্য মানে না হৃদয়!
কার পদশব্দ শুনি! না না কিছু নয়।

(সুমুখীর প্রাচীনা ধাত্রীর বেশে বিজয়ার প্রবেশ)

বিজয়া।—(স্বগত) পুড়ুক কপাল তোর; যাও ছারখার!
(প্রকাশ্যে) সুমুখি, চিনিতে মোরে পার কি এখন ?
সুমুখী।—একি স্বপ্ন ? ওমা একি, ধাই মা আমার ?
তাইতো গো আয় আয় করি আলিঙ্গন

বিজয়া।—কবে মরি কবে বাঁচি,ভাবিলাম তাই,
একবার সুমুখিরে, তোরে দেখে যাই।
সুমুখী। ভালতো গো ছিলি তুই? দেশের মঙ্গল?
প্রাক্‌জ্যোতিষপুর হতে আসিলি কখন?
জানিতে কত কি কথা হৃদয় চঞ্চল।
বসিয়ে কর গো আগে শ্রান্তি বিনোদন।
হয়েছিস্ বড় বুড়ী, ধাই মা আমার।
তাইতো গো একটীও দাঁত নাই আর?
বিজয়া।—কত দিন থাকে কার নবীন যৌবন?
চঞ্চল জগৎ, হেথা দুঃখ পরিণাম।
লাবণ্য, সুরূপ, সে তো দুদিনের ধন,
তার পড়ে ভেঙ্গে পড়ে এ দেহ সুঠাম।
শরতে অদ্রির শোভা ছিল কি সুন্দর!
এ শীতে সকলি হের হয়েছে অন্তর।
(হিমাচলকে লক্ষ্য করিয়া)
কাল দেখেছিনু ওর এলো চুলগুলি,
রমণীর এলান কেশ গুচ্ছের মতন,
দীপ্ত নীলাকাশ তলে ছিল মাথা তুলি
যেনরে অক্ষয় বীর পুরুষ সুজন।
আজি গো মস্তক তার অমল ধবল,
ঝরিছে তুষার, শুভ্রতায় রৌপ্য জিনি,
এ জরা তাহার শিরে, ঝাড়িয়া অঞ্চল
দিয়াছে সে মৃত্যুময়ী হিম নিশিথিনী।
নিগূঢ় রহস্য মন্ত্রে বাঁধা এক সাথে,
আছে দুই জন তারা বার্দ্ধক্য যৌবন।
দিন বর্ষ আছে সবে ধরি হাতে হাতে,
ক্ষুদ্র এক স্বপ্ন মাত্র মধ্যে ব্যবধান।
সুমুখী।—আগেতো শুনিনি ধাই কথনো এমন?
এত তত্ত্ব কথা তুই শিখিলি কোথায়?
বিজয়া।—সুমুখিরে আছে তোর নবীন যৌবন,
তোর রূপে দেবতারো মন ভুলে যায়,
তাইতো এ তত্ত্ব কথা তিক্ত লাগে কাণে।
শিব শিব! সুখ, আশা, থাক্ তোর প্রাণে।
একি দেখি সুমুখীরে, শিব নাম শুনি,
গণ্ডে কেন ব্রীড়া তোর সঞ্চরে অমনি?
সুমুখী।—(স্বগত) একি দায়! পোড়া প্রাণ
সামালিতে নারি।
(প্রকাশ্যে) থাক্ ছাই, এস ধাই অন্য কথা
পাড়ি।
তোদের দেশের বল্ সব্‌তো মঙ্গল?
রাজা রাজপরিবার তাঁদের কুশল? [পুরে,
বিজয়া।—অতি বৃষ্টি মহামারী প্রাক্‌জ্যোতিষ-
আসে না বিদেশী কেহ থাকে দূরে দূরে।
বাণিজ্য ব্যবসা সব হল লুপ্ত প্রায়,
উঠেছে রোদন ধ্বনি দেশ যায় যায়।
নিশি দিন হোম যাগ শিব আরাধনা,
তবুও খণ্ডেনা গ্রহ বড় বিড়ম্বনা।
যাজক ব্রাহ্মণ শেষে কহিল রাজারে,
কোঁচরাজ্যে শিব নাকি, ফেলিয়া কান্তারে
বিহার করেন নিত্য, তাই নাকি আর
পৌঁছেনা কৈলাসে ভক্তি পূজা উপহার।
তাই মোরা আসিয়াছি পূজিতে হেথায়,
দেখি তাহে এ দুর্দ্দিন যায় কি না যায়।
সুমুখী। যাও সবে দেশে ফিরে শঙ্কা নাই আর,
নিরাপদ হবে দেশ কহিনু তোমার।
এই দণ্ডে প্রাক্‌জ্যোতিষ শিবের কৃপায়,
নিরাপদে পাবে স্থান শান্তির ছায়ায়।
বিজয়া।—তবে কিলো সত্য তাই, লোকে
যাহা বলে?
ওকি লো ঢাক যে মুখ সহসা অঞ্চলে?
তোমারি প্রণয়ে শিব মজেছে সুমুখি?
সুখে থাক, সুখে থাক, শুনে হনু সুখী।
কিন্তু এক শঙ্কা মোর হতেছে পরাণে,
মহারুদ্র রূপ তাঁর পুরাণে বাখানে।
কেমনে মানুষী হয়ে তাঁহারে লইয়া
হয়েছ সুখিনী তুমি মরিলো ভাবিয়া। [ধাই।
সুমুখী।—শোন্ শোন্ তবে কথা কহি তোরে
অমন মধুর রূপ চক্ষে দেখি নাই।

তরুণ যৌবন তাঁর কান্তি মনোহর,
নিয়ত ঊষার রাগ কপোল উপর।
প্রণয়-মদিরা বশে আঁখি ঢল ঢল,
সুধার তরঙ্গ যেন অধরে চঞ্চল।
হাসির জ্যোছনা খেলে শ্রীমুখে সদাই,
কি যে সে সুঠাম দেহ বর্ণিব কি ছাই।
সে অঙ্গ পরশ মাত্রে অবশ হৃদয়,
সে রূপ দেখিলে বল কার হয় ভয়?
বিজয়া।—মায়াময় মহেশ্বর, তাই তবে হবে,
ধরিযে মানব বেশ বিহরেন ভবে।
কিন্তু তিনি মহাদেব, জানিলে কেমনে?
প্রকাশ দেখেছ কিছু স্বরূপ লক্ষণে?
সুমুখী।—দেখি নিত্য ব্যোম পথে আসিতে হেথায়,
আসিবার পূর্ব্বে শুনি ডমরুনিনাদ,
অদৃশ্যে সতত নন্দী সঙ্গে তাঁর যায়,
শুনেছি হেরিলে তারে ঘটয়ে প্রমাদ।
আর (ও) শুন, আগমন করেন যখন,
পাদস্পর্শে ধরে ধরা, নব শোভা রাশি,
অন্ধকারে আলোকের কম্পন সৃজন,
জ্যোছনায় অমানিশা ফুটে পড়ে ভাসি।
বিজয়া।— সুমুখি, বালিকা তুমি, জাননা বিশেষ,
সহসা মনেতে মোর শঙ্কা উপজিল।
মনিপুর রাজপুত্র ধরি ছদ্ম বেশ,
অবশেষে আসি হেথা তোরে কি ছলিল?
ভেল্কিবাজী জানে সে যে বড় যাদুকর,
শুনেছি তাহারো রূপ বড় মনোহর।
ছলেছে অনেক নারী প্রাক্‌জ্যোতিষ ধামে,
নারীর সতীত্বনাশ ব্যবসা তাহার।
শুনিয়াছি চারিদিকে ফেরে শিব নামে,
যাদুবলে করে নিত্য আকাশে বিহার।
নিতান্ত সে নীচজাতি মনিপুর বাসী,
সেই কি সতীত্ব তোর গেলরে বিনাশি?

সুমুখী।—শুনে যে কাঁপেরে প্রাণ ওগো মা আমার!
তাইত! কেমনে আমি বুঝিব বলনা,
সত্য কি না মহাদেব এ কণ্ঠের হার,
অথবা কলঙ্ক মাত্র,—কেবল ছলনা।
দুরু দুরু কাঁপে বক্ষ, ধর মোরে ধর,
চেতনা মিলায় যে গো রক্ষ মোরে হর।
(মূর্চ্ছা)
বিজয়া।—মর তুমি সেই মোর একান্ত বাসনা।
(সুমুখীর মূর্চ্ছাভঙ্গ)
শিব বলে পেল বুঝি আবার চেতনা।
সুমুখী।—(উঠিয়া) এখন বল্‌লো তুই কি করি উপায়?
না জানিয়া না বুঝিয়া ঘটিল কি দায়।
বিজয়া।—ভয় নাই ধৈর্য্য ধর, কে বলিতে পারে,
হয়ত সত্যই শিব প্রণয়ী তোমার।
পরীক্ষা করিয়া তুমি লইবে এবারে,
সহসা দিওনা স্থান নিকটেতে আর।
এখন আসিলে, আগে করি অভিমান,
কহিওনা কোন কথা, রেখো দূরে তারে,
তার পর, যখন সে তোষে আগুয়ান
প্রণয় বচনে আসি তুষিবে তোমারে,
করিও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দিতে পরিচয়
পার্ব্বতীর নামে, শেষ অঙ্গীকার হলে
কোরো তাঁরে পীড়াপীড়ি দেখাতে নিশ্চয়,
কপালে নয়ন তাঁর জ্বলে কি না জ্বলে।
অন্য কোন চিহ্নে তুমি ভুলনা কখন,
যাদুবলে যাদুকর কত কি না পারে,
কিন্তু সাধ্য আছে কার ধরে ত্রিনয়ন?
সেই গো নিশ্চিত চিহ্ন কহিনু তোমারে।
হেরিলে কপালে তাঁর সে দীপ্ত নয়ন,
"ভয়পাবে মো'রে যাবে" বলিতেও পারে।
কিন্তু সে কথায় দেখো ভুলনা কখন।
মরণ কি হয়, মৃত্যুঞ্জয় রক্ষে যারে?
সুমুখী।—ঠিক বলেছিস্ তুই তাহাই করিব,

নতুবা, না জানি চিত্ত, কেমনে সঁপিব ?
সত্য হৌক অথবা গো মিথ্যা ছলনায়
অর্পিয়াছি প্রাণ মোর মহেশ সেবায়,
অজ্ঞাতে কলঙ্ক যদি ছুঁয়েছে তাহার,
বিষ পানে, শিব নামে, করিব সংহার।
বিজয়া।—(স্বগত) ধরেছে ঔষধ মোর আর চিন্তা নাই।
য়া হবে বুঝেছি শেষ এখন পালাই।
(প্রকাশ্যে) সুমুখি, বিদায় দে গো যাই মা নগরে,
প্রভাতে আসিব তোরে দেখিবার তরে।
(প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

(স্বর্গপথে মহাদেব সুমুখীর গৃহের দিকে অবতরণ করিতেছেন, সঙ্গে নন্দী।)

মহাদেব।—নন্দি।
নন্দী।—প্রভু।
মহাদেব।—কোথা শুনি রোদনের ধ্বনি ?
ডাকিছে আমারে আজি কে সে অসহায় ?
নন্দী।—দেবদেব। পতি-হারা কাঁদিছে রমণী,
করিছে তোমার নাম লুটায়ে ধূলায়।
মহাদেব।—দ্রুত যাও, পতি তার দেও বাঁচাইয়া,
জগতে বিচ্ছেদ জ্বালা সহিবে না কেহ,
স্বয়ং ঈশ্বর যদি প্রণয়ে মজিয়া
ধূলার জগতে আসি করিলেন গেহ।
নন্দী।—যে আজ্ঞে চলিনু তবে। (প্রস্থান)
মহাদেব।—(সুমুখীর গৃহে অবতরণ করিয়া) সুমুখি, কোথায় ?
নিত্য দেখি অপেক্ষিয়া থাকে দরজায়।
আদরেতে আগুসারি হাসি ভরা মুখে,
প্রেমময় বাহুপাশে বাঁধে মোরে বুকে।
কৈ গো আজি তো তারে দেখিতে না পাই,
সুমুখি। সুমুখি ? নাগো হেথায় তো নাই।
অসুস্থতা ? অমঙ্গল ? সম্ভবে না কভু,
স্বয়ং মঙ্গলদাতা শিব যাঁর প্রভু।
মহেশ্বরী অভিমানে বধেছেন প্রাণ ?
দেবতার বক্ষে কম্প।। করিব সন্ধান।
সুমুখি।
(সুমুখীর প্রবেশ)
এই যে মোর চাঁদের উদয়।
শশাঙ্কশেখর যারে শিরে তুলে লয়।
(অবনত মুখে সুমুখীর পরিভ্রমণ)
ধরায় কৈলাস তুমি, ভবানী, শঙ্করী,
কাছে এস—
সুমুখী।—যাও যাও।
মহাদেব।— একি গো সুন্দরি।
সুমুখি, তোমার মুখে একি শুনি বাণী,
কাছে এস, কাছে এস, হৃদয়ের রাণী।
(সুমুখীর দূরে গমন)
অহো, আজি সৃষ্টি কিরে নিবিবে নিমেষে।
সুমুখি! চিনিতে তুমি পারনা মহেশে ?
সুমুখী।—থাম, শঠ প্রবঞ্চক।
মহাদেব।—সুমুখি আমার।
সুমুখী।—যাও যাও।।
মহাদেব।—আমি শিব চরণে তোমার।
সুমুখী।—তুমি শিব ? ছিছি তোর হয় না শরম ?
জন্ম লয়ে রাজবংশে এমন ধরম ?
সতীত্ব নাশের পাপে, মনিপুর পতি।
করিবেন শিব তোর নিরয়েতে গতি।
মহাদেব।—(সগৌরবে) হের বিশ্ব পদতলে ঘুরিছে আমার।
আমি মনিপুর-পতি ? কি কথা তোমার ?
সুমুখী।—পাপ। পাপ। মহাপাপ। বলিও না আর।
মহাদেব।—এ কি ভাষা। এ কি স্বপ্ন দেখিছ মায়ার ?
সুমুখী।—মায়ার স্বপন বটে। ঠিক কথা তাই।।

(ঊর্দ্ধে চাহিয়া) এ কিরে কুহকে মোর ফেলিলে গোঁসাই!
যাও যাও, দূরে যাও, যা হবার হলো,
করিলাম ভ্রমে সুধু কলঙ্ক স-ম্ব-ল—
নারীর সতীত্ব রত্ন কেনই হরিলে,
শিব নামে মোরে তুমি কেনই ছলিলে?
মহাদেব।—শিবত্বে সন্দেহ ধনি, হয়েছে তোমার?
সুমুখী।—সত্য যদি শিব তুমি হইতে আমার।
আহারে যৌবন মোর সঁপিয়াছি শিবে।
যদি তুমি শিব নহ, সুমুখী মরিবে।
মহাদেব।—বল ধনি কি করিব দিতে পরিচয়?
সুমুখী। প্রতিজ্ঞা "পার্ব্বতী নামে" কর মহাশয়।
যা সুধাব যা বলিব করিবে গো তাই।
মহাদেব।—(স্বগত) কে শিখাল এ প্রতিজ্ঞা, একিরে বালাই!
অঙ্গীকার না করিলে ক্ষুব্ধ হবে প্রাণে।
(প্রকাশ্যে) ভাল, করিলাম দিব্য পার্ব্বতীর নামে।
সুমুখী।—পুরাণে তন্ত্রেতে উক্ত শিব ত্রিনয়ন।
কপালে তৃতীয় চক্ষু দেখাও এখন।
মহাদেব।—(বিষাদে) সুমুখী ধরিগো পায়, ক্ষমা কর মোরে,
এমন দুর্ব্বুদ্ধি বল কে দিয়াছে তোরে?
পার্ব্বতীর নামে করিয়াছি অঙ্গীকার,
সাধ্য নাই, সাধ্য নাই, ভাঙ্গিব আবার।
কবলো সুমুখি তুমি অন্য আবদার,
সে চক্ষু দেখিলে তুমি যাবে ছারখার।
দেখ চেয়ে গ্রহ তাহা আমার ঈঙ্গিতে,
জ্যোতিহীন ম্রিয়মান হয়েছে চকিতে,
ঐ দেখ রজনীতে হল সূর্য্যোদয়,
ইথে কি সন্দেহ আর, পেতে পরিচয়।
সুমুখী।—যাদুকর, যাদুবলে পারে সমুদয়,
ইহাতে কিছুই মোর না হয় প্রত্যয়।
বরং সন্দেহ বড় জনমিল প্রাণে।
দেবতা কি সুখ আশে আসিবে এখানে?
স্বরগে শঙ্করী সদা সাথে সাথে যাঁর,
নিজসৃষ্ট কীট প্রেমে কিহবে তাঁহার?
মহাদেব।—জাননা প্রেয়সি তুমি রহস্য ইহার,
চিত্রকর মুগ্ধ হয় চিত্রে আপনার।
আপনি গড়িয়া মূর্ত্তি আপনি পাগল,
হয়েছে জগতে শ্রেষ্ঠ ভাস্করের দল।
সুমুখী।—কি কাজ সে কথা শুনি? হৃদয় চঞ্চল,
দেখিতে কপালে সুধু চক্ষু সমুজ্জ্বল।
মহাদেব।—আতঙ্গে কাঁপিছে বক্ষ, সুমুখি আমার।
ছাড় এ কুমন্ত্র, কর অন্য আবদার।
সুমুখী।—হইলে প্রতিজ্ঞাচ্যুত, চলিলাম আমি।
(যাইতে উদ্যত)
মহাদেব।—আজিকি সঙ্কটে হায় ত্রিভুবনস্বামী,
সুমুখি! নিয়তি বল, কে খণ্ডিতে পারে।
অক্ষম রক্ষিতে আজি দেবতা তোমারে।
যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি সাধ্য কি খণ্ডিব?
এস, এস, যাহা চাও তাই দেখাইব।
হায়, হায়! সুমুখিরে, ফলিল কি ফল!!
এইদেখ দীপ্ত ভালে চক্ষু সমুজ্জ্বল।
(ত্রিনেত্র প্রকাশ—এবং সুমুখীর পুড়িয়া ভস্ম হইয়া পতন)
(বিষাদে অন্তরীক্ষে মহাদেব, মৃতপুরুষের জীবনদানের সংবাদ লইয়া নন্দী উপস্থিত)
নন্দী।—দেব-দেব! আজ্ঞাক্রমে জীবন সঞ্চার করিয়াছি নরদেহে। কি করিব আর?
মহাদেব।—যাও যাও, দ্রুতবেগে যাওগো আবার,
ফেল তারে মৃত্যু-মুখে বাঁচায়েছ যার।
অযুত যুবতি-পতি আরো কর বধ,
ছড়াও পৃথিবীময় বিচ্ছেদ বিপদ।
বিচ্ছেদে কাতর যদি ত্রিভুবনেশ্বর,
বিয়োগ বিধুর তবে হোক্ নারীনর।
(উভয়ের প্রস্থান)
(যবনিকা পতন)

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

ছাটীয়ার জন্ম ষষ্ঠী।

বাপেব পাবিশ (গোত্র) মত ছেলেব পাবিস হয, মাব মত হয না। যে গ্রামে সন্তান হয়, সে গ্রাম অশুদ্ধ হয। শুদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত পূজা পর্ব্ব কিছু হয় না। পুত্র জন্মের পাঁচ দিবস পবে এবং কন্যাব তিন দিবস পবে শুদ্ধ স্নান কবিতে হয। সেই দিন ছেলেব বাপ গ্রামেব সকলকে নিমন্ত্রণ কবিয়া আনে। সকলে আসিলে নাপিত প্রথমে পুবোহিত (পূঝাব), তাহাব পব তন্ত্রধাব (কুড়াম নায়কি) মোস্তাজিব পবামাণিক, যোগ মাঝি, যোগ পবামাণিক ও গোডাইতকে ক্রমান্বয়ে কামাইযা শেষে গ্রামেব অন্য সকলকে কামাইযা ছেলেকে কামাইযা দেয়। দাই দুইটা দোনা (পাতেব চোঙা) লইযা ছেলেকে কোলে কবিয়া দ্বাবে বসে। একটা দোনায় জল, অন্যটায ছেলেব মাথাব চুল থাকে। কামান শেষ হইলে যে তীবে ছেলেব নাড়ী কাটা হয, দাই সেই তীবে দুটা সুতা বাধিযা দেয়। তখন ছেলেব বাপ দোনায তেল লইযা পুরুষদিগকে সঙ্গে লইযা স্নান কবিযা আসে। তাহাবা ফিবিয়া আসিলে দাই তেল হলুদ সুতা বাঁধা শব লইযা সকল স্ত্রীলোকেব সঙ্গে স্নান কবিতে যায়। ঘাটে গিযা দাই চুলেব দোনা ও একটা সুতা ভাসাইয়া দেয এবং ঘাটে পাঁচ ফোঁটা সিঁদুবেব দাগ দেয়। ইহাকে ঘাট কেনা বলে। অন্য সুতা ও শরটী ধুইয়া ঘবে আনে। সেই সুতায় হলুদ মাখাইযা ছেলেব কোমবে দড়ি করিয়া দেয়। ঘাট হইতে ফিরিয়া আসিযা দাই চালেব নীচে ছেলে কোলে কবিয়া প্রসূতিকে বসাইয়া চালের উপর গোবর জল ঢালিযা দেয। সেই জল চোঁযাইয়া প্রসূতিব মাথাব উপব পড়ে। কিছু জল হাতে মাথায় ছুইয়া দেয় ও কিছু পান কবে। তাহাব পব প্রসূতি ঘবে গিযা ছেলেকে খাটিযায় শোয়াইযা দেয়। তখন দাই চালের জল খাটিয়াব কোণে ছিটাইয়া দেয। এক দোনা লইযা পূর্ব্বোল্লিখিত ক্রমে গ্রামেব প্রধানদিগেব গায়ে ছিটাইয়া দেয। এবং আব এক দোনা জল লইযা পর্য্যায়ক্রমে উক্ত প্রধানদিগেব স্ত্রী ও গ্রামেব অন্যান্য স্ত্রীলোকেব চক্ষে ছিটাইয়া দেয। তাহাব পব শিশুর নামকবণ হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রেব নাম পিতাব নামে। দ্বিতীয়েব নাম মাতামহেব নামে। জ্যেষ্ঠ কন্যার নাম পিতামহীব নামে ও দ্বিতীয় কন্যাব নাম মাতামহীব নামে হয। খুল্লতাত মাতুল প্রভৃতির নামে অন্য পুত্রেব এবং খুড়া মাসী প্রভৃতিব নামে অন্য কন্যাব নামকবণ হয়। নাম স্থির হইলে দাই সকলকে দণ্ডবৎ করিয়া শীকাবে ও অন্য কর্ম্মে পুত্রকে এবং জল আনিতে ও অন্য কর্ম্মে সেই নামে কন্যাকে ডাকিতে সকলকে অনুবোধ করে। তদনন্তব নীম পাতার গুঁড়া ও চালেব গুঁড়া জলে ফুটাইযা সেই জল পুরুষ ও স্ত্রীদিগকে বিতবণ কবিলে ছাটিয়াব সম্পূর্ণ হয। তদবধি শিশু কুটুম্বেব মধ্যে পবিগণিত হয়। ছাটিয়ারেব পাচ দিন পবে দাই ও নাপিত দুই জনে মিশিযা আর একবাব ছেলেকে কামাইয়া দেয়। হাড়িয়া (মদ) ভিন্ন সাঁওতালের কোন পর্ব্ব পূর্ণ হয় না। এবং বোঙ্গা বুঙ্কিকে না দিযা তাহা পান কবে না। এজন্য সে কথা স্বতন্ত্র উল্লেখ করা হইল না।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র বায় চৌধুরী।

সমুদ্র।

(প্রথম প্রস্তাব)

পৃথিবীতে স্থল অপেক্ষা জলের ভাগ অনেক অধিক। পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সমুদ্রের পরিমাণ প্রায় ১৪,৪৭,১২,০০০ বর্গমাইল অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর ৩/৪ অংশের কিছু কম স্থান সমুদ্র কর্তৃক আচ্ছাদিত।

সমুদ্রের গভীরতা সকল স্থানে সমান নহে। বঙ্গোপসাগরের যে স্থান দিয়া গঙ্গা পাতাল প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়া কথিত আছে, তাহা অতলস্পর্শ না হইলেও যে অত্যন্ত গভীর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গত ১৫ বৎসরে সমুদ্রের অনেক স্থানের গভীরতা স্থিরীকৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, সেণ্টটমাস দ্বীপের ১০০ মাইল উত্তরস্থ সমুদ্রই আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গভীর এবং উহার গভীরতা প্রায় ৪৷৷০ মাইল। কিউরিল দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব্বস্থ প্রশান্তমহাসাগর প্রায় ৫৷৷০ মাইল গভীর, ইহা অপেক্ষা গভীর স্থান অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। পৃথিবীর মধ্যে হিমালয় পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং উহার উচ্চতম শৃঙ্গ প্রায় ৫৸০ মাইল উচ্চ। সুতরাং পৃথিবীর গভীরতম স্থান হইতে উচ্চতম স্থানের উচ্চতা প্রায় ১১৷০ মাইল হইল। যাহা হউক, পূর্ব্ব কথিত স্থান দ্বয়ের ন্যায় গভীর সমুদ্র প্রায় লক্ষিত হয় না। সমুদ্রের অল্প ও অধিক গভীরতার গড় ধরিলে উহার সাধারণ গভীরতা প্রায় ৩ মাইল হইবে। তাহা হইলে সমুদ্রের ঘন পরিমাণ প্রায় ৪০,০০,০০,০০০ চল্লিশ কোটী ঘন মাইল হইবে। কিন্তু এই অসীম জল রাশি, সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করিলে অতি সামান্য বলিয়া বোধ হইবে। পৃথিবীকে যদি একটা কমলা লেবুর মত মনে করা যায়, তাহা হইলে তাহার ৩/৪ অংশে তুলি দ্বারা জল লাগাইয়া দিলে যত টুকু জল লাগে, সমুদ্রজলের অনুপাত তাহা অপেক্ষা বড় অধিক হইবে না।

বর্ত্তমান সময়ে সমুদ্র সম্বন্ধে যতগুলি তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটী প্রধান তত্ত্ব এই যে, উত্তর, ভূমধ্য ও কৃষ্ণসাগর, ক্যাস্পেরিয়া, ওখটস্ক ও চীন সমুদ্র, বাফিন ও হাডসন্ উপসাগর প্রভৃতির সঙ্গে মহাসমুদ্রের কোন সম্বন্ধই নাই। স্থলভাগের স্থানে স্থানে বসিয়া গিয়া ঐ সমস্ত সাগর ও উপসাগর উৎপন্ন হইয়াছে। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক ক্রিয়া দ্বারা যদি কয়েক শত ফাদাম উচ্চ হয়, তাহা হইলে ঐ সকল জলভাগ আবার স্থলরূপে পরিণত হইবে।

পৃথিবীর উপরিভাগে যেমন কোথাও সমতল ক্ষেত্র বিস্তৃত, কোথাও গভীর গর্ত্ত, আবার কোথাও বা পর্ব্বত শ্রেণী শূন্যে মস্তক উন্নত করিয়া বিরাজ করিতেছে, সমুদ্র তলের অনেক স্থানেও সেইরূপ বিস্তৃত সমতল, গভীর গর্ত্ত ও পর্ব্বত শ্রেণী রহিয়াছে। আটলাণ্টিক মহাসাগরে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক পর্ব্বত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশের চূড়া ২।৩ শত ফিট জলের নিম্নে অবস্থান করিতেছে, আর কতকগুলির উন্নত শৃঙ্গ সমুদ্রের উপরিভাগে দ্বীপরূপে অবস্থান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে আজোরিজ্, সেণ্ট-

পল, আনেস্সান্, ট্রিষ্টান প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবাল-দ্বীপপুঞ্জ সমুদ্র গর্ভস্থ পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত। এই পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর পশ্চিম দিক হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত। যে সমস্ত দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জ ভাগ হইতে অনেক দূরে সমুদ্র মধ্যে রহিয়াছে, তাহারা হয় আগ্নেয়গিরি, না হয় সমুদ্র গর্ভস্থ পর্ব্বতের উপর প্রবালকীট দ্বারা নির্ম্মিত। সেণ্টহেলেনা, আসেন্সান্, ফ্রেণ্ডলি, স্যাণ্ডউইচ্ প্রভৃতি ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত। সমুদ্রের সঙ্গে আগ্নেয়গিরির বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয়, কারণ প্রায় সমস্ত আগ্নেয় পর্ব্বতই সমুদ্রের উপকূলে, না হয় দ্বীপের উপর অবস্থান করিতেছে, আবার অনেকগুলির শৃঙ্গ সমুদ্র গর্ভেই রহিয়াছে। ইহাদের মধ্য হইতেও সময়ে সময়ে অগ্নিশিখা, গলিত প্রস্তর প্রভৃতি পদার্থ নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই সমস্ত আগ্নেয় পর্ব্বতের অগ্নিই বাড়বানল নামে অভিহিত হইয়াছে।

নদী ও পুষ্করিণীর জল পরিষ্কার, সুতরাং পানের উপযোগী, কিন্তু সমুদ্র জলের সঙ্গে নানা প্রকার লবণ পদার্থ মিশ্রিত আছে বলিয়া তাহা কিছুতেই পান করা যায় না। সাধারণত, সমুদ্র জলের প্রতিশত ভাগে প্রায় ৩$\frac{১}{২}$ ভাগ বিভিন্ন প্রকারের লবণ থাকে। ইহার মধ্যে প্রায় ২$\frac{৩}{৪}$ ভাগ আমাদের আহার্য্য লবণ। সমুদ্র সকল স্থানে সমান লোণা নহে। যেখানে সমুদ্র হইতে প্রচুর পরিমাণে বাষ্প উত্থিত হয়, সেখানকার জল অধিক লোণা। এই জন্যই উষ্ণ প্রধান দেশের সমুদ্র অধিক লোণা। এই জন্যেই ভূমধ্য সাগরের জলে কখন কখন শত করা ৪$\frac{১}{১২}$ ভাগ পর্য্যন্ত লবণ পাওয়া যায়। অন্যপক্ষে যেখানে নদী প্রভৃতি দিয়া প্রচুর পরিমাণে পরিষ্কার জল সমুদ্রে আসিয়া পড়ে এবং সেই সমুদ্রের চতুর্দ্দিক যদি অনেকটা স্থল ভাগ দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তাহা হইলে সেখানকার জলের লবণের পরিমাণ কম হয়। বল্টিক সাগরের জলে এই কারণে শতকরা $\frac{১}{২}$- ভাগ হইতে ১$\frac{৩}{৪}$ ভাগের অধিক লবণ পাওয়া যায় না।

সমুদ্র জলের সঙ্গে নানা প্রকার লবণময় পদার্থ মিশ্রিত আছে বলিয়া তাহার আপেক্ষিক গুরুত্ব নদী জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব অপেক্ষা অনেক অধিক। এক সহস্র কলসী সমুদ্র জলের ভার এক সহস্র ছাব্বিশ কলসী নদী জলের ভারের সমান। সমুদ্র জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক বলিয়া জাহাজাদি কোন জলযান সমুদ্রে গেলে অধিক ভাসিয়া উঠে।

সমুদ্র জলে এত লবণ কোথা হইতে আসিল? উহার জল পূর্ব্বে পরিষ্কার ছিল এবং তৎপরে কারণ বিশেষের দ্বারা লবণাক্ত হইয়াছে, অথবা সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই উহার জল লবণাক্ত, এ বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। জলের এই একটী বিশেষ শক্তি আছে যে, যে কোন পদার্থ উহার সংস্পর্শে আসিবে, তাহার কিছু না কিছু অংশ গলিয়া জলের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে। কাচ যে এমন কঠিন পদার্থ, তাহাতেও পরিষ্কার জল রাখিলে, কাচের কিয়দংশ গলিয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। এখন দেখা যাইতেছে যে, বৃষ্টির জল পর্ব্বতের উপর এবং পৃথিবীর নানা স্থানে পতিত হইয়া, নদী খাল প্রভৃতি দিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে, সুতরাং ইহা স্থির নিশ্চয় যে, প্রতি বৎসর অসংখ্য নদী দিয়া, নানা প্রকার লবণ পদার্থ সমুদ্রে গিয়া

পড়িতেছে। এখন হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে, নদী দিয়া লবণ পদার্থ সমুদ্রে গিয়া পড়িতেছে, এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? কই আমরা নদীর জল ত তত লোণা দেখিতে পাই না? এ কথার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, নদী জলে লবণ থাকিলেও উহার পরিমাণ অনেক স্থলে এত অধিক নহে যে, অত জলকে বিস্বাদ করিয়া ফেলিবে। রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা এই লবণের অস্তিত্ব অনায়াসেই দেখা যাইতে পারে। সমুদ্রে যে জল গিয়া পড়িতেছে, তাহাতে অল্প পরিমাণে লবণ পদার্থ থাকে বটে, কিন্তু সূর্য্যের উত্তাপে যে জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতেছে, তাহা পরিষ্কার, সুতরাং যেমন বৎসরের পর বৎসর চলিয়া যাইতেছে, সমুদ্র জলে লবণের ভাগও তেমনি বাড়িয়া যাইতেছে।

সমুদ্র জল এইরূপে লোণা হইয়াছে, ইহা মানিতে গেলে বুঝিতে হইবে যে, সৃষ্টির আদিতে সমুদ্র জল লোণা ছিল না, তৎপরে ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনেক পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন যে, সমুদ্র জল যে কোন কালে পরিষ্কার ছিল, তাহার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না, বরং তাহার বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁহারা বলেন, নদী প্রভৃতি দিয়া সমুদ্রে লবণ যাইতেছে বটে, কিন্তু ইহা ভিন্ন আর একটী বিশেষ কারণে সমুদ্র জল এত লোণা হইয়াছে। তাহা এই,—সৃষ্টির আদিতে যখন আমাদের পৃথিবী বাষ্পাকারে অবস্থান করিত, তখন অন্যান্য পদার্থের ন্যায় সমস্ত জল রাশিও বাষ্পাকারে চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত, তৎপরে ক্রমে ক্রমে যখন এই জলীয় বাষ্পরাশি অপেক্ষাকৃত শীতল হইয়া তরলাবস্থা প্রাপ্ত হইল, তখনই বায়ুমণ্ডলস্থ নানা প্রকার লবণ পদার্থের সহিত মিশিয়া লবণাক্ত হইয়া গেল। এই লবণাক্ত জল রাশিই সমুদ্র, সুতরাং সৃষ্টির আদি হইতেই সমুদ্রের জল লোণা। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বকালে সমুদ্র জলে লবণের ভাগ যেরূপ ছিল, এখন নানা কারণে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

সমুদ্রের পূর্ব্ব অবস্থা সম্বন্ধে দুইটী মত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পৃথিবী যখন তরল হইতে কঠিনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন উহার উপরিভাগ প্রায় এক সমতলে ছিল। সুতরাং জল সমগ্র পৃথিবীকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। তখন বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় স্থলভাগ ছিল না। তৎপরে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক ক্রিয়া দ্বারা স্থান বিশেষ উন্নত হইয়া অল্প বা অধিক উচ্চ স্থলভাগের সৃষ্টি হইয়াছে।

আবার বর্ত্তমান সময়ের ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নানা স্থানের স্তর সমূহ পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, পৃথিবীতে এমন অনেক স্থান পাওয়া যায়, যাহা কোনও কালে জলের নীচে ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং জলের নীচে ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। এই মত সত্য হইলে, পৃথিবীর জন্ম হইতেই উহার উপরিভাগে স্থল ও জল রহিয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যাহাই হউক, বর্ত্তমান স্থলভাগের অনেক স্থান যে পূর্ব্বকালে জলময় ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান হ্রদ প্রভৃতির উপর দিয়া সমুদ্র প্রবাহিত হইত। উত্তর মেরু সন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জের অনেকগুলি ও সাহারা মরু পূর্ব্বকালে সমুদ্রগর্ভে ছিল। আবার যেখানে স্থল ছিল, এমন অনেক স্থান সমুদ্র হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব কথিত উত্তর, ভূমধ্য সাগর, হাড্‌সন্ উপসাগর প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

শ্রীকালীবর ভট্টাচার্য্য।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৩৯)

দক্ষিণাপথে—রামানন্দ মহোৎসব।

কর্ম্ম ক্ষেত্র হইতে গৌরচন্দ্র জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্রে আসিয়া নৃসিংহ দেখিয়া স্তব বন্দনা করিলেন। এখানে ভূগর্ভে পাদমূল প্রোথিত নৃসিংহ মূর্ত্তি বিরাজমান। কথিত আছে, এক সরল বিশ্বাসী পুঁড়া গোয়ালের এই স্থানে শস্য ক্ষেত্র ছিল। সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গৃহে যাইবার সময় শস্যক্ষেত্র অন্যরক্ষক না রাখিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া ক্ষেত্রগুলি তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইত। কিন্তু দেখিতে লাগিল, প্রত্যহ রাত্রে কে তাহার শস্য নষ্ট করিয়া যায়। সে দুঃখিত হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল যে, যে তাহার শস্য নষ্ট করে, তাহাকে যেন সে দেখিতে পায়। এই বলিয়া রজনীতে এক স্থানে সে লুকাইয়া থাকিল। কিছুক্ষণ পরে সে দেখিল যে, ভীষণমূর্ত্তি এক বরাহ আসিয়া তাহার শস্য খাইতেছে। অমনি সে ধনুকে গুণ যোজনা করিয়া শূকরকে বিদ্ধ করিল, এবং শুনিতে পাইল, শূকর রাম। রাম। শব্দ করিয়া নিকট স্থিত পর্ব্বত গুহায় প্রবেশ করিল। তখন গোয়ালা বুঝিল যে, সে শূকর নহে, ভগবান তাহাকে ছলনা করিয়াছেন। ইহাতে সে নিতান্ত ব্যথিত চিত্তে উপবাসী থাকিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত ভগবানের নিকট আত্ম দোষের ক্ষমা চাহিয়া প্রার্থনা করিল। দৈববাণী হইল, 'তোমার অপরাধ নাই, ঘরে যাও।' পুঁড়া ছাড়িবার পাত্র নয়, বলিল, 'আমার দোষ ক্ষমা করিলে কেমন করিয়া বুঝিব, যদি কোন প্রসাদ চিহ্ন দেখিতে না পাই?' দৈববাণী উত্তর করিল 'পাইবে'। পুঁড়া তখন দেশের রাজার নিকটে যাইয়া আদ্যোপান্ত বিবৃত করিলে, রাজা বলিলেন, 'যদি তুমি দেখাইতে পার, তবে আমি তোমার ক্রীত দাস।' তখন রাজা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে প্রার্থনা করিলে, দৈববাণী হইল, 'তুমি যে জাতিবুদ্ধি ছাড়িয়া আমার ভক্তের সম্মান করিয়াছ, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। এইখানে দুগ্ধ সেচন কর, আশ্চর্য্য দেখিবে।' তখন রাজাজ্ঞায় সেই স্থানে দুগ্ধ সিঞ্চন হইতে লাগিল এবং একটু একটু করিয়া ভূগর্ভ হইতে অপূর্ব্ব নৃসিংহ মূর্ত্তি উঠিতে লাগিল। দর্শকবৃন্দ বিস্মিত হইয়া গেল। জানু পর্য্যন্ত উঠিলে আজ্ঞাবাণী হইল, 'আর উঠিবে না, নিরস্ত হও।' রাজা তখন মহানন্দে সেই স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া মহা মহোৎসব করিলেন। কিছু দিন পরে জিয়ড় নামে এক সাধু মহাজন দুই পুরঙ্গনা সমভিব্যাহারে দেবমূর্ত্তি দেখিতে মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে হঠাৎ তাঁহার সঙ্গিনী দুই জনকে পাষাণময়ী হইয়া দেবচরণ লাভ করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে রোদন করিতেছিলেন। দেবতা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'রোদন ছাড়, তোমার রমণীদ্বয় সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। আজি হইতে তোমার নামে আমার নাম হইল।' সেই অবধি জিয়ড় নৃসিংহ নাম প্রকাশ হইল। চৈতন্যদেব নৃসিংহ মন্দিরে যাইয়া এই কিংবদন্তী শুনিতে পাইয়াছিলেন।

নৃসিংহক্ষেত্র ছাড়িয়া গৌরচন্দ্র কত দিন পরে গোদাবরী তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। গোদাবরী দেখিয়া যমুনা ও তীরস্থ বন দেখিয়া বৃন্দাবন স্মৃতি হওয়ায় তিনি অনুরাগ ভরে বন মধ্যে অনেকক্ষণ নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। এবং নদী পার হইয়া পর পারে আসিয়া স্নানাবগাহন সাঙ্গ করিয়া ঘাটের কিছু দূরে জল সন্নিধানে বসিয়া নাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই নগরের নাম বিদ্যানগর বা রাজমহেন্দ্রি। ইহা উৎকল রাজের দাক্ষিণাত্য প্রদেশের রাজধানী। অল্পক্ষণ পরে মহাপ্রভু দেখিলেন যে, বহু লোক সঙ্গে বাজনা বাজাইতে বাজাইতে এক বিচিত্র দোলায় চড়িয়া কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ঘাটে স্নানাবগাহন জন্য আসিলেন। তাঁহার সঙ্গের স্তাবক এবং বৈদিক ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিল। রাজপুরুষ বিধিমত স্নান তর্পণ সমাধা করিলেন। শ্রীচৈতন্য মনে মনে চিন্তা করিলেন, এই কি রাজা রামানন্দ রায়, যাঁহার কথা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়াদিয়াছেন? ইতিমধ্যে রাজপুরুষ সন্ন্যাসী দেখিয়া নিকটে আসিয়া প্রণাম করিলে, গৌর উঠিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি রাজা রামানন্দ রায়।" আগন্তুক উত্তর করিলেন "হাঁ আমি সেই মন্দবুদ্ধি শূদ্রাধমই বটি।" গৌর বলিলেন, "আমি নীলাচল হইতে আসিতেছি, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য আপনার গুণ বর্ণনা করিয়া আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিয়াছেন। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যই আমার এখানে আসা, ভাল হইল যে অনায়াসে দর্শন পাইলাম।" এই বলিয়া গৌরচন্দ্র বাহু প্রসারিয়া রামানন্দ রায়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। রায়ও তাঁহাকে আলিঙ্গিয়া প্রেমোন্মত্ত হইলেন। স্তম্ভ, স্বেদ, অশ্রু, কম্প, পুলক, বৈবর্ণতে উভয়ে বিহ্বল হইয়া ভূমিতলে পড়িলেন। ক্ষণ কালের জন্য উভয়েই আত্ম বিস্মৃত হইলেন। কে জানে ভক্তদিগের অন্তরে অন্তরে কি এক অদৃশ্য বৈদ্যুতিক ভাব আছে যে, পরিচয় না থাকিলেও দর্শন শ্রবণে পরস্পরকে চিনিতে বাকী থাকে না। দর্শক লোকেরা এই ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিল, "এই সন্ন্যাসীকে মহা তেজোময় দেখিতেছি, শূদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া ইনি কাঁদিতেছেন কেন? আর আমাদের মহারাজ পরম গম্ভীর ও পণ্ডিত, ইনিই বা কেন সন্ন্যাসী স্পর্শে অস্থির হইলেন।" যাহা হউক, উভয়েই ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে রায় রামানন্দ শ্রীচৈতন্যের কথার উত্তরে বলিলেন, "সার্ব্বভৌম আমাকে ভৃত্য জ্ঞানে অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকেন বলিয়া আমার উপকারের জন্য আপনাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আজ আপনার দর্শন ও আলিঙ্গনে পবিত্র হইলাম। আমি অস্পৃশ্য রাজসেবী শূদ্রাধম, আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বরূপ হইয়াও আমাকে যে স্পর্শ করিলেন, সে আপনার কৃপার গুণে। মহৎদিগের স্বভাবই এই যে, নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও তাঁহারা পামরদিগের গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। আপনার প্রভাব সাক্ষাতেই দেখিতেছি যে, আমার সঙ্গের এই সহস্রাধিক লোকও আপনাকে দেখিয়া হরি নাম পুলকাশ্রুতে দ্রবীভূত হইয়াছে। গৌর বলিলেন, "না, তা নয়। আপনি ভাগবতোত্তম, আপনার মিলনে আমার প্রেমভক্তি লাভ হইবে বলিয়াই সার্ব্বভৌম এখানে

আসিতে বলিয়া দিয়াছেন।" এইরূপ কথা বার্ত্তার মধ্যে রাজার ইঙ্গিতে এক বৈদিক বিপ্র মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহার গৃহে যাইতে অনুরোধ করিল। শ্রীচৈতন্য নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া রামানন্দ রায়কে বলিলেন, "আপনার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে বড় সাধ আছে। আবার যেন দর্শন পাই।" রায় বলিলেন, "যদি অধম তারিতে এখানে আসিয়াছেন, তবে ৫।৭ দিন থাকিয়া আমার দুষ্ট মনকে সংশোধন করুন।' এই বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া রাজা রামানন্দ রায় দোলায় চড়িয়া বাজনা বাজাইতে বাজাইতে মহা সমারোহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীচৈতন্যও ব্রাহ্মণের সঙ্গে তদীয় গৃহে যাইয়া মধ্যাহ্নাদি সমাপন করিলেন।

রামানন্দ রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই:— ভবানন্দ রায় নামে উড়িষ্যার করণ বংশীয় এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পাঁচ পুত্র। গোপীনাথ পট্টনায়ক, বাণীনাথ পট্টনায়ক, রামানন্দ রায় এবং আর দুই জন, যাঁহাদের নাম জানা যায় না। সপুত্র ভবানন্দ চিরদিন উড়িষ্যার রাজ সংসারে উচ্চ উচ্চ রাজকার্য্য করিয়া আসিতেছেন। মালজ্যেঠ্যা দণ্ডপাঠ নামক প্রদেশে গোপীনাথ শাসন কর্ত্তা, রামানন্দ রায় গোদাবরী প্রদেশের শাসন কর্ত্তা, তাঁহার উপাধি রাজা। ভবানন্দ ও বাণীনাথ নীলাচলে উচ্চ উচ্চ পদে অভিষিক্ত। ইহার পর শ্রীচৈতন্য নীলাচলে থাকার সময়ে এই গোষ্ঠি তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহারই পরিবার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। ভবানন্দের পাঁচ পুত্রের মধ্যে রামানন্দ রায় পরম পণ্ডিত ও রাধাকৃষ্ণের উপাসক, পরম ভক্ত এবং সর্ব্বোচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত। সংসারে থাকিয়া নির্লিপ্ত ভক্ত জীবনের উজ্জ্বল আদর্শ তাঁহার জীবন।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে রাজা রামানন্দ ও শ্রীচৈতন্য স্ব স্ব স্থানে গমন করিলে উভয়ের পুনর্ম্মিলনের উৎকণ্ঠায় সন্ধ্যা উপনীত হইল। শ্রীচৈতন্য সায়ন্থ স্নান সমাপনান্তে নিভৃতে বসিয়া হরিনাম করিতেছেন, এমন সময় রামানন্দ রায় এক মাত্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলে তিনি আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে ভৃত্যকে বাহিরে থাকিতে বলিলেন। রঙ্গ স্থানে নানা কথোপকথন হইলে শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাধ্য বস্তু কি? তাহার নির্ণয় করুন।"

রামানন্দ উত্তর করিলেন, "স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চারি বর্ণের ব্রহ্মচর্য্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ এই চারি আশ্রমের ধর্ম্ম যেরূপ মন্বাদি ঋষিগণ নিরূপণ করিয়াছেন, স্ব স্ব অধিকার ভেদে তাহাই যাজনা করিয়া ভগবানের আরাধনা করা উচিত।" শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "এত বাহিরের কথা, নিগূঢ় কথা কি বল।" রামানন্দ বলিলেন, "ভগবানে কর্ম্মার্পণই সাধ্যসার। পান, ভোজন, দান, তপস্যাদি যে কোন কর্ম্ম করা যায়, তাহার ফলাফলে উদাসীন থাকিয়া ভগবদিচ্ছার অনুগত হইয়া চলাই সার ধর্ম্ম।"

শ্রীচৈতন্য। 'এও বাহিরের ধর্ম্ম।'

রামানন্দ। 'তবে স্বধর্ম্ম ত্যাগই শ্রেষ্ঠ, বর্ণাশ্রম-নিরূপিত ও বেদ-বিহিত সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি কেবল মাত্র ভগবচ্চরণ আশ্রয় করিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ সাধক।'

শ্রীচৈতন্য। ইহাও বাহিরের কথা।

রামানন্দ। জ্ঞান মিশ্রা ভক্তিই সাধ্য শিরোমণি। যাঁহার অবিদ্যা দূরীভূত হইয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্ম জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, যাঁহাতে ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন ও যিনি ব্রহ্মে অবস্থিতি করেন, যাঁহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়া, শুভ, অশুভ, রোগ, শোক, সম্পদ, বিপদ সমজ্ঞান হইয়া চিত্ত নির্ম্মল ও প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে, তিনিই সর্ব্বত্র সমভাবে ব্রহ্ম দর্শন লাভ করিয়া ব্রহ্ম যোগরূপ পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য। ইহাও বাহিরের ধর্ম্ম, ইহার পর কি বল।

রামানন্দ। জ্ঞান শূন্যা ভক্তিই সাধ্য শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানের পথ কুটিল, তাহাতে সর্ব্বদাই সংশয় আসিয়া আত্মাকে কলুষিত করে, বিশেষতঃ সকলের পক্ষে কিছু জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। পৃথিবীতে কয় জন জ্ঞানী ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়? আর জ্ঞানের সীমাই বা কোথায়? কে কতটুকু জ্ঞান লাভ করিতে পারে? মানবজ্ঞান তো অতি অকিঞ্চিৎকর, অসীম জ্ঞান বস্তুকে কি ক্ষুদ্র মানবজ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারে? এই সকল বিবেচনা করিয়া যিনি জ্ঞানানুসন্ধানে প্রয়াস না করিয়া সাধুমুখবিনিসৃত ভগবৎ কথা শ্রবণ ও তাহা কায়মনোবাক্যে অবলম্বন করিয়া থাকেন, অন্যের দুষ্প্রাপ্য হইলেও ভগবান প্রায় এরূপ লোকের নিকট আত্ম স্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শ্রীচৈতন্য। এ এক রকম কথা বটে। কিন্তু ইহার পর কি, শুনিতে চাই।

রামানন্দ। প্রেমভক্তিই সর্ব্ব সাধ্যসার। প্রেমবিহীন কৃষ্ণ পূজা ভক্তের কখনই সুখকর হয় না। এক মাত্র প্রেমভক্তি রস লাভই তাঁহাদের লোভনীয়। কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্য বলেও ঐ লোভ পাওয়া যায় না।

শ্রীচৈতন্য। এও বটে। তার পর?

রামানন্দ। দাস্য প্রেমই সাধ্য শিরোমণি। যাঁহার নাম শ্রবণ মাত্র জগৎ পবিত্র হয়, সেই ভগবানের নিত্য দাসদিগের চেয়ে, আর সৌভাগ্যবান্ কে?

শ্রীচৈতন্য। এও বেশ, তারপর কি।

রামানন্দ। সখ্য প্রেমই সর্ব্ব সাধ্য সার। জ্ঞানীরা ব্রহ্ম সুখানুভূতিতে ও ভক্তগণ আরাধ্যরূপে যাঁহাকে প্রতীতি করেন, যদি কেহ তাঁহার সহিত সখ্যতা করিয়া তাঁহার অপার পারমেশ্বরী শক্তি ভুলিয়া গিয়া সুখ দুঃখ সম্পদ বিপদের বন্ধুর ন্যায় তাঁহাকে ভাবিতে পারে, তবে সে সাধকের সম শ্রেষ্ঠ আর কে?

শ্রীচৈতন্য। এ উত্তম কথা। ইহার পর আর কিছু আছে?

রামানন্দ। আছে, বাৎসল্য প্রেমই সাধ্য সার। সকল ভুলিয়া গিয়া যাঁহারা ভগবানকে আপনার সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিতে পারেন, তাঁহাদের তুল্য সাধক আর কে? নন্দ যশোদার তুল্য কাহার সৌভাগ্য?

শ্রীচৈতন্য। অতি উত্তম, তার পর?

রামানন্দ। তার পর কান্ত ভাব। ইহাই সকল সাধ্যের শ্রেষ্ঠ সাধ্য। ভগবানে আত্ম সমর্পণের ন্যায় আর কি আছে? সতী স্ত্রী যেমন প্রিয় পতিকে শরীর, আত্মা, প্রাণ, মন সকলই সমর্পণ করেন, তেমনি কান্তভাবে ভক্ত সকলই তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। ক্ষিত্যপ্ তেজো মরুদ্ব্যোম পঞ্চ ভূতের স্থায়িভাব যেমন পর পর ভূতে বৃদ্ধি হইতে হইতে ক্ষিতিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ পাঁচটী তন্মাত্রই থাকিয়া যায়, তেমনি শান্তের অচঞ্চলতা, দাস্যের সেবা, সখ্যের

বিশ্বাস, বাৎসল্যের স্নেহ এবং কান্তের আত্ম সমর্পণ সকলই কান্তভাবে অন্তর্নিবিষ্ট। ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় বহুবিধ। যাহার যে পন্থা, তাহাই তাহার নিকট সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে কান্ত প্রেমই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। অন্য প্রেমে ভগবানকে পাওয়া গেলেও পরিপূর্ণ রূপে এক কান্ত প্রেমেই পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, যত দূর বলিলেন, ইহাই সাধ্যের সীমা বটে, কিন্তু ইহার পর আর কিছু যদি থাকে, তবে বলুন।

রামানন্দ উত্তর করিলেন, ইহার পরের কথা জিজ্ঞাসা করে এমন লোক জগতে আছে বলিয়া জান্‌তাম না। যাহা হউক, ইহার পর আছে বই কি? শ্রীরাধিকার প্রেমই সর্ব্ব সাধ্য শিরোমণি। কেন জানেন না কি? শত কোটী গোপীর সঙ্গে রাসবিলাসে প্রবৃত্ত থাকিয়াও ভগবান্ রাধা প্রেমে এমনই মুগ্ধ যে, রাস ছাড়িয়া তাঁহাকে লইয়া বন মধ্যে লুকাইয়াছিলেন?

শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাতে রাধাপ্রেমের গৌরব হইল কৈ? গোপীদিগের সঙ্কোচে যখন রাধিকাকে লইয়া ভগবানকে লুকাইতে হইল, তখন সে প্রেমে অন্যাপেক্ষা হইল, তাতে তো প্রেমের গৌরব হইল না। যদি জানিতাম, ভগবান শ্রীরাধিকার জন্য সর্ব্ব সমক্ষেই গোপীদিগকে ত্যাগ করিতে পারিবেন, তবে বুঝিতাম, শ্রীরাধায় কৃষ্ণের গাঢ় অনুরাগ। আপনার মুখ দিয়া অমৃতনদী প্রবাহিত হইতেছে, বলুন এ কথার সমাধান কি?

রামানন্দ বলিলেন, তা নয়। রাধা প্রেমই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। রাসমণ্ডলে যত গোপী নাচিতেছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের পাশে এক এক কৃষ্ণমূর্ত্তি নাচিতেছিল। রাধার পাশেও এইরূপ এক মূর্ত্তি দাঁড়াইযাছিল। সাধারণ প্রেমে সর্ব্বত্রই সমভাব দেখিয়া শ্রীরাধিকার অভিমান উপস্থিত হইলে, তিনি রাসমণ্ডল ছাড়িয়া অভিমানিনী হইয়া চলিয়া গেলেন। নিগূঢ় প্রেমেই অভিমান হয়, সাধারণ প্রেমে তাহা হয় না। শ্রীরাধিকার অভিমান এই নিগূঢ় কুটিল প্রেম নিবন্ধনই হইয়াছিল, তাহাতেই সে প্রেমের গভীরতা বুঝা যাইতে পারে। যাহা হউক, অভিমানিনী রাধার অন্বেষণ জন্য ভগবানও রাসমণ্ডল ছাড়িয়া নিবিড় নিকুঞ্জ বনে বেড়াইয়া তাঁহাকে পাইয়া কামনা উপভোগ করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। শত কোটী গোপীতেও যে কাম নির্ব্বাপণ হইল না, একা রাধিকাতেই তাহা হইল। ইহাতেও শ্রীরাধার প্রেমের গভীরতা বুঝুন।

শ্রীচৈতন্য মহা আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "আমি ধন্য হইলাম, যাহা শুনিতে আপনার নিকট আসিয়াছিলাম, তাহা সকলই শুনিলাম। এখন আর কয়টী প্রশ্ন আছে, তাহার উত্তর দানে কৃতার্থ করুন। শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধিকার স্বরূপ কি? রস কোন্ তত্ত্ব? প্রেমই বা কি? এই যে 'কাম' শব্দ বলিলেন, তাহাই বা কি?"

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

আদিশূর ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ।

(১৭৬ পৃষ্ঠার পর।)

"ঠাকুর"ই হউন আর "দাস"ই হউন আদিশূরের সময়ে পঞ্চ কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় আগমন করেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং এক্ষণে এই রূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, অন্যান্য বংশীয় কায়স্থগণ কোন্ স্থান হইতে কখন বাঙ্গালায় আসিয়াছেন? এই প্রশ্নের অনেক প্রকার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, যথা—

১। পঞ্চ কায়স্থের আগমনের পূর্ব্বে এ দেশে যে সকল কায়স্থ ছিলেন, তাঁহারাই সামৌলিক ও মৌলিক, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন।

২। পঞ্চ কায়স্থ বাঙ্গালায় আগমনের পর আরও অনেকগুলি কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছেন।

৩। যে সকল ক্ষত্রিয় পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালায় বাস করিতেছিলেন, তাঁহারা কায়স্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন।

৪। বাঙ্গালার শূদ্রগণ কায়স্থদিগের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইত্যাদি।

এই সকল উত্তরের মধ্যে যে আংশিক সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। কারণ আদিশূরের বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যবংশীয় এক শাখা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্গের কতকগুলি লোক কায়স্থ আখ্যা দ্বারা পরিচিত হইয়াছিলেন। রাজকার্য্য উপলক্ষে সেই শাখার কতকগুলি লোক অবশ্যই বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কারণ লেখক অর্থাৎ মুহুরী না থাকিলে কোন দেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না।

ধ্রুবানন্দ কৃত কায়স্থ কারিকায় লিখিত আছে যে, সেই পঞ্চ কায়স্থের সহিত নাগবংশীয় দেবদত্ত ও মহৌজা, নাথবংশজ চন্দ্রভানু, দাসবংশজ চন্দ্রচূড় বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। তদনন্তর অম্বষ্ঠ কুলজাত সেনবংশীয় জয়ধর গৌড় দেশে আগমন পূর্ব্বক গৌড়ীয় কায়স্থ সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হন। তৎপর করবংশীয় ভূমিঞ্জয়, দাসকুলভূষণ ভূধর, পালবংশীয় জয়পাল, পালিতবংশসম্ভূত চক্রধর, চন্দ্রবংশের দীপক স্বরূপ চন্দ্রধ্বজ, রাহাবংশসম্ভূত মহাপ্রাজ্ঞ বিপুঞ্জয়, ভদ্রকুলজাত সুশীল বীরভদ্র, ধরকুলের কমল স্বরূপ দণ্ডধর, নন্দীবংশের শিরোমণি তজোধর, দেববংশজ মহাবাহু শিখিধ্বজ, কুণ্ডবংশের চন্দ্রস্বরূপ বশিষ্ঠ, সোমবংশসম্ভূত সুধীর ভদ্রবাহু, সিংহকুলের কমল মহাবাহু বীরবাহু, রক্ষিতকুলভূষণ মহাবীর ইন্দুধর, অঙ্কুরবংশের দীপকস্বরূপ সুধী হরিবাহু, বিষ্ণুবংশের দীপক মহাযশা লোমপাদ, আদ্যকুলসম্ভূত মহাজ্ঞানী বিশ্বচেতা এবং নন্দনকুলভূষণ মহীধর,—আদিশূরের শাসনকালে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আদিশূরের সময়েই বসু, ঘোষ, মিত্র, গুহ, দত্ত, নাগ, নাথ, দাস, সেন, কর, দাম, পাল, পালিত, চন্দ্র, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ড, সোম, সিংহ, রক্ষিত, অঙ্কুর, বিষ্ণু, আদ্য, নন্দন প্রভৃতি সপ্তবিংশতি বংশীয় কায়স্থ বাঙ্গলায় উপনীত হইয়াছিলেন। মহারাজ আদিশূর রাজবাটী, সপ্তপুর, রাজাপুর, বটগ্রাম, মল্লপুর, পদ্মদ্বীপ, লৌহিত্য, মল্লকোটী,

লক্ষ্মীপুর, কেশিনী, কুমার, কীর্ত্তিমতি, নন্দীগ্রাম, বাটাজোড, স্বর্ণগ্রাম, দক্ষপুর, মাণ্ডব, মণিকোটী, শম্ভুকোটী, সিংহপুর, মৎস্যপুর, মেঘনাদ, ভল্লকুলী, সিন্ধুবাঢ ও শূবপুবী নামক সপ্তবিংশতিগ্রাম প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্থাপন কবিয়াছিলেন।

বাঙ্গালায় প্রাচীন ক্ষত্রিয়গণ যে কায়স্থ সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, তৎপক্ষে কোন সন্দেহ হইতে পারেনা। কারণ এক্ষণে বাঙ্গালায যে সকল ক্ষত্রিয় বা বাজপুত দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাঁহাবা সকলেই মুসলমান শাসনেব অন্তভাগে বাঙ্গালায় আসিযাছেন। সেন বাজ বংশেব সৌভাগ্য-ভাস্কব অস্তমিত হইলেও বাঙ্গালাব সামন্তরাজগণ সমূলে উৎপাটিত হন নাই। তাঁহাবা অবশ্যই ক্ষত্রিয় ছিলেন। বখ্তিয়াব খিল্‌জীর নবদ্বীপ বিজযেব কিঞ্চিদূনাধিক ৩৮৫ বৎসব অন্তে আকববেব বিখ্যাত সচিব আবুল ফজল আইন আকববী বচনা কবেন। তৎকালে বাঙ্গালায় তিন জাতীয় "জমিদাব" বা সামন্ত বাজা ছিলেন যথা, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও মুসলমান। আবুল ফজল বলেন, "ইহাদিগেব মধ্যে কাযস্থেব সংখ্যাই অধিক।" আবুল ফজলেব আইন আকববী বচনাব প্রায় ১৫০ বৎসব পবে নবাব সুজাউদ্দিন "জমা তুমাবি তক্‌ছিছি" নামক বাঙ্গালাব বাজস্বেব যে হিসাব প্রস্তুত করেন, তদ্‌পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায যে, তৎকালে বাঙ্গালায় ১১ জন প্রধান জমিদাব ছিলেন। তন্মধ্যে ৫ জন ব্রাহ্মণ, ৪ জন কাযস্থ, ১ জন রজপূত (ক্ষত্রিয়), এবং ১ জন মুসলমান। ব্রিটীসগবর্ণমেণ্টর নিলামী আইনের কৃপায় যদিচ এক্ষণ বাণিজ্য ব্যবসায়ীব সন্তান সন্ততীগণ জমিদারী ক্রয় করিতেছেন, তথাপি কায়স্থদিগের এই অধিকারটী সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহাদেব হস্তস্খলিত হয নাই। সুতবাং ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, হিন্দু শাসন কালেব ক্ষত্রিয় কুলজাত বাঙ্গালাব সামন্ত নবপতিব বংশধরগণই মুসলমান শাসনেব আবম্ভে বাঙ্গালাব জমিদার শ্রেণীতে পবিগণিত হইয়াছিলেন। বিশেষত চন্দ্রদ্বীপেব আদি বাজবংশ যে বাঙ্গালার সেন রাজবংশ হইতে উদ্ভুত, এরূপ অনুমান কবিবাব বিশেষ কাবণ প্রাপ্ত হওযা গিযাছে। ভুলুযাব হৃতসর্ব্বস্ব সুব বাজবংশধবদিগেব মধ্যে অদ্যাপি ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহাব দৃষ্ট হইযা থাকে। বাঙ্গালাব "সিংহ" ও "বর্ম্মা" বংশীয কাযস্থগণ যে ক্ষত্রিয় কুল হইতে উদ্ভুত, উপাধিই তাহাব প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিশেষত মিত্র, নাগ, পাল, সেন, দত্ত, বর্দ্ধন বংশীয প্রাচীন হিন্দু বাজন্যবর্গেব সহিত বাঙ্গালাব ঐ সকল উপাধিধাবী কাযস্থগণেব অবশ্যই কোন রূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বহিয়াছে।*

*শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার 'প্রাচীন ভারতের সভ্যতার ইতিহাস নামক উপাদেয় গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩১১ পৃষ্ঠার টীকায় লিখিয়াছেন :—

"Here and elsewhere we have stated that Kayasthas are descended from the ancient Vaisyas A controversy is going on since many years past, and reasons have been advanced to shew that Kayasthas are descended from Kshatriyas We have not entered into the merits of this controversy, and we are unable to give an opinion on the subject Our main contention is that Kayasthas are not Sudras nor the product of a hybrid mixture of castes, that they are the sons of the ancient Aryan population of India, and have formed a separate caste because they embraced a separate profession Whether they are descended from Aryan Kshatryas or from Aryan Vaisyas is a question of minor importance. It is possible that their ranks have been mainly recruited

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যখন ইতর জাতির রুধির সংযুক্ত হইতেছে, তখন কায়স্থদিগের মধ্যে অবস্থাপন্ন দুই এক জন শূদ্র অনুপ্রবিষ্ট হইবেন, ইহা বিচিত্র কি? এবম্প্রকার দোষারোপ করিয়া যাহারা সমগ্র কায়স্থ জাতিকে শূদ্র বংশজ প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিতান্ত সল্পজ্ঞান সম্পন্ন। বশিষ্ঠ, ব্যাস, শুক, নারদ প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত ঋষিগণের জন্মবৃত্তান্ত আমরা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। স্থানে স্থানে অবস্থাপন্ন বৈষ্ণব অধিকারীগণ কিরূপে ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছেন এবং বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণ কিরূপে ভাড়ার মেয়ে বিবাহ করিয়া পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন, এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তৎপর কায়স্থদ্রোহীগণ জিহ্বা আস্ফালন করুন, ইহা আমাদের অনুরোধ।

বল্লাল কৃত শ্রেণীবিভাগ ও মর্য্যাদা স্থাপন।

আদিশূরের তিরোধানান্তে পাল রাজগণের অভ্যুদয়। পালবংশীয় দ্বাদশ জন নরপতি কিঞ্চিদূন সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দী বাঙ্গালা দেশ শাসন করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় মহীপাল দেবের শাসন কালে প্রবল বিক্রম চোলারাজ কুলতুঙ্গার সাহায্যে দক্ষিণাপথ-নিবাসী বিজয় সেন দেব বাঙ্গালা দেশ অধিকার করেন। ইনিই বাঙ্গালায় সেন বংশের স্থাপনকর্ত্তা। বিজয়ের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বল্লাল সেন দেব পৈত্রিক আসন অধিকার করেন। বল্লাল যেরূপ বিদ্বান—সেইরূপ বিদ্যোৎসাহী, যেরূপ গুণবান—সেইরূপ গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার শাসন কালে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বাঙ্গালার শীর্ষস্থানে বিরাজ করিতেছিলেন। এজন্য তিনি কেবল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের শ্রেণীবিভাগ ও তাঁহাদের মধ্যে কুলমর্য্যাদা স্থাপন করেন।* সেই শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে অতি সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এ স্থলে আমরা ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ করিব না। কেবল কায়স্থদিগের বৃত্তান্ত লিখিত হইবে।

মহারাজ বল্লাল দ্বারা কায়স্থগণ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাসনিবন্ধন প্রধানত চারি ভাগে বিভক্ত হইয়াছিলেন। যথা বঙ্গজ, দক্ষিণ রাঢী, উত্তর রাঢী ও বারেন্দ্র।

উদগত দক্ষিণ রাঢ়েচ বঙ্গ বারেন্দ্রকৌ তথা।
ইতি চতুশ্রঃ সংজ্ঞা স্যুস্তত্তদ্দেশ নিবাসনাৎ॥
কৃতং চতুর্ব্বিধং তেষাং শ্রেণি শ্রেণি বিশেষতঃ

---

from the Ksatriya stock, and that poor relations of kings gladly accepted the posts of accountants and record keepers in the royal courts. We are informed that to the present day the period of impurity for Kayasthas in Northern India, on the death of relations is the same as is prescribed for Kshatriyas."

আমরা আনন্দের সহিত রমেশ বাবুর শেষোক্ত মত অনুমোদন করিতেছি। অধিকন্তু কালিঞ্জরাধিপতি চন্দ্রবংশীয় রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মদেবের ১১৯০ সম্বতের ১৫ মাঘের তাম্রশাসনের লিখিত "কুটম্বি কায়স্থ মহাত্মারা দীন সর্ব্বান" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এই মতের উপর একটি উজ্জ্বল আলোক নিক্ষেপ করিতেছে। প্রাচীন হিন্দু রাজন্যবর্গের ক্ষোদিত লিপি সমূহে কুটম্ব ও কায়স্থদিগকে এক শ্রেণীতে গণনা করা হইয়াছে। চেদিপতি মহারাজ যযান দেবের শাসন পত্রও এই মতকে উজ্জ্বল করিয়া দিতেছে।

* আমাদের মতে বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজ বল্লালের সময়ে গঠিত হয় নাই, সুতরাং বৈদ্যদিগের কৌলিন্য প্রথা ও বল্লাল কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বৈদ্যদিগের ঘটক নাই, ইহাই আমাদিগের মত সমর্থনোপযোগী সুদৃঢ় প্রমাণ।

বঙ্গজ কায়স্থ।

সেনরাজগণের যে সকল তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়ে বঙ্গান্তর্গত প্রাচীন (সমতট) বিক্রমপুর* তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান রাজধানী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং কায়স্থদিগের শ্রেণী বিভাগের কথা উল্লেখ করিতে হইলে, প্রথমেই রাজধানী বিভাগের বিষয় উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। তদনুসারে আমরা প্রথমেই বঙ্গজ কায়স্থদিগের বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু যে সকল কুলজীগ্রন্থ আমাদের একমাত্র অবলম্বন, তাহা প্রত্যয়োপযোগী নহে। বঙ্গস্থ কায়স্থ সমাজপতি রাজা দনুজমর্দ্দন দেবকৃত শ্রেণী বিভাগের পর বঙ্গজ ঘটকদিগের গ্রন্থসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে। সুতরাং বল্লাল ও দনুজ কৃত শ্রেণীবিভাগের মধ্যস্থিত প্রভেদ সমূহ আবিষ্কার করত তাহার সমালোচনা করা নিতান্ত দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ এই সকল বিষয় চিন্তা করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হন নাই।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বঙ্গীয় কায়স্থদিগের মধ্যে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত, নাগ, নাথ, দাস, দেব, সেন, পালিত ও সিংহ, এই দ্বাদশ বংশ বিশুদ্ধ ও প্রধান।

"এতে দ্বাদশ নামানঃ প্রসিদ্ধাঃ শুদ্ধ বংশজাঃ।

এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ৮৭ বংশীয় কায়স্থ নিম্ন শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছেন।

ঘটকদিগের গ্রন্থপাঠে অনুমিত হয়, মহারাজ বল্লালসেন দেব বঙ্গজ কায়স্থদিগের মধ্যে ২৭ ঘর কায়স্থের বিশেষ প্রশংসা করিয়া, সেই ২৭ বংশের ২৮ জন কায়স্থকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। *তন্মধ্যে পঞ্চবংশ কুলীন ও দ্বাবিংশ বংশ মহাপাত্র বা সন্মৌলিক।

কুলীন পঞ্চবংশ।

ঘোষ	চতুর্ভুজ।
বসু	লক্ষ্মণ ও পূষণ।
গুহ	দশরথ।
মিত্র	অশ্বপতি।
দত্ত	নারায়ণ। * মৌদ্গল্য গোত্রজ।

মহাপাত্র বা সন্মৌলিক দ্বাবিংশ বংশ।

নাগ	দশরথ।
নাথ	মহানন্দ।
দাস	চন্দ্রশেখর।
সেন	গঙ্গাধর।
পালিত	জন।
সিংহ	রত্নাকর।
দেব	কেশব
কর	দামোদর।
দাস	উষাপতি।
চন্দ্র	নারায়ণ।
পাল	আর।
রাহা	কৃষ্ণ।
ভদ্র	দিগাম্বর।
নন্দী	প্রভাকর।
ধর	ব্যাস।
কুণ্ড	অধিপতি।
সোম	বংশধর।
রক্ষিত	নারায়ণ।
অঙ্কুর	বেদগর্ভ।
বিষ্ণু	দৈত্যারি।
আঢ্য	ত্রিলোচন।
নন্দন	উষাপতি।

* ইহার আধুনিক নাম রামপাল।

* এই নারায়ণ দত্ত, মহারাজ বল্লাল ও তৎ পুত্র লক্ষ্মণসেন দেবের মহাসন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। লক্ষ্মণ সেন দেবের শাসনপত্রে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

বসুবংশেষু মুখ্যৌদ্বৌনাম্না লক্ষণপূষণৌ।
ঘোষেষুচ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভুজ মহাকৃতিঃ॥
গুহে দশবথশ্চৈব মিত্রে অশ্বপতি স্তথা।
দত্তে নাবাযণশ্চৈব এতেচ বঙ্গজাঃ স্মৃতাঃ॥
নাগেদশরথশ্চৈব মহানন্দস্ত নাথকঃ।
চন্দ্রশেখরদাসস্ত সেনে গঙ্গাধবোস্তথা॥
পালিতে জনসংজ্ঞস্যাচ্চন্দ্রে নাবাযণাখ্যকঃ।
পালে আবঃ সমাখ্যাতোবাহাবংশেষু কৃষ্ণকঃ॥
ভদ্রে দিগাম্বরোশ্চৈব ধবেচ ব্যাসসংজ্ঞকঃ।
প্রভাকবস্ত নন্দীস্যাৎ কেশবো দেববংশজঃ॥
অধিপতিবিতিখ্যাতঃ কুণ্ডবংশে প্রকীর্ত্তিতঃ।
সোমেবংশধবশ্চৈব সিংহে রত্নাকবস্তথা॥
নাবায়ণঃ সমাখ্যাতৌ রক্ষিতেচ তথা পরে।
বেদগর্ভাঙ্কুরশ্চৈব দৈত্যাবি বিষ্ণু সংজ্ঞকঃ॥
আদ্যে ত্রিলোচনো খ্যাত নন্দনেচ উবাপতিঃ।
এতে বঙ্গজা নির্দ্দিষ্টা বল্লালেন মহাত্মনা॥

বঙ্গজকায়স্থকাবিকা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ।*

---

* ফরিদপুরে একটি আয্যকায়স্থসমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই কায়স্থ সমিতি হইতে "আয্যকায়স্থ প্রতিভা' নাম্নী এক খণ্ড ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। আমরা এই পত্রিকার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। ফরিদপুরেব কয়েকজন ব্রাহ্মণ এই সমিতির প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছেন। সেই ক্রোধেব বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাবা সম্প্রতি "কাযস্থকুল চন্দ্রিকা' নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার ছাপা ও লেখা, উভয়ই কদর্য্য। তাঁহাবা যে কি সাহসে এই কদর্য্য পুস্তক প্রকাশ কবিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা। এই পুস্তকের প্রকাশক একজন "মোক্তার", সুতরাং কার্য্যটি তাঁহার ব্যবসায়ের অনুরূপই হইয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে নব্যভারতে কায়স্থ-দ্রোহীদিগের যে সকল মত উদ্ধৃত করিয়া তাহার তীব্র সমালোচনা কবিয়াছি, এই পুস্তক খানাতে সেই সকল প্রাচীন কথার চর্ব্বিত চর্ব্বন মাত্র দৃষ্ট হইল। অধিকন্তু কায়স্থদিগের বিরুদ্ধে কযেকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেব একখানা প্রদত্ত ব্যবস্থাপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। যতদিন ভারতবাসী স্মৃতি পুবাণাদি গ্রন্থ পাঠ কবিতে পাইত না, ততদিনই শাস্ত্র-ব্যবসায়ী পণ্ডিতদিগেব ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল। মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় এক্ষণে আমবা সকলেই সেই সকল গ্রন্থ পাঠ কবিতে সক্ষম হইয়াছি। সুতবাং এক্ষণ আর ব্যবস্থার কোন প্রযোজন নাই। এই সকল ব্যবস্থা-দাতা পণ্ডিতের মধ্যে ত্রিপুরাব জলপায়ী পণ্ডিত কেহ আছেন কিনা, তাহা কোন ফবিদপুরবাসী কায়স্থ বন্ধু আমাদিগকে জনাইলে আমরা নিতান্ত অনুগৃহীত হইব, এবং বারান্তরে ব্যবস্থাপত্রেব এবং তদ্দাতা পণ্ডিত মহাশয়দিগের মূল্য নিরূপণ করিতে যত্ন করিব।

ব্রাহ্মণেবা সেই প্রাচীন কাল হইতে কায়স্থদিগের প্রতি অন্যায় অত্যাচার ও বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। ইহাব কারণ কি? কায়স্থগণ কখনই ব্রাহ্মণদিগেব উপরে আপনাদের আসন সংস্থাপন কবিতে যত্ন কবেন নাই। তথাপি এই বিদ্বেষ কেন? কায়স্থ বিদ্বেষ রূপ রোগ কি পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হইবে? কাযস্থগণ ক্ষত্রিয়ই হউন আর শূদ্রই হউন, তাহাতে ব্রাহ্মণ জাতির কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তথাপি ফবিদপুরেব ব্রাহ্মণগণ কেন হিংসার দংশনে অস্থিব এরূপ ছুটা ছুটি করিতেছেন! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থাব মূল্য যুগী জাতিতেই প্রকাশ হইয়াছে। লজ্জাটা কি পদ্মার জলে বিসর্জ্জন করা হইয়াছে নাকি।

সৌরকলঙ্ক।

কবিগণের উপমাস্থল চন্দ্রের কলঙ্ক সকলেই বিদিত আছেন। সূর্য্যের কলঙ্ক তত প্রসিদ্ধ নহে। এতৎসম্বন্ধে এখানে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।

সূর্য্যও সময়ে সময়ে কলঙ্কময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার প্রখর জ্যোতিঃ বশতঃ তাঁহার কালিমা-চিহ্ন সহজে দেখা যায় না। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে গালিলীও সর্ব্ব প্রথমে ইয়োরোপে সৌরকলঙ্ক আবিষ্কার করেন। আমাদের দেশে যে উহা জানা ছিল, বিজ্ঞানানুশীলনরতা 'পৃথিবী'-রচয়ত্রী তাঁহার 'পৃথিবী' নামক গ্রন্থে তাহার কয়েকটি প্রমাণ দিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত সেই গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "দূরবীন সৃষ্টি হইবার পরে ইয়োরোপে অল্পকাল মাত্র সূর্য্যবিম্ব (solar spots) পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মার্কণ্ডেয় পুরাণে রহিয়াছে,

'তেজসঃ শাতনং চক্রে বিশ্বকর্ম্মা শনৈঃশনৈঃ।
তেনাস্মিন্ শ্যামিকা জাতা শাতনেনোচিষ স্তথা॥'

"বিশ্বকর্ম্মা অল্প অল্প করিয়া সূর্য্যের তেজ কর্ত্তন করিয়া লইলেন, যে যে অংশ কর্ত্তিত হইল, সেই অংশটি শ্যামিকা অর্থাৎ কলঙ্ক হইল।"

তাঁহারা যে তখন কলঙ্ক দেখিয়াছিলেন, এই শ্লোকটি তাহার স্পষ্ট প্রমাণ।

জ্যোতির্বিবদ বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতায় সূর্য্যবিম্বের অর্থাৎ সৌরকলঙ্কের কথা স্পষ্টাক্ষরে রহিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে হার্শেল সূর্য্যবিম্বের সহিত দুর্ভিক্ষের যে সম্বন্ধ দেখান, বরাহমিহির বহুদিন পূর্ব্বে তাহাই বলিতেছেন—

"যস্মিন যস্মিন্দেশে দর্শন মায়াস্তি সূর্য্য-
বিম্বস্থাঃ।
তস্মিন তস্মিন ব্যসনং মহীপতীনাং পরি-জ্ঞেয়ং।
* * * * বারিমুচো ন প্রভূত বারিমুচঃ
সরিতো আযান্তি তনুত্বং ক্বচিৎক্বচি জায়তে
শস্যং।"

যে যে দেশে সূর্য্যবিম্ব দেখা যায়, সেই সেই দেশাধীপের বিপদ জানিতে হইবে। * * মেঘ সকল প্রভূত বারি বর্ষণ করে না। নদী সকল ক্ষীণত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং কোন কোন স্থানে মাত্র শস্য জন্মায়।"

উপরি উদ্ধৃত শ্লোক হইতে জানা যায়, বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবাসী সৌরকলঙ্ক প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, ইদানীন্তনের কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতের ন্যায় তাঁহারা পৃথিবীর, সুতরাং আমাদের ইষ্টানিষ্টের সহিত সৌরকলঙ্কের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এ সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে। বাস্তবিক, জ্যোতিষ ও দর্শন শাস্ত্র ভারতের কিরীট স্বরূপ। তাহার কহিনূরের অতিবিস্তৃত সুদূর-প্রসারিত রশ্মিমালায় এখনও লোকের চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে সৌরকলঙ্কের অস্তিত্ব জানা থাকিলেও, তাহা যে সবিশেষ সর্ব্ব সাধারণে

অবগত ছিল, এমত বোধ হয় না। অতি প্রাচীন কালে প্রখর জ্যোতিষ্মান সূর্য্য দেখিয়া সহজেই লোকের মনে ভয় ও বিস্ময় রসে পরিপূর্ণ হইত। মনুষ্যজীবনের শৈশব কালে সূর্য্যের পদে মানবের মস্তক স্বতঃই অবনত হইত এবং স্বতঃই কণ্ঠ হইতে তাঁহার প্রীতিসূচক গীতে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইত। তামসী রজনীর অবসানে পূর্ব্বাকাশ প্রভাসিত এবং সারা দিন জ্যোতির্ম্ময় কিরণ জাল বিস্তার করিয়া অবশেষে পশ্চিমভাগে অল্প অল্পে নীরবে দীনভাবে সূর্য্যকে অস্তমিত হইতে দেখিলে কোন্ স্বভাব-কবির কবিতা-উৎস উচ্ছ্বসিত না হয়?

আর্য্য ঋষিগণ কেবল সৌরকাব্যেই মুগ্ধ হন নাই। সূর্য্যের একটু মাত্র আলোক ও তাপ পাইয়া পৃথিবী শস্য-শ্যামলা বহুজীব-সঙ্কুলা হইয়াছে। তাঁহারই কৃপায় জীবগণের গতিশক্তি রহিয়াছে এবং তাঁহারই কণিকা প্রসাদে বাষ্পীয় যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঝড, বৃষ্টি, মেঘ ইত্যাদি প্রায় যাবতীয় নৈসর্গিক ব্যাপারের মূলে তিনি বিদ্যমান। যে স্রোতস্বতীর পুণ্য সলিলে ভূমি সিক্ত ও উর্ব্বরা হইতেছে, যাহা ভূপৃষ্ঠ চূর্ণীকৃত ও পুনর্গঠিত করিয়া পৃথিবীকে বহুবিধ উদ্ভিদ্ ও প্রাণিগণের আবাসভূমি করিয়া তুলিযাছে, তাহাও সূর্য্যের কৃপায় প্রাণ ধারণ করিতেছে। পুরাতন ঋষিগণ যে সূর্য্যকে বিশ্বস্রষ্টার ন্যায় "নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে। জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে" এবং "নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে, জগৎপ্রসূতিস্থিতি নাশহেতবে" ইত্যাদি বাক্যে অর্চ্চনা করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি?

পৃথিবী হইতে সূর্য্য প্রায় নয় কোটি বিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। এত অধিক অন্তর সহজে ধারণা করা যায় না। বাষ্পীয় শকট প্রতি ঘণ্টায় ৩০ মাইল বেগে ভ্রমণ করিলে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে এক মাস সময় লাগিবে। কিন্তু সেই শকট সেই বেগে সূর্য্যাভিমুখে গমন করিলে তথায় উপস্থিত হইতে তাহার প্রায় ৩৫০ বৎসর কাল আবশ্যক হইবে। এমন কি, যে আলোক প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল বেগে ধাবমান হয়, তাহাকেই সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে আসিতে পাঁচ শত সেকেণ্ডের বেশী সময় লাগে। অতএব প্রতীতি হইবে যে, সূর্য্যের উপাদান পরম্পরা এখানে বসিয়া সাধারণ রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রণালী দ্বারা অনুসন্ধান করা অসম্ভব। কিন্তু বুনসেন ও কীরকফ, সেচী ও তাচিনীর অধ্যবসায় ও পরিশ্রমকে ধন্য। কয়েক বৎসর হইল তাঁহারা এক নূতন অতি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রণালী আবিষ্কার করিযাছেন। সূর্য্যের অন্তর যত বেশীই হউক না কেন, এই নূতন প্রণালী সূর্য্যের উপাদান নিরূপণার্থ যথেষ্ঠ সামগ্রী রাসায়নিক পণ্ডিতগণের করতলস্থ করিযাছে। এই বিশ্লেষণ প্রণালী বর্ণনা করা, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ইহা বলিলেই যথেষ্ঠ হইবে যে, সৌরকর-জাল রশ্মি-দর্শন-যন্ত্র (spectroscope) দ্বারা পরীক্ষা করিয়া সূর্য্যের অনেকাংশের উপাদান নিরূপিত হইয়াছে। বাস্তবিক জানা গিয়াছে যে, সূর্য্যের চারিদিকে বাষ্পমণ্ডল রহিয়াছে এবং পৃথিবীতে বিদ্যমান জলজনক গ্যাস, লৌহ, নিকেল, তাম্র, সীসক, দস্তা, চুণ ও অন্যান্য ক্ষারজনক পদার্থ প্রভৃতি তাহাতে বর্ত্তমান আছে।

সূর্য্যালোক বিশ্লেষণ দ্বারা যেমন উহার উপাদান অবগত হওয়া যায়, দূরবীক্ষণ ও

ফটোগ্রাফি দ্বারা উহার প্রাকৃতিক অবস্থা নিরূপিত হয়। দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার পর, তাহা সূর্য্যাভিমুখে স্থাপিত হয়। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ গালিলীও প্রথমে দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহযোগে সূর্য্য নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার পৃষ্ঠদেশ নিরবচ্ছিন্ন সমান ভাবে জ্যোতির্ম্ময় না দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়েন। তিনি দেখেন, যে সূর্য্যের পৃষ্ঠদেশে বহুসংখ্যক কলঙ্কচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎসমুদায় চিহ্নের আকার নানাবিধ ও ক্ষেত্রপরিমাণও বিভিন্ন। প্রতিদিবস পর্য্যবেক্ষণে তৎসমুদায়কে সূর্য্যদেহে ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করিতে দেখেন। সে গুলি সূর্য্যবিম্বের (solar disc) পূর্ব্বাংশে উদিত হইয়া পশ্চিমে অস্তমিত হইত। অবশেষে জানা গেল যে, সেই সকল কালিমাচিহ্ন যাহাই হউক, তাহারা সৌরদেহে সংলগ্ন রহিয়াছে এবং তাহাদিগের আপাতঃদৃশ্যমান অবস্থিতি ভেদ সূর্য্যের আপন অক্ষদণ্ডে আবর্ত্তন বশতঃ সংঘটিত হইতেছে।

কিন্তু বিচিত্র কথা এই যে, তৎসমুদায় কলঙ্ক সৌরদেহে চিরস্থায়ী থাকে না। তাহারা কখন বা সৌরদেহে আবির্ভূত ও কখনও বা অন্তর্হিত হইতেছে। কখন কখন অতি ক্ষুদ্র কণিকার ন্যায় উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ বৃহদায়তন ধারণ করে এবং অবশেষে বিলীন হইয়া যায়। কখনও বা কোন কোনটা সৌরদেহে অনেক দিন অবস্থিত করিয়া পশ্চিম দিকে অদৃশ্য হয় এবং আবার ঘুরিয়া আসিয়া সূর্য্যবিম্বের পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিগোচর হয়।

কোন একটা চিহ্নকে সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহা সর্ব্বত্রে সমগাঢ় নহে। উহার মধ্যভাগ অপেক্ষা চারিপার্শ্ব অপেক্ষাকৃত অল্পতর গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। আবার মধ্যভাগের মধ্যস্থিত এক স্থান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। ইহাকে কলঙ্কের কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। অল্পতর গাঢ় কৃষ্ণবর্ণকে পূর্ণচ্ছায়া এবং তদপেক্ষা অল্প গাঢ় বহির্ভাগকে অপূর্ণচ্ছায়া বলা যায়।

এই সমুদায় কলঙ্কের প্রকৃতি বিশদ করিবার নিমিত্ত একটি কলঙ্ক সবিশেষ বর্ণিত হইতেছে। এটি গত বৎসর জুনমাসে দৃষ্টিগোচর হয়। সেই সময় দেখা যায় যে, প্রধান কলঙ্কের নিকটে আরও কতকগুলি বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। উহাদিগের দীর্ঘ দীর্ঘ নানাবিধ আকৃতির অপূর্ণচ্ছায়াময় পুচ্ছ ছিল। দেখিলে বোধ হইত যেন এক দল ধূমকেতু পুচ্ছ বিস্তার করিয়া আছে। প্রধান কালিমা চিহ্নটি কয়েক দিবস পরে সৌরবিম্বের পশ্চিম প্রান্তে লুক্কায়িত হইল। যখন পূর্ব্বভাগে পুনর্ব্বার দেখা গেল, তখন উহা নিতান্ত ক্ষুদ্র কলেবর ধারণ করিয়াছে এবং উহার অনুবর্ত্তী কলঙ্কগুলিও বিলুপ্ত হইয়াছে। ৬ই সেপ্টেম্বর দিবসে সূর্য্য যখন অস্তগমনোন্মুখ হইয়াছে, সেই সময় উহাতে সূর্য্যের পশ্চিম প্রান্তভাগে দেখা যায়। পর দিবস প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় দেখা গেল যে, উহার পূর্ব্বাংশে আর দুইটি প্রকাণ্ড কলঙ্ক রাত্রির মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে।

উক্ত প্রধান কলঙ্কের অপূর্ণচ্ছায়া প্রায় দশ সহস্র মাইল দীর্ঘ ছিল। কিরূপে উহার দৈর্ঘ্য পরিমিত হইল, তাহা বর্ণনা করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে উপায় অনুসরণ পূর্ব্বক সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক সকলের ব্যাস নিরূপিত হইয়াছে, সেই উপায় দ্বারাই কল-

ঙ্কের বিস্তার অবগত হওয়া যায়। উহার কেবল অপূর্ণচ্ছায়াটি দশ সহস্র মাইল দীর্ঘ ছিল; অর্থাৎ উহা সৌরদেহের দশ কোটি বর্গ মাইল স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। কিন্তু ইহাকে সামান্য বলিতে হইবে, কেন না এতদপেক্ষা বৃহত্তর কলঙ্ক দেখা গিয়াছে। একবার একটিকে ৪৫০০০ পঁয়তাল্লিশ সহস্র মাইল দীর্ঘ দেখা গিয়াছিল, তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়, অর্থাৎ তাহা দুই শত কোটি বর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়াছিল।

সূর্য্যদেহে কলঙ্কের সংস্থান ভেদও বিচিত্র। ইয়োরোপীয় জ্যোতির্বিদগণ উহা সূক্ষ্মরূপে অবধারণ করিয়াছেন। তাহাতে জানা যায় যে, সূর্য্যবিম্বের সকল স্থানেই কলঙ্ক দেখা যায় না। সৌরগোলকের নিরক্ষবৃত্তের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে ও নিম্নে মাত্র কলঙ্ক দেখা যায়। উহার মেরুদ্বারে কিম্বা তৎসন্নিকটে কিছু মাত্র কলঙ্ক কখন দৃষ্টিগোচর হয় না। সূর্য্যবিম্বের নিরক্ষবৃত্ত লইয়া উত্তর দক্ষিণে ৩০°।৪০° অক্ষাংশ পরিমিত মণ্ডলের মধ্যে কলঙ্ক আবির্ভূত হয়।

দূরবীক্ষণ দ্বারা সূর্য্যবিম্বস্থ কলঙ্কগুলি কোথায় এবং কিরূপ দেখায়, তাহা বলা গেল। কঠিন বিষয় বলিতে বাকী আছে। উক্ত কলঙ্কগুলির উৎপত্তি কিসে, এ সম্বন্ধে বহুবিধ মত প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক কপোল-কল্পিত মত আড়ম্বর পূর্ব্বক বিজ্ঞান-সমাজে ঘোষিত হইয়াছে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, যদ্দারা সৌরকলঙ্কের প্রকৃতি ও উৎপত্তি বুঝিতে পারা যাইবে, তদ্দারা সূর্য্যের প্রাকৃতিক অবস্থাও জানা যাইবে। গ্লাসগো-বাসী ডাক্তার উইলসন সাহেব বিগত শতাব্দীর শেষভাগে প্রথমে এসম্বন্ধে এক মত ব্যক্ত করেন। বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ সার উইলিয়াম হার্শেল সাহেব তাঁহার মত স্বীকার করিয়া বলেন যে, সূর্য্যবিম্বের চতুর্দ্দিকস্থ বাষ্পরাশির আলোড়ন বশতঃ মধ্যে মধ্যে তথায় ফাঁক উৎপন্ন হয়। সেই সকল ছিদ্র দিয়া সৌরদেহের কৃষ্ণবর্ণ কঠিনাংশ দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ কৃষ্ণবর্ণ অংশই তাঁহার মতে সৌরকলঙ্ক। উক্ত পণ্ডিতের স্বনাম-খ্যাত-পুত্র সার জন হার্শেল সাহেব উক্ত ব্যাখ্যা অবলম্বন করেন, আর বলেন যে, সৌরবাষ্প-মণ্ডলে ঝটিকা উৎপন্ন হইলে উহার স্থানে স্থানে ছিন্নবিছিন্ন হওয়া সম্ভব। যাহা হউক, এই ব্যাখ্যা তত সন্তোষপ্রদ নহে। কেন না এতদ্দারা সূর্য্যের প্রভূত তেজোরাশির উৎপত্তি বুঝা যায় না। সূর্য্য হইতে নিরন্তর তাপ ও আলোক বিকীর্ণ হইতেছে, সেই তাপ ও আলোকের অবশ্য সমুচিত কারণ আছে।

বিশ্ব জগতের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে নানাবিধ মত আছে। তন্মধ্যে লাপলাস প্রকাশিত নেবুলা নামক সূক্ষ্ম বাষ্পীয় পদার্থ হইতে জগতের উৎপত্তির কথা বৈজ্ঞানিক মণ্ডলীতে বিশেষ সমাদৃত। তিনি বলেন যে, বহুকাল পূর্ব্বে সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহাদি তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থায় ছিল না। তাহাদিগের পরিবর্ত্তে আকাশে কেবল জ্বলন্ত বাষ্পরাশি ছিল। উক্ত উত্তপ্ত বাষ্পরাশি ক্রমশঃ শীতল হইয়া জমিতে থাকে। সেই বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়াই সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহাদি রূপ ধারণ করিয়াছে। সার উইলিয়াম টমসন সাহেব উক্ত মত অনুসরণ পূর্ব্বক বলেন যে, বাষ্পময় সৌরদেহ ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকাতেই এত তেজোরাশি বিকীর্ণ হইতেছে। বাষ্পীয় অবস্থায় যে শক্তি প্রচ্ছন্নভাবে ছিল, বাষ্পসঙ্কোচন কালে

তাহাই তেজোরূপে প্রকাশিত হইতেছে। হেলম্‌হোল্‌জ, ব্যানকিণ, টেট প্রভৃতি বিখ্যাত অধ্যাপকগণও এই মত সমর্থন করেন। হেলম্‌হোল্‌জ সাহেব বলেন যে, সূর্য্যের বাষ্পময় দেহের সঙ্কোচন কালে উহার বাষ্প-মণ্ডলে বিশাল আবর্ত্ত উৎপন্ন না হওয়াই অসম্ভব। কেন না বিকীরণ বশতঃ সৌর বাষ্পমণ্ডলের পৃষ্ঠদেশ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শীতল ও ঘন হইতেছে। উক্ত ঘন অংশ নিম্নস্থ অপেক্ষাকৃত কম ঘন ও অধিকতর উত্তপ্ত বাষ্পরাশির উপর অবস্থিত হইতেছে। আমাদের পৃথিবীতেও সেই কারণ বশতঃ বাতাবর্ত্ত প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলের যাবতীয় গতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সূর্য্যোত্তাপে উত্তপ্ত ভূভাগের সংস্পর্শে আসিয়া বায়ু নিম্নে উত্তপ্ত হয় এবং উপরে প্রচুর বিকীরণ বশতঃ সর্ব্বদা শীতল থাকে। সূর্য্যের আকৃতি ও তাহার উত্তাপ স্মরণ করিলে সৌরবাষ্পমণ্ডলে অতীব প্রকাণ্ড আলোড়নের সংঘটন বুঝিতে বাকী থাকে না। সূর্য্যের ধাতব বাষ্পমণ্ডলে আবর্ত্ত জন্মিলে, আবর্ত্ত-কেন্দ্রের চাপ নিশ্চয়ই কম পড়িবে। তাহাতে তথায় শৈত্য উৎপন্ন হইয়া বাষ্পীয় ধাতব সামগ্রী অপেক্ষাকৃত ঘন ভাবাপন্ন হইবে। সুতরাং তথায় সৌরদেহাভিমুখে অতি বিস্তৃত অপেক্ষাকৃত অল্পোষ্ণ বাষ্পরাশি মেঘবৎ প্রতীয়মান হইবে। অতএব সমুদায় কলঙ্কগুলি সৌর বাষ্পমণ্ডলস্থিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গহ্বর বিশেষ। অপেক্ষাকৃত অল্পোষ্ণ হওয়াতে এক একটি কলঙ্ক নিম্নস্থ অধিকতর উজ্জ্বল প্রভাময় সৌরদেহে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। বলা আবশ্যক যে, কৃষ্ণবর্ণ দেখাইলেও উহা একেবারে নিষ্প্রভ নহে। প্রখর তাড়িতালোকের সম্মুখে প্রজ্বলিত বাতি ধরিলে বাতি যেমন নিষ্প্রভ দেখায়, তদ্রূপ কলঙ্কসকলও সৌরদেহের প্রচণ্ড আলোক বশতঃ নিষ্প্রভ দেখায়। সৌরকলঙ্ক যে সৌর-বাষ্পের আবর্ত্ত-সম্ভূত, দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা কলঙ্কের আকার পরিবর্ত্তন পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহা প্রমাণিত হয়। পুনশ্চ রশ্মি দর্শন-যন্ত্র ও সৌরবাষ্পমণ্ডলের ভয়ঙ্কর আলোড়নের সত্যতার অন্য প্রকার সাক্ষ্য প্রদান করে।

উপরে সৌরকলঙ্কের প্রকৃতি ও উৎপত্তি সামান্যতঃ বর্ণিত হইল। কলঙ্কের উৎপত্তির বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, সূর্য্যের মধ্যভাগ অপেক্ষা অল্পোষ্ণ বাষ্পরাশি তাহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া আছে। সেই বাষ্পরাশির কথাই পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সূর্য্যের মধ্যভাগ হইতেই আলোক ও তাপ বিকীর্ণ হইতেছে। আমাদের মৃন্ময় পৃথিবীর চরিদিকে যেমন বায়ুরাশি ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সূর্য্যদেহের চারিদিকেও ধাতব বাষ্প তদ্রূপ পরিবেষ্টন করিয়া আছে। এরূপ বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ আছে। প্রথমতঃ, সূর্য্যবিম্বের চিত্র ফটোগ্রাফী যন্ত্র দ্বারা নানা মানমন্দিরে অঙ্কিত হইতেছে। তৎসমুদায় তুলনা করিলে সৌর বাষ্পমণ্ডলের অস্তিত্ব জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ রশ্মিদর্শন-যন্ত্র সাহায্যে সৌরকর জাল নিরীক্ষণ করিলে সৌরদর্শনে (Solar spectrum) অসংখ্য রেখা সকল দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সমস্ত কৃষ্ণ রেখা অনুসন্ধান পূর্ব্বক কীরকফ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এক সুন্দর সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তদ্দ্বারা বাষ্পমণ্ডলের অস্তিত্ব সপ্রমাণিত হইতেছে। তৃতীয়তঃ সূর্য্যগ্রহণ কালে দেখা যায় যে, সূর্য্যবিম্বের বহির্দ্দিকে লোহিত আলোক অগ্নিশিখাবৎ প্রতীয়মান হয়। তাহা অনুসন্ধান করিলে বুঝা যায়

যে, সূর্য্যবিম্বের মধ্যভাগে যাহাই থাকুক, উহার পৃষ্ঠদেশ অতীব প্রখর জ্যোতির্বিশিষ্ট। এই জ্যোতিবিশিষ্ট বহির্ভাগের নাম দ্যুতি মণ্ডল রাখা হইয়াছে। ইহার বাহিরে আরও দুইটি আবরণ রহিয়াছে। অনাবশ্যক বিবেচনায় সেগুলি বর্ণিত হইল না। এস্থলে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দ্যুতিমণ্ডলের বাষ্পময় গহ্বর গুলিই কলঙ্ক স্বরূপ দেখা যায়। সেই গহ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গভীরতা বশতঃ কলঙ্কের পূর্ণচ্ছায়া ও অপূর্ণচ্ছায়ার উৎপত্তি।

সৌরকলঙ্ক দ্বারা আমাদের কোন ইষ্টানিষ্ট আশঙ্কা আছে কি না, তদ্বিষয়ে দুই একটী কথা বলা যাইতেছে। ইতি পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে বরাহমিহিরের শ্লোক, পৃথিবী নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। হোফরাথ সোয়াবে সাহেব প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত সৌরকলঙ্ক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রতি বৎসর সৌরকলঙ্ক সমান পরিমাণে উৎপন্ন হয় না। প্রায় প্রত্যেক একাদশ বৎসর ব্যবধানে কলঙ্কের সংখ্যা অধিক দেখা যায়, অর্থাৎ প্রায় প্রত্যেক একাদশ বৎসরে সূর্য্য নিষ্কলঙ্ক ও কলঙ্কময় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই শতাব্দীর ১৮০০, ১৮১১, ১৮২২, ১৮৩৩, ১৮৪৪, ১৮৫৬, ১৮৬৭, ১৮৭৮, ১৮৮৮ বৎসরে সৌরকলঙ্ক অত্যল্প সংখ্যক ছিল। এবং ১৮০৫, ১৮১৬, ১৮২৭, ১৮৩৮, ১৮৪৮, ১৮৫৯, ১৮৭১, ১৮৮২ বৎসরে বহু সংখ্যক বৃহৎ আকারের কলঙ্ক দেখা গিয়াছে *। এই নিয়মানুসারে এ বৎসরের প্রারম্ভে এবং গত বৎসরের সৌরকলঙ্কের নিম্নতম সংখ্যার কালের অবসান হইবার আশা করা গিয়াছিল। বাস্তবিক বিগত বৎসরে সৌরকলঙ্কের প্রাদুর্ভাব আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা ছিল। যাহা হউক, ইহাতে উক্ত চক্রাকার কাল পরিবর্ত্তনের ব্যতিক্রম ধরা যাইবে কি না, সন্দেহ আছে। এই বৎসরের বিগত মার্চ্চমাসে সূর্য্যের উচ্চ অক্ষাংশে দুইটী কলঙ্ক সূর্য্যবিম্বে পরিভ্রমণ করিতে দেখা গিয়াছে। তাহাতে বোধ হয় যে, এবারের অপেক্ষাকৃত অধিককাল ব্যাপী সৌরকলঙ্কের অভাব শীঘ্র দূর হইবে। বস্তুতঃ সূর্য্যবিম্বে এক্ষণে কলঙ্কের পূর্ব্ববর্ত্তী সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষ্ণচিহ্ন দেখা গিয়াছে। ইতি মধ্যে সেপ্টেম্বর মাসেও সামান্য সামান্য কলঙ্ক দেখা গিয়াছিল। যাহা হউক, দুই তিন মাসের মধ্যে বোধ হয় সৌর বাষ্পমণ্ডলের ক্রিয়া-সূচক কলঙ্ক দেখা যাইবে।

সৌরকলঙ্কের ঊর্দ্ধতম ও নিম্নতম কালচক্রের পরিবর্ত্তনের সহিত পৃথিবীর ঝড় বৃষ্টি শস্য ও বাণিজ্যের সম্বন্ধ দেখাইবার অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতীয় বায়ুবিদ্যা বিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ব্লানফোর্ড সাহেব তৎকৃত বায়ুবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, মেলড্রাম সাহেব ভারত সমুদ্রের দক্ষিণাংশে এবং পোএ সাহেব ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ প্রদেশের বাতাবর্ত্ত সকলের উৎপত্তিকাল আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যে যে বৎসর সৌরকলঙ্কের প্রাচুর্য্য ছিল, সেই সেই বৎসরে বাতাবর্ত্ত অধিক সংখ্যক পরিমাণে উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়াছে। বঙ্গোপসাগরে উৎপন্ন বাতা-

* এখানে বলা আবশ্যক যে, সৌরকলঙ্কের ঊর্দ্ধতম ও নিম্নতম সংখ্যার কালের চক্রাকার (cycle) পরিবর্ত্তন ঠিক একাদশ বৎসরে সম্পন্ন হয় না। ইহার কাল পরিমাণ ১১.১১ বৎসর। উপরের তালিকায় ঊর্দ্ধতম ও নিম্নতম সংখ্যার কালের নিকটবর্ত্তী বৎসর দেওয়া হইয়াছে।

বর্ত্তের সহিত আমাদের নিকট সম্বন্ধ। দুঃখের বিষয় এখানকার বাতাবর্ত্ত গুলির বিবরণ বহুদিন হইতে তাদৃশ যত্ন সহকারে লিপিবদ্ধ হয় নাই। অনেক বৎসরের বাতাবর্ত্তের সংখ্যা না পাইয়া উহাদিগের আবির্ভাব কালের কোন নিযম বাহির করিতে পারা যায় না। ১৮৭২ হইতে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গোপসাগরে কিম্বা ভারতের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের অপরাংশে যে সকল বাতাবর্ত্ত উৎপন্ন হইয়াছে, সে সকলের বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রায় এক শতটি বাতাবর্ত্ত উৎপন্ন হইয়াছে। দেখা যায় যে, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী (১৫টি) বাতাবর্ত্ত জন্মে। এবং ১৮৭৩ ও ১৮৭৫ অব্দে একটিরও উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাহা হউক, ঐ ঐ বৎসরের সঙ্গে সৌরকলঙ্কের প্রাচুর্য্য বা অপ্রাচুর্য্যের কোন বিশেষ সম্বন্ধ দেখা যায় না।

সৌরকলঙ্কের প্রাচুর্য্যের সহিত বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য্যের সম্বন্ধ এক্ষণে দেখা যাউক। ব্লানফোর্ড সাহেব ভারতের বৃষ্টি ও সৌরকলঙ্কের সম্বন্ধ অনুসন্ধান করিতে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছেন। মেলড্রাম, লকিয়ার, সার উইলিয়াম হার্শেল এবং উল্‌ফ সাহেব ভূপৃষ্ঠের বৃষ্টিপতনের পরিমাণ আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সৌরকলঙ্কের সংখ্যার সহিত বৃষ্টি পরিমাণের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, যে যে বৎসর অধিক সংখ্যক কলঙ্ক দেখা গিয়াছে, সেই সেই বৎসরে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়াছে এবং কলঙ্কের নিম্নতম সংখ্যার বৎসরে বৃষ্টিপাতও কম হইতে দেখা গিয়াছে। অধিকন্তু, সার উইলিয়াম হার্শেল ও অধ্যাপক উল্‌ফ সাহেব অনেক বৎসরের পুরাতন বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দেখিয়াছেন যে, কেবল তাহাই নহে, সৌরকলঙ্কের প্রাচুর্য্যের বৎসরে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইয়াছে ও শস্যের মূল্য-হ্রাস ঘটিয়াছে। সিংহল দ্বীপে এই নিয়মটি নাকি এত দূর লক্ষিত হইয়াছে যে, তথাকার সাধারণ লোক সমাজ পর্য্যন্ত তাহা অবগত আছে। দক্ষিণ-ভারতের দুর্ভিক্ষ ও সৌরকলঙ্কের অপ্রাচুর্য্য এক সময়েই ঘটিয়াছে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ডাক্তার হাণ্টার সাহেব বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছেন। ব্লান্‌ফোর্ড সাহেব ভারতের মধ্যে সিংহল, কর্ণাট প্রদেশ ও সামান্যতঃ মান্দ্রাজ প্রদেশ সম্বন্ধে বৃষ্টিপাত ও সৌরকলঙ্কের সমকালিক আতিশয্য এক প্রকার স্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, বিগত ২২ বৎসরের মধ্যে ভারতের নানা স্থানের বৃষ্টিপাত তুলনা করিলে সমুদায় ভারত সম্বন্ধে এরূপ কোন নিয়ম দেখা যায় না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হিল সাহেব তথাকার শীতকালের বৃষ্টিপাতে এইরূপ একটা সম্বন্ধ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

সৌরকলঙ্কের সহিত ভূতলস্থ ঝটিকা ও বৃষ্টিপাতের সম্বন্ধ কেন থাকিবে? ইহার উত্তরে এই দেখা যায় যে, সূর্য্যবিম্ব হইতে তাপ ও আলোক প্রতি বৎসর সমান পরিমাণে বিকীর্ণ হয় না। এরূপ ঘটিবার কারণ এই যে, সূর্য্যবিম্ব কখনও বা অধিক কখনও বা অল্প সংখ্যক এবং বিভিন্ন পরিমাণ আকারের কলঙ্কে আবৃত থাকে। বস্তুতঃ, জলীয় বাষ্প নিঃসরণের উপর বৃষ্টি পরিমাণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সূর্য্যবিম্ব যখন সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক থাকে, তখন উহা হইতে তেজঃ কম পরিমাণে

বিকীর্ণ হইতে দেখা যায়। এজন্য সে সময় বাষ্প নিঃসরণ ক্রিয়া ও বৃষ্টিপাত কম দেখা যায়। ইহা যে কতদূর সত্য, তাহা এক্ষণে বলা যায় না। বহু বৎসরাবধি পর্য্যবেক্ষণ না করিলে এ সকল বিষয়ে কোন সম্বন্ধ বাহির করা বৃথা। গত বৎসর সৌরকলঙ্ক দেখা যায় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না, অথচ গত বৎসরে কি বাণিজ্য কিম্বা শস্য কম হয় নাই? ব্লানফোর্ড সাহেব বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সৌরকলঙ্কের ঊর্দ্ধতম সংখ্যার কালের দুই এক বৎসর পরে বৃষ্টিপাত বেশী হইতে দেখা যায়। যাহা হউক, এ তত্ত্বের শেষ মীমাংসা এখনও হয় নাই। অনেক বৎসর ধরিয়া সূর্য্যবিম্বের ফটোগ্রাফ তুলনা করিলে বোধ হয় তাহার সকলঙ্ক কিম্বা নিষ্কলঙ্ক অবস্থা সম্যক্ পরিজ্ঞাত হওয়া যাইবে। এজন্য অনেকগুলি বড় বড় মানমন্দিরে সূর্য্যের প্রতিরূপ অঙ্কিত করিবার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ফটোগ্রাফ যন্ত্রাদি সজ্জিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে যে দিবস সূর্য্য আকাশমার্গে দৃশ্যমান হয়, সেই দিবসেই, তাহার প্রতিরূপ চিরস্থায়ীরূপে অঙ্কিত করা হইতেছে।

প্রবন্ধটি দীর্ঘ হইয়া পড়িল। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর দুইটি কথার উল্লেখ না করিলে ইহা অসম্পূর্ণ থাকে। সৌরকর-জালের সহিত পার্থিব ব্যাপারের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ এতদ্দ্বারা বুঝা যাইবে। সৌরকলঙ্কের আবির্ভাব ও তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব কোন কোন ব্যাপারের আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখা যায়। মেরুজ্যোতিঃ (aurora) নামক যে নৈসর্গিক ব্যাপার আছে, তাহা প্রতি বৎসর সমান সংখ্যায় দেখা যায় না। কোন বৎসর বা উহার সংখ্যা বেশী, কোন বৎসর বা কম দেখা যায়। বড় আশ্চর্য্য কথা যে, সৌরকলঙ্কের ঊর্দ্ধতম ও নিম্নতম সংখ্যার বৎসর ও মেরুজ্যোতির ঊর্দ্ধতম ও নিম্নতম সংখ্যার বৎসর প্রায় এক। ইহার চক্রও দশ হইতে একাদশ বৎসরের মধ্যে পূর্ণ হয়।

আর একটি ব্যাপার এই যে, সৌরকলঙ্কের প্রাচুর্য্য ও অপ্রাচুর্য্যের সহিত চুম্বক শলাকার অবস্থিতির দিক্ পরিবর্ত্তিত হইতে দেখা যায়। একটা চুম্বকশলাকা শূন্যে ঝুলাইয়া দিলে, উহাকে প্রায় উত্তর দক্ষিণাভিমুখে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। ভূভাগের কোন অংশে উহা বরাবর একই দিকে স্থির থাকে না। ইহার অবস্থানের একটি দৈনন্দিন পরিবর্ত্তন দেখা যায়। প্রাতঃকালে উহার উত্তরমুখ কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে এবং মধ্যাহ্নে কিঞ্চিৎ পশ্চিমে হেলিতে দেখা যায়। ভূপৃষ্ঠের সকল স্থানে এই দৈনন্দিন পরিবর্ত্তন সমান পরিমাণে ঘটে না, কিম্বা প্রতি বৎসরও সমান পরিমাণে হয় না। দশ বৎসরের কিঞ্চিদধিক কালে ইহার পরিবর্ত্তনচক্র সম্পূর্ণ হইতে দেখা যায়। বাস্তবিক সৌরকলঙ্কের কালচক্রের সহিত মেরুজ্যোতিঃ ও চুম্বকশলাকার কালচক্রের ঐক্য লক্ষিত হয়।

অনেকে আবার মনে করেন যে, বৃহস্পতি, শনি ও শুক্র গ্রহের আপন আপন কক্ষের বিশেষ বিশেষ অংশের অবস্থিতির সহিত, সৌরকলঙ্কের সম্বন্ধ আছে। কিরূপে এই সকল গ্রহ সূর্য্যের পৃষ্টদেশের পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে, তাহা সম্যক্ জানা নাই। ডাক্তার লুমিস সাহেব মনে করেন যে, সূর্য্যের চারিদিকে প্রবল তাড়িত প্রবাহ সঞ্চালিত হইতেছে। তাঁহার মতে সৌরতেজের তাহা অন্যতর কারণ। যাহা হউক, ঐ সকল গ্রহ

সূর্য্যের চারিদিকে পরিভ্রমণ করিবার সময় বিশেষ বিশেষ অংশে তাহারা সূর্য্যের উপর কার্য্য করিতে পারে। তাহাতে ঐ সকল গ্রহের ভ্রমণ কালের সহিত সৌরকলঙ্কের কাল চক্রের ঐক্য ঘটিয়া থাকে। যদিও কোন কোন স্থলে এরূপ ঐক্য ঘটিতে দেখা গিয়াছে, তথাপি তাহাদিগের মধ্যে যে কোন কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আছে, এমন বোধ হয় না। বোধ হয় তৎসমুদায় কাকতালীয় রূপে ঘটিয়া থাকে। সূর্য্যের জ্যোতিঃমণ্ডলের উপর বৃহস্পতি গ্রহের ক্রিয়ার দ্বারা সৌরকলঙ্কের উৎপত্তির কথাও কেহ কেহ বলেন। প্রকৃটর সাহেব এই মত সমর্থন করিতেন। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সৌরকলঙ্কের উদ্ধতম সংখ্যার কাল ছিল, তখন বৃহস্পতি গ্রহ দূরকক্ষে অবস্থিত ছিল। বিশ বৎসর অগ্রে বৃহস্পতি গ্রহ নিকটকক্ষে ছিল, তখনও একবার সৌরকলঙ্কের উদ্ধতম সংখ্যার কাল ছিল।

সারজন হার্শেল সাহেব একটি সৌরকলঙ্কের যে পরিমাণ করিয়া ছিলেন, তাহার সারাংশ দিয়া এ প্রবন্ধটি শেষ করা যাইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, "১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আমি একটা কলঙ্কের বিস্তার পরিমাণ করি। তাহা তিন শত আটাত্তর কোটি বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া ছিল। একটার মধ্যস্থিত যে গাঢ়কৃষ্ণবর্ণ পূর্ণচ্ছায়া দেখা গিয়াছিল, উহা এত প্রকাণ্ড যে, তাহার ভিতর দিয়া আমাদের পৃথিবী অনায়াসে প্রবেশ করিয়া তাহার কোন অংশ স্পর্শ না করিয়া নির্গমন করিতে পারিত। কেবল তাহাই নহে, পৃথিবীর চারিদিকেও প্রায় সহস্র মাইল ব্যবধান থাকিতে পারিত। এতদপেক্ষা বৃহত্তর কলঙ্কের বিবরণ পাওয়া যায়। কি ভয়ঙ্কর অগ্নিময় ঝটিকা সূর্য্যদেহে বহমান হইতেছে, ইহা হইতে তাহার কথঞ্চিত আভাষ পাওয়া যায়। কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, যে তদ্দ্বারা স্থানে স্থানে আবর্ত্ত জন্মিয়া সূর্য্যপৃষ্ঠের আকার এতাদৃশ পরিবর্ত্তিত হয়।" কি প্রকাণ্ড ভাবেই সৃষ্টি স্থিতি কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। সূর্য্য একটা সামান্য অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্র মাত্র। এত ক্ষুদ্র যে সিরিয়াস নামক একটা নক্ষত্রই দুই তিন শত সূর্য্যকে গ্রাস করিতে পারে। সেই সকল নক্ষত্রে না জানি কি ভীষণ পরাক্রমে, কি বিশাল আকারে প্রাকৃতিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। ব্রহ্মাণ্ড আবার অনন্ত অসীম, তাহার রহস্যও অনন্ত অসীম।

শ্রীযোগেশ চন্দ্র রায়।

হিন্দু নাটকের প্রাচীনত্ব।

চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ইউরোপের সভ্যজাতিগণের মধ্যে নাটকীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই, এইরূপ নির্দ্দেশ করিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। ইহারও সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতে পূর্ণ মাত্রায় নাটকের প্রচার ছিল।

মনুষ্যসমাজে নাটকের সৃষ্টি অত্যন্ত স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। মানবজাতির

মধ্যে অনুকরণ প্রবৃত্তি অতিশয় বলবতী। বালকবালিকাদিগের মধ্যে এই অনুকরণ করিবার শক্তি সম্যক্‌রূপে পরিলক্ষিত হয়। বালকেরা প্রায়ই পরিণতবয়স্কদিগের আচার ব্যবহারাদি অনুকরণ করিয়া থাকে। তাহারা কখন রাজা, কখন বিচারক, কখন পিতা, কখন অধ্যাপক প্রভৃতির বেশ ধারণ করিয়া সবিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত তাঁহাদের অনুষ্ঠানাবলীর অনুকরণ করিয়া থাকে। বালিকাদিগের প্রায় প্রত্যেক ক্রীড়ার সহিত সংসারের গুরুতর ব্যাপার সমূহের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দেশীয় ষষ্ঠবর্ষীয়া বালিকা পুত্রীকৃত মৃৎপুত্তলের বিবাহ সম্পাদন কার্য্যে কতই বিব্রত, তাহার নিমন্ত্রণের ঘটাই বা দেখে কে। মানবজাতির এই অন্তর্নিহিত অনুকরণী প্রবৃত্তি, অনন্ত ঘটনাপূর্ণ মানবজীবন এবং অনন্ত লীলাময়ী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ব্যাপ্তি এবং উৎকর্ষলাভ করিয়াছে, এবং ইহাই কালক্রমে নানারূপান্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক চক্ষু ও কর্ণের যুগপৎ প্রীতিপ্রদ, অত্যুৎকৃষ্ট আমোদ-প্রদান-সমর্থ নাটকাভিনয় ক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে, এই অনুমান করা কোন ক্রমেই যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কেবল আর্য্যজাতির মধ্যেই নাটকের বহুল প্রচার দেখা যায়। তন্মধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও গ্রীসে স্বাধীনভাবে নাটকের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। প্রাচীন রোম হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক ইংলণ্ড, জর্ম্মনি প্রভৃতি সমগ্র ইয়োরোপ গ্রীসের নিকট নাটকাভিনয় শিক্ষা করিয়াছে। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি জাতিকে নাটকাভিনয় প্রথা শিক্ষা দিয়াছে। প্রাচীন পারসীকদিগের মধ্যে নাটকের প্রচার ছিল বলিয়া বোধ হয় না। সেমিটিক জাতির মধ্যেও নাটক নাই। আরব এবং হিব্রুজাতিরা এক সময়ে সভ্যতার অত্যুন্নত সোপানে অধিরোহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার নাটকাভিনয়ের উল্লেখ নাই। হিরোডোটস প্রাচীন মিশরবাসিদিগের সভ্যতার অনেক প্রশংসা করিয়াছেন, এবং তাহাদের আচার, নীতি এবং সামাজিক অবস্থাদির অনেক সূক্ষ্ম বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের মধ্যে, কোন প্রকার নাটকের অভিনয় হইত, এরূপ কোন আভাষ দেন নাই। পক্ষান্তরে চীনজাতির প্রাচীন সভ্যতার পরিচায়ক অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির সহিত তাহাদের উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় প্রথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এমন কি, কোন কোন অনুকরণপ্রিয় অসভ্যজাতিদিগের মধ্যেও, এক প্রকার সামান্য রকম অসভ্যোচিত যাত্রাভিনয়ের ন্যায় নাটকাভিনয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কি নিমিত্ত মনুষ্যের স্বাভাবিক অনুকরণী প্রবৃত্তি ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া কেবল কয়েকটী জাতির মধ্যে নাটকের আকার ধারণ করিয়াছে, এবং কি নিমিত্তই বা অবশিষ্ট দেশগুলিতে নাটকের উৎপত্তি হয়নাই, তাহা নিরূপণ করা অতি কঠিন ব্যাপার। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যে জাতির মধ্যে প্রাচীন কালে নাটকাভিনয় প্রথা বর্ত্তমান ছিল, তাহারা সভ্যজাতিবৃন্দের শীর্ষ স্থানীয়, এবং জাতি সাধারণের অবশ্য পূজনীয়।

যতদূর অনুমান দ্বারা স্থির করিতে পারা যায়, তাহাতে বোধ হয়, নৃত্য গীত হইতেই নাটকের প্রথমোৎপত্তি হইয়াছে। সংস্কৃতে 'নাটক' শব্দটী, 'নৃত্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'নৃত্য' এবং 'নাট্য', 'নর্ত্তক' এবং 'নট' উভয় একই পদার্থ বলিয়া বোধ হয়।

প্রথমতঃ নৃত্যের সহিত আনুষঙ্গিক অঙ্গসঞ্চালনাদি এবং সঙ্গীতের সমাবেশ; পরে হস্তাদি সঞ্চালন এবং বহুবিধ মুখভঙ্গির সহিত স্বাভাবিক ভাষায় কোন পৌরাণিক ইতিবৃত্তের বর্ণনা, তৎপরে যাত্রাদির ন্যায় কথোপকথন এবং সঙ্গীতের সংমিশ্রণ এবং সর্ব্ব শেষে প্রকৃত নাটকের সৃষ্টি, এইরূপ ক্রমবিস্তারেই নাটকের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এইরূপে নাটকের কয়েকটী বিভিন্ন স্তর স্পষ্টই পরিলক্ষিত হয়। আমাদের বঙ্গীয় নাটকের উৎপত্তি একটু পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই, সাধারণতঃ নাটকের উৎপত্তি বুঝিতে পারা যাইবে। বাঙ্গালা নাটকের প্রথম অবস্থা, রামায়ণ কিম্বা মহাভারত অথবা অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, ইহাকে সাধারণতঃ "কথা" বলে। "কথক" ঠাকুর রামায়ণাদির অংশ বিশেষ সুর করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে শ্রবণ করাইয়া থাকেন। তিনি রামের কথা, রাবণের কথা, অথবা হনুমান প্রভৃতির কথা, শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জনার্থ বিভিন্ন ভাষায় বিবিধ সুরে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি সহকারে ব্যক্ত করেন। এই স্থানেই আমরা নাটকাভিনয়ের অঙ্কুর দেখিতে পাই। দ্বিতীয় স্তর, আমাদের দেশের যাত্রাভিনয়। ইহাতে নাটকের প্রধান প্রধান উপকরণ কথোপকথন, সঙ্গীত প্রভৃতি প্রায় সমুদায়ই পরিলক্ষিত হয়, কেবল অভিনয় ক্রিয়া, কবিত্ব প্রভৃতি কিয়ৎ পরিমাণে অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে, সম্যক্ পরিস্ফুট হইতে পারে না। ইহারই অব্যবহিত পরে, পূর্ণ নাটকের সৃষ্টি, উৎকৃষ্ট সঙ্গীত, উৎকৃষ্ট চিত্র এবং উৎকৃষ্ট কবিত্বের একত্র সমাবেশ, বহিরিন্দ্রিয় এবং অন্তরিন্দ্রিয়ের যুগপৎ পরম পরিতৃপ্তি।

জাতীয় সভ্যতার সহিত নাটকের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক দেখা যায়। জাতীয় সমৃদ্ধির উন্নত অবস্থাতেই নাটকের সৃষ্টি এবং পুষ্টি হইয়া থাকে। প্রায়ই দেখা যায়, প্রত্যেক সুসভ্যজাতির মধ্যে এমন এক সময় আসে, যে সময়ে নাটকের স্বাভাবিক সৃষ্টি হইয়া থাকে। নানা প্রকার ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া এবং উন্নতির চেষ্টার সময়ে নাটক এবং নাটকাভিনয় প্রথার সৃষ্টি হয়। দুই একটী সভ্যজাতির ইতিহাস পাঠ করিলে এই কথাটী স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। ইংলণ্ডের পরম সৌভাগ্যবতী রাণী এলিজাবেথের রাজত্ব কালে ইংরেজ জাতির নাটকের সৃষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই সময় ইংরেজ জাতি উন্নতির চরমসীমা লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে তাহাদিগের শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তিগুলির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল এবং তাহারা উদ্যমশীলতা এবং কর্ম্মদক্ষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। রাজ্যের চতুর্দ্দিকে সমৃদ্ধি সুখ এবং শান্তি বিরাজ করিতেছিল। ইংরাজেরা তখন ধর্ম্মবলে বলীয়ান্, নূতন প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছিল। স্প্যানিস্ আর্ম্মাডার (Spanish Armada) পরাজয়ে ইংরাজের বাহুবল অতুলনীয় বলিয়া প্রমাণিত হইল। কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি আভ্যন্তরীণ সমৃদ্ধির প্রতিদিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। লোকের কর্ম্মদক্ষতা, কর্ম্ম করিবার বাসনার সহিত চতুর্গুণ উদ্দীপিত হইল। কেহ আমেরিকায় নূতন দেশ আবিষ্কার করিতে চলিল, কেহ ভারতবর্ষে আসিবার নূতন পথ অন্বেষণ করিতে চলিল, কেহ বা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করিতে গিয়া সহস্র প্রাণীপূর্ণ অর্ণবযান সহিত অতল জলে ডুবিয়া গেল। এইরূপ নানা প্রকার "ঘাত প্রতি-

ঘাতের" মধ্যে ইংরাজের জাতীয় নাটকের সৃষ্টি হইল। জাতীয় প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি ক্রমে নাটকীয় হইয়া পড়িল। প্রথমে অসম্পূর্ণ নাটক 'Mysteries", 'Moralities", "Interludes", প্রভৃতি নানাবিধ নামে অভিহিত হইয়া সাধারণের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। পরে নাটক গুরু সেক্সপীয়ার এবং তাঁহার সমসাময়িক নাটককারগণ কর্ত্তৃক নাটকের পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তি হইল। প্রাচীন গ্রীসদেশেও নাটক সৃষ্টির ইতিহাস এইরূপ। খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসবাসীগণ পারস্যাধিপতি জেরাক্সিসের ৫০ লক্ষ সেনাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। তাহাদের বাহুবল তখন অসীম। এই সময়ের কিঞ্চিৎ পরে পেরিক্লিস্ এথেন্সের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁহার শাসনগুণে এথেন্সবাসিদিগের সুখের সীমা ছিল না। এই সময়ে তাহারা শিল্পবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, ভাস্করবিদ্যা প্রভৃতি নানা প্রকার সুকুমার শিল্পে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। তখন তাহাদের অদ্ভুত উদ্যমশালিতা ছিল। এইরূপ সময়েই এথেন্সে নাটকের সৃষ্টি হয়। প্রথমে ধর্ম্মমন্দিরে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া সঙ্গীত যাত্রাদি হইত। পরে এস্কিলিস্, সফোক্লিস্, ইউরিপাইডিস্, এরিষ্টফেনীস্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধনামা নাটকরচয়িতৃগণ জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহারা অত্যুৎকৃষ্ট দৃশ্যকাব্যাবলী রচনা করিয়া রাজকোষের ব্যয়ে অসংখ্য শ্রোতৃমণ্ডল সমক্ষে অভিনয় প্রদর্শন করাইতেন, এবং আপামর সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থনিচয় অদ্যাপি তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

এইরূপে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, নাটক সভ্যতার একটি অঙ্গ। যে দেশ প্রাচীন কালে নাটকীয় সাহিত্যে উন্নতি লাভ করিয়াছিল, সে দেশ যে সেই সময়ে সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সংশয় নাই। ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে শত শত প্রমাণ আছে; প্রাচীন ভারতে নাটকীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ, অন্যতম একটি প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে।

বর্ত্তমান কালে প্রাচীন সংস্কৃত নাটকাবলীর অনুশীলনে আমাদের অনেক উপকার দর্শিতে পারে। ইহাদের অনেকগুলি, সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন, প্রকৃত কবিত্বের খনি। কালিদাস ও ভবভূতির নাটকগুলি কিরূপ অলৌকিক কবিত্বরসে পরিপূর্ণ, কিরূপ অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক, তাহা সংস্কৃত সাহিত্যজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই অবগত আছেন। সংস্কৃত নাটকাবলী প্রকৃত কাব্যরসজ্ঞের চিত্তবিনোদন এবং উপদেশ প্রদানে সম্পূর্ণ সমর্থ। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন নাটকের আলোচনায় আমাদের আর একটি গুরুতর লাভ আছে। আমাদের প্রাচীন কালের কোন প্রকৃত ইতিহাস নাই। প্রাচীন হিন্দু সমাজের অবস্থা প্রকৃতরূপে অবগত হওয়া বড়ই দুরূহ ব্যাপার। আমাদের প্রাচীন নাটকগুলি অনেক পরিমাণে আমাদের প্রাচীন ইতিহাসের স্থান পূরণ করে। ইতিহাস শুদ্ধ ঘটনাবলীর শৃঙ্খল নহে; অথবা রাজবৃন্দের জীবনীও নহে। এলিজাবেথ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন, তাঁহার পিতার নাম ৮ম হেন্‌রী, তাঁহার পিতামহের নাম ৭ম হেন্‌রী, দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ খ্রীঃ পূঃ ২০২ অব্দে হইয়াছিল, এইরূপ কয়েকটি বিবরণ অবগত হইলেই ইতিহাস জানা হইল

না। জাতি, জাতীয়তার সংগঠন, জাতির উন্নতি, জাতির সমৃদ্ধির বিবরণ এবং জাতীয়ত্বের ক্রমবিকাশ প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় লইয়াই প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হওয়া উচিত। হিন্দুজাতির এই সকল বিবরণ জানিতে হইলে তাহাদের প্রাচীন কালের নাটকীয় সাহিত্য অনুসন্ধান করা উচিত। প্রাচীন হিন্দুজাতির আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, রাজনৈতিক অবস্থা, সমাজের অবস্থা, প্রভৃতি সমস্তই এই নাটকাবলীতে বর্ণিত আছে। নাটকে কল্পিত চরিত্রের সমাবেশ হইলেও, এমন কোন নাটক হইতে পারে না, যাহাতে দেশের সমসাময়িক ঘটনাবলী অথবা সামাজিক অবস্থার ছায়া প্রতিফলিত হয় না।

এক্ষণে আমরা হিন্দু নাটকের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি প্রমাণ প্রয়োগ করিব।

আমাদের দেশের কতকগুলি প্রথা এত প্রাচীন যে, তাহাদের প্রথম উৎপত্তি ঠিক্ কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা সম্পূর্ণ সুকঠিন। অনেক সময়ে এই প্রথাগুলি দৈবসম্ভব বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। এবং কখন কখন এতৎ সম্বন্ধীয় অনেক পৌরাণিক উপন্যাসও পাওয়া যায়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। মনে করুন, আমাদের দেশে জাতিভেদ প্রথা কত প্রাচীন, তাহা নির্দ্দেশ করিতে হইবে। এই প্রথা ঠিক কোন্ সময়ে কত বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করা সম্পূর্ণ সুকঠিন। এতৎ সম্বন্ধে প্রচলিত উপন্যাসটি বড়ই চমৎকার বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্মা যে সময়ে প্রথম মনুষ্য সৃষ্টি করেন, সেই সময়ে তিনিই জাতিভেদ প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইলেন, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় হইলেন; উরু হইতে বৈশ্য হইলেন, এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিলেন (১)। এই উপন্যাসে জাতিভেদ প্রথা একেবারে সৃষ্টির সমসাময়িক হইল, এবং ইহার প্রাচীনত্বের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল। এই উপন্যাসের সত্যাসত্য প্রমাণ করিবার আবশ্যক নাই, কিন্তু ইহাতে অন্ততঃ একটি সত্য পাওয়া যাইতেছে। জাতিভেদ প্রথা যে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা এই উপন্যাস দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে উপলব্ধি হয়। এইরূপ, অধিকাংশ অতি প্রাচীন প্রথা সম্বন্ধে, প্রাচীনতার পরিচায়ক অনেক উপন্যাস পাওয়া যায়।

নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধেও এইরূপ উপন্যাস প্রচলিত আছে। প্রথম নাটক দেবতাদিগের মনোরঞ্জনার্থ স্বর্গে অভিনীত হয়। এই নাটকের প্রথম প্রবর্ত্তক ভরতনামা মুনি। স্বয়ং বাগ্দেবী সরস্বতী নাটক রচয়িত্রী ছিলেন। আর অভিনয় করিতেন, অপ্সরাগণ এবং গন্ধর্ব্বগণ। কালিদাসের বিক্রমোর্ব্বশী নামক নাটকে এইরূপ একটি গল্প আছে। বিক্রমোর্ব্বশীর তৃতীয়াঙ্কের প্রারম্ভে ভরতমুনির শিষ্যদ্বয়ের একটি কথোপকথন আছে। তাহাতে এক শিষ্য অপরকে স্বর্গে গুরু-প্রবর্ত্তিত নাটকাভিনয়ের বৃত্তান্ত কহিতেছেন। প্রথমোক্ত বলিতে লাগিলেন, তাহাদের গুরুদেব শ্রীমতী সরস্বতী দেবী প্রণীত "লক্ষ্মীস্বয়ম্বর" নামক নাটক অভিনয় করাইতেছিলেন। অভিনয় হইতেছিল, দেবগণের সমক্ষে, আর

(১) বভূবুর্ব্ব্রহ্মণো বক্ত্রাদন্যা ব্রাহ্মণ জাতয়ঃ।
ব্রহ্মণো বাহুদেশাচ্চ জাতাং ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ
উরুদেশাচ্চ বৈশ্যাশ্চ পাদতঃ শূদ্র জাতয়ঃ।

অভিনয় করিতেছিলেন, প্রথিতনাম্নী উর্ব্বশী, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণ। উর্ব্বশী লক্ষ্মী-চরিত্র এবং মেনকা বারুণীচরিত্র অভিনয় করিতেছিলেন। বারুণী (মেনকা) লক্ষ্মীকে (উর্ব্বশীকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, সমবেত সকেশব লোকপালগণের মধ্যে কে তোমার মনোমত বলিয়া বোধ হয়। উর্ব্বশীর বলিতে হইবে "পুরুষোত্তমে"। উর্ব্বশী ইতিপূর্ব্বে প্রাণদাতা পুরুরবার ভুবনমোহনরূপে উন্মাদিনী, পুরুরবার নাম তাহার জপমালা। উর্ব্বশী নাটকাভিনয় ভুলিয়া গেল, নিজের মনের কথা বলিয়া ফেলিল, নামের আদ্যক্ষরদ্বয়ের সাদৃশ্য দেখিয়া বলিল "পুরুরবসি"। স্বপ্রবর্ত্তিতশাস্ত্রের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া উপাধ্যায় উর্ব্বশীকে অভিশাপ দিলেন, "তোর দিব্য জ্ঞান নষ্ট হইবে।" উর্ব্বশীর শাপে বর হইল। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে আশ্বাস দিয়া মর্ত্ত্যলোকে পুরুরবার মহিষী করিয়া পাঠাইলেন। বোধ হয়, নাটক শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই কালিদাস বিক্রমোর্ব্বশীতে এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন, এবং এই উপন্যাসটি নাটকের প্রাচীনতারও সম্পূর্ণ পরিচায়ক।

হিন্দু নাটকের প্রাচীনতা প্রমাণ করিবার আরো একটি প্রকৃষ্ট উপায় আছে। কোন একখানি নাটক মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে সেই নাটক হইতেই তাহার প্রাচীনতার পরিচায়ক অনেকগুলি আভ্যন্তরীণ প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা মৃচ্ছকটিক নামক (১) প্রাচীন নাটক হইতে কয়েকটি প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছি। সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধারের মুখে নাটককারদিগের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় থাকে, অন্তত তাহাতে সমাসবদ্ধ বিশেষণসংযুক্ত গ্রন্থকারের নামটি জানা যায়। মৃচ্ছকটিকে নাটকরচয়িতার কিছু বিস্তৃত বিবরণ আছে। তিনি গজেন্দ্রগতি, চকোরনেত্র, চন্দ্রানন, রূপবান, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ এবং অপরিমিত বলশালী ছিলেন। তাঁহার নাম শূদ্রক ছিল। তিনি ঋক্ এবং সামবেদ, গণিতশাস্ত্রে এবং নৃত্যগীতাদি ললিতকলা এবং হস্তিশিক্ষা প্রভৃতিশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। তিনি স্বীয়পুত্রকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া, অশ্বমেধযজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক দশদিনাধিক শতবর্ষ বয়সে অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধ-ব্যসনী, অপ্রমত্ত, বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ, তপোধন এবং বাহুযুদ্ধ-নিপুণ ছিলেন। এবং তিনি স্বয়ং রাজা ছিলেন। কিন্তু এতখানি বর্ণনার মধ্যে, তিনি কোন্ দেশের রাজা ছিলেন, তাহার নামগন্ধটি পর্য্যন্ত নাই। রাজাশূদ্রক কোন্ দেশের রাজাছিলেন, কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, প্রভৃতি তত্ত্ব কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারিলেই তদীয় গ্রন্থের সময় নিরূপণ করা যাইত। কিন্তু এতৎসম্বন্ধে কিছুই জানিবার উপায় নাই। কেবল এই পর্য্যন্ত জানা যায় যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে শূদ্রকনামে একজন প্রবল পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে অন্ধ্রবংশীয় মগধরাজগণের প্রথম রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং কেহ২ তাঁহাকে বিক্রমাদিত্যের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক অবন্তী রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এবং এই

(১) প্রচলিত সংস্কৃত নাটকাবলীর মধ্যে মৃচ্ছকটিক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়।

রূপে তিনি খ্রীষ্টজন্মের দুই অথবা তিন শতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া নির্ণীত হইয়াছিল। কিন্তু এই শূদ্রকরাজা এবং মৃচ্ছকটিকের নাটককার প্রকৃত পক্ষে একই ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায়না। এই সকল আনুমানিক কথা ছাড়িয়া দিয়া আমরা প্রস্তাবনোক্ত বিবরণে একটি অপেক্ষাকৃত সারবত্তর কথা পাই না। তিনি "অগ্নি প্রবেশ দ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন" এই কথাটি গ্রন্থের অতিশয় প্রাচীনত্বের একটি প্রমাণ। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে এইরূপে "অগ্নি প্রবেশ দ্বারা আত্মহত্যা করা মহাপাপ।" কিন্তু অতি প্রাচীন কালে মনুসংহিতাদি সংগৃহীত হইবার সময়ে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়। রামায়ণে শরভঙ্গ নামক ঋষির এইরূপ অগ্নি প্রবেশের কথা আছে। সম্ভবতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের আদিম অবস্থায় এবং কলিযুগ-প্রোক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রাদি সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীতে, এই নাটক লিখিত হইয়াছিল। এইজন্য গ্রন্থকারের অগ্নি প্রবেশ দ্বারা মৃত্যু সমাজে দূষনীয় বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই, এবং এই জন্যই প্রস্তাবনা-লেখক (১) অসঙ্কুচিতচিত্তে গ্রন্থ মধ্যে এই কথার সন্নিবেশ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত প্রমাণদ্বয় এই মতের সম্পূর্ণ পরিপোষক।

প্রায় প্রত্যেক নাটকে শকার অথবা রাজশ্যাল বলিয়া একটি চরিত্রের সমাবেশ থাকে। শকার অনেকটা ইংরাজি clown এর (ভাঁড়ের) সদৃশ। শকার সাধারণতঃ রাজরক্ষিত বলিয়া দুষ্কর্ম্মান্বিত, মূর্খ, ভীরু, এবং দুর্ব্বলের উৎপীড়ক। তাহার কথা হাস্যোপম, পুনরুক্ত, এবং লোক ন্যায-বিরুদ্ধ। মৃচ্ছকটিকের শকার সংস্থানকও এইরূপ দুশ্চরিত্র ও দুষ্ক্রিয়ারত। স্বীয়রূপ সঙ্গিসমভিব্যাহারে বসন্তসেনার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া, বসন্তসেনাকে সম্বোধন করিয়া শকার মহাশয় রামায়ণ এবং মহাভারতের শ্রাদ্ধ করিয়াছেন, এবং নিজের অদ্ভুত এবং অগাধ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। কতকগুলি শ্লোকে, রাবণবশীভূতা কুন্তী, হনুমানের সুভদ্রাহরণ, রামভয়ে দ্রৌপদীর পলায়ন, চাণক্য কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ প্রভৃতি অদ্ভুত ইতিহাসজ্ঞতার পরিচয় আছে। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, সংস্থানক শুদ্ধ রামায়ণ, এবং মহাভারত হইতে কেন উদাহরণ তুলিল, এবং পুরাণাদি হইতে কেন একটিও উদাহরণ গ্রহণ করিল না। গ্রন্থকার অবশ্য মহামহোপাধ্যায় এবং অশেষশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি রামায়ণ, মহাভারত, এমন কি চাণক্যের কথা পর্য্যন্ত তুলিলেন, কিন্তু কেন যে তিনি পুরাণোক্ত ব্যক্তিগণের নাম একেবারেই করেন নাই, তাহার সন্তোষজনক কোন কারণ দেখা যায় না। এই জন্য ইহাই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় যে, পুরাণাদির পূর্ব্বেই এই নাটক লিখিত হইয়াছিল; এবং তখন পর্য্যন্ত পুরাণসমূহের একেবারেই

(১) সাধারণতঃ অনেকের বিশ্বাস নাটককার স্বয়ংই প্রস্তাবনায়, সূত্রধারের মুখে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। এইরূপ ধারণা সত্য হইলে মৃচ্ছকটিকের প্রস্তাবনা বড়ই কৌতুকাবহ বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকার স্বয়ং কি করিয়া লিখিলেন, তিনি ১০০ বৎসর ১০ দিন বাঁচিয়া মরিয়াছিলেন। একজন টীকাকার বলেন, তিনি জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, স্বকীয় বিদ্যা প্রভাবে তিনি ভবিষ্যৎকে অতীত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই টীকাকারের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সকলেই সহজে অনুমানকরিতে পারেন যে, প্রায় প্রত্যেক নাটকেরই প্রস্তাবনা দ্বিতীয় ব্যক্তির লিখিত।

সংগ্রহ হয় নাই, অথবা হইয়া থাকিলেও তাহাদের বহুল প্রচার হয় নাই। চাণক্যের নামোল্লেখ থাকাতে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের পর নাটক প্রণীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে, অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে, এই নাটক প্রণীত হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই নাটকের প্রাচীনত্বের আর একটি দৃঢ় প্রমাণ আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ভারতের অনেক উপকার করিয়াছে, তাহা বোধ হয় বিদ্বজ্জন মাত্রই স্বীকার করিবেন। বৌদ্ধধর্ম্মের তেজঃপ্রভাবে তাৎকালিক হিন্দু-ধর্ম্মের কুসংস্কার সকল ভস্মীভূত হইয়াছিল এবং হিন্দুধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়াছিল। ইহারই অভ্যুদয়ালোকে অন্ধ তমসাচ্ছন্ন প্রাচীন ভারতেতিহাস স্থানে স্থানে উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই ধর্ম্ম দিগন্ত-ব্যাপিত হইয়াছিল বলিয়া, সময় সময় বৈদেশিক পরিব্রাজকগণ ভারতে আগমন করিয়া স্ব স্ব সময়ের প্রকৃত ইতিহাস লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস পাঠ করিলে ভারতবর্ষের অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য এবং নাটকাবলীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত গ্রন্থ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অনেক অভিনব ঐতি-হাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করা যাইতে পারে। ললিতবিস্তর প্রভৃতি বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিয়া, অন্যান্য গ্রন্থোক্ত বিবরণা-বলী পাঠ করিলে, অনেক ঐতিহাসিক ঘট-নার সময় নির্দ্দেশ করা যায় এবং জাতীয় রীতি নীতি এবং সমাজের প্রকৃত অবস্থা জানিতে পারা যায়। মৃচ্ছকটিকের স্থানে স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের উল্লেখ এবং বৌদ্ধ সন্ন্যা-সিদিগের বৃত্তান্ত আছে। যেরূপভাবে এই বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, বৌদ্ধধর্ম্মের তখন হীন অবস্থা ছিল না। এবং প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত ইহার কোন বিরোধ ছিল না। বৌদ্ধেরা তখন একটি সবিশেষ পরিচিত এবং ক্ষমতা-শালী সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল। এক্ষণে, বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায়, খ্রীষ্ট জন্মের দুই শত অথবা ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের এই রূপ অবস্থা ছিল। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠে; এবং খ্রীষ্ট দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে এই ধর্ম্ম ভারতে ক্রমে ক্রমে ক্ষীণপ্রভ হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং আমরা অনেক পরিমাণে নিঃসঙ্কুচিতচিত্তে বলিতে পারি যে, অন্ততঃ খ্রীষ্ট জন্মের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে মৃচ্ছকটিক লিখিত হইয়াছে।

এইরূপ নানাবিধ আভ্যন্তরীণ প্রমাণ প্রয়োগে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে যে, মৃচ্ছকটিক অন্ততঃ খ্রীষ্ট জন্মের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। মৃচ্ছকটিক এক খানি পূর্ণাঙ্গ নাটক। অতি প্রাচীন হইলেও ইহাতে আধুনিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের সমস্ত লক্ষণই বর্ত্তমান আছে। অতি কৌশলে ইহাতে দুইটি বিভিন্ন উপন্যাস সংমিশ্রিত হইয়াছে। অতি কৌশলের সহিত নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয় ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইংরাজিতে যাহাকে Plot-interest (1) বলে, তাহাও প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত

(1) উপসংহারৌৎসুক্য।

সমভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ উচ্চ শ্রেণীর নাটক লিখিত হইবার অনেক পূর্ব্বেই যে নাটকের সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্মেরও অনেক পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষে নাটকের প্রচার ছিল, নিম্নে তদ্বিষয়ে একটি অখণ্ডনীয় প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

ভগবান্ পাণিনির ব্যাকরণে নাটকের প্রাচীনতার পরিচায়ক একটি সূত্র আছে, সে সূত্রটি এই, "পারাশর্য্যশিলালিভ্যাং ভিক্ষু নট সূত্রয়োঃ"। এইটি "ণিনুক্" প্রত্যয়ের বিধায়ক একটি সূত্র। পারাশর্য্য প্রণীত ভিক্ষুসূত্র যাঁহারা অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে "পারাশরিণঃ ভিক্ষবং" এবং শিলালিমুনি প্রণীত নটসূত্র যাঁহারা অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদিগকে "শৈলালিনোনটাঃ" বলা হয়। এই সূত্র দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পাণিনির পূর্ব্বে শিলালি নামক এক জন মুনি ছিলেন, এবং তিনি নাটক শাস্ত্রের সূত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন। পাণিনির পূর্ব্বে নাটক প্রথা শুদ্ধ প্রবর্ত্তিত ছিল, তাহা নয়, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নাটক অধ্যয়নীয় শাস্ত্ররূপে বর্ত্তমান ছিল, ইহাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। এক্ষণে পাণিনি কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেই হিন্দু নাটকের অতি প্রাচীনত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইতে পারে। পরম পণ্ডিত অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকর "নির্ব্বাণোহ-বাতে" * প্রভৃতি পাণিনি সূত্রের সূক্ষ্ম সমালোচনা দ্বারা অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন যে, পাণিনি বৌদ্ধধর্ম্মাভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। পাণিনির সময় নিরূপণ সম্বন্ধে অধ্যাপক গোল্ডষ্টুকরের এই মত এক্ষণে প্রচলিত মত হইয়াছে। বুদ্ধদেব খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অতএব নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে যে, খ্রীষ্টজন্মের ছয় শত বৎসরেরও অনেক পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নাটক-প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল।

অন্য ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে আমাদিগকে এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইতেছে যে, খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীতে বহুল পরিমাণে নাটকের প্রচার ছিল। ইহা অপেক্ষাও অনেক পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে নাটকের প্রচার ছিল, এরূপ অনুমান করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। এমন কি, মহাভারতে পর্য্যন্ত নাটক প্রথা প্রচলনের আভাষ পাওয়া যায়। এই সকল এবং নাটক সম্বন্ধে অন্যান্য কথা আমরা বারান্তরে প্রকাশ করিব।

শ্রীসুরেশচন্দ্র বল।

ভিখারী।

(১)

আমিও তোদেরি একজন—
আমিও শৈশব-সুখে
বেড়েছি মায়ের বুকে,
আমিও বাবার কোলে পেয়েছি যতন,
আমিও কিশোর বেলা

---

* পাণিনির এই সূত্রদ্বারা বায়ুশূন্যতা অর্থে নিঃপূর্ব্বক বা ধাতুর উত্তর "ক্ত" প্রত্যয়ের "ত" স্থানে "ন" হয়। বৌদ্ধদিগের অপবর্গবাচক "নির্ব্বাণ" শব্দ পাণিনির ব্যাকরণে নাই। এমন কি "নির্ব্বাণঃ প্রদীপঃ" প্রভৃতি স্থলে "নিবে যাওয়া" অর্থে পাণিনি "নির্ব্বাণ" শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কাত্যায়নের বৃত্তিতে এবং পতঞ্জলি ভাষ্যেতেই এই "নিবে যাওয়া" অর্থ পাওয়া যায়। ইহা হইতেই গোল্ডষ্টুকার অনুমান করেন, শাক্যজন্মের পূর্ব্বেই পাণিনি বর্ত্তমান ছিলেন।

খেলেছি সাধের খেলা,
আমারো সোহাগ ছিল "সোণা, যাদু, ধন",
আমিও তোদেরি একজন।

(২)

আমিও তোদেরি একজন—
আমারো, ভুলাতে জ্বালা
পরিয়া মুকুতা মালা,
সরল তরল ঊষা দি'ত দরশন,
নিতুই সাঁঝের করে
হাসিত আমারো ঘরে
উজল সুধাংশু খানি সোণার বরণ।
আমিও তোদের একজন।

(৩)

আমিও তোদেরি একজন—
প্রকৃতি আমারে হাসি
পরিত ভূষণ রাশি,
উছলি পড়িত ছটা মধুর মোহন।
শ্যামল রসালে থাকি
গাহিত আমারো পাখী,
ফুটিত আমারো যুথি জাতি বেলিগণ।
আমিও তোদের একজন।

(৪)

আমিও তোদের একজন—
আমারো এ বুক ময়
কত কি উচ্ছ্বাস বয়,
তরঙ্গে তরঙ্গ ছোটে করি গরজন,
আমারো মরমে সাধ,
(মেঘেতে লুকানো চাঁদ)
আমরো হৃদয় আছে, আছে প্রাণ মন।—
আমিও তোদেরি একজন।

(৫)

আমিও তোদেরি একজন—
আজি আমি বড় একা,
কেউ নাহি দেয় দেখা,
খুঁজিতেছি দো'রে দো'রে আপনার জন;
শত দূর, শত পর,
শত দুখে মর মর।
তোরা কি আমার কেউ হবি গো আপন?
আমিও তোদেরি একজন।

(৬)

আমিও তোদেরি একজন—
তোরা যে দেবের শিশু,
আমি নীচ, হীন, পশু,
আমারে দিবি কি তোরা মানুষ-জীবন?—
বিন্দু বিন্দু প্রাণ দিয়া
মৃত দেহ বাঁচাইয়া,
দেখা'বি কি যা দেখিলে হয় না মরণ?
আমি ও তোদেরি একজন?

(৭)

আমিও তোদেরি একজন—
তোরা আলোকের পাখী,
আমিই আঁধারে থাকি,
কথন চেনেনা আঁখি আলোক কেমন।
পতিত এ হীন প্রাণ
তোরা কি করিবি ত্রাণ,
তোরা কি আমার কেউ হ'বি গো আপন?
আমিও তোদেরি একজন।

(৮)

আমিও তোদেরি একজন—
তোদের জনম যেথা
আমিও হয়েছি সেথা,
তবে যে ভিখারী আমি কপালে লিখন!
থাকি এই অন্ধকারে,
অন্ধ কূপ কারাগারে,
হাসেনা রবিটি হেথা বহেনা পবন!—
আমিও তোদের একজন!

(৯)

আমিও তোদেরি একজন—
আজ যে জীবনে মরা,
কালিমা মরিচা ধরা,
আঁধারে আঁধারে হায় নিবিছে জীবন।—
তোদের সুখের বাস,
আলো সেথা বার মাস,
তোদের আনন্দ-ভূমি নন্দন কানন।
পারিজাত ফুল ফোটে,
মন্দাকিনী নিতি ছোটে,
নিশিতে চাঁদিমা হাসে উষায় তপন।—
সব ভাই সব বোন,
সবে আপনার জন,
একটী ভিখারী নাই আমার মতন।
আমিও তোদের একজন।

(১০)

আমিও তোদের একজন—
তোরা কি আমার হবি,
"আমারে" আমার ক'বি,
ঘুচাবি এ পরাণের জ্বলন্ত বেদন,
অণু অণু প্রাণ দিয়া
মৃত দেহ বাঁচাইয়া,
দেখাবি কি দেব-দেশ মধুর কেমন,
তোমাদের পিছু পিছু,
আমি কি পারিব কিছু,
জীবনের "মহাব্রত" করিতে সাধন,
আমারে কি ভিক্ষা দিবি, অমরজীবন?
আমিও তোদের একজন।

শ্রীপ্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী।

ধন-বিজ্ঞান (২)

ধনোৎপত্তি।

ধনের উৎপত্তি ৩ প্রকারে সংঘটিত হয়, (১) প্রাকৃতিক জড়পদার্থ হইতে, (২) মূলধন হইতে ও (৩) শ্রম হইতে। এই ৩টী মিলিত ও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ধন উৎপাদন করিতে সমর্থ।

(১) প্রাকৃতিক জড় পদার্থ—এই শ্রেণীর মধ্যে ভূমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু প্রাকৃতিক অবস্থায় যে সমস্ত পদার্থের আদান প্রদান হইতে পারে, তৎসমুদয়ই ইহার অন্তঃপাতী। মনুষ্য মাত্রেরই ভূমির আবশ্যকতা অপরিহার্য্য, কারণ অবস্থিতি করিবার জন্য সকলেরই একটু স্থানের প্রয়োজন হয়, তার পর পৃথিবীতে স্বভাবতঃ যে সকল আহারোপযোগী দ্রব্য জন্মে, তাহার দ্বারা বহু সংখ্যক মনুষ্যের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হয় না, এজন্য মানুষ কেবল অবস্থিতি করিবার স্থান পাইয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই, শস্যোৎপাদনের জন্য ক্ষেত্রের অনুসন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ভূমির আবশ্যকতা বৃদ্ধি হইয়া আস্তে আস্তে ভূমি ধনোৎপত্তির একটা মুখ্য পদার্থ হইয়া উঠিয়াছে।

(ক) সান্নিধ্য,(খ) সাধ্যত্ব,(গ) ফলশালীত্ব ও (ঘ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভেদে ভূমির মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে।

(ক) সান্নিধ্য :—যদি আবশ্যকীয় ভূমি মূল্যবান ভূমির নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে তাহার মূল্য অধিক হইয়া থাকে, কারণ

যে সকল হেতুতে প্রথম ভূমি মূল্যবান হইয়াছে, দ্বিতীয় ভূমিতেও সেই সকল হেতু বিদ্যমান আছে।

(খ) সাধ্যত্ব:—যে উদ্দেশ্যে ভূমিগ্রহণ করা যায়, সহজে সেই উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হইতে পারিলে সেই ভূমিকে সাধ্যত্ব-গুণ-সম্পন্ন বলা যায়। কোন কোন স্থলে জঙ্গল কাটিয়া গর্ত্ত বুঁজাইয়া খাল কাটিয়া, গাথনি ভাঙ্গিয়া ভূমিকে প্রয়োজনসুকর করিয়া লইতে হয়, এরূপ স্থলে অবশ্যই ভূমির মূল্য কম হইয়া থাকে। কিন্তু অনায়াস ব্যবহার্য্য হইলে তাহার মূল্য অধিক হয়।

(গ) ফলশালীত্ব:—একই ব্যয়ে কোন ভূমিতে প্রচুর ও কোন ভূমিতে অল্প জন্মে. সুতরাং যে ভূমিতে সহজে অধিক উৎপন্ন হয়, তাহারই অধিক আদর হইয়া থাকে, অর্থাৎ ফলশালীত্ব অনুসারে ভূমি ধনোৎপাদনে সমর্থ হয়।

(ঘ) প্রতিদ্বন্দ্বিতা:—কোন কোন সময়ে এরূপ ঘটে যে, একই ভূমিখণ্ড বহু ব্যক্তির লইবার আবশ্যক হয়, এরূপ স্থলে গ্রাহকের আধিক্য প্রযুক্ত প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে একরূপ নীলাম চলিতে থাকে, তাহাতে ভূমির মূল্য বাড়িয়া যায়, কাজে কাজেই ভূমি অধিক উৎপাদনে সমর্থ হইয়া উঠে। জন সংখ্যার বৃদ্ধিই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রধান কারণ, চেষ্টা দ্বারা স্থান বিশেষের জন সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ভূমির মূল্য বাড়ান যায়।

কোন ভূমি দ্বয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ অবধারণ করিতে হইলে বিচার্য্য গুণ ব্যতীত অন্য সমস্ত গুণ উভয় পক্ষে তুল্য করিয়া লইতে হয়, ইহা ভিন্ন বিশুদ্ধ মীমাংসায় উপনীত হইবার কোন উপায় নাই।

(২) মূলধন:—ধনের সেই মূল অংশকে ধন বলা যায়, যাহা আবশ্যকীয় ব্যয় সমুদয় নির্ব্বাহ করিয়া ভবিষ্যতের উৎপাদনের জন্য বাঁচাইতে পারা যায়। তুমি এক মাস খাটিয়া নিজের ও পরিবারের ভরণ পোষণাদি সম্পন্ন করিয়া যাহা ভবিষ্যতের উৎপাদনের জন্য বাঁচাইতে পার, তাহা তোমার সেই মাসের মূলধন। ইহা অর্থ ও মুদ্রা, উভয় প্রকারের বলা যাইতে পারে। মূলধনের প্রধান উদ্দেশ্য শ্রামিককে শ্রমকার্য্যে পরিপোষণ করা।

মূলধন দুই প্রকারের হইতে পারে, যে মূলধন একবারের ব্যবহারে শেষ হইয়া যায়, অর্থাৎ একবার ব্যবহার করিলে সেই আকারে পুনর্বার ব্যবহার করা যায় না, তাহাকে ভ্রাম্যমান মূলধন কহে, আর যাহা হইতে পুনঃ পুনঃ ধনের উৎপত্তি হয়, তাহাকে স্থাবর মূলধন কহে। অন্ন ইন্ধন ভ্রাম্যমান মূলধন, তাঁত, বাইশ, নেহাই স্থাবর মূলধন। ভ্রাম্যমান মূলধনের মূল্য উহার ক্রয়ে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে সেই ধন, ও উহার নিয়োগে যে বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহাও লভ্যাংশ, কিন্তু স্থাবর মূলধনের মূল্য মূলধনের কিয়দংশ ও উহার ক্ষয়ের ক্ষতিপূরণ ও লভ্যাংশ। ভ্রাম্যমান মূলধনের উৎপন্ন তৎক্ষণাৎ একবার ব্যবহারে হস্তগত হয়, কিন্তু স্থাবর মূলধনের উৎপন্ন যত কাল উহা ব্যবহার করা যায়, ততকাল ব্যাপিয়া হইয়া থাকে।

বিলাস দ্রব্য সকল কোন মূলধন বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কারণ উহার উৎপাদনে যে মূলধন নিয়োগ করা যায়, বিলাস পদার্থ গুলি সেই মূলধনের রূপান্তর মাত্র, বিলাস দ্রব্যের ক্ষয়ের সহিত সেই মূলধনেরও ক্ষয় হইয়া থাকে। কেহ হয়ত

বলিবেন যে, বিলাস দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যখন লাভ হয়, তখন উহা মূলধন নহে। ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারি? এ প্রশ্নের উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, বিলাস দ্রব্য স্বয়ং যখন কোন শ্রমের পরিপোষক নহে ও অন্য শ্রমের উৎপাদক নহে, অথচ ক্ষয়েই উহার পরিসমাপ্তি হয়, তখন উহা কদাচ মূলধন শব্দের বাচ্য হইতে পারে না।

ভাব, একজন লোক গহনা প্রস্তুত করিতেছে ও একজন লোক দা গড়িতেছে। এ স্থলে গহনাটা বিলাস দ্রব্য, উহা যে ব্যবহার করে, তাহার শ্রমকার্য্যে কোন অতিরিক্ত যোগ্যতা লাভ হয় না এবং উহাকে কোন উৎপাদক ভাবে ব্যবহার করাও যায় না, সুতরাং উহা মূলধন শব্দের বহির্ভূত, কিন্তু দা মূলধন, কারণ উহা ঘরামীর উপার্জ্জনের সহায়। কিন্তু এরূপ যদিও নির্দ্দেশ করা হইল, তাই বলিয়া বিলাস দ্রব্যকে একেবারে নিষ্ফল বলা আমার উদ্দেশ্য নহে, কারণ উহাতে কথক গুলি লোকের জীবিকা লাভ হয় এবং কোন কোন স্থলে শ্রামিকদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে উৎসাহিত করিয়া উৎপাদনের সহায়তা করে। কিন্তু বিলাস দ্রব্য যখন স্বদেশজ হয়, তখন তাহার এই এক গুণ থাকে, বিদেশীয় হইলে তাহার ফল কোন প্রকারে শুভজনক নহে। ভাব, কাবুল যদি আমাদিগের নিকট ক্রমাগত আতর বিক্রয় করে, তাহা হইলে অনুৎপাদক আতরের বিনিময়ে আমাদিগের ধন ক্রমাগত কাবুলে যাইতে থাকে। ইহাতে আমরা ক্রমশঃ নিঃস্ব হই, কিন্তু যদি আতর-ওয়ালা কাবুলীকে আতরের বিনিময়ে বাঁজি দিয়া বিদায় করিতে পারি, তাহা হইলে দেশের কোন অনিষ্ট হয় না। *

মূলধনকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রাখিলে উহা অনুৎপাদক হইয়া যায়। টাকা পুঁতিয়া রাখা, অচলভাবে সঞ্চয় করা ও গহনা করা এই কারণে দূষণীয়। আজকাল গহনার বিরুদ্ধে অতি গভীর প্রতিবাদের স্বর শুনিতেছি, কিন্তু গহনা দ্বারা ধনকে অনুৎপাদক অবস্থায় রাখা হইলেও এ দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় উহা দূষণীয় বলিতে পারি না, কারণ ইহা সকলেরই বুঝা উচিত যে, মূলধন, ক্রিয়াশীল অবস্থায় থাকিলেই লাভ হয় না, উহা উৎপাদক ভাবে ক্রিয়াশীল হওয়া চাই। যাঁহারা গহনা প্রথার দোষারোপ করেন, তাঁহারা গহনার মূলধন নিয়োগের কোন প্রশস্ত পথ দেখান না। সেভিংব্যাঙ্কে কোন কোন জেলায় গবর্ণমেণ্টের দুই বৎসরের মুনাফার পরিমাণ টাকা আমানত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট চলিয়া যাইতে চাহিলে পায়ে তৈল দিয়া দুই বৎসর রাখিতে পারিবে কি? কেহ কেহ হিন্দু-টি-কোম্পানী প্রভৃতি দুই চারিটা কোম্পানীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মূলধন নিয়োগের প্রশস্ত পথ দেখান, কিন্তু তাহাতে কটা টাকা খাটিতে পারে, তাহা তলাইয়া দেখেন না।

এই সকল কারণে আমি বিবেচনা করি যে, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে আমরা এক্ষণও যেমন নিরেট মূর্খ, তখন গহনা প্রথা আরও খরতর বেগে চলা আমাদিগের পক্ষে অশেষ রূপে কল্যাণকর। অর্থ সকল যেরূপ খরতর বেগে পশ্চিম দিকে ধাবমান হইতেছে,

---

* এই কারণে ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যে আমরা অশেষ প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি। ইংলণ্ডের নিকট খেলনা, পমেটম, ব্র্যাণ্ডি লইয়া তদ্বিনিময়ে গম তুলা পাট এই সকল দ্রব্য দিতেছি।

তাহাতে এই গহনাগুলি অর্থাকারে রূপান্তরিত করিলে স্বল্প-দিনেই আমাদিগের অজ্ঞাতসারে উহা পশ্চিমের পুষ্টি সাধন করিবে।

পরাধীন জাতির ধনাগমের দ্বার সহজে প্রসারিত হইতে পারে না। লোকে রাজ্য জয় করে, শাসন করে কিঞ্চিৎ পাইবার নিমিত্ত। ইংরেজ জাতি অবশ্য মানুষের সমষ্টি, ইহাদিগের লক্ষ্যও যে তাহাই, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি? সুতরাং মানুষের আশা যেমন স্বভাবত উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, ইহাদিগের আশাও সেইরূপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি না হইবে কেন? যত দিন পাইবার সহজত্ব থাকিবে, ততদিন আশা বৃদ্ধি পাইবে। যখন দুঃখের দুঃসহনীয়তায় একান্ত ব্যথিত হইয়া এ দেশের লোকেরা অর্থ নির্গমের পথের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবে, তখন আমাদিগের শুভ দিনের সূচনা হইবে। তারপর যখন কেবল দৃষ্টিতে সন্তুষ্ট না হইয়া বাক্ বিতণ্ডা আরম্ভ করিবে, তখন ইংরেজের আশা সমস্তকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষয় হইতে থাকিবে। যখন ক্ষয়ের সূচনা হইবে, সেই সময় জানিবে, এদেশের কার্য্যারম্ভের শুভ যোগ। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, এক্ষণ কোন্ কাল যাইতেছে, তদুত্তরে আমি এই বলিব যে, এক্ষণ দৃষ্টির কাল যাইতেছে, ইহার সম্পূর্ণতা হইলে বাদানুবাদ কাল, তৎ পরে কর্ম্ম কাল আসিবে।

এক্ষণ শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যের অসময় বলিয়া, কেহ ইহা আমার উদ্দেশ্য মনে করিবেন না, এক্ষণ কাজ করিতে হইবে না। কাজ অবশ্যই করিতে হইবে, কাল দোষে ফল অল্প হইবে, এই মাত্র স্মর্ত্তব্য।

(৩) শ্রমঃ—শ্রম ব্যতিরেকে প্রায় কোন দ্রব্যই ব্যবহার্য্য হয় না; ক্ষেত্র শ্রম প্রয়োগ দ্বারা শাসিত হইলে ফল প্রদান করে, মূলধন শ্রম যোগে পরিচালিত হইলে লাভ উৎপাদন করে। যে কোন দ্রব্য কেন উৎপাদন করিতে যাওনা, দেখিতে পাইবে, শ্রম তাহার একটা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অঙ্গ।

শ্রম ত্রিবিধ (ক) মানসিক (খ) বাচনিক (গ) কায়িক।

(ক) মানসিক,—মানসিক বৃত্তির পরিচালন দ্বারা বিষয় সকলের যথার্থ তত্ত্ব অবধারিত হয়। যে ব্যক্তি বা জাতি এই বৃত্তির অনুশীলনে তৎপর, সেই বুদ্ধি জগতে পূজনীয় হইয়া থাকে। লোকে মানসিক শ্রমের দ্বারা যেরূপ লাভবান হয়, এরূপ অন্য কোন প্রকারে হয় না, কিন্তু কোন্ ব্যক্তির কোন্ বিষয়ে মানসিক বৃত্তি পরিচালন বিধেয়, তাহা ব্যক্তিরাই স্ব স্ব শক্তি অনুসারে নির্ব্বাচন করিয়া থাকে, যে দেশে স্বদেশীয় গবর্ণমেণ্ট আছে, সেখানে ব্যক্তি দিগের মনোবৃত্তি অনুসারে বিষয় বিশেষে প্রবেশের জন্য সুন্দর সুন্দর বন্দোবস্ত আছে।

সচরাচর মানসিক শ্রমের ফল যাহার মন, সেই ভোগ করে, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী লোকেরা আদর্শ হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। এজন্য সচ্চিত্ত ব্যক্তি যে স্থানে বাস করেন, তাহার চতুর্দ্দিগের লোক তাহার বুদ্ধি বৃত্তি হইতে জ্যোতি লাভ করিয়া হানি সকল পরিহার করিতে ও লাভ সকল বৃদ্ধি ভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

(খ) বাচনিক,—বাচনিক শ্রম মানসিক শ্রম প্রকাশের দ্বার স্বরূপ, উহা আবার দ্বিবিধ (১) কথিত ও (২) লিখিত। সঙ্গত ও সংযত বাক্য বলা মনীষীদিগের একটী অসাধারণ ক্ষমতা, ইহা দ্বারা জগতের অশেষ

প্রকারের হিতাহিত সর্ব্বদা সংঘটিত হই-তেছে। বিচারকেরা মীমাংসা লিখিয়া, উকীলেরা অনুকূল প্রতিকূল কথা বলিয়া, চিকিৎসকেরা ব্যবস্থা করিয়া সর্ব্বদা সংসারের শান্তি বিধান করিতেছেন। লোকে ইহা-দিগের শ্রমের মূল্য দিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান করে।

যে দেশ যেরূপ সভ্য, সে দেশে সেই রূপ সুকথিত ও সুলিখিত বাক্যের আদর হইয়া থাকে। তুমি যদি কাহাকেও বুঝা-ইতে পার যে, একটী দেশের লোক সংখ্যার সহিত সেই দেশের প্রচলিত সংবাদ পত্রের যে অনুপাত, অপর একটী দেশে তদপেক্ষা উচ্চ অনুপাত দৃষ্টি করিয়াছ, তাহা হইলে তোমার শ্রোতা অতর্কিত রূপে এই মীমাং-সায় উপনীত হইবেন যে, প্রথমটী অপেক্ষা দ্বিতীয়টী সভ্যতর দেশ। সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত পৃথিবীতে বাচনিক শ্রমেরও হাট বসিয়াছে, অধ্যাপক পি ঘোষ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের বাচনিক শ্রমের হাট হইতে অধ্যাপক টড্‌হণ্টার নিষ্কাসিত হইয়াছেন, এমন দিন ক্রমে আসিবে, যখন দেশীয় সংবাদ পত্র বিদেশীয় সংবাদ পত্রকে ও দেশীয় ব্যারিষ্টার বিদেশীয় ব্যারিষ্টারকে স্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হইবেন।

(গ) কায়িক শ্রমঃ—কায়িক শ্রমও মান-সিক শ্রমের দ্বারস্বরূপ। যাহার মন অপরি-স্ফুট, কায়িক শ্রমে ফল-লাভ করা তাহার পক্ষে অসাধ্য। কায়িক শ্রমও দ্বিবিধ (১) দৈহিক ও (২) যান্ত্রিক। যন্ত্রের আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত দৈহিক শ্রমেরই রাজত্ব ছিল, কিন্তু এক্ষণ আর সে দিন নাই, দশ জন দরজী হাতে সূচী চালাইয়া যাহা করিত, একটী সেলাইএর কল অনায়াসে তাহা করিতেছে। হাটিয়া এক জনের ২০ মাইল পথ যাওয়া কষ্ট, বাষ্পীয় যানে লোকে অনায়াসে অৰ্দ্ধ ঘণ্টায় ২০ মাইল যাই-তেছে; সুতরাং দৈহিক বলে এক্ষণ জাতির উন্নতির কোন আশা নাই। জগতে সেই জাতিরই আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবার আশা, যাহার যন্ত্র সকল অতিশয় কর্ম্ম-কুশল।

যান্ত্রিক শ্রম যে কায়িক শ্রমীদিগকে কর্ম্ম-চ্যুত করে, ইহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। ৫০,০০০ নৌকায়, ৫০,০০০ গাড়ীতে যে মাল ও আরোহীকে গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতায় লইয়া যাইত, ই, বি, রেল একাকী তাহা করিতেছে। ইহাতে নিশ্চয়ই কথকগুলি নৌকা ও গাড়ী-জীবী লোক নিরুপায় হইয়াছে। শুভ ফল এই হইয়াছে যে, মূলধনীরা মূলধন নিয়োগ দ্বারা লাভবান হইয়াছে, কর্ম্মচারীরা যে উপার্জ্জন করে, তাহা অতিশয় সামান্য, সুতরাং ধর্ত্তব্য নহে।

উপরে যে কয়েকটী ফল দৃষ্টিগোচর হইল, তন্মধ্যে দুই পক্ষ প্রধান দেখা যাইতেছে। লাভ পক্ষে মূলধনীগণ ও হানিপক্ষে নৌকা ও গাড়ীজীবীগণ। যদি একরূপ স্থলে মূল-ধনী এবং নৌকা ও গাড়ীজীবী এক দেশের লোক হয়, তবে দেশ দরিদ্র হইবার কোন আশঙ্কা থাকেনা, কিন্তু যদি ধনী বিদেশী হয়, তাহা হইলে ঘোরতর হানি, যদি গাড়ী প্রস্তুতের যন্ত্র সকল আবার বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে সোণায় সোহাগা অর্থাৎ হানির একশেষ।

যন্ত্রে, দেখা যাইতেছে, নিশ্চয়ই মানুষকে শ্রম-চ্যুত করে, সুতরাং এক মাত্র সেই দেশই জগতে পূজ্য হইবার আশা করিতে পারে, যাহার এত যন্ত্র আছে যে যন্ত্রেই সে জাতির

সমস্ত শ্রম শক্তি ক্রিয়া পায়। তাহা হইলে তাহারা কায়িক শ্রমী জাতিদিগের নিকট সুলভ মূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া নিজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে। কিন্তু ঈদৃশ বিস্তারিত যন্ত্রবান জাতিদিগের মধ্যে সেই জাতির কৃতকার্য্যের আশা অধিক, যাহার সমস্ত শ্রমাপকরণ দ্রব্য যান্ত্রিক শ্রমের দ্বারা নিজদেশে উৎপন্ন হয়। ইংলণ্ডের এই অংশে বড়ই দুর্ব্বলতা আছে, পৃথিবীর অনেক দেশ মূর্খ। তাই ইংলণ্ডকে এক্ষণও সে দোষ অনুভব করিতে হইতেছে না, কিন্তু কাল ক্রমে এমন দিন আসিবে, যখন আমাদিগের ন্যায় মূর্খ দেশ সকলের চক্ষু ফুটিবে, তখন ইংলণ্ডকে ক্ষেত্রজ সামগ্রীর জন্য সঙ্কটে পড়িতে হইবে। জগতের সেই দেশকে সুখী ও নিরাপদ বলিতে পারি, যাহাকে বাধ্য হইয়া পরের মুখের অপেক্ষা করিতে হয় না। নিজের দ্রব্য পরের নিকট বিক্রয় করিবার জন্য লালায়িত হইতে হয় না। সম্পূর্ণ সাম্যনীতিতে অবস্থান বলিয়া, কেহ তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী হয় না, অন্যথা এক সময়ে না এক সময়ে প্রতিযোগিতা আসিবেই আসিবে। আজ কাল ইউনাইটেড্‌ষ্টেট বহুল পরিমাণে এই নীতির অনুসরণ করিতেছে।

যন্ত্র যে দেশের সমস্ত প্রাপ্তব্য শ্রম না গ্রাস করিতে পারে, সে দেশে শ্রমজীবীরা কষ্ট ভোগ করে। যাহারা (survival of the fittest) যোগ্যতমের পরবর্ত্তিতার একমাত্র পক্ষপাতী, তাঁহারা দরিদ্রদিগের কাতর স্বরে বিচলিত হন না, ভাবেন, জন সংখ্যার একটা অকর্ম্মণ্য অংশ ধ্বংস হওয়াই কল্যাণকর। আমার নিকট কিন্তু এ নীতি পাশব বলিয়া বোধ হয়। এ দেশে লোকে দরিদ্রদিগকে ইচ্ছানুসারে ভিক্ষা দেয়, ইহাতে অসংখ্য দরিদ্র লোক জীবন ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু দাতাদিগের একান্ত অবিমৃষ্যকারিতা প্রযুক্ত ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা বংশগত করিয়া লইয়াছে এবং মহাসুখে বিলাস দ্রব্যাদি ভোগ করিয়া ভিক্ষুক "বাবুর ন্যায়" জীবন যাপন করিতেছে। ভিক্ষায় অক্ষমদিগেরই অধিকার, বলিষ্ঠ কার্য্যক্ষমদিগকে ভিক্ষা দিলে যেমন একপক্ষে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, তেমনি পরিশ্রমকে অমান্য করা হয়। এজন্য আমার ইচ্ছা যে, আমার স্বদেশীয়গণ এবিষয়ে বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করেন।

শ্রম প্রয়োগে যন্ত্রের ন্যায় সহায়তা করে, একপ একটা প্রণালী আছে, তাহার নাম শ্রমবিভাগ নীতি। নানা প্রকারের শ্রমবিভাগ নীতির শুভ ফলে আজ ইউরোপ জগতের শীর্ষস্থ, কিন্তু অবশিষ্ট পৃথিবী অদ্যাপি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেও সমর্থ হয় নাই। ইহা দ্বারা অবধারিত হইয়াছে যে, একজন লোক একাকী সমস্ত করিয়া আলপিন প্রস্তুত করিতে পারে না। কিন্তু যদি দশ জন সমবেত হইয়া ঐ আলপিন গঠনের কার্য্য বিভাগ করিয়া করে, তাহা হইলে প্রত্যেকে এক দিনে ৫০,০০০ আলপিন প্রস্তুত করিতে পারে। এ প্রকারের শ্রমবিভাগের ব্যবস্থা অবশ্যই সুশিক্ষিত লোকের বুদ্ধি-প্রসূত ; কিন্তু এ দেশে সুশিক্ষিত লোকদিগের এ প্রকারে শ্রম বিভাগের ব্যবস্থা দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জনের সাহস নাই, প্রখরতা নাই। তাঁহারা নিরন্তর সতৈল-হস্ত, পরপদ-লেহনক্ষম, লেখনী-অঙ্গুলি তাড়নে ক্ষিপ্রহস্ত এবং বেতনাস্বাদনে তাহাদিগের লোল রসনা আবদ্ধ-প্রসারিত।

শ্রমবিভাগের আর একটা প্রণালীর নাম যৌথ কারবার—ইংলণ্ডের সমস্ত ঐশ্বর্য্য

এই নীতির মধ্যে লুকায়িত—এই বিশাল বিদেশীয় অধিকার, কুবের সদৃশ ধনসম্পত্তি, সকলই এই নীতি হইতে প্রাপ্ত। এ দেশের বিজ্ঞেরা ইহার তত্ত্ব বুঝিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এত মিথ্যাবাদী, জুয়াচোরের মধ্যে কোন নূতন কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া তুলা অসম্ভব, অখাদ্য খাইয়া খাই নাই, অকার্য্য করিয়া করি নাই বলে শিক্ষিত লোকের পনের আনা, রাত্রিকালে কদর্য্য স্থানে মাতাল অবস্থায় যে সকল লোক শুইয়া থাকে, তাহার অর্দ্ধেক শিক্ষিত লোক। এই সকল ধূর্ত্ত শৃগাল শিক্ষিতদিগের দ্বারা কোন কার্য্য হইতে পারে কি?

দেশে যত প্রকার শ্রমজীবী থাকে, তন্মধ্যে ভূমি হইতে শস্যোৎপাদন যাহার ব্যবসায়, তাহার ন্যায় অটল জীবিকা কাহারও নহে, কারণ প্রত্যেক দেশের আদি সম্পত্তি তদ্দেশীয় ক্ষেত্রোৎপন্ন সামগ্রী সকল, এই আদি দ্রব্য না পাইলে যন্ত্র সকল অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। যান্ত্রিক শ্রমের উন্নতি যেরূপ অনিশ্চিত, কৃষিজীবীর উন্নতি যেরূপ অনিশ্চিত নহে। এজন্য প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, কৃষকদিগের অবস্থার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে।

শ্রামিক মূল্যের পরিমাণে যেরূপ কার্য্য করে, তদনুসারে তাহার মূল্যের ন্যূনাতিরেক হইয়া থাকে। যে অভাব ও পূরণের নিয়মে দ্রব্যের মূল্য অবধারিত হয়, শ্রমের মূল্য অবধারণেও সেই নিয়ম প্রবল। যে স্থানে শ্রমের একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্য আছে, সে স্থানে হটাৎ বহুসংখ্যক শ্রামিক আসিয়া কার্য্য প্রার্থনা করিলে শ্রমের বাজার দর অবশ্য কমিবে, কিন্তু ইহাতে কেহ এরূপ মনে করিবেন না যে, সেই স্থানে দৈনিক শ্রমব্যয় যত হইয়া থাকে, নবাগত ও পুরাতনেরা তাহা বণ্টন করিয়া লইবে। জগতে যে যাচমান হয়, তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অনিবার্য্য—এস্থলে নবাগতেরা যাচমান সুতরাং নিয়োগকর্ত্তাগণ যে দর নির্দ্ধারণ করেন, তাহাতেই তাহাদিগকে সম্মত হইতে হয়।

শ্রম তত্ত্বে ইহা একটী স্থির মীমাংসা যে, ধনের প্রয়োজন দ্বারা শ্রমের প্রয়োজন জন্মে না ও শ্রমের প্রয়োজন দ্বারা ধনের প্রয়োজন জন্মে না। উভয়ের মধ্যে যে প্রবল হয়, সেই অন্যের অধীন হইয়া পড়ে। যদি শ্রমের আবশ্যক অধিক হয়, মূলধন তাহার পরিপোষণের পক্ষে অপ্রচুর হয়, তাহা হইলে মূলধনই সে স্থলে নিয়ামক হইয়া থাকে, আবার মূলধন যে স্থলে অধিক হয়, শ্রম অল্প থাকে, সে স্থলে শ্রমই মূলধনের নিয়ামক হইয়া থাকে। অতিরিক্ত শ্রম বা মূলধন ক্ষয় পাইয়া পরস্পরের সাম্য বিধান করে। এবিষয়টা জটিল, এজন্য একটা উদাহরণ দিতেছি। আমার ৫০,০০০ মাল সার দরকার, কিন্তু কুম্ভকার মূলধন অভাবে ৫০০০র অধিক দিতে পারে না, সুতরাং আমার ঐ ৫০০০ই অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া কুম্ভকারকে অধিক মুনাফা দিতে হয়, আবার ভাবুন আমার দরকার ৫০০০র, কিন্তু ঐ কুম্ভকারের এত মূলধন আছে যে, সে ৫০,০০০ প্রস্তুত করিতে পারে, সে স্থলে তাহার ৫০০০র অতিরিক্ত মূলধন বসিয়া থাকিবে, অর্থাৎ তাহার সমগ্র মূলধনের উৎপত্তি ন্যূন হইবে।

শ্রীগঙ্গেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখা পড়া।

"লেখা পড়া করে যে গাড়ী ঘোড়া চড়ে সে," আমাদের এই কথা। সুতরাং বুঝিতে হইবে, লেখা পড়ার প্রকৃত আদর আমাদের দেশে আজ কাল নাই। ব্যাস, কনাদ, কপিলাদি মহাত্মাগণ যথাসাধ্য লেখা পড়া করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের ভাগ্যে গাড়ী ঘোড়া চড়া নিশ্চয় ঘটে নাই, অথচ বর্ত্তমান সময়ে প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, ঐ সকল মহাপুরুষদের তুলনায় যৎসমান্য লেখাপড়া করিয়া কত উকীল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার জুড়ি গাড়ী হাঁকাইতেছেন। এই দুই শ্রেণীর জীবের লেখা পড়ায় কত খানি তফাৎ, বুঝিতে না পারাই ভারতের বর্ত্তমান ব্যাধি। প্রথমোক্ত অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন অমরাত্মাগণ যাবচ্চন্দ্র দিবাকর এই সংসারে জীবিত থাকিবেন, আর একালের বিদ্যাদিগ্‌গজ লেখাপড়া-ওয়ালা বাবুগণ সাধারণ জীবের ন্যায় কালাতিপাত করিয়া যথাসময়ে অনন্ত কালের জন্য বিলুপ্ত হইবেন।

বিদ্যাধ্যয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিদ্যালাভ বই আর কিছুই নয়, কিন্তু অবিদ্যা অর্থাৎ ভোগবিলাসাদি ক্রয় জন্য অর্থোপার্জ্জন যদি লেখা পড়ার কারণ হয়, তাহার নাম লেখা পড়া নয়, অতি নিম্ন শ্রেণীর ব্যবসায়। ইহার প্রমাণ আমরা নিজেরা। আমাদের মধ্যে কাহাকেও সর্ব্বদা মনোযোগের সহিত অধ্যয়নে নিযুক্ত দেখিলে তাহাকে ঐ সৎপথ হইতে বিরত করিয়া আমাদের দলে আনিবার জন্য বলি, "কি এখন এত লেখা পড়ায় ব্যস্ত!", অর্থাৎ কালেজে লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকিবার কথা, এখন সংসারে প্রবেশ করিয়া পুরাতন হইয়াছি, স্বার্থপরতার নিকট দস্তখত লিখিয়া দিয়া টাকা রোজগারে নিযুক্ত হইয়া, মাছের ঝোল, স্ত্রীর অলঙ্কার ও কোম্পানির কাগজ ভিন্ন চতুর্থ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করি না, এখন ওরূপ নিষ্ফল কাজে (unproductive labour) ব্যস্ত থাকা নিতান্ত অন্যায় ও অসঙ্গত কথা। কিন্তু এইরূপ কৈফিয়ত বা আশ্চর্য্যোক্তি দ্বারা বাস্তবিক কি বুঝায়? ইহা দ্বারা আমি ধরা পড়িলাম, নিজের কপালে স্বহস্তে বড় বড় হরপে "মূর্খতার" ছাপ মারা হইল মাত্র,—এত কালের নাম আজ ডুবিল, শত শত পুঁথি পড়িয়াছি বলিয়া যে এক ভুয়া খ্যাতি ছিল, তাহা মুছিয়া গেল। টাকা রোজগারের গরমাগরম সময়ে বন্ধু যে সর্ব্বদা একমনে একধ্যানে গ্রন্থাদি অধ্যয়ন দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানোপার্জ্জনে ব্যস্ত, তাহা উপলব্ধি করিতে না পারাতে কেবল মাত্র ইহাই প্রকাশ পাইল যে, আমি একজন চিনির বলদ, অনেক পুস্তক পড়িয়াছি বটে, কিন্তু শুধু মথন পড়া সার হইয়াছে, অর্থবোধ হয় নাই, কারণ তাহা আমার ক্ষমতার অতীত ছিল, জন্মাবধি লেখা পড়া করিয়াছি, কিন্তু আজ বেশ বুঝিতে হইতেছে, আমি ও রাইচরণ টিন-ওয়ালা উভয়ে সমান, প্রভেদ মাত্র এই যে, আমার উপর সৌভাগ্যের সুবাতাস বহিয়াছে, উহার অদৃষ্টে তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে।

মানুষ নিঃস্বার্থ ভাবে শুধু জ্ঞান-লালসায় পরিচালিত হইয়া যাবজ্জীবন অধ্যয়ন নিরত

থাকে, ইহা আমার পক্ষে অসম্ভব বোধ হয়; তবে কি আমি ঘোর অজ্ঞান? যদি এই সর্ব্ববাদী-সম্মত বাক্য সত্য হয় যে, যে চোর না হইলে কোন বিশেষ পটু চোরের বাহাদুরী সম্যক উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, নিজে চিত্রকর না হইলে সুচিত্রের গুণপনা বুঝিতে অক্ষম হয়, সাধু না হইলে সাধুর সাধু ভাব দেখিতে পায় না, (অর্থাৎ যাঁহার যে বিষয়ে যত টুকু খাঁটি অধিকার আছে, তিনি যে বিষয়ে তত টুকু উপলব্ধি করিতে সক্ষম) তাহা হইলে আমার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় ঐ উক্তির দ্বারা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এখনও যদি আমি নিজের ত্রুটি ও অভাব দেখিতে পাইয়া থাকি, মঙ্গল, নতুবা সর্ব্বনাশ।

বহুকাল হইল গুরু রস্কিনের (Ruskin) নিকট শুনিয়াছিলাম "You might read all the books in the British Museum (if you could live long enough), and remain an utterly illiterate, uneducated person, but that if you read ten pages of a good book, letter by letter,—that is to say, with real accuracy,—you are for ever more in some measure an educated person" অর্থাৎ যদি কেহ অমানুষিক দীর্ঘ জীবন পাইয়া ব্রিটীশ মিউজিয়মের বিশ লক্ষ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে পারে, অথচ প্রকৃত ভাব গ্রহণ করিতে অক্ষম হয়, সে নিরক্ষর মূর্খ বলিয়া গণ্য হইবে, আর যিনি কোন একখানি ভাল গ্রন্থের দশ পৃষ্ঠা উত্তমরূপে পড়িবেন, তত্রস্থ সত্যগুলি নিজের সম্পত্তি করিয়া লইতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয় কতক পরিমাণে শিক্ষিত জীব। এই কয়টী মহামূল্যবান কথার মর্য্যাদা করিতে শিখি নাই বলিয়া আজ সংসারের ন্যায় বিচারে মূর্খ পদ বাচ্য হইলাম; ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় কি হইতে পারে। হায়, অর্থকরী ভাবে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া কত অমূল্য জ্ঞান রত্ন হেলায় হারাইয়াছি। এখন বুঝিলাম, অর্থোপার্জ্জনের লেখা পড়া নয়, লেখাপড়ার জন্য অর্থোপার্জ্জন, অদ্যাবধি যথাসাধ্য অর্থোপার্জ্জনে নিযুক্ত থাকিব, যাহাতে অতি শীঘ্র এই সয়তানের দাসত্ব হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত চিত্তে প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনে মনোভিনিবেশ করিতে পারি।

শ্রীচন্দ্র শেখর সেন।

সৌন্দর্য্য।

এই বিচিত্র জগৎ সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার। স্থির নয়নে একবার দৃষ্টিপাত করিলে, এই অনন্ত সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে চিত্ত চমৎকৃত ও বিমোহিত হইয়া পড়ে। আজ আমরা প্রতিনিয়ত সেই সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছি, সেই শোভা একই ভাবে আমদের সমক্ষে বিরাজ করিতেছে,—তাই আমরা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, দেখিয়াও যেন দেখিতেছি না। কিন্তু মনে করুন, আমরা যেন মহা নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া সহসা এই সংসারে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলাম, প্রকৃতির ভাণ্ডার আমাদের সমীপে উদ্‌ঘাটিত হইল, দেখিবামাত্র সুদূর সুনীল গগনে পরম শোভাকর শশধর

বিরাজমান; নক্ষত্ররাজি পুঞ্জে পুঞ্জে গ্রথিত হইয়া কণ্ঠদেশে শোভা পাইতেছে, প্রকৃতির অলঙ্কার কুসুমরাজি বিকশিত হইয়া সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে, লতা কুসুম মণ্ডিত হইয়া মৃদুমন্দ সমীরণ সংযোগে সঞ্চালিত হইতেছে, অলিকুল পরিমল লোভে বিমুগ্ধ হইয়া নৃত্য করিতেছে। সাধ্য কি যে মন এ শোভা দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? সৌন্দর্য্যের সমাকার্ষণে নয়ন পরিতৃপ্ত হয়, চিত্তে আনন্দ উদ্বেলিত হইয়া উঠে, শরীর সুশীতল সলিল সিঞ্চনবৎ সুস্নিগ্ধ হইয়া পড়ে। সৌন্দর্য্যের সমুজ্জ্বল কিরণে নয়ন বিস্ফারিত, হৃদয় সরোজ সমুদ্ভাবিত। সৌন্দর্য্য শারদীয় গগনের সুবিমল শশাঙ্ক, প্রশান্ত সাগরের আনন্দ-ময়ী লহরী লীলা, কিন্নরী-কণ্ঠ বিনিঃসৃত সংগীত—তাপস মনের অখণ্ড শান্তি। এ জগতে যাহা দেখিলে, শুনিলে বা ভাবিলে হৃদয় প্রফুল্ল হয়, তাহাই সুন্দর, তাহা-তেই সৌন্দর্য্য। অভ্রভুঙ্গ পর্ব্বতশৃঙ্গ, বিশাল তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র হইতে সামান্য বালু-কণা পর্য্যন্ত প্রত্যেক বস্তুতেই মনোহর শোভা সমাকীর্ণ রহিয়াছে। গভীর সাগর-কল্লোল, মৃদুগভীর মেঘনিনাদ হইতে কামিনী-কণ্ঠ বিনিঃসৃত সুতান সঙ্গীত পর্য্যন্ত প্রত্যেক মনোহর শব্দে মধুরিমা ক্ষরিত, অনুপম শোভা বিকশিত।

প্রকৃতি জগতে যাহা সৌন্দর্য্য, মানব-জীবনে তাহা বিভিন্নাকার। মানবের গুণই মানবের প্রকৃত সৌন্দর্য্য,—পবিত্রতা মানব জীবনের সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ। সত্য আমাদের অলঙ্কার, কোমলতা আমা-দের সৌরভ, দয়া আমাদের মকরন্দ। যখন বাহ্য সৌন্দর্য্যের সঙ্গে গুণের সম্মি-লন হয়, তখন সে সৌন্দর্য্য—সে মণি-কাঞ্চন যোগ—অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শকু-ন্তলার সৌন্দর্য্য আর নন্দন কানন-বাসিনী অপ্সরাগণের সৌন্দর্য্য—চন্দ্রের কোমলতা আর সূর্য্যের প্রখরতা চিত্তের চির শান্তি এবং ক্ষণিক উল্লাস, ইহার মধ্যে একের সঙ্গে অপরের তুলনা হইতে পারে না। মানবের বাহ্য সৌন্দর্য্য বিলাস-ভঙ্গিমা সময়ে সময়ে লোকের চিত্ত বিমোহিত করে সত্য, কিন্তু যে সৌন্দর্য্যের জ্বলন্ত প্রতিভায় হৃদয়-নিহিত প্রেম বিগলিত হইয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত হয়, এবং হৃদয়-নদী পূর্ণ হইয়া প্রেম সাগরে মিশিবার জন্য প্রধাবিত হয়, সে সৌন্দর্য্য বহি-র্জগতে নাই,—মানবের আভ্যন্তরীণ প্রদেশে তাহার পূর্ণ বিকাশ।

এই বসন্ত কাল, প্রকৃতি সুন্দরী অনুপম শোভায় সমুদ্ভাসিত। শীতের আতিশর্য্যে পৃথিবী শীর্ণ ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল, বাসন্তিক সমীরণ সংযোগে শরীর বিকশিত ও সৌন্দর্য্যে প্রস্ফুটিত। জগৎ কেমন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে—সর্ব্বত্র অনন্দে পূর্ণ। মানব জগতে তদ-পেক্ষা সমধিক মুগ্ধকর সৌন্দর্য্য প্রকাশিত। যৌবনের প্রারম্ভে যে অনুপম শোভা বিকশিত হয়, তাহা সন্দর্শন করিলে কাহার না চিত্ত বিমোহিত হয়—নবীন আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত হয়?

সেই সৌন্দর্য্য অধ্যয়ন করিতে করিতে মনুষ্য ক্রমশ দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। কল্পনা শক্তি উৎকর্ষতার শেষ সীমা অতিক্রম করত, এই মর্ত্ত্য জগতে স্বর্গের অপূর্ব্ব লীলা বিস্তার করিয়া, সেই ঐন্দ্রজালিক শোভায়

চিত্ত চমৎকৃত ও বিমোহিত করে। স্মৃতির অপূর্ব্ব ভাণ্ডার কত শত অলৌকিক ভাবে পরিপূর্ণ হয় এবং মুখমণ্ডলে অনুপম স্বর্গীয় জ্যোতিতে সমাকীর্ণ হইয়া দেব ভাব ধারণ করে। সৌন্দর্য্য কবির কবিত্বশক্তির উন্মেষ সাধন করে—বালারুণ কিরণে শতদল বিকশিত হয়। সৌন্দর্য্যের লোপ হউক, জগৎ হইতে কবিত্ব অন্তর্হিত হইবে। যখন কবি সৌন্দর্য্যের নিভৃত নিবাসে প্রবেশ করিয়া তাহার অলৌকিক শোভা সন্দর্শন করেন, তখন তাঁহার মনে যে যুগপৎ কত শত ভাবের উদয় হয়, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? তিনি তখন যে মধুচক্র নির্ম্মাণ করেন, তাহা মানবে "আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"।

কালিদাসের কবিত্ব সৌন্দর্য্য-বিন্যাসময়, তিনি সেই সৌন্দর্য্যের সমাকর্ষণে দুষ্মন্তের মন হরণ করিয়াছিলেন। পথশ্রান্ত মৃগয়াক্লিষ্ট রাজা তপোবনে প্রবেশ করিলেন, কবি সৌন্দর্য্যের বাসন্তিক লীলা বিস্তার করিলেন। দেখিতে দেখিতে কল্পনার তিনটী ছবি তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইল। আহা! সে সরলতা, সে কোমলতা, সে অলৌকিক মধুরিমা কে বর্ণনা করিতে পারে? প্রকৃতির তিনটী মনোহর ছবির সেই মধুর কথোপকথন, সেই সরলতাময় প্রণয়, সেই যৌবন-সুলভ ঈষৎ আকুঞ্চিত ভাব, সেই বৈকালিক সৌর কিরণ-পরিস্নাত পবিত্র তপোবনের অপূর্ব্ব শোভা, দুষ্মন্ত অনিমেষ লোচনে অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি আত্মবিস্মৃত হইলেন, বাহ্য জগতের সঙ্গে চিত্তের সমন্বয় হইল, তিনি বিহ্বল হইয়া সেই সৌন্দর্য্য-স্রোতে পতিত হইয়া ভাসিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ সমুদায় সংসার অন্তর্হিত হইল; কেবল একটী মাত্র ছবি—সৌন্দর্য্যের লীলাময়ী সেই মনোহারিনী মূর্ত্তি খানি দেখিতে লাগিলেন। হৃদয়-তন্ত্রী একে একে বাজিয়া উঠিল, অন্তর্জগতে এক মনোহর সঙ্গীত সমুত্থিত করিল। প্রেমের এই অপূর্ব্ব দৃশ্য, সৌন্দর্য্যের এই অতুল বিন্যাস কবি তাঁহার সেই অবিনাশী গ্রন্থে চিত্রিত করিয়া তাহার বিকাশ দেখাইয়াছেন। সৌন্দর্য্যে প্রেম, প্রেমে মিলন, এবং মিলনে সমাজ সংগঠন ও পার্থিব সুখের উদয় ও সম্ভোগ। সৌন্দর্য্য বৃক্ষ, প্রেম তাহার ফুল, এবং মিলন তাহার ফল। এই সৌন্দর্য্যবোধই মানবকে ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর করিতেছে, তাহা না থাকিলে মানবে ও ইতর জন্তুতে কোন প্রভেদ থাকিত না। মানব প্রতিনিয়ত সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যের দিকে প্রধাবিত। মানবের স্বর্গ, অনন্ত সৌন্দর্য্যের অনন্ত আলয়। মানবের দেবতা, সৌন্দর্য্যের পূর্ণ অবতার।

কিন্তু এই সৌন্দর্য্য-লিপ্সা যেমন এক দিকে মনকে উন্নতির চরম সীমায় উপনত করিতেছে, অপর দিকে তেমনই বিলাসের প্রবল তরঙ্গে ফেলিয়া মানবের চির শান্তি ও সুখ অপহরণ করত তাহাকে বিনাশের পথে অগ্রসর করিতেছে। মানব কর্ত্তব্যের পথে বিচরণ করিতে করিতে সহসা সৌন্দর্য্যের অনুপম মূর্ত্তি দর্শনে এরূপ উন্মত্ত হইয়া পড়ে যে, আর স্থির থাকিতে পারে না। হিমাচলের তুষারমণ্ডিত বালারুণ-রঞ্জিত শোভা সন্দর্শনে ভাবুক বিমোহিত হইয়া স্থির নয়নে ভগবানের কীর্ত্তি অনুধ্যান করিতে থাকেন, আর অবোধ পুরুষ অধীর হইয়া ঐ রত্নমণি পাইবার জন্য আরোহণ

করিতে গিয়া অধঃপতিত ও নিষ্পেষিত হইয়া যায়। রমণীর অনুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে পাবস্ত কবি ভগবানের শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া কৃতজ্ঞতাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, আব ইন্দ্রিয়-প্রমত্ত পাপ-পুরুষ তাদৃশ রূপে সমাকৃষ্ট হইয়া অনন্ত নবকে ডুবিতেছে। ক্লিওপেট্রাবরূপে বিমুগ্ধ হইয়া এনটনি অতুল সাম্রাজ্য ও স্বদেশের মমতা পরিত্যাগ করিয়া চিব কলঙ্ক-পঙ্কে ডুবিলেন, আব আগস্ত সিজার তাহা পাপেব প্রলোভন বলিয়া পদতলে দলিত করত বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট ও অতুল বৈভবেব অধীশ্বব হইয়া স্বদেশেব গৌবব বৃদ্ধি কবিলেন।

আমি তেমন সৌন্দর্য্য চাহিনা। ঐ যে সর্প-জড়িত চন্দন তরু রহিয়াছে, উহার নিকট যাইতে চাহিনা। আমি সৌন্দর্য্য দেখিতে চাহি, স্পর্শ করিতে চাহিনা। ফুলটি ফুটিতেছে, কেমন বাতাসে দুলিতেছে, তাহা দেখিতে ভাল বাসি—উহা ছিড়িতে চাহিনা, উহা ছিড়িলে উহাব সে শোভা, সে সৌন্দর্য্য থাকিবেনা; সে নূতনত্ব, সে কোমলতা কিছুই থাকিবে না। ঐ যে অবোধ পতঙ্গ সৌন্দর্য্য ডুবিবে বলিয়া কত চেষ্টা কবিতেছে, কতবার যাইয়া ঐ আবরণেব উপবে পড়িতেছে, কত ব্যাকুল হইতেছে, মোহ আববণ উহার পথের প্রতিবন্ধক বলিয়া কত আর্ত্তনাদ করিতেছে, অবশেষে অশেষ চেষ্টার পবে ঐ যে আলোব উপব উৎপতিত হইয়া পুড়িয়া গেল—আমি উহার মত প্রমত্ত হইতে চাহিনা। এই যে সংসাবের মোহ, এই যে সংসাবের স্নেহ মমতা, উহা আমার নিকট বড় আমোদেব জিনিষ—আমি উহা-রই মধ্যদিয়া সেই পূর্ণ আলোক দেখিতে চাহি, অনন্ত কাল দেখিব—স্থিব নয়নে স্থিব ভাবে দেখিব, কিন্তু সাধিলেও আমি উহাতে যাইয়া পড়িবনা, আমাব ভয় হয়, আমাব শঙ্কা হয়—আমি উহাব সঙ্গে মিলিতে অনুপযুক্ত,—মিলিতে চেষ্টা করিলে আমাব ঐ পতঙ্গেব দশা হইবে।

শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল।

বঙ্গবাসী ও অনাচরনীয় হিন্দু।

(৩)

আমি যে অতিশয় "মূর্খ", তাহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। বঙ্গবাসীতে ঐ কথার পুনরুল্লেখে আমি সমধিক কৃতজ্ঞ হইয়াছি, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু নব্য-ভারতের সম্পাদক মহাশয় ও "সমস্ত বাবু-দের মূর্খতা" আমি স্বীকাব কবিতে প্রস্তুত নহি।

বঙ্গবাসীব নীতি সম্বন্ধে যাহা আমরা বলিয়াছি, বঙ্গবাসী তাহা একে একে সকলই স্বীকার করিয়াছে ও কবিতেছে। তবে যে গুণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা শৌণ্ডিকের ও সুবর্ণবণিকের বাটীতে দানগ্রহণ করিয়া সমাজে আসিয়া অস্বীকার করেন, স্বভাবসিদ্ধ সেই পরম রমণীয় গুণ বশতঃ 'বঙ্গবাসী

আমাদের কথায় উত্তর দিয়াও প্রকাশ্যে আমাদের কথায় উপেক্ষা ও "ঘৃণা" প্রদর্শন করিয়াছে। আমরাও বঙ্গবাসীকে একথা বলিতে পারি যে, আমরা যদি কোন বস্তুকে ঘৃণা করি, তবে এই প্রকারের কাপুরুষতাকেই করি।

ইহা আমরা জানি ও বলিয়াছি যে, এ দেশের অনেক মূর্খ লোক ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মকেই হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া জানে। আবার এমন বিচক্ষণ লোকও আছে, যাহারা ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ও যাজকতা যে ভিন্ন জিনিস, ইহা উপলব্ধি করিতে পারে। আধুনিক বাবুগণই এই বিভিন্নতা বুঝেন, এমত নহে, বঙ্গবাসীর অবাবুগণও উহা বিলক্ষণ রূপে বুঝেন। যত কেন সূক্ষ্মভাবে ও সতর্কভাবে বলা হউক না, বঙ্গবাসীর উপদেশ যে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যকে লক্ষ্য করে, তাহা বুঝিতে কৃত-বিদ্য সমাজের আর বাকী নাই। তবে যাঁহারা নিদ্রা যাইতে যাইতে বঙ্গবাসী পাঠ করেন, তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গের জন্য গত কয়েক সপ্তাহের বঙ্গবাসী হইতে, আমাদের উত্তরচ্ছলে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

১। "শাস্ত্রশাসিত ও ব্রাহ্মণাশ্রিত সমাজকেই আমরা হিন্দু সমাজ বলিয়া জানি।" বঙ্গবাসী ২২শে ভাদ্র, ১২৯৭, ৪র্থ স্তম্ভ।

২। "ব্রাহ্মণ যাহাতে সুব্রাহ্মণই থাকেন, দেশে যাহাতে সংস্কৃত ভাষার সমধিক চর্চ্চা হয়, শাস্ত্রানুশীলন বিশিষ্ট রূপে হয়, ইহাই আমাদের অন্তরের কামনা। * * * ধর্ম্মশাস্ত্রের সার কথা ব্রাহ্মণের জিহ্বাগ্রে অবস্থিতি করুক—ইহাই আমাদের অন্তরের কামনা। আমরা জানি, সুব্রাহ্মণ ব্যতীত হিন্দু সমাজ সুরক্ষিত হইবে না। তাই আমরা ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য এত বদ্ধকর।" বঙ্গবাসী ২৫শে শ্রাবণ, ১২৯৭, ৫ম স্তম্ভ।

পাঠক। বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণের স্বার্থে পরিচালিত কি না, এস্থলে বিবেচনা করুন।

শাস্ত্রশাসিত ধর্ম্মকে আমরাও হিন্দুধর্ম্ম বলি। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সটীক স্মৃতি সংগ্রহ যদি শাস্ত্র হয়, রমেশ বাবুর সটীক ঋক্‌বেদ সংহিতা শাস্ত্র হইবে না কেন, ইহাই আমরা বুঝি না।

সুব্রাহ্মণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউন, ইহা আমাদেরও ইচ্ছা, কিন্তু কুব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিয়া তাহার ব্যবসায়োচিত বর্ণে তাহাকে নিমজ্জিত কর এবং পংক্তি ভোজনের সময় তাহাকে ব্যবসায়োচিত বর্ণের সঙ্গে বসিতে দাও। আর তাহা যদি না কর, তবে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের কথা মুখে আনিও না, এবং ভগী যদি যজ্ঞোপবীত ধারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ হইতে চায়, তাহাকে নিষেধ করিও না।

৩। "কলিকাতার হিন্দু হোষ্টেলে সুবর্ণ-বণিকের সন্তানকে স্থান দেওয়া হয় নাই, তাই একটু ঘোট হইতেছে। হোষ্টেলের নিয়ম আমরা জানি না। কিন্তু যেখানে সংস্পর্শের আশঙ্কা সেখানে সুবর্ণবণিকেরাই বা জিদ করিবেন কেন?" বঙ্গবাসী ২২ শে ভাদ্র, ১২৯৭—১ম স্তম্ভ।

অনাচরণীয় হিন্দুগণ বঙ্গবাসীর কর্ণধারত্বে যে লাভ করিবেন, তাহার নমুনা বাহির হইতেছে। ধনকুবের সুবর্ণবণিকগণ যখন বিদ্যালঙ্কার ও সিদ্ধান্তবাগীশদিগকে চুপে চুপে দান করেন, তাঁহাদের হাতের বসিদ রাখিবার রীতি যদি প্রবর্ত্তিত করিতেন, তবে অনেক উপাধ্যায় ও মহামহোপাধ্যায়ের নাম

তাঁহাদের দ্বারদেশে সাইনবোর্ডে দেখাইতে পারিতেন। তাহাত তাঁহারা করেন নাই। ধন আছে ধনের ব্যবহার করিয়াছেন, সুখ হইয়াছে ও হইতেছে, এই পর্য্যন্ত। কৈবর্ত্ত-গণের মধ্যে একদল ঘুষ দিয়া সংস্পর্শের দায় হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁতীর মধ্যে "ক্লীব তাঁতী" নাম ধারণ করিয়া একদল উঠিয়া গিয়াছেন, দাগদেওয়া গোয়ালও সজল ব্যবহারের অন্তর্গত হইয়াছে, শৌণ্ডি-কের মধ্যে একদল 'কুণ্ড' উপাধিগ্রহণে উপরে উঠিয়াছেন, সুবর্ণবণিকের মধ্যে, বহু বহু সুবর্ণবণিক নাম ধারণ করিয়া, অবশ্য শাস্ত্রাধ্যক্ষগণকে ঘুষ দিয়া, উঠিয়া যাইবার জন্য একদলের চেষ্টা আছে। যাহা হউক, এরূপেও যদি দেশে সজল ব্যবহার হয়, দোষ নাই। কিন্তু আজ কি ব্রাহ্মণে পাতি দিলেই অন্যান্য জাতি, অনাচরণীয় জাতির মধ্যে এবম্বিধ ছিন্ন-লাঙ্গুল শৃগাল তুল্য উচ্চাভিলাষীদিগের জলস্পর্শ করিবে? আমরা এমন মনে করি না। সজল ব্যব হারের জন্য এরূপ পরোক্ষ ভাবের যত্ন আমরা অনুমোদন করি না। পরোক্ষ ভাবের যত্ন অতি হীন জাতির সম্ভবে, সুবর্ণবণিকের ন্যায় মান্যগণ্য জাতি, সজলত্যাগ করিয়া কিছু ঘুষ ঘাস দিয়া উপরে উঠিবার মনকরিতে পারিবেন, এমন আমরা মনে করি না।

অনাচরণীয় বর্ণের কি উপায়ে সজল ব্যবহার্য হইতে পারে, এবিষয়ে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক আমরা লিখিয়াছি। তাহাতেই আমরা বলিয়াছি, সকল অনাচরণীয় জাতি সমবেত ভাবে সজল ব্যবহারের যত্ন করিলে, সিদ্ধকাম হইতে পারেন। সুবর্ণবণিক ও শৌণ্ডিকগণ অগ্রবর্ত্তী হইয়া কার্য্যারম্ভ করিলেই কার্য্য হয়।

৪। "এত যে জাতি নাশের চেষ্টা, হিন্দু মুসলমান, পার্শী খৃষ্টান সমস্ত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একাকার করিবার আগ্রহ, এই যে ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ, বাল্যবিবাহের উপর আক্রোশ * * ইত্যাকার অন্তবিধ সমাজ সংস্কারের প্রয়াস এই সমস্ত বাবুদের মূর্খতা জন্য।"

৫। "বাবুদের মধ্যে কদাচিত দুই এক জন বিদ্যাভিমানী আছেন। ঋকবেদের ভূঁইফোড় আচার্য্য হইয়া ইহারা ধুয়া ধরাইয়া দেন। নিরক্ষর অনুচরবর্গ অমনি সমস্বরে দোহারী করিতে থাকেন।" (বঙ্গবাসী ১লা ভাদ্র, ১২৯৭, ৪।৫ স্তম্ভ)।

এই ভূঁইফোড় আচার্য্য বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত, আর এই দোহারী-কারক বোধ হয় আমাকে বলা হইয়াছে। রমেশ বাবুর বেদানুবাদে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতে বসি-য়াছে। আমি অবগত হইয়াছি, তিনি একটি বৈদিক বিদ্যালয় সংস্থাপন পূর্ব্বক বাঙ্গলা ভাষায় বেদ শিক্ষা দেওয়ার বিধান করি-বেন। এ বিষয়ে আমার নিকট যে সকল কাগজ পত্র আছে, তাহা আমি ক্রমশঃ মুদ্রিত করিব। সুতরাং এক্ষণ কিছু বলিব না।

৬। 'বাবু বিদ্যালয় বাবু বানাইবার কল। বাবুরাই সমাজ ধ্বংসের মূলীভূত কারণ হইতেছেন। চোকের উপর এই সর্ব্বনাশ দেখিতেছি, তবুও ত চৈতন্য কাহা-রও হয় না। ইংরেজি যখন শিখিতে হইবে, তখন আজ কাল খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম ও বাবুদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা ভিন্ন গত্যন্তর কি আছে? তখন ছিল এক শত্রু (খ্রীষ্টানেরা) এখন হইয়াছে তিন শত্রু (খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম ও বাবু) সুতরাং রহিয়া যাইবার পথ প্রশস্ত হই-

য়াছে।" (বঙ্গবাসী ১৫ই ভাদ্র, ১২৯৭, ৬ষ্ঠ স্তম্ভ)।

বঙ্গবাসীর লেখকগণের মধ্যে যে কেহই বাক্যানুরূপ হৃদয় ধারণ করেন না, এ কথা আমরা বিশ্বাস করিতে চাহি না। যাঁহারা দেশের উপকার করিবার প্রয়াসী, তাঁহাদের যদি কোন শত্রু থাকে, তবে সে শত্রু কপটতা। বঙ্গবাসী কি প্রকৃতই বাবুগণকে এইরূপ শত্রু মনে করে? ইংরেজী শিক্ষা কি প্রকৃতই বঙ্গবাসীর অশ্রদ্ধেয়? তবে কলিকাতার বঙ্গবাসী স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হয় কেন? এই প্রকার কপট উপদেশে কি সুব্রাহ্মণ তৈয়ার হইবে? ছি! যদি বাবুই ঘৃণার পাত্র ও শত্রু হয়, তবে বঙ্গবাসীর আফিসময় যে আমরা বাবু দেখিতেছি! বঙ্গবাসীর শত্রু বাবুরা নয়, বঙ্গবাসী নিজে।

৭। "আবার অজ্ঞান ও দুর্বুদ্ধি বশত 'সমং পশ্যতি পণ্ডিতঃ' ইত্যাদি বাক্যে একে আর বুঝিয়া এক অদ্ভুত সাম্যবাদের সৃষ্টি করিয়া ইহারা জাতি নাশের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। সহজ বুদ্ধিতেই বুঝা যায়, বৈষম্যই জগৎ। যতক্ষণ বৈষম্য থাকিবে, ততক্ষণ সৃষ্টি থাকিবে। সাম্যই প্রলয়।" (বঙ্গবাসী ১লা ভাদ্র ১২৯৭, ৪।৫ স্তম্ভ।)

বলি, ইংলণ্ড ও রুষ ভূমে যে বর্ণ-বৈষম্য নাই, সে সব স্থানে প্রলয় হইয়াছে কি?

আবার দেশে যে কন্যা বা বর বিক্রয়ের প্রথা হইয়াছে, তাহাও নাকি বাবুদের দোষ।

৮। "তাই বলি ইংরেজী শিক্ষিত বিক্রীত বাবুদের মতি গতি ফিরাইতে না পারিলে কন্যাদায়ের বিষম রোগ সারিবে না। * * * * কন্যাদায়ের কুপ্রথা ঘুচাইবার চেষ্টা করিতে হইলে প্রত্যেক সমাজের জাতিকে স্বতন্ত্রভাবে করিতে হইবে। একাকারে চলিবে না। (বঙ্গবাসী ১লা ভাদ্র, ৪র্থ স্তম্ভ।)

ধন্য সত্যবাদীতা! কৌলিন্য প্রথা, অন্তর্বিবাহের অভাব, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি কারণে কন্যাদায় জন্মিয়াছে। সে দোষটা এখন বাবুদের শিরে চাপাইয়া দেওয়া হইল। বাস্তবিক কি ইহা সরল হৃদয়ের কথা? যদি ইহা কপট বাক্য হয়, তবে এ দেশের এত লোককে ত ইহা শুনিতে দেওয়া উচিত হইতেছে না। বাবুদের যে দোষ নাই, তাহা নহে। কিন্তু কন্যা বিক্রয়ের বা বর বিক্রয়ের দোষ বাবু হইতে জন্মে নাই।

যে দেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের নাম হিন্দুধর্ম্ম, একতার নাম "একাকার", সে দেশেই এত কপট ব্যবহার সম্ভবপর হয়।

৯। "হিন্দু মুসলমানকে একাকার করিবার চেষ্টাও অজ্ঞান প্রযুক্ত। তেলে জলে মিশাইতে গেলে তাহাতে আর প্রদীপও জ্বলে না, তৃষ্ণাও ভাঙ্গে না। তেলও নষ্ট হয়, জলও নষ্ট হয়। অথচ বাবুদের ব্যাপারই এই রকমের।" (বঙ্গবাসী ১লা ভাদ্র, ৪।৫ স্তম্ভ।)

হিন্দু ও মুসলমান তেল ও জল নহে। ইহারা তেল ও তেল। তেলে তেলে মিশাইলে প্রদীপ বিলক্ষণ জ্বলে। এই তেল কেবল দুই বোতলে রাখা হইয়াছে। মিশাও, প্রদীপও জ্বলিবে, পাকের কাজও চলিবে। ইহা যে বুঝ না, ইহাই মূর্খতা।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

ভারতীয় মুদ্রা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

ব্রিটীশ ভাবতেব ইংবাজ পুরুষ কর্তৃক প্রবর্ত্তিত মুদ্রা সকলের বিবরণ পাঠক-দিগেব নিকট বোধ করি অবিদিত নাই, কিন্তু তবুও এসম্বন্ধে আরও কিছু জানিবাব বিষয় বাকী আছে। ইংবাজ বাজা এদেশে প্রধানতঃ তিন প্রকাব ধাতুব মুদ্রা প্রচলন কবিযাছেন, তদ্যথা স্বুবর্ণ, বৌপ্য এবং তাম্র। ইংবাজের স্বুবর্ণ মুদ্রা দুই প্রকাব (১) গিনি সোণাব মুদ্রা এবং (২) পান্না সোণাব মুদ্রা। শেষোক্ত প্রকাব স্বর্ণই খাঁটি এবং এতদ্দেশীব বিশুদ্ধ স্বুবর্ণ। বৌপ্য মুদ্রা সমূহ টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি এবং একাণী, এই পঞ্চম প্রকাবে বিভক্ত। একাণীব ব্যবহার এখন খুব কম। ইংবাজ গবর্ণমেণ্টেব বৌপ্য মুদ্রাব ৫ বাব সংস্কবণ হইযাছে, ইষ্ট ইণ্ডিযা কোম্পানীর রাজত্ব কালে বৌপ্য মুদ্রায তুলাদণ্ডেব চিত্র ছিল, তাহাব পবে ব্যাঘ্রমূর্ত্তি বসান হয। কিছুকাল পবে শার্দ্দুলেব ভীষণ মূর্ত্তি উঠাইযা দিযা চতুর্থ উইলিযমের নামে টাকা উঠিতে আবম্ভ হয়, তদনন্তব কুইন ভিক্‌টোবীযাব প্রতি-মূর্ত্তি ও নামে টাকা অঙ্কিত হইতে থাকে। লর্ড লিটনেব শাসন কালে দিল্লীব বিখ্যাত দববাবেব পবে এম্‌প্রেশ্‌ ভিক্টোবীযা নামে মুদ্রা প্রচাব আবম্ভ হইযাছে। তাম্র মুদ্রা সমূহ একপয়সা, অর্দ্ধপযসা এবং $\frac{১}{১২}$ আনী, এই চাবি ভাগে বিভক্ত। ইংরাজী বারো পাই আমাদেব এক আনা, অর্দ্ধপয়সাব নীচে অতি ক্ষুদ্রাকাব তাম্র মুদ্রা চলে, তাহাব নাম $\frac{১}{৭}$ আনা মুদ্রা অর্থাৎ বাবো পাই হিসাবে যে "আনা" হয, সেই আনাব ইহা দ্বাদশাংশের একাংশ। বাঙ্গালা দেশে ইহা কম চলে, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ইহাব অধিক প্রচলন, তথায় ইহা ছোটী পাই, এই আখ্যা প্রাপ্ত হই-য়াছে। ইহাদেব তিনটা এক পয়সাব সমমূল্য। ইংবাজেব তাম্রমুদ্রাব প্রায় ত্রযোদশ সংস্কবণ হইয়া গিযাছে। এই ত্রযোদশ সংস্কবণেব ভিন্ন ভিন্ন পয়সা একত্র কবিলে দেখিবেন, সিংহ, শার্দ্দুল, তুলাদণ্ড, কুইন ভিক্‌টোবীযা, এম্‌প্রেস ভিক্‌টো বীযা, চতুর্থ উইলিযম, উদ্যান, কোম্পানীর কুঠি, কোম্পাণীব নাম, তাম্র প্রভৃতি লেখা আছে। যতই সংস্কবণ হউক না, ধাতুব ওজন ও দব প্রায়ই সকল সমযে এক থাকে। ধাতুপবীক্ষকেবা বলেন, ইংবাজেব টাকায প্রায তিন আনা খাদ দেখা যায, কখনও কখনও তাহাব অধিকও থাকে। এক্ষণে সংগৃহীত মুদ্রা সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতেছে। যতপ্রকাব মুদ্রা সংগ্রহ কবিতে সমর্থ হইযাছি, তাহাদেব প্রত্যেকটিতে সংখ্যা দিয়া বর্ণনা কবিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

১। রট্‌লামের তাম্র মুদ্রা।

মধ্যভাবতেব অন্তর্গত মালোয়া প্রদে-শেব সীমান্তবর্ত্তী বট্‌লাম একটি ক্ষুদ্র হিন্দুবাজ্য। বর্ত্তমান বাজাব নাম বনজিৎ সিংহ, যুবাপুরুষ এবং জাতিতে ক্ষত্রিয়। আয় প্রায় বার্ষিক ৬ লক্ষ টাকা, গবর্ণ-মেণ্ট ইহাঁব নিকট হইতে কব গ্রহণ কবেন। বাজাব নিজেব টাকশালা আছে, তথায় কেবল তাম্র মুদ্রা (পয়সা) অঙ্কিত

হয়, রৌপ্য বা সুবর্ণ মুদ্রা অঙ্কণের অধিকার রাজার নাই। টাকশালার অধ্যক্ষের নাম রঘুনাথ প্রসাদ। রটলামে যে তাম্র মুদ্রা দেখা যায়, তাহা দুই প্রকার, যথা প্রাচীন ও আধুনিক। বর্ত্তমান (সন১২৯৭) সালের শ্রাবণ মাস হইতে বর্ত্তমান রাজা রনজিৎ সিংহ এক প্রকার নূতন ধরণের পয়সা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহারই নাম আধুনিক পয়সা। এই পয়সা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে যে তাম্র মুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহার নাম প্রাচীন পয়সা। রটলামের লোকেরা ইহাদিগকে "কদমী পয়সা" এবং "ছাপ্পী" পয়সা, এই দুই নামে আখ্যাত করেন। রটলামের পুরাতন পয়সার একপৃষ্ঠের দুই পার্শ্বে দুই তরবারীর চিত্র এবং তরবারীদ্বয়ের মধ্যে সূর্য্যের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি দেখা যায়। সূর্য্যদেবের মস্তকোপরে সুদর্শনচক্র এবং নিম্নে গঙ্গানদী। পয়সার অপর পৃষ্ঠায় ইংরাজী অক্ষরে "Rutlam 1853" এই গুলি দেখিতে পাইবেন। পয়সার আকার গোল, ওজনে ইংরাজী এক পয়সা হইতে কিছু অধিক। এই পয়সা রট্‌লামে প্রায় ৪৮ বৎসর চলিতেছিল, ইহার পূর্ব্বে হোলকার মহারাজার মুদ্রা এখানে চলিত। উপরে যে পয়সার উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা ইং ১৮৫৩ অব্দের মুদ্রা। অর্দ্ধ পয়সার চলন এখানে নাই। এখন যে নূতন পয়সা চলে, তাহার বিবরণ এই রূপ। এক দিকের চতুষ্পার্শ্বে সুন্দর সুন্দর লতা এবং ঐ লতার শাখায় পত্র ও ফুল, মধ্যে দেবনাগরাক্ষরে "এক পয়সা" এই কয়েকটি কথা লেখা। ইহার নীচে সম্বতের উল্লেখ থাকে। অপর পৃষ্ঠার চতুষ্পার্শ্বে লতা, পাতা, ফুল, ফলের চিত্র আরও নিবিড়, সুন্দর এবং দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বড়। ইহার মধ্যস্থানে মারুতী দেব (পবনপুত্র) হনুমান, বস্ত্রদ্বারা কটিদেশ বদ্ধকরিয়া, ভীষণ গদা হস্তে মহাবীরের ন্যায় দণ্ডায়মান। ইহার পদতলের নীচে দেবনাগরাক্ষরে "রৎলাম" কথাটি অতি ক্ষুদ্রতম রূপে দেখিতে পাইবেন। পয়সার আকার গোল, ওজন প্রায় ব্রিটিশ পয়সার সমতুল্য। সুতা দিয়া রৎলামের প্রাচীন ও আধুনিক পয়সাকে মাপিলে, প্রথমের পরিধি প্রায় (সুতার লম্বত্ব অনুসারে) পৌণে চার অঙ্গুলি এবং দ্বিতীয়ের পরিধি প্রায় ৪ অঙ্গুলি হইয়া থাকে। যে সুতা দিয়া মাপিবেন, সেই সুতার দৈর্ঘ্যের মাপের কথা বলা যাইতেছে। রৎলাম রাজ্যে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের এবং পার্শ্ববর্ত্তী দুই একটি দেশীয় রাজ্যের পয়সারও প্রচলন আছে।

২। বরোদারাজ্য। গুজরাটের বরোদারাজ্য অতি বিস্তৃত ও প্রসিদ্ধ। এই রাজ্যের রাজারা গুজরাটী ভাষায় গায়কোঁয়াড় নামে খ্যাত। "গায়" অর্থে গাভী, "কোঁয়াড়" অর্থ "পালক" অর্থাৎ গাভীর রক্ষক ও পালক, এই জন্যই বরোদারাজ্যে গাভীর খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা। বরোদারাজ্যের তাম্র মুদ্রার (পয়সার) আকার গোল। ইহার একদিকে লতা পাতার চিত্র এবং তাহার মধ্য দেশে দেবনাগরাক্ষরে "এক পয়সা এবং সম্বতের উল্লেখ আছে।" অপর পৃষ্ঠায় দেবনাগরাক্ষরে "শ্রী রাবাজী রাওমগায়ক রাউ" এবং তদন্তর "সেনাখাস সখেল শমসের বাহাদুর" এই শব্দগুলি দেখিতে পাইবেন। ইহাদের মধ্যস্থলে দেবনাগরাক্ষরে "সরকার"

এবং তাহার নীচে কর্ত্তিত নরমুণ্ডের অর্দ্ধাংশ ও তন্নিম্নে এক তরবারীর চিত্র। ওজনে ইংরাজী পয়সার সমতুল্য। সুতা দিয়া মাপিলে সুতার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ অঙ্গুলি হয়।

৩। আশির গড়। খান্দেশের অন্তঃপাতী। খাণ্ডোয়া হইতে গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনীন্সুলার রেলওয়ে কোম্পানীর গাড়ীতে বোম্বাই অভিমুখে যাইলে পথে চাঁদনী ষ্টেশন দেখিতে পাইবেন। ইহা বোম্বাই হইতে ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। চাঁদনী ষ্টেশন হইতে আশিরগড় প্রায় তিন ক্রোশ। ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে আশা আহির নামক এক গোয়ালা জাতীয় কৃষক এই রাজ্য স্থাপন করেন। পর্ব্বতের উপরে যে মহা প্রকাণ্ড দুর্গ আশিরগড় নামে খ্যাত, তাহা ইহারই কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। আকবর শাহ এই দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরেজেরা আশিরগড় এক্ষণে রাবায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কতকগুলি ইংরাজ ও দেশীয় সৈন্য এখানে এক্ষণে বাস করে। এই দুর্গ ইংরাজের "রাজকয়েদী" (Political State prisoners) গণের কারাগার স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। রাজা আশা আহিরের মুদ্রার আকার চতুষ্কোণ, ইহা তাম্র ও রৌপ্য, এতদুভয়ে নির্ম্মিত। আকার ক্ষুদ্র। কোনও অক্ষর বা চিত্র নাই, দুই পৃষ্ঠে কতকগুলি অর্থ শূন্য বিন্দু মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ওজনে এক দুয়ানীর সঙ্গে সমান। ইহার দৈর্ঘ্য কনিষ্ঠ অঙ্গুলির নখের সমান। এই পয়সা এখন চলে না; আশির গড় এখন ইংরাজ রাজ্য।

৪। ভারতে পর্টুগীজ রাজ্যের মুদ্রা। গোয়া প্রভৃতি পর্টুগালাধিকৃত রাজ্য সমূহে এই মুদ্রা (পয়সা) প্রচলিত হয়। ইহার ধাতু তাম্র, আকার গোল। ইংরাজের পয়সার সমতুল্য ও সমমূল্য। ওজন প্রায় এক। এই পয়সার এক দিকে ইংরাজী অক্ষরে "Ludovicus 1. Portug. et. Algarb Rex 1884" এই কথাগুলি লেখা আছে। ইহাদের মধ্যদেশে পর্টুগীজ সম্রাটের মুখের মূর্ত্তি। সম্রাটের মাথায় আবরণ নাই। অপর পৃষ্ঠায় ইংরাজী অক্ষরে "India Portugueza De Tanga" এই কয়েকটি কথা আছে। ইহাদের মধ্যদেশে সম্রাটের মাথার মুকুটের চিত্র, এবং এই চিত্রের নিম্নে ইংরাজীতে "quarto' শব্দ দেখিবেন। সুতা দিয়া পরিধি মাপিলে, সুতার দৈর্ঘ্য প্রায় ৬ অঙ্গুলি হয়।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ দত্ত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

অন্বেষণ।

খুঁজে খুঁজে হারানিধি মেলে নাই যার
নিরাশ হয়েছে তবু, খোঁজে নাকি আর?
তেমতি এ অন্বেষণ,
তাই পুনঃ আকিঞ্চন,
তাই ও ভুলের দেশে যেতেছি যাচিয়ে,
বাসনা—বিমনা, আশা উঠে শিহরিয়ে

বরষা প্লাবিত স্নেহ কেমনে শুকায়,
বাল্য-রবি অনুরাগ কোথায় লুকায় ?
হতাশের প্রাণ নাশা,
অর্দ্ধ পূর্ণ ক্ষীণ আশা,
পিপাসায় ছুটাছুটি করে তৃষ্ণিকায়,
হারায়েছে যারে, তারে তবু নাহি পায়।

উপেক্ষাই আত্মহত্যা—ধ্বৃতির বিকার,
স্মৃতি মাঝে অনাবৃষ্টি বজ্র হাহাকার,
সেথায় কার্য্যের শেষ,
অনিবার্য্য হেথা ক্লেশ,
প্রতিধ্বনি সে হৃদয় নাহি করে পান
সাঁপেতে শিশির বিন্দু কটোর পাষাণ॥

কবিতা-বসন্তে কেন কোকিল-কূজন
আশা সুরভিতে ভরা মলয় স্বজন ?
না যাইবে কাছে তার
না ছুঁইবে দেহ আর
গান মাখা এ অনিল প্রাণে করে খেলা
পশে না সেথায় যেথা প্রেমে অবহেলা।

যে ছিল সে স্মৃতি মাঝে নিদ্রায় মগন
জীবন্ত সমাধি আমি কাঁদি অকারণ
জীবন যা—মরিয়াছে
মৃত্যু সুধু-জেগে আছে—
সাধিলে কি মৃত্যু কাছে—মিলিবে জীবন
হারায়েছি যারে—তার বৃথা অন্বেষণ।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

আকুলতা।

কেন এই আকুলতা মরমের মাঝে গো,
ভাবের লহরী পরে অজানা উছাস।
শীতের কুয়াশা দিনে, অস্ফুট হৃদয় বনে,
কোথা হতে ব'হে আসে বসন্ত বাতাস।
প্রাণের ভগন ঘরে, কেন গো, কিসের তরে
সহসা পড়িল মৃদু জ্যোছনা আভাস ?
বিশুষ্ক পতিত চিতে আকুলতা জাগাইতে,
কে আনিল, কোথাকার কুসুম সুবাস ?
নিভৃতে পাতার আড়ে, লুকাইযে অন্ধকারে,
কোন্ পিক দিযে সাড়া থামিল আবার,
আধ মৃদু তার গান, ভরেছে ঘুমন্ত প্রাণ,
মেলিতে অলস আঁখি পারিনা যে আর।
কি এক স্বপনে হায়। পরাণ ভাসিয়ে যায়
ভাঙ্গিয়া হৃদয স্তর আকুলতা স্রোত বয়।
কেন এই আকুলতা, কেন এ নীরব ব্যথা,
কিছুই বুঝিতে নারি,—বিপ্লব পরাণময।

শ্রীবিনয় কুমারী বসু।

বসন্ত ফুরাযে গেল ?

কথন বসন্ত এসে
সেজেছিল নব বেশে
কথন ফুটিল ফুল
বহিল মলয বায় ?
পিউ পিউ তান ধরে
পাপিয়ারা গান করে
কুহুরবে নবলতা
শিহরে কোমল কায় ?
গুণ গুণ অলিকুল
আড়ে চায বনফুল
নিকটে আসিলে কাঁপে
হেঁসে অলি উড়ে যায়।
কথন বসন্ত এল
কথন চলিয়া গেল
কথন ফুটিল ফুল
ভরা ভরা লতিকায় ?
আমার হৃদয় মন
ধ্যানে ছিল নিমগন

প্রিয়ের প্রেমের ছবি
দিবা নিশি অবচনে।
অনমনে এক যোগে
নিনিমেষ সুখ ভোগে,
কেটেছে রজনী দিন
জাগরণ সুস্বপনে।
ফুল তুলে মালা গেঁথে,
কাননের পথে পথে,
করিনি যে সখি খেলা
ফুলদের চুমি চুমি।
একিসের ঘুমের ঘোর,
একিসে স্বপন মোর,
অথবা সে নাহি এল,
না শোভিল বনভূমি।
মালা গাঁথা নাহি হোলো,
মালা দে'য়া নাহি হোলো,
আসিল বসন্ত আর
অমনি চলিয়া গেলো।
বিবাহের বারি ধারা
ঝটিকা করকা তারা
গিয়ে কেন নাহি যায
যেই এলো সেই এলো?

শ্রীবণ কুমারী।

মিলন।

(১)
সংসারে প্রবাসী মোরা সবে,
বাস মোদের অনন্তের তীরে,
এক দিন থাকিয়া এ দেশে,
পর দিন যাই ঘরে ফিরে।

(২)
পান্থশালে সকলের সনে
দেখা শুনা নাহি কভু হয়,
কিন্তু সমধর্ম্ম দুটী আত্মা
দূরে থেকে করে পরিচয়।

(৩)
বীণা যন্ত্রের তন্ত্রীর মত,
বাজে যখন একটী প্রাণ,
উল্লঙ্ঘিয়া সংসার প্রাচীর,
দ্বিতীয়টী ধরি লয় তান।

(৪)
পথ ভুলে যায় যদি চলি
অদৃষ্টের ঘোর আবর্ত্তনে,
পরাণটী জাগিয়া সদা
নীরবেতে খেলে তার সনে।

(৫)
সত্য, ধরার বিজ্ঞানে তারা
ভ্রমে দুই প্রতিকূল তীরে,
স্থান আর কাল মাঝে আসি
বিচ্ছেদ জন্মায় পরস্পরে।

(৬)
যবনিকার অপর পারে,
নাহি স্থান, কাল ব্যবধান,
সেথা বিযোগেতে হয় যোগ
হরণেতে রহেছে পূরণ।

(৭)
ক্রুর বিচ্ছেদ শকুনী কভু,
রক্ত মাংস করেনা ভক্ষণ,
বন্ধু মিশে একের করালে,
চির দিন অনন্ত মিলন।

শ্রীরজনী নাথ নন্দী

কি সাধে রব!

দিনের পর রা'ত হ'তেছে,
রা'তের পর দিন,
আমার জীবন একই ভাবে,
বিষাদে মলিন।
হাসির পর কান্না আসে,
সুখের পরে দুখ।
চির দিন কেঁদে কেঁদে,
আমার ম্লান মুখ।

মা গিয়াছে, বাপ গিয়েছে,
ফেলে মোরে একা,
বন্ধু-বান্ধব সব গিয়েছে,
আর না হবে দেখা।
বাগানেতে ফুল ফুটেছে,
সৌরভ গেছে ছুটে।
এমন সৌরভ নাই আমাতে
মানুষ-অলি জুটে।
কি সাধেতে রব তবে
এ ভবেতে আর,
জুড়াই গিয়া জীবন জ্বালা
যথা মা আমার।

শ্রীভুবন মোহন দাস।

আর কেন ?

আর কেন বিফল রোদন ?
কাঁদায়েছ, কাঁদিযাছ ঢের ,
এস সখি করি উদযাপন,
এই খানে ব্রত আমাদের।
এই মুছিলাম অশ্রুজল,
ম্লান মুখে ফুটাইনু হাসি,
বিস্মৃতির পাষাণ চাপনে—
ঢাকিলাম বিষাদের রাশি।
মুদিলাম নয়ন পল্লব,
ফিরাইয়া লইলাম মুখ,
হৃদয়ের গুহাতল হ'তে
উপাড়িয়া ফেলিলাম দুখ।
ভাঙ্গিলাম জীবন-শয্যার
স্বপ্নময় মোহময় ঘুম ;
যে অনলে দগ্ধ কলেবর
আজি তাহা হইল নির্ধূম !
যাও, সখি, সেই পথে যাও,
যে পথে হবেনা আর দেখা,
যে পথে কেবলি অন্ধকার
একটীও নাই আলোরেখা।
দেবে, যদি দেখা হয় কভু,
মুখ ঢেকে যেও পলাইয়া,
এক বিন্দু নীরব নিশ্বাস
বাতাসেরে যেও বিলাইয়া।
সে নিশ্বাস ভেসে ভেসে এসে
যেমন লাগিবে মোর গায়
যেন সেই নীরব নিশ্বাসে
এ প্রাণ তখনি মিশে যায়।

শ্রীযদুনাথ ঘটক

সমাধি।

আজি হোতে আমি যে গো ভুলে যাব ভালবাসা;
আজি হোতে আমি যেগো ভুলে যাব কাঁদা হাসা।
তারকার বিষ হাসি হেরিব না মুখ তুলে ;
আকাশের ইন্দু ছিঁড়ি ডুবাব সিন্ধুর জলে।
বিদ্যুৎ কাড়িয়া লব নীরদের কোল হ'তে ;
বিষাদে কাঁদিবে সুধু নীরবে আকাশ পথে।
গোধূলির রবিকরে উড়াব মেঘের ধূলা ,
বিহগের কণ্ঠ কাটি জুড়াব প্রাণের জ্বালা।
মুখে মৃদু হাসি মাখা প্রাণে জাগে কপটতা,
এরূপ বনের যত রাক্ষসী কুসুম লতা ,
তাদিগে দলিয়া যাব আপনার দুই পায়,
আর কিছু রহিবে না, র'বে সুধু হায় হায়।
গম্ভীর অম্বরতল ভেদি সেই হাহাকার,
আকাশের গ্রহতারা করিবে গো চুরমার।
সে মহা ধ্বংসের পরে দাঁড়ায়ে ধরিব তান ;
চরাচর কাঁপাইয়া গাহিব প্রলয় গান।
গাহিব গো উচ্চৈঃস্বরে—"হৃদয় নাহিক হেথা,
আঁখি জল হা হুতাশ কেবলি কথার কথা,
হেথায় নাহিক কভু প্রেম আর সুখ আশা,
হেথায় নাহিক তাহা যারে কহ ভালবাসা।"
—এই গানে করিব গো অযুত রজনী ভোর,
শেষে এই ধ্বংস মাঝে লভিব সমাধি মোর।

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র সেন।

প্রাণোৎসর্গ।

কি ছার এ প্রাণ

জলের বুদ্‌বুদ প্রায়, বায়ুতে মিশিয়া যায়
ক্ষণেক লহরী কোলে, মলয় অনিলে দোলে
আবার মুহূর্ত্ত পরে হয় অন্তর্দ্ধান।

অসার ভৌতিক দেহ, প্রাণের বাসের গেহ
ক্ষিতি অপতেজসনে, মিশি যায় ক্ষণে ক্ষণে
এ অসার জড়পিণ্ড রহি ক্ষণ কাল।

অসার ইন্দ্রিয় গ্রাম, ক্রোধ লোভ মোহ কাম
করে তারে বিচলিত, চিরতরে কলুষিত
বহিয়া পাপের বোঝা বিষম জঞ্জাল।

অসার সংসার মায়া, পুত্র মিত্র বন্ধু জায়া
আজি যার সনে দেখা, কালি কোথা নাহি লেখা
তাহাদের তরে কেন করি বিসর্জ্জন।

অসার পার্থিব ধন, স্বর্ণ রৌপ্য প্রলোভন
বালক খেলনা প্রায়, নয়ন ঝলসে যায়
যাবতরে দেহ মন পাপে নিমগন।

অসারের মাঝে থাকি, অসার সঞ্চিয়া রাখি
অনিত্য সম্পদ লয়ে, নিরন্তর ব্যস্ত হয়ে
অশ্রু জলে ভাসি চির লইব বিদায়।

এই কি নিয়তি হায়, এরতরে এত দায়
সংসার সর্ব্বস্ব করি, ক্ষণে তাহা পরিহরি
নিরালম্ব নিঃসহায় নিরাশ্রয় প্রায়।

এ সকল পরিহরি, কি ধন আশ্রয় করি
প্রবল ইন্দ্রিয় দ্রোহ, কাম ক্রোধ লোভ মোহ
রোধ করি স্বর্গধামে করিব গমন।

না রবে মৃত্যুর ভয়, শোক দুঃখ করি জয়
উচ্চসংকল্পের রথে, চলিব স্বর্গের পথে
এছার পরাণ পাবে নবীন জীবন।

অনিত্য শরীর সহ, দেখ কত অহরহ
মুক্ত আত্মা অগণন, যুঝিতেছে অনুক্ষণ
অনুক্ষণ মরণেরে করি পরাজয়।

ইন্দ্রিয়েরে জয় করি, আকাঙ্ক্ষা ঘোটকে চড়ি
চির উন্নতির রথে, চলিছে মহত্ত্ব পথে
বিপক্ষে সপক্ষ করি মানব নিচয়।

ভুতবলে ভুতে বান্ধি, নরের নয়ন ধান্ধি
মহান ব্যাপার কত, সাধিতেছে অবিরত
এক এক মহাজন পুরুষ প্রধান।

এ কি উপাদানে গড়া, এ কি এই বসুন্ধরা
তবে কেন হেনমতে, চলিব নৈরাশ্য পথে
কি কারণে বলি তবে অসার পরাণ।

এ প্রাণ অসার নয়, মানবাত্মা মহাশয়
অনন্ত শকতিপানে, যাইবে পুণ্যের যানে
বিরোধী শকতি গণে করি পরাজয়।

নিজে চিনি একবার, যদি করে হুহুঙ্কার,
পাহাড় পর্ব্বত চয় পদাঘাতে চূর্ণ হয়,
সমুদ্র অতল স্পর্শ গণ্ডূষে বিলয়।

কেন ভীরু হীনবল, বিলাপে কি হবে ফল,
উঠ হুহুঙ্কার করি, অলসতা পরিহরি,
অবশ্য মহত্ত্ব প্রাণে হইবে উদয়।

ধর বল কর পণ, যুঝিতে সম্মুখ রণ
পাপ প্রলোভন সনে, দমি বাধা বিঘ্নগণে
অবশ্য পাইবে রাজ্য অনন্ত অক্ষয়।

নাহি কি জীবনে বল, হীনতেজ পেশীদল?
ইন্দ্রিয় শৃঙ্খলে পড়ি, করিতেছ জড়াজড়ি?
অনন্ত শকতি নামে করবে হুঙ্কার।

এ ধরণী কর্ম্মক্ষেত্রে, দৈবতেজ ধরি নেত্রে,
কররীর্য্যে আস্ফালন, করবে জীবন পণ
অনন্ত শকতি পাবে বিক্রম অপার।

উৎসর্গ করহ পান, হও তেজ বলবান্
ছাড়ি মোহ ছাড়ি ভয়, গাইয়া সত্যের জয়
সত্যের প্রতিষ্ঠা তরে কর প্রাণপণ

নহেরে অসার প্রাণ, নহে হীনজন দান
নয় আত্মা হীনবল, অসার এ ভুমণ্ডল
আমরাও হ'তে পারি পুরুষ প্রধান

শ্রীপ্যারিশঙ্কর দাস গুপ্ত।

বিদায়।

তোমরা ভুলিয়া যদি যাও
তবু স্মৃতি কাতর পরাণে,
সজল নয়ন দু'টি তুলে,
র'বে চেয়ে তোমাদেরি পানে।
তোমাদের হৃদয়ের ছায়
স্নেহ ফুল, লতায় পাতায়,
বেঁধেছিনু খেলাবার ঘর,
কেমনে ছাড়িব তারে আজ
তাই প্রাণ বড়ই কাতর।
দিন যাবে, মাস যাবে কত।
সে কুটীরে আর কত শত
দীন আসি লইবে আশ্রয়,
দিন যাবে, মাস যাবে যত
অভাগার প্রতিচিহ্ন তত
ক্রমে বুঝি পাইবে বিলয়।
সে কুটীরে এখনো যেমন
হাসে মৃদু জ্যোছনা চাঁদের,
আশে পাশে ফুটে শত ফুল
বিলাইয়া সুরভি তাদের—
তখনো ফুটিবে ফুল
তখনও রহিবে জ্যোছনা,
তোমাদের র'বে সেই সব
আমিই সেথায় রহিব না।
আমার সে মধুর আলয়
আর যে আমার রহিবে না।
ভেবে তাই কেন গো কি জানি
নয়নে আসিতে চায় জল,
প্রাণ যেন সহসা কেমন
হয়ে আসে কাতর দুর্ব্বল।

ছেড়ে যে'তে চাহেনা পরাণ
তবু আজ চলিনু ছাড়িয়া
প্রতি পদে ফিরে ফিরে চাই—
যে'তে যে'তে ভুলিয়া দাঁড়াই,
অশ্রু ছুটি আসে গড়াইয়া।

দূরে কোন বিদেশে বিজনে
প্রবাসী দাঁড়ায়ে ম্লান মুখে,
একটি নয়ন জল ফেলে,
একটি সুদীর্ঘ শ্বাস তুলে
ফিরে চায় আপনের দিকে।

প্রবাসী এ হৃদয় আমার
তেমনি, যেখানে গিয়ে থাক্,
যাহা আছে কপালে তাহার
মহা সুখ—মহা দুঃখ পাক্
নিস্তব্ধ সন্ধ্যার আঁধারে
অবসন্ন উদাস অন্তরে,
পরবাসে সজল নয়নে,
প্রতি দিন—প্রতি দিন সে যে
চাহিবে ও কুটীরের পানে।

তোমরা ভুলিয়া যদি যাও
তাহার রহিবে সদা মনে।

শ্রীকিশোরী লাল গুপ্ত

চিতায় চিতায়। *

বড় ব্যথা পেয়েছিল ও—
হৃদয়ে জ্বলিত শত চিতা,
চিতায় চিতায় আজি মিশে,
নির্ব্বাণ হইল ওর ব্যথা।
পরাণের অনন্ত শ্মশান,
শ্মশানের ছাই হয়ে গেছে।
হৃদয়ের অনন্ত যাতনা,
যাতনা সমুদ্রে নিবে গেছে।
সহস্র স্নেহের পরশনে,
নিবেনি যে প্রাণের বেদন;

---

* একটী বিধবার মৃত্যু উপলক্ষে।

আজি তাহা চিতার আগুনে,
একেবারে হয়েছে নির্ব্বাণ।
এতদিন অবিশ্রান্ত জ্বালা,
অহোরাত্র দিতেছিল ব্যথা;
এখন সে অবসর লয়ে,
শান্তিকে পাঠায়ে দেছে তথা।

কাঁদ কেন আর তার তরে,
ডাক কেন মর্ম্মভেদী ডাক্—
সে যেখানে গিয়াছে চলিয়ে,
বড় সুখে আছে থাক্ থাক্।

শ্রীমতী সরলা বালা দাসী

প্রাচীন বংশ বিবরণ। (৪)

(২৫৭ পৃষ্ঠার পর।)

নিধ্রুবি।

নিধ্রুবি সঙ্কলিত বেদাংশ, ৯ মণ্ডলের অন্তর্গত ৬৩ ত্রিষষ্টিতম সূক্তে ৩০ ত্রিশটি ঋকে নিবদ্ধ আছে। উহাতে গায়ত্রী ছন্দে সোমের স্তব প্রকটিত হইয়াছে। ইহার কুলোৎপন্ন নৈধ্রুবি হইতে অপ্সার ও কশ্যপের সংযোগে কশ্যপ গোত্র প্রচলিত হইয়াছে। ইঁহার বংশোদ্ভূত নৈধ্রুবের এক কন্যা জন্মে। তাঁহার নাম অজ্ঞাত। এই কন্যাই কশ্যপের প্রেয়সী।

অসিত ও দেবল।

অসিত দেবলের সংক্ষিপ্ত প্রসঙ্গ কিছু পরেই বলা যাইবে। এস্থলে কেবল প্রসঙ্গাধীন কিছু কিছু বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহার দুই জনে গায়ত্রী ও অনুষ্টুপ ছন্দে ১৫০ একশত পঞ্চাশটি ঋকে সোম ও আপ্রী দেবতার স্তুতি করিয়াছেন। এই দেবল ভিন্ন আর চারিটি দেবলের বিষয় অবগত হওয়া গিয়াছে। প্রাচীন বংশ বিবরণের দ্বিতীয় প্রস্তাবে দেবলগণের বিষয় দেখ।

(১) দক্ষের প্রপৌত্রের নাম দেবল। তিনিই সম্ভবতঃ স্মৃতিকর্ত্তা। দক্ষ আবার দুই জন—ব্রহ্মার তনয় দক্ষ, দশ প্রজাপতির মধ্যে এক জন। তিনি প্রসূর্ত্তির ভর্ত্তা। দ্বিতীয় দক্ষ, প্রাচীন বর্হিষের পৌত্র ও প্রাচেতার পুত্র।

(২) স্বনামখ্যাত ব্যাকরণকার পাণিনি মুনির পিতামহ এক দেবল।

(৩) বৃহস্পতির জনকও দেবল আখ্যায় পরিচিত। অঙ্গিরার সন্তান যে বৃহস্পতি, তিনি দর্শনবেত্তা। দেবল-পিতা বৃহস্পতি, তাঁহা হইতে পৃথক্।

(৪) বিশ্বামিত্র পুত্র এক দেবল।

কোন্ কোন্ ঋষি, কি ছন্দে কোন্ কোন্ দেবতার স্তুতি উচ্চারণ করিয়াছেন, সেই স্তবোক্ত বচন-পরম্পরা, বেদব্যাস-সংগৃহীত ঋগ্বেদ-সংহিতার কোন্ মণ্ডলের ও কোন্ সূক্তের অন্তর্গত, এবং কয়টি ঋকই বা তাঁহাদের বিচরিত; পাঠক-সাধারণের জানা উচিত, বিবেচনা করিয়া, পশ্চাৎ তাহারও একটি তালিকা দেওয়া গেল।

ঋকমন্ত্র-প্রণেতার নাম	কোন্ মণ্ডল	কোন্ সূক্ত	ঋকের সংখ্যা	দেবতার নাম	ছন্দের নাম
১। অসিত ২। দেবল	৯ নবম	৫ হইতে ২৪ সূক্ত পঞ্চম হইতে চতুর্বিংশতিতম সূক্ত	১৫০ দেড়শত	আপ্রি, পবমান সোম	গায়ত্রী, অনুষ্টুপ
৩। নিধ্রুবি	ঐ	৬৩ নিষষ্টিতম	৩০ ত্রিশটি	পবমান সোম	গায়ত্রী
৪। বেভ, ৫। স্নূনু	ঐ	৯৯ ও ১০০ নবতিতম ও শততম	১৭ সতবটি	ঐ	বৃহতী, অনুষ্টুপ
৬। অপ, ৭। সবঃ	ঐ	১০৪ চতুবধিক শততম	৬ ছয়টি	ঐ	উষ্ণিক
৮। অবৎসাব	ঐ	৫৩—৬০ ত্রিপঞ্চাশত্তম সূক্ত হইতে ষষ্টিতম সূক্ত	৩২ বত্রিশটি	ঐ	গায়ত্রী, পুবউষ্ণিক
৯। ভূতাংশ	১০ দশম	১০৬ ষডধিক শততম	১১ এগাবটি	অশ্বিদ্বয়	ত্রিষ্টুপ
১০। বিবৃহা	ঐ	১৬৩ ত্রিষষ্ঠ্যধিক শততম	৬ ছয়টি	যক্ষ্মা ব্যাধি	অনুষ্টুপ

বেভ ও স্নূনু।

অসিত ও দেবলেব ন্যায়, বেভ ও স্নূনুব সম্মিলিত চেষ্টায় কতকগুলি ঋক প্রণীত হয়। সে গুলি, ৯ নবম মণ্ডলেব ৯৯ ও ১০০ নিরনব্বুই ও একশত সূক্তেব অন্তর্গত। সমুদায়ে ১৭ সতবটি ঋক অর্থাৎ শ্লোক তাঁহাদেব যুগলের বিবচিত। সোম দেবতার উদ্দেশে বৃহতী ও অনুষ্টুপ ছন্দে মন্ত্রগুলি উচ্চাবিত হইয়াছিল।

অপ্ ও সরঃ।

অসিত ও দেবল এবং বেভ ও স্নূনুব ন্যায় ইঁহাদেরও উভয়েব উদ্যোগে ৯ নবম মণ্ডলেব ১০৪, চতুরধিক শতম সূক্তেব ৬ ছয়টি ঋক সোমেব উদ্দেশে উষ্ণিক ছন্দে বচিত হয়। কোন কোন লোকেব মতে উক্ত মন্ত্র ৬ ছয়টি নাবদ ও পর্ব্বত নামক ২ দুই জন ঋষিব বাক্য।

অপ্সার।

অপ্ ও সবঃ ঋষি-দ্বিযেব বংশেই বোধ হয়, অপ্সাবেব জন্ম হইয়াছিল। তিনি কাশ্যপ-গোত্রীয়। কতকগুলি লোকেব অনুমান, অপসার ঋষি, অপ ও সরঃ এই উভয় মহর্ষির কুলে সমুৎপন্ন। আনুমানিক যক্তি অলীক বা অমূলক নয়।

অবৎসার।

অবৎসার কর্ত্তৃক ৯ নবম মণ্ডলের

৫৩ হইতে ৬০ ত্রিশপঞ্চাশত্তম সূক্ত হইতে ষষ্টিতম সূক্ত সঙ্কলিত হয়। সোম দেবতার স্তুতির কারণ গায়ত্রী ও পুরউষ্ণিক ছন্দে ৩২ বত্রিশটি মন্ত্র ঐ সূক্তে গ্রথিত আছে।

ভূতাংশ।

১০ দশম মণ্ডলের ১০৬ ষষ্ঠাধিক শততম সূক্তের ১১ এগারটি ঋক্ ত্রিষ্টুপ ছন্দে ভূতংাশ ঋষি, অশ্বিদ্বয়ের স্তব করেন।

বিবৃহা।

বিবৃহার প্রণীত মন্ত্র, ১০ দশম মণ্ডলের ১৬৩ ত্রিষষ্ট্যধিক শততম সূক্তে ৬ ছয়টি ঋকে অনুষ্টুপ ছন্দে নিবদ্ধ আছে। যক্ষ্মারোগ নিবারণার্থ ঋষি কর্তৃক উক্ত বচনগুলি উচ্চারিত হইয়াছিল। বিবৃহা ঋষি, কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ব্যাধির উপশমের নিমিত্ত যে ঋক গুলি প্রস্তুত করেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

"তোমার দুই নেত্র, দুই নাসিকা-ছিদ্র, শ্রুতি-যুগল, শির, মস্তিষ্ক, চিবুক, রসনা, এই সমুদয় অঙ্গ হইতে যক্ষ্মাকে (স্বনাম-খ্যাত পীড়াকে) বিদূরিত করিতেছি। ১।

"তোমার গ্রীবাস্থ শিরা, স্নায়ু, অস্থি-সন্ধি, ভুজ-যুগল, স্কন্ধ-দ্বয়—এই সমস্ত অবয়ব হইতে, আমি রোগকে দূরীভূত করিতেছি। ২।

"তোমার ক্ষুদ্র নাড়ী, অন্ত্র-নাড়ী, হৃদয়-স্থল, বৃহদণ্ড, যকৃৎ, মূত্রাশয়াদি হইতে পীড়াকে তাড়াইয়া দিতেছি। ৩।

"তোমার জানু-দ্বয়, উভয় উরু, পার্ষ্ণি-যুগল (গোড়ালি) যুগ্ম-পদ-প্রান্ত, দুই নিতম্ব, কটি-প্রদেশ ও মল-দ্বার হইতে ব্যাধিকে দূরীকৃত করিতেছি। ৪।

"মূত্র-ত্যাগ-কারী পুরুষাঙ্গ, নখ, রোমাদি' অর্থাৎ সর্ব্বাবয়ব হইতেই রোগ দূরীভূত করিতেছি। ৫।

'তোমার সর্ব্বাঙ্গে—সন্ধি-স্থল, লোম ইত্যাদি যেখানে—কোন রোগ জন্মিয়াছে, আমি তাহা বিদূরিত করিতেছি।" ৬।—ঋসং ১০ম। ১৬৩ সূক্ত।]

কাশ্যপ (শণ্ডিল) এবং শাণ্ডিল্য।

কাশ্যপ, মরীচির বংশ-সম্ভূত। অঙ্গিরা ঋষির কুল, ইহার মাতামহবংশ। কাশ্যপের জনক কশ্যপ ঋষি, কিরূপ অপরিমেয়-সামর্থ্যশালী ছিলেন, ইতিপূর্ব্বেই তাহার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। নৈধ্রুব, কাশ্যপের মাতামহ। কাশ্যপের দ্বিতীয় বা প্রকৃত আখ্যা শণ্ডিল। শণ্ডিল এক জন প্রধান ঋষি ছিলেন।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি।

ভক্তিকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২৭৫। ভক্ত এত নত-মস্তক হইয়া গুরু-জনদিগকে নমস্কার করেন যে, নমস্ত ব্যক্তি তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ দেখিতে পান।

২৭৬। সত্যেতে যাহার প্রাণ সদা থাকে মগ্ন, তাহার চিত্ত হয় না কোন ভয়ে ভগ্ন।

২৭৭। কি হইবে পিণ্ড গো। আমার

এই অধম জীবনে, যদি না পারি থাকিতে সদা তব পবিত্র চরণে।

২৭৮। ব্রহ্মানন্দ ও প্রেমে সদা মগ্ন যাহার প্রাণ; সেই করে ভোগ তাঁহার মুক্ত জীবনদান।

২৭৯। ভক্ত জানেন যে তিনি যাহা বলেন, তাহা তিনি সেই সর্ব্বসাক্ষীর সম্মুখেই বলেন। তিনি তন্নিমিত্ত আপন কথানুসারে কার্য্য না করিলে পাপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হন। তিনি এই বিশ্বাসেরই জন্য আপনার অঙ্গীকার অনুসারে কার্য্য করিবার অভ্যাস করিতে বিশেষ যত্নশীল হন। অভ্যাসের ফল এতই মধুময় যে, যাহা বড় কঠিন বোধ হয়, তাহা তদ্গুণে সহজ হইয়া পড়ে। দয়াময় তাঁহার সন্তানগণকে কি আশ্চর্য্য ক্ষমতাই দিয়াছেন।

২৮০। রোগ ও পাপ হয় প্রাণেশ্বরের অবমাননার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও ফল।

২৮১। সুদীর্ঘ প্রশস্ত ও গভীর জলপূর্ণ নদী প্রশান্ত ভাব ধারণ করিলে যেমন তাহার অভ্যন্তরে সবেগে ও প্রায় নীরবে তদীয় প্রবাহ প্রবাহিত হইতে থাকে, সেইরূপ ভক্ত জীবনের প্রেমনদী স্থিরভাব ধারণ করিলেও তদভ্যন্তরে প্রেমের স্রোত নীরবে অথচ সবেগে বহিতে থাকে।

২৮২। শান্তি বিনা কেহ পারে না ভোগ করিতে প্রাণ নাথের বিমল, অনুপম, মঙ্গল পূর্ণ অভয় দর্শন, ও তাঁহার পরমানন্দ, পরমামৃত, পরম মঙ্গল, পরম পবিত্রতা ও পরম শোভা। অশান্ত যাহার মন প্রাণ, সে দুর্ভাগা এ সকল নিত্য সুখে বঞ্চিত হইয়া সদা হাহাকার রবে রোদন করে।

২৮৩। ঋষি জীবন স্থান, কাল ও সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ নহে। সকল দেশেও জাতিতে অল্পাধিক উহা দৃষ্ট হয়। যিনি স্বার্থ ত্যাগ করিয়া মঙ্গলময়ের সত্য, নিত্য, মঙ্গল পূর্ণ অভয় চরণে বাস করিয়া আপনার শরীর মনের সুস্থতা, নির্ম্মলতা ও তাঁহার জ্ঞান জ্যোতি, আনন্দ, অমৃত, শান্তি মঙ্গল, পবিত্রতা ও শোভা ভোগ করেন, আর পরের নিত্যোন্নতি ও মঙ্গল সাধনে যত্নশীল থাকেন, তিনিই ঋষি।

২৮৪। এই অনিত্য সংসারের নানা অনিত্য কার্য্য সাধন জন্য মানব ও মানবী বিভিন্ন বাহ্যিক অনিত্য আকার ধারণ করে, কিন্তু তাহাদিগের নিত্য জীবনের গঠন একই প্রকার। অর্থাৎ তাহাতে স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ নাই। সেই ভেদবিহীন জীবনের দিকে যে তাহার নয়ন মন সদাস্থির রাখিবার অভ্যাস করে, সেই পারে সত্যের জ্যোতি সাক্ষাৎ করিতে দর্শন। তাহারই ভেদাভেদ-জ্ঞান ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হয়, ফলতঃ শারীরিক জীবনাপেক্ষা আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে যাহার মন প্রাণ যতই অধিকতর পরিচালিত হয়, সে ততই সত্যের আলোকে ধর্ম্মের উচ্চতর সোপানে উত্থান করিতে পারিয়া, ইহ ও পর জীবনের জীবনদ্বয়ের পবিত্রতা ও মঙ্গল সাধনে সমর্থ হয়। এ সংসারে সকলই নিত্য, প্রাণের নিত্য চক্ষু দিয়া দেখিবার অভ্যাস করা বড়ই প্রয়োজন।

২৮৫। যাহাতে অনাদি, অনন্ত, সত্য-স্বরূপের জ্যোতি প্রতিভাত নাই, যাহা অসত্য বলিয়া অভিহিত, তাহাই পাপ।

২৮৬। মানুষ এতই স্বার্থপরতাধীন যে, সে তাহার জীবনের উচ্চতম কর্ম্ম ধর্ম্ম-সাধন অথবা তৎ প্রচার কালেও তদীয় অধীন হইয়া চলে। সে তোমার নিকট

কর্ত্তব্য পালন জন্য, উপস্থিত হয় না, কিন্তু এই দুই কার্য্যের মধ্যে একটীতেও কিছু মাত্র সহায়তা পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে অনায়াসে আগমন করিবে। যিনি ঈদৃশ স্বার্থ ত্যাগ করিতে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত রূপে ধর্ম্ম পথে পদচারণা করিতে পারগ হন, তাঁহারই জীবনে যথার্থ ঔদার্য্য, প্রেম ও পবিত্রতা দৃষ্ট হয়। যিনি যত কর্ত্তব্য জ্ঞানাধীন, তিনি তত স্বার্থ বিহীন। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞানের বল যতই বৃদ্ধি হয়, ততই তাঁহার ভক্তি প্রেমাদি উচ্চতর বৃত্তি সকল বিশুদ্ধতা লাভ করে।

২৮৭। পুত্রেরা যখন তাহাদিগের মৃত পিতা মাতার সদ্গতির জন্য ও তাঁহাদিগের প্রতি আপনাদিগের শ্রদ্ধা ও ভক্তি উত্তেজিত রাখিবার উদ্দেশে তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, তখন তাহারা তাঁহাদিগের জীবিতাবস্থার সদাচরণে রত থাকিয়া নানা পুণ্যানুষ্ঠান করিলে তাঁহাদিগের জীবদ্দশায় তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ করিবার ফল লাভ হয়। সুতরাং সেই শ্রাদ্ধই অধিকতর শ্রেয়স্কর। অতএব পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিতে থাকিতে পুত্রগণের ঐরূপে তাঁহাদিগের শ্রাদ্ধ করাই অধিকতর কর্ত্তব্য।

২৮৮। যাঁহারা ভৃত্যদিগকে শিষ্য সম না দেখেন, তাহাদের সঙ্গে তাঁহাদিগের ব্যবহার বিশুদ্ধ হওয়া বড়ই কঠিন।

২৮৯। ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থান, কাল, গ্রন্থ, ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ নহে। যাহা যখন যেখানে যাহাতে সত্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইবে, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম।

২৯০। উন্নতিশীল মানব প্রাণের অনন্ত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করিতে অনাদি, অনন্ত ও পূর্ণ মঙ্গল স্বরূপ বিনা, সৃষ্ট, ক্রমোন্নতি ও আপেক্ষিক নিত্যতা প্রাপ্ত কোন দেব বাচ্য জীবের সাধ্য নাই। মানবের অভ্রান্ত ও অনন্ত জ্ঞান, প্রেম, ও পবিত্রতা দাতা, সেই একমেবাদ্বিতীয়ং বিনা কেহই হইতে পারেন না।

২৯১। ব্রহ্মাণ্ডপতি যখন মানবের আধ্যাত্মিক জীবন নিত্য করিয়াছেন, তখন তিনি তাহা পবিত্র করিতে বাধ্য। কারণ পবিত্রতা বিনা নিত্যতা হইতে পারে না। তিনি কখন কোন্ ব্যক্তিকে স্থায়ী পবিত্রতা দান করিবেন, তাহা তিনিই জানেন।

২৯২। সদাচরণ করিয়া তাহার গৌরব না করাই যথার্থ গৌরব।

২৯৩। আপনার ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা, অভ্রান্ত জ্ঞান, অপার প্রেম, ও অপাপবিদ্ধ পবিত্রতার অধীন করাই এক মাত্র ধর্ম্মানুমোদিত যথার্থ স্বার্থ সাধন।

২৯৪। ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সার সংগ্রহ। ব্রাহ্ম মাত্রেই এই ধর্ম্মসারগ্রাহী ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। ব্রাহ্মগণ যেন এই মহৎ ব্রত পালনে যাবজ্জীবন প্রাণগত যত্ন করিতে সমর্থ হন।

২৯৫। যতই হয় উন্নত মানবের অনন্ত উন্নতিশীল নিত্য জীবন, ততই সে পায় শোভনতমের সুন্দরতর সুন্দরতম দরশন।

২৯৬। আত্মন, যতই তুমি করিবে তোমার নিত্য উন্নতির পর উন্নতি লাভ, ততই তব হইবে ভোগ পবিত্রতমের গাঢ়তর গাঢ়তর সহবাস।

২৯৭। হে মঙ্গলময়, আমার, এই প্রার্থনা, জ্ঞান, বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম ও পবিত্রতা, আর চিন্তা, বাক্য, কার্য্য ও ব্যবহার সম্পূর্ণ রূপে ও নির্ব্বিশেষে তব পবিত্রতম চরণাধীন কর।

২৯৮। ব্রহ্ম দর্শন বিনা মানব জ্ঞানের তৃপ্তি নাই। যতক্ষণ জ্ঞানময়ের জ্যোতি মানব জ্ঞানে প্রতিভাত না হয় ও সেই প্রকাশিত জ্যোতিতে সে তাঁহার জ্ঞানময দর্শন না পায়, ততক্ষণ তাহার জ্ঞানের তৃপ্তি সাধন হয় না। ফলতঃ ব্রহ্মজ্ঞান লাভই মানব জ্ঞানের তৃপ্তি।

২৯৯। বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে কর্ত্তব্যের অনুরোধে অর্থাৎ রজনী যোগে সুস্থ শরীরে ও মনে প্রতিমাসে উপযুক্ত কালে এক বারের অনধিক সংসর্গ করিলে, জীবন দেবভাবাপন্ন হয়। আর পাশব বৃত্তির উত্তেজনায় অবৈধ রূপে ঐ কার্য্য করিলে, জীবন পশুবৎ হয়।

৩০০। যে শক্তির বলে অটল ভাবে ও প্রাণপণে ধারণ করে মনপ্রাণে সত্যস্বরূপের নিত্য সত্যদান, তাহার নাম বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বল যতই বৃদ্ধি হয়, ততই তাহার জীবন উন্নত হয়। বিশ্বাস রূপ জীবন্ত ও জ্বলন্ত শক্তি ধারণ করিলে আত্মা অপরাজিত হয়।

৩০১। ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিয়া অন্যূন তিন বৎসর কাল ধর্ম্ম সাধন করিবার পর ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে মধুময় ফলোৎপাদনের সম্ভাবনা। নতুবা বিষ উদ্গীরণ হইতে পারে।

৩০২। ব্রাহ্মোপাসক জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে দয়া করিবেন। ইহার অন্যথাচরণে তিনি পরব্রহ্মের ও আপনার অবমাননা করিয়া পাপগ্রস্ত হইবেন। তিনি যতই অসাম্প্রদায়িকতা ও উদারতা সহকারে দয়ার কার্য্য করিবেন, ততই তিনি তাঁহার যোগ্য আচরণে সমর্থ হইবেন।

৩০৩। যাঁহার অভাব নাই, সেই সুখী, যাঁহার যে পরিমাণে অভাব অল্প, তাহার সেই পরিমাণে সুখ অধিক।

৩০৪। সাধক যতদিন না মঙ্গলময়ের কৃপায় তাঁহার সাধনা করিতে করিতে তাঁহার মঙ্গলপূর্ণ সত্তা সাগরে মগ্ন হইয়া আপ্তকাম হয়, ততদিন সে তাহার সুনিয়মিত ও সুশাসিত জীবনের সকল প্রকার অভাব মোচন জন্য মঙ্গল দাতার নিকট প্রার্থনা করিতে বাধ্য।

৩০৫। পবিত্রস্বরূপের পবিত্রতর চরণ ছাড়া হইলে তুমি নিশ্চয়ই অপবিত্র হইবে। মুহূর্ত্ত কালের জন্যও তাঁহার বিশুদ্ধ সহবাস ত্যাগ করিও না।

৩০৬। সাধন বিনা লব্ধ জ্ঞান জীবনে পরিণত না হইয়া বিফল হয়।

৩০৭। ভারতবর্ষে ব্রহ্মোপাসনা উপনিষদ কালাবধি যেরূপে চলিয়া আসিতেছে, তাহা গুপ্ত ধর্ম্ম গ্রন্থ বিশেষে বদ্ধ ও ব্যক্তিগত। যাহাতে ব্রহ্ম সন্তানগণ মিলিত হইয়া প্রকাশ্যরূপে ও মুক্তভাবে অর্থাৎ জাতি, বর্ণ, সম্প্রদায় ও কোন একবিধ ধর্ম্ম শাস্ত্র নির্ব্বিশেষে পরব্রহ্মের উন্নতিশীল নিত্য জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সমর্থ হন, তাহারই জন্য ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহা যেন ব্রাহ্মগণ বিস্মৃত না হন।

শ্রীকানাইলাল পাইন।

মনু-সংহিতানুসারে অরজস্কা স্ত্রী-সহবাস দণ্ডনীয় কি না?

কন্যা কাহাকে বলে? যে স্ত্রীর বিবাহ হয় নাই, সে কন্যা।

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদযথাবিধি॥

মনু ৯। ৮৮

উৎকৃষ্ট, অভিরূপ ও সদৃশ বর পাইলে অপ্রাপ্তা হইলেও যথাবিধি উক্ত বরে কন্যা সম্প্রদান করিবেক।

যে অর্থে বর কন্যা এই শ্লোকে ব্যবহৃত হইযাছে, বাঙ্গলা দেশের প্রচলিত ভাষায সেই অর্থে বর কন্যা শব্দ অদ্যাপি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিবাহের সম্বন্ধের কথা উঠিলেই বর কন্যা শব্দ ব্যবহৃত হয।

"অপ্রাপ্তামপি তাং কন্যাং'—বিবাহ যোগ্য বযস না হইলেও বালিকাকে কন্যা শব্দে অভিহিত করা যায।

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যার্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায কর্হিচিৎ॥

মনু ৯। ৮৯

কন্যা ঋতুমতী হইয়া আমরণ পিতৃগৃহে থাকুক, তথাপি তাহাকে কদাপি গুণহীন পাত্রে সমর্পণ করিবে না। সুতরাং ঋতুমতী না হইলে তাহাকেও কন্যা বলা যাইতে পারে।

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিং॥

মনু ৯। ৯০

কুমারী ঋতুমতী হইয়া তিন বৎসর কাল অপেক্ষা করিবে, (পিতা তাহাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করেন কি না)। এই সময় অতিক্রান্ত হইলে স্বয়ং সদৃশ পতি গ্রহণ করিবে।

এই স্থলে যে স্ত্রী ঋতুমতী হয় নাই, তাহাকে কুমারী শব্দে অভিহিত করা হইযাছে।

অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদ্ যদি স্বযম্।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যং সাধিগচ্ছতি॥

মনু ৯। ৯১

অদীযমানা স্ত্রী স্বযং ভর্ত্তা বরণ করিলে, তাহাকে কোন দোষ স্পর্শ করে না, অথবা যাহাকে সে বরণ করে, সেও কোন প্রকারে দোষী হয না।

এই অদীযমানা আগতার্ত্তবা স্বয়ংবরা স্ত্রী কন্যা কি কুমারী শব্দের বাচ্য, এই শ্লোক হইতে তাহা নির্দ্ধারণ করা যায না। কিন্তু বক্ষ্যমান শ্লোকে তাহার মীমাংসা করা হইযাছে।

অলঙ্কারং নাদদীত পিত্র্যং কন্যা স্বয়ংবরা।
মাতৃকং ভ্রাতৃদত্তং বা স্তেনাস্যাৎযদিতং হরেৎ॥

মনু ৯। ৯২

স্বযংবরা "কন্যা" পিতৃদত্ত কি মাতৃদত্ত কি ভ্রাতৃদত্ত কোন অলঙ্কার গ্রহণ করিবে না। তাহা গ্রহণ করিলে চৌর্য্য দোষে দোষী হইবে।

এখানে স্বয়ংবরা স্ত্রীকে কন্যা বলা হইযাছে। ঋতুমতী হইয়া তিন বৎসর অতিক্রম না করিলে স্বয়ংবরা হইতে পারে না। সুতরাং ঋতুমতী অনূঢ়া স্ত্রীও কন্যা শব্দের বাচ্য।

পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যংপুত্রং জনয়েদ্রহঃ।
তং কানীনং বদেন্নাম্না বোঢ়ুঃ কন্যাসমুদ্ভবম্॥

মনু ৯। ১৭২

পিতৃগৃহে গোপনে কন্যার যে পুত্র হয়, তাহাকে উক্ত কন্যা বিবাহকারী ব্যক্তির "কানীন পুত্র" বলা যায়। "কৌমার পুত্র" এইরূপ ভাষা ব্যবহৃত হয় নাই।

ঋতুমতী না হইলে গর্ভসঞ্চার হইয়া পুত্র জন্মিতে পারে না। সুতরাং ঋতুমতী দূষিতা অনূঢ়া স্ত্রীও 'কন্যা' শব্দে, এবং তদবস্থোৎপন্ন সন্তান 'কানীন' শব্দের বাচ্য হইয়াছে।

যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতে স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে যে, অবিবাহিতা স্ত্রী অনাগতার্ত্তবা হউক বা আগতার্ত্তবা হউক, তাহাকে 'কন্যা' বলা যায়।

কন্যা ঋতুমতী হইয়া বরং আমরণ পিতৃগৃহে থাকিবে, তথাপি তাহাকে গুণহীন বরে সমর্পণ করিবে না, মনুর এই বিধি। ঋতুমতী হইয়া অনূঢ়া থাকিলে কন্যার পাপ পথে পতিত হইবার সম্ভাবনা জানিয়া মনু লিখিয়াছেন।

যোঽকামাং দূষয়েৎ কন্যাং স সদ্যোবধমর্হতি।
সকামাং দূষয়ংস্তুল্যো ন বধং প্রাপ্নুয়াৎ নরঃ॥

মনু ৮। ৩৬৪

যে ব্যক্তি অকামা কন্যাকে দূষিত করিবে, তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে। যে ব্যক্তি সকামা কন্যাকে দূষিতা করিবে, তাহার প্রাণ বধ হইবে না, অন্য কোন দণ্ড হইবে। সকামা কন্যার সম্বন্ধে মনু লিখিতেছেন।

উত্তমাং সেবমানস্তু জঘন্যোবধমর্হতি।
শুল্কং দদ্যাৎ সেবমানঃ সমামিচ্ছেৎ পিতা যদি॥

মনু ৮।৩৬৬

'অধম ব্যক্তি যদি সকামা উত্তম বর্ণা কন্যা দূষিতা করে, তবে তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে। যদি সবর্ণা সকামা কন্যাকে দূষিত করে, তবে কন্যার পিতা ইচ্ছা করিলে সম্ভোগকারীর নিকট হইতে কন্যার শুল্ক আদায় করিতে পারেন।

সহস্রং ব্রাহ্মণো দণ্ডং দাপ্যোগুপ্তে তু তে ব্রজন্।
শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয় বিশোঃ সাহস্রোবৈ ভবোদ্দমঃ॥

মনু ৮।৩৮৩

ব্রাহ্মণ,গোপনে ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা সকামা কন্যা গমন করিলে, অথবা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য সকামা শূদ্রা কন্যা গমন করিলে তাহার সহস্র গুণ দণ্ড হইবে।

তবে মনু এই ব্যবস্থা করিলেন যে, অকামা কন্যা সম্ভোগে সেবমান ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড হইবে। কিন্তু সকামা কন্যা সম্ভোগে যদি কন্যা সবর্ণা হয়, তবে কন্যার পিতা ইচ্ছা করিলে সেবমান ব্যক্তির নিকট হইতে কন্যার শুল্ক আদায় করিতে পারিবেন।

যদি কন্যা উত্তম বর্ণা হয়, তবে সেবমান ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড হইবে। কিন্তু সকামা কন্যা অধমবর্ণা হইলে, সেবমান পুরুষের অর্থ দণ্ড হইবে।

এখন সকামা কন্যার দণ্ডের কথা হইতেছে।

কন্যাং ভজন্তীমৎকৃষ্টং ন কিঞ্চিদপিদাপয়েৎ।
জঘন্যং সেবমানন্তু সংযতাং বাসয়েৎ গৃহে॥

মনু ৮।৩৬৫

যে সকমা কন্যা উৎকৃষ্টবর্ণ পুরুষের সহিত ভোগ করিবে, তাহার কোন দণ্ড হইবে না। আর যে কন্যা নিকৃষ্টবর্ণ পুরুষ গমন করিবে, তাহাকে গৃহে বদ্ধ করিয়া শাসন করিতে হইবে।

কন্যা অর্থাৎ অনূঢ়া স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যত প্রকার দোষ হইতে পারে, অষ্টম অধ্যায়ে তাহার বিধি ব্যবস্থা করিয়া মনু একাদশ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন।

রেতঃ সেকঃ স্বযোনীষু কুমারীষন্ত্যজাসু চ।
সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু গুরুতল্পসমং বিদুঃ॥

মনু ১১।৫৯

ভগিন্যাদি স্বযোনি, কুমারী, অন্ত্যজা স্ত্রী, সখাপত্নী ও পুত্রবধূতে রেতঃপাত করিলে গুরুপত্নী গমন সমান পাপ হয়। গুরুপত্নী গমনে পাপের অতি গুরু শাস্তি প্রাণ দণ্ড।

অনেকে বলেন, এস্থলে কুমারী অর্থ অনাগর্ত্তবা স্ত্রীলোক। বিবাহ হউক আর না হউক, যে পর্য্যন্ত রজোদর্শন না হয়, সে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগকে কুমারী বলা যায়। আর রজোদর্শন হউক আর না হউক, যে পর্য্যন্ত বিবাহ না হয়, সে পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগকে কন্যা বলা যায়।

সকামা ও অকামা কন্যা সম্ভোগ করিবার দণ্ড বিবৃত করিয়া শাস্ত্রকার কুমারী সম্ভোগ অপরাধকে পুত্রবধূসম্ভোগ, ভগিনী সম্ভোগ, ও দুহিতৃ সম্ভোগ তুল্য বিধি দিয়াছেন। কন্যা সম্ভোগ করিলে সকল স্থানেই প্রাণ দণ্ড হয় না। অকামা কন্যা সম্ভোগে প্রাণদণ্ড হয়, কিন্তু সকাম কন্যা সম্ভোগে প্রাণদণ্ড হয় না, লঘুতর দণ্ড হয়। পুত্রবধূ সম্ভোগ করিলে অথবা ভগিনী সম্ভোগ করিলে কিম্বা কুমারী সম্ভোগ করিলে, ভগিনী, পুত্রবধূ ও কুমারী সকামাই হউক আর অকামাই হউক, অপরাধ প্রাণার্হ দণ্ড। শুধু তাহা নয়।

যোহকামাং দূষয়েৎ কন্যাং স সদ্যোবধমর্হতি।

মনু ৮।৩৬৪

যে পুরুষ অকাম কন্যা সংগম করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু ভগিনী সঙ্গম ও কুমারী সঙ্গমের প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বে আরো দণ্ড আছে।

গুরুতল্পাভিভাষ্যৈনস্তপ্তে স্বপ্যাদয়োময়ে।
সূর্ম্মীং জ্বলন্তীং স্বাশ্লিষ্য মৃত্যুনা স বিশুদ্ধ্যতি॥

মনু ১১।১০৪

স্বয়ংবা শিশ্নবৃষণাবুৎকৃত্যাধায় চাঞ্জলৌ।
নৈঋর্তীং দিশমাতিষ্ঠেদানিপাতাদজিহ্মগঃ॥

মনু ১১।১০৫

গুরুপত্নী-গমন পাপ সরল ভাবে ব্যক্ত করিয়া লৌহময় তপ্ত শয্যায় শয়ন করিবে এবং জ্বলন্ত লৌহময়ী প্রতিমূর্ত্তি আলিঙ্গন করিয়া মৃত্যুদ্বারা বিশুদ্ধ হইবে। অথবা স্বয়ং শিশ্ন ও মুষ্ক ছেদন করিয়া অঞ্জলিতে স্থাপন পূর্ব্বক মরণ পর্য্যন্ত অমন্দগতিতে নৈঋত দিকে গমন করিবে।

অকামা কন্যা সম্ভোগ অপেক্ষাও ভগিনী সম্ভোগ বা কুমারী সম্ভোগের গুরুতর দণ্ড।

অবস্থাভেদে সকাম কন্যার সম্ভোগের দণ্ডের তারতম্য আছে, কিন্তু ভগিনী সম্ভোগ ও কুমারী সম্ভোগের দণ্ড, সকাম ও অকাম উভয় স্থানেই সদৃশ।

এই সকল কারণ হইতে স্পষ্ট অনুমিতি হইতেছে যে, কুমারী ও কন্যা শব্দ মনু সংহিতার একার্থবাচক নহে। বিশেষতঃ মনু লিখিয়াছেন।

ত্রীণিবর্ষাণ্যু দীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তুকালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম্॥

মনু ৯।৯০

কুমারী ঋতুমতী হইলেও, তিনবৎসর কাল অপেক্ষা করিবে।

যে স্ত্রীলোকের রজোদর্শন হয় নাই, তাহাকে এস্থলে কুমারী বলা হইয়াছে। মনু অন্যত্র বলিয়াছেন—

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি—

মনু ৯।৩

স্ত্রীলোকদিগকে পিতা কৌমারে, ভর্ত্তা যৌবনে, এবং পুত্রেরা বার্দ্ধক্যে রক্ষা করিবেক। স্ত্রীলোকেরা কথনই স্বতন্ত্রা অর্থাৎ অরক্ষিতা হইয়া রহিবেক না।

এস্থলে স্পষ্টতঃ যৌবনারম্ভের পূর্ব্বকালকে কৌমার অর্থাৎ কুমারী অবস্থা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিবাহ যখনই হউক, যুবতী হইলে ভর্ত্তার রক্ষণে থাকিবে। ইতঃপূর্ব্বে অর্থাৎ দুহিতার কৌমার বয়সে পিতা রক্ষা করিবেন। এস্থলে যৌবনারম্ভের পূর্ব্বকাল যে কৌমার, তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে। এবং যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে স্ত্রীর রক্ষণভার স্বামীর কার্য্য নয়, তাহাও জানিতে পারিতেছি। মনু অন্যত্র বলিয়াছেন,

কালেঽদাতা পিতা বাচ্যোবাচ্যশ্চানুপযন পতিঃ।

মনু ৯। ৪

যথা সময়ে কন্যা সম্প্রদান না করিলে পিতার দোষ স্পর্শ হয়, এবং যথাকালে স্ত্রী গমন না করিলে স্বামী দোষ গ্রস্ত হয়েন। কন্যা সম্প্রদান করিবার উৎযুক্ত কাল কখন্ উপস্থিত হয়, তাহা এখন বিচার করিব না।

"বাচ্যোবাচ্যশ্চানুপযন পতিঃ।"

যথাকালে স্ত্রীগমন না করিলে পতির অপরাধ হয়। যে বয়সে স্ত্রীগমন করিলে সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই, অথবা স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব, মৃতবৎসাত্ব প্রভৃতি অতি শোচনীয় চিররোগ জন্মিতে পারে, তৎ সময়ে স্ত্রী সহবাস করিলে কখনই "যথাকাল স্ত্রীগমন করা হইল" এমন বলা যায় না।

অকালে স্ত্রীগমন করিবে না, ইহা মনুর স্পষ্ট ব্যবস্থা। কৌমারে পিতা রক্ষা করিবেক, এবং যৌবনে ভর্ত্তা রক্ষা করিবেন। সুতরাং স্ত্রীর যৌবনারম্ভের পূর্ব্বে স্ত্রীগমন করা মানব ধর্ম্ম বিরুদ্ধ।

বালিকাবিবাহ করিলেই অরজস্কা সহবাস করিতে হইবে, গর্ভাধান প্রথার এমন উদ্দেশ্য নয়। মনুর মতে অবস্থাভেদে অপ্রাপ্তা কন্যারও বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে, কোন কোন অবস্থায় বিবাহ সময় উপস্থিত হইলেও কন্যার বিবাহ দেওয়া উচিত নয়।

উৎকৃষ্টায়াভিরূপায় বরায় সদৃশায় চ।
অপ্রাপ্তামপি তাং তস্মৈ কন্যাং দদ্যাদ্ যথাবিধি॥

মনু ৯। ৮৮

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্‌গৃহে কন্যা ঋতুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ॥

মনু ৯। ৮৯

ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎকন্যাং হৃদ্যাংদ্বাদশবার্ষিকীম।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥

মনু ৯। ৯৪

উৎকৃষ্ট অভিরূপ সদৃশ বর পাইলে কন্যা অপ্রাপ্তা হইলেও তাহাকে সম্প্রদান করিবে। কন্যা ঋতুমতী হইয়া আমরণ পিতৃগৃহে থাকিবেক, তথাপি তাহাকে গুণহীন বরে সম্প্রদান করিবে না। ত্রিংশদ্‌বর্ষীয় পুরুষ হৃদ্যা দ্বাদশবার্ষিকী কন্যা বিবাহ করিবে, এবং চতুর্বিংশ বর্ষ বয়স্ক পুরুষ অষ্টম বর্ষবয়স্কা কন্যা বিবাহ করিবে। রজোদর্শনের প্রাক্‌কালই বিবাহ সময়। কিন্তু অবস্থা বিশেষে অর্থাৎ উপযুক্ত বর পাইলে অপ্রাপ্তকালে, এবং উপযুক্ত বর পাইতে বিলম্ব হইলে রজোদর্শনের পরও বিবাহ হইতে পারে, এমন কি রজোদর্শনের পর যদি কন্যা স্বয়ং স্বামী বরণ করে, তবে বর কি কন্যা কেহই দোষভাগী হয় না।

অদীয়মানা ভর্ত্তারমধিগচ্ছেদযদি স্বয়ং।
নৈনঃ কিঞ্চিদবাপ্নোতি ন চ যংসাধিগচ্ছতি।

মনু ৯। ৯১

মনুর মতে অপ্রাপ্তা কন্যার বিবাহ বিধি আছে। কিন্তু "অপ্রাপ্তা" বরের কুত্রাপি বিবাহ বিধি দৃষ্ট হয় না। মনু লিখিয়াছেন, চতুর্বিংশবর্ষ বয়স্ক পুরুষ অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা গ্রহণ করিতে পারে। ন্যূনকল্পে বরের চতুর্বিংশ বর্ষ এবং কন্যার বয়স অষ্টম বর্ষ বিবাহ বয়স, ইহাই মনুর বিধি। কিন্তু যৌবনের পূর্ব্বে স্ত্রীর স্বামি-সহবাস নিষিদ্ধ।

যে সকল ব্যক্তি মনুর শাস্ত্র মান্য করেন না, তাঁহাদের জন্য আমি লিখিতেছি না। অঙ্গিরা, স্পেন্সার প্রভৃতি স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ঋষির শ্রীচরণে যাঁহারা আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি আমার কোন বক্তব্য নাই। কিন্তু যাঁহারা মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে চরিত্র গঠন করিতে চাহেন, তাঁহাদের সুবিধার্থ মনুসংহিতা হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম। এই সকল শাস্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, কন্যার অষ্টমবর্ষের পূর্ব্বে, এবং বরের চতুর্বিংশ বর্ষের পূর্ব্বে বিবাহ ধর্ম্ম ও শাস্ত্রসঙ্গত নয়। বালিকা বিবাহ মানব শাস্ত্রসঙ্গত, কিন্তু বালক বিবাহ মানব ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ। অবস্থা বিশেষে গোবধও শাস্ত্রের বিহিত কার্য্য হইতে পারে; কিন্তু বালকের বিবাহ যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। রজোদর্শনের প্রাক্‌কালই কন্যার শাস্ত্রবিহিত বিবাহকাল। এই সময় অতিক্রান্ত হইলে পিতা পুত্রীর বিবাহবিষয়ে অমনোযোগী বলিয়া দোষার্হ হইবেন, কিন্তু এই দোষভয়ে কদাপি গুণহীন বরে কন্যা সম্প্রদান করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইবেন না। মনু বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন, অপ্রাপ্তকাল অর্থাৎ কন্যার কৌমার বয়সে পতি স্ত্রী সহবাস করিবেন না। কিন্তু যথাকালে অর্থাৎ স্ত্রী যৌবনপ্রাপ্ত হইলে স্বামী স্ত্রী সহবাস না করিলে প্রত্যবায় ভাগী হইবেন। মনু অপ্রাপ্তা কন্যার বিবাহ বিধি দিয়াছেন, কিন্তু তেমনি কুমারী স্ত্রী সহবাস করিলে ভগিনী সহবাস ও পুত্রবধূ সহবাস তুল্য গুরু অপরাধ হয়, তাহার বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। ভগিনী বা পুত্রবধূ সকামা হইলে অপরাধের লঘুতা হয় না, কুমারী স্ত্রী সহবাসেও তাহার সম্মতি আছে বলিয়া, দণ্ডের লঘুতা হয় না।*

চণ্ডালী সহবাস, কুমারী সহবাস, ভগিনী সহবাস, পুত্রবধূ সহবাস, এবং সখা-পত্নী সহবাস এবং গুরুপত্নী সহবাস শাস্ত্রকারের মতে অতি জঘন্য পাপাবহ কার্য্য। পূর্ব্বকালে এতাদৃশ পাপলিপ্ত পাষণ্ডের প্রাণদণ্ড হইত। চণ্ডালী সহবাসে এখন কাহারও কোন বিশেষ দণ্ড হয় না। কুমারী সহবাস তো ধর্ম্ম কার্য্যের মধ্যেই গণ্য। সখাপত্নী সহবাস যে জঘন্য কার্য্য, সে বিশ্বাসও শিথিল হইয়া আসিয়াছে। বাকী রহিলেন ভগিনী, পুত্রবধূ, ও গুরুপত্নী। অধোগতির স্রোত যেরূপ দ্রুতবেগে চলিতেছে, তাঁহারাও আর ৫০ বৎসর পর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না। তবে তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ন্যায় লোকের চেষ্টায় অধোগতির স্রোতঃ ফিরিতে পারে। রজস্বলা হইলে স্ত্রীর গর্ভাধান † এবং

* আমি মনু-সংহিতার যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই যে প্রকৃত ব্যাখ্যা, যদি কাহারও তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইয়া থাকে, তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বঙ্গবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত অভিমত পাঠ করুন্।

† স্ত্রীলোকের গর্ভ হইলে গর্ভাধান সংস্কার হওয়া উচিত, প্রথম রজোদর্শনে গর্ভাধান সংস্কার হওয়া ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধি নহে, দ্বিতীয় প্রবন্ধে এই বিষয় বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইবে।

ষষ্ঠ মাসে শিশুর অন্নপ্রাশন রীতি প্রচলিত রহিয়াছে। অন্নপ্রাশন হইলে কি শিশুকে মাতৃস্তন্য পরিত্যাগ করিতে হয়? না গর্ভাধান হইলেই স্ত্রীর শারীরিক অবস্থার প্রতি বিচার না করিয়াই স্ত্রী সঙ্গম করিতে হয়? শিশু যদি স্তন্য পরিত্যাগ করিয়া শুধু অন্নের উপর নির্ভর করে, তবে আমাশয়াদি হইয়া আশু মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। গর্ভাধানের পরই আশু গর্ভবতী হইয়া অস্মদ্দেশে অনেক স্ত্রী বন্ধ্যাত্ব,মৃতবৎসাত্ব প্রাপ্ত এবং প্রথম প্রসব চেষ্টায় মৃত্যুমুখে পর্য্যন্ত পতিত হইতেছে।

ভগিনী সহবাস ও অরজস্কা স্ত্রী সহবাস যে মানব ধর্ম্মানুসারে প্রাণদণ্ডের যোগ্য, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন, রাজা বিদেশী, বিশেষতঃ অপর ধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং দণ্ডের ভার রাজার উপর সমর্পণ না করিয়া আমরা স্বয়ং সমবেত চেষ্টায় কুমারী স্ত্রী সেবমান ব্যক্তির শাসন বিধান করিব, অথবা অনৃতু-মতীর বিবাহ রহিত করিব *। ব্রাহ্মণ সমাজ হউক, আর কায়স্থ সমাজ হউক, বাঙ্গালা দেশে হউক আর উৎকলে হউক, যদি সমবেত চেষ্টায় এই জঘন্য পাপাচার রহিত করিতে পারেন, অতি উত্তম কথা। নতুবা রাজা এই অপরাধের দণ্ড বিধান করুন। পৃথিবীতে সৎলোক নিতান্তই অল্প, সকলেই দণ্ড ভয়ে কুপথ হইতে নিবৃত্ত থাকেন, "দণ্ড ভয়" আছে, তাই পৃথিবীস্থ লোকেরা সুখ সম্পদ সম্ভোগ করিতেছে।

সর্ব্বোদণ্ডজিতো লোকো দুর্লভোহি শুচির্নরঃ।
দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্ব্বং জগদ্ ভোগায় কল্পতে॥
মনু ৭।২২।

লোক সকল দণ্ড দ্বারা জিত হয়, স্বতঃ শুচি লোক একান্তই দুর্লভ। দণ্ডের ভয়েই সমস্ত জগৎ ভোগ করিতে সমর্থ।

যদি ন প্রণয়েদ্ রাজা দণ্ডং দণ্ড্যেষতন্দ্রিতঃ।
শূলে মৎস্যানিবাপক্ষ্যন দুর্ব্বলান্ বলবত্তরাঃ॥
মনু ৭।২০।

রাজা অতীন্দ্রত হইয়া যদি দণ্ড যোগ্য ব্যক্তিদিগকে দণ্ড নির্দ্দেশ না করেন, তবে বলবত্তর লোকেরা শূলে মৎস্যপাকের ন্যায় দুর্ব্বলদিগকে ভাজা পোড়া করে।

মহর্ষি মনু যেন ভবিষ্যৎ দর্শনবলে বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থা জানিতে পারিয়াই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। অনৃতুমতী সহবাসে অস্মদ্দেশে স্ত্রীলোকের নিতান্ত কষ্টদায়ক দুশ্চিকিৎস্য রোগ জন্মিতেছে, প্রাণবধ পর্য্যন্ত হইতেছে। শিশু বালিকা শ্রেণীর দুর্দ্দশার একশেষ হইতেছে, কোথায় বালিকারা মাতার স্নেহে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সুখে গৃহকার্য্য শিক্ষা করিবে, না কোথায় অকালে স্বামী সহবাস করিতে শ্বশুর গৃহে আনীত হইয়া কত প্রকার যন্ত্রণাই সহ্য করিতেছে। অনেকে ইহজীবন ভাররহ বোধ করিয়া আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতেছে। বস্তুতঃ সবল ব্যক্তিরা শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক জঘন্য কাম রিপুর * বশবর্ত্তী হইয়া শূলে মৎস্য ভাজিবার ন্যায় দুর্ব্বলা অসহায়া অনৃতুমতী বালিকা স্ত্রী-

* আর্য্য বঙ্গ-সম্মিলনী সভা বলিতেছেন, বালিকায় ১২ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বিবাহ বন্ধ হউক।

* কালিদাস বলিয়াছেন "কামার্ত্তাহি প্রকৃতি কৃপণাশ্চেত না চেতনেষু," কামার্ত্ত ব্যক্তিদের চেতন ও অচেতন বস্তুতে বৈলক্ষণ্য বিচার নাই, তবে কি আর তাহারা রজস্কা ও অরজস্কা বিচার করিয়া চলিবে, এমন প্রত্যাশা করা যায়? এজন্য মনু বিধি করিয়াছেন "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।"

দিগকে ভাজা পোড়া করিতেছেন। দণ্ডা ব্যক্তিব দণ্ড না হইলে কীদৃশ অনিষ্ট রাশি উৎপন্ন হইতে পারে, বিংশতি বর্ষেব ন্যূন-বয়স্কা বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের দুর্দ্দশা তাহাব উদাহরণ স্থল হইয়াছে।

ইংবেজেবা বণিক বেশে অর্থেব লোভে এই দেশে আগমন কবিয়া ঘটনাচক্রে বাজত্ব পর্য্যন্ত পাইয়াছেন। কিন্তু বণিকেব অর্থ লোভে মুগ্ধ হইয়া অনেব সময় বাজাব কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইতেছেন। পাছে অর্থ লাভে ব্যাঘাত ঘটে, এই চিন্তাই প্রবল। অর্থ লাভেব জন্য তো বাজত্ব, এই যেন ইংবেজেব মূল নীতি। কিন্তু শাস্ত্রকাব মনুব ব্যবস্থা অন্যরূপ। বাজা স্বদেশীয় হউন, আব বিদেশীয় হউন, দণ্ড্যব্যক্তিকে দণ্ড বিতরণ কবা রাজাব প্রধান ধর্ম্ম। রাজা, যে কাবণেই হউক, এই বাজকার্য্যে শৈথিল্য করিলে প্রজাব তো মহাদুঃখ উপস্থিত হয়ই, রাজাব বাজত্ব অল্পে অল্পে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। দুর্ব্বলেব বক্ষা কার্য্য অবহেলা কবিয়া প্রবল রোম বাজ্য ধ্বংস পাইয়াছে, মহাপবাক্রমশালী সূর্য্য চন্দ্রবংশ লুপ্ত হইয়াছে, অজেয় মোগল বাজ্য ধূলিসাৎ হইয়াছে। হে ইংবাজ বাজ, হিন্দুরা কদাচারী ও কুপথগামী হইয়া অধঃপাতে যাইলে তোমাদেব বাজত্ব নিষ্কণ্টক ও চিবস্থায়ী হইবে, মনে কবিও না

দণ্ডোহি সুমহৎ তেজো দুর্দ্ধরশ্চাকৃতাত্মভিঃ।
ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্॥
মনু ৭।২৮

রাজদণ্ড সুমহৎ তেজঃস্বরূপ, অকৃতাত্মা রাজাব নিকট ইহা দুর্দ্ধর্ষ। এই সুমহৎ তেজঃ ধর্ম্ম পথ হইতে বিচলিত রাজাকে সবান্ধবে বিনাশ কবে।

এই যে দুর্ব্বলা অসহায়া বালিকাদের উপব অত্যাচার উৎপীড়ন হইতেছে, সর্ব্বদর্শী পবমেশ্বব তাহাব গণনা করিতেছেন। ইংবেজবাজ শিশু বালিকাদিগকে বক্ষা না কবিয়া সমগ্র ভারতেব নারীজাতির ঘৃণাব পাত্র হইতেছেন। ফল এই হইবে যে, নাবীজাতিব শ্রদ্ধা হারাইয়া ইংবাজ বাজত্ব লোপ পাইবে। ব্রাহ্মণেতব জাতির অভিসম্পাতে হিন্দুব বাজত্ব লুপ্ত হইয়াছে। নাবীজাতিব অভিসম্পাতে মোগল বাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। যদি ভাবতবর্ষে এই প্রবল পবাক্রমশালী ইংবেজ বাজত্ব ধ্বংস হয়, এই সকল শিশু বালিকার অশ্রুপাতে সেই অধঃপাত সংঘটিত হইবে। ১৮২৯ সালের বাজপ্রতিনিধি ভাবতবর্ষে "কখনও ধর্ম্ম ও মনুষ্য হইতে বিচলিত হইব না" বলিয়া * যে ঘোষণা কবিয়াছিলেন, যখন ইংবাজ বাজ সেই পথ পবিত্যাগ কবিবেন, তখন

"ধর্ম্মাদ্বিচলিতং হন্তি নৃপমেব সবান্ধবম্'
মনু ৭।২৮

"বাজধর্ম্ম হইতে বিচলিত নৃপ সবান্ধবে বিনাশ পাইবেক" মনুব এই অভিসম্পাৎ ইংবাজ বাজকে আচ্ছন্ন কবিতে থাকিবে। কি জর্ম্মনি, কি অষ্ট্রীয়া কোন বাজ্যই তখন কোনও প্রকাব সহায়তা কবিতে পাবিবে না। কোথায় বা থাকিবে শাস্ত্রেব কূটার্থকাবী অবজ্ঞা সেবমান ব্যক্তিব চীৎকার, আর কোথায় বা থাকিবে ইংবেজের অর্থলাভ চিন্তা। দুর্ব্বল ব্যক্তিকে সবল ব্যক্তির আক্রমণ হইতে রক্ষা কবা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। যে বাজা এই ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইয়াছেন, সর্ব্ব শক্তিময় পরম কারুণিক

* See the preamble of Regulation XVII of 1829.

পরমেশ্বরের আজ্ঞার নিয়মানুসারে তিনি বা তদ্বংশীয়েরা ঘটনার চক্রে পড়িয়া সত্বর রাজস্ব হারাইয়াছেন। সর্ব্ব দেশে এবং সর্ব্ব যুগে ঈশ্বরের এই নিয়ম চলিয়া আসিযাছে। সমুদ্রবারির লবণত্বও ধ্বংশ হইবে না, আর এই ঐশিক নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটিবে না।

আর হিন্দু সমাজস্থ লোকদিগকে শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বাক্য স্মরণ করাইয়া সামুনয়ে নিবেদন করিতেছি, "অনাগতার্ত্তবা বালিকা-গমন সোদরাগমন বা গুরুপত্নী গমনের ন্যায় অতি গুরুতর পাপাবহ এবং ঘোরতর অধঃপাতের হেতু। ঐ ভীষণ পাপের প্রথা যে হিন্দুসমাজে গুরুতর বলিয়া বিশ্বাস নাই এবং সেই জন্য যে হিন্দুর সন্তান পরম্পরায় ঘোরতর অধঃপাত ঘটিতেছে, আরও ঘটিবে, তাহাত সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া থাকি।"

সামান্য দুঃখে কি কবি বলিয়াছেন,—

"অরে কুলাঙ্গার হিন্দুদুরাচার
এই কি তোদের দয়া সদাচার?
হয়ে আর্য্যবংশ অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে।
বারেক ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি ভ্রমেতে ডুবিয়া—
চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া,
এখনো রয়েছ উন্মত্ত হ'য়ে?"
"ধিক হিন্দুকুলে হয়ে আর্য্যবংশ
নবকণ্ঠ-হার নারী কর ধ্বংশ।
ভুলে সদাচার দয়া সদাশয়
কর আর্য্যভূমি পূতিগন্ধময়,
ছড়ায়ে কলঙ্ক পৃথিবী মাঝে।"

বোম্বাই, মান্দ্রাজ, উৎকল, প্রভৃতি ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে এই পাপাবহ প্রথা দণ্ডদ্বারা নিবারিত করিবার চেষ্টা হইতেছে, শুধু কি বাঙ্গালী জাতি এতৎ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট রহিয়া স্বজাতির গৌরব দরপনেয় কলঙ্কে মলিন করিবেন?

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

প্রাচীন মহারাষ্ট্র। (১)

"A people that can feel no pride in the past in its history and literature looses the mainstay of its national character When Germany was in the very depth of its political degradation, it turned to its ancient literature and drew hope for the future, by the study of its past Something of the same kind is now passing in India"

Professor Max Mullar

বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই ভারতের ইতিহাস নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে কাহাকেও এ অভাব মোচনে অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। হয়ত অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, একজনই সমগ্র ভারতের একটী সু-বৃহৎ ইতিহাস লিখিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু এক জনের দ্বারা এই সুবিশাল ভারতের একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ইতিহাস সঙ্কলিত হওয়া সম্ভাবপর নহে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া সংগ্রহ করা এক জনের সাধ্যাতীত। কারণ ভারতের এক প্রদেশ অন্য প্রদেশ হইতে এত বিভিন্ন, এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের জাতিগত এবং ভাষাগত পার্থক্য এত অধিক যে, সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক, কোন

অদ্ভুত প্রতিভাশালী ব্যক্তি আশাতীত দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইলেও ভারতীয় বিভিন্ন প্রদেশের ভাষা সমূহে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া, তৎপরে সেই সেই প্রদেশের তিমিরাচ্ছন্ন ইতিহাসের উদ্ধার সাধনে কৃতকার্য্য হইবেন কিনা সন্দেহ। আমাদের বিবেচনায়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আলোচিত ও সংগৃহীত হইলেই অনেক পরিমাণে কৃত-কার্য্য হইবার সম্ভাবনা এবং তদ্দ্বারা ভবিষ্যৎ ভারত-ইতিহাস লেখকের পথও অপেক্ষাকৃত সুগম হইবে।

এই উদ্দেশ্য লইয়াই আমরা ভারতের ইতিহাসের অংশ বিশেষের—মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত অতি অল্প গ্রন্থই রচিত হইয়াছে, এবং এ বিষয়ে যে দুই এক খানি গ্রন্থ আছে, তাহার একখানিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই। সুতরাং এ বিষয়ে যে আমরা আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তাহার বিশেষ, সম্ভাবনা নাই। আমরা আশা করিয়াছিলাম, আমাদিগের বঙ্গ দেশের কোন কৃতবিদ্য মহোদয় এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন, কিন্তু যখন দেখিতেছি যে, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই এই বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, তখন অগত্যা আমাদিগকেই এই দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইল।

মহারাষ্ট্রীয় জাতির ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে কাপ্তান জেমস্ গ্রাণ্ট ডাফ্ (Captain James Grant Duff) সাহেব মহোদয় প্রণীত History of the Marathas নামক গ্রন্থ ব্যতীত সমগ্র মহারাষ্ট্রীয় জাতির ইতিহাস পদবাচ্য আর কোন গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না। উক্ত মহাত্মা প্রভূত পরিশ্রম ও বিপুল অর্থ (বিংশতি সহস্রাধিক মুদ্রা) ব্যয় করিয়া সর্ব্ব প্রথম মহারাষ্ট্রীয় জাতির এক সুবৃহৎ ইতিহাস প্রণয়ন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তদীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে আর্য্যগণ কোন্ সময়ে দাক্ষিণাত্যে যাইয়া বসতি করেন, এবং কোন্ সময়ে মহারাষ্ট্র দেশ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, সাহেব মহোদয় এ বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। এতদ্ ব্যতীত মরাঠাগণ (মহারাষ্ট্রীয় জাতি) কে? কোথা হইতে আসিল? প্রাচীন কালে মহারাষ্ট্র দেশে কোন্ কোন্ রাজ বংশ রাজত্ব করিতেন? এবং তাঁহাদের বংশীয়গণের মধ্যেই বা এখন কোন্ কোন্ বংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে, ইত্যাদি বহুবিধ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় তদীয় গ্রন্থে আলোচিত হয় নাই। এমন কি, আধুনিক কালের সুবিখ্যাত "ভোঁসলে" "পবার" (প্রমার) "মহাডীক," "শিরকে" (সালকে বা চালুক্য) প্রভৃতি পঞ্চকুলের, ছত্রিশ কুলের ও ছিয়ানব্বই কুলের মরাঠাগণ কোন্ বংশোদ্ভূত? কোন্ দেশীয়? এবং তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ কুল পূর্ব্বদিকের রাজবংশ হইতে আসিয়া এ দেশে বসতি করিয়াছে, ইত্যাদি অনায়াস-লভ্য আবশ্যকীয় বিষয় সমূহও উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হয় নাই। প্রাচীন কালে মহারাষ্ট্র দেশে যে সমস্ত সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও কবিগণ জন্ম গ্রহণ করেন ও তাঁহাদিগের দ্বারা প্রাচীন মরাঠী (মহারাষ্ট্রী) ও সংস্কৃত

ভাষায় যে সমস্ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট কাব্যাদি রচিত হইয়াছে, এই গ্রন্থে তৎসমূহের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। তদীয় গ্রন্থে যে সকল মহাপুরুষ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী বিবৃত হইয়াছে, তাহা একে অতি সংক্ষিপ্ত, তাহার উপর আবার অধিকাংশ স্থলেই অসম্পূর্ণ। কারণ যে সকল ঘটনাবলীর উপর তাহাদের চরিত্রের উৎকর্ষ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, দুঃখের বিষয় তাহা একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে *। মরাঠা জাতির চির শত্রু মুসলমান ঐতিহাসিকগণের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াও গ্রন্থকার অধিকাংশ স্থলে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। অনেক স্থলেই তাঁহার বর্ণিত বিষয়গুলি প্রকৃত ঘটনা হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। এই প্রবন্ধের অন্য স্থলে তাহার বিশদরূপে সমালোচনা করিবার আমাদিগের ইচ্ছা রহিল। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে এই সমস্ত ত্রুটী বা দোষ পরিলক্ষিত হইলেও তাঁহার প্রভূত অর্থ ব্যয়, কষ্ট স্বীকার ও অধ্যবসায়ের জন্য আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না।

এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, "মহ্রাঠাগণের সম্বন্ধে চারিটি উদ্গার," "গ্রাণ্ট ডফ্ সাহেব প্রণীত, মরাঠা জাতির ইতিহাসের প্রতিবাদ" ও "অতি প্রাচীন কাল হইতে মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত দক্ষিণ বা মহারাষ্ট্র দেশের ইতিহাস' প্রধানতঃ এই তিনখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধটি লিখিত হইল। প্রথম গ্রন্থখানি বোম্বে সেণ্ট-জেভিয়ার্স কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিতবর রাজারাম রামকৃষ্ণ ভাগবত মহোদয় কর্ত্তৃক মরাঠী ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থে মরাঠাগণের ও মরাঠী ভাষার উৎপত্তি, বিস্তৃতি, ও অতি প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ দেবাস রাজ্যের দেওয়ান রাও বাহাদুর নীলকণ্ঠ জনার্দ্দন কীর্ত্তনে প্রণীত। গ্রন্থকার যখন পুনা কলেজের 'জুনিয়ার ষ্টুডেণ্ট', ছিলেন তখন "পুনা ইয়ংমেনস্ এসোসিয়েশন" নামক ছাত্রদিগের বিতণ্ডা সভায় যে প্রবন্ধ পাঠ করেন, এই গ্রন্থ তাহারই সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ মাত্র।* পুনে + ডেক্কান কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, এম, এ, মহোদয় শেষোক্ত গ্রন্থ খানি প্রণয়ন করিয়াছেন। 'বম্বে গেজেটিয়ার' অর্থাৎ বোম্বাই প্রদেশের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ নামক এক সুবৃহৎ ইংরাজি গ্রন্থ বোম্বের গবর্ণমেণ্ট খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিতেছেন। উক্ত গেজেটিয়ারের "মহারাষ্ট্র দেশের ইতিবৃত্ত" নামক অংশের জন্য ডাক্তার ভাণ্ডারকর মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত দক্ষিণের প্রাচীন ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া দেন। কিন্তু উক্ত গেজেটিয়ার ক্রয় করা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নহে, বিবেচনায় সাধারণের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া তিনি উহা স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। মরাঠী ভাষায়, কি ইংরাজি ভাষাতেও মুসলমান বিজয় পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রদেশের

* "A Review of Captain James Grant Duff's History of the Marathas" by Raw Bahadar Nilkantha Janardan Kertani, Late Asst. Guardian and Tutor to H H The Nawab of Jawrah &c &c

* গ্রন্থকার আমাকে লিখিয়াছেন "I was very young and raw when I penned them * * * (Though) there is nothing really objectionable in it"

+ ইহার বাঙ্গালা উচ্চারণ 'পুণ'।

ইতিহাস আজ পর্যন্ত কেহ লিখিতে পারেন নাই। কারণ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্নেলস্ এবং উক্ত সোসাইটির কলিকাতা ও বোম্বে ব্রাঞ্চের (শাখার) জর্নেলস (ইতিবৃত্ত), ইণ্ডিয়ান আণ্টি-কোয়েরী ও অন্যান্য বহুবিধ ইংরাজী ইতিহাস গ্রন্থ সমূহে ও সংস্কৃত কাব্য পুরাণাদি গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক সত্য ও আবশ্যকীয় উপাদন সমূহ সংগ্রহ করা অতি কঠিন ব্যাপার। আবার উক্ত সংগৃহীত সত্য সকল একত্রিত করিয়া ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়ন করা ততোধিক কঠিন কার্য্য। ডাক্তার ভাণ্ডারকর অদম্য উৎসাহ ও দীর্ঘকালব্যাপী পরিশ্রম দ্বারা উহা সম্পন্ন করিয়া, মহারাষ্ট্রবাসীর, এমন কি সমস্ত ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা ইতিহাসপ্রিয় ইংরাজী-অভিজ্ঞ পাঠকগণকে এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। পাঠকগণ দেখিবেন, এ গ্রন্থে এমন একটিও কথার উল্লেখ নাই, যাহার কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। ইংরাজি অনভিজ্ঞ পাঠকগণের ভাগ্যে এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠের সুবিধা হইবেনা বলিয়া নারায়ণ বিষ্ণু রাপট মহোদয় সরল মরাঠী ভাষায় ইহার অবিকল অনুবাদ করিয়া মহারাষ্ট্র-বাসী জন সাধারণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলন সম্বন্ধে আমরা রাপঠ মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় মহারাষ্ট্র দেশেরও অতি প্রাচীন কালের ধারাবাহিক বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু প্রস্তরলিপি ও তাম্র শাসনাদির সাহায্যে এবং আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতমণ্ডলীর চেষ্টায় ও যত্নে সকল প্রদেশেরই প্রাচীন ইতিহাস অল্পাধিক পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছে। মহারাষ্ট্র দেশেও প্রস্তর-লিপি, প্রাচীন মুদ্রা, দান-পত্র ও তাম্রশাসনাদি অনেক পাওয়া গিয়াছে ও তাহা হইতে প্রাচীন কালের অনেক ঐতিহাসিক সত্য কিয়ৎ পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। মহারাষ্ট্র দেশে সর্ব্ব-প্রথম মহাত্মা বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী জাম্ভেকর মহোদয় প্রস্তরলিপি ও তাম্র-শাসনাদি পাঠ করতঃ তাহা হইতে ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিয়া ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার পথ প্রদর্শন করেন। তৎপরে বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলিক, শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ রাও পণ্ডিত, কাশী নাথ ত্রিম্বক তেলঙ্গ, রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার, ও ভগবান লাল পণ্ডিত প্রভৃতি মহোদয়গণ তৎপ্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। উক্ত মহাত্মাগণের অধ্যবসায় ও যত্নেই আজ আমরা মহারাষ্ট্র দেশের প্রাচীন কালের তিমিরাচ্ছন্ন ইতিহাস কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারিয়াছি। এই সকল মনস্বী পুরুষগণের পরিশ্রম এবং অনুসন্ধিৎসার ফল আমরা বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার দিব।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

উৎকল-ভ্রমণ।

পুরীর তীর্থের কথা।

পুরীর পঞ্চতীর্থের নাম—নরেন্দ্র, মার্কণ্ড, শ্বেতগঙ্গা, ইন্দ্রদ্যুম্ন এবং চক্রতীর্থ। গত বারে ভুল ক্রমে ইন্দ্রদ্যুম্নকে জগন্নাথের রথ বিহারের বাড়ী বলা হইয়াছে। জগন্নাথের রথ বিহারের বাড়ীর নাম গুণ্ডীচাবাড়ী। তারপর দিন প্রাতে গুণ্ডীচাবাড়ী, মাসিমার বাড়ী, ইন্দ্রদ্যুম্ন ও নরসিংহ-মন্দির দেখিতে বাহির হইলাম। শুনিলাম, রথ বিহারের সময় জগন্নাথদেব একদিন মাসিমার বাড়ী অবস্থিতি করেন। ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী গুণ্ডীচাদেবীর নামে গুণ্ডীচাবাড়ীর নামকরণ হইয়াছে। গুণ্ডীচাবাড়ীর প্রাঙ্গণ পুরীর শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণ অপেক্ষা অনেক ছোট, কিন্তু মন্দিরের নানা বিভাগ ঠিক শ্রীমন্দিরের অনুরূপ। ভোগ প্রস্তুতের গৃহগুলি ভিন্ন আর সমস্তই ইষ্টকময়। এই মন্দিরের গায়েও অসংখ্য অশ্লীল ছবি বিদ্যমান আছে। প্রাতে দেখিলাম, দলে দলে পাণ্ডা সমভিব্যাহারে যাত্রীগণ গুণ্ডীচা বাড়ী দেখিতে আসিতেছেন। বিধবার সংখ্যাই অধিক। অশ্লীল ছবিগুলি পাণ্ডারা এইরূপ ব্যাখ্যাসহ প্রদর্শন করিতে লাগিল, "এই খানে ভগবান এক সখীর সঙ্গে লীলা করিতেছেন।" এইরূপ কথা শুনিয়া ও ছবি দেখিয়া কেহ কেহ লজ্জায় মুখ আবৃত করিতে লাগিল। কিন্তু পাণ্ডাদের ব্যাখ্যা তবুও ফুরায় না। তাহাদের পয়সা লওয়ার ফন্দি দেখিলে অবাক হইতে হয়। যেখানে লইয়া যাইতেছে, সেই খানেই যাত্রীদিগকে "এই খানে কিছু চড়াও" বলিয়া পয়সা আদায় করিতেছে। পয়সা প্রদানের এত স্থান প্রদর্শিত হয় যে, এক পয়সা করিয়া প্রত্যেক স্থানে দিলেও সমস্ত পুরী দেখিতে ৬।৭ টাকা লাগে। এতদ্ভিন্ন প্রধান পাণ্ডাদের প্রাপ্য—সে ত স্বতন্ত্র কথা। কেহ কেহ পুরী হইতে ফকীর হইয়া প্রত্যাগমন করেন। গুণ্ডীচাবাড়ী দেখিয়া নৃসিংহ-মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। গুণ্ডীচাবাড়ী এবং ইন্দ্রদ্যুম্নের মধ্যে ইহা অবস্থিত। এখানকার বহুদেব দেবীর মূর্ত্তি মৃত্তিকা নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইল। বল্কি অবতারের মূর্ত্তি বিশেষ রূপ মনকে আকৃষ্ট করিল। তৎপর ইন্দ্রদ্যুম্ন দর্শনে গেলাম। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার নামে এই পুকুরের নাম হইয়াছে। গুজরাটের যাত্রিকগণ জলে যখন মুরকির মোয়া ভাসাইতে লাগিলেন, তখন জনৈক পাণ্ডা বিকট চিৎকার করিয়া নানারূপ সম্বোধনে কূর্ম্ম অবতারের বংশধরগণকে ডাকিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কূর্ম্মগণ সমবেত হইয়া উপাদেয় আহার গ্রহণ করিতে লাগিল। আর তখন পাণ্ডা মন্ত্র পড়িতে লাগিল "মৎস্য কচ্ছ, দশ অবতার, গদাধর, জনার্দ্দন ইত্যাদি"। যাত্রিকগণ এই দৃশ্য দাঁড়াইয়া দেখিয়া জীবনকে সার্থক মনে করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র।—একটী প্রাচীন এবং প্রকাণ্ড পুকুর, ইষ্টক দ্বারা তীর বাঁধা। শুনা যায়, ইহার মধ্যে কুম্ভীর আছে। এই পুকুরের মধ্যেস্থলে একটী মন্দির আছে। বৈশাখ মাসে এখানে একটী মেলা হয়, তাহাকে

চন্দন যাত্রা বলে। ২১ দিন মেলা থাকে। মদনমোহন এই মেলার সময় এখানে আগমন করিয়া থাকেন।

মার্কণ্ড।—এটী অপেক্ষাকৃত ছোট, কিন্তু এটীরও তীর বাঁধা, এটীও খুব প্রাচীন পুকুর। এখানে চৈত্র মাসে অশোকাষ্টমিতে কালীয় দমন যাত্রা হয়।

শ্বেতগঙ্গা—এটী সর্ব্বাপেক্ষা গভীর। অন্যান্য তীর্থের ন্যায় এখানেও যাত্রিকগণ স্নান করিয়া থাকেন।

চক্রতীর্থ—অথবা সমুদ্র। সমুদ্র দেখিলে যে নবজীবন লাভ হয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই, তীর্থের মধ্যে এই তীর্থ অতি জীবন্ত ও মহান।

একদিনে এই পঞ্চতীর্থে যাত্রিগণকে স্নান করিতে হয়। ইহারা পরস্পর এত দূরে অবস্থিত যে, প্রাতঃকাল হইতে স্নান আরম্ভ করিলে সকল তীর্থ শেষ করিয়া আসিতে ১২টা বাজে।

সর্ব্বাপেক্ষা পুরীর জীবন্ত দেবতা লোকনাথ। লোকনাথকে ভয় করে না, এমন লোক পুরীতে বিরল। লোকনাথের মন্দির ৩।৪ মাইল দূরে অবস্থিত। একদিন প্রাতে দর্শনার্থ গমন করিলাম। অন্ধকারময় গৃহে লিঙ্গরাজ বিরাজিত। এখানে শৈব ধর্ম্মের জাজ্জল্যমান নিদর্শন দেখিলাম। দুই চারি জন ভক্তের সহিত দেখা হইল। শিবরাত্রির সময় এখানে খুব ধূমধাম হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন মাঘ, কার্ত্তিক ও বৈশাখ মাসেও খুব ধূমধাম হয়।

তোটাগোপীনাথ—একটী প্রসিদ্ধ মন্দির। প্রবাদ এইরূপ, এই খানে চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধান হয়। এ সম্বন্ধে একটী কবিতা পাওয়া যায়; সেটী এই—

"কি করিব, কোথা যাব, বাক্য নাহি সরে।
গোরাচাঁদে হারাইনু গোপীনাথের ঘরে॥"

এখানে চৈতন্যদেব অনেক সময় থাকিতেন। এইরূপ কথিত আছে, এক দিন তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন, আর বাহির হইলেন না।

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এক দিন স্বর্গদুয়ার দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, শঙ্করাচার্য্য চৈতন্য কবীর প্রভৃতির মঠের নিকটবর্ত্তী একটা প্রশস্ত স্থানে, সমুদ্রের খুব নিকটে, বালুকারাশির মাঝে এক খণ্ড প্রস্তর প্রোথিত রহিয়াছে, ইহাকেই স্বর্গদুয়ার বলে। দলে দলে যাত্রিগণ ইহা দেখিয়া পয়সা দিয়া থাকে।

পুরীর শ্রীমন্দিরের প্রাঙ্গণে বহু ছোট ছোট মন্দির আছে—তাহাতে বহু দেবতার সন্মান রক্ষা করা হইয়াছে। এই সকল মন্দিরের মধ্যে বিমলার মন্দিরই প্রধান। এই বিমলা যাজপুর বিরজা-ধাম হইতে আনীতা হইয়াছেন। শাক্তধর্ম্মের সহিত বৈষ্ণবধর্ম্মের সম্মিলনের জন্য এই রূপ বিধান করা হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না। শুনিলাম, এই বিমলামন্দিরে, মহাষ্টমির দিন জগন্নাথ যখন নিদ্রিত হন, তখন মহাবলী হয়। পুরীতে বৌদ্ধধর্ম্মের ভগ্নাবশেষের একমাত্র চিহ্ন—জাতিভেদের অন্তর্দ্ধান। শ্রীমন্দিরের প্রসাদ আব্রাহ্মণ চণ্ডাল একত্র সানন্দে ভোজন করিয়া থাকে। এই প্রথা প্রচলিত থাকায় হিন্দুধর্ম্ম বিলোপের সম্ভাবনা ছিল বলিয়া বিমলাকে এখানে আনিয়া স্থাপন করা হইয়াছে। শাক্তধর্ম্মানুসারে প্রসাদ মন্ত্রপূত হয়, এই ধারণায় এখন আর ধর্ম্ম লোপের

ভয়েরকারণ নাই। বিমলার মন্দিরের প্রাঙ্গণে রোহিণী-কুণ্ড আছে—এই কুণ্ডে ব্রহ্মার প্রথম সাক্ষী "ভূষণ্ডিকাক" পড়িয়া স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিল, প্রবাদ আছে।

জগন্নাথদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ শ্রুত হইয়াছি। বাহুল্যভয়ে সে সকল বিবৃত করিলাম না। বহুবার জগন্নাথ অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। প্রথমত ৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হন, ১৫০ বৎসর অরণ্যে লুক্কায়িত ছিলেন, ৩ বার চিল্কা-হ্রদে প্রোথিত হইয়াছিলেন। ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই নূতন মন্দির নির্ম্মিত হয়, কোন মতে ১১৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রীঅনিয়ঙ্ক ভীমদেব ১২৫,০০০০ লক্ষ স্বর্ণ মার (এক কোটী টাকা) আড়াই লক্ষ মার মূল্যের মণি মুক্তা এই কার্য্যের জন্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। চূড়া সমেৎ ইহা ১৯৮ ফিট উচ্চ।

জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার সময়ে তিনটী রথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। সেই তিনটী রথে আরোহণ করিয়া গুণ্ডিচা গৃহে গমন করেন। এক সপ্তাহ অন্তে তথা হইতে মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জগন্নাথের রথের নাম "নন্দীঘোষ" ইহা প্রায় ৩২ হস্ত উচ্চ, বলরামের রথ "তালধ্বজ" ইহা প্রায় ৩০ হস্ত উচ্চ, সুভদ্রার রথের নাম "পদ্মধ্বজ" ইহা প্রায় ২৮ হস্ত উচ্চ।

মহাত্মা হণ্টার সাহেব বলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীতে রামানন্দ উৎকলে আগমন করেন। ১১৫১ খ্রীষ্টাব্দে জয়দেবের আবির্ভাব। ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে চণ্ডীদাস; ১৪৩৩ তে বিদ্যাপতি, ১৪৪৮তে কবীর, ১৪৮৯তে নানক, ১৫০৯ হইতে চৈতন্যদেব, ১৫৭২তে গোবিন্দ দাস এবং ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তুলসীদাসের পুরীর লীলা বলিয়া অনুমান হয়। চৈতন্যদেব ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বহু বৎসর উড়িষ্যায় থাকেন, ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চৈতন্যের উৎকল প্রচার, প্রতাপ রুদ্র দেব এই সময়ে রাজা ছিলেন। ১০৪৫ খ্রীষ্টাব্দ বিষ্ণুপুরাণের সময়। ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দে রামানুজ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার করেন। এইরূপ প্রবাদ, ইহারা সকলেই পুরী আগমন করিয়াছিলেন। চৈতন্য, কবীর, নানক ও শঙ্করাচার্য্য যে আসিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেননা, এই সকলের নামেই মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

পুরীতে আগমন করিলেই বুঝা যায় যে, ইহা ধর্ম্মক্ষেত্র, অথবা শ্রীক্ষেত্র। গবর্ণমেণ্টের প্রতাপ অপেক্ষা শত গুণে অধিক ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীর প্রতাপ। যতই পুরীর বিষয় অনুসন্ধান করা যায়, ততই নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। প্রাচীন ভারতের তত্ত্বরাশি-পূর্ণ এমন দ্বিতীয় স্থান ভারতে দুর্লভ।

আর এক দিন বৈকালে সেই মেয়ে কয়েকটীর অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। কটক হইতে জনৈক ব্যক্তি সঞ্জীবনীর সদাশয় সম্পাদক মহাশয়ের নিকট একখানি বেনামা পত্রে লিখিয়াছিল যে, এই কয়েকটী অসহায়া মেয়েদিগের জন্য "আমরা" কিছুই চেষ্টা করি নাই। সঞ্জীবনীর সম্পাদক মহাশয় দয়া করিয়া সে পত্র ছাপান নাই। ঐ ব্যক্তি সব-জান্তা উপাধি পাওয়ার যোগ্য, কেননা, পুরীতে না যাইয়াও লিখিতে সাহস পাইল, "আমরা কিছুই চেষ্টা করি নাই।" যা'ক। অনুসন্ধানে সেই কয়েকটী মেয়েকে পাওয়া গেল। তাহারা তখন একটু দূর বিগড়াইয়া

গিয়াছে যে, তাহাদের কথায় ও প্রতিবাদে আমরা অবাক হইলাম। এদিকে দেখিলাম, অনেক ষণ্ডামার্ক সেই বাড়ীতে আনাগোনা করিতেছে। তাহাদের স্পষ্ট উত্তর পাওয়ার পর বুঝিলাম, আমাদের দ্বারা আর কিছুই হইবে না। তখন অগত্যা কলিকাতায় পত্র লিখিতে বাধ্য হইলাম। ইহার পর আর আমরা কোন খবর পাই নাই। তাহারা পরিবারে গৃহীত হইয়াছে কি না, জানি না। পরিবারে গৃহীত হইয়া না থাকিলে দুঃখের সীমা নাই। এইরূপ করিয়া কত নারী যে বিপথে পা ফেলিতেছে, ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়।

পুরীর প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দামোদর তীর্থ স্বামী এক জন প্রাচীন বহুদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি। শঙ্করের মঠে ইনি তখন থাকিতেন। ইহার অগাধ পাণ্ডিত্য। শুনিলাম, শীঘ্র মঠ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। মঠধারী সন্ন্যাসীর মঠ পরিত্যাগ—এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। সন্ন্যাসী আরো সন্ন্যাসী হইবার জন্য চলিয়াছেন—যাহা কিছু আসক্তি অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ছিঁড়িতেছেন, এই জড়বাদের দিনে এরূপ দৃষ্টান্ত খুব বিরল। আমরা তাঁহার অলৌকিক জীবনের কথা শুনিয়া মোহিত হইলাম। তার পর আমরা তাঁহার আদিষ্ট দিনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম।

শঙ্করেরমঠ—বালুকা-গুহার মধ্যে নির্ম্মিত। সমুদ্রের উপকূলে অনন্ত বালুরাশি—তাহার মধ্যে একটা গর্ত্তের ন্যায় স্থানে এই মন্দির। মন্দিরের মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের বেদি আছে, আর অসংখ্য হস্তলিখিত পুঁথি আছে। মন্দিরের কিঞ্চিৎ আয় আছে, তদ্দারা শিষ্যবর্গের কোন রকম ভরণপোষণ হয়। শ্রীযুক্ত দামোদর তীর্থস্বামী শ্রীমন্দিরের প্রসাদ পাইয়া থাকেন। তীর্থস্বামী সরল সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেন; তিনি অতি মিষ্টভাষী ব্যক্তি। তাঁহার প্রসন্ন ও প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়, তিনি একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত, অদ্বৈতবাদী। তাঁহার নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ উপদেশ লাভ করিলাম। তিনি আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে এইরূপ মর্ম্মের উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন।

১। এক অদ্বিতীয় দেবতা ভিন্ন দুই জগতে নাই। যত দিন মানুষ মোহের অধীন, ততদিনই দ্বিত্ব বোধ। মোহ ছিন্ন হইলে—অদ্বৈতভাব প্রাণে উপস্থিত হয়।

২। উপাসনা বা পূজা তত দিন, যত দিন মানুষ মোহের অধীন অথবা যত দিন মানুষের দ্বিত্ব বোধ আছে। দ্বিত্ব বোধ ঘুচিলে আর উপাসনার প্রয়োজন থাকে না। ইন্দ্রিয়-মূলক আমিত্ব বোধ মানুষের সর্ব্বনাশের মূল।

৩। "আমিই সেই"—অদ্বৈতবাদীর এ মত নয়, "আমি নাই, কেবল "তিনি আছেন"—এই মত। আপনার নাশই প্রকৃত ধর্ম্ম।

৪। মোহ ও মায়ার অতীত হওয়ার পক্ষে কর্ম্ম কাণ্ড সহায়। শেষে ধর্ম্ম কাণ্ডের প্রয়োজন নাই।

এই সকল কথার পর আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি পুরীর শ্রীমন্দিরের জগন্নাথদেবকে মানেন?

তিনি স্পষ্ট উত্তর দিলেন—'না—আমি না।"

আমরা।—তবে সেখানে মধ্যে মধ্যে যান কেন ?

তিনি।—লোকদিগকে দেখাইবার জন্য। আমি না যাইলে অনেকের অবিশ্বাস হইবে।

আমরা।—ধর্ম্মে কপটতা ভাল কি ?

তিনি।—ভাল নয়, কিন্তু এরূপ না করিলে পৃথিবীতে ধর্ম্ম-যে আর থাকে না।

আমরা।—এই রূপে কি থাকিবে ?

তিনি।—থাকিবে, একটা ত ধরা চাই। আশা করি, এইরূপ করিয়া সকলে এক দিন ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিতে পারিবে।

আমরা।—এরূপ দৃষ্টান্ত দেখিয়াছেন কি ?

তিনি।—দেখি নাই বলিয়া দুঃখিত, সেই জন্য মানুষের সংসর্গ আর ভাল লাগেনা, যাইতে পারিলে বাঁচি।

এই রূপ নানা কথায় বুঝা গেল, তিনি যাহা বিশ্বাস করেন না, লোক দেখানের জন্য তাহাও করেন। তিনি সরলভাবে দুর্ব্বলতা স্বীকার করিলেন, ইহাও বলিলেন, জগন্নাথমন্দিরে যাইয়া তিনি পূজাদি করেন না। এই মহাত্মার সংস্পর্শে যতক্ষণ ছিলাম, যেন স্বর্গে ছিলাম। যেমন ধর্ম্মজ্ঞান, তেমনি অমায়িকতা, যেমন বিশ্বাস, তেমনি ভক্তি। অবশেষে তিনি ক্লান্ত হইতেছেন দেখিয়া প্রণাম করিয়া আমরা বিদায় লইলাম।

আমাদের ক্ষীণ ভাষায় আর পুরীর বর্ণনা সম্ভবে না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরী সম্বন্ধে ভাবা যায় অনেক, লেখা যায় অল্প। অতি অল্পই লিখিলাম। দেখিবার, জানিবার, শুনিবার, পড়িবার—পুরীতে অনেক জিনিস আছে; কিন্তু সে সকল আমাদের লেখনীর বর্ণনা করিবার শক্তি নাই। • •

আর একটি কথা। চৈতন্যদেবের শেষ জীবন পুরীর অঙ্গে বিলীন হয়। একথাটী ভাবিলে পুরীর প্রতি আপনা আপনি একটা অজানা গভীর অনুরাগ জন্মে। কেহ কেহ বলেন, গোপীনাথের ঘরে তাঁহার অন্তর্দ্ধান হয়; কেহ বলেন, জগন্নাথের ঘরে, কেহ বলেন, তিনি সমুদ্রে আত্ম বিসর্জ্জন করেন। চৈতন্যচরিতামৃতে সমুদ্র পতন নামক একটী পরিচ্ছেদ আছে, তাহাতে জানা যায়, তিনি সমুদ্র পতনের পরও উঠিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা ভক্তগণ পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, কিন্তু তবুও তাঁহার অর্দ্ধধানের প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যায় না, বড়ই আশ্চর্য্য।

আমরা সম্প্রতি শ্রীখণ্ড, কাটোয়া, নবদ্বীপ, কালনা প্রভৃতি চৈতন্য-ভক্তি-প্রধান স্থান দেখিয়া আসিয়াছি। এই সকল স্থানই চৈতন্যদেবের লীলার ভূমি, এই সকল স্থানেই তাঁহার মূর্ত্তি ধূমধামের সহিত পূজিত হইতেছে। এই সকল স্থানের কোথাও আমরা তাঁহার তিরোধানের প্রকৃত কথা জানিতে পারি নাই। নিত্যানন্দের জীবনের পরিবর্ত্তন দেখিয়া তিনি তাঁহাকে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিবাহাদি করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বলেন। নিত্যানন্দ সেই আদেশে দেশে প্রত্যাগত হইয়া বিবাহ করেন। খড়দহের গোস্বামী বংশ নিত্যানন্দের বংশ। এইরূপ প্রবাদ, নিত্যানন্দ চৈতন্যের ধর্ম্মকে এইরূপ বিকৃতভাবে প্রচার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার দ্বারাই বৈষ্ণব সমাজে চরিত্রহীনতা প্রশ্রয় পায়। নিত্যানন্দের কথা বলিয়া এইরূপ একটী শ্লোক প্রচলিত আছে;—

"মৎস্যের ঝোল, কামিনীর কোল, মুখে হরি বল।"

গোরাচাঁদের ধর্ম্মের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া অদ্বৈত প্রভু গৌরচন্দ্রের নিকট এই রূপ একটী তরজা লিখিয়া পাঠান—

"আউলকে কহিও হাটে নাহি বিকায় চাউল,
আউলকে কহিও দেশ হইল বাউল।
আউলকে কহিও কাজে নাকি কাউল।
এই কথা বাউলকে কহিয়াছে বাউল।"

এইরূপ কথিত আছে, এই কথাগুলি শুনিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত বিমর্ষ হন, এবং বলেন "যে ব্যক্তি আহ্বান করিয়া আমাকে আনিয়াছিলেন, তিনিই বিসর্জ্জন দিতেছেন।" ইহার পর প্রায়ই যেখানে সেখানে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতেন। শেষে হঠাৎ অন্তর্দ্ধান হন। কিরূপে কোথায় কি হইল, কেহই জানে না। চৈতন্যের শেষ জীবনের ছায়া উৎকলকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে। পুরী চৈতন্যের অতি মিষ্ট স্থান। এই কারণে পুরী বৈষ্ণবগণের অতি প্রিয় জিনিষ। কিন্তু দুঃখের বিষয়—পুরীতে চৈতন্যের তেমন কোন কীর্ত্তি নাই। পাণ্ডারা জগন্নাথের প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য বলেন, "তিনি জগন্নাথ দেবের সহিত মিলিত হইয়াছেন।" ইহাতে জগন্নাথের মহিমাই অপ্রতিহত রহিয়া গিয়াছে। প্রেমিকশ্রেষ্ঠ চৈতন্যের ভক্তিপূর্ণ জীবন যে ভূমিকে পবিত্র করিয়াছে, পাপীর পক্ষে সে ভূমি যে অতি আদরের জিনিষ, সন্দেহ কি? পুরী—জ্ঞানীর তীর্থ, কেননা, শঙ্করাচার্য্যের ভূমি। পুরী বিশ্বাসীর তীর্থ, কেননা কবীরের বিচরণ স্থান। পুরী ভক্তের তীর্থ—কেননা চৈতন্যের শেষ লীলাভূমি। পুরী, এ জগতে জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাসের সমন্বয় ক্ষেত্র। কেবল সমন্বয় ক্ষেত্র নয়, হিন্দু ইতিহাসের একরূপ উজ্জ্বল ক্ষেত্র পৃথিবীতে বিরল।

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা।

চৈতন্য লাইব্রেরি সভার অধিবেশনে শ্রীদ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পঠিত, মূল্য ৵০। সর্ব্বদেশেই এমন এক এক জন ক্ষণজন্মা পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন, যাঁহাদের জীবনের কথা শুনিবার জন্য জগৎ ঊর্দ্ধকর্ণ হইয়া থাকে। আমাদের এই বঙ্গভূমিতে বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর সেই রূপ একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাঁহার এই বক্তৃতা শ্রবণ কালে প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ৩০০।৪০০ শত ব্যক্তি চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশনে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়াছিল। এরূপ চিন্তা, গবেষণা ও বিজ্ঞতা পূর্ণ বক্তৃতা এদেশে অতি অল্পই হইয়াছে। চন্দ্র নাথ বাবু সভাপতির মন্তব্যের পর ধন্যবাদ দিবার জন্য উঠিয়া ঠিকই বলিয়াছিলেন যে, "আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছিলাম বলিয়াই কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারি নাই।" সভাপতি মহাশয় অনুরোধ করিলেও কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি বক্তৃতা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। একজন বক্তৃতাপ্রিয় সাহেববেশ-ধারী, যুবক

উঠিয়া দুই চারিটী অসংলগ্ন বাহাদুরীর কথা বলিয়াছিলেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু এই বক্তার কথাগুলি ফুটনোটে তুলিয়া আপন বক্তৃতার সাহেবি আনার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র বাবু এই একটী বক্তৃতার জন্য এদেশে অমর হইবেন। সে দিন এই বক্তৃতা শ্রবণের পর দ্বিজেন্দ্র বাবুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া,প্রবন্ধটী পুস্তকাকারে ছাপাইতে অনুরোধ করিতে, আমাদের একান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল। তাই আজ এই প্রবন্ধটীকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত দেখিয়া যারপর নাই সুখী হইলাম। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াছি—এ প্রবন্ধের বিরুদ্ধে বলিবার আমাদের কিছুই নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবুর নিকট তাঁহার পদধূলি চাই, আর স্বদেশীয় লোকের নিকট এই চাই, বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত বলিয়া ঘৃণা না করিয়া এই পুস্তক খানি একবার পড়েন। বাঙ্গলার সামাজিক বর্ত্তমান ঘোরতর বিপ্লবের দিনে এই পুস্তক প্রভূত কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া আমরা সকলকে এই অনুরোধ করিতেছি। এই কাজের জন্য দ্বিজেন্দ্র বাবুর নামে ঘরে ঘরে পূজা হওয়া প্রয়োজন। বিলাত হইলে তাহাই হইত। হা বঙ্গভূমি, তুমি আজও প্রকৃত গুণী ব্যক্তির আদর করিতে শিখিলে না।

২। গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ, এম, এ, প্রণীত, মূল্য ১৷৷০। যে দুই প্রাতস্মরণীয় ব্যক্তির মাহাত্ম্যে ইতালী আজ স্বাধীন, গ্যারিবল্ডী তাহার অন্যতর। ম্যাট্‌সিনি গুরু, গ্যারিবল্ডী শিষ্য। ম্যাট্‌সিনি দেবতা, গ্যারিবল্ডী বীর। অথবা ম্যাট্‌সিনির হৃদয়-নিহিত প্রেম-জ্যোতি গ্যারিবল্ডিতে প্রতিফলিত হইয়া আজ ইতালীর বর্ত্তমান অতুল শোভা আনয়নে সমর্থ হইয়াছে। ম্যাট্‌সিনির সময়ে ইতালির যে দশা ছিল, ভারতের ঠিক সেই দশা উপস্থিত। কিন্তু দেশ আজ স্বার্থের কুহক-জালে আচ্ছন্ন, কোথায় ম্যাট্‌সিনি, কোথায় বা গ্যারিবল্ডি। এমন স্বার্থ-বিবর্জ্জিত প্রেমাবতারের অভ্যুত্থান ভিন্ন ভারতের আর আশা কোথায়?

যোগেন্দ্র বাবু ভারত-ক্ষেত্র পরিষ্কার করিয়া একমহাযজ্ঞের মহা আয়োজন করিতেছেন। ম্যাট্‌সিনি এবং গ্যারিবল্ডির অমূল্য জীবন কাহিনী বাঙ্গলা ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া এই মহাত্মা, এই মৃত দেশের যে কাজ করিলেন, আজ না হইলেও, শতাব্দী পরে তাহার সুফল ফলিবে। মহতের কথা শ্রবণ করিলেও মহত্ত্ব জন্মে। কে জানে, গ্যারিবল্ডির বা ম্যাট্‌সিনির জীবনী এদেশে কত মৃত লোকের জীবন দিতে সমর্থ হইবে।

বলিতে চাই অনেক কথা, কিন্তু বলিবার স্থান নাই। যোগেন্দ্র বাবু প্রেমিক—তাই তিনি এই সকল প্রেমিক জীবন লইয়া মাতোয়ারা। যোগেন্দ্র বাবু বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া এই গ্রন্থ ছাপাইয়াছেন। বন্ধু-বান্ধবেরা সে জন্য তাঁহাকে কত তিরস্কার করিতেছেন, কিন্তু এদেশ নিদ্রিত। এমন অমূল্য জিনিসেরও আদর নাই। বলিতে চাই অনেক কথা, কিন্তু বলিলেই বা ফল কি?

যোগেন্দ্র বাবুর ভাষার আর কত প্রশংসা করিব। বীরকাহিনী লিখিবার জন্য যে ভাষার প্রয়োজন, এদেশে তাহা কেবল যোগেন্দ্র বাবুর লেখনীতেই সম্ভবে, একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যেমন উচ্ছ্বাস ও

তেজোপূর্ণ, তেমনই মধুর, তেমনই সরল। পড়িতে পড়িতে কখন শরীর অগ্নিময় হয়, কখনও আবেগে চক্ষের জল পড়ে। এরূপ পুস্তকের আদর না হইলে বুঝিব, এদেশ জাতীয় সমাসমিতির এবং স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে যতই মাতুক, এদেশের উন্নতি বহু শতাব্দীর পশ্চাতে লুক্কায়িত।

অনেকের ধারণা আছে বাঙ্গলা জীবন-চরিত মাত্রেই ইংরাজির অনুবাদ। এই পুস্তক খানি যে তাহা নহে, দেখাইবার জন্য একটী স্থান তুলিয়া দিলাম :—

"ইতিহাস সপ্রমাণ করিয়াছে যে গ্যাবিবল্ডীর উদ্দীপনা-বাক্য বিফল হয় নাই। তাঁহার মন্ত্রপ্রভাবে ঐ সকল জাতির অধিকাংশই তুরস্কের অধীনতাশৃঙ্খল চূর্ণীকৃত করিয়া স্বাধীন রাজ্যসকলে পরিণত হইয়াছে। ভাবিলে বোধ হয় যেন উনবিংশ শতাব্দী জগৎ হইতে অধীনতা উঠাইয়া দিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে (১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) আমেরিকা যে বিপ্লবতরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই তরঙ্গমালা আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসি রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। পরে সেই তরঙ্গমালা কিছুকাল ধরিয়া সেই দেশকে আলোড়িত করিয়া ক্রমশঃ প্রাচ্যদেশাভিমুখিনী হইতেছে। তরঙ্গমালা 'লোক সাধারণ ও ঈশ্বর' এই অক্ষরাঙ্কিত পতাকা সম্মুখে লইয়া অপ্রতিহতবেগে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। ইহার প্রভাবে ইতালি উঠিয়াছে; গ্রীস্ সঞ্জীবিত হইয়াছে, সার্ভিয়া, রাউমিনিয়া প্রভৃতি প্রদেশসকলও স্বাধীন হইয়াছে! ইহার সম্মুখে ইউরোপীয় মুকুটীগণ ভয়ে কম্পান্বিতকলেবর হইয়াছেন। সেই বিরাট পতাকা লইয়া এই বৈপ্লবিক তরঙ্গমালা কখন কোন্ দেশে উপস্থিত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। এই তরঙ্গমালা আমেরিকা ও ইউরোপের শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চার করিয়াছে। ইহার প্রভাবে আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্রই লোকতান্ত্রিক শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠাপিত হইতেছে। অল্প দিন হইল প্রকাণ্ড ব্রাজিল্ সাম্রাজ্য সাধারণ তন্ত্রে পরিণত হইয়াছে। এই তরঙ্গমালার গতি স্থির নাই, ইহা কখন প্রাচ্যে, কখন প্রতীচ্যে, কখন উদীচ্যে এবং কখন বা দক্ষিণে ধাবিত হইতেছে। ইহার প্রভাবে অচেতন জগৎ যেন সচেতন হইতেছে। এক প্রকাণ্ড তাড়িত যন্ত্র যেন নিদ্রিত জাতি সকলের স্নায়ু মণ্ডলীতে বিদ্যুৎ সঞ্চালন করিয়া দিতেছে। যাহার নয়ন আছে, সে নয়ন ভরিয়া এই বিশ্বব্যাপী সঞ্জীবন ব্যাপার দেখিয়া জীবন সার্থক করুক। ভাবুক। আর ঘুমাইয়া কেন? এক বার নয়ন মেলিয়া বিশ্বপতির এই অপূর্ব্ব সঞ্জীবন ক্রীড়া পরিদর্শন করিয়া ইহজীবনের সাধ মিটাও। যাহার অদৃষ্টে সম্ভোগ ঘটেনা, তাহার দর্শনেও বাসনা চরিতার্থ করিয়া লওয়া উচিত। উঠ। আর কুম্ভকর্ণের ন্যায় অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত থাকিও না। উঠিয়া একবার নয়ন মেলিয়া সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখ।"

গ্যারিবল্ডির মৃত্যু সংবাদে ইতালীর গভীর শোক গ্রন্থকার অতি মধুর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। পড়িতে পড়িতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চক্ষে অবিরল ধারায় জল পড়ে। ধন্য যোগেন্দ্র বাবুর লেখনী!

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট আব্রাহাম লিঙ্কলনের বাল্য-জীবনী।

এই মহাপুরুষ ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী কেণ্টাকি প্রদেশের অন্তঃপাতী নোলিন ক্রীক নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আশৈশব দরিদ্রতার চির দুঃখময় ক্রোড়ে লালিত পালিত হন। তিনি বাল্যকাল হইতে দারিদ্র্যের দুঃসহ ভারে নিপীড়িত হইয়াও, স্বকীয় অসাধারণ বুদ্ধি ও জ্ঞান, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, চরিত্র ও প্রতিভা বলে পৃথিবীর সভ্যতম প্রদেশের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিরূঢ় হন। তিনি আত্ম-বিদ্রোহানলে দহ্যমান জন্মভূমিকে নির্ভীক-চিত্তে ও প্রশান্ত হৃদয়ে রক্ষা করিয়া, ইউ-নাইটেড্ ষ্টেটস্ (যুক্ত রাজ্য) হইতে সমূলে জঘন্যতম দাসত্ব-প্রথাকে উৎপাটিত করেন। আমেরিকার কৃষ্ণবর্ণ দাসদিগের উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক, উপাংশুঘাতকের নিষ্ঠুর হস্তে স্বীয় পবিত্র জীবন, ধার্ম্মিক চূড়ামণি মহাত্মা খ্রীষ্টের ন্যায় উৎসর্গীকৃত করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মর্য্যাদা যথোচিতরূপে রক্ষা করিতে গিয়া, তিনি নরাধম বিদ্রোহীর হস্তে নশ্বর জীবন বিসর্জ্জন দিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। যত দিন পৃথিবীতে মনুষ্য বসতি করিবে, যত দিন ভূমণ্ডলে সাম্য ও স্বাধীনতার সম্মান থাকিবে, যত দিন নরলোকে আত্মোৎসর্গ ও স্বদেশ-হিতৈষিতা, বিশ্বজনীন প্রেম ও সার্ব্বভৌমিক ভ্রাতৃভাব শব্দ বর্ত্তমান থাকিয়া অভিধানের পত্র উজ্জ্বল করিবে,—তত দিন প্রেসিডেণ্ট লিঙ্কলন স্বদেশ-হিতৈষিগণের অগ্রণী বলিয়া জগতে প্রীতি ও ভক্তির পবিত্র পুষ্পাঞ্জলী পাইতে বঞ্চিত হইবেন না, তত দিন দেবতার ন্যায় সভ্য জগতের গৃহে গৃহে পূজিত হইতে থাকিবেন, তত দিন ভূমণ্ডলস্থ নর নারী এক বাক্যে তাঁহার স্বর্গীয় অমর আত্মার উদ্দেশে গভীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অকৃত্রিম অনুরাগ উপহার দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। জর্জ ওয়াসিংটন ব্যতীত এমন মহাপুরুষ স্বাধীনতার লীলাভূমি আমেরিকায় আর কখনও আবির্ভূত হইয়াছেন কি না সন্দেহ স্থল।

কেণ্টাকির অন্তর্গত হার্ডিন প্রদেশে নোলিন ক্রীক্ নামে একটী সামান্য স্থানে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার ভাবী অধিপতি শুভক্ষণে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম সময় তাঁহার পিতা টমাস লিঙ্কলনের বয়স ৩১ এবং তাঁহার মাতার ২৬ বৎসর বয়স ছিল। তাঁহারা উভয়ে যে সামান্য গৃহে বাস করিতেন, তাহা কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছিল বটে, কিন্তু তাহাতে নির্ম্মল বায়ু সঞ্চারণের নিমিত্ত দ্বার কি গবাক্ষ কিছুই ছিল না। সেই কুটীরের সমীপে অন্য কোন প্রতিবেশীর বাসস্থল ছিল না। তাহার চতুর্দ্দিকের ভীষণ অরণ্যে নানাবিধ হিংস্র জন্তু নিরাপদে বাস করিত।

টমাস অনুমাত্রও লিখিতে পড়িতে জানিত না। শৈশবকালেই তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু ঘটিলে, টমাস দুরবস্থা ও দরিদ্রতার সহিত অনন্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন। এই নিমিত্ত কোনও বিদ্যালয়ে পদার্পণ

করিতে এক দিনের জন্যও তাঁহার ভাগ্যে অবসর ঘটে নাই। টমাসের পত্নী কিছু কিছু পড়িতে পারিতেন বটে, কিন্তু পত্রাদি লিখিতে পারিতেন না। বিদ্যা, বুদ্ধি, উদারতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি কোন বিষয়েই টমাস নিজ পত্নীর সমকক্ষ ছিলেন না বলিয়া পতির উপর টমাস পত্নীর সর্ব্বতা-মুখী প্রভুতা বরাবরই অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি অতি কষ্টে পত্নীর নিকট নিজের নাম লিখিতে অভ্যাস করিয়া, নিরক্ষরতার অপ-বাদ হইতে মুক্ত হন।

বালক আব্রাহামের যখন ৪ বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতা অপেক্ষাকৃত উর্ব্বর ও রমণীয় একটী স্থানে আসিয়া সপরিবারে বসতি করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সমবয়স্ক যে ৬।৭ জন প্রতিবেশী বালক ছিল, অল্প কালের মধ্যেই আব্রাহাম বুদ্ধি কৌ-শলে তাহাদের প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এখানে তিনিপাঠশালায় সামান্য লেখা পড়া আরম্ভ করিয়া, অতি অল্প কালেই গুরু মহাশয়ের আয়ত্তাধীন যাবতীয় বিষয় শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন। আব্রাহাম জ্যেষ্ঠা ভগিনী সারার সহিত পাঠশালায় প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন। এই পাঠ-শালা তাঁহার পিতার বাসস্থান হইতে চারি মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। চারি পাঁচ বৎসরের শিশু লেখা পড়া শিক্ষার জন্য প্রত্যহ আট মাইল পথ যাতায়াত করিত!!! কি অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়। কি প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা।

প্রতি রবিবার ও অন্যান্য দিনের অব-সর সময়ে টমাসপত্নী পতি, পুত্র ও কন্যাকে বাইবল গ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেন। পড়িতে শিখিবার পূর্ব্বে বিদুষী মাতার নিকট হইতে এইরূপে শুনিয়া, আব্রাহাম সেই অমূল্য ধর্ম্ম পুস্তকের অনেক উপদেশ ও উপন্যাস শিক্ষা করেন। তাঁহার পিতার পুস্তকাগারে আব্রাহাম যে তিন খানি কীটদংষ্ট্র ও অযত্ন-রক্ষিত পুস্তক পাইলেন, পাঠশালায় অবস্থান কালে অতি মনোযোগের সহিত ক্রমে তাহা পড়িতে ও শিখিতে লাগিলেন। সেই তিন খানি পুস্তক এই,—বাইবল, ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর, ডিলোয়ার্থের বানান পুস্তক।

পূর্ব্বোক্ত পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হইলে, আব্রাহাম গৃহে বসিয়া বাইবল পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বাইবলের উপন্যাসাংশ গুলি তাঁহার কোমল মনকে সমধিক আকৃষ্ট করে। পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও তাহার তৃপ্তির হ্রাস হইত না। বাইবলের ন্যায় বহুমূল্য ধর্ম্মগ্রন্থ যাঁহার বাল্য জীবনকে প্রথম হইতে গঠিত ও পরিচালিত করে, তিনি যে যৌবনে শৌর্য্য, বীর্য্য, নির্ভীকতা, উদারতা, সততা, সহৃদয়তা, মহানুভাবতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক মানব জাতির অশেষবিধ উপকার সাধন করিয়া কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে টমাস দাসত্ব ব্যবসায়ের পাপে পরিপূর্ণ কেণ্টাকি প্রদেশ ছাড়িয়া ইণ্ডিয়ানা প্রদেশে যাইয়া বসতি করিতে মনস্থ করিলেন। ইতি পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ানা প্রদেশ (যুক্তরাজ্যের United State) অন্তর্ভুক্ত করিবার কথা হইতেছিল। মহাসভা কংগ্রেসে ঘোরতর তর্ক বিতর্কের পর ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ানা যুক্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সেখানে কেণ্টাকির ন্যায় জঘন্যতম দাস ব্যবসায়ের প্রথা প্রচলিত ছিল না। এই নিমিত্ত দলে দলে দীন দরিদ্র লোক নূতন প্রদেশে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিতে

লাগিল। টমাস দাসত্ব প্রথাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি জানিতেন যে, হেয়তম দাসত্ব প্রথা যে যে স্থানে প্রচলিত আছে, সেই স্থানে উৎপীড়ন ও অবনতির এক শেষ ঘটিয়া থাকে। তিনি নিরক্ষর হইলেও বুদ্ধিহীন ও হৃদয়-শূন্য ছিলেন না। কেণ্টাকি দাস ব্যবসায়ীদিগের পাশবিক ও অমানুষিক অত্যাচারের অন্যতম রঙ্গভূমি ছিল। কার্টার নামে টমসের পরিচিত জনৈক কৃষক ইতি পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ানার অন্তর্গত স্পেনসার কাউণ্টিতে উপনিবিষ্ট হন। তিনিও তথায়ই নিজের বাসস্থল মনোনীত করিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কেণ্টাকি ছাড়িয়া নূতন স্বাধীন প্রদেশে যাওয়ার টমাসের অন্যতর কারণ ছিল। দাসব্যবসায়িগণ অন্যায় পূর্ব্বক দরিদ্র কৃষকদিগের জমি ইত্যাদি কৌশলে স্বাধিকারভুক্ত করিতে সঙ্কুচিত হইত না। কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া যাহারা মানব জাতির অমূল্য স্বাধীনতা রত্ন অপহরণ করিয়া আপনাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দিত, জমী জমা হরণ তাহাদের পক্ষে নিতান্ত সামান্য বিষয়। টমাস এই আকস্মিক বিপৎ পাত উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বেই সেই স্থান সত্বর পরিত্যাগ করিলেন।

তাঁহার যে কিছু সামান্য ভূমি সম্পত্তি ছিল, তাহা তিন শত ডলার (প্রায় সাড়ে সাত শত টাকা) মূল্যে বিক্রয় করিলেন। মূল্যের মুদ্রার মধ্যে বিশ ডালার নগদ লইলেন। বাকী টাকার পরিবর্ত্তে দশ বেরেল (৪০০ গেলেন ৫০ মণ) মদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। জমীজমার বিনিময়ে হুইস্কি মদ। কি অদ্ভুত বিনিময়!! এই মদ বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে, তাহার দ্বারা ইণ্ডিয়ানা প্রদেশে বাড়ী ঘর নির্ম্মাণ ও জমীজমা ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলেন। জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ কর্ত্তন ও আহরণ করিয়া টমাস নিজ হস্তেই নৌকা নির্ম্মাণ করিলেন। পূর্ব্বোক্ত মদ ও গৃহনির্ম্মাণের উপযুক্ত আবশ্যকীয় দ্রব্য সঙ্গে লইয়া টমাস জলপথে একাকী ইণ্ডিয়ানা অভিমুখে ক্ষুদ্র নৌকা বাহিয়া চলিলেন। স্ত্রীপুত্রাদিকে কেণ্টাকির বাটীতেই রাখিয়া গেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ওহিও নদীর গর্ভে তাঁহার ক্ষুদ্র নৌকা ডুবিয়া যাওয়াতে, তাঁহার ভবিষ্যতের আশা ভরসা বিনষ্ট হইল। তীরবর্ত্তী লোকদিগের সাহায্যে তিনি নৌকা খানির সহিত তিন বেরেল মদ নদীগর্ভ হইতে উত্তোলিত করিতে সমর্থ হইলেন। তাহা নৌকায় উঠাইয়া নির্ভীক চিত্তে ও আশ্বস্ত মনে টমাস টমসনের খেয়াঘাটে উপস্থিত হইলেন। গন্তব্য স্থানে পদব্রজে যাওয়ার জন্য টমাস একজন ভারবাহী গরুর অধিস্বামীকে দ্রব্যাদি বহনার্থ নিযুক্ত করিলেন। ভাড়ার পরিবর্ত্তে গোস্বামী নৌকা খানি গ্রহণ করিতে সম্মত হইল। কিছু দূর যাইয়াই তাঁহারা উভয়ে দেখিতে পাইলেন যে, সেখানে জনমানবের যাতায়াতের কোনও চিহ্ন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নাই। টমাস সঙ্গীর সহিত, কুড়ালি দ্বারা সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে দিয়া রাস্তা প্রস্তুত করিতে করিতে, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু দিন অবিশ্রান্ত ঘোরতর পরিশ্রমের পর তাঁহারা আঠার মাইল পথ গমন করিয়া একটী ক্ষুদ্র কুটীর দেখিতে পাইলেন। তথায় বিশ্রাম করিয়া গৃহস্বামী উড সাহেবকে আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন। পরে উডের সহিত দুই মাইল গমন করিয়া টমাস

আপন ভাবী বাসস্থল মনোনীত করিলেন। উডের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, দুই মাইল দূরে পূর্ব্বদিকে, ছয় মাইল দূরে উত্তর দিকে এবং আট মাইল দূরে পশ্চিম দিকে তিন ঘর কৃষক বসতি করে। তাঁহার সমস্ত জিনিসাদি উডের কুটীরে রাখিয়া টমাস পদব্রজে কেণ্টাকীর পূর্ব্বতন বাড়ীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অবিলম্বে সপরিবারে মনোনীত নূতন বাসস্থলে যাওয়ার উদ্যোগ হইল। শয্যাদি দ্রব্যসহ সপরিবারে টমাস সওয়া শত মাইল সাত দিনে অতিক্রম করিয়া ভাবী বাসস্থানে উপনীত হইলেন। টমাসের যে দুইটী ভারবাহী অশ্ব ছিল, তাহার পৃষ্ঠে কখন চড়িয়া, কখন হাঁটিয়া লিঙ্কন-পত্নী পুত্র কন্যা সহ স্বামীর অনুগমন করিলেন। মৃত্তিকাই তাঁহাদের রাত্র কালের এক মাত্র শয্যা এবং আকাশ তলই এক মাত্র আশ্রয় ছিল।

টমাস তাড়াতাড়ি একটী অতি সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ানার দুঃসহ শীত কোন ক্রমে যাপন করিলেন। উপযুক্ত সময়ের অভাবে কুটীরের তিন দিক্ বদ্ধ এবং এক দিক খোলা রাখিতে হইয়াছিল। পর বৎসর এক খানি বাসোপযোগী প্রশস্ত কুটীর নির্ম্মিত হয়। এই কুটীর দৈর্ঘ্যে ১৮ ফিট ও প্রস্থে ১৬ ফিট বিস্তৃত ছিল। এই সামান্য কুঠরীতে আব্রাহাম সন্তুষ্টচিত্তে জীবনের দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত করেন। কুটীর নির্ম্মাণ, কাষ্ঠ কর্ত্তন, জঙ্গল আবাদ, শস্যরোপণ, ক্ষেত্র কর্ষণ, ঢেঁকি নির্ম্মাণ প্রভৃতি পিতার অনুষ্ঠিত যাবতীয় কার্য্যে আট বৎসরের বালক টমাসের এক মাত্র সাহায্যকারী ছিল। এই অষ্টম বর্ষ বয়স হইতে যৌবন প্রাপ্তি পর্য্যন্ত কুঠার আব্রাহামের নিত্য সহচর ছিল। প্রত্যহ কুঠার পরিচালন করাতে অল্পকালের মধ্যেই আব্রাহাম অতি বলিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। কাষ্ঠ কর্ত্তন ও ছেদনাদি কার্য্যে তিনি বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। ইণ্ডিয়ানার বনবাসী দরিদ্র কৃষকগণ বন্য জন্তু শিকার করিয়া অনেক সময় জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত করিত এবং বন্য পশুর উপদ্রব হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিত। বাল্যকালেই লিঙ্কন পিতার নিকট পশু পক্ষী শিকার করিতে শিক্ষা করেন। সেই নিবিড় বন-দেশের মধ্যবর্ত্তী কুটীরের নিকটে কোথাও পানীয় জল ছিল না। জ্যেষ্ঠা ভগিনী সারার সহিত লিঙ্কন এক মাইল দূরে অবস্থিত একটী নির্ঝরিণী হইতে সমস্ত পরিবারের ব্যবহার্য্য জল প্রত্যহ আনয়ন করিতেন।

তত্রত্য অশিক্ষিত নিরক্ষর দরিদ্র লোকের মধ্যে ধর্ম্ম, সাধুতা ও সচ্চরিত্রতার বিশেষ অভাব ছিল। সময় সময় তাহারা সুযোগ ক্রমে অপরের দ্রব্যাদি চুরি করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাহারা অধিক পরিমাণে মদ্য পান করিয়া সময় সময় পশুবৎ আচরণ করিত। এই সকল লোকের সংসর্গে সর্ব্বদা থাকিয়া কিসে আব্রাহাম সাধু, সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক রহিবে, পুত্রবৎসলা মাতা সর্ব্বদাই তাহা চিন্তা করিতেন। পুত্রকে তিনি সময় সময় অনেক সুন্দর ও সরল উপদেশ প্রদান করিয়া, তাঁহার নৈতিক জীবন গঠন করিয়াছিলেন। মদ খাওয়া সম্বন্ধে তিনি বলিতেন,—"বৎস, মদ পান করিতে আরম্ভ করিয়াই লোকে মাতাল হয় ও পশুবৎ আচরণ করে। তুমি কখনও মদ্য পান করিওনা! তাহা হইলে তোমাকে

কখনও মাতাল হইতে হইবেনা।" আমরণ পুত্র মাতার এই সকল উপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাজ্যের অধিপতিত্বে বরিত হইয়াও চিরপ্রচলিত প্রথা অনুসারে মদ্য পান করিতে অস্বীকৃত হন। এমন নৈতিক সাহস ও প্রগাঢ় মাতৃভক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াই তিনি জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে 'টমাস স্পেরো লিঙ্কলন-পরিবারের প্রতিবেশী হইল। টমাস স্পেরোর পত্নী বেটসি লিঙ্কন-পত্নীর শৈশবের প্রতিপালিকা ছিলেন বলিয়া, তিনি তাঁহাকে মাতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে বেটসির ভগিনীপুত্র হ্যাঙ্কসকে সমবয়স্ক সহচর ও বন্ধু পাইয়া আব্রাহাম অত্যন্ত সুখী হইলেন।

কেণ্টাকিতে হেজেলের পাঠশালায় আব্রাহাম যে লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, এখানে গৃহে বসিয়া পিতার পুস্তকাগারের পূর্ব্বোক্ত তিনখানি পুস্তকের সাহায্যে অবসর ক্রমে তাহার উন্নতি বিধান করিতে ত্রুটি করিলেন না। অন্য পুস্তকের অভাবে এই তিন খানি পুস্তক পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়া সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিলেন। শীতের দুঃসহ প্রকোপ প্রশমনের জন্য গৃহের মধ্যে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইত, বালক লিঙ্কন রাত্রিকালে সেই প্রদীপ্ত আলোকের নিকট বসিয়া পাঠ করিতেন। কুটীরে অন্য-আলো ব্যবহৃত হইত না। নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ আনিয়া, দরিদ্র কৃষকগণ তদ্দ্বারা শীতের ক্লেশ দূর করিত, কাঠের নির্ম্মিত লাঠির অগ্রভাগ পোড়াইয়া বৃক্ষের বল্কল এবং প্রস্তর খণ্ডাদিতে লিখিয়া আব্রাহাম হাতের অক্ষর দুরস্ত করিতেন। শীতকালে যষ্টির অগ্রভাগ দ্বারা বরফের উপর লিখা অভ্যাস করিতেন, গ্রীষ্মকালে পিতার বাগানে বসিয়া মৃত্তিকাতে লিখিয়া কালী কলম ও কাগজের অভাব দূর করিতেন॥ এইরূপে তিনি পুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সুন্দররূপে লিখিতেও অভ্যাস করিলেন। পুনঃপুনঃ পাঠ করিতে করিতে আব্রাহাম পূর্ব্বোক্ত তিন খানি (বাইবল, ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর ও ডিলোয়ার্থের বানান) সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত ও কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি নূতন নূতন গ্রন্থ পড়িতে উৎসুক হইলেন। এই সময়ে সহসা মৃত্যুভয় উপস্থিত হইয়া তাঁহার জ্ঞান লাভে কিয়ৎকালের নিমিত্ত সমূহ বিঘ্ন উৎপাদন করিল।

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে "দুগ্ধরোগ" নামে ভীষণ সংক্রামক রোগ আবির্ভূত হইয়া প্রতিবেশীদিগের অনেককে অকালে কালগ্রাসে পাতিত করিল। লিঙ্কলন পরিবারের অকৃত্রিম সুহৃৎ স্পেরো সাহেব ও তাঁহার পত্নী একই সময়ে উক্তরোগের প্রবল আক্রমণে শয্যাশায়ী হইল। তৎকালে ৩০।৪০ মাইল দূরের মধ্যেও কোনও চিকিৎসক ছিলনা। প্রতিবেশীবর্গের সেবা শুশ্রূষা ভিন্ন কোনও রোগের যথোচিত প্রতীকার লাভ অসম্ভব ছিল। টমাস ও তাঁহার পত্নী পীড়িত স্পেরো পরিবারের যথাসাধ্য শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অবশেষে টমাস তাহাদিগকে আপনার ক্ষুদ্র কুটীরে আনয়ন করিলেন। তাহার সমস্ত যত্ন চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কিছুতেই রোগের

উপশম ঘটিল না। স্পেরো ও তাহার পত্নী কিয়দ্দিনের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হইয়া রোগের যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করিল। টমাস স্বহস্তে কবরাধার (coffin) প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে সমাহিত করিলেন। স্পেরো পরিবারের সেবা শুশ্রূষার জন্য অনেক মানসিক উদ্বেগ ও শারীরিক কষ্ট সহ্য করিয়া কিছু দিনের মধ্যেই টমাসের পত্নী সেই ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইলেন। ৫ই অক্টোবর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া কুটীরের মধ্যে অপরিজ্ঞাত শোকদুঃখ আনয়ন করিলেন। টমাসের ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে বিষাদপূর্ণ শোকের গভীর উচ্ছ্বাস বহিতে লাগিল। বালক আব্রাহামের মুখে শোকের কালিমাময় রেখা অঙ্কিত হইয়া উঠিল। পরিবারের অশ্রুজলে সিক্ত ভূগর্ভে টমাসপত্নীর সুকোমল দেহ নিস্তব্ধে সমাহিত হইল। ধর্ম্মযাজকের কোনও সময়োচিত অনুষ্ঠান হইতে পারিল না।

শোকে দুঃখে বর্ষাধিক গত হইল। এলকিন্স নামে জনৈক ধর্ম্মযাজক টমাসের কুটীর হইতে ৭৫ মাইল দূরে অবস্থান করিতেন। মৃত পত্নীর আত্মার সদ্গতির জন্য যথাবিহিত প্রার্থনা করিতে টমাস তাঁহাকে আহ্বান করিতে মনস্থ করিলেন। একদা সন্ধ্যাকালে তিনি বালক আব্রাহামের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং পাদ্রি সাহেবর নিকট এক খানি অনুরোধ পত্র লিখিতে তাঁহাকে আদেশ করিলেন। দশমবর্ষীয় বালক অল্পকালের মধ্যেই পিতার আদেশ পালন করিয়া, টমাসকে স্বরচিত পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। ইহার পূর্ব্বে টমাসের পরিবার ও পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কেহই সামান্য লেখা পড়াও জানিত না। আজ পুত্র আব্রাহামকে অনায়াসে পত্র লিখিতে দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিলনা। তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিরক্ষর কৃষিজীবী হওয়া অপেক্ষা এরূপে পত্রাদি লিখিতে ও পড়িতে পারা শ্রেয়স্কর। টমাস হৃষ্টচিত্তে আপনার প্রতিবেশীগণের মধ্যে কুলতিলক পুত্রের এই অসাধারণ ক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার সমবয়স্ক বালকদিগের কথা দূরে থাকুক, সেই প্রদেশের এক চতুর্থাংশ যুবক ও বৃদ্ধ বোধ হয় এইরূপ পত্র লিখিতে পারিত না। এই ঘটনার পর হইতে দূরবর্ত্তী বন্ধুবান্ধবগণের নিকট পত্র লিখাইবার জন্য প্রতিবেশীগণ অনেক সময়ে বালক আব্রাহামের নিকট আসিত। এইরূপে তাঁহার রচনাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং হস্তাক্ষরও ক্রমে ক্রমে অধিকতর সুন্দর হইয়া উঠিল।

তিন মাস পরে উক্ত অনুরোধ পত্র অনুসারে পাদ্রি এলকিন্স টমাসের বাসস্থলে অশ্বারোহণে উপনীত হইলেন। কুটীরের দুই মাইল দূরে আব্রাহাম পাদ্রি সাহেবকে দেখিয়া পুলকিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি প্রশ্নকর্ত্তা বালকের লিখিত পত্র পাইয়াছিলেন কিনা? বালক স্বয়ং এমন সুন্দর পত্র লিখিয়াছে বলিয়া পাদ্রি এলকিন্স বিস্মিত হইয়া লেখকের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। বালক পাদ্রি সাহেবকে পিতার নিকট লইয়া গেল। টমাস পাদ্রি সাহেবের আগমনে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে মৃত পত্নীর প্রেতাত্মার সদ্গতির জন্য কবরস্থানে প্রার্থনা করিতে অনুরোধ

করিলেন। রবিবার পাদ্রি সাহেব কবর-স্থানে প্রার্থনা ও উপাসনা করিয়া একটী হৃদয়গ্রাহী করুণভাব-পূর্ণ বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতায় আব্রাহামের মন সাতিশয় আকৃষ্ট ও বিগলিত হইল। বালক অতি মনো-যোগের সহিত সেই বক্তৃতার সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন। বাল্যকাল হইতেই আব্রাহাম সবিশেষ চিন্তাশীল ছিলেন। অন্যান্যের ন্যায় কিছু পড়িয়া বা শুনিয়া তাঁহার সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধি তৃপ্তি লাভ করিত না। প্রতি কথার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ইহাতে তাহার বিচারশক্তি বাল্যকাল হইতেই বিশেষরূপে পরিচালিত হইয়া পরিপক্কতা লাভ করিয়াছিল। এই ঘটনার পূর্ব্বে তিনি দুই তিন জন আগন্তুক পর্য্যটক পাদ্রির সরল উপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন বক্তৃতারই তাঁহার মন এতদূর আকৃষ্ট হয় নাই। মাতৃবিয়োগের পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত লিঙ্কলনের জ্যেষ্ঠা ভগিনী সারা রন্ধনাদি যাবতীয় গৃহকার্য্য ভ্রাতার সাহায্যে সম্পাদন করিতে লাগিল। এই উপলক্ষে বালক লিঙ্কলন সমস্ত গৃহকার্য্য শিখিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি এতদূর বলবতী ছিল যে, তিনি যে কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, সেই কর্ম্মই সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে শিক্ষা না করিয়া নিবৃত্ত হইতেন না। বাল্যকাল হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ১৫ হইতে ১৮ ঘণ্টা কাল অনবরত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়াও তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেন না। ১৫।১৬ বৎসর বয়সের সময় তিনি প্রদর্শন করেন যে, প্রতিবেশী কৃষকগণ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতে বিশেষ আগ্রহ দেখাইত।

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে লিঙ্কলনের পিতা টমাস পুনর্ব্বার বিবাহ করিলেন। পূর্ব্বস্বামী জনসনের ঔরসজাত দুইটী কন্যা ও একটী পুত্র বিধবা মাতার সঙ্গে সঙ্গে টমাসের কুটীরে আগমন করিল। তিনি সঙ্গে করিয়া বাক্স, সিন্দুক ও চেয়ার প্রভৃতি প্রভূত গৃহসজ্জা দরিদ্র স্বামীর কুটীরে আনয়ন করিলেন। এই বিবাহের নিমিত্ত টমাস কিংবা তাঁহার পুত্র কন্যা কাহাকেও কোন কালে অসুখী হইতে হয় নাই। টমাসের নব বিবাহিতা পত্নী সুন্দরী ও সুশিক্ষিতা ছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই বিমাতার চরিত্র গুণে লিঙ্কলন তাঁহাকে স্বীয় মাতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার পুত্র কন্যাদিগকে আপনার সহোদর ভ্রাতা ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসিতে আরম্ভ করিলেন। বালকের অসামান্য বিদ্যা বুদ্ধি ও কার্য্যকুশলতা দর্শনে বিমাতা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতে লাগিলেন এবং কিসে তাঁহার লেখা পড়ার সুবিধা হইতে পারে, সাধ্যানুসারে তৎপ্রতি যত্নবতী হইলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিমাতার প্রতি লিঙ্কলনের অচলা ভক্তি অব্যাহত ছিল।

পুত্রের উন্নতির প্রতি টমাসও উদাসীন ছিলেন না। নিজের এমন অর্থ-সম্বল ছিলনা যে, ভাল ভাল পুস্তক কিনিয়া প্রিয়তম পুত্রকে পড়াইতে পারেন। কিন্তু তিনি ধার করিয়া আনিয়া পুত্রের দুর্নী-বার্য্য জ্ঞান-পিপাসার তৃপ্তি বিধান করিতে লাগিলেন। বিংশতি মাইল দূরে পিয়া-রসন নামে এক ব্যক্তি বাস করিত।

টমাস তাহার নিকট হইতে সুকবি বানিয়ানের বিরচিত Pilgrim's Progress নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আনয়ন করিয়া পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অবিলম্বে লিঙ্কলন এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করিয়া সমাপ্ত করিলেন। দ্বিতীয় বারে তাহার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত পঠিত হইলে সুপ্রসিদ্ধ উপাখ্যান Esop's Fable তাঁহার হস্তগত হয়। লিঙ্কলন এই দুই খানি পুস্তক পাঠে এতদূর নিবিষ্ট হইয়া উঠিলেন যে, আবশ্যকীয় গৃহ ও কৃষিকার্য্যে নিতান্ত অমনোযোগী হইয়া পড়িলেন। এই জন্য টমাস সময় সময় অলস ও অমনোযোগী বলিয়া পুত্রকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাম্‌জের লিখিত ওয়াসিংটনের জীবনচরিত ও Robinson Crusoe তাঁহার হস্তগত হয়। রবিনসন ক্রুসো পড়িয়া তিনি ডিফোর রচনা ও বর্ণনার চাতুর্য্যে মুগ্ধ হন। পিতার কুটীর হইতে দুই মাইল দূরে ইতিমধ্যে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ডরসি নামক একজন নামমাত্র শিক্ষক বিদ্যালয়স্থ বালকদিগের অধ্যাপনা কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। লিঙ্কলন এখানে বানান ও পাটীগণিত শিক্ষার নিমিত্ত ভর্ত্তি হইলেন। হাতের লেখা, বর্ণবিন্যাস, রচনা ও পুস্তক পাঠে লিঙ্কলন শিক্ষক অপেক্ষা কোনও অংশে হীন ছিলেন না। কয়েক সপ্তাহ পরেই অশিক্ষিত শিক্ষকের দোষে বিদ্যালয়টী উঠিয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে তিনি আরও দুইটী এবম্বিধ ক্ষণস্থায়ী পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইয়া লেখা পড়া শিক্ষা করেন।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্রফোর্ড নামক অপর একজন শিক্ষিত ব্যক্তি (পূর্ব্বে ডাসির পাঠশালা যেখানে ছিল, ঠিক সেই স্থানে একটী পাঠশালা খুলিলে, লিঙ্কলন শিক্ষার্থী হইয়া সেই পাঠশালায় যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্টতা জন্মিল। তিনি লিঙ্কলনের গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহার পিতার নিকট মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। অতি দুরূহ ও কঠিন বলিয়া তিনি বিদ্যালয়ের কোন ছাত্রকেই রচনা শিক্ষা দিতেন না, কিন্তু লিঙ্কলনের মানসিক উন্নতি বিধানে মনোযোগী হইয়া ক্রফোর্ড তাঁহাকে গদ্য ও পদ্য রচনা শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রচনার সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ে তিনি ক্রফোর্ডের নিকট বক্তৃতা দেওয়াও অভ্যাস করেন। তাঁহার একরূপ প্রখরা স্মৃতিশক্তি ছিল যে অধীত পুস্তক ও শ্রুত বক্তৃতা হইতে অনেক অংশ অবিকল বলিয়া বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্র ও সহচরদিগকে অনেক সময়ে আমোদিত করিতেন। তিনি জীবজন্তুর প্রতি কখনও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্রদিগের এবম্বিধ নিষ্ঠুর কার্য্যে বাধা দিতেন এবং অনেক সময়ে তাহাদের অনেককে নিষ্ঠুরতার জন্য অতি তীব্র ও মর্ম্মভেদী তিরস্কার করিতেন। জীবজন্তুর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার একান্ত অনুচিত এই বিষয়ে তিনি এক সুন্দর ও সবল বক্তৃতা দিয়া স্বীয় হৃদয়ের অপরিসীম মহত্বের পরিচয় প্রদান করেন।

একদা লিঙ্কলন বিদ্যালয়ে যে হরিণ শাবক ছিল, তাহার শৃঙ্গ দৈবাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তিনি সরলভাবে আপনার দোষ শিক্ষক ও অপরাপর ছাত্রগণের নিকট প্রকাশ করিয়া সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দেন।

ওয়াসিংটনের ন্যায় তিনি অসত্য ও মিথ্যাকে বাল্যকাল হইতেই অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। পাঁচ বৎসরের বয়সের সময় ওয়াসিংটন পিতার বাগানে প্রবেশ করিয়া বালসুলভ চপলতার উপরোধে পিতৃরোপিত চেরিবৃক্ষ হস্তস্থিত নবনির্ম্মিত কর্ত্তরিকা দ্বারা ছেদন করেন ও অকপটে পিতার নিকটে আত্মদোষ প্রকাশ করিয়া সত্যনিষ্ঠ পিতাকে পরিতুষ্ট করেন। লিঙ্কলনের সত্যনিষ্ঠায় তাঁহার শিক্ষকও সম্ভবত বিশেষ তুষ্টি লাভ করেন।

লিঙ্কলন শুদ্ধরূপে বর্ণবিন্যাস করিতে বাল্যকাল হইতেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। কি শিক্ষক, কি ছাত্র, কেহই কখনও মনে করিত না যে তিনি বানানাদি সম্বন্ধে ভ্রমে পতিত হইবেন। এই বিষয়ে অতি কৌতুকাবহ আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। একদা শিক্ষক ক্রফোর্ড বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে "de-fied শব্দের বানান জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহ fide, কেহ fyd, কেহ fyde এবং কেহ fyed বলিয়া বানান করিল। কেহই শব্দটী শুদ্ধরূপে বানান করিতে পারিল না দেখিয়া, শিক্ষক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি তাহাদিগকে সারাদিন কয়েদ থাকিবার আদেশ করিলেন। সেই শ্রেণীতে রাবি নাম্নী বালিকা অধ্যয়ন করিত। লিঙ্কলন তাহার প্রতি একটু অনুরক্ত ছিলেন। এই সময়ে তিনি গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া ছাত্রদের দুর্গতি দেখিয়া হাসিতেছিলেন। রাবির দিকে চাহিয়া তিনি ঈষৎ হাস্য করিয়া শিক্ষকের অজ্ঞাতসারে আপনার একটী চক্ষুতে (eye) অঙ্গুলী রাখাতে চতুরা বালিকা বুঝিতে পারিল যে, শেষোক্ত defyed শব্দের y অক্ষরের স্থলে i হইবে। লিঙ্কলনের ইঙ্গিত অনুসারে, বালিকা শব্দটী শুদ্ধরূপে বানান করিয়া নিজকে ও সহাধ্যায়ী বালকগণকে কয়েদ-মুক্ত করিল।

এইরূপে অল্প কালের মধ্যেই বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে লিঙ্কলনের সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্ব সংস্থাপিত হয়। আপনার মধুর উপদেশ, বচন বিন্যাস ও অন্যান্য নানা উপায়ে তিনি সহচর ছাত্রদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপন করিতেন। তাহাদের মধ্যে কোনও বিষয় লইয়া বিবাদ হইলে আপোষে তাহা মিটাইয়া দিতেন। এই জন্য ছাত্রগণ 'শান্তি-সংস্থাপক' বলিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া ডাকিত ও সবিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিত। তাঁহার রাজপদ প্রাপ্তির অনতিবিলম্বে যুক্তরাজ্য যে ঘোরতর গৃহবিবাদে দাসত্ব প্রথা লইয়া (১৮৬১-৬৪ খৃঃ) দগ্ধীভূত হয়, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও তাহা নিবারণে সমর্থ হন নাই এবং আপনার 'শান্তিসংস্থাপক' নামের সার্থকতা বিধান করিয়া বিনা রক্তপাতে স্বদেশের কল্যাণ সাধনে সক্ষম হন নাই। কারণ স্বাধীনতার চিরকলঙ্ক দাসত্ব প্রথা প্রচলিত রাখিয়া আমেরিকাকে নরকের গভীর অন্ধকারে চির কালের জন্য নিমজ্জিত করিতে, দক্ষিণ দিগস্থিত কেরোলিনাদি প্রদেশ সকল বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। তিনি উত্তরস্থ দাসত্ব প্রথার চির-বিরোধী প্রদেশ সমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় আমেরিকার যুক্ত রাজ্য হইতে সমূলে দাসত্ব উন্মূলিত করিয়া ৩০ লক্ষ কৃষ্ণবর্ণ দাসকে স্বাধীনতা প্রদান পূর্ব্বক বর্ণভেদের বৈষম্য দূরীভূত করেন, এবং সর্ব্বতোভাবে সাম্য মৈত্রী ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আমেরিকাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীনতার লীলাভূমিতে পরিণত করেন।

চারি বৎসর ঘোরতর যুদ্ধের পর দক্ষিণস্থ প্রদেশ সকল পরাজিত হইয়া সর্ব্বত্র ন্যায় ও সত্যের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের ক্রোধ ও জিঘাংসা পরিতৃপ্ত হইল না। যে দেবোপম মহাপুরুষ আমেরিকাকে ন্যায় ও সাম্য মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দাসত্ব প্রথার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল হইতে চিরকালের জন্য স্বদেশের উদ্ধার সাধন করেন, অবশেষে তাঁহার অমূল্য হৃদয়শোণিত পান না করিয়া সেই পাশবিক জিঘাংসা পরিতৃপ্ত হয় নাই। বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট ব্যতীত এমন মহাপুরুষ আর কয়জন আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের পদরেণুতে পৃথিবীকে পবিত্রীকৃত করিয়াছেন এবং চিরদুঃখী ও দরিদ্রের উদ্ধারার্থ আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহা জানি না।

লিঙ্কলন ক্রফোর্ডের নিকট ভদ্র সমাজে রীতি নীতি শিক্ষা করেন। বিদ্যালয় গমনের অল্পকাল পরেই তিনি ত্রৈরাশিক ব্যতীত পাটীগণিতের সমুদায় বিষয় শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন। শিক্ষকের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বেই তিনি ত্রৈরাশিক ও সমানুপাত আয়ত্ত করিলেন। তাঁহার সহাধ্যায়ী ডেভিড টারণহান কহিয়াছেন যে, "শিক্ষকদিগের যতটুকু বিদ্যা থাকিত, তাহা শিক্ষা না করিয়া আব্রাহাম কখনও কোন স্কুল পরিত্যাগ করেন নাই।"

ক্রফোর্ডের বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া লিঙ্কলন তিন বৎসর পর্য্যন্ত গৃহে বসিয়াই অতি যত্নের সহিত, দৈবাৎ যখন যে পুস্তক পাইতেন, তাহা অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতৃগৃহ হইতে ৫ মাইল দূরে ছোয়ানী নামক একজন শিক্ষক একটী বিদ্যালয় খুলিলে তিনি তাহাতে কয়েক দিন পাঠ করিয়া ১৮ বৎসর বয়সে ছাত্রজীবন সমাপন করেন। ক্রমে ক্রমে ৫টী পাঠশালায় লিঙ্কলন মোটে এক বৎসরেরও ন্যূন সময় অধ্যয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন!! আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেণ্টকে এইরূপ সামান্য শিক্ষা লাভ করিয়াই আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকিতে হইল।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

ভারবি।

বাল্মীকি, ব্যাস, জগতের আদর্শ কবি। তাঁহাদের পরে নাম করিতে হইলে, কালিদাসই প্রথম চিন্তাপথে উপস্থিত হন, তার পর ভারবি। ভারবির অন্য কাব্য ছিল কি না, জানিবার উপায় নাই, কিন্তু তাঁহার কিরাতার্জ্জুনীয় অতি উচ্চ দরের মহাকাব্য। ইহার কবিতা গুলি যেমন মাধুর্য্যময়, তেমনই ভাবপূর্ণ। বৃথা অতিশয়োক্তি দ্বারা তিনি স্বকীয় কাব্যকে দূষিত করেন নাই। তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় যেমন কুশলী, মানবের চিত্তবৃত্তি পরিজ্ঞানেও ততোধিক কৃতী। তাঁহার নির্দ্দোষ কবিতার নানা গুণ সত্বেও পূর্ব্বতন সমাজে যে তিনি তত প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই; তাহা মন্তব্য দ্বারাই প্রকাশিত হইতেছে। প্রাচীনেরা বলিয়াছেন :—

তাবদ্ভাভারবের্ভাতি, যাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ।
উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ॥

ইহা বোধ হয়, যমক ও অনুপ্রাসপ্রিয়

পাঠকদিগের উক্তি হইবে, নতুবা ভাবের পক্ষপাতী পণ্ডিতসমাজ, কদাচ তাঁহাকে মাঘ ও শ্রীহর্ষের নিম্নে আসন প্রদান করিবেন না। তাঁহার গভীরার্থ কবিতা গুলি পাঠ করিতে করিতে হৃদয়ে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব ভাব উপস্থিত হয়। তাঁহার লেখনী কখনও বীর-রসে প্রমত্ত হইয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ করিয়াছে, কোন স্থানে বা আদিরসের কুসুম-সৌরভ বিতরণ করিয়া যুবজনের চিত্তবৃত্তির অনু-বর্ত্তন করিয়াছে, কোথাও শান্তি-সলিল প্রক্ষেপ দ্বারা বীর-হৃদয়েও বৈরাগ্য জন্মা-ইবার চেষ্টা করিয়াছে। মানবহৃদয়ের মনস্বিতা, তেজ, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ গুলি যেন তাঁহার সুপরীক্ষিত ছিল, তাই যেখানে যে ভাবটী সুসঙ্গত, সেখানে সেইটী বিন্যাস করিয়াছেন।

তাঁহার কাব্যের নায়ক নায়িকার গুণ সমূহ চর্চ্চা করিবার পূর্ব্বে ইতিবৃত্তটা প্রক-টিত করা উচিত। পাণ্ডবগণ পাশক ক্রীড়ায় পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইয়া, বনে আসিয়া-ছেন। সর্ব্বদা বিপক্ষদিগের কথা তাঁহা-দের হৃদয়ে জাগরুক। শত্রুরা কিরূপ রাজ্য-শাসন করিতেছে, জানিবার জন্য দ্বৈত-বনে অবস্থান কালে একজন বনেচর পাঠাই-য়াছিলেন। সে আসিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট সুযোধনের প্রজাপালনের অতি সুশৃঙ্খলা বর্ণন করিল। যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী-গৃহে গিয়া, ভ্রাতাদের নিকট সমুদয় বলিলে, প্রথম যাজ্ঞসেনী, পরে বৃকোদর অতি ওজস্বিভাবে নিজ দুঃখ জ্ঞাপন পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য উত্থিত হইতে উপদেশ প্রদান করিলেন। ধর্ম্মরাজও নীতিযুক্ত বাক্য দ্বারা যখন প্রোক্ত বাক্যের উত্তর প্রদান করিতেছেন, এমত সময়ে মহর্ষি কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন, সেখানে উপনীত হইলেন এবং অর্জ্জুনকে মন্ত্রদীক্ষিত করিয়া তপস্যার আদেশ করিয়া চলিয়া গেলেন। অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের আদেশে, ব্যাস-নির্দ্দিষ্ট বনে-চরের সহিত হিমালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিরাত, ইন্দ্রকীল পর্ব্বত প্রদর্শন করিয়া চলিয়া গেল। অর্জ্জুন সেখানে তপস্যা আরম্ভ করিলে, পর্ব্বতবাসীরা দেবরাজকে সংবাদ প্রদান করিল। দেব-রাজ, অর্জ্জুনের অন্তঃকরণ পরীক্ষার জন্য অপ্সরাদিগকে পাঠাইলেন। কিন্নরীগণ অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া গেল। তখন স্বয়ং দেবরাজ আসিয়া অর্জ্জুনকে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু পার্থ, বৈরশোধন না করিয়া মুক্তিও শ্রেয়স্কর নহে, বোধ করিয়া ইন্দ্রের বাক্যে সম্মত হইলেন না। ইন্দ্র আত্ম-পরিচয় দিয়া মহাদেবকে আরাধনা করিতে উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। অর্জ্জুন পুনরায় কঠোর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। মুণিগণ মহাদেবকে অর্জ্জুনের তপঃপ্রভাবের বিষয় বলিলেন। পরে কিরাতরূপী মহাদেবের সহ অর্জ্জুনের ঘোরতর সংগ্রাম হয় এবং মহাদেবকে জানিতে পারিয়া অর্জ্জুন স্তব করেন এবং মহাদেবের প্রসাদ স্বরূপ পাশু-পতাস্ত্র লাভ করিয়া প্রত্যাগত হন।

এই মহা কাব্যের নায়ক, অর্জ্জুন। আলঙ্কারিকেরা নায়কের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদনুসারে অর্জ্জুনকে ধীরো-দাত্ত নায়ক বলা যাইতে পারে, কারণ শোভা, বিলাস, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজঃ, উদারতা প্রভৃতি নায়কের যে সকল সাধারণ গুণ উক্ত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন ধীরো-

দান্ত নায়ক, আরও কতক গুলি গুণে মণ্ডিত, সে সকল এই যথাঃ—ত্যাগশীলতা, কৌলীন্য, দক্ষতা, তেজস্বিতা, পাণ্ডিত্য, সচ্চরিত্রতা ইত্যাদি। অর্জ্জুনে এই সকল গুণের কোনটী কিরূপ ভাবে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত কবিতা গুলি দ্বারা তাহা কতকটা বুঝা যাইতে পারে। বনেচরেরা দেবরাজের নিকট গিয়া অর্জ্জুনের প্রকৃতি বর্ণন করিতেছে। যথাঃ—

উরুসত্ত্বমাহ বিপরিশ্রমতা,
পরমং বপুঃ প্রথয়তীব জয়ং,
শমিনোঽপি তস্য নবসঙ্গমনে
বিভুতানুসঙ্গি ভয়মেতি জনঃ ॥৩৫। ষষ্ঠ সর্গ।

আয়াস করিলেও শ্রমবোধ নাই, ইহাতেই তাঁহার মহাসত্ত্বতা প্রকটিত হইতেছে, আর আকার দেখিলেই জয়শীল বলিয়া বোধ হয়। যদিও শান্তিপ্রিয় তপস্বী, কিন্তু তাঁহার সহিত প্রথম সমাগমে, লোকে একটী ভয় প্রাপ্ত হয়, উহা প্রভুত্বের স্বাভাবিক সহচর।

প্রভবতি ন মনঃ কদম্ববায়ৌ,
মদমধুরেচ শিখণ্ডিনাং নিনাদে।
জনইব ন ধৃতেশ্চ চাল জিষ্ণুঃ,
নহি মহতাং সুকরং সমাধিভঙ্গঃ ॥ ২৩।
দশম সর্গ।

কদম্ব সংসর্গী বায়ু প্রবাহিত হইলে এবং মদমত্ত ময়ূরের মধুর নিনাদে, অর্জ্জুনের অন্তঃকরণকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিল না, সামান্য জনের ন্যায় তিনি ধৈর্য্য হইতে বিচলিত হয়েন নাই। যেহেতু মহান্ ব্যক্তিদের সমাধিভঙ্গ, সুসাধ্য নহে। আবার অপ্সরাগণ অর্জ্জুনকে নানারূপে প্রলোভিত করিয়াও যখন কৃতকার্য্য হইতে পারিলনা, তখন বলিতেছে,—

যদি মনসি শমঃ কিমঙ্গচাপং,
শঠ বিষয়াস্তব বল্লভা ন মুক্তিঃ।
ভবতু দিশতি নান্য কামিনীভ্যঃ,
তব হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরাবকাশং ॥৫৫। ১০ম সর্গ।

তোমার মনে যদি শান্তিই থাকিবে, ওহে তবে ধনু কি জন্য? হে শঠ। বিষয়ই তোমার প্রিয়, মুক্তি তোমার স্পৃহনীয় নহে। তাহা হউক, তোমার কোন হৃদয়েশ্বরী তোমার হৃদয় অধিকার করিয়া আছে, সেই জন্য কামিনীদের অবকাশ প্রদান করিতেছনা। আবার তাপসরূপী সহস্র লোচনের উপদেশে সম্মত না হইয়া স্থির অধ্যবসায় অর্জ্জুন বলিতেছেন,—

বিচ্ছিন্নাভ্র বিলায়ং বা বিলীয়ে নগমূর্দ্ধনি।
আরাধ্য বা সহস্রাক্ষমযশঃশল্যমুদ্ধরে॥ ৭৯।
১১শ সর্গ।

বায়ু-তাড়িত অভ্র যে প্রকার আকাশে বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ এই পর্ব্বতে লয় পাইব, অথবা সহস্র-লোচনকে আরাধনা করিয়া, অযশঃশল্য উদ্ধার করিব।

আবার যে সময় বিদ্ধ বরাহের অঙ্গ হইতে, শর লইয়া অর্জ্জুন প্রত্যাগত হইতেছেন, সে সময় ছদ্মরূপী মহাদেবের দূত কিরাত আসিয়া, এই বান আমার প্রভুর, এই কথা বলায় অনেকক্ষণ উভয়ে বাদানুবাদ হইল, তার পর অর্জ্জুন বলিতেছেন,—

অসিঃ শরা বর্ম্ম ধনুশ্চ নোচ্চৈঃ,
বিবিচ্য কিং প্রার্থিতমীশ্বরেণতে।
অথাস্তি শক্তিঃ কৃতমবযাচ্ঞয়া,
নদূষিতঃ শক্তিমতাং স্বয়ং গ্রহঃ ॥২০।১৪শ সর্গ।

“খড়্গ, বান, কবচ, উৎকৃষ্ট ধনু, ইহার মধ্যে কোন বস্তু তোমার প্রভু বিবেচনা করিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন। অথবা যদি শক্তি থাকে, যাচ্ঞা না করিয়াও প্রয়োজন

কি? বীরদিগের স্বয়ং গ্রহণ, নিন্দনীয় নহে।" ইহা কি অল্প বিক্রমের পরিচয় দিতেছে। কোথায় সুদূর হিমালয় শিখর, কোথায়ইবা সহচর পর্য্যন্ত শূন্য, নিঃসহায়, একাকী অর্জ্জুন। কোন্ ব্যক্তি শত্রু-বেষ্টিত স্থানে এইরূপ গর্ব্বিত বাক্য প্রয়োগ করিতে পারে?

নায়কের বিষয় যাহা কিছু উদ্ধৃত হইল, ইহাতেই নায়কোচিত গুণের উৎকর্ষতা কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে। এখন এই কাব্যের নায়িকা দ্রৌপদী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা আবশ্যক। কালিদাসের শকুন্তলা, ভবভূতির মালতী কি সীতা, বানভট্টের মহাশ্বেতা অথবা কাদম্বরী, হর্ষদেবের সাগরিকা, কিংবা শ্রীহর্ষের দময়ন্তী যে ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত, দ্রৌপদী সে উপাদানে গঠিতা নহেন। প্রোক্ত নায়িকারা, কেবল কোমলতারই আধার, কিন্তু ভারবির দ্রৌপদীতে কর্ত্তব্যবুদ্ধির কঠোরতা পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। তিনি বীরের উপযুক্ত ভার্য্যা, রাজ্যের উপযুক্ত রাজ্ঞী, প্রেমিকেরও উপযুক্ত প্রণয়িণী। যখন বনেচর দুর্য্যোধনের রাজ্য শাসনের চরমোৎকর্ষ বর্ণন করিয়া গেল, তখন দ্রৌপদী বলিতেছেন,—

ভবাদৃশেষু প্রমদাজনোচিতং,
ভবত্যধিক্ষেপ ইবানুশাসনং।
তথাপি বক্তুং ব্যবসায়য়ন্তিমাং
নিরস্তনারীসময়া দুরাধয়ঃ॥২৮। প্রথম সর্গ।

যদিও ভবাদৃশ বীরগণের প্রতি স্ত্রীজন কর্ত্তৃক উপদেশ অনুচিত এবং তিরস্কার তুল্য, তথাপি প্রমদাজনের লজ্জাভঙ্গ জন্য যে মানসিক ব্যথা, তাহাই আমাকে বলিবার জন্য প্রবৃত্ত করিতেছে।

ভবন্তি মে তর্হি মনস্বি গর্হিতে,
বিবর্ত্তমানং নরদেব বর্ত্মনি।
কথং ন মন্যুর্জ্জ্বলয়ত্যুদীরিতঃ,
শমীতরুং শুষ্কমিবাগ্নিরুচ্ছিখঃ॥৩২। ১ম সর্গ।

হে নরদেব! আপনি মনস্বিজন কর্ত্তৃক বিগর্হিত পথের অনুসরণ করিয়াছেন। উদ্ধশিখা বহ্নি বিশুষ্ক শমীতরুর ন্যায়, প্রদীপ্ত ক্রোধানল আপনাকে কেন দগ্ধ করিতেছে না।

অবন্ধ্যকোপস্য বিহন্তুরাপদাং
ভবন্তি বশ্যাঃস্বয়মেব দেহিনঃ।
অমর্ষশূন্যেন জনস্য জন্তুনা
ন জাতহার্দ্দেন ন বিদ্বিষাদরঃ॥৩৩। ১ম সর্গ।

যাহার কোপ বন্ধ্যা প্রাপ্ত হয় না, প্রাণিগণ আপনা হইতেই সেই আপদ নিবারণক্ষম ব্যক্তির বশতাপন্ন হয়। ক্রোধশূন্য হইলে, কি শত্রু কি মিত্র কেহই আদরও করে না।

দ্বিষন্নিমিত্তা যদিয়ং দশা ততঃ,
সমূলমুন্মূলয়তীব মে মনঃ
পরৈরপর্য্যাসিতবীর্য্যসম্পদাং,
পরাভবোঽপ্যুৎসব এব মানিনাং॥৪১। ১ম সর্গ।

যেহেতু শত্রু কর্ত্তৃক আপনার এই দশা হইয়াছে, তজ্জন্যই আমার অন্তঃকরণ ব্যথিত। বিপক্ষ দ্বারা যাঁহাদের বলবীর্য্য নিরাকৃত হইয়াছে, তাদৃশ অভিমানী ব্যক্তিদের (যুদ্ধ করিয়া) পরাভবও উৎসব বলিতে হইবে।

পুরঃসরা ধামবতাং যশোধনাঃ,
সুদুঃসহং প্রাপ্য নিকারমীদৃশং।
ভবাদৃশাশ্চেদধিকুর্ব্বতে রতিং,
নিরাশ্রয়া হন্ত হতা মনস্বিতা॥ ৪৩।

তেজস্বীদিগের অগ্রগণ্য, আপনাদের ন্যায় যশোধন ব্যক্তিরাও যদি এইরূপ পরাভব প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষ অবলম্বন করেন, তবে দেখিলাম, মনস্বিতা আশ্রয়শূন্য হইয়া বিনষ্ট হইতে চলিল।

এই মহাকাব্য বীররস প্রধান, আদি ও শান্তিরস অপ্রধানরূপে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ঋতু, শৈল, বন, যুদ্ধপ্রয়াণ, মন্ত্রণা প্রভৃতি যাহা আবশ্যক, কবি সে সমুদয়ই অতি সুচারুরূপে ইহাতে বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু কালিদাসের সময় হইতে যে যমক অনুপ্রাস ও চিত্রময় কবিতা লেখার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল, ইনি তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, কিন্তু ভারবি, যমক ও অনুপ্রাস সৃষ্টিতে তত উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই, এ বিষয়ে মাঘভট্ট অধিক কৃতকার্য্য হইয়াছেন। চিত্রময় শ্লোক রচনায় মাঘ ও ভারবি উভয়ই সমানধর্ম্মা। নিম্নে ভারবিকৃত একটী চিত্রময় কবিতা উদ্ধৃত হইল। এই শ্লোকটী যে দিক হইতে পাঠ করা যাইবে, তাহাতে তুল্য আকার ও তুল্য অর্থ প্রকটিত হইবে।

[সর্ব্বতোভদ্র।]

দে বা কা নি কা বা দে
বা হি কা স্ব কা হি বা
কা কা রে ভ রে কা কা
নি স্ব ভ ব্য ভ স্ব নি

১৫ শ সর্গ-৩৫ শ্লোক।

এ সকল গেল পুরাতন সংস্কার, কিন্তু একটী বিষয়ে ভারবি আধুনিক পাঠকবর্গের নিকট নিতান্ত অভিযুক্ত। তিনি অনুচিত আদিরস বর্ণনা দ্বারা যে কয়েকটী সর্গ কলুষিত করিয়াছেন, উহা না করিলে তাঁহার কিরাতার্জ্জুনীয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহাকাব্য হইত। তাঁহার ন্যায় আর একজন মনস্বী কবি ভবভূতি উত্তর চরিতাদি নাটকে নিতান্ত প্রযোজনীয় স্থলেও অতি সাবধানে আদিরসের অবতারণা করিয়াছেন। বস্তুতঃ অনবগুণ্ঠন আদিরস বর্ণনা করা প্রাচীন কবিদিগের একটী মহাদোষ! মাঘভট্ট ও ভারবির অনুকরণ করিতে বসিয়া নিতান্ত অশ্লীল বর্ণনা দ্বারা শিশুপাল বধের ৪টী সর্গ নিতান্ত অপাঠ্য করিয়া রাখিয়াছেন। যাহা হউক, এই দুই একটী সামান্য দোষ মহাকবি ভারবির পক্ষে তত কলঙ্কের বিষয় নহে। ইহা পাঠকগণ উপেক্ষাও করিতে পারেন। কারণ তাঁহার এই নারিকেল ফলসদৃশ কবিতা যদি আমরা অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে পারি, তাহা হইলে ইহাদ্বারা বহু উপকারের সম্ভাবনা, কিন্তু উপরে উপরে পাঠ করিলে অর্থাৎ অর্থের গভীরতারূপ ত্বক্ ভেদ না করিতে পারিলে ভারবির রসে একান্তই বঞ্চিত হইতে হয়। ভারবির জীবনবৃত্ত জানিবার জন্য অনেকের ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে। কিন্তু তাঁহার ইতিবৃত্ত অতীব অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমরা সেই তিমির ভেদ করিয়া যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছি, বারান্তরে উহা প্রকটিত করা যাইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র শর্ম্মা।

ইউরোপে দর্শন ও ধর্ম্ম প্রচার। *

খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মাবলম্বীগণ যেরূপ পরাক্রান্ত ও দিগন্তব্যাপী, তাহাতে বোধ হয়, অদূরদর্শী লোকেরা মনে করিবে, পরিশেষে খ্রীষ্টধর্ম্মই সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পৃথিবীকে পরাভূত

* নবজীবনে প্রকাশিত প্রস্তাবের পর হইতে আরম্ভ।

করিবে, বস্তুতঃ পৃথিবীর মহাখণ্ড চতুষ্টয়ে খ্রীষ্টীয় প্রচারক দ্বারা তাঁহাদিগের মণ্ডলী সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং অসংখ্য নর নারী তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া উক্ত ধর্ম্মেরই জয় বিঘোষণা করিতেছে। পৃথিবীর এ অভিনয়, সভ্যতা ও জ্ঞানোন্নতির বিরোধী কি না, জানি না, ধর্ম্ম জানেন, আর সমাজ-তত্ত্বদর্শী লোকেরা বলিতে পারেন। ঈশ্বর স্পষ্ট সকলেই, কে তাহা অস্বীকার করিবে? কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম ইহুদি কি আর্য্যজাতীয় ধর্ম্ম, তন্নিরূপণ কেহই করেন নাই। আমি তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কিন্তু ইহা কতদূর প্রতিপন্ন করিতে পারিব, বলিতে পারি না।

খ্রীষ্টীয় পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের পরম বিড়ম্বনা বাইবল, বাইবল বিজাতীয় শাস্ত্র। ইহাতে খ্রীষ্টোপাসকগণের যেরূপ সত্যদৃষ্টি সঞ্চালিত হয়, আমার সে চক্ষু নাই, সে জ্ঞান বুদ্ধি নাই, সেই হেতু ইহুদি শাস্ত্রকে ঈশ্বরাদিষ্ট বলিতে প্রাণে আঘাত লাগে। খ্রীষ্ট কে? তিনি গোলকের ঈশ্বর, অথবা যিরুশালমের মেসায়া? তিনি আর্য্য কি ইহুদি? মুনি কি যিহুদা দেশীয় যাজক? তিনি কে? হিন্দুস্থানী হিত বাক্য প্রসিদ্ধ আছে যে, "আগে দর্শন ঢালি, পিছে গুণ বিচারি", মথি লিখিত পুস্তকের একবিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে, যিশু যিরুশালম নগরীস্থ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তত্রস্থ পোদ্দারদিগের মুদ্রার আসন এবং কপোত-ব্যবসায়ীগণের আসন উল্টাইয়া ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "আমার পিতার প্রার্থনা-গৃহ দস্যুর গহ্বর করিও না।" বাইবলে খ্রীষ্টের এরূপ অসৌম্য ভাব আর কদাপি দৃষ্ট হয় না; তাঁহার এই ভাব দৃষ্টে আপাততঃ তাঁহাকে যিহুদীয় যাজ্ঞনি বলিয়া ধরিয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ। সমুদ্র-তরঙ্গমালা-বেষ্টিত দ্বীপে, মহা অরণ্যানি মধ্যে, সুবিশাল পর্ব্বতময় স্থানে, সুদীর্ঘ জনপদে অথবা রাজবর্ত্মে যে খ্রীষ্টের নাম প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাঁহার পরিচয় স্থল বাইবল। অপর স্থল পালিষ্টিন্ দেশ। তিনি পিতা মাতার সহিত সেই দেশে বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং প্রৌঢ়াবস্থায় নব ধর্ম্ম ও নব দীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর পাপ ও সন্তাপ হরণ করেন। সেই পালিষ্টিনের বৃত্তান্ত মধ্যে খ্রীষ্টের কার্য্য কলাপের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমস্ত ভুবন ব্যাপিয়া যাঁহার বিপুল মাহাত্ম্য সুবিস্তৃত আছে, তিনি যেই হউন, ভূমণ্ডলের এক জন অদ্বিতীয় মহাজ্ঞানী ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি পালিষ্টন কি ভারতবর্ষ, পুরাকালিক আঁধার-স্তর ভেদ করিয়া তাহা নিরূপণ করিতে না পারিলে জগতের অন্ধকার কোন ক্রমেই বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। সমালোচকগণ তৎসম্বন্ধে নানা রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমিও তাঁহাদিগের পদানুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া বিহিত অনুসন্ধানে অনুরক্ত হইয়াছি, কিন্তু মনুষ্য ভ্রমাদি পরিশূন্য কখনই নহে, এই হেতু আমার সে ভ্রম বিজ্ঞ লোকেরা উপেক্ষা করিবেন, কোন বিষয় সত্য হইলে তাহা ইতিবৃত্তেরই মহা মঙ্গলকর ঘটনা বলিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করিবেন। কিন্তু আমার সে আশা অতি অল্প, কারণ পুরাকালিক বিশ্বাসের কথা মনে উদয় হইলে আমি একেবারে ভগ্ন-মনোরথ হইয়া পড়ি, বাইবলের মতে মনুষ্য ও ঈশ্বরে এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে, ঈশ্বর মনুষ্যের সহিত কথা কন, মনোগত ভাব তাহাদিগকে জ্ঞাপন করেন,

এই বিশ্বাসের উপর সম্পূর্ণ রূপেই বাইবল গঠিত হইয়াছে। এ প্রকার বিশ্বাস পাশ্চাত্যে যেরূপ সাধারণ, ভারতে তত নহে, এতদ্দেশীয় দর্শন শাস্ত্রই তাহা প্রতিপন্ন করিতেছে।

"ইচ্ছায় আপন, করিলেন সৃজন,
আপনি গোপন তা।।"

ইউরোপের দর্শন শাস্ত্র নাই, পূর্ব্বে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি, এতদ্দেশীয় দর্শন লইয়া ইউরোপ দার্শনিক, নবজীবনে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী পাঠে সম্যক বুঝিতে পারিবেন। হিব্রু জাতির দর্শন শাস্ত্র ছিল না, দর্শনের মূল পদার্থ গুলিও বাইবলে বিচারিত হয় নাই। এক ঈশ্বর মূল পদার্থ বলিলে দর্শনের প্রকৃত ব্যাখ্যা হয় না। যাহাই হউক, পাশ্চাত্যগণ বাইবল্-বিশ্বাস বশত, স্বর্গীয় বিশ্বাস অপেক্ষা শাস্ত্রীয় বিশ্বাসকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন, সেই জন্য তদ্বিরুদ্ধে কোন লোকই তর্ক করিতে ইচ্ছা করেন না। আমি অগ্রে বলিয়াছি যে, খ্রীষ্টোপাসকেরা যে চক্ষে বাইবলের সত্য সন্দর্শন করেন, আমার সে চক্ষু নাই। এ পাপ চক্ষে যাজকগণের ভ্রম-কল্পিত কথা দৃষ্ট হয়। স্বর্গীয় বিশ্বাসে ভ্রম আছে, শাস্ত্রীয় বিশ্বাসে ভ্রম নাই, এ কথা যদি আমি বলি, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টা বিশ্বস্ত এবং কোন্‌টা অবিশ্বাস্য, বাইবলের সম্যক আলোচনা ভিন্ন কি হটাৎ বলা যাইতে পারে? আমি এ সম্বন্ধে কোন বিশেষ নির্দ্ধারিত মতে উপনীত হইতে পারিলাম না। আমার সামান্য বিবেচনায় এই মাত্র বোধ হয় যে, বাইবল-ভক্ত লোকেরা শাস্ত্রীয় বিশ্বাস স্বর্গীয় মনে করেন। তাঁহাদের মতে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তদ্বিরুদ্ধে কোন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। কারণ খ্রীষ্ট এবং ঈশ্বরে প্রভেদ আছে কি? এস্থলে শাস্ত্রীয় বিশ্বাসের আর একটি তেজের কথা হইল, সুতরাং শাস্ত্রানুমোদিত বিশ্বাসের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টের জন্মভূমি অর্থাৎ তাঁহার কার্য্যের পরিচয় স্থল পালিষ্টিনের বৃত্তান্ত পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত এস্থলে অবতারণা করিতেছি।

খ্রীষ্টের মৃত্যুর ষাইট বৎসর মধ্যে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত-লিপি সমাপ্ত হইয়াছিল, এই ষাইট বৎসরের ভিতর তাঁহার গোরস্থানের, ক্রুশের, জন্মস্থানের ও হত্যাস্থানের কোন বিবরণ ইবাঞ্জিলিষ্টগণ নিউটেষ্টামেণ্টে প্রকাশ করেন নাই। লোকে কি তখন খ্রীষ্টজীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনা-স্থানের কোন তত্ত্বই রাখিত না, অথবা জীবনচরিত-লেখকদিগের ঐ সকলের উপর মোটেই ভক্তি ছিল না? দাউদের মৃত্যু বিষয়ে পিতর ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছিলেন, তাঁহার দেহ মৃত্তিকাগত হইয়াছে, কিন্তু তিনি অদ্যাপি আমাদের প্রাণে কবরস্থ আছেন। কিন্তু খ্রীষ্টের মৃত্যু বিষয়ে পিতরের শোকর্তহৃদয় হইতে একটিবার ঐরূপ শোকোচ্ছ্বাস উদ্ভূত হয় নাই। পৌল খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং স্বর্গারোহণ বিষয়েই প্রাণ ধর্ম্ম ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু মৃত্যু বা স্বর্গারোহণ-স্থানের বিশেষ বৃত্তান্ত একেবারে উল্লেখ করেন নাই। ইঁহারা কি তবে খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ ঘটনাস্থান গুলিকে ভক্তি করিতেন না? অথবা তৎকালে লোকের ঐ সকল স্থানের প্রতি ভক্তি ছিল না? অথবা পালিষ্টিনে মোটেই খ্রীষ্টের কবর ছিল না? এই সকল প্রমাণ দ্বারা যখন প্রতিপন্ন হইতেছে, উপরোক্ত

সময়ে উহাদের প্রতি লোকের কোন আনুগত্য ছিল না, তখন উহাদের সত্যতা বিষয়ে কি প্রতিপাদন হইতে পারে? গল-গথা অটলাণ্টিক মহাসাগরে কিম্বা ভূটানে, এ পাপ প্রশ্নের মীমাংসা শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা কখনই প্রতিপন্ন হইবেনা। খ্রীষ্টীয় শাস্ত্র এ সম্বন্ধে নীরব।

আর একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করি। খ্রীষ্ট কোথায় জন্মিয়াছিলেন? বাইবলে কেবল আস্তাবলে জন্মের উল্লেখ আছে। অগষ্ট কৈশরের অনুমতিক্রমে সমস্ত রোম সাম্রাজ্যের মনুষ্য গণনা হইয়াছিল, সিরিয়া দেশের শাসনকর্ত্তা সাইরিনিয়াস্ সেই হেতু লোক-দিগকে আপন আপন নগরে যাইতে আদেশ করেন, মেরী ঐ জন্য বেথ্‌লেহমে নীতা হইয়াছিলেন, কিন্তু পান্থাবাসে স্থানাভাব জন্য মেরি আস্তাবলেই সন্তান প্রসব করেন। বাইবলের এ ব্রহ্ম-বাক্য খ্রীষ্টোপাসক মাত্রেই বিশ্বাস করেন। কিন্তু পরে প্রদর্শিত হইবে, এ সম্বন্ধে খ্রীষ্টোপাসকগণের কেমন মতভেদ আছে। সেই হেতু বলিতেছি, খ্রীষ্ট জীবদ্দশায় পালিষ্টিনের কোথায় কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। বাই-বলের মধ্যে যাহার নির্দর্শন নাই, পালিষ্টিনে আবহমান কাল খ্রীষ্টোপাসকদিগের তাহাতেই পরম বিশ্বাস আবদ্ধ রহিয়াছে। খ্রীষ্ট ইহুদী ছিলেন, তাঁহার কবর ইহুদিদিগের স্বদেশে বর্ত্তমান আছে, ইহা আপনিও জানেন, আমিও শুনিয়াছি, কিন্তু তিনি যে স্থানে ক্রুশে হত হইয়াছিলেন, বাইবেলে সে স্থানের নির্দ্দেশ কি আছে? এ সমস্ত স্থান বিদেশীয় যাজকেরাই নিরূপণ করিতে জানেন। এক্ষণে ঐ দেশ মুসলমানদিগের হস্তগত। খ্রীষ্ট-কবরের প্রতি লোকের অসীম ভক্তি জন্য বহুদূরবর্ত্তী দেশ হইতে অসংখ্য তীর্থযাত্রী এবং ভ্রমণকারী ঐ দেশে উক্ত কবরের উপর প্রার্থনা করিতে আইসে। কিন্তু প্রাচীন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মেতিহাসে এ সকল স্থানের বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত হয় নাই (১) এই হেতু যোধিয়া দেশ অযোধ্যা কি জুডিয়া? ইহা আণ্ডামান দ্বীপে, কি ভারতবর্ষে, নিশ্চয় কিরূপে বলিব?

এক হাজার পাঁচ শত বৎসর যিরুশালম মূর্খতা, কুসংস্কার ও প্রতারণার বাস্তুভূমি হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খ্রীষ্টীয় শতাব্দে খ্রীষ্টোপাসকগণের পালিষ্টিনে কোন প্রতিপত্তি ছিল না। উপাসনা গৃহাদি যে ছিল না, ইহা অসম্ভব কথা নহে। (২)

চতুর্থ খ্রীষ্টীয় শতাব্দে রোমের সম্রাট কন্‌স্তান্তাইন্ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতিপোষক হইয়া ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করেন, এই সূত্রে জানা যায় যে, উক্ত সময়ে ইউরোপের মধ্যে একটী নূতন ধর্ম্মতন্ত্রের পত্তন হইয়াছিল, এবং রোমীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর যাজকগণের অপরিসীম প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। রোমে কোন্ সময়ে বা কাহা কর্ত্তৃক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না; পেটৌ (Petou) নামা জনৈক লেখক রোমীয় বিসপগণের কাল-নিরূপক একটী তালিকা প্রস্তুত করেন। রোমীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর ইতিবৃত্তেও লিখিত

(1) "That they erected their churches on places consecrated by miracles, and especially on Calvary and over our Lord's Sepulchre, is a more questionable position There is at least no trace of it in the New Testament, nor in the history of the primitive church." Osborn's Holy Land, VII

(2) "That for the lapse of more than fifteen centuries, Jerusalum has been the abode not only of mistaken piety, but also of credulous superstition, not unmingled with pious fraud" Ibid VIII

হইয়াছে যে, পিতর রোমের প্রথম বিশপ ছিলেন। সাতায় খ্রীষ্টাব্দে শত্রুদ্বারা তিনি নিহত হইলে ইটুবিয়াস্থ লিনিয়স্ তৎপদে নিয়োজিত হন। তৎপরে ক্লেমেন্স রোমান্থ রোমেক বিশপ হন। যাজকদিগের এ ইতি-বৃত্তের মূল নিরাকৃত হওয়া অতি অসম্ভব।

৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে কনস্তান্তাইনের মাতা হেলেনা সর্ব্বাদৌ খ্রীষ্টের প্রসিদ্ধ ঘটনা সম্বন্ধীয় স্থান নিরূপণে সচেষ্টিতা হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে নানা বিদেশীয় যাজকগণ পালিষ্টিনে আসিয়া ঐ কার্য্যে যোগ দেন। ঐ সময়ে উক্ত বিদেশীয় যাজকগণ অধিকাংশ মূর্খ ছিল। বিশেষতঃ তাহারা ঐ দেশ প্রচলিত "অরমিয়" ভাষা জ্ঞাত ছিল না। পালিষ্টিনের অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তাহারা সর্ব্বতোভাবে অনভিজ্ঞ বলিয়া অপরিচিত দেশীয় লোকের নিকট ও তাহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী বিশপগণের নিকট যাহা অবগত ছিল, তাহাই মাত্র উল্লেখ করিয়াছে। ঐ বর্ণনা অত্যন্ত অসার ও অকিঞ্চিৎকর। (৩)

চতুর্থ শতাব্দ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দ কেবল জনপ্রবাদ বৃদ্ধি এবং পালিষ্টিনের প্রসিদ্ধ ঘটনা-স্থান নিরূপণ কার্য্যেই পরিসমাপ্ত হয়। সপ্তম খ্রীষ্টীয় শতাব্দে মুসলমানগণের যুদ্ধানল প্রজ্জ্বলিত হওয়ায় পালিষ্টিনের অধিবাসীদের কষ্টের আর সীমা ছিল না। যাজকগণ উক্ত স্থানের এই বিপন্ন দশা দর্শন করিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও সসব্যস্ত হইয়াছিল। সুতরাং এই স্থানেই পালিষ্টিনের যাজকদিগের উৎসাহ-বহ্নি নির্ব্বাণ হইল। যে সকল কল্পিত স্থানাবিষ্কার অগ্রে হইয়াছিল, তাহাই চির প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পূজ্য হইয়া গেল।

নিউইয়র্ক-নিবাসী প্রসিদ্ধ লেখক ডাক্তার রবিন্সন সাহেব স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, পালি-ষ্টিনের ইতিহাস এবং অন্যান্য বৃত্তান্ত সম্যক আলোচনা দ্বারা আমার এইরূপ দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, তথায় এক্ষণে খ্রীষ্টের কবর, মৃত্যু ও জন্ম স্থানাদি সম্বন্ধে যে সকল স্থল প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণকারীগণ যে যে স্থানের বর্ণন করেন, তাহা প্রকৃত ঘটনা স্থান নহে। উহা যাজকগণের প্রতারণার কৌশলমাত্র। রোমের রাজমহিষী বৃদ্ধা হেলেনার ক্রুশাবিষ্কার যেরূপ, খ্রীষ্টের কবর ও মৃত্যু স্থানাদি নির্ণয়ও সেই রূপ ভণ্ডামী মাত্র। ত্রাণকর্ত্তা যিশুর কবর বা মৃত্যুস্থান নিরূপণ করা, সকল চেষ্টার অতীত হইয়া পড়িয়াছে (৪)। খ্রীষ্টের জন্মস্থান আরও

(3) "So all the reports and accounts we have of the Holy City and its Sacred places have come to us from the same impure source The fathers of the Church in Palestine, and their imitators, the monks, were themselves for the most part not natives of the country With few exceptions, they knew little of its topography, and were mostly unacquaintad with the Aramæan, the vernacular language of the common people They have related only what was transmitted to them by their predecessors, also foreigners, or have given opinions of their own, adopted without critical inquiry, and usually without much knowledge In this way and from all these causes, there has been grapted upon Jerusalem and the Holy Land a vast mass of tradition, foreign in its source, and doubtful in its character, which has flourished luxuriantly aud spread itself out widely over the western world * * * * That all ecclesiastical tradition respecting the ancient places in and around Jerusalem and throughout Palestine is of no value, except * * * " Ibid VIII.

(4) "In every view which I have been able to take of the question, both topographical and historical, whether on the spot or in the closet, and in spite of all my previous prepossessions, I am led irresistibly to the conclusion that the Golgotha and the Tomb now shown in the church of the Holy Sepulcre are not upon the real places of the crucifixion and resurrection of our Lord The alleged discovery of them by the aged and credulous Helena, like her discovery of the cross, may not improbably have been the work of pious fraud. * * * If it

দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার। পালিষ্টিনে খ্রীষ্টের জন্মস্থান সম্বন্ধে যাহা নিরূপিত আছে, তাহা পর্ব্বতগুহা, আস্তাবল নহে। তএত্য খ্রীষ্টোপাসকগণের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে, খ্রীষ্ট পর্ব্বত-গুহায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'দ্বিতীয় শতাব্দের মধ্য সময়ে যষ্টিন মার্টর স্পষ্ট রূপেই বলিয়াছেন, খ্রীষ্টের পর্ব্বত-গুহায় জন্ম হইয়াছিল। বেথ্লেহমের নিকট ঐ পর্ব্বতগুহা অবস্থিত। তৃতীয় শতাব্দেও ঐ রূপ জনপ্রবাদ ছিল, কারণ ওরিগেন্ বলিতেছেন যে, খ্রীষ্টের পর্ব্বতগুহায় জন্ম, ইহা সর্ব্বসাধারণে অবগত ছিল, যাহারা খ্রীষ্টের শিষ্য নহে, তাহারাও উহা স্বীকার করিতেছে। চতুর্থ শতাব্দের প্রারম্ভে ইউসিবিয়স লিখিয়াছেন, হেলেনের পালিষ্টীনে যাইবার অগ্রে তিনি খ্রীষ্টের জন্মস্থানের উপর একটী গির্জা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সব বড় বড় মাতব্বর যাজক কি মিথ্যা বলিতে পারেন? কিন্তু ইবাঞ্জিলিষ্টগণ ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত, বাইবলে আস্তাবলের উল্লেখ তাহারাই করিয়াছেন। খ্রীষ্টের জন্মস্থান সম্বন্ধে বাইবেল এবং পরবর্ত্তী যাজকগণের মতের বিরোধ দেখা যায়। বিষয়টা সম্পূর্ণই অন্ধকারাবৃত, সন্দেহ নাই। দেশস্থ লোক সকলে স্থান প্রাপ্ত হইল কিন্তু মেরীর স্থানাভাব হইয়াছিল; অতি আশ্চর্য্য কথা। ইহাতে ঈশ্বরের নিগূঢ় মর্ম্ম কিছু থাকিতে পারে।

কোথা হইতে রোমে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম আসিয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শন নাই। কনস্তান্তাইনের হস্তেই ইহার নানা রূপ গঠিত হইয়াছিল। কনস্তান্তাইন খ্রীষ্টধর্ম্মের নিয়ন্তা বলিলেও বলা যায়। কিন্তু তাঁহার ঐ ধর্ম্ম রোমে সৃষ্টি হইবার বহু পূর্ব্বে জ্ঞস্তিক ধর্ম্মাবলম্বীগণ রোমে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জ্ঞস্তিক ধর্ম্মের অসাধারণ প্রাধান্য খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মে। কিন্তু খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের অসাধারণ প্রাধান্য জ্ঞস্তিক ধর্ম্মে আছে,এ কথা শুনিতে পাই না। জ্ঞস্তিক ধর্ম্মই বা কি, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মই বা কি? দুইটী পৃথক ধর্ম্ম, কিন্তু একের উপর অন্যের অসাধারণ প্রাধান্য লাভের হেতু কি? বুঝিতে পারিলাম না।

পালিষ্টিনের প্রাচীন পর্ব্বতভেদী পুরী সকল দৃষ্টে জানা যায়, অতি দূরবর্ত্তী কালে তথায় বৌদ্ধধর্ম্মাধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল অক্ষয় বৌদ্ধকীর্ত্তি বর্ত্তমান থাকিতে বৌদ্ধধর্ম্মের কখনই বিনাশ নাই। পালিষ্টিনের বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে মহারাজা অশোকের ধর্ম্মানুশাসন লিপি আর একটী অদ্বিতীয় প্রমাণ।

শ্রীজগন্নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভবভূতি ও প্রকৃতি।

*ভবভূতির প্রকৃতি-উপাসনা প্রদর্শন করিতে হইলে, তাঁহার যাদৃশী বর্ণনায় উহা সম্যক্ প্রতিবিম্বিত, তাহার আংশিক সমালোচনা আবশ্যক, বিশেষতঃ রচনা শক্তি

---

he asked, where then are the true sites of Golgotha and the Sepulchre to be sought? I must reply, that probably all search can only be in vain." Ibid

বর্ণনার প্রধান সহায় বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান অসঙ্গত নহে। অতএব আমরা প্রথমত তদীয় রচনা ও বর্ণনা শক্তির আভাস প্রদান করিব।

ভবভূতির রচনা শক্তি অতি বিস্ময়কর, তাঁহার ন্যায় ভাষাধিপত্য অন্য কোন কবির কাব্যে লক্ষিত হয় না। অতি দুরূহ পদ-সমন্বিত অতি দীর্ঘ সমাস তদীয় লেখনী হইতে অনায়াসে প্রসূত হইয়াছে, তদীয় কাব্যে লৌকিক ও বৈদিক শব্দ এবং প্রণালী অলক্ষিতভাবে অতি সহজে মিশ্রিত হইয়া বহুস্থলে অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। নবজলধরের আমন্দ্র গর্জ্জনে মন যেরূপ পুলকিত হয়, ভবভূতির স্নিগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠনাদে চিত্ত তেমনই সন্তর্পিত ও পুলকিত হয়। এমন প্রগাঢ়, এমন গাম্ভীর্য্যময়, এমন তুঙ্গতরঙ্গময় রচনা সংস্কৃত ভাষাকে আর অলঙ্কৃত করে নাই। নবীন জলধর সংঘ দিগন্তপ্রসারিণী ভূধরশৃঙ্গসংহতি ও তদীয় রচনা মনকে তুল্যভাবে মোহিত করে। উক্তবিধ রচনা যখন পর্ব্বতাদি প্রকাণ্ড ও বিশাল বস্তুর বর্ণনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যকোন পদার্থই সম্ভবে না।

"এতাশ্চন্দনাশ্বকর্ণ সরল পাটল প্রাংশুতরু গহনা, পরিণত মালূর সুরভয়ঃ স্মারয়ন্তি খলু তরুণকদম্বজম্বুবনারুদ্ধান্ধকার গুরুনিকুঞ্জ গভীরগহ্বরোদগার গোদাবরীরব মুখরিত বিশাল মেখলাভুবো দক্ষিণারণ্য ভূধরান্।"

চন্দন অশ্বকর্ণ সরল ও পাটলাভূমিষ্ঠ বৃক্ষ দ্বারা গহন ও পরিপক্ক মালূর ফল দ্বারা সুরভিত এই সকল অরণ্য গিরিভূমি, তরুণ কদম্ব ও জম্বুবন কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ অন্ধকারাবৃত বিশাল নিকুঞ্জস্থ গভীর-গহ্বর হইতে উদ্‌গীর্ণ গোদাবরী জল-প্রবাহে প্রতিধ্বনিত বিশাল মেখলাভূমি শোভিত দক্ষিণারণ্যস্থ ভূধর সমূহকে স্মারিত করিতেছে।

বর্ণনা শক্তি পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে, সম্প্রতি আমরা রচনা-কৌশল প্রদর্শন জন্য নিম্নে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

গুঞ্জৎ কুঞ্জ কুটীর কৌশিক ঘটা
ঘুৎকার সংবল্গিত ক্রন্দৎ-ফেরব
চণ্ডতাৎকৃতিভৃত প্রাগ্‌ভারভীমৈস্তটৈঃ।
অন্তঃশীর্ণ করঙ্ককর্পর পয়ঃ সংরোধ কূলঙ্কষ।
স্রোতোনির্গম ঘোরঘর্ঘর রবা পারে শ্মশানং
সরিৎ॥

মাধব মালতীর প্রণয় নিরাশ হইয়া আত্মবিসর্জ্জনার্থে শ্মশানঘাটে উপস্থিত হইলেন। তিনি খড়্গহস্তে পিশাচ ও বেতালাদির ভয়াবহ বিভীষিকা দর্শন করিতে করিতে শ্মশান-পার্শ্বস্থ নদীতটে উপস্থিত হওয়ামাত্র সমস্ত বিভীষিকা সহসা অন্তর্হিত হইল, তখন সেই গাঢ় অন্ধকার মধ্যে মানব-সঞ্চার রহিত শ্মশান-প্রান্তে পেচকের ঘুৎকার, শিবাগণের অশুভ ও দীর্ঘতাৎকৃতধ্বনি এবং শবকঙ্কালে প্রতিহত প্রবাহা শৈবলিনীর ঘোর ঘর্ঘররব আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিল। উক্ত শ্লোকে কবি এই ভাব প্রকাশিত করিয়াছেন। উহার পর্য্যালোচনায় এলফিনষ্টন্ বলিয়াছিলেন * "ভবভূতির বিস্ময়কারী বর্ণ-

* "Among his most impressive descriptions is one, where his hero repairs at midnight to a field of tombs, scarcely lighted by the flames of the funeral pyres and evokes the demons of the place, whose appearance, filling the air with shrill cries and unearthly forms, is painted in dark and powerful

নাব মধ্যে শ্মশান বর্ণনাও একটী প্রধান। নিশীথ সময়ে নায়কেব শ্মশান ঘাটে গমন, চিতাগ্নি দ্বাবা কথঞ্চিৎ আলোকিত অন্ধকাবময় শ্মশান, ক্ষীণালোকে প্রকটিত পিশাচগণেব অমানুষ আকৃতি, গগনব্যাপী কর্কশনাদ, অতি প্রগাঢ় ও অত্যুজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, পবন্তু পিশাচগণেব আকস্মিক অন্তর্দ্ধানেব পবেই নির্জ্জনতা, সমীরণেব সোঁ সোঁ নাদ, নদী স্রোতেব কর্কশধ্বনি, পেচকেব উদাসকাবী বব এবং শৃগালেব অতি দীর্ঘ শব্দ, ভূতসঙ্গ-প্রসূত ভয় হইতেও যেন অধিকতব ভযাবহ।"

উক্ত শ্লোকস্থ দীর্ঘ সমাস সংবলিত, ঘুৎকাব, চণ্ড, তাৎকৃত, ভূত, প্রাগ্‌ভাব, ভীম, ঘর্ঘব এবং শ্মশান এই কযেকটী পদ ভীতি সঞ্চাবেব প্রধান সহায, এই কযেকটী পদবন্ধনেব কৌশল আবও বিস্ময়জনক। এই কযেকটী শব্দই প্রায মহাপ্রাণ বর্ণময, পবন্তু সেই মহাপ্রাণ বর্ণময শব্দ শ্লোকেব মহাপ্রাণ স্থান ও দ্বিতীয ও তৃতীয পংক্তিতে সন্নিবেশিত হইযাছে। যেরূপ বর্গেব প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ অল্পপ্রাণ, শ্লোকেব প্রথম ও তৃতীয খণ্ডকেও তদ্রূপ অল্পপ্রাণ বর্ণময় কবতঃ কবি পদবিন্যাসেব চবম কৌশল প্রদর্শন কবিযাছেন। বিশেষত শ্লোকেব ধ্বনিও শবাস্থি-প্রতিহত প্রবাহা প্রবন্তীব কর্কশনাদানুকাবী।

প্রতিকূলবর্ণতা দোষ প্রদর্শন সমযেও কাব্য প্রকাশকার "প্রাগপ্রাপ্তনিশুম্ভ" এই শ্লোক উদ্ধৃত করিযা বলিয়াছেন, "রৌদ্ররসে বিকটবর্ণত্বও দীর্ঘসমাসত্ব অনুকূল, সুতবাং ভবভূতি উক্ত শ্লোকে ক্রোধব্যঞ্জক তিন পদেই বিকটবর্ণ ও দীর্ঘসমাস যুক্ত কবিয়াছেন, অথচ চতুর্থ পদে ক্রোধ বর্ত্তমান নাই বলিযা সেই স্থানে সেই পদেই শব্দ প্রয়োগ কবিযাছেন।"*

কবি স্বযং বলিযাছেন, তিনি "বশ্যবাক" "দেবীভাবতী তাঁহাকে বশগা কামিনীব ন্যায সেবা কবিয়া থাকেন,‡ সুতরাং ভাষাধিপত্য ও বচনাকৌশল বর্ণনা শক্তিব সহায হইয়া ভবভূতি-কাব্যেব পবমোৎকর্ষ সম্পাদন কবিযাছে। বর্ণনাশক্তি কবিমাত্রেবই পবীক্ষাব স্থল, কিন্তু ভবভূতির যে বর্ণনায প্রকৃতিব বিপ্রলম্ভময ভাব প্রতিফলিত হইযাছে, তাহা প্রকৃতি-প্রেমিক সহৃদয়গণেব অতিশয প্রীতিপ্রদ ও অনুমোদিত। উক্ত সহৃদযগণ বলেন,—অবণ্য, ভুবন প্রভৃতি সঞ্চাবেব বর্ণনা কবিতে হইলে মনুষ্যেব অবতাবণা না হইয়া প্রকৃতির সন্তান, বনবিহাবী ও বনবাসী বিহঙ্গ, বিটপী ও মৃগাদিব আনুষঙ্গিক বর্ণনাই প্রশস্ত। মনুষ্য স্বভাবেব সন্তান হইলেও সে অতি বিকৃত, তাহাব শবীব স্পৃষ্ট সমীবণ স্পর্শেও কাননেব বিজনতা জীবনা দেবতা সন্ত্রস্তচিত্তে বহু-

colours; while the solitude, the moaning of the winds, the hoarse sound of the brook, the wailing owl, and the longdrawn howl of the jackal, which succeed on the sudden disappearance of the spirits, almost surpass in effect, the presence of their supernatural terrors"

Elphinstone's History of India

* রৌদ্রে বিকটবর্ণত্বং দীর্ঘ সমাসত্বঞ্চ উচিতং।

যথা (ভবভূতি)

১। "প্রাগ্‌প্রাপ্তনিশুম্ভ শাম্ভবধনুর্দ্বৈধাবিধ৷ ...

২। যেনানেন জগৎসু খণ্ডপরশুঃ।—

যত্রতুন ক্রোধস্তত্র চতুর্থপদাবিধানে তথৈব শব্দপ্রয়োগঃ।

কাব্যপ্রকাশ।

‡ বশ্যবাচঃ কবেঃ কাব্যং সাচ রামাশ্রয়া কথা॥

"যং ব্রহ্মাণমিয়ং দেবী বাগ্‌বশ্যেবানুবর্ত্ততে।"

উত্তরচরিত।

দূরে পলায়ন করিয়া থাকেন। কল্পনার নিভৃত নিকুঞ্জে মানব-সঞ্চার অতি দূর হইতেই বর্জ্জনীয়। উক্ত সহৃদয়গণের মতে, কবির দিব্য কাননে, প্রতি লতা, প্রতি পল্লব ও প্রতি নির্ঝরের প্রতি কণে প্রকৃতির জ্বলন্ত জীবন উদ্ভাসিত হইবে, প্রভাতে নীহার বিন্দু চ্ছলে প্রতি পত্রে অনিলান্তর-প্রলীনা প্রকৃতির অশ্রুবিন্দু বিলম্বিত হইবে, নব-কিসলয়-রক্তিমায় অধররাগ ও নবকুসুম সমৃদ্ধিতে তাঁহার হৃদয়ানন্দন বিভ্রম বিকীর্ণ হইবে, এবং প্রবিতত বনগাম্ভীর্য্যে প্রকৃতির অগাধ প্রেমের তরঙ্গ অবিরত প্রতিহত হইবে। চঞ্চল কুরঙ্গশাবক, প্রকৃতির দুর্ললিত শিশু ও জলধরের ন্যায় আমন্দ্র গর্জ্জনকারী বলদৃপ্ত পশুরাজই রক্ষক কল্পিত হইবে। তাঁহারা বলেন, প্রকৃতির বর্ণনা যেন তাহাকে পদার্থান্তরের অধীন না করিয়া ফেলে, প্রকৃতির অস্তিত্ব যেন অন্যের জন্য কল্পিত না হয়, প্রকৃতি যেন নায়ক নায়িকার বিলাস নিকুঞ্জ, অথবা অবধীরিত প্রেম উদাসীনের চিরদাসী না হইয়া পড়েন, প্রকৃতি যেন চরিতার্থ প্রেমিকের উদ্দীপন ও নিরস্ত প্রণয়জনের জীবনালম্বন না হন। প্রকৃতির পুলকবিধায়িনী বসন্তবিভা, শোণিত-শোষণ শিশির সম্পত্তি ও বর্ষার মেঘ ভীতি-সঞ্চারিণী জলধর হুঙ্কৃতি যেন তুচ্ছজীব মনুষ্যকে লক্ষ্য করতঃ প্রসূত না হয়, প্রকৃতির স্নিগ্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি দ্রব্যান্তরের অগ্রজলে উচ্ছলিত না হইয়া, কবির লেখনী স্পর্শে যতদূর বিচিত্র হইতে পারে, তাহাই হউক, কবির লেখনী স্পর্শে দোষ গুণরূপে প্রতি-ভাত হউক, কিন্তু উহাতে যেন কৃত্রিম অলঙ্কার আসক্তিত না হয়।

উক্তবিধমত ইংরাজী কি বাঙ্গালা কোন ভাষায় স্পষ্টরূপে প্রচারিত না হইলেও কাব্যালাপী ব্যক্তিগণের ভাবানুসারে সম্যক্ লক্ষিত হয়। উক্তবিধ বর্ণনা অতি বিশুদ্ধ ও পুলকাবহ। এতন্মতে বিশ্ব-ব্যাপিনী প্রকৃতির হর্ষ, বিষাদ ও দুঃখময় বিকার সমূহের হেতু ও অভিপ্রায় চিরকাল মানব প্রতিভাকে অভিভূত রাখিবে, কবির কর্ত্তব্য, তিনি যেসকল বিকার লক্ষ্য করিতে পাবেন, বিশ্বস্ত চিত্রকারের ন্যায় তাহারই অবিকল প্রতিবিম্ব কাব্যে প্রতিফলিত করেন, ইহা হইতে যাহা কিছু অল্প বা অধিক, তাহাই তাহার ত্রুটীও অনধিকার চর্চ্চা।

উক্তবিধ সহৃদয়গণ ভবভূতি-কাব্যকে উক্তবিধ বর্ণনার আদর্শ স্থান মনে করিতে পারেন। ভবভূতি-বর্ণনায় নির্জ্জন প্রকৃতির নিভৃত গম্ভীর মাধুর্য্য যত বিকীর্ণ, অন্য কোন কবির বর্ণনায় তাহা লক্ষিত হয় না। তদায় বর্ণনায় কিরূপ ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রদর্শিত হই-যাছে, তাহা অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। তদীয় বর্ণনা প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যময় ভাবসমূহের অবিকল প্রতিবিম্ব। উহাতে মনুষ্যের সমাগম নাই, দেবকন্যার বিভ্রম নাই, নায়ক নায়ি-কার নিকুঞ্জবন চিত্রিত নাই, উহাতে যাহা প্রকৃতি, তাহাতেই চিত্তোন্মাদিরূপে জ্যোৎ-স্নায়িত। ভবভূতির গিরি, নদ, নদী প্রভৃতির বর্ণনা পাঠ করিলে, হৃদয়ে অকলিত গাম্ভীর্য্য ও প্রশান্ত ভাবের আবির্ভাব হয়। দিগন্ত-ব্যাপিনী মেঘমালা হইতে প্রসূত গম্ভীর গর্জ্জন যেরূপ শ্রুতিসুখাবহ, "গভীর গিরি-গহ্বরাণি জনস্থান পর্য্যন্ত দীর্ঘারণ্যাণির" মধ্য হইতে নিনাদিত কবির স্নিগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠনাদ ততোধিক পুলকাবহ। তাঁহার প্রকৃতি আদ্যন্তই প্রশান্ত বৈভব পরিপ্লুত। তিনি যে স্থানে ভূধরাবলীর চিত্র অঙ্কিত

করিতে বসিয়াছেন, সে স্থানে অভ্রভেদী শৃঙ্গ-লহরী, গাঢ়নীলিম মেঘরাজি, ভীষণ পরি-সরারণ্য, গুহাগত নির্ঝরের ঝঙ্কৃত ও শিখণ্ডির প্রমত্ত নৃত্য স্বরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে।

আমরা উক্তবিধ বর্ণনার দৃষ্টান্ত স্বরূপ কিয়দংশ অনুবাদ করত উদ্ধৃত করিতেছি।

"বেতসলতার কুসুম দ্বারা নিকুঞ্জনদী সুরভিত ও তটান্তভাগ উচ্ছ্বসিত যূথিকা কুসুম দ্বারা অলঙ্কৃত, এবং প্রস্ফুটিত কুটজ কুসুম দ্বারা হাস্যযুক্ত গিরিসানু সমূহকে অবলম্বন করত শিখণ্ডিগণের তাণ্ডবহেতু মেঘরাশি ঊর্দ্ধদিকে বিতানের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে।" (১)

"পর্ব্বতের আভোগ ভূমি, জন্তাবশত জর্জ্জরডিম্ব ও ঘন শ্রীমান্ কদম্বদ্রুম সমূহে শোভিত, দিক্ সকল কাদম্বিনী দ্বারা শ্যামলীভূত, তটিনী বৃন্দের কচ্ছদেশ প্রকাঢ় কন্দল, কোমল কেতক কুসুম পূর্ণ, এবং বন সন্ততি আবির্ভূত শিলিন্ধ্র ও লোধ্র কুসুম দ্বারা সজ্জিত হইবা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে।" (২)

"সম্প্রতি অরণ্যভূমিতে সেই সকল দিন উপনীত হইয়াছে, যখন উৎফুল্ল অর্জ্জুন ও সর্জ্জ কুসুমবাসিত পৌরস্ত্য ঝঞ্ঝানিলের বেগবশত, সমলিত ইন্দ্রনীল-মণি খণ্ড সকলের ন্যায় স্নিগ্ধ অমবুদশ্রেণী গগনে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়, এবং ধারা-বসুন্ধরা যোগে সুরভিত, ও ঘর্ম্মজলের উদসমাপগমে দিবস রমণীয় শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে।" (৩)

"এই সেই সর্ব্বভূত লোমহর্ষণ উন্মত্ত চণ্ড শ্বাপদসঙ্কুল গিরিগহ্বর যুক্ত জন-স্থানপর্য্যন্ত প্রসৃত অরণ্য দক্ষিণাভিমুখে অভিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহার কোনস্থান নিঃশব্দ ও নিষ্কম্প, কোনস্থান প্রচণ্ড সিংহগর্জ্জন সমাকুল, কোনস্থান স্বেচ্ছানুরূপ প্রসুপ্ত অজগরের শব্দায়মান গভীর শ্বাস দ্বারা দাবানল প্রজ্জলিত, কোন কোন-স্থানে গর্ত্তাভ্যন্তর অল্পজলবিশিষ্ট, ঐস্থানে তৃষিত কৃকলাসগণ অজগরের ঘর্ম্মজল পান করিতেছে।" (৪)

"এই পর্ব্বত নয়নের অতিশয় প্রীতি সঞ্চার করিতেছে। ইহার উত্তুঙ্গ সানু অভিনব মেঘের ন্যায় শ্যামল, ইহার সর্ব্বস্থান ময়ূর ময়ূরীগণের অবিরত কেকা-ধ্বনি সমাকুল। প্রত্যন্তভাগ শকুনির শবল নীড়পূর্ণ অনোকহ দ্বারা আবৃত এবং প্রকাণ্ড উপল সমূহে বন্ধুর। (৫)

আমরা পশ্চাৎ ভবভূতির বর্ণনাশক্তি পর্য্যবেক্ষণ করিব, আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য সম্প্রতি উহাই যথেষ্ঠ। উক্তবিধ পুলকবিধায়িনী পবিশুদ্ধ প্রগাঢ় বর্ণনায় ভবভূতির কাব্য সমাক অলঙ্কৃত। তাঁহার ধরাধর জলদাবলীর লীলাস্থল; সস্থানে কেবল মেঘ গর্জ্জন, বারিধারা, নির্ঝরের ঝঙ্কার ও প্রগাঢ় নীলিমা, অধোদেশে ঘনসন্নিবিষ্ট বর্ণপাদপ সিংহের গর্জ্জন, ভল্লুকের চীৎকার ও নগনিম্নগার নিস্যন্দ, তথায় গন্ধর্ব্ব বা অপ্সরার চিহ্নও বর্ত্তমান নাই, দেবতার নিভৃত নিকুঞ্জ নাই। তদীয় অরণ্য দৃশ্যে মেঘ গর্জ্জন ও সিংহনাদই গম্ভীর মুরজধ্বনি, প্রতিধ্বনিত কন্দরই নবঘনস্তম্ভন মেঘ-রাগ, বিদ্যুত দামই চপলা অপ্সরা, ভীম-প্রভঞ্জনই মন্দ মলয় মারুত, প্রগাঢ় নীলি-মাই অনঙ্গ লেখ-মসী, নিঝরিণীই আনন্দা-শ্রুধারা, " ফল ভরপরিণাম শ্যামজম্বুনিকুঞ্জই

বিলাস কানন, কণ্টকাকীর্ণ দুর্গম কানন-বল্লীই রোমাঞ্চ।

উক্ত গাম্ভীর্য্যময় বর্ণনা নিবহে স্পষ্ট লক্ষিত হয়, কবি নির্জ্জন বনে, গভীর নিকুঞ্জে প্রকৃতির সহিত অতিরহস্য সম্ভাষণে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহার দিব্য নয়নে, নির্জ্জন আরণ্য ভূমিতে প্রকৃতির দিব্য মধুরিমা অতি স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইত। প্রকৃতি নিভৃত গিরিভূমিতে, নির্ধূম অগ্নির ন্যায় ধীরে ধীরে অত্যল্প শিখা বিস্তার করত কবির চিত্ত হরণ করিত। কবি প্রতি সায়াহ্নে প্রকৃতির উন্মাদয়িত্রী জ্যোৎস্না অবলোকন করত কৃতার্থ হইতেন। তিনি প্রকৃতির গাম্ভীর্য্যময় সৌন্দর্য্যে বিলীন হইয়াই স্বভাব বর্ণনার কুলক্ষয় প্রবাহ অভিস্যন্দিত করিয়াছেন। কবি প্রকৃতির গম্ভীর ভাবেই প্রমত্ত ছিলেন। স্বভাবের কি এক বিশ্বব্যাপক ভাব তাঁহার অন্তঃকরণ নির্জ্জিত করিয়াছিল, কবি ঐ ভাবের উপাসনায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কবি যেন বিশাল অরণ্য মধ্যে, গাঢ়নীল শৈল মালায় উপবেশন করত শিশুর ন্যায় উদ্বেল চিত্তে প্রকৃতির ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন। তিনি স্বকীয় কাব্যে প্রকৃতির প্রশান্ত, বিষাদ ও বিপ্রলম্ভময় কোন ভাবের উপাসনা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃতি আদ্যন্তই প্রশান্ত। ক্রমশঃ—

শ্রীবসন্ত কুমার রায়।

সাহিত্য এবং সমাজ।

সাহিত্যের দুই অবস্থা। প্রথমাবস্থায় সাহিত্য মানুষের কণ্ঠাগ্রে বাস করে, দ্বিতীয়াবস্থায় সাহিত্য লিখিত হয়। ঋগ্বেদ পৃথিবীর সর্ব্বাদিম গ্রন্থ। ইহা বহু শতাব্দী বা যুগযুগান্ত মানবকণ্ঠে নিহিত ছিল। বেদ-মন্ত্র সকল গীতিময়। মুখস্থ করিবার সুবিধার জন্যই আদিম সাহিত্য সকল গীতাকারে রচিত হয়। জেন্দ ভাষার আদিম গ্রন্থ জেন্দ-আবস্তা গীতিময়। ইহা বয়সে ঋগ্বেদের প্রায় সমতুল্য। মোজেসের অপূর্ব্ব উপদেশ-মালা ও প্রাচীন সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি দেশ-ভ্রষ্ট ইহুদাগণ যত্নে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। ঈশার উপদেশ সমূহ হিব্রু ভাষায় গীতাকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঈশা নিজ হস্তে এক অক্ষর লিখিয়া গিয়াছেন, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ঈশার প্রাথমিক শিষ্যগণ প্রায়ই নিরক্ষর ছিলেন। ঈশার অমূল্য উপদেশ সকল শিষ্যকণ্ঠ হইতে হিব্রু ভাষায় লিখিত হয়।

আদিমাবস্থায় সাহিত্য সুধু মানুষের মুখের সম্পত্তি ছিল বলিয়াই পৌরোহিত্য-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। দীর্ঘ দীর্ঘ উপদেশ সমূহ মুখস্থ করিতে প্রায়ই জন-সাধারণের সুযোগ ও সুবিধা হয় না। কাজেই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে সেই সকল সম্পত্তি যত্নে কণ্ঠাগ্রে সঞ্চিত করিতে হয়। এই বিশেষ ব্যক্তি সকল বা তাঁহাদের পরবর্ত্তী শিষ্যগণ কালক্রমে পুরোহিতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। সময়ে পৌরোহিত্য বংশানুক্রমিক হয়। পুরাকালে মিসরদেশে এবং আধুনিক

ইয়ুরোপ পৌরহিত্যের প্রাধান্য থাকিলেও ভারতবর্ষের ন্যায় কুত্রাপি ইহার প্রবলাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

শাস্ত্রে অধিকারী অনধিকারীর প্রথা পৌরহিত্য প্রথার অবশ্যম্ভাবী ফল। দুই কারণে এই ফল উৎপন্ন হয়। অসুবিধা, অমনোযোগ ও অনভ্যাস বশত সাধারণ জনগণ আপনা হইতেই শাস্ত্রাধিকার উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে ইচ্ছুক হয়। সেই উপযুক্ত পাত্র চিরন্তন পৌরহিত্য ব্যবসায়িগণই মনোনীত হন। অপর দিকে পুরোহিতগণ চিরাবলম্বিত ব্যবসায় সম্পূর্ণ রূপে হস্তগত রাখিতে এবং জন-সাধারণের উপরে আধিপত্য স্থাপন জন্য স্বার্থান্ধ হইয়া ধীরে ধীরে শাস্ত্রাধিকার অপরের অপ্রাপ্য করিতে চেষ্টা করেন। জগতে যে খানেই বিশেষ ব্যক্তি সাধারণের দত্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই স্থানেই ক্ষমতার এইরূপ অপব্যবহার হইয়াছে। রাজত্ব সাধারণ-দত্ত ক্ষমতা মাত্র। কিন্তু রাজা এখন প্রভু সাধারণ-জনগণ অধীনস্থ ভৃত্যের অধম। ভারতের ব্রাহ্মণ জ্ঞানে ধর্ম্মে অলঙ্কৃত হইয়াও মানবপ্রকৃতির এ নীচ ভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

নেতা যাহা করেন, অল্পজ্ঞান নীতব্যক্তি তাহার অনুকরণ করে, ইহা মনুষ্য-প্রকৃতির একরূপ সাধারণ সূত্র। পুরাকালে ব্রাহ্মণজাতি সমাজ মধ্যে যে অধিকারভেদ ও জাত্যভিমানের বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই জাতিভেদ-প্রথা বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়া ভারত-সমাজকে সহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

লিখিবার সঙ্কেত বা বর্ণ মালার আবিষ্কারের পরে সাহিত্য লিখিত ভাষায় পরিণত হয়। তখনও পূর্ব্বের অভ্যাস এবং সাধারণ রুচি বশত লেখক বা রচনা-কারকের হৃদয়ে মন্ত্রাদির রচনা গীতাকারে স্ফূরিত হয়। বিশেষত লেখা সৃষ্টির প্রথম যুগে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের গীতিময় মন্ত্রাদি মনুষ্য কণ্ঠ হইতে সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থ-বদ্ধ করাই তৎকালীন লেখকদিগের বিশেষ কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। এইজন্য লেখা সৃষ্টির পরেও বহুকাল সাহিত্য গীতিময় অবস্থায় থাকে।

মানব-হৃদয়ের সহজাবস্থার উচ্ছ্বাসই গীতি। এইজন্য শিশুর প্রথম স্ফূরিত আধ আধ ভাষা মধুর গীতিময়, আদিম বৈদিক ঋষিগণের অলঙ্কার পরিচ্ছদ-হীন উচ্চ ভাষা মহাদেব বা তানসিয়ানের সঙ্গীত নিপুণতাকে চিরতরে হেয় করিয়াছে। শিশু বলে, "দিন নিবিল, বাত চাঁদিল, আকাশে পাখী ভাসিয়া গেল।" আদিম ঋষি বলিতেন, "সুবর্ণ-ভূষিতা উষা দেবীকে ধরিতে তরুণ তপন অরুণ রথে ধাবমান হইয়াছেন।" মানুষের হৃদয় সহজ অবস্থা ছাড়িয়া যখন পাষাণ হয়, তখন গীতি ভোলে। প্রাচীন গ্রীস্ দেশে প্রবাদ ছিল, প্রেমের দেবতা অন্ধ শিশু। তিনি দিবসে বিমান-বক্ষে রঙ্গিন মেঘের শয্যায় শুইয়া ঘুমান এবং রাত্রিতে চন্দ্রের কিরণ ধরিয়া ধরাপৃষ্ঠে অবতরণ করেন। একদা কোন বড় মানুষের চিত্র-শালিকায় ছবি দেখিতে গিয়াছিলাম। ইতালি দেশীয় খ্যাতনামা চিত্রকরদিগের অনেক মনোমোহন চিত্র দেখিয়া যুগপৎ নয়ন মন চরিতার্থ করিলাম। তাহার এক খানি ছবিতে দেখিলাম, এক পরম রূপসী রমণীর গোলাপস্তূপ বিনিন্দিত গ্রীবার উপরিদেশে একটী পক্ষধারী মনোহর পরী শিশু

বসিয়া দুই খানি ক্ষুদ্র করে রমণীর দুইটী চক্ষু চাপিয়া ধরিয়াছে। এই শিশু, প্রেমের দেবতা। প্রেমের দেবতা যাহার স্কন্ধে চাপিয়াছেন, তাহাকে দৃষ্টিহীন অর্থাৎ অন্ধ করিয়াছেন। প্রেম অন্ধকার, প্রেমিক অন্ধ।

প্রেম বা অনুরক্তিই মানব-হৃদয়ের সহজ অবস্থা। প্রেমিকের হৃদয় মীনাহত প্রশান্ত হ্রদ-বক্ষের ন্যায় স্থির এবং মনোহর। হিংসা কলহাদি আসুরিক ভাব এ অসীম-প্রসার স্বর্গ ধামে অসম্ভবনীয়। গীতি প্রেম-পূর্ণ হৃদয়ের সুধানিঃসারিণী ভাষা মাত্র। সুতরাং গীতি অন্ধকার, গায়ক অন্ধ।

অনেকে বলেন, অনুষ্টুব ছন্দই সংস্কৃতের গদ্য ভাষা। বস্তুত কাদম্বরী, বাসবদত্তা, দশকুমারচরিত, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থ ব্যতীত সংস্কৃতে বিশুদ্ধ গদ্য রচনাময় পুস্তক দুর্লভ। সংস্কৃত নাটকাদিতে সহজ কথা বার্ত্তা থাকিলেও তৎসমুদয়কে বিশুদ্ধ গদ্যময় গ্রন্থ বলা যায় না। প্রাচীন ভারতের দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ সকলই ছন্দ বন্ধে বিরচিত। ভারতীয় শিক্ষা-প্রণালী বোধ হয় ইহার অন্যতম কারণ। অলিখিত বেদের সময়ে ঋষিগণ যেমন বেদ মুখাগ্রে রাখিতেন, ভাষা লিখিত হইলেও সেই প্রথার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। স্বর ও উচ্চারণ বিষয়ে আর্য্য-ঋষিদিগের বিশেষ দৃষ্টি থাকাতেই তাঁহারা শিষ্যদিগকে প্রথমে গ্রন্থের আবৃত্তি উত্তম রূপে শিক্ষা দিতেন এবং মুখস্থ না হইলে আবৃত্তি অনর্গল ও তাহাতে শিষ্যগণের উত্তম অধিকার জন্মিবার সম্ভাবনা ছিল না। মুখস্থ করিবার সুবিধার জন্যই দর্শনাদি সূত্রাকারে ও সাহিত্য সকল ছন্দ বন্ধে রচিত হইত।

গীতি ভাবজগতের রাজা হইলেও, সত্য বিবরণ প্রকাশের অনুপযোগী। ঘটনার অবিকল বসন-ভূষণ-হীন উলঙ্গ মূর্ত্তি অঙ্কনে কবির তুলিকা সুনিপুণ নয়, এ কথা বলিলে বোধ হয় কবিগণের অগৌরব প্রচার করা হয় না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, ছন্দ বা সূত্র মাত্রই কি গীতি? সূত্রের সঙ্গে কবিত্বের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, জানি না। ছন্দ গীতির দেহ, ভাব প্রাণ। ভাবহীন ছন্দ কবিত্বের মৃত দেহ মাত্র। ছন্দের বিশেষ বাঁধা বাঁধিতে অনেক সময়ই কবিত্বকে উদ্বন্ধন-যাতনা সহ্য করিতে হয়। কবিবর শ্রীমধুসূদন দত্ত তৎকাল-প্রচলিত অন্নদামঙ্গলি মিত্রাক্ষর ছন্দকে মাতৃভাষার পায়ের নিগড় বলিয়াছেন। ভাবের অন্ধকারময় উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে, সুধু ছন্দ ভাষাকে "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে"র ন্যায় নীরস ও কঠিন করিয়া ফেলে। এই জন্য সংস্কৃত ভাষার কবিগণ নিঃশঙ্ক চিত্তে নায়কের অশ্রুবোথিত বজোরাশিতে সিন্ধু গর্ভকে স্থলে পরিণত করিয়াছেন, ভট্ট নারায়ণ প্রস্তর কঠিন ভাষায় কাব্যকলঙ্ক ভট্টি লিখিয়াছেন, এই কারণেই বানভট্টের অতুলনীয় প্রতিভা লৌহবর্ম্মে আবৃত হইয়া সাধারণ জনগণের দুষ্প্রাপ্য হইয়া রহিয়াছে। গৌতম কপিল উভয়ই প্রতিভা এবং জ্ঞানে অদ্বিতীয়, কিন্তু তাঁহাদের মনীষা যে বজ্র নির্ম্মিত পেটকে নিবদ্ধ রহিয়াছে, সাধারণ জনমণ্ডলী দূরের কথা, অসাধারণ ধীমানের পক্ষেও তাহা উন্মোচন করিয়া রত্নোদ্ধার করা সাতিশয় দুঃসাধ্য ব্যাপার। শাস্ত্রের আদেশ অসংখ্যা-র্থক, উপপুরাণ, পুরাণ, মহাপুরাণ সকল পরী, দানব এবং দেবলোকের স্বপ্নময়

ভাষায় লিখিত। ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে, সমাজক্ষেত্রে সর্ব্বত্রই পথের সংখ্যা অগণ্য। কেনই বা এ সমাজকে স্বেচ্ছাচার এবং অধোগতি দ্রুতবেগে আলিঙ্গন করিবে না? কেন ভারত অনাচারে, কুসংস্কারে, পাপে প্রোথিত হইবে না? শাস্ত্রের কূটার্থ সাহায্যে পাপ এবং অনাচারকে সৎকাজ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, কয় জন এই আপাতমধুর আস্বাদনে আপনাকে বঞ্চিত রাখিতে ইচ্ছুক হয়? লোকনিন্দা ও গ্লানির হাত এড়াইতে পারিলে, জগতের কয় জন মানুষ স্বেচ্ছাচারকে মাথার মুকুট না করিয়া থাকিতে পারে? সংস্কৃত সাহিত্যের ফল ভারতসমাজের উপরে যেরূপ ভাবে প্রসারিত হইয়াছে, তাহার সামান্য আংশিক আভাস দিতে হইলেও এক খানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিতে হয়। বেদ উপনিষদের কথা তো অতি দূরের, অপেক্ষাকৃত আধুনিক মহাভারত এক খানি মহাকাব্যমাত্র হইয়াও সমাজকে যেরূপ তোল পাড় করিয়াছে, তাহা ভাবিলে সুধু অবাক হইয়া থাকিতে হয়। মহাভারত একটী নূতন সমাজ গঠন করিয়া ভারতে সামাজিক যুগান্তর ঘটাইয়াছে, ইহা বলিলেও কিছুই হইল না। পূর্ব্বোক্ত যৎসামান্য কথা কয়টী দ্বারা সেই মহা ব্যাপার, সেই যুগ যুগব্যাপী সুফল কুফল বুঝাইবার চেষ্টা করাও অতি ধৃষ্টতা।

ভারতবর্ষের মধ্যে আজ পর্য্যন্তও বাঙ্গালী পাশ্চাত্য শিক্ষায় অগ্রসর। প্রচলিত দেশীয় ভাষার মধ্যে বাঙ্গলা ভাষাই এখন উন্নতিশীল। বাঙ্গলা ভাষাই কালে সমগ্র ভারতের সাধারণ ভাষা হইবে, কাহাকে কাহাকে এইরূপ আশা করিতেও দেখা যায়। আমাদের মনে হয়, যদি ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালীকে কেহ কোন বিষয়ে আজ কাল শ্রেষ্ঠত্ব দিতে প্রস্তুত হয়, তবে সে শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ, বাঙ্গালী কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষার কথঞ্চিৎ উন্নতি সাধন। সাহিত্যে বা লেখার মধ্যেই জাতীয় চরিত্র অঙ্কিত থাকে। কোন জাতির চিন্তাশীলতা, ধীমত্তা, স্বাধীনচিত্ততা, সমাজনীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির ঔৎকর্ষ্য সেই জাতির লিখিত গ্রন্থ পাঠে যেমন সহজে জানা যায়, অন্য উপায়ে তদ্রূপ অবগত হওয়া যায় না। যে জাতির ভাষা মূল্যবান্ গ্রন্থ রাজিতে পরিশোভমান, সে জাতি যে একটা বড় জাতি, ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়। বাঙ্গালী মাতৃভাষায় ও ভাষান্তরের পত্রিকাদিতে সচরাচর বহুতর বিষয়ের যেরূপ আলোচনা করিয়া থাকেন ও অনেক দিন হইতে আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে এ জাতিকে ভারতীয় অপরাপর জাতির অপেক্ষা কতকগুলি বিষয়ে কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠতর আসন প্রদান করিতে প্রায় কেহই কুণ্ঠিত নন। বিশেষতঃ ইতি মধ্যেই বাঙ্গালা ভাষার যে প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালীর প্রশংসা পাইবার কথঞ্চিৎ অধিকারও জন্মিয়াছে।

জাতীয় ভাষা জাতির সাধারণের সম্পত্তি। পরকীয় ভাষায় অভিজ্ঞ হওয়া বহু আয়াসসাধ্য। এইজন্য তাহা চিরদিনই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লোকের অধিকারাধীন থাকে। মানুষ শৈশব হইতেই জাতীয় ভাষায় হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে শিখে। জাতির প্রয়োজন ও প্রকৃতির অনুসারে জাতীয় ভাষা রচিত হয়। দেশভেদে মানব-প্রকৃতির প্রভেদ স্বীকার করিলে, ভাষাভেদও অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং এক প্রকৃতির মানুষের ভাষায় অপর প্রকৃতির

মানুষ কখনও প্রকৃত হৃদয়-ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না। পক্ষান্তরে জাতীয় ভাষার উচ্চ ভাব সকলও জাতির অজ্ঞব্যক্তি-গণ অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারে। জাতীয় ভাষায় অতি উন্নত বিষয় সকলের আলোচনা করিলেও জাতির আপামর সাধারণে তাহাতে কিছু না কিছু পরিমাণে যোগ দিতে পারে। পরকীয় ভাষায় অতি সহজ ও সরল বিষয়ের অবতারণা করি-লেও জাতির অনেকের পক্ষেই তাহা সম্পূর্ণ অবোধ্য হয়। সুতরাং সেই আলো-চনার ফল জাতির সর্ব্বাংশে বিস্তৃত হইতে পারে না। পরকীয় ভাষা আয়াস-কর-শিক্ষা-সাপেক্ষ বলিয়া যখনই সেই ভাষার শিক্ষা বন্ধ হয়, তখনই তাহা দেশ হইতে উঠিয়া যায়। এইজন্য পরকীয় ভাষায় কোন গ্রন্থাদি লিখিলে যুগান্তে তাহা জাতির সম্পত্তি থাকে না। অবশ্য জাতীয় ভাষা যুগে যুগে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহা জাতির সম্পত্তি থাকে। পারস্য ও আরব্য ভাষা যেমন ইতিমধ্যেই হিন্দু জাতির নিকট এক প্রকার চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, ঋগ্বেদের সংস্কৃত বহু সহস্র বৎসরের প্রাচীন হইলেও তাহার তদ্রূপ দশা ঘটে নাই। আর এক যুগের জাতীয় ভাষার অস্থিমাংস দ্বারাই পরবর্ত্তী যুগের জাতীয় ভাষার দেহ গঠিত হয়। বস্তুত আধুনিক যুগের জাতীয় ভাষা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের জাতীয় ভাষার সন্তান সন্ততিমাত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ভাষাগত বিধি ব্যবস্থা ও ভাব সকল আপনা হইতেই পরবর্ত্তী যুগের ভাষায় অনুবাদিত হয়। কথায় কথায় পূর্ব্ববর্ত্তী ভাষার মজ্জাগত সত্তা সকলের উদাহরণ আসিয়া পড়ে। সুতরাং এক যুগের জাতীয় ভাষার স্রোত পরবর্ত্তী কোন যুগেই একবারে বিলুপ্ত হয় না। পরকীয় ভাষায় ও জাতীয় ভাষায় তদ্রূপ কোন সম্বন্ধ না থাকাতেই সচরাচর এক জাতির ভাষা অপর জাতির মধ্যে চিরস্থায়ী হয়না। এই জন্যই পরকীয় ভাষায় গ্রন্থাদি লিখিয়া সময় ক্ষয় করিলে জাতির বিশেষ কিছুই লাভ হয় না। এই সকল কারণে জাতীয় ভাষার চর্চ্চায় ও উন্নতি সাধনে জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। "হেমি-ল্টন কোম্পানি" আমাদের দেশে দোকান করিয়াছেন। সেই দোকানে বহুসংখ্যক বহু-মূল্য মণি মুক্তা আছে। অথচ তাহা আমাদের দেশের সম্পত্তি নয়। কারণ আজই যদি প্রয়োজন বশত "হেমিল্টন কোম্পানি" দোকান তুলিয়া দেশে চলিয়া যান, তাহার মণিমুক্তা তাহারই সঙ্গে স্বদেশে চলিয়া যাইবে। তদ্রূপই ইংরেজের যে সকল সাহিত্য রত্ন আমাদের দেশে বিস্তৃত ভাবে রহিয়াছে, দেশীয় লোকের মস্তক হইতে যে সকল ইংরেজি সাহিত্য বাহির হইতেছে, তৎ সমুদয়ও ইংরেজের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে হইতে অন্তর্হিত হইবে। তখন তাহার প্রসূত ফল কিছু দিনের জন্য এদেশে থাকিবে বটে, কিন্তু জাতীয় প্রকৃতির বহি-র্ভূত বলিয়া তাহাও বহুদিন তিষ্ঠিতে পারিবে না, আমরা পুন-র্মূষিক হইব। সকল বিদেশীয় ভাষার সঙ্গেই আমাদের এই রূপ সম্বন্ধ। কেবল বিদেশীয় সাহিত্য ভাণ্ডার হইতে আপনাদের দেশীয় সাহিত্য ভাণ্ডারে যাহা সঞ্চিত করা যায়, তাহার সুফল কথনো বিনষ্ট হয় না। আবার পরকীয় ভাষায় প্রকৃত মৌলিকতা প্রকাশ করাও সুসাধ্য নয়। এক কবি অপর কবির

হৃদয়ের ভাষায় কথনই কবিতা লিখিতে পারেন না, এক জন ধর্ম্মপিপাসু অপর ধর্ম্মপিপাসুর প্রাণের ভাষায় প্রার্থনা করিতে পারেন না। এই দুইটী দৃষ্টান্তের মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত কথাটীর সুযুক্তি নিহিত আছে। মৌলিকতাই লেখকের প্রতিভার পরিমাপক, ইহাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। পরন্তু স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিক ভাব-সম্পন্ন গ্রন্থ দ্বারাই ভাষা উন্নত হয়। কোন জাতির জাতীয় ভাষা উন্নত বলিলে যেমন জাতিটাকেও উন্নত বুঝা যায়, তেমনই, কোন জাতি জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন করিতেছে, ইহা শুনিলেও, সেই জাতি উন্নতিমার্গে আরোহণ করিতেছে, বুঝা যায়। বাঙ্গালী জাতীয় ভাষার উন্নতি সাধন জন্য কি করিতেছেন এবং এ পর্য্যন্ত কি করিয়াছেন, এখন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক্।

বাঙ্গলা সাহিত্যের জীবন-কালকে কয়েকটী অংশে বিভক্ত করা যাইতে পারে। জয়দেবের পর-বর্ত্তী সময় হইতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রবলাধিপত্যের সময় পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম যুগ গণনা করা যাইতে পারে। চণ্ডীদাসের আবেগপূর্ণ উচ্ছ্বাসময় লেখনী বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রাথমিক অবতারণা যেরূপ মধুর সঙ্গীত ধ্বনিতে সমাধান করিয়াছে, তাহা অতি মনোমোহন। বোধহয়, পৃথিবীর কোন ভাষার সাহিত্যই এইরূপ মনোজ্ঞ বেশে বঙ্গক্ষেত্রে প্রথম অবতরণ করে নাই। অবতারণার পরেই বীণা বংশী শিঞ্জারবে বৈষ্ণব কবিগণ মাতৃভাষার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সে সম্বর্দ্ধনাও অপূর্ব্ব। গোবিন্দ দাস-প্রমুখ অসংখ্য বৈষ্ণব কবি বহুকাল ব্যাপিয়া মাতৃ ভাষার মঙ্গলগীতি গাইয়া জীবন শেষ করিয়া গিয়াছেন। মহাপ্রভুর বিশ্বোন্মাদিনী প্রেম-গীতিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের শৈশব জীবন পরিপূর্ণ। এমন প্রেমের মহোচ্ছ্বাস, মহাভাবের প্রবল স্রোত অপরের যৌবনেও দুর্লভ। সাত্বিক বৈষ্ণবগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের শৈশব জীবনে যে অমৃতের মহাসিন্ধু রচনা করিয়াছিলেন, পাপভারাক্রান্ত বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যবশত চৈতন্যধর্ম্মের মন্দীভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাই শেষে গরলে পরিণত হইয়াছে। অনেকে বলেন, নিত্যানন্দের প্রচারই গৌরাঙ্গের মহাভাব-পূর্ণচন্দ্রকে মেঘাবৃত করিয়াছে, তাঁহারই প্রচারে বাঙ্গালী বৈষ্ণব, "মাছের ঝোল, কামিনীর কোল, হরি হরি বোল" সার করিয়াছে, ব্যভিচার ও নেড়া নেড়ীতে দেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে। যাঁহারা বৈষ্ণব শাস্ত্রাভিজ্ঞ, তাঁহারাই এ প্রবাদের সত্যতা বা অমূলকতা নির্দ্ধারণ করিবার উপযুক্ত পাত্র, আমরা শুনা কথামাত্র লিখিলাম। কিন্তু মহাপ্রভু যখন পুরুষোত্তমে বাস করিতেছিলেন, তখন বঙ্গদেশ হইতে অদ্বৈত প্রভু দুঃখ করিয়া তাঁহাকে যে তর্জ্জাটী লিখিয়াছিলেন, তাহা এই ,—

"বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল,
বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল,
বাউলকে কহিও দেশ হইল বাউল,
বাউলকে একথা কহিল বাউল।"

এই তর্জ্জা পাঠে বুঝা যায় যে, চৈতন্য জীবিত থাকিতেই তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বঙ্গদেশে বিকৃতি লাভ করিয়াছিল। কেহ কেহ ইহাও অনুমান করেন যে, অদ্বৈতের এই পত্র পাইবার পরে মহাপ্রভু অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন এবং এই ঘটনার কিছুদিন পরেই তিনি শ্রীক্ষেত্রের গোপীনাথের মন্দির

হইতে অন্তর্দ্ধান হন। মহাপ্রভু নীলাচলে বাসকালে নিত্যানন্দের প্রতি বঙ্গদেশে ধর্ম্ম প্রচারের ভার দিয়াছিলেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। যে নিতাই গৌরাঙ্গের দক্ষিণ বাহু ছিলেন, যে নিতাই এক সময়ে ভাবোন্মত্ত গোরাচাঁদের সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় অরণ্যে অরণ্যে ও দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, যে নিত্যানন্দ জগাই মাধাইর উদ্ধাররূপ মহাব্যাপারে অসীম প্রেম ও ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহা হইতে কেন যে দুর্ভাগ্য বঙ্গের বিপদ্-পাত হইল, তাহা ভাবিলেও হৃদয় বজ্রাহত হয়, প্রাণ বিদীর্ণ হয়। যাহা হউক্, বৈষ্ণব সাহিত্যের উচ্চ মর্ম্ম সাধারণ বৈষ্ণবগণের অবোধ্য হওয়াতে দেশের ও বৈষ্ণব সমাজের চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাব উচ্চ ও আধ্যাত্মিক হইলেও তাহা রূপকাকারে লিখিত। নর নারীর প্রেমবিলাস ও হাবভাবে শরীর গঠন করিয়া বৈষ্ণব কবিগণ সেই অনিত্য দেহে পরম আধ্যাত্মিকতার মহাপ্রাণ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অবোধ বৈষ্ণবগণ সত্যের ত্রিসীমায়ও উপস্থিত হইতে না পারিয়া সুধু অসত্য অনিত্য বস্তু লইয়া পাপসাগরে ঝাপ দিয়াছে, আপনারাও ডুবিয়াছে, দেশকেও ডুবাইয়াছে, এই সঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্যের একরূপ মৃতদশা উপস্থিত হইয়াছে। বঙ্গের অনেক সুসন্তান এই মহারত্ন পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টাকে সাধুবাদ। কিন্তু দুর্ব্বলচরিত্র বাঙ্গালীকর্ত্তৃক এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে কি না, তাহা সুনিশ্চিতরূপে বলা কঠিন।

বৈষ্ণব সাহিত্য বা বাঙ্গলা ভাষার প্রথম যুগের সাহিত্যের সমালোচনাতে আমরা একটী সুন্দর উপদেশ পাইতেছি। প্রথম কথা সত্যকে রূপকাবরণে আবৃত করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। নীরস মোহান্ধকারাচ্ছন্ন প্রাণের চক্ষুতে উলঙ্গমূর্ত্তি সবল সত্যের প্রখর জ্যোতি অনেক সময়ই অসহনীয় হয়। এইজন্য তাহাদিগকে সত্যের পানে আকৃষ্ট করিতে অনেক মহাপুরুষ রূপকের আশ্রয় লইয়া থাকেন। বিশেষত, অতি সহজে পাইলে সাধারণ জনগণের নিকট সত্যের মূল্য এবং আদর যেন কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়। এইজন্য অনেকে সত্যকে রূপকের কঠিন আবরণে আবৃত করেন। কিন্তু অনেক সময়ই জনসমাজের উপরে তাহার বিপরীত ফল ফলে। সাধারণত, মানুষ রূপকের গর্ভস্থ মূল তত্ত্ব অবধারণ করিতে না পারিয়া সহজার্থই গ্রহণ করে এবং তাহা হইতে মূল সত্য বাদে বিকৃত আকারে পরিণত হয়। বিকৃত সত্য মানব-সমাজের উপরে অতি বিষময় ফল প্রসব করে। সত্যের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে, অতি ধীরে ধীরে কার্য্যকর হইলেও সেই সৌন্দর্য্যের মানসাকর্ষণী শক্তি আছে, সত্য প্রচারকের এ কথায় দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিত। সৌন্দর্য্যের ন্যায় সত্যের মহামূল্যতাও অতি স্বাভাবিক। কৃত্রিম উপায়ে মূল্য বৃদ্ধির চেষ্টাতে সত্যের স্বাভাবিক মূল্যবত্তায় অনাস্থা প্রকাশ করা হয়। যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছ, তাহাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় জনসমাজের নিকট উপস্থিত কর, তাহা যদি প্রকৃত সত্য হয়—প্রকৃত স্বর্গীয় আলোক হয়, তবে তাহার জয়ের জন্য কাহাকেও চেষ্টা করিতে হইবে

না। সত্যের জয়-পতাকা সত্যের সেনা-পতি স্বয়ং ভগবান স্বহস্তে ধারণ করিয়া অগ্রে অগ্রে ধাবিত হন। সত্যের জয় মানবীয় চেষ্টার অতীত, সম্পূর্ণ নৈসর্গিক।

দ্বিতীয় কথা, অতি গভীর আধ্যাত্মিক ভাবকেও সাধারণ মানবীয় বাসনার কুৎ-সিৎ বর্ণে রঞ্জিত করিলে, তাহা হইতে সাধারণত জন-সমাজের মহদপকার সং-ঘটিত হয়। প্রথমত, এক দল মানুষ স্বভাবতই স্থূলদৃষ্টি সম্পন্ন। কখনো অল্প শিক্ষা, কখনো বা স্বভাব ইহার কারণ হয়। তাহারা ঐন্দ্রিক লালসার নিম্নে অবতরণ পূর্ব্বক গূঢ় ভাব গ্রহণ না করিয়া আপাতো-বোধ্য সহজ ভাবই গ্রহণ করে। এই জন্য সাধারণ বৈষ্ণবগণ রাসাদির স্থূল ভাব মাত্র গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণব সমাজকে কলঙ্কিত করিয়াছে, দেশের আপামর সাধারণের চক্ষে রাধা কৃষ্ণের প্রেম সামান্য মানবীয় অবৈধ প্রেমমাত্রে পরিগণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, জ্ঞানে উচ্চাসন লাভ করি-লেই অন্তঃকরণ পবিশুদ্ধ হয় না। এই জন্য, এক দল লোক রূপকের মর্ম্মার্থ বুঝিলেও উপরে উপরে ভাসিতে থাকে। রূপকে বাহ্যাকর্ষণ বা লালসার উদ্দীপনা থাকিলে তাহা তাহাদিগকে সহজে চরিত্রের অধো-দেশে লইয়া যায়, লালসার উদ্দীপক শব্দ শুনি-লেই তাহাদের ইন্দ্রিয়-বাসনা জাগরিত হয়। এইরূপ জ্ঞানীর পক্ষে রূপকের জটিলতা অজ্ঞানীকে ভুলাইয়া বাসনা চরিতার্থ করি-বার দ্বার স্বরূপ হয়। বৈষ্ণব-শাস্ত্র-ব্যাখ্যা-কারী গোস্বামীদিগের চরিত্র ও কার্য্যকলাপ অনেক সময়ই এ কথার সমর্থন করে।

আবার যাঁহারা লালসার অতীত হইয়া-ছেন, চরিত্রে অটল হইয়াছেন, জ্ঞানে প্রাজ্ঞ হইয়াছেন, সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য সত্যকে কেনই বা পার্থিব সাজে সাজাইয়া মনোমোহন করিতে হইবে? যাহা হউক, বৈষ্ণব কবিগণ বাঙ্গালা সাহিত্যে যেরূপ প্রতিভা ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়া-ছেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের পরবর্ত্তী কোন যুগেই তাহা দৃষ্ট হয় না। বৈষ্ণব কবিগণই বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্ব প্রথমে জীবনচরিত, গভীর দার্শনিক তত্ত্ব, কাব্য ও সঙ্গীত লিখিয়াছেন। বৈষ্ণবগণই বাঙ্গালা সাহি-ত্যের প্রবর্ত্তক, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। যদিও চণ্ডীদাস চৈতন্য ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের পূর্ব্বেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি এক জন বৈষ্ণব ছিলেন এবং ভাগবতানুমোদিত রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাই তাঁহার বর্ণনার বিষয় ছিল। এই জন্য তাঁহাকেও আমরা বৈষ্ণব লেখকগণের মধ্যেই পরিগণিত করিলাম।

বাঙ্গলা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ বৈষ্ণব যুগের পরবর্ত্তী যুগে পাঁচজন বিখ্যাত অবৈষ্ণব কবি বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি কল্পে জীবন যাপন করিয়াছেন। কীর্ত্তিবাস, কাশীরাম দাস, রামপ্রসাদ, মুকুন্দ নারায়ণ ও ভারতচন্দ্র। এই পাঁচ জনই দ্বিতীয়যুগের প্রধান বাঙ্গালা সাহিত্য সেবক। কীর্ত্তি-বাস ও কাশীরাম দাসের প্রস্তাব সম্বন্ধীয় মৌলিকতা না থাকিলেও রচনার সারল্য ও পারিপাট্য অতি মনোজ্ঞ। সামান্য মুদী হইতে ভদ্র সন্তান পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সকলেই কীর্ত্তিবাস ও কাশীরামের প্রসাদে আজ বাল্মীকি এবং ব্যাসের সুধা-নিঃসারিণী লেখ-নীর অপূর্ব্ব ফল অতি সহজে উপভোগ করিতেছে। তাহারই ফলে বাঙ্গালার সামান্য স্ত্রীলোকও দুই চারিটা শাস্ত্রের কথা

বলিতে পাবে। বস্তুত কীৰ্ত্তিবাস ও কাশী-রাম বাঙ্গালী হৃদযে চিবদিন বাজত্ব কবি-বেন। কথক ও গায়কের মুখ হইতে শুনিয়া সামান্য সংগ্রহ-পুস্তক লিখিযাও তাঁহাবা একটী বিস্তীর্ণ জন-সমাজেব পবিচালন কার্য্যে যেরূপ আধিপত্য লাভ কবিযাছেন, জগতে অসাধাবণ প্রতিভা এবং মৌলিকতাব পবিচয দিয়াও অল্পসংখ্যক গ্রন্থকাবই এইরূপ সৌভাগ্যেব অধিকাবী হইতে পাবিযাছেন।

মুকুন্দবামেব চণ্ডীকে একখানি উপাদেয় মহাকাব্য বলিলেও অত্যুক্তি হয না। কবি ইহাতে যেমন বচনাচাতুর্য্য, তেমনই কবি-প্রতিভা প্রদর্শন কবিযাছেন। ইহা একখানি মৌলিকতাপূর্ণ সামাজিক কাব্য-গ্রন্থ—তৎকালীন বঙ্গসমাজেব আচাব ব্যবহাবেব একখানি অপূৰ্ব্ব দর্পণ বা আলেখ্য। চণ্ডী এক সমযে গৃহে গৃহে গীত হইত। এখন আব সে দিন নাই। বাজনীতি, সমাজনীতি ও ধৰ্ম্মনীতিব জগতে যেমন আমবা ইংবেজেব পদাঙ্ক অনুসবণ কবি, পদ-ধূলি লেহন কবি, সাহিত্যজগতেও আমবা সেইরূপ ইংবেজেব উদ্বমিত পদার্থবাশিব প্রসাদ পাইযা কৃত কৃতার্থ হই। চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস-প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণেব এবং মুকুন্দবামেব সম্পূর্ণ মৌলিক ও কবি-প্রতিভা-পূর্ণ দোষোৎপন্ন ভাবামৃত আমাদেব মত নব পিশাচেব নিকট কখনই সমাদৃত হইতে পাবে না। উচ্ছিষ্ট কণ্টক- ভোজী কুক্কুবেব নিকট দেবভোগ্য নৈবিদ্যের আদব কখনই সম্ভবে না। আমাদেব শবীবের প্রতিবক্তবিন্দু অধীনতাব পূতিগন্ধ- দূষিত। আমাদের স্ত্রী পুত্র দেশ অপরে রক্ষা করিবে, আমরা সুখে ঘর বাঁধিয়া নিদ্রা দিব, আমাদের সামাজিক কুনীতি দুর্নীতি অপরে শোধন কবিবে, আমবা পবমপূজ্য আর্য্য-সন্তান বলিযা বাহবাব চীৎকার তুলিব, আমাদেব বস্ত্রাদি নিত্য প্রযোজনীয় দ্রব্য অপবে সংগ্রহ কবিবে, আমবা ব্যবহাব কবিযা জগতেব ভাব বৃদ্ধি কবিব, অপবে পড়াবে, আমবা পবকীয় ভাষায ময়না ও টিযাপাখীব মত কথা কহিব, বক্তৃতার কোলাহল তুলিব, এই আমাদেব জীবনেব ব্রত। "শেলি" কবে হাসিযাছিলেন, "ওযাড্‌স্‌ওযাথ কেমন কবিযা কাসিতেন, "টেনিসন্" কেমন কবিযা পা ফেলেন, ইহাই মুখস্থ কবিবাব আমবা সময পাই না, কখন আব দেশেব কবিবৃন্দেব কথা ভাবিব? দেশেব ভাষা, স্বাধীন চিন্তা, আমাদেব কেন ভাল লাগিবে? "ট্রাফাল্‌গাবে" নৌযুদ্ধে "নেল্‌সন" কেমন কবিযা মবিযাছিলেন, "ওযাটার্ল্ল'ব" মহাযুদ্ধে "নেপোলিয়ন" কিরূপে বন্দী হইযাছিলেন, "ওযেলিংটন" কি প্রকাব ব্যূহ বচনা কবিযাছিলেন, ইহা তো আমবা অতি যত্নে কণ্ঠাগ্রে সঞ্চিত কবিযাছি, তবে আব দেশে কখন কে ছিল না ছিল, কে কি কবিয়াছিল কি না, তাহা জিজ্ঞাসা কব কেন? বাঙ্গালাব যদি কখন দিন ফেবে, তবে একদিন এই সকল পূজ্যপাদ দেশীয় কবিবৃন্দেব সমাদব বাড়িবে, নতুবা আজি-কাব মত চিবদিনই তাঁহাদেব কথা পাড়িয়া অবণ্যে বোদন কবিতে হইবে।

কবিবঞ্জন বামপ্রসাদ একখানি বিদ্যা-সুন্দব বচনা কবিয়াছিলেন। ভক্ত রাম-প্রসাদেব মালসী বাঙ্গলা ভাষাব একখানি অপূৰ্ব্ব অলিখিত সাহিত্য। বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা এবং ভক্ত রাম প্রসাদ একই ব্যক্তি কিনা, নিশ্চিত রূপে জানা যায় না। রাম-প্রসাদের মালসী এখন প্রসাদসঙ্গীত নামে

গ্রন্থবদ্ধ হইয়াছে। রাম প্রসাদের সঙ্গীতাবলী ধর্ম্ম রাজ্যের অপূর্ব্ব বস্তু। ইহা শুনিলে পাষাণ হৃদয় দ্রবীভূত হয়, নাস্তিক বিশ্বাসী হয়। ইহার রচনাও অতি সরল এবং আপামর সাধারণের বোধ্য। রাম প্রসাদও বাঙ্গালীর হৃদয়ের উপরে আধিপত্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। রাম প্রসাদের মালসীতে অনুকরণের লেশও নাই।

অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, আরো কত কি হিজি বিজি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের লিখিত। ভারতচন্দ্র ছন্দ বন্ধ এবং লিপি-চাতুর্য্যের জন্য যদি গুণাকর উপাধি পাইয়া থাকেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। মুকুন্দ রামের চণ্ডী পড়িয়া অন্নদামঙ্গল হাতে করিলে নূতন কল্পনার জগতে ভারতচন্দ্রকে অতি হীন বোধ হয়। কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরের প্রস্তাব লইয়া ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর লিখিত। ভারত বিদ্যাসুন্দরে আদিরস রূপ হলাহল সমুদ্র মন্থন করিয়াছেন। ইংরেজ কলঙ্ক "রেনাড্‌স্‌কে" বিদ্যাসুন্দর-লেখক ভারতচন্দ্র অশ্লীল ভাবের অবতারণায় অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছেন। তিনি হলাহল সমুদ্র মন্থন করিয়া মহাপাপ পিশাচের এক ভীষণ মূর্ত্তি উত্তোলিত করিয়াছেন, যে বিদ্যাসুন্দর হাতে করিয়াছে, তাহারই ঘাড়ে সে দানব চিরতরে চাপিয়া বসিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ একভাবে সমাজে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্র আর এক ভাবে বাঙ্গালীর স্মরণীয় হয়েছেন। বিদ্যাসুন্দর পড়িয়া কত নর নারী পাপের অতল সমুদ্রে ডুবিয়াছে, কে জানে? সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গরমণীগণ লেখাপড়ায় সাধারণত অনভিজ্ঞ হওয়াতে তাঁহাদের উপরে এ বিষময় ফল অধিক পরিমাণে ফলিতে পারে নাই। কিন্তু ব্যভিচারদোষ যে বাঙ্গালী পুরুষের নিকট দোষ বলিয়াই গণ্য নয়, বরং পুরুষোচিত কাজ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় বিদ্যাসুন্দরেরই গুণে। মলমূত্রে মেতরের ঘৃণা কম কেন? অভ্যাসের গুণে। শতকণ্ঠে পাপের গুণ গাইবে, পাপের ইতিহাস-দগ্ধ লৌহশলাকায় হৃদয়ের স্তরে স্তরে আঁকিবে আর পাপ তোমার অভ্যাস পাইবে না, কে বলিল? সদ্‌গ্রন্থ যেমনই জন সমাজকে উন্নত করে, অসদ্‌গ্রন্থ তেমনই মানব সমাজকে অধঃপাতে লইয়া যায়। কেহ কেহ বিদ্যাসুন্দরের কুৎসিত ভাবের নিম্নেও আধ্যাত্মিকতা দেখিতে পান। আমরা এরূপ নবকল্পিত আধ্যাত্মিকতাকে দূর হইতে শত সহস্র প্রণিপাত করি। অনেকে হীরামালিনীর হাব ভাব ঠমক্ ঝমক চমককে ভারতের প্রতিভার অদ্ভুত ফল বলেন আমরা বলি, এমন প্রতিভার মুখে আগুন। রুচিবিরুদ্ধ কারী, অপরের সকল লোকের স্লেচ্ছ-সম্বোধনকারী, সনাতন ধর্ম্মের নিশান-ধারী "বঙ্গবাসী" পত্রিকার দলবল ভারতের গুণ্ডামির হলাহল নবীন চিত্রবিচিত্র গ্রন্থ পাত্রপূর্ণ করিয়া বিদ্যালয়ের অবোধ ছাত্রদিগকে পর্য্যন্ত অমৃত বলিয়া পান করাইতেছেন, আর কিছু কিছু পয়সা আদায় করিতেছেন। ইহাঁরা বাঙ্গের সুসন্তানই বটে। বলি, এত পাপে দেশ প্লাবিত হইয়াছে, ইহা দেখিয়াও কি তোমাদের পাপের পিপাসা, অর্থের লালসা দূর হইবেনা? রুচি বেচারি পৃথিবীত জন্মিয়া তোমাদের চরণে যে শত অপরাধ করিয়াছে, ইহাতে আর ভুল কি? বটতলার অস্পষ্ট ছাপায়, যাত্রায়, নাটকে বিদ্যাসুন্দর বহুকাল হইতেই দেশের সর্ব্বত্র বিস্তারিত রহিয়াছে। ইহার

পরে আবার তাহার নূতন বাহনের কি প্রয়োজন হইয়াছিল, জানিনা।

কবিওয়ালাগণের কবি বঙ্গীয় সাহিত্যের সাময়িক কলেবর বৃদ্ধি সম্বন্ধে দ্বিতীয়, তৃতীয় উভয় যুগেই বিশেষ কার্য্য করিয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে অনেক সময় সময় উৎকৃষ্ট কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু সে সকলের অধিকাংশই গ্রন্থবদ্ধ না হওয়াতে সময়ের সঙ্গে লোপ পাইতেছে। নিধুর টপ্পা এবং দাশরথির পাঁচালী এক সময়ে অতি আদরের জিনিষ ছিল, এখনও সর্ব্বত্র প্রশংসিত। কিন্তু কবিওয়ালাগণ লাল ছড়া এবং অশ্লীল তর্জ্জায় এক সময়ে বঙ্গদেশ প্লাবিত করিতেও ত্রুটি করেন নাই। আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় ভারতচন্দ্রই তাহা অশ্লীল ভাবের দ্বার খুলিয়া দিয়া দেশের লোকের এই কুৎসিত রুচি বাড়াইয়া দিয়াছেন। কবিওয়ালার ছড়া ও তর্জ্জাদি তাঁহার কার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল। কি পরিতাপের কথা। এক সময়ে বারোয়ারি ও দুর্গোৎসবাদিতে এ দেশের পুরুষ রমণী একত্র হইয়া কবিওয়ালার কুৎসিত গালিগালাজ শুনিতে একটুও কুণ্ঠিত হইতেন না, এখনও এ প্রথা একবারে নির্ম্মূল হয় নাই। যে কথার আভাসে কাণে হাত দিতে হয়, আর সেই কুৎসিত কথা একটী ভদ্রলোক মাতা ভগ্নী স্ত্রী পুত্র কন্যা শিষ্য ও অনুগত ব্যক্তিদিগকে লইয়া অকাতরে শুনিতেছেন এবং বাহবা দিতেছেন। হায়। ইহার অপেক্ষাও কি অমানুষিক কার্য্য আছে? এই দেশের লোক কি চরিত্র এবং সুরুচির দাবি করিতে পারে? যাহা হউক, এইরূপে বঙ্গ সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ ভারতের অশ্লীল ভাব এবং কবিওয়ালার কুৎসিত গালিগালাজ রাশির নিম্নে সমাহিত হইয়াছে, বাঙ্গালীর চরিত্র রূপ প্রাসাদ ভগ্ন এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলীসাৎ হইয়াছে।

বাঙ্গলা সাহিত্যের তৃতীয় যুগের দ্বার ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ কয়েক ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রথম উদ্ঘাটিত হইয়াছে। এই দ্বার দিয়া বঙ্গমাতার অনেক সুসন্তান রঙ্গ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন। কিন্তু এই যুগের প্রথম হইতেই বঙ্গের রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি, ধর্ম্মনীতি, রুচি ও ব্যবহার সমস্তই ইংরেজি ভাবের ছায়ার সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। মুসলমান বিজেতারা ভারতের শস্য শ্যামল ভূভাগে আধিপত্য স্থাপন করিয়াই কৃতার্থ মন্য হইয়াছিলেন, ভারতের মানসিক জগৎ একরূপ অস্পৃষ্ট ছিল, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু ইংরেজগণ এদেশের মৃত্তিকার সঙ্গে দেশবাসীর মন প্রাণ হৃদয় সকলই অধিকৃত করিয়াছেন। সামান্য আহারে, পরিচ্ছদে, এমন কি শুদ্ধ নির্শিথিনী গর্ভস্থ প্রণয়ী প্রণয়িনীর মধুর বিশ্রমালাপে পর্য্যন্ত ইংরেজের সোহিত্যের শব্দমূর্ত্তির ছায়া পতিত হইয়াছে। সাহিত্য আর কোন ছার। যে ব্যক্তি ইংরেজের ভাষায় কল্পনা করে, ইংরেজের মাথায় চিন্তা করে, ইংরেজের মুখে কথা বলে, তাহার লিখিত সাহিত্য যে ইংরেজ-সাহিত্যাকারের বনিত উদ্বমিত পদার্থ মাত্র হইবে, তাহা অপরকে বুঝাইতে চেষ্টা করাই মূঢ়তা। এই যুগে বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে অনেক প্রতিভা-জ্বলন্ত জ্যোতিষ্কের উদয় হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সে সমুদয়ই চন্দ্রের ন্যায় উপগ্রহ মাত্র, তন্মধ্যে একটীও সূর্য্য বা মূল নক্ষত্র নাই। বস্তুত, যিনিই যত লিখুন, যিনিই যত প্রতিভার পরিচয় দিউন কিছুই যেন ইংরেজের ছায়া কলঙ্কিত না হইয়া আপন পায়

ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারেনা। ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের সময়কে পশ্চাতে রাখিয়া অক্ষয়-কুমার, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম চন্দ্র, দীনবন্ধু, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীন চন্দ্র, রবীন্দ্র নাথ প্রভৃতি অনেকেই আসরে নামিয়াছেন, অনেকেরই গান খুব জমিয়াছে। কিন্তু চণ্ডী-দাস, গোবিন্দ দাস, মুকুন্দ রামের প্রতিভার ছায়াও কেহ মাড়াইতে পারেন নাই। সতীর প্রেম এবং কুলটার প্রেমে যত তফাত্, এ উভয় দলের কাব্যরসেও তত তফাৎ তফাৎ ভাব। যাহাহউক্, এ বিষয় আমাদের ঠিক সমালোচ্য নয়।

তৃতীয় যুগের সাহিত্যে খুব মৌলিকতা না থাকিলেও, তাহা বঙ্গ সমাজকে এক নূতন ভাবে আলোড়িত এবং আন্দোলিত করিয়াছে। এই আলোড়ন কার্য্যে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা এবং স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্তের গ্রন্থাবলীই সর্ব্ব প্রধান। স্বর্গগত মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেনের বক্তৃতা এবং উপদেশ প্রথমে ধর্ম্মতত্ত্বাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হইত, পরে গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইয়াছে। ইহাও পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর সাহিত্য। ইংরেজি সাহিত্যের উচ্চ নৈতিক ভাব উচ্চ শিক্ষিতদিগের চরিত্রেই প্রতিফলিত হইতে পারে। অর্দ্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত দিগের চরিত্রের উপরে দেশীয় সাহিত্যের প্রভাবই কার্য্যকারী হয়। এদেশে কয়টী নীতিমান উচ্চ শিক্ষিত লোক এতৎ পূর্ব্বে দেশের মুখোজ্জ্বল করিতেন, তাহা আমরা ভাল রূপে জানিনা। কিন্তু অক্ষয় কুমারের গ্রন্থ পড়িয়া এদেশের সহস্র সহস্র নরনারী যে সুনীতি ও সুসংস্কারের মর্য্যাদা বুঝিয়াছেন, ইহাতে ভুল নাই। আজ কাল অনেক বাঙ্গালীকে ব্রাহ্ম করিয়া বলিতে শুনা যায়, ইয়ুরোপের সভ্য জাতির মধ্যেও অনেক অনাভাসিত কুসংস্কার আছে। সংস্কারের এত তীক্ষ্ণ জ্ঞান কি অক্ষয় কুমারের যত্নের ফলেই আমরা লাভ করি নাই? অশ্লীল কবির ছড়া, পুনর্ব্বিবাহের গান, বাই খেমটার নাচ গান যে অতি জঘন্য রুচির কার্য্য, ইহা কি অক্ষয় কুমার দেশের সহস্র সহস্র নরনারীর গোচরে অঙ্কিত করেন নাই? মদ্য মাংসের প্রতি অশ্রদ্ধা, অকপট বন্ধুতা ও পবিত্র আদর্শ দাম্পত্য প্রেমের প্রতি অনুরাগ কি অক্ষয় কুমারের গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেকে হৃদয়ে সঞ্চয় করেন নাই? প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ভাষায় নূতন যুগান্তর করাইয়াছেন, বিধবা বিবাহ প্রতি-পোষক ও বহু বিবাহের প্রতিরোধক গ্রন্থাদি লিখিয়া সামাজিক কুপ্রথার মূলোচ্ছেদ করিতেও তদ্রূপ ভূয়সী চেষ্টা করিয়াছেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র ও তৎ সহযোগীদের লেখনী বঙ্গ সমাজের যে উপকার করিয়াছে তাহা বহু শতাব্দীর পরে বঙ্গের ভবিষ্য ইতিহাস-লেখক গম্ভীর সমাহিত চিত্তে ভাবিয়া লিখিবেন, এ হারি ভাষায়, এ বিদ্রূপের দিনে আমরা তৎসম্বন্ধে অধিক কিছু বলিয়া তাহার গৌরব নষ্ট করিব না। প্রতিদিনই বঙ্গ সমাজ হইতে বহুবিবাহ ও বাল্য বিবাহ অন্তর্হিত হইতেছে, জাতি-ভেদের কঠোর নিয়মের মূল বন্ধন শিথিল হইয়াছে, মান-বের ধর্ম্ম বিশ্বাস অতি সূক্ষ্মরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সমাজ সংস্কারে ও উদার ধর্ম্ম মতে সমাজ প্রতি দশ বৎসরে উন্নতির এক একটী ধাপ অতিক্রম করিতেছে, দিন দিনই আবার বাঙ্গালীর মনে সত্যনিষ্ঠা এবং স্ত্রী পুরুষ অভেদে চরিত্রবত্তার আদর বাড়িতেছে, জ্ঞানানুশীলন এবং যৌক্তিকতার প্রতি

অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে, ন্যায় বিচার এবং সত্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, আত্ম মর্য্যাদা এবং বিবেকের স্বাধীনতা মানব মনকে আগনিত করিতেছে, বাঙ্গালীর বর্ত্তমান উন্নতির ইতিহাস-লেখককে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই যে সুলক্ষণ সকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ইহার মূল কারণ কি? ইংরেজের জ্ঞান বিজ্ঞান পাঠে ও তাঁহাদের সংস্রবে দেশীয় শিক্ষিত লোকের এ বিষয়ে অনেক উপকার হইয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কিন্তু ঐ একটী ঘটনা মাত্রই ইহার মূল কারণ নয়। ইতি পূর্ব্বে যে মহাত্মাদিগের কার্য্য কলাপের অতি সামান্য সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল তাঁহাদের মহতী চেষ্টার ফলেই যে বঙ্গ সমাজে এই সকল উন্নতির সুলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, বঙ্গের সুলেখক এবং সুসন্তান বঙ্কিমচন্দ্রও বর্ত্তমান জীবনে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহার 'বঙ্গদর্শন" মাতৃ ভাষার প্রতি দেশবাসীর প্রাণে প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চার করিয়াছে, ইহার 'আনন্দ মঠ" ও "সীতারাম" দেশের লোককে অনেক সংশিক্ষা প্রদান করিতেছে, ইহার "ধর্ম্মতত্ত্ব" ধর্ম্মের দিকে দেশবাসীর চিত্তাকর্ষণে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সঙ্গীত এবং কবিতার রাজ্যে রবীন্দ্র নাথ এবং ব্রাহ্মসমাজ প্রচুর সুরুচি ও সদ্ভাব আনয়ন করিয়াছেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার ধনে মানে যেমন দেশ-বিখ্যাত, মাতৃভাষার উন্নতি সাধনেও বঙ্গবাসীর নিকট বাঙ্গালার ইতিহাসে তেমনই চিরস্মরণীয়তা লাভ করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনন্ত গম্ভীর ধর্ম্মোপদেশ গ্রন্থ এবং স্বনাম-খ্যাত দ্বিজেন্দ্রনাথের "তত্ত্ববিদ্যা" প্রভৃতি বঙ্গভাষার অমূল্য অলঙ্কার। ঠাকুর-সাহিত্য-ভাণ্ডার সুরুচি, সদ্ভাব, চিন্তা ও কবিত্বের সমাবেশ ক্ষেত্র। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, কয়েক বৎসর হইতে যেন দেশের ভাল দিকে গতি কিছু মন্দীভূত হইয়াছে। সমাজের সুসংস্কার এবং ভাল কাজে এত বিদ্রূপ ও শিথিলতার ভাব আসিয়া পড়িয়াছে যে, অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছেন। দিন দিনই যেন সমাজের সর্ব্বাঙ্গে এই রোগ ছড়াইয়া পড়িতেছে। বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকদিগকে কিছু দিন পূর্ব্বে দেশের লোক অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। এ শ্রদ্ধার মূলে যে ভ্রম ছিল, তাহা নহে। বস্তুতই তখন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্র অনেক পরিমাণে নির্ম্মল স্বভাব ছিলেন। মিথ্যা, ব্যভিচার ও অত্যাচারের উপরে সত্য সত্যই তাঁহাদের বিদ্বেষ ছিল। দেশের যে কোন সৎকার্য্য ও সুসংস্কারে তখন উঁহারাই প্রধান অস্ত্র স্বরূপ হইতেন। আর যেন সে দিন নাই।

সাপ্তাহিক ও সাময়িক পত্রিকাগুলির এমন দুর্গতি হইয়াছে যে, তাহারা যেন সময়ের স্রোতের সহিত চলিতে না পারিয়া পশ্চাৎপদ হইবার উপক্রম করিয়াছে। আবার 'সঞ্জিবনী", "বঙ্গবাসী" ও "সময়' প্রভৃতিতে সেই ঈশ্বর গুপ্ত এবং গুড়্‌গুড়ে ভট্টাচার্য্যের মেয়েলি কোঁদল উপস্থিত। "সোমপ্রকাশ", "সাধারণী", "নববিভাকর" প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর দেশীয় ভাষার সাপ্তাহিক পত্রগুলি ক্রমে ক্রমে হীনতেজ ও অন্তর্হিত হইতেছে। বঙ্গদর্শনের সময়ানুপাতে উন্নত সাময়িক পত্রিকারও প্রায়

অভাব। কয়েক বৎসর হইতে সময়োপযোগী উচ্চ শ্রেণীর উৎকৃষ্ট সাহিত্যও অল্পই বাহির হইতেছে। বরং তৎপরিবর্ত্তে চিনিবাসচরিত, পাঁচুঠাকুর, মাডলভগ্নী, বেশ্যাচরিত, কলিকাতারহস্য প্রভৃতির ন্যায় অতি জঘন্য রুচির চিন্তাবিহীন, নিম্নশ্রেণীর পুস্তকেরই আদর বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন হইল, বাঙ্গের একজন প্রধান লেখকের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি দুঃখ করিয়া বলিলেন, দাম না উঠিল বই লিখিয়া লাভ কি? বস্তুত কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি বহু পরিশ্রম করিয়া যে একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন, সমাজে অদ্যাবধি তাহার কিছুমাত্র যথোপযুক্ত আদর হয় নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাহিত্য দ্বারাই সহজে সমাজের গতি নির্ণীত হয়। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলা সাহিত্যের গতি বড় মন্দ দিকে গড়াইয়াছে। উপহারের জোরে অরুচি, কুরুচি সকলই বিকাইয়া যাইতেছে। কুলোক এবং কুলেখকেরই পসার বাড়িয়া উঠিয়াছে। ভাল লোক এবং ভাল লেখকেরা উপহাররূপ ঘুষ দিতে পারিতেছেন না, তাঁহাদের লেখারও আদর বাড়িতেছে না। এই জন্য খ্যাতনামা লেখকদের মধ্যে অনেকেই কাগজ কলম তুলিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু সাহিত্যের এইরূপ দুর্গতিতে দেশের সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর নীতিজ্ঞান এবং রুচির অপকৃষ্টতা প্রমাণিত হইতেছে। সমাজের এ অবস্থা যে অধোগতির, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ অধোগতির মূল কারণ কি এবং কি উপায়ে ইহা দূরীভূত হইতে পারে, তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

অনেকে বলেন, বঙ্গবাসী প্রভৃতির ন্যায় পত্রিকার প্রভাব বৃদ্ধিই এইরূপ ঘটিবার একটী প্রধান কারণ। এই কথার মূলে প্রচুর সত্য আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটী কথা ভাবিতে দুঃখও হয়, লজ্জাও হয়। ঐ সকল পত্রিকা যাঁহাদের কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়, তাঁহারা কোনরূপেই দেশের গণ্য, মান্য বা বিখ্যাত লোক নহেন। ঐ দলের অধিকাংশ লোকই অর্দ্ধশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত এবং নগণ্য। ইঁহাদেরই কথায় যে সমাজের গতি ফিরিয়া দাঁড়ায়, সে সমাজ কতদূর উন্নত, তাহা এক কথাতেই বুঝা যাইতে পারে। তবে যদি বল, উপহারের জোরে তাঁহাদের কথা তাঁহারা লোকের কাণে তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং লোক তাহা শুনিয়া অধঃপতিত হইয়াছে। প্রথম কথা সুলভ লোভে যে জনসমাজ সদসদ্বিবেচনাহীন হইতে পারে, তাঁহারা নিজেরাই দুর্ব্বল। দ্বিতীয় কথা উপহারের পূর্ব্বেই বঙ্গবাসী দেশে বিখ্যাত হইয়াছে। ইহা দ্বারা আমাদের মনপ্রাণের অপকৃষ্টতা আরো প্রমাণিত হইতেছে। আমরা দুর্ব্বল, আমাদের রুচি ও আশয় বিষয় অতি অপকৃষ্ট, তজ্জন্যই মন্দ সাহিত্য প্রচারিত ও আদৃত হয়। সুতরাং বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকাই আমাদের অধোগতির প্রধান কারণ নয়, বরং তাহা আমাদের অধোগতির লক্ষণ প্রকাশক।

অনেকে বলেন, উপর্য্যুপরি দেশের অনেক বড় লোকের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের বড়ই ক্ষতি হইয়াছে। কৃষ্ণদাসাদির ন্যায় বড়লোকদিগকে হারাইয়া বঙ্গদেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন বটে কিন্তু বঙ্গভাষায় কিছুমাত্র ক্ষতি হইয়াছে, বলা যায় না। বাবু রাজকৃষ্ণ

মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির মত লোকের মৃত্যুতে বঙ্গভাষা সত্য সত্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের মৃত্যুতে বঙ্গ সমাজ ও সাহিত্য দুইই বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। যে মহাত্মার মৃত্যুতে সমগ্র পৃথিবীর ক্ষতি হইয়াছে, সেই গৌরবান্বিত কেশবচন্দ্রকে হারাইয়া বঙ্গমাতা যে মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়াছেন, তাহাতে আর ভুল কি? পরন্তু রাজনীতি-বিশারদ কৃষ্ণদাসাদির মত লোকের হানিতেও যে আমাদের সমাজের গাত্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কয়েকটী লোকের হস্তের উপরে যে সমাজ দাঁড়াইয়া থাকে তাহার নিজের হাঁটুতে বল নাই, ইহাও প্রমাণিত হয়। লোকোত্তর মরণ আসে; সুতরাং বড়লোকের আশ্রিত সমাজেরও পতন অবশ্যম্ভাবী। এই পতনেও সমাজের বা দেশের দুর্ব্বলতা প্রমাণিত হয়।

বস্তুত, আমরা শিশুর মত পরের হাত ধরিয়া "হাঁটি হাঁটি পা পা" করিয়া, এক পা, দুই পা উন্নতির পথে চলিতেছি মাত্র। আমাদের আভ্যন্তরীণ এবং স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা প্রচুর। যে যাহা বলে, আমরা তাহাই শুনিয়া হুজুগে মাতিয়া গড্ডলিকা-প্রবাহে ছুটিতে, নাচিতে ও খেলিতে থাকি। গম্ভীর চিন্তা শক্তি, চরিত্রের দৃঢ়তা, হৃদয়ের প্রসারিতা হইতে আমরা অনেক দূরের জীব। এইজন্য আমাদের প্রকৃতি জলের মত। আমাদিগকে যে যেমন ঘটনা রূপ পাত্রে স্থাপিত করে, আমরা তাহারই আকার ধারণ করি, বস্তুত আমাদের জাতীয় একটী নির্দ্দিষ্ট বিশেষ আকার নাই। কুলোকেরা এই মহা সুযোগ পাইয়া দিন দিন নূতন নূতন হুজুগ তুলিয়া অনায়াসে দুই পয়সার সঙ্গে সঙ্গে নাম ও পসার কিনিয়া লইতেছে। ভাল লোকেরা এই ঠগীর ঠকাম হাঁ করিয়া দেখিতেছেন।

আমরা অধঃপতিতই, আমাদের অধঃপতনের নূতন কোন কারণ নাই। বহুকাল হইতে অধোদিকে আহত হইয়া যে বেগ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই আমাদিগকে দিন দিন অধঃ হইতে অধোতে লইয়া যাইতেছে। শূন্য-স্থিত ভাঁটার ন্যায় যে ঘুরি আমাদের গতি ফিরাইতেছে। আমরা কখনও উন্নতির স্বপ্ন দেখিতেছি, কখনও অধঃপতন কল্পনা করিয়া কাঁদিতেছি। এই অধঃপতিত জাতির উদ্ধার অবশ্যই ভগবানের হাতে, তাহাতে ভুল নাই। কিন্তু ভগবানের ক্রিয়া মানবের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হয়। সেই শক্তি কখন কোন মানবে অবতীর্ণ হইবে, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং মানবের কর্ত্তব্যেরও শেষ নাই।

মাতৃভাষার উন্নতি সাধন এবং মাতৃভাষায় ভাল ভাল সদুপদেশ ও উদ্দীপনাপূর্ণ গ্রন্থ প্রচার দ্বারা যে জাতীয় চরিত্র উন্নত হয়, ইহাতে আমরা বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করি না। অক্ষয় কুমার দত্ত প্রমুখ দেশীয় গ্রন্থকার বঙ্গসমাজের যে উপকার করিয়াছেন, তাহা আমরা কখনও ভুলিব না বা অস্বীকার করিব না। সমাজগঠন ও সমাজের উন্নতি সাধনে সাহিত্যের অতুলনীয় শক্তি এ দেশে এবং অপর দেশে যুগে যুগে প্রকাশিত হইয়াছে। এই জন্যই এই প্রবন্ধের প্রথমে নানা সময়ের সাহিত্যের কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবতারণা করিয়াছি। বঙ্গসমাজের উন্নতিও যে বাঙ্গালা সাহিত্যের উপরে নির্ভর করিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আজ কাল মাতৃভাষার সেবাব্রতে অনেকেই সময় ব্যয় করিতেছেন। এ অতি শুভ লক্ষণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল প্রতিভা-সম্পন্ন সৎলোক বাঙ্গালা সাহিত্যের আপাত উপস্থিত দুর্দ্দিন দেখিয়া লেখনী সংযত করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে বদ্ধপরিকর হইয়া বঙ্গক্ষেত্রে নামিতে আমরা সানুনয়ে আহ্বান করিতেছি। অনেক সুপণ্ডিত বাঙ্গালী বিদেশীয় ভাষার চর্চ্চায় যে পাণ্ডিত্য ও যে চিন্তা ক্ষয় করিতেছেন, তাহা কি মাতৃভাষার উন্নতি কল্পে ব্যয় করিলে ফল কম হইবে? মাতৃভাষার উন্নতির গর্ভেই জাতীয় মহাসমিতির শক্তি এবং সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি নিহিত। দেশ কি সত্য সত্যই প্রতিভা-সম্পন্ন সাধু সজ্জন শূন্য হইয়াছে? বঙ্গবাসী ভদ্র সন্তান মণ্ডলীর ও পাঠকবৃন্দের কি রুচি ও মানসিক অবস্থা সত্য সত্যই হীন হইয়াছে? এ দেশে কি চিরদিনই কুরুচি, মিথ্যা ও অধর্ম্ম প্রশ্রয় পাইবে? বাঙ্গালা-সাহিত্য কি চিরকাল কতকগুলি দায়িত্বহীন গ্রন্থকারের অর্থ ও প্রশংসা লাভের যন্ত্র মাত্রই থাকিবে?

আমরা বলি, যতদিন দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সাধুলোকের হাতে সাহিত্যের সমগ্র ভার না পড়িবে, ততদিন সমাজের কল্যাণ হইবে না। যেন তেন উপায়ে কিছু অর্থ বা যশের লাভের জন্য যাঁহারা গ্রন্থ লিখেন, তাঁহাদের মত সমাজ-শত্রু অল্পই আছে। সাহিত্য এক মহাযোগ-সাধনা, ইহার রচয়িতা নিন্দা, প্রশংসা এবং অর্থ লালসার অতীত মহাযোগী হইবেন। অনেকে বই লেখাকে একটা ব্যবসায় মাত্র মনে করেন, অনেকে হাতের লেখা ছাপায় তুলিয়াই কৃতার্থ হন। কিন্তু হাতের লেখা ছাপায় তুলিয়া শত সহস্র লোকের নিকট পাঠান যে কত দায়িত্বের কাজ, তাহা একবারও ভাবেন না। একটা কথা লিখিবার পূর্ব্বে তাহা মানব মনের উপরে কিরূপ কাজ করিবে, শতবার ভাবা উচিত। সাহিত্যই সমাজের সঞ্জীবনী মন্ত্র, সাহিত্য সত্য সত্যই মৃতপ্রাণে জীবনীশক্তি সঞ্চারে সমর্থ। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ স্থলেই আমাদের সাহিত্য কুলোকের কুবাসনা সাধনের যন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। যে সাহিত্য-সমাজ-দেহের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত বঙ্গালয়ের নাট্যামোদ এবং প্রতি সামাজিক ও পারিবারিক উৎসব আনন্দের ভিতর দিয়া সমাজের অস্থি মজ্জা ও প্রতি রক্তবিন্দু গঠন করে, তাহার দুরবস্থাতে দেশের কি ক্ষতি হইতেছে, একবার সকলে ভাবিয়া দেখুন।

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৪০)

অতঃপর গৌরচন্দ্র যে সব তীর্থ দর্শন করিলেন, বৈষ্ণব গ্রন্থকারেরা তাহার আনুক্রমিক বর্ণনা করিতে পারেন নাই, সংক্ষিপ্ত রূপে ইতস্ততঃ উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে তৎকালে কর্ম্মী, জ্ঞানী, বৌদ্ধ, রামানুজ সম্প্রদায়, শ্রীবৈষ্ণব মধ্বা-

চার্য্য মঠের তত্ত্ববাদী প্রভৃতি বহুবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ছিল, তাহাদের সকলকেই শ্রীচৈতন্য তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয় নিশান উড্ডীন করিলেন। বিদ্যানগরের পর শ্রীচৈতন্য গৌতমী গঙ্গায় স্নান করিয়া মল্লিকার্জ্জুন তীর্থে মহেশ মূর্ত্তি দর্শন করিলেন। গোদাবরীর নামান্তর গৌতমী। বোধ হয়, গোদাবরীর শাখান্তর বৈনগঙ্গাই এখানে গৌতমী গঙ্গা নামে অভিহিত হইয়াছে। তাহার পর তিনি আহোবালেম্ নগরে যাইয়া রামানুজ প্রতিষ্ঠিত মঠ ও নৃসিংহ বিগ্রহ দর্শন করিয়া সিদ্ধবট নামক স্থানে রামসীতা দেখিলেন। সিদ্ধবটে একটী ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অতিথি সংকার করিয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ নিরন্তর রাম নাম জপ করিত। এখান হইতে গৌরচন্দ্র স্কন্দক্ষেত্রে স্কন্দ দর্শন করিয়া ত্রিমঠে যাইয়া বামনমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। ত্রিমঠ হইতে তিনি পুনর্ব্বার সিদ্ধবটে আসিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত রামজপী ব্রাহ্মণের গৃহে অতিথি হইলেন। কিন্তু এবারে এক আশ্চর্য্য দেখিলেন যে, ঐ বিপ্র তাঁহার পূর্ব্বাভ্যস্ত রাম নাম ছাড়িয়া এখন নিরন্তর কৃষ্ণ নাম জপিতেছে। আহারান্তে চৈতন্যদেব তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ বলিল "তোমার প্রথম দর্শন প্রভাবে আমার চিরদিনের অভ্যাস ঘুচিয়া এই নূতন অভ্যাস হইয়াছে। তোমাকে কৃষ্ণনাম করিতে দেখিয়া আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক একবার 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়াছিলাম। সেই হইতে রাম নামের পরিবর্ত্তে আমার জিহ্বা হইতে কেবল কৃষ্ণ নামই স্ফূরিত হইতেছে ও আমার চিরকালের স্বভাব একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ পরব্রহ্মবাচক রামনামের ও কৃষ্ণনামের মহিমা ব্যাখ্যা করিয়া কৃষ্ণনামের গৌরবাধিক্য বর্ণন করিল এবং বিনীতভাবে নিবেদন করিল যে 'আপনাকে কৃষ্ণ স্বরূপ মনে হইতেছে।' তখন শ্রীচৈতন্য তাহাকে কৃপা করিয়া ভ্রমিতে ভ্রমিতে বৃদ্ধ কাশীতে আসিয়া শিব দর্শন করিলেন। এবং তথা হইতে নিকটবর্ত্তী কোন এক সম্ভ্রান্ত গ্রামে যাইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই গ্রামে তৎকালে ব্রাহ্মণ সজ্জন বহুবিধ লোকের বাস ছিল। তার্কিক, মীমাংসক, দার্শনিক, মায়াবাদী, স্মার্ত্ত, পৌরাণিক প্রভৃতি নানা পণ্ডিতগণ এখানে বিদ্যা চর্চ্চা করিতেন। ইহা ভিন্ন এখানে বৌদ্ধদিগেরও এক আশ্রম ছিল। কথিত আছে, এই সকল পণ্ডিতদিগের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের তুমুল তর্কযুদ্ধ বাধিয়াছিল, এবং তিনি স্বীয় অসাধারণ শক্তি প্রভাবে সকলকে পরাজিত করিয়া স্বমতে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। গৌরের অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও প্রেমাবেশ দেখিয়া লক্ষ লক্ষ লোক বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। ইহা শুনিয়া বৌদ্ধাচার্য্য বিচার-জিগীষু হইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে গৌরের নিকট আসিয়া নব প্রশ্ন করিলেন। তাঁহার নব প্রশ্নের বিচার্য্য বিষয় এই :—

১। ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা নাহন, তিনি অনন্ত জ্ঞানবস্তু মাত্র। ২। জগতের অস্তিত্ব নাই, ইহা অবিদ্যা সমুৎপন্ন। ৩। অহং তত্ত্ব কি? ৪। পরলোকের অস্তিত্ব সম্ভবে কি না? ৫। বুদ্ধ দৃষ্টি লাভের উপায় কি? ৬। নির্ব্বাণ-তত্ত্ব কি? ৭। বৌদ্ধ দর্শন। ৮। বেদাদি অপৌরুষেয় কি রূপে? ৯। সগুণ ও নির্গুণবাদের প্রকৃতি কি? লিখিত আছে যে, শ্রীচৈতন্য স্বীয় অসাধারণ

তর্কশক্তি প্রভাবে এই সকল জটিল প্রশ্নের উত্তর দিয়া বৌদ্ধ মতকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন। দেখিয়া শুনিয়া উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী অবাক হইয়া গেলেন এবং বৌদ্ধাচার্য্য লজ্জায় অধোবদন হইলেন। গৌরের বিষ্ণুভক্তির কথা শুনিয়া কতকগুলি দুষ্ট বৌদ্ধ তর্কে হারিয়া গিয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার মানসে নিযুক্ত করিয়া এক থালিতে কতক অপবিত্র অন্ন পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে খাইতে দিতে আনিতেছিল, কিন্তু রামকৃষ্ণ, হরিনাম উচ্চারণ করিতে বলিলে তাহারা ঐরূপ করিল। তখন বৌদ্ধাচার্য্য চৈতন্য লাভ করিয়া গৌরকে বিনয় মিনতি করিতে লাগিলেন। দর্শকমণ্ডলী দেখিয়া বিস্মিত হইল। এই প্রস্তাবের মূলে কত টুকু সত্য আছে, জানি না। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই এখানে উল্লিখিত হইল।

মহাপ্রভু উপরোক্ত স্থান হইতে ত্রিপদী ত্রিমল্লে যাইয়া চতুর্ভুজ বিষ্ণু বিগ্রহ দর্শন করতঃ ব্যাঙ্কটগিরি হইয়া ত্রিপদী নগরে রাম সীতা দেখিতে পাইলেন। মান্দ্রাজের উত্তর পশ্চিমে ত্রিপতির পর্ব্বত। ইহারই শৃঙ্গ বিশেষের নাম ব্যাঙ্কটাদ্রি। ব্যাঙ্কটগিরি মান্দ্রাজের ৩৬ ক্রোস উত্তরে অবস্থিত। শকাব্দার একাদশ শতাব্দীতে এখানে রামানুজাচার্য্য শিবমন্দির অধিকার করিয়া বিষ্ণুবিগ্রহ স্থাপিত করেন। ত্রিপদী নগর ত্রিপতির পাহাড়ে অবস্থিত। এখানেও রামানুজ প্রতিষ্ঠিত রামমূর্ত্তি রহিয়াছে। তাহার পর গৌরচন্দ্র পানা নরসিংহ দর্শন করিয়া শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে আসিয়া শিব পার্ব্বতী ও লক্ষ্মীনারায়ণ দেখিতে পাইলেন। মান্দ্রাজের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বর্ত্তমান চেঙ্গল পট্টু জেলায় পেলার নদী তীরে কঞ্জীভরম্ বা কাঞ্চীপুরম্ নগর এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাকেই বৈষ্ণব গ্রন্থে শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণু কাঞ্চী নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ইহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ মান্দ্রাজের দক্ষিণ পশ্চিম বর্ত্তমান চিঙ্গল পট্টু ও আর্কট জেলার স্থানে স্থানে এই সকল তীর্থ দর্শন করিলেন, যথাঃ,—ত্রিমল্ল, ত্রিকালহস্তী, পক্ষতীর্থ বৃদ্ধকাল পীতাম্বর ও শিয়ালী ভৈরবী গুলি দুষ্ট বৌদ্ধ তর্কে হারিয়া গিয়া তাঁহাকে জব্দ করিবার মানসে যুক্তি করিয়া এক থালিতে কতক অপবিত্র অন্ন পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে খাইতে দিতে আনিতেছিল, কিন্তু বিধাতার কি আশ্চর্য্য লীলা। হঠাৎ এক বৃহদাকার পক্ষী আসিয়া ঠোটে করিয়া সেই থালি উর্দ্ধে লইতে গেল বৌদ্ধাচার্য্যের মাথায় পড়িল। থালিখানি তেরছে পড়াতে আচার্য্যের মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, আচার্য্য ধরায় পড়িয়া মুর্চ্ছিত হইলেন। বৌদ্ধগণ হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং শ্রীচৈতন্যের কোপে ঐরূপ হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া মিনতি করিয়া তাঁহাদের গুরুকে বাঁচাইতে বলিতে লাগিল। গৌর তাহাদিগকে আচার্য্যের কর্ণমূলে উচ্চৈঃস্বরে তাঞ্জোরের উত্তর পূর্ব্বে শিয়ালী নগর দৃষ্ট হয়, এখানে ভৈরবীর মূর্ত্তি আছে। অনন্তর শচীনন্দন কাবেরী নদীর তীরে মহাবন, দেবস্থান প্রভৃতি স্থানে মহাদেব দর্শন করিয়া শৈবদিগকে বৈষ্ণব করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে কুম্ভকর্ণ তীর্থ, পাপনাশন তীর্থ প্রভৃতি দর্শন করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গক্ষেত্রে আসিয়া রঙ্গনাথ দর্শন করিয়া

প্রেমে বিহ্বল হইলেন। মাছরাব পূর্ব্বদিকে শ্রীগৌবঙ্গ দ্বীপ কাবেবী নদীব দুইটী শাখা দ্বাবা পবিবেষ্টিত। কথিত আছে যে, রামানুজাচার্য্য কর্তৃক বঙ্গনাথ বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইযাছিল। শ্রীবাসদ্বীপ বামানুজ বৈষ্ণবদিগেব প্রধান তীর্থস্থান, বঙ্গনাথেব মন্দিব প্রাঙ্গণে শ্রীচৈতন্য সংকীর্ত্তন ও নৃত্যকবিযা প্রেমে বিহ্বল হইলেন দেখিয়া বেঙ্কট ভট্টনামে সেই স্থান-বাসী জনৈক ব্রাহ্মণ গৌবেব প্রতি বড়ই আকৃষ্ট হইলেন এবং কীর্ত্তনাবসানে যত্নেব সহিত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ কবিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন। বেঙ্কট ভট্ট শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত লক্ষ্মীনাবাযণ উপাসক। তাঁহাবা তিন সহোদব—ত্রিমল্ল ভট্ট, বেঙ্কট ভট্ট ও শ্রীপ্রবোধানন্দ সবস্বতী। বেঙ্কটেব পুত্র গোপাল ভট্ট তৎকালে বালক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যেব প্রেম চেষ্টা দেখিয়া বেঙ্কট এতই মুগ্ধ হইলেন যে, ভোজনান্তে তাঁহাকে বলিলেন যে, সম্প্রতি বর্ষাকাল উপস্থিত। এই চাতুর্ম্মাস্যে তীর্থ পয্যটন অসম্ভব। অতএব আমি নিবেদন কবি যে, এই চাবমাস আপনি এখানে থাকিয়া সুখে সময়াতিপাত করুন্। শ্রীচৈতন্য তাঁহাব হইলে বেঙ্কট ভট্ট নিজগৃহে তাঁহাব বাসস্থানাদি নির্দ্দিষ্ট কবিয়া দিয়া অতিভক্তিব সহিত গৌরের সেবা কবিতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য ভট্টগৃহে চাবিমাস কাল সুখে অবাস্থতি কবিতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে কাবেবীতে স্নান কবিয়া বঙ্গনাথ দর্শন কবা, দুই সন্ধ্যাব সেখানে হবিনাম সংকীর্ত্তন ও নৃত্যাদি বিলাস কবা, ভট্টের সহিত ভগবদ্বিষয়ক কথোপকথন ও হাস্য পরিহাস করা, তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্যের মধ্যে পবিণত হইল। বেঙ্কট ভট্টের স্বগোষ্ঠিবর্গ গৌবেব অলৌকিক চরিত যতই দেখিতে লাগিল, ততই তাহাদের তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি হইতে লাগিল। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণসজ্জন ও অপবাপর লোক তাঁহার মধুব ভাবে মুগ্ধ হইযা কতই আত্মীয়তা কবিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে সকলেই কৃষ্ণভক্তি লাভ কবিয়া হবিসঙ্কীর্ত্তনে উন্মত্ত হইযা গেল। শ্রীবঙ্গক্ষেত্রেব ব্রাহ্মণগণ শ্রীচৈতন্যকে স্বগৃহে আহাবেব নিমন্ত্রণ কবিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে নিমন্ত্রণ সংখ্যা এতই অধিক হইয়া পড়িল যে, চারি মাসকাল এক এক দিন কবিযা খাইযাও গৌবচন্দ্র সকল নিমন্ত্রণ বক্ষা কবিযা উঠিতে পাবিলেন না। বালক গোপাল ভট্ট সর্ব্বদা গৌবেব সঙ্গে কালযাপন করেন ও তাঁহাব ইচ্ছা প্রতিপালনে তৎপব থাকেন। থাকিতে থাকিতে গৌবেব অপরূপ রূপমাধুবী, অলৌকিক প্রেমভক্তি এবং সুমধুব ব্যবহার তাঁহাব শৈশব অন্তঃকবণে চিবমুদ্রিত হইয়া গেল, আব অপনীত হইল না। ইহার পব ইনি পিতা মাতাব স্বর্গারোহণে গৃহ পরিজন ছাড়িযা সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যচবণ আশ্রয় কবিয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনে যাইয়া রূপ-সনাতনের সঙ্গে মিলিত হইয়া ধর্ম্মচর্চ্চায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সমাজে গোপালভট্ট ছয় গোস্বামীর অন্যতম গোস্বামীরূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

রঙ্গনাথেব মন্দিবে এক ব্রাহ্মণ প্রতিদিন প্রাতে গীতা পাঠ করিত। ব্রাহ্মণ মূর্খ, ব্যাকবণজ্ঞানে বঞ্চিত, যাহা উচ্চারণ কবিত, সকলই অশুদ্ধ ও বিকৃত। তাহা শুনিয়া কতলোক তাহাকে পবিহাস করিত, কেহ

গালি দিত ও নিন্দা করিত। কিন্তু ব্রাহ্মণ সে সব গ্রাহ্য না করিয়া আবিষ্টচিত্তে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা যতক্ষণ সমাপ্ত না হইত, ততক্ষণ ছাড়িত না। আরও আশ্চর্য্য এই যে, সেই মূর্খ ব্রাহ্মণ যাহা পড়িত, তাহার এক বর্ণও সে যে বুঝিতে পারিত, তাহার পাঠ শুনিয়া ইহা কেহই মনে করিতে পারিত না। অথচ অধ্যয়নকালে তাহার নয়নাশ্রুতে বক্ষঃস্থল ভিজিয়া যাইত, পুলকে সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইত, কম্প, হুঙ্কার, স্বেদ প্রভৃতি সাত্বিক লক্ষণ সকল দেখা যাইত। শ্রীচৈতন্য দেবালয়ে যাইয়া প্রতিদিন এই ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইতেন। এক দিন তাহার পাঠ সমাপ্ত হইলে গৌর তাহাকে নিভৃত স্থানে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার গীতা পাঠে এত সুখ হয়, ইহার কারণ? আপনি ইহার কি অর্থ আস্বাদন করিয়া থাকেন?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিল 'আমি মূর্খ, শব্দার্থজ্ঞান আমার কিছুই নাই, অশুদ্ধ শুদ্ধ কিছুই জানি না। কিন্তু যতক্ষণ পড়িতে থাকি, ততক্ষণ দেখি যেন অর্জ্জুনের রথে শ্যামল সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ অশ্বরশ্মি ধারণ করিয়া মৃদু মধুর বাক্যে অর্জ্জুনকে হিতোপদেশ দিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই আমার আনন্দাবেগ হয়। এই জন্য লোকের উপহাস সহিয়াও আমি গীতা পাঠ ছাড়িতে পারি না।"

শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণের এই সরল ও অকৃত্রিম বিশ্বাস দেখিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন "গীতা পাঠ আপনারই সার্থক, ইহাতে আপনিই শ্রেষ্ঠ অধিকারী" এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রেমালিঙ্গন পাইয়া ব্রাহ্মণের ভাবসিন্ধু উথলিয়া উঠিল, তাহার মন নির্ম্মল হইল এবং সে গৌরের মহিমা বুঝিতে পারিয়া চারি মাস কাল ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কৃতার্থ হইয়া গেল।

বেঙ্কট ভট্টের সঙ্গে গৌরের সখ্যভাব দিন দিন গাঢ়তর হইতে লাগিল। বেঙ্কট এক জন সোজা লোক, লক্ষ্মীনারায়ণে অগাধ বিশ্বাসী। গৌরচন্দ্র তাঁহার সঙ্গে সময়ে সময়ে কত পরিহাসই করিলেন। এক দিন তিনি হাসিতে হাসিতে ভট্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থিতা পতিব্রতা শিরোমণি হইয়াও গোয়ালার ছেলে কৃষ্ণকে কেন ভজিতে চাহিয়াছিলেন? আর ইহাতে তাঁহার পাতিব্রত্য ধর্ম্মই বা কিরূপে রক্ষা হইল?" ভট্ট গম্ভীরভাবে উত্তর করিল "কৃষ্ণ ও নারায়ণ, একই তত্ত্ব। কেবল কৃষ্ণেতে লীলাধিক্য এই মাত্র। ইহাতে লক্ষ্মী নারায়ণের ভার্য্যা হইয়াও কৃষ্ণ ভজন করিতে চাহায় তাহার পাতিব্রত্য ধর্ম্মের হানি হইতে পারে না। আমার মোটা বুদ্ধিতে তো এই বুঝি, ইহাতে পরিহাস করিতেছ কেন?"

শ্রীচৈতন্য ততোধিক পরিহাসব্যঞ্জক ভাবে বলিলেন "আচ্ছা তা যেন হ'লো, কিন্তু শাস্ত্রে শুনিয়াছি যে, লক্ষ্মী কৃষ্ণ সঙ্গে রাসকেলি করিতে অধিকার পান নাই। অথচ শ্রুতিগণ তপস্যা করিয়া ব্রজদেবীর দেহ লাভ করিয়া রাসে অধিকারিণী হইয়াছিলেন, ইহার কারণ কি?"

ভট্ট এবারে কিছু মুস্কিলে পড়িয়া দিশা না পাইয়া উত্তর করিলেন "আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, ভগবানের অগাধ লীলার কি বুঝি? তুমি যদি বুঝাইয়া দাও, তবে কৃতার্থ হই।"

গৌরচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ মাধুর্য্য পূর্ণ ও সর্ব্ব চিত্তা-

কর্ষক। ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এমন কেহ নাই যে, তাঁহাকে দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে। অথচ মাধুর্য্য গুণে ব্রজবাসী জন কখন পুত্র জ্ঞানে তাঁহাকে উদুখলে বাঁধে, কখন সখা জ্ঞানে খেলায় হারাইয়া তাঁহার কাঁধে চড়ে, আবার কখন সামান্য নাচক জ্ঞানে তাঁহাতে আসক্ত হয়, অথচ কেহই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারে না। ব্রজজন ভিন্ন এ লীলায় অন্যের অধিকার নাই। সেই জন্য শ্রুতিগণকেও ব্রজদেবীর শরীর লইয়া এই লীলা সুখের অধিকার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তোমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তাহা না করিয়া দেবীদেহে রাসবিলাস অভিলাষ করিয়াছিলেন, তাহাতেই সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। কৃষ্ণ আমার গোয়ালা, গোপীগণ তাঁহার প্রিয়সী। দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ অঙ্গীকার করেন না। এখন বুঝলে তো, তোমার লক্ষ্মী কেন রাস পান নাই।"

বেঙ্কট ভট্টের মনে এত দিনে এই অভিমান হইল যে, নারায়ণই স্বয়ং ভগবান এবং তাঁহার ভজনই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। এক্ষণে গৌরের মুখে নারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের গৌরবাধিক্য শুনিয়া তিনি ম্লান মুখে নীরব হইয়া থাকিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিয়া পরিহাসটীকে আরও গভীর করিবার জন্য বলিলেন "ভট্টজি! সন্দেহ করিও না। শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণ ভগবান, নারায়ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্যরূপ বিলসিত বিগ্রহ মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের এই অসাধারণত্ব হেতু নারায়ণের শক্তি লক্ষ্মীর কৃষ্ণের প্রতি এত তৃষ্ণা। অথচ নারায়ণ গোপীদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে একটুও সমর্থ নহেন। কোন সময়ে গোপীদিগকে কৌতুক করিতে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ নারায়ণ বিগ্রহ ধরিয়াছিলেন, কিন্তু গোপীরা তাহা দেখিয়া মুখ ফিরাইয়াছিলেন।

এই সব কথা শুনিয়া বেঙ্কট ভট্টের মুখ শুকাইয়া গেল এবং কৃষ্ণ অপেক্ষা স্বীয় অভিষ্ট নারায়ণের অপকর্ষতা শুনিয়া তিনি মনে মনে বড়ই দুঃখিত হইলেন। পরম কারুণিক শ্রীচৈতন্য তাঁহার দুঃখ নিবারণ জন্য পরিহাস রাখিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ব্রাহ্মণ! দুঃখ করিও না। আমি তোমাকে পরিহাস করিয়াছি। নারায়ণে তোমার অবিচলিত বিশ্বাস দেখিয়া ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। বাস্তবিক কথা এই যে, ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ বুদ্ধি করা মহা অপরাধের কথা। যেমন একই মণি আঁধারাদি ভেদে নীল, লোহিত, পীত, নানা বর্ণে সুরঞ্জিত হইয়া পৃথকরূপে শোভা ধারণ করিয়া থাকে, তেমনি উপাসনাভেদে একই ভগবান নানা ভক্তের চিত্তে বিশ্বাসানুরূপ নানা রূপে প্রতিভাত হইয়া দেখা দেন। ইহাতে লক্ষ্মী ও গোপী, কৃষ্ণ ও নারায়ণে ভেদ করিবার কোন কারণই নাই। পরিহাস করিয়া তোমার প্রাণে যে ক্লেশ দিলাম, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর।"

এই কথা শুনিয়া বেঙ্কট ভট্ট হর্ষোৎফুল্ল নয়নে গৌরের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ হইয়াও তাঁহার অসাধারণ ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি করিয়া বলিলেন, "আমি অতি পামর জীব, ধন্য আমি যে লক্ষ্মী নারায়ণের কৃপায় তোমার এখানে শুভাগমন হইয়াছে। তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, তাই কৃপা করিয়া আমাকে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ও ভক্তিতত্ত্ব শুনাইয়া কৃতার্থ করিলে।" ভট্ট এই বলিয়া গৌরের চরণে পড়িলেন ও গৌরও তাঁহাকে আলিঙ্গন দানে সুখী করিলেন।

এইরূপে চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হইলে শ্রীগৌরাঙ্গ রঙ্গনাথ দর্শন করিয়া পুনরায় তীর্থ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। বেঙ্কট ভট্ট সগোষ্ঠিবর্গে কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক দূর তাঁহার অনুগমন করিলেন। তখন শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন এবং নীলাদ্রির শৃঙ্গ বিশেষ ঋষভ পর্ব্বতে আসিয়া নারায়ণ দর্শন করিলেন। এখানে আসিয়া গৌরচন্দ্র শুনিলেন যে, মাধবেন্দ্র পুরীর প্রধান শিষ্য ও তাঁহার গুরু ঈশ্বর পুরীর অধ্যাত্ম ভ্রাতা পরমানন্দ পুরী তথায় চাতুর্ম্মাস্য যাপন করিতেছেন। গৌর অতি মাত্র ব্যগ্র হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং একত্র কৃষ্ণ কথা রঙ্গে তিন দিন পর্য্যন্ত যাপন করিলেন। পরমানন্দ পুরী বলিলেন "আমি সম্প্রতি পুরুষোত্তম দেখিয়া বঙ্গদেশে গঙ্গা স্নানে যাইব।" গৌর বলিলেন "আপনার নিকটে সর্ব্বদা থাকিতে আমার ইচ্ছা, আপনি আমার প্রতি সদয় হইয়া বঙ্গদেশ হইতে যদি পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তবে ভাল হয়, তাহা হইলে আমিও তত দিন সেতুবন্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনার সহিত মিলিত হইতে পারিব।" ইহার পর পুরী মহাশয় পুরুষোত্তমে চলিয়া গেলেন এবং গৌরচন্দ্র শ্রীশৈলে আসিয়া শিবদুর্গা দর্শন করিয়া কামকোষ্ঠি বা বর্ত্তমান কম্বকোনম নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই নগর তাঞ্জোরের উত্তর পূর্ব্ব একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। ইহা প্রাচীন কোল রাজ্যের রাজধানী ছিল। কামকোষ্ঠি হইতে গৌরচন্দ্র দক্ষিণমথুরা বা মাদুরা নগরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই নদী ভিগে নদীর তীরে, কিন্তু বৈষ্ণব কবি লিখিয়াছেন যে, মাদুরা নগরে গৌরচন্দ্র কৃতমালা নামক নদীতে স্নানাবগাহন করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ভীগের নামই কৃতমালা হইবে। সে যাহা হউক, এই নগরে একটী রামভক্ত ব্রাহ্মণ গৌরকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া স্ব ভবনে লইয়া গিয়া বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত পাকাদির কোনই আয়োজন করিল না। তাহা দেখিয়া শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, পাক হইল না কেন? ব্রাহ্মণ রামভাবে বিভোর ছিল, উত্তর করিল, কি করিব মহাশয়। আমার অরণ্যে বাস, বনের মধ্যে তো পাক সামগ্রী কিছু পাওয়া যায়না। লক্ষ্মণ বন্যশাক, ফল মূল আনিতে গিয়াছেন। তাহা আসিলে সীতা ঠাকুরাণী রন্ধন করিবেন। গৌরচন্দ্র তাহার উপাসনার ভাব দেখিয়া বড়ই সুখী হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ আস্তে ব্যস্তে পাক করিয়া অতিথিদিগকে ভোজন করাইয়া নিজে উপবাসী থাকিল। গৌর সুধাইলে সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল যে, জগদাত্মা জগৎলক্ষ্মী সীতাদেবীকে রাক্ষসে স্পর্শ করিয়াছেন, একি প্রাণে সয়? আমার জীবনে কাজ নাই, জলে প্রবেশিয়া মরিব?" চৈতন্যদেব তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, "আপনার বুঝিবার ভুল হয়েছে, সীতার মূর্ত্তি প্রকৃত নয়। উহা চিদানন্দময়ী। তাহা স্পর্শ করিবার শক্তি দূরে থাকুক, প্রকৃত চক্ষু দর্শন করিতে সমর্থ নহে। রাবণের সাধ্য কি সীতাকে হরণ করিতে? সে সীতাকে স্পর্শ করিতে গেলে সীতা অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন। মায়াময়ী সীতাকৃতি রাবণ ছুইয়াছিলেন মাত্র। আমার এই ব্যাখ্যা ঠিক, আপনি বিশ্বাস করিয়া দুঃখ দূর করুন।"

ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত হইলে গৌরচন্দ্র দুর্ব্বেশন নগরীতে রঘুনাথ,' মহেন্দ্রশৈলে পরশুরাম দেখিয়া সেতুবন্ধে যাইয়া ধনুতীর্থে স্নান করিলেন। কৃতমালার সাগর সঙ্গমস্থানে সেতু-বন্ধ অবস্থিত। সেখানে নৌকায় উঠিয়া ধনু প্রণালী পার হইয়া রামেশ্বর দ্বীপে যাইতে হয়। গৌরচন্দ্র রামেশ্বর শিব দর্শন করিয়া বিশ্রামান্তে বিপ্রসভায় কূর্ম্ম পুরাণ শুনিতে গেলেন। সেখানে পতিব্রতা উপাখ্যান মধ্যে রাবণ কর্ত্তৃক মায়া সীতাহরণ বৃত্তান্ত শুনিয়া নিজের ব্যাখ্যার পোষক প্রমাণ পাইয়া তাঁহার পরিচিত রামভক্ত ব্রাহ্মণদিগের সই পুথি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। তদনন্তর তিনি পুনরায় দক্ষিণ মথুরায় আসিয়া সেই পুস্তক রামদাসকে দিলে সে অতি আনন্দিত হইল এবং নানা প্রকারে গৌরচন্দ্রের স্তব করিয়া সেদিন অতিথি সৎকার করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিল। শ্রীচৈতন্য এখন তাম্রপর্ণী নদীর তীরে তীরে পাণ্ড্য রাজ্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান টীনিভেলী জেলা এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং দক্ষিণ মথুরা উহার রাজধানী ছিল। এই স্থানে বহুতর হিন্দু কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে, তৎপরে গৌরচন্দ্র এই সব স্থানে দেখিলেন,—নয় ত্রিপদী, চিয়ড তালা, তিলতাঞ্চী, গজেন্দ্র মোক্ষণ, পানাগড়ি, চামতাপুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ, মলয় পর্ব্বতে অগস্ত্যাশ্রম, কন্যাকুমারী এবং আমলীতলা। তৎপরে গৌরচন্দ্র মালাবর উপকূলে মল্লার বা মালাবর দেশে আগমন করিলেন। এই দেশ এখন মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর একটী জেলা, প্রধান নগর কালীকট। এখানে আসিলে গৌরের একটী বিপদ উপস্থিত হইল। তৎকালে এ দেশে ভট্টমারী বা ভর্ত্তৃহরি নামে এক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ী লোক ছিল। উহারা ভর্ত্তৃহরিকে স্বীয় সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করে এবং স্ত্রী পুত্র, পশ্বাদি পশু এবং অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে যে, শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণ আসিয়াছিল। ভট্টমারীগণ তাহাকে সুন্দরী স্ত্রীর সহিত বিবাহ দিয়া ধন ঐশ্বর্য্য দিবে বলিয়া ভুলাইয়া আপনাদের দল মধ্যে আনিয়া রাখিয়া দিল। শ্রীচৈতন্য জানিতে পারিয়া ভট্টমারীদিগের আড্ডায় গিয়া বলিলেন, "দেখ তোমরাও সন্ন্যাসী, আমিও সন্ন্যাসী। তবে আমার ব্রাহ্মণকে তোমরা আট্‌কাইয়া রাখ, এ কি ভাল হয়?" এই কথা শুনিয়া দস্যু প্রকৃতি ভট্টমারীগণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাঁহাকে মারিতে আক্রমণ করিল। কিন্তু কে জানে কি আশ্চর্য্য, তাহাদের অস্ত্র সকল হাত হইতে পড়িয়া পরস্পরের গায়ে আঘাত লাগিল। ইহাতে ভট্টমারীগণ কে কোন্ দিকে পলাইতে লাগিল, তাহাদের স্ত্রী পুত্র কাঁদিয়া ব্যাকুল হইল, একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। এই সুযোগে শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ দাসকে দেখিতে পাইয়া তাহার চুলে ধরিয়া বলে টানিয়া লইয়া দৌড়িতে লাগিলেন এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়া সেই দিনেই পয়স্বিনী বা পাপনাশিনী নদীর তীরস্থ কোন ভদ্র গ্রামে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। এই স্থানে আদি কেশব মন্দিরে শ্রীচৈতন্য নৃত্য কীর্ত্তন করাতে তাঁহার ভক্তিভাব দেখিয়া বহু লোকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। এখানে তিনি "ব্রহ্মসংহিতা" নামক ভক্তিপূর্ণ এক আধ্যাত্মিক গ্রন্থ পাইয়া অতি যত্নের সহিত

লেখাইয়া লইলেন। পরবর্ত্তী সময়ে এই গ্রন্থ ও কৃষ্ণ কর্ণামৃত তাঁহাব ধর্ম্ম প্রচার পক্ষে অমোঘাস্ত্র স্বরূপ হইয়াছিল। ইহাতে গোবিন্দ মহিমা ও কৃষ্ণতত্ত্ব অতি বিশদরূপে বর্ণিত আছে। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ" ইত্যাদি শ্লোক ব্রহ্মসংহিতার। দুঃখের বিষয় এই যে, এমন মূল্যবান গ্রন্থের প্রথম পাঁচ অধ্যায় ভিন্ন অবশিষ্টাংশ এখন পাওয়া যায় না। তৎপরে গৌরচন্দ্র মধ্বাচার্য্যের দীক্ষা স্থান অনন্ত পদ্মনাভে আসিয়া অনন্তেশ্বর শিব দেখিলেন এবং তথা হইতে শ্রীজনার্দ্দন দেখিয়া পয়োষ্ণি বা পুত্তি নামক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত দেব স্থানে আসিলেন। তৎপরে তিনি শৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গপুরে শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত শিংহারী মঠে আসিলেন। এই স্থানে কোচিন দেশে তাঙ্গভদ্রা নদী তীরে অবস্থিত এবং এখানে শঙ্করাচার্য্য সরস্বতীর পাদ পীঠের নিকট ভারতী সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার পর শ্রীগৌরাঙ্গ তুলব দেশে চতুঃসন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের প্রধান স্থান উদিপী নগরে আসিয়া-উডুপ কৃষ্ণ দর্শন করিয়া সুখী হইলেন। এই স্থান সমুদ্র হইতে ১৪ ক্রোশ দূরে স্থিত। উডুপ কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে, কোন বণিকের অর্ণবপোত দ্বারিকা হইতে আসিতে তুলব দেশের উপকূলে সমুদ্র মধ্যে জলমগ হয়। এই পোত মধ্যে গোপীচন্দন মৃত্তিকার মধ্যে বাল গোপাল মূর্ত্তি লুকায়িত ছিল। মধ্বাচার্য্যকে স্বপ্নাদেশ হওয়ায় তিনি উহা আনিয়া উদিপী নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন। মধ্বাচার্য্যের অনুবর্ত্তীগণকে তত্ত্ববাদী বলা যায়। তত্ত্ববাদীগণ গৌরকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী জ্ঞানে প্রথমে বড় একটা গ্রাহ্য করে নাই, পরে তাঁহার প্রেমভক্তি প্রভাব দেখিয়া সম্মান করিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে সাধ্য সাধন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলে তত্ত্বাচার্য্য কহিলেন "শ্রীকৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ করিয়া পঞ্চবিধ মুক্তি লাভ করাই শ্রেষ্ঠ সাধন।" গৌর তাঁহাদিগকে শাস্ত্রাদি প্রমাণ দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, কৃষ্ণ ভক্তের পক্ষে কর্ম্ম ও মুক্তি দুইই পরিত্যাজ্য। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধ ভক্তিযোগে প্রেম ও সেবা লাভই পরম সাধন। তখন তত্ত্ববাদীগণ বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। ইহার পর গৌরচন্দ্র নিম্নলিখিত তীর্থ স্থান দর্শন করিলেন,—ফল্গুতীর্থ, ত্রিতকূপ বিশালা, পঞ্চাপ্সরা, গোকর্ণ শিব, দ্বৈপায়নি, সুপারক, কোলাপুরের দেবালয়াদি এবং পাণ্ডুপুর বা পাণ্ডারপুর।" পাণ্ডারপুর বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ভীম নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা বিঠল বা বিথুল ভক্তদিগের প্রধান স্থান। এখানে বিঠল বা বিথুল দেবের মন্দির আছে।" শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ মন্দিরে নৃত্য কীর্ত্তন করিলেন। বিঠল-ভক্তগণ বিঠল দেবকে বিষ্ণুর নবম অবতার বুদ্ধদেব বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইঁহাদিগকে এক প্রকার বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলা যাইতে পারে। পুণ্ডলিক নামক ব্যক্তি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই সময়ে মাধবেন্দ্র পুরীর অন্যতম শিষ্য শ্রীরঙ্গ পুরী ঐ গ্রামে কোন ব্রাহ্মণ গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শ্রীচৈতন্য এই শুভ বার্ত্তা পাইয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে যাইয়া পুরীকে দর্শন করিলেন এবং প্রেমাবেশে তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। শ্রীরঙ্গ পুরী গৌরের প্রেম পুলক অশ্রু কম্প দেখিয়া প্রসন্ন চিত্তে বলিলেন, "শ্রীপাদ। উঠ; তোমাকে দেখিয়া মনে

হইতেছে যে, আমাব ইষ্টদেবেব সহিত তোমাব কোন সম্বন্ধ থাকিবে; নইলে এরূপ প্রেম লক্ষণ তো অন্যত্র সম্ভবে না।" শ্রীচৈতন্য বিনীত ভাব ঈশ্বরপুরীব সম্বন্ধ জ্ঞাপন কবিলে উভয়ে প্রেমানন্দে গলাগলি নৃত্য কীর্ত্তন ও ভাবাবেশে ক্রন্দন কবিলেন। এক দিন শ্রীবঙ্গ পুরী তাঁহাব জন্মস্থান কোথায় জিজ্ঞাসা কবিলে, তিনি নবদ্বীপেব নাম কবিলেন। পুরী ইহাতে উত্তব কবিলেন "আমি আমাব গোঁসাইব সঙ্গে একবাব নদীয়ায় গিয়াছিলাম এবং জগন্নাথ মিশ্র নামক ব্রাহ্মণেব গৃহে অতিথি হইযাছিলাম। জগন্নাথ পত্নী শচীদেবী বন্ধন কার্য্যে অদ্বিতীয়া, তিনি আমাদিগকে অপূর্ব্ব মোচাব ঘণ্ট বাঁধিয়া খাওযাইয়াছিলেন, তাহাব আস্বাদ এখনও ভুলিতে পাবি নাই"। আহা তাঁহাদেব এক যোগ্য পুত্র অতি অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ কবিযা শঙ্কবাবণ্য নাম লইযা দেশ পর্য্যটন কবিতে কবিতে এই তার্থে আসিয়া সিদ্ধি প্রাপ্ত হইযাছেন।" শ্রীচৈতন্য উত্তর কবিলেন, "পূর্ব্বাশ্রমে শঙ্কবাবণ্য আমাব ভ্রাতা এবং জগন্নাথ আমাব পিতা।" কৃষ্ণকথা আলাপনে ও এইরূপ প্রসঙ্গে পাঁচ সাত দিন কাটিয়া গেলে শ্রীবঙ্গ পুরী দ্বাবকা তীর্থ দর্শনে গমন কবিলেন। শ্রীচৈতন্য গৃহস্থ ব্রাহ্মণেব অনুরোধে আবও চাবি দিন তথায় অবস্থিতি কবিযা পর্য্যটনার্থে বহির্গত হইলেন এবং বর্ত্তমান হাইদ্রাবাদ রাজ্য কৃষ্ণা নদীব তীবে তীবে নানা দেশ ভ্রমণ কবিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরে তিনি এক গ্রামে আসিয়া ব্রাহ্মণ মণ্ডলীব মধ্যে "কৃষ্ণকর্ণামৃত" নামক কৃষ্ণলীলা বিষযক মধুব গ্রন্থ অধীত হইতেছে, শুনিতে পাইযা প্রেমে বিহ্বল হইয়া গেলেন। এবং অনুসন্ধানে গ্রন্থকর্ত্তা বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবনের কথা শুনিতে পাইয়া আবিষ্ট হইলেন এবং অতি যত্নেব সহিত তিনি ঐ গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। সিদ্ধান্ত বিষয়ক ব্রহ্ম সংহিতা এবং লীলা বিষয়ক কৃষ্ণকর্ণামৃত, এই দুই গ্রন্থ পাইয়া চৈতন্য দেব মহা আনন্দিত হইলেন এবং ভক্তদিগকে উপহাব দিবেন বলিযা অতি যত্নেব সহিত বাখিযা দিলেন। তৎ পবে তিনি কৃষ্ণাব তীব হইতে উত্তব পশ্চিমাভিমুখে নানা বাজ্য ভ্রমণ কবিতে করিতে তাপী বা তাপ্তী নদীব তীবে মাহেশ্বতীপুব নামক গ্রামে আসিয়া নদীতে অবগাহন করিলেন। কৃষ্ণা হইতে তাপ্তী বহুদূবে অবস্থিত। মাহেশ্বতীপুবে আসিতে শ্রীচৈতন্য যে যে স্থান দিযা আসিযাছিলেন, বৈষ্ণব গ্রন্থে তাহাব নামোল্লেখ নাই। বোধ হয় তিনি বর্ত্তমান হাইদ্রাবাদ বাজ্য ভ্রমণ কবতঃ বেবাব ও নাগপুবেব মধ্যদিয়া তাপ্তী তীবে আসিয়া থাকিবেন। ইহাব পর নানা দেশ পবিদর্শন কবিতে কবিতে গৌবচন্দ্র নর্ম্মদা নদীধাবে আগমন করিলেন এবং ধনুতীর্থ দর্শন কবিয়া নির্ব্বিন্ধ্যা বা বর্ত্তমান কালী সিন্ধু নদীতে স্নানাবগাহন কবিলেন। সেই স্থান হইতে তিনি পৌবাণিক ঋষ্যমুখ পর্ব্বত দেখিয়া দণ্ডকারণ্যে আসিযা উপনীত হইলেন। এখানকাব বনমধ্যে অতিবৃদ্ধ, অতিস্থূল ও অতিউচ্চ সপ্ত তাল বৃক্ষ ছিল, কথিত আছে শ্রীচৈতন্য তাহাদিগকে আলিঙ্গন করায় তাহারা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। এখান হইতে শ্রীচৈতন্য বামাযনোল্লিখিত পম্পাসবোবরে স্নান কবিয়া পঞ্চবটীবনে গমন কবিলেন এবং তথা হইতে বর্ত্তমান আহম্মদাবাদ

নগরের উত্তর পশ্চিম নাসিক ত্র্যম্বক বা নাসিক নগরে গমন করিয়া ব্রহ্মগিরি হইয়া গোদাবরীর উৎপত্তি স্থান কুশাবর্ত্তে গমন করিলেন। এখানে গোদাবরীর সপ্ত শাখা মিলিত হইয়া গোদাবরী নামে প্রবাহিত হইতেছে। সপ্ত গোদাবরী দর্শন করিয়া গোদাবরীর ধারে ধারে নানা দেশ পর্য্যটন করিতে করিতে চৈতন্য প্রভু পুনরায় বিদ্যানগর বা রাজমহেন্দ্রীতে আসিয়া রাজা রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পুনর্মিলনে উভয়েই মহা আনন্দিত হইলেন এবং গৌরচন্দ্র রামানন্দকে স্বীয় তীর্থ বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত উপঢৌকন দিলেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, তুমি যে সব সিদ্ধান্ত পূর্ব্বে আমাকে শুনাইয়াছ, এই দুই গ্রন্থ তাহাই সাক্ষ্য দিতেছে। রামানন্দ রায় গৌরের সঙ্গে গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিয়া সুখী হইলেন এবং নকল করিয়া লইয়া আসল গ্রন্থ গৌরকে ফিরাইয়া দিলেন। পুনরায় দুই বন্ধুতে পাঁচ সাত দিন রাত্রিতে নানা প্রসঙ্গ হইতে লাগিল। রামানন্দ বলিলেন, তোমার ইচ্ছানুসারে আমি রাজাকে লিখিয়াছিলাম, মহারাজ দয়া করিয়া আমাকে নীলাচলে যাইতে আদেশ দিয়াছেন। আমি যাইবার উদ্যোগ করিতেছি।

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, আমিও তো সেই জন্য এখানে আসিয়াছি।

রাজা বলিলেন, আমার এখনও সব কাজ সারা হয় নাই। বিশেষতঃ আমার সঙ্গে হাতী ঘোড়া সৈন্য কোলাহল থাকিবে। তোমার তাহা ভাল লাগিবেনা। তুমি আগে যাত্রা কর, আমি দিন দশেকের মধ্যে সব সমাধান করিয়া তোমার অনুগমন করিতেছি। ইহার পর শ্রীচৈতন্য বিদ্যানগর হইতে যাত্রা করিয়া পূর্ব্ব পরিচিত পথে হাঁটিতে হাঁটিতে আলালনাথে আসিয়া উপনীত হইলেন, এবং সঙ্গী কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ দ্বারা নিত্যানন্দাদির নিকট আগে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়া নিজে পাছে পাছে যাইতে লগিলেন। ভক্তগণ তাঁহার প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে আসিয়া পথিমধ্যে তাঁহার দর্শন পাইয়া সুখ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, জগন্নাথের প্রধান পাণ্ডা ও উৎকল রাজের ইষ্টদেব কাশী মিশ্র প্রভৃতি বড় বড় সম্ভ্রান্ত লোক সমুদ্র তীরে তাঁহার সঙ্গে আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন এবং সকলে একত্র জগন্নাথ দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্য সার্ব্বভৌমের আলয়ে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন ও বন্ধুগণের নিকট তীর্থ যাত্রা বৃত্তান্ত বলিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিলেন।

শ্রীচৈতন্যের জীবনে এই তীর্থ ভ্রমণ এক মহা ব্যাপার। যখন রেলওয়ে ছিল না, রাস্তা ঘাট ভাল ছিল না, সে সময় একাকী পদব্রজে ব্যাঘ্র ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু পূর্ণ দুর্গম পথে এত দেশ ভ্রমণ করা কম পুরুষত্বের পরিচায়ক নহে।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

আদিশূর ও বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ।

(৩৮২ পৃষ্ঠার পর।)

বঙ্গজ কুলাচার্য্যগণ বলেন, মহারাজ বল্লালসেন দেব বঙ্গজ কায়স্থদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা, কুলীন, মধ্যল্য, মহাপাত্র এবং অচলা। আমরা ঘটকদিগের এই বাক্য সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কারণ "মধ্যল্য" শ্রেণী চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা রাজা দনুজমর্দ্দন দেব কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার সহিত বল্লালের কোনরূপ সংশ্রব নাই। ইহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহারাজ বল্লালসেন সপ্তবিংশ বংশের কায়স্থকে বিশেষরূপে সম্মানীত করিয়া তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। কুলীন ও মহাপাত্র বা সন্মৌলিক। যাঁহারা নবগুণ সম্পন্ন তাঁহারা কুলীন, যাঁহারা সপ্তগুণ সমন্বিত, তাঁহারা সন্মৌলিক। তদ্ব্যতীত অন্যান্য মৌলিক কায়স্থগণ অচলা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। চন্দ্রদ্বীপপতি দনুজমর্দ্দনের শ্রেণী বিভাগ কালে মৌদগল্য দত্তদিগকে মধ্যল্য শ্রেণীতে গণনা করা হইয়াছে। কিন্তু বল্লালের সময় দত্তের কুল নষ্ট হয় নাই। এইজন্য অদ্যাপি বিক্রমপুর সমাজে কাঠালীয়ার দত্তগণ অর্দ্ধ কুলীন বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। আদিশূর কিম্বা বল্লালের সময় দত্তদিগের কুল নষ্ট হইবার কোনও যুক্তি-সঙ্গত প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হইতেছি না। পরবর্ত্তী ঘটকগণ নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় লিখিয়াছেন।

"দত্তবংশ সমুদ্ভূতো নারায়ণো মহাকৃতিঃ।
চকার স নৃপতিঃ তং নিষ্কুলং দিনাদ্ধীনং॥

বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণ সেন দেবের শাসন-পত্রেও যে নারায়ণ দত্তের কীর্ত্তি বিঘোষিত হইতেছে, সেই নারায়ণদত্ত আদিশূর কিম্বা বল্লাল কর্ত্তৃক নিষ্কুল হইয়াছিলেন। ইহা নিতান্তই অজ্ঞের প্রলাপ বলিতে হইবে। ভূগর্ভ হইতে তাম্রশাসন ও প্রস্তর লিপি সমূহ আবিষ্কৃত হইয়া কুলাচার্য্যদিগের সর্ব্বজ্ঞত্ব লোপ করিবে, ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও চিন্তা করিতে পারেন নাই। আমরা ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, বল্লালের সময়ে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র ও দত্ত (মৌদগোল্য) এই পঞ্চবংশীয় কায়স্থ কুলীন শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছিলেন।

কান্যকুব্জাগত দশরথ বসুর দুই পুত্র পরম বসু ও কৃষ্ণ বসু। পরম বঙ্গদেশে ও কৃষ্ণ বসু দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করিতেছিলেন। উত্তর কালে কৃষ্ণ বসুর বংশে আলঙ্কার নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাঢ় দেশ পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। তদনুসারে অলঙ্কারের সন্তান সন্ততীগণও বঙ্গজ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। কিন্তু বল্লাল কৃত মর্য্যাদা স্থাপন কালে পরম বসুর উত্তর পুরুষ লক্ষ্মণ ও পূষণ বঙ্গজ বসুদিগের শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন। *

---

* ঘটকদিগের কুলজীগ্রন্থে কান্যকুব্জাগতে দশরথ বসুর পুত্র পরম বসু ও কৃষ্ণ বসু। পরম বসুর পুত্র লক্ষ্মণ ও পূষণ। ব্রাহ্মণদিগের বংশাবলী গণনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে (সেনরাজগণ ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) আদিশূরের প্রায় তিন শতাব্দীর পর বল্লাল আবির্ভূত হন। এমত স্থলে আদিশূরের সমসাময়িক দশ

* কান্যকুব্জাগত মকরন্দ ঘোষের দুই পুত্র সুভাষিত ও পুরুষোত্তম। সুভাষিত ঘোষ বঙ্গে ও পুরুষোত্তম ঘোষ দক্ষিণ রাঢ়ে বাস করিতেছিলেন। ‡ কুলাচার্য্যদিগের মতে সুভাসিতের দুই পুত্র, মহাকীর্ত্তি ও চতুর্ভুজ। মহারাজ বল্লাল সেন দেব ঘোষ বংশের শিরোভূষণ চতুর্ভুজকে কৌলিন্য প্রদান করেন। মহাকীর্ত্তি নিষ্কুল। এ স্থলে আদিশূরের সমসাময়িক মকরন্দের পৌত্র চতুর্ভুজকে বল্লালের সমসাময়িক বলা হইয়াছে। সুতরাং এই বংশাবলীও বিশুদ্ধ নহে।

কান্যকুব্জাগত বিরাটগুহের উত্তর পুরুষ দশরথ গুহ বল্লাল দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই দশরথের ও তাঁহার ভ্রাতাগণের উত্তর পুরুষগণ বহুকালান্তে রাঢ় দেশে গমন করিয়াছিলেন, এজন্য দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে কুলীন গুহ নাই। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন বিরাট গুহের উত্তর পুরুষ—বল্লালের সমসাময়িক দশরথ গুহকেই কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থের অন্যতম অবধারণ করিয়াছেন। এবং আপনাদের অনভিজ্ঞতা গোপন করত সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রচার করিবার মানসে লিখিয়াছেন যে, "গুহ" শব্দ শ্রবণে আদিশূরের সভাসদ্‌গণ হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই, এজন্যই "দশরথগুহ" আদিশূরের সভা পরিত্যাগ করিয়া এক বারে 'বঙ্গদেশে" যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

কান্যকুব্জাগত কালিদাস মিত্রের উত্তর পুরুষ অশ্বপতি হইতে বঙ্গজ ও শ্রীধর হইতে দক্ষিণ রাঢ়ীয় মিত্রদিগের উৎপত্তি। ইঁহারা উভয়েই বল্লালের সমসাময়িক।

কান্যকুব্জাগত মৌদ্গোল্য গোত্রজ পুরুষোত্তম দত্তের উত্তর পুরুষ নারায়ণ দত্ত বল্লালের সমসাময়িক, ইনি বল্লাল দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। খোদিত লিপি সমূহ পাঠে অবগত হওয়া যায়, এই মহাত্মা লক্ষ্মণসেন দেবের সময়ে বাঙ্গালায় মহাসন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। ব্রাহ্মণ কুলজ মহাত্মা উমাপতি মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, সুতরাং আমরা দেখিতে পাই, কায়স্থ-কুলভূষণ মহাত্মা নারায়ণ দত্ত রাজকর্ম্মচারিদিগের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে সমারূঢ় ছিলেন। এরূপ একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী কৌলিন্য প্রাপ্ত হন নাই ইহা আমরা কোনরূপে বিশ্বাস করিতে পারিনা। সেন রাজাদিগের শাসন কালে পুরুষোত্তমের বংশের কোনও প্রধান ব্যক্তি দক্ষিণ রাঢ়ে ছিলেন না। উত্তর কালে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ ভরদ্বাজ গোত্রজ দত্তদিগকে পুরুষোত্তমের বংশধর বলিয়া তাহাদিগকে সন্মৌলিক শ্রেণীতে স্থান প্রদান করিয়াছেন, এবং তদবধি তাঁহারা "অভিমানে বালির দত্ত যায় গড়াগড়ি" এই অপূর্ব্ব কথা দেশ মধ্যে প্রচার করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে মদ্গোল্য গোত্রজ পুরুষোত্তমের সহিত ভরদ্বাজ গোত্রজ বালির দত্তের কি সম্পর্ক হইতে পারে, তাহা আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা স্থির করিতে পারিলাম না। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ

রথের পৌত্র কখনই বল্লালের সমসাময়িক হইতে পারে না। ঘটক মহাশয়গণ প্রাচীন বংশাবলী সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইয়া কাহাকে যে কাহার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, তাহার কোন নির্ণয় নাই।

‡ বঙ্গজ ঘটকদিগের মতে মকরন্দ ঘোষের দুই পুত্র সুভাষিত ও ভবনাথ। কিন্তু দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটকদিগের মতে মকরন্দের দুই পুত্র সুভাষিত ও পুরুষোত্তম। এই পুরুষোত্তমের পুত্রের নাম ভবনাথ।

যখন অবগত হইলেন যে, পুরুষোত্তম দত্তকে তাঁহারা ভরদ্বাজ গোত্রজ বলিয়া দত্তের আদিপুরুষ অবধারণ করিয়াছেন, ইনি প্রকৃত পক্ষে মদ্‌গোল্য গোত্রজ ছিলেন। সুতরাং তখন তাঁহারা এক "কিন্তু" খাটাইয়া বলিলেন "বঙ্গজ কুলাচার্য্য গ্রন্থে স এব মৌদ্‌গল্য গোত্রঃ।" কিন্তু বঙ্গজ কুলাচার্য্যগণ পুরুষোত্তম দত্তকে মুক্তকণ্ঠে মৌদ্‌গল্য গোত্রজ লিখিয়াছেন। তাঁহারা রাঢ়ী ঘটকদিগের ন্যায় "কিন্তু" খাটাইয়া বলেন নাই যে, "দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগ্রন্থে স এব ভরদ্বাজ গোত্রঃ।" ইহার দ্বারা বঙ্গজ কায়স্থ-কারিকা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ-কারিকা অপেক্ষা প্রাচীন ও সমধিক প্রামাণ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।*

রাজা দনুজমর্দ্দন দেব কৃত শ্রেণীবিভাগ।

"চন্দ্রদ্বীপ শিরস্থানং যথা কুলীন মণ্ডলং।"

রাজা দনুজমর্দ্দন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা। বিখ্যাত মুসলমান ইতিহাস তবকাত-ই নাসিরি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, মহম্মদ বখতিয়ার খিলজী নবদ্বীপ অধিকার করিলে, রায় (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণসেন দেব বঙ্গের রাজধানী সমতট নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উক্ত ইতিহাস-লেখক মিনহাজ সিরাজ বলেন, ৬৪০-৪২ হিঃ অব্দে রায় লক্ষ্মণসেন দেবের বংশধরগণ বঙ্গদেশ শাসন করিতেছিলেন। জইয়ে বারনি প্রণীত তারিখে ফিরোজসাহি নামক ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ৬৮০ হিঃ অব্দে গৌরের বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা "সুলতান মখিসুদ্দিন তুগ্রল" সম্রাট বলবন কর্তৃক তাড়িত হইয়া যৎকালে জাজনগর (ত্রিপুরা) অভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময় সেন রাজবংশজ সুবর্ণগ্রামাধিপতি, বলবন বাদসাহকে যথেষ্ঠ সাহায্য করিয়াছিলেন। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুমান করেন, এই দনুজরায়ই পশ্চাৎ পাঠানদিগের দ্বারা তাড়িত হইয়া সমুদ্র উপকূলে গমন করত চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য স্থাপন করেন। রাজা দনুজরায় "সমাজপতি" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বল্লাল-নির্দ্ধারিত প্রথার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া কায়স্থদিগকে নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

১। কুলীন:—১ ঘোষ, ২ বসু, ৩ গুহ, ৪ মিত্র।

২। মধ্যল্য:—৫ দত্ত, ৬ নাগ, ৭ নাথ, ও ৮ দাস।* মধ্যল্য কুলীনদিগের আশ্রয় স্থান। ইহাদের সহিত আদানপ্রদান করিলে তাহাদের কুলের কোন হানি হয় না।

৩। মহাপাত্র:—(ক) ৯ সেন, ১০ সিংহ ১১ দেব, ১২ রাহা। এই চারি ঘর শ্রেষ্ঠ মহাপাত্র কুলীনের বিশ্রাম স্থান, ইহাঁদের সর্ব্বদা কুলকার্য্য হওয়া উচিত। ইহাদের সহিত আদানপ্রদান করিলে কুলীনের কুল নষ্ট হয় না।

মহাপাত্র:—(খ) ১৩ কর, ১৪ দাস, ১৫ পালিত, ১৬ চন্দ, ১৭ পাল, ১৮ ভদ্র, ১৯ ধর, ২০ নন্দী, ২১ কুণ্ড, ২২ সোম, ২৩ রক্ষিত, ২৪ কুরু, ২৫ বিষ্ণু, ২৬ আদ্য, ২৭ নন্দন। এই সকল মহাপাত্রগণ ৯,

* এস্থলে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণ প্রবন্ধ-লেখককে বঙ্গজ কায়স্থ কুলজ বিবেচনা করিতে পারেন। এই জন্যই ইহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য যে, প্রবন্ধ-লেখক দক্ষিণ রাঢ়ীয় চৌলা সমাজের সিংহ বংশজাত।

* কেবল মদগোল্য দত্তই মধ্যল্য, অন্যান্য গোত্রজ দত্তগণ সর্ব্বদা কুলকার্য্য করিলে মহাপাত্র শ্রেণীতে স্থান পাইতে পারেন।

১০, ১১, ১২ সংখ্যক মহাপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ নিম্ন হইলেও ইহারা উৎকৃষ্ট কায়স্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য নিকৃষ্ট কায়স্থগণ "অচলা" আখ্যা প্রাপ্ত হন।

৪। অচলা:—হোড়, স্বর, ধরণী, বাণ, আইচ, পৈ, শূর, শাল, ভঞ্জ, বিন্দু, গুই, বল, শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভূমিক, হুই, রুদ্র, গুড, আদিত্য, পীল, খিল, গুপ্ত, চাঞ্চী, বন্ধু, শাক্তি, হেস, সুমন্তু, গণ্ড, বাণা, রাহুত, দাহক, দান, গণ, অপ, মান, থাম, ক্ষেম, তোষক, বৈ, ঘর, বেদ, ভূত, অর্ণব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শক্তি, সঙ্গ, ক্ষমা, আশ, বর্দ্ধন, হেম, বন্ধ, অঙ্গ, কীর্ত্তি, শীল, ধনু, গুণ, যশ, মনন, দাড়িক, চাকি, শ্যাম, পূঞ্চ, গণ্ডু, নাদক, বোই, হোম, চাশক, ঢোল, দূত, ইত্যাদি কায়স্থগণ অচলা বলিয়া খ্যাত। মতান্তরে ৬৪ ঘর কায়স্থ অচলা শ্রেণীতে গ্রথিত হইয়াছে।

চন্দ্রদ্বীপাধিপতিদিগের সামাজিক আধিপত্য সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ উত্তরকালে যখন বসুবংশীয়গণ চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসন ও সমাজপতির আসন অধিকার করেন, তৎকালে বঙ্গজ কায়স্থগণ প্রধানত চারি সমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন যথা—

চন্দ্রদ্বীপ শিরস্থান, যশোহর বাহুস্বরূপ,
উরুদ্বে বিক্রমপুরঃ পাদৌ ফথয়াবাদকঃ॥
গুহ্যানি বাজুবশ্চৈব অন্যস্থানঞ্চ পুরীষং।

বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের শিরস্থান চন্দ্রদ্বীপ। যশোহর ইহার বাহু স্বরূপ। মহারাজ প্রতাপাদিত্য দ্বারা যশোহর সমাজ গঠিত হইয়াছিল। বিক্রমপুর এই সমাজের উরু, সুবিখ্যাত ভৌমিক চাঁদরায় ও কেদার রায় এই সমাজের সমাজপতি ছিলেন। ফতেয়াবাদ অর্থাৎ ভূষণা এই সমাজের পদস্বরূপ, বীরবর মুকুন্দরাম রায় ইহার সমাজপতি ছিলেন। বাজু (ঢাকা, ময়মনসিংহ) এই সমাজের গুহ্যদেশ ও অন্যান্য স্থান পুরীষ তুল্য। বঙ্গজ কায়স্থদিগের কুলবিধি কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

কুলকর্ম্ম কুলীনস্য কন্যায়াঞ্চ সমস্থিতং।
আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ সপর্য্যে চ প্রশস্তকাঃ॥
নাতি দূরে সমীপেচ ঋণগ্রস্তে চ দুর্জ্জনে।
ব্যাধিযুক্তে চ মূর্খে চ ষঠ সুকন্যা নদিয়তে॥
আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুলত্যাগ স্তথৈবচ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেচ কুলকর্ম্ম চতুর্ব্বিধং॥
স্বপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমং।
কন্যা ভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞা বা পরস্পরং॥
কুলীনায় সুতাং দদ্যাৎ কুলীনস্য সুতাং লভেৎ।
পর্য্যায় ক্রমত শ্চৈব স এব কুলদীপকঃ॥
বিপর্য্যয়ে কুলং নাস্তি ন কুলংবগু পিণ্ডয়োঃ।
পোষ্য পুত্রে কুলং নাস্তি ডেঙ্গরেচ কুলক্ষয়ং॥
সম্বন্ধ মচলৈঃ সার্দ্ধং কুর্য্যশ্চ যদি কুলীনাঃ।
কুলং নষ্টং তথা তেষাং দূষিতঞ্চ কুলং ভবেৎ॥
অচৈতন্য মোহভাবং প্রাপ্নুয়ুস্তে কুলাধমাঃ।
তেষাং কুলস্য প্রমাদং নৈব সরোমি বর্ণিতং॥
ভ্রষ্টস্থান নিবাসী চ সদ্বংশশ্চ ভবেন্নরঃ।
পদচ্যুতোঽপি তৎকুলেঃ কথ্যন্তে কুলভূষণৈঃ॥
কুর্য্যাচ্চেৎ কুল কর্ম্মানি তত্রকুলে ক্রমাগতঃ।
কুলজশ্চ সমাখ্যাতঃ কথ্যতে গ্রন্থকারকৈঃ॥
ভ্রষ্টস্থান নিবাসীচ সদ্বংশশ্চ ভবেন্নরঃ।
নৃপতিনাং পদং প্রাপ্য স্বস্থানেচ নিবাসিন॥
কুর্য্যাচ্চেত কুল কর্ম্মানি কায়স্থ স্বান্নভোজিনঃ।
কুলজাশ্চ ইতিখ্যাতাঃ কথ্যন্তে গ্রন্থকারকৈঃ॥
যদি পোষ্য পুত্রে কন্যা কুলীনঃ প্রদদেৎ কচিৎ।
ভ্রষ্ট কুষ্ঠ ফলং ভবেৎসহি মহাপাত্র সমোভবেৎ॥

প্রমার্দং তস্য কুলস্য নৈব শক্নোমি বর্ণিতং।
নহি প্রজায়তে সিদ্ধিঃ সহস্র কুলকর্ম্মভিঃ॥
কুলীনায় সুতাং দদ্যাৎ যো গৃহ্নাৎ কুলীনাৎ সুতাং।
কুর্য্যাচ্চেৎ কুলকর্ম্মাণি তত্র কুলে যথাক্রমং॥
দানাদিগ্রহণদোষাৎ বর্জ্জয়েৎ বিধি পূর্ব্বকং।
গঙ্গাক্রেন্ত কুলং তস্য কথ্যতে কুলভূষণে,॥
কুলীনস্য সুতাভাবাৎ পুত্র পর্য্যায় নিবৃতেঃ।
প্রসন্তান্যপকর্ম্মাণি ক্ষমাপানি তথৈবচ॥
কুলীনস্যাশ্রয় স্থানং বিবতে স্থানমেবচ।
কুলজশ্চ মধ্যল্যশ্চ মহাপাত্রশ্চ ভদ্রবেৎ॥
তৈঃ সার্দ্ধং যদি সম্বন্ধং কুর্য্যাচ্চ কুলীন বচিৎ।
তদা ন কুলহীনঃ সকুলকর্ম্মাচরেদ্যদি॥
কুলকর্ম্ম যদি ভবেৎতস্য ত্রিপুরুষাবধি।
তদাকুলস্য রক্ষস্যাদন্যথা চ কুলক্ষয়ং।
আত্মোচিত গৃহ কবি চতুর্ভাবানি প্রাপ্নুয়াৎ।
ক্রমশশ্চাপি কুলীনো বিবিধিঃ কুলকর্ম্মভিঃ॥
কুলজেন সহকর্ম্মঃ কুর্য্যাচ্চেৎ কুলীন যদা।
তদাপ্নুয়াৎ চোপ ভাবং তদ্বক্ষেদ্রুপকর্ম্ম চ॥
মধ্যল্যেন ক্ষমং ভাবং মহাপাত্রেন চাপকং।
প্রাপ্নুয়াচ্চ কুলীনোয়ং তত্ত্বং কর্ম্মানুসারতঃ॥
কুলীন শ্রেষ্ঠবংশেন ইতর কুলীনো যদা।
দানাদি কুলকর্ম্মাণি কুর্য্যাচ্চ বিধি পূর্ব্বকং॥
তদেতর কুলীনশ্চ সম্ভাব প্রাপ্নুয়াৎ তথা।
তৎকর্ম্ম সৎকর্ম্ম ভবেৎ তৎ পক্ষচ মহাযশঃ॥
কুলজো বা মধ্যল্যো বা মহাপাত্রশ্চ বা তথা।
সম্বন্ধঞ্চ যথা কুর্য্যু কুলীনেন সমংকিল॥
সম্ভাব প্রাপ্নুয়ুস্তে চ বিবিধিঃ কুলকর্ম্মভিঃ।
ভাবস্থানি বর্ম্মানি সৎকর্ম্মাণি তথা কিল॥
ত্যক্ত্বা চ কুলসম্বন্ধং লোভাচ্চ যদি কুলীনাঃ।
মধ্যে ত্রিপুরুষাণস্তু ন কুর্য্যুশ্চ কুলক্রিয়া॥
পুরুষানুক্রমাদেবং বতাস্যুরপকর্ম্মণি।
ভবেয়ুস্তে কুলচ্যুতাঃ অচলানাং সমাভবেৎ॥
এতৈঃ সহাপি সম্বন্ধং কুর্য্যাচ্চ কুলীনো যদি।
প্রাপ্নুয়াৎ কর্ম্ম ভাবেন অপভাবং তথাত্যপ॥
মধ্যে ত্রিপুরুষানন্তু দৌহিত্রো দোষমাবহেৎ।
কুলীনস্য কুলং নষ্টং দূষিতঞ্চ কুলংভবেৎ॥

বঙ্গজ কুলীন কায়স্থের কুল কন্যাগত। স্বপার্য্যায় * আদান প্রদান প্রশস্ত। অতিদূরে, অতিনিকটে, ক্ষয়গ্রস্থে, দুর্জ্জনে, ব্যাধিযুক্তে, মূর্খে কন্যাদান করিবে না। আদান, প্রদান, কুশত্যাগ এবং ঘটকাগ্রে প্রতিজ্ঞা, এই চারি প্রকারে কুলীনের সম্বন্ধ স্থির হইবে। স্বপর্য্যায়ে দান ও গ্রহণ উত্তম। কন্যাভাবে কুশত্যাগ অথবা পরম্পরের প্রতিজ্ঞা দ্বারা সম্বন্ধ স্থির রাখিবে। যিনি পর্য্যায়ক্রমে কুলীনে কন্যাদান ও কুলীনের কন্যা গ্রহণ করিবেন, তিনি কুলদীপক বলিয়া গণ্য হইবেন। বিপর্য্যায়, বণ্ডাকন্যা ও পোষ্যপুত্রের কিম্বা ডেঙ্গরের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুল নষ্ট হইবে। অচলের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুল নষ্ট ও দূষিত হয়। তদ্বারা কুলীন অচৈতন্য ও মোহ ভাব প্রাপ্ত হইবেন। সেই দোষ বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। সদ্বংশজাত ভ্রষ্টস্থানে বাস করিলে কৌলিন্য হইতে চ্যুত হইবে, কিন্তু তদ্বংশীয়গণ ক্রমাগত কুলকার্য্য করিলে কুলজ বলিয়া গণ্য হইবেন। স্বস্থানবাসী রাজপদ বিশিষ্ট ব্যক্তি ভ্রষ্টস্থানে বাস করিয়া স্বপার্কা হইলে ক্রমাগত কুলকর্ম্ম দ্বারা কুলজ বলিয়া গণ্য হইবেন। পোষ্যপুত্রে কন্যাদান করিলে কুল নষ্ট হইবে এবং দাতা মহাপাত্রভাবাপন্ন হইবেন এবং সহস্র কুলকর্ম্মের দ্বারাও সেই দোষ খণ্ডন হইবে

---

* দক্ষিণ রাঢী ও বঙ্গজ কায়স্থগণ পর্য্যায় লইয়া চীৎকার করিয়া থাকেন, অথচ পর্য্যায়ের বিচমলায় গলদ দেখা যাইতেছে। বংশাবলীর প্রথমভাগ বিশুদ্ধ নহে সুতরাং এরূপ পর্য্যায় গণনা করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

না। যে কুলীন বংশ পরম্পরায় দোষ গুণ বিচার পূর্ব্বক সর্ব্বদোষ পরিহার করত কুলীনে আদান প্রদান করিবেন, তাঁহার কুল গঙ্গাশ্রুত বলিয়া কথিত হইবে। পর্য্যায় অনুসারে পুত্র ও কন্যার অভাব হইলে উপ, ক্ষয় ও অপকর্ম্ম প্রশস্ত হইবে। কুলীনের আশ্রয় ও বিবাহ স্থল কুলজ, মধ্যাল্য ও মহাপাত্র। কুলীন তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধ করিয়া যদি তিন পুরুষের কুলক্রিয়া করেন, তাহার কুল নষ্ট হইবে না। কিন্তু তিন পুরুষের মধ্যে কুলকার্য্য না করিলে কুলক্ষয় হইবে। কুলীনগণ কুলকর্ম্মদ্বারা আত্ম, উচিৎ, গ্রহ ও কবি এই চারি ভাব প্রাপ্ত হইবেন। কুলজের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুলীন উপভাব প্রাপ্ত হন এবং ঐ কর্ম্ম উপকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইবে। মধ্যাল্যের সহিত ক্রিয়া করিয়া ক্ষয় ভাব ও মহাপাত্রের সহিত সম্বন্ধ করিয়া কুলীন অপভাব প্রাপ্ত হইবেন। কুলজ, মধ্যাল্য ও মহাপাত্র কুলীনের সহিত সম্বন্ধ করিলে তাহা তাহাদের পক্ষে সৎ সম্বন্ধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহারা সৎভাব প্রাপ্ত হইবেন। লোভ বশত কুলীন তিন পুরুষ মধ্যে কুলক্রিয়া না করিয়া পুরুষানুক্রমে অপক্রিয়ায় রত হইলে, তিনি কুলচ্যুত এবং অচল তুল্য হইবেন। এই কুলীনের সহিত সম্বন্ধ করিলে কুলীন ক্রিয়ার ভাবানুসারে অপভাব ও অত্যাপভাব প্রাপ্ত হইবেন। তিন পুরুষের মধ্যে দৌহিত্র দোষ বর্ত্তিলে কুলীনের কুল নষ্ট ও দূষিত হইবে।

বঙ্গজ কায়স্থ কুলীনদিগের মধ্যে মিত্রদিগের কুল নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে চারি ঘরের পরিবর্ত্তে তিন ঘর কুলীন হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাঠালীয়ার দত্তগণ অর্দ্ধকুলীন বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন।

ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ।

আসক্তি ও অনুরাগ।

মাতাল না হইয়া যে মদ খাইতে পারে, সেই মদ খাইতে জানে। নেশায় প্রকৃতি-বিপর্য্যয় ঘটায়। অনুরাগের সহিত যার আসক্তি নাই, সেই ভালবাসিতে জানে। দর্পণে প্রতিকৃতি প্রতিভাত হয়, দর্পণের স্বচ্ছতা গুণে। যদি প্রতিকৃতি দর্পণে লাগিয়া যাইত, দর্পণের স্বচ্ছতা থাকিত না। প্রতিকৃতি প্রতিফলিত আর হইত না।

আসক্তি অনুরাগকে সীমাবদ্ধ করে। স্থান কাল পাত্রের গণ্ডিতে ধরিয়া রাখে। সসীম অনুরাগ কলঙ্কিত, আসক্তি অনুরাগের কলঙ্ক। আসক্তি কর্ম্মের প্রাণ, কিন্তু জ্ঞানের নয়। গৃহস্থ কর্ম্মী, সন্ন্যাসী, জ্ঞানী। কর্ম্মেতে অনুরাগ, জ্ঞানেও অনুরাগ, কর্ম্মে আসক্তি-কলঙ্কিত অনুরাগ, জ্ঞানের অনুরাগে আসক্তি নাই।

আসক্তি-শূন্য অনুরাগ ব্যভিচারী নহে। ব্যভিচার আসক্তির অতিমাত্রা জনিত, অভাব জনিত নহে। দর্পণে অনেক প্রতিকৃতি প্রতিফলিত হয়, তজ্জন্য দর্পণকে কেহ

ব্যভিচারী বলেনা। একটীকে ধরিয়া যে আর একটীর জন্য হাত বাড়ায়, সেই ব্যভিচারী। যে কাহারই জন্য হাত বাড়ায় না, যাহার গৃহে অতিথি অনেক, কুটুম্ব কেহ নাই, সে ব্যভিচারী নহে, সে গৃহস্থ নহে, সে সন্ন্যাসী।

নেশা না হইলে মদ খাইয়া সুখ কি? আসক্তিহীন অনুরাগ নপুংসক। সে অনুরাগে—অনুরাগীরও সুখ নাই, অনুরক্তেরও সুখ নাই। সুখ দুঃখ মৃৎসমুদ্রের পাঁয়া ফল। এই কষ্টিপাথরে সকলেই পরীক্ষিত। অসার কল্পনা, শূন্য শূন্যের পরীক্ষা, প্রলাপীর উদগার। সুখ নাই, অনুমানেও নাই।

যখন অহঙ্কারে আপনাকে জগতের কেন্দ্র করি, তখন আমার সুখ দ্বারা জগতের পরিমাণ করি। যখন আমার সুখ জগতের মানদণ্ড হয়, তখন অসুখে সুখ ভ্রম হইলেও তাহারই দ্বারা পরিমাণ পরিসমাপ্ত হয়। আবার সেই অহঙ্কারে নীতি উচ্ছৃঙ্খল হইয়া অনীত কর্ম্ম কর্ত্তব্যে পরিগণিত হয়। নেশার সার—অহঙ্কার। স্থল জল আকাশ পাতাল ধর্ম্ম অধর্ম্মের পার্থক্য অপনোদনে ইহার তুল্য আর নাই।

তোমার সুখকেও মানদণ্ড করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। যখন বালক ছিলে, পুতুল দিয়া ভুলাইয়াছি। দর্পণে চাঁদ দেখাইয়া চাঁদের অভাব মিটাইয়াছি। যৌবনে দুটা ফুল দিয়া, একটু হাসি দিয়া, একটু খোষামুদী করিয়া নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া লইয়াছি।

তোমার অহঙ্কার সন্তুষ্ট করিলেই তোমার সুখ হয়। অহঙ্কার প্রমত্ত সার অসার বুঝেনা। সুখের মানদণ্ড ভাঙ্গিয়াছে। অন্য তুলায় ভাল মন্দ বিচার করিতে হইবে।

আর এক অসার কল্পনা বিবেক। গোবরে পদ্ম ফুল ফোটে, লোকে যখন জানিত, হস্তীর মাথায় গজমুক্তার জন্ম যখন বিশ্বাস করিত, তখন বিবেকের জন্ম। প্রাক্তন-লব্ধ বহুদর্শিতা বা জন্মগত জ্ঞান রাশি বিবেক নহে। বিবেক ভগবানের আদেশ কথা, ইসারা। পূতিগন্ধময় পয়োনালী-জাত কীটের হৃদয়ে নাকি সে পরশমণির জ্যোতিঃ প্রতিভাত হয়? কেহ দেখে নাই, শুনে নাই, তবুও নাকি হয়? শিক্ষা সাধনার আবশ্যক নাই, হেমন্তের শিশির, বর্ষার জল ও বসন্তের বায়ুর ন্যায় সকলেই তাহা অনায়াসে লাভ করে। অথচ কেহই স্বীকার করে না যে পাইয়াছে, দেখিয়াছে, শুনিয়াছে। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, ধর্ম্মে অধর্ম্মে আমিও কখন দেখি নাই, আর কেহ দেখিয়াছে, তাহার মুখেও শুনি নাই। কেহ কেহ বলেন, স্বাতি নক্ষত্রের জলের ন্যায় সেই কহিনুরের আলোক লগ্ন সাপেক্ষ, অসম সমবায়ে ঘটেনা। যাহা দেখি নাই, তাহা আছেও বলিতে পারি না, নাইও বলিতে পারিনা। কে বলিবে, ভূতপ্রেত আছে কি না? কিন্তু একটু বলিতে পারি, প্রতি মুহূর্ত্তে যাহার প্রয়োজন, সে এমন অস্পৃশ্য হইলে চলেনা ও আমার তাহাতে কাজ চলে না। নিত্য কার্য্যের জন্য, নিত্য ব্যবহারোপযোগী অন্য কিছু আছে। সে কথা থাক্।

তোমার সুখ হইবে বলিয়া তোমাকে ভালবাসি নাই, যখন ভাল বাসিয়াছিলাম, জ্যামিতির স্বীকার্য্য স্বতঃসিদ্ধ স্মরণ হয় নাই। যে হেতু, অতএব ভাবিবার সময় পাই নাই। বলিও না, স্বার্থপরতা। নিজে সুখী হইব, একথা ভাবিবার অবসর পাই নাই

অন্য পদার্থের কেনা বেচার লাভ লোকসান হিসাবের সময় হয়, ভালবাসিতে যদি সে সময় পাইতাম, যদি ভালবাসিলে এত হব জানিতাম, তবে হয়ত—কিন্তু তখন ভাবিবার সময় ছিল না, ক্ষমতা ছিল না, ইচ্ছা ছিল না। তোমার সুখও ভাবি নাই, আমার সুখও ভাবি নাই। ইচ্ছা করিয়াও ভালবাসি নাই। অনিচ্ছায়ও নহে।

প্রেমে পবিত্র করে। অনুরঞ্জিতকে মনুষ্যত্বের অতীত করিয়া দেবত্বে পরিণত করে। অনুরাগী ব্রহ্মচারী। আসক্তি মনুষ্যোচিত, পশুত্বের অনেক উপরে। আসক্তি মনুষ্যকে উপরে উঠিতে দেয় না।

আসক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। যে উপরে উঠিবে, তাহাকেই টানিয়া নীচে ফেলিবে। গার্হস্থ্য জীবন আত্মানুষিতার প্রশ্রয় দেয় না। সকলই নিয়মিত ধারাবদ্ধ, অনিয়ত অতিমাত্রয় প্রগল্ভতা শান্ত সলিল রাশি উদ্বেলিত করে। চাঞ্চল্য স্থির জীবনের বিসম্বাদী। এজন্য সে গণ্ডীর বাহিরে কাহাকেও যাইতে দেয়না। মাধ্যাকর্ষণে সকলকে বাঁধিয়া রাখে। আসক্তি গার্হস্থ্য জীবনের উপযোগী। সে গৃহস্থকে কর্ম্মে প্রণোদিত করে, দুঃখ বিপদ বিসম্বাদের ঝটিকায় গৃহস্থকে রক্ষা করে। আসক্তি না থাকিলে মনুষ্য মনুষ্যত্ব হারাইত।

কিন্তু সে কীট জীবনের প্রয়োজন কি? যাহা লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহাই লইয়া চলিলাম। যে লতা পল্লব এত দিন দেহ সুশোভিত করিয়াছিল, একে একে সকলই বৃন্তচ্যুত কুসুমের ন্যায় তলায় আসিয়া পড়িল। তাহাদের বুকের উপর দিয়া চলিতে হইল। আশা, ভরসা, উৎসাহ, কোথায় অদৃশ্য হইল। পৃষ্ঠাস্থি চূর্ণিত হইল। বিবাদ বিচ্ছেদ বিপদে সকলই, বিসর্জ্জন দিয়া বিজয়ার অন্ধকারে চক্ষু মুদিয়া শুইয়া আছি। এ জীবন ছাড়িয়া যাইলে দুঃখ কি? ভালবাসিয়া যদি রক্ষা করিতে না পারিলাম, সে ভালবাসার লাভ কি?

আসক্তি মনুষ্যকে দুর্ব্বল করে। অনুরাগে বলবৃদ্ধি হয়। নিরাসক্ত অনুরাগী কুজ্ঝটিকার উপরে অনাহত-দৃষ্টি, অবদ্ধ বাগ। তিনি অনুরঞ্জিতের প্রকৃত উপকারী, তাঁহার অনুরাগ সার্থক, সফল ও সুখপ্রদ।

তিনি উপরে থাকিয়া দূর হইতে বিপদের সমাগম অনুভব করেন। অসীম বলে তাহা পর্য্যুদস্ত করিয়া আত্মীয়কে রক্ষা করেন। আসক্তি চক্ষের জ্যোতিঃ অপহরণ করে, হাতের বল কমাইয়া দেয়। আত্মীয়কে বুকে পিঠে হাতে তুলিয়া যুদ্ধ করিবার ইহার সামর্থ্য, সুবিধা কিছুই থাকে না। সে সকলকে বুকে চড়াইয়া, কাদার উপরে গড়াইতে থাকে। এইরূপে মনুষ্য জীবন অতীত হয়।

নিরাসক্ত অনুরাগী সংসারের উপরে, স্বর্গের দুয়ারে দেববলে বলবান। ইন্দ্রিয় সীমার অতীত, ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বব্যাধি হরণক্ষম মহাপুরুষ। মাধ্যাকর্ষ। অতিক্রম করিলে উপরে উঠা যায়, নীচেও নামিবার ক্ষমতা থাকে।

হাসি কান্না জীবনের বৈচিত্র্য-মূল। হাসি কান্না আসক্তি হেতু। নিরাসক্ত, এই বৈচিত্র্যময়ী কুয়াসার বাহিরে, নিরনুরাগ—জীবন্মৃত, অনাসক্ত অনুরাগ মোহের অতীত, শক্তির মূল, মোক্ষের নিদান।

জীবন অতি ক্ষুদ্র। পৃথিবী পঙ্কে পূর্ণ। পৃথিবীর পাখী যতই উড়ুক না কেন, আকাশের উপরে উঠিতে পারে না। বিশ্রা-

মের জন্য, খাইয়া বাঁচিবার জন্য আবার নীচে নামিয়া আসিতে হয়। স্নেহ, প্রীতি, ভক্তি কলঙ্কিত। যাহাকে ভালবাসে, তাহার মঙ্গলের জন্য নিজের স্বার্থ ত্যাগ করেনা। কে কবে বলিয়াছে, আমি ইহাকে ভাল বাসি, এ আমাকে ভালবাসে, কিন্তু ইহার মঙ্গল অপরকে ভালবাসিলে, তারই দিকে ইহাকে ঘুরাইয়া দি।

প্রণয়িনী আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতেছে, তুমি আমাকে ছাড়িওনা। কে তাহাকে বুঝাইয়া অন্যের হাতে দিতে পারিয়াছে? স্বার্থ স্বার্থ পৃথিবীর ভিত্তি গরলে গঠিত। ধন জন মান অকিঞ্চিৎকর, আপাত মনোরমে সকলই মুগ্ধ। মাতাল ঘুরিতেছে, অসীম সমুদ্রের একটী বুদবুদে মানুষ প্রতারিত। আশা ভরসা, সুখ সম্পদ আপাত মনোহারী যে ছাড়াইতে পারিয়াছে, সেই অমৃতের অধিকারী হইয়াছে। সেই এই সকল অধিকার করিয়াছে, যে হৃদয়কে বিসর্জ্জন দিতে পারিয়াছে। যে হৃদয় বিসর্জ্জন দিয়াছে, সেই হৃদয়বান। আসক্তি—অক্ষতা কুমারী জীবত্রাতার জন্মদায়িনী। অতি অপূর্ব্ব কল্পনা, অনাবিল সত্য, অন্ধকারে উষার জন্ম, মেঘে তড়িতের অভ্যুদয়। আসক্তি অক্ষত অনুরাগ-বঞ্চিত জ্ঞান, এইত প্রেম।

এই প্রেম তোমাকে দিতে চাহি, কিন্তু পাবি কৈ? মাধ্যাকর্ষণের টানে আমার প্রেম ভূতলে পড়িয়া ধূলায় গড়াইয়া কলঙ্কিত হইয়াছে। তাহা তোমাকে কি বলিয়া দিব? আমি শিষ্য হইয়া তোমার চরণতলে বসিলাম। আমাকে শাসিত কর; তোমার উপযোগী করিয়া লও। পূজা করিতে আমার জন্ম, ভালবাসিতে নহে।

মানে লজ্জা, স্নেহে ভয়, ভাবে দুঃখ। পুত্র কন্যার জন্য লোকে অম্বরত্ব পরিহার করে। মৃত্যুর দাসত্ব স্বীকার করে। গুরুরূপে তোমার ক্ষমতা অন্যকে হাসাইতে শিষ্যরূপে প্রার্থী তুমি অন্যের হাসি দেখিতে।

যখন ছেলেটী পাইয়াছিলাম, বুকে তুলিয়া হাসিয়াছিলাম, যাঁহার ছেলে তাঁহাকে ফিরাইতে কাঁদিলাম কেন?

আসক্তি মনুষ্যকে স্বার্থ-পরায়ণ করে। ধন্য সে, যে সংসারে জড়ায় নাই। তাহার অটুট রাজত্ব। জ্ঞান ও অনুরাগ, উভয়কে ধূলী কুয়াসার ঊর্দ্ধে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

জন্মভূমি। *

'বঙ্গবাসীর বঙ্গপ্রস্থ মুদ্রাযন্ত্র হইতে নিত্য নূতন বঙ্গরাজি প্রসূত হইতেছে। "বঙ্গবাসী" স্বয়ং সাহিত্য-সংসারে ক্ষুদ্র দেহ অবতীর্ণ হইয়া কাল সহকারে প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছে এবং তৎসঙ্গে 'দৈনিক' ও 'হিন্দী বঙ্গবাসী'র উৎপত্তি দ্বারা সাহিত্যের সমুন্নতি সাধন করিয়াছে। তদ্ভিন্ন রামায়ণ, মহাভারত, বিংশতি স্মৃতিসংহিতা,

* মাসিক পত্র। প্রথম ভাগ—প্রথম সংখ্যা।

অষ্টাদশ মহাপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র-পুরাণাদির সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করিয়া সংস্কৃত ও বঙ্গ সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছে এবং কালাচাঁদ, মডেল ভগিনী প্রভৃতি উপন্যাসাদির প্রচার দ্বারা সুকুমার সাহিত্য সেবী পাঠকগণেরও পাঠলিপ্সা অনেক পরিমাণে চরিতার্থ করিয়াছে। প্রত্যুত 'বঙ্গবাসী'র অধ্যক্ষগণ নানাবিধ উপায়ে বঙ্গ সাহিত্যের পরিচর্য্যা করার নিমিত্ত তাঁহারা বঙ্গবাসী মাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

'বঙ্গবাসী'র সকলই ছিল—অভাবের মধ্যে, কেবল মাসিক পত্রিকা। আজি "জন্মভূমি"র অবতারণা দ্বারা তাহার সে অভাবও তিরোহিত হইল। আমরা অনেক সময় মনে মনে ভাবিয়াছি, "বঙ্গবাসী'র সাময়িক পত্র বিভাগে সাপ্তাহিক, দৈনিক, অধিক কি—ভাষান্তরিক ভাও দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু উহার মাসিক মূর্ত্তি প্রকটিত হয় না কেন? আমরা এখন বুঝিলাম, উহার অধ্যক্ষগণের অন্তরে 'মাসিক পত্র প্রকাশের কল্পনা' ও জাগরূক ছিল, কেবল যথোপযোগী উদ্যোগ অভাবে "সে কল্পনা কার্য্যে পরিণত' হয় নাই। এত দিনে তাঁহাদিগের "উদ্যোগ শেষ হইল"—বঙ্গভূমে "জন্মভূমি"র জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। কি কারণে বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, নবজীবন, প্রচার, প্রভৃতি পত্রের অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছে,—কি কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পত্র সকলের উত্থানের সঙ্গেই পতন হইয়াছে ক্রন্দনের সঙ্গেই হাহাকার উঠিয়াছে কি উপায়ে, কিরূপ উদ্যোগে, কি কি গুণ থাকিলে, মাসিক পত্র যথানিয়মে চালান যায়—এই সকল মহাতথ্য সবিশেষ জানিয়া তদুপযোগী মহান্ উদ্যোগ করা সত্ত্বেও 'জন্মভূমির" অকাল-বিলয় ঘটিবে কি না—সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতাই বলিতে পারেন। তবে এরূপ অবস্থায়, বিলয় ঘটিলেও, "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ" বলিয়া উহার অধ্যক্ষগণ মনকে প্রবোধ দিতে পারিবেন। যাহাই হউক, আমাদিগের জন্মভূমির এই অসাড় নির্জ্জীব অবস্থায়—বঙ্গসন্তানের বিকৃতমস্তিষ্কতা প্রযুক্ত, বঙ্গভাষার প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধার অবস্থায় "বঙ্গবাসী"র উদ্যোগে বঙ্গভূমে এই 'জন্মভূমি'র জন্ম বড়ই আনন্দকর। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, উহা দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া জন্মভূমির উন্নতিকল্পে ও মাতৃভাষার মর্য্যাদা রক্ষায় ব্যাপৃত থাকুক।

আমরা 'জন্মভূমি'র দীর্ঘজীবন প্রয়াসী বলিয়া উহার 'সূচনা' হইতেই দুই এক কথার সমালোচনা করিব।

'বঙ্গবাসী" পত্রিকা বঙ্গবাসী মাত্রেরই আদরের পদার্থ, বাস্তবিক উহা লোকশিক্ষা বিস্তারে বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইয়াছে, সংবাদ সমাচার বহন পক্ষে 'সুলভ' প্রথম প্রবর্ত্তক হইলেও, 'বঙ্গবাসী'ই তৎসম্বন্ধে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, উহার সহযোগী ও পদানুসরণকারী নানা পত্রের 'পতন ও হাহাকারে'র পর 'সঞ্জীবনী' ও সময়' টিকিয়া গেলেও এবং লোকশিক্ষা সাধন পক্ষে ইহারাও যথেষ্ট পরিমাণে সহায়তা করিলেও, 'বঙ্গবাসী'কেই এ কার্য্যের পথপ্রদর্শক বলিতে হইবে। কিন্তু কালক্রমে 'বঙ্গবাসী'র প্রতি লোকের ক্রমশঃ শ্রদ্ধা কমিতেছে, 'বঙ্গবাসী'র আত্মম্ভরিতাই ইহার একমাত্র কারণ। আমরা প্রথমাবধিই 'বঙ্গবাসীর'র পক্ষপাতী, উহার যুক্তি তর্কের সঙ্গেও আমাদিগের অধিকাংশ স্থলে ঐক্য

আছে, কিন্তু উহার ইদানীং ভাব আমাদিগেরও কিঞ্চিৎ অরুচিকর বোধ হয়। সংসারে সকলের ঐকমত্য একেবারে অসম্ভব—উহা কখন হয় নাই, কখন হইবে এমনও বোধ হয় না। অতএব 'বঙ্গবাসী'র সকল মতের সঙ্গেই যে সকলের মত মিলিবে, ইহা মনে স্থান দেওয়াই ভ্রান্তি, আর 'বঙ্গবাসী'র সকল মতই যে অভ্রান্ত এবং তদ্ব্যতীত সমস্ত মতই ভ্রান্ত,—ইহা মনে করা অসাধারণ আত্মম্ভরিতার পরিচয়,—ব্যাস বুদ্ধ পতঞ্জলি, মনু পরাশর-যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষীগণও যে কখন এরূপ মনে স্থান দিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। কোন কোন বিষয়ে "বঙ্গবাসী"র সমীচীন মত ও উহার বর্ণনা (tone) গুণে লোকের কর্ণশূল হইয়া উঠে। লোকশিক্ষা যাহার ব্রত, কটুভাষী হওয়া তাহার পক্ষে কখনও কর্ত্তব্য নহে। মিষ্ট উপদেশে যে উপকার সংসাধিত হয়, শ্লেষময় ব্যঙ্গোক্তি বা ঘৃণাব্যঞ্জক টীট্‌কারিতে তাহার শতাংশের একাংশ ফলও জন্মে না, বরং তাহাতে শ্রোতার গাত্রদাহ বৰ্দ্ধিত করে,—শত্রুতার পথ প্রসারিত করে। যুক্তিমার্গানুসারে অনতিরঞ্জিত ভাষায় যে সত্য প্রকাশিত হয়, অতিরঞ্জনের দোষে, সে সত্য প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক, মৌলিক যুক্তি-জালও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই দোষে 'বঙ্গবাসী'র উপদেশ কাহারও কর্ণে বড় বাজিতেছে না,—'বঙ্গবাসী'-স্তম্ভেই বিলীন হইয়া যাইতেছে। এই কংগ্রেসের কথা,—যে সকল কারণে কংগ্রেসের সহিত 'বঙ্গবাসী'র সহানুভূতি নাই, অনেকেই সে সকল কারণ উপলব্ধি করিয়া থাকে এবং তৎসম্বন্ধে 'বঙ্গবাসী'র সহিত অনেকের মতেরও মিল আছে। কিন্তু দুইটা প্রকৃত কথার সঙ্গে 'বঙ্গবাসী' ছইশ'টা শ্লেষময় বাগ্‌জাল বিস্তার করেন, সুতরাং কংগ্রেস-পক্ষীয়দিগের মত পরিবর্তন করা দূরে থাকুক, তাহাতে 'বঙ্গবাসী'-পক্ষীয়দিগেরও বিরক্তি জন্মে। এই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের কথা,—নিতান্ত স্বেচ্ছাচারের কাল পড়িলেও, আজি পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের প্রতি অনেক হিন্দুর যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা আছে,—কিন্তু সে কেবল যথার্থ ব্রাহ্মণের প্রতিই আছে, সূত্রগুচ্ছধারী ব্রাহ্মণপদবীধারী ব্যক্তিমাত্রের প্রতি নহে। 'বঙ্গবাসী' এ শ্রেণীর হিন্দুকেও অহিন্দু বলেন, হয় ত তাঁহাকে 'বাবু' উপাধিতে বিভূষিত করিয়া বিষম টীট্‌কারি প্রকাশ করেন। 'বঙ্গবাসী'র এ কিরূপ যুক্তি, আমরা ভাবিয়া পাই না। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি আর কশাই বালী-প্রতিষ্ঠাতা পতিতপাবন শিরোমণি যদি উভয়েই ব্রাহ্মণ বলিয়া সমান ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র হ'ন, তবে সেরূপ হিন্দুধর্মে কাহার আস্থা জন্মিবে? 'বঙ্গবাসী' যে মহাভারতের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে উপদেশ দেন, সেই অমূল্য গ্রন্থই বলিতেছে,—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য না করিল, সে শূদ্রাপেক্ষাও অধম, আর যে শূদ্র শমদমাদি গুণ সংযুক্ত, সেও ব্রাহ্মণ পদবাচ্য। * ইহার পরেও

---

* "যে ব্রাহ্মণ দাম্ভিক ও বহুল দুরিতাচারী হইয়া পতনীয় অসৎকর্ম্মে বর্ত্তমান থাকে, সে শূদ্র হয়, এবং যে শূদ্র ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সত্য ও ধর্ম্মবিষয়ে সতত উদ্যমান্বিত, তাহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করি. কেননা ব্রাহ্মণ হইবার কারণ একমাত্র সচ্চরিত্র।"

—বঙ্গবাসীর শাস্ত্রবিভাগ প্রকাশিত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ, ৪৮৮ পৃঃ।

অপিচ অন্যত্র। "সত্য, দান, অক্রোধ, অনৃশংস্য, অহিংসা ও দয়া * * * যে শূদ্রে * * থাকে এবং যে ব্রাহ্মণে তাহা না থাকে, সে শূদ্র শূদ্র নয়

ব্রাহ্মণ-পদবী-ধারী মাত্রকেই ব্রাহ্মণোচিত ভক্তি প্রকাশ করিতে বসিলে কি সেই আর্য্যগ্রন্থেরই অবমাননা করা হয় না? বেদ পুরাণ, স্মৃতিশ্রুতি প্রভৃতি দুরূহ বিষয় সকল ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের আলোচ্য নহে, বেশ কথা, কিন্তু ঐ পতিতপাবন শিরোমণির আলোচনায় অধিকার আছে, আর সংস্কৃত সাহিত্যবিৎ সংযতচিত্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তাহাতে অধিকার নাই—ইহাই কি শাস্ত্রের বিধান?—এইরূপ নানা কারণে 'বঙ্গবাসী'র কথা অলৌকিক ও অরুচিকর বোধ হয়, এবং সেইজন্যই উহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ক্রমশঃ কমিতেছে।

আমরা 'জন্মভূমি'র আলোচনা করিতে বসিয়া 'বঙ্গবাসী'র অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। তাহার এক কারণ আছে,—'জন্মভূমি' "বঙ্গবাসীর অধ্যক্ষগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত" এবং 'সূচনা' হইতেই যেরূপ দেখা যাইতেছে, 'বঙ্গবাসী'র সহিত এক সুরে সংমিলিত। "কাণ টানিলেই মাথা আসে",—'বঙ্গবাসী'র দোষ গুণের কথা বলিলেই, 'জন্মভূমি'রও দোষ গুণ বুঝা যাইবে, এই বিবেচনায় আমরা 'বঙ্গবাসী' সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম। পূর্ব্বকথিত আত্মম্ভরিতার পরিচয় 'জন্মভূমি'র 'সূচনা'তেই দেদীপ্যমান,—জানি না, সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে উহা কতদূর বর্দ্ধিত হইবে। আপন মুখে আপন ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া পুরুষার্থ নহে, কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া যাইলে সহজেই তাহা সাধারণের হৃদয়াকর্ষণ করে এবং সেই গুণ বা ক্ষমতার জন্য লোকেই সাধুবাদ করিয়া থাকে। জগতের অক্ষয় কবি কালিদাসও রবিবংশ-স্রোতে গা ঢালিয়া, "তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্" বলিয়া, আপনার হীন বলের জন্য বিনয় প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর 'জন্মভূমি'র জন্মদাতাগণ আসরে অবতীর্ণ হইয়াই, বঙ্গদর্শন, বান্ধব, নবজীবন, প্রচার যাহা করিতে পারেন নাই, তাহাই করিবেন বলিয়া আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা নিতান্তই শিষ্টাচার বিরুদ্ধ।

তার পর ঘৃণা ও শ্লেষ।—'নব্যভারত,' ও 'ভারতী'র প্রতি বিচক্ষণ একটু ভ্রুকুটী নিক্ষেপ হইয়াছে। উক্ত পত্রিকাদ্বয়, যথাক্রমে, 'ব্রাহ্মদলের' ও 'ব্রাহ্ম পরিবারের' পত্র বলিয়া তাহাদিগের নিয়মিত প্রকাশরূপ সদ্গুণও 'জন্মভূমি'র বিবেচনায় "ধর্ত্তব্যই নহে।" কলিযুগের শেষে হিন্দুধর্ম্মের এতই রূপান্তর হইয়াছে, এতদিন আমাদিগের সে জ্ঞান ছিল না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, অধিক কি - কলির প্রারম্ভেও, হিন্দুরা পরম শত্রুরও গুণ ব্যাখ্যা করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না, আর আজ 'জন্মভূমি' সেই "হিন্দুর * * শিক্ষা সম্পূর্ণ" করিতে অবতীর্ণ হইয়া, ধর্ম্ম বিশ্বাসের কিঞ্চিৎ পার্থক্য হেতু, এক জনের প্রকৃত গুণ প্রকাশেও সঙ্কুচিত। তদ্ভিন্ন উক্ত বাক্যে সত্যেরও কিঞ্চিৎ অপলাপ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, উক্ত পত্রিকাদ্বয় 'ব্রাহ্মদলের' ও 'ব্রাহ্মপরিবারের' পত্র নহে; উহাদিগের স্বত্বাধিকারীগণ এবং কোন কোন লেখক, ন্যূনাধিক ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, উহারা

এবং সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। * * * অপৌরুষেয় সত্য বেদবাক্য চতুর্বর্ণেরই হিতকর। * * * পুরুষ যে পর্য্যন্ত বেদে সংযুক্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত শূদ্র সম থাকে। * * * যে পুরুষেতে সুসংস্কৃত চরিত্র দৃষ্ট হয়, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানি পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি।" ঐ ঐ ৪৭৮ পৃষ্ঠা।

নিরবচ্ছিন্ন 'ব্রাহ্মদলের' বা 'ব্রাহ্ম পরিবারের' মুখপাত্র নহে। লেখকদিগের মধ্যে আমরা অনেককে জানি—তাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী নহেন, এবং অনেক পত্রে ব্রাহ্ম মত-বিরোধী প্রবন্ধ আলোচনা ও প্রকাশিত হইতে দেখিয়াছি, সেরূপ [illegible] পত্রে নিরপেক্ষ [illegible] সকল সম্প্রদায়ের লেখকগণের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং 'প্রবন্ধ [illegible] মতামতের জন্য লেখকগণই দায়ী।' আর প্রকৃত পক্ষে উহারা 'ব্রাহ্মদলের' ও 'ব্রাহ্ম পরিবারের' পত্র হইলেই বা ক্ষতি কি?—ধর্ম বিশ্বাস মনুষ্য মাত্রের সমান নহে,—হইলে, নাস্তিক, আস্তিক, হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, এবং এইরূপে এক এক ধর্মের মধ্যে শত শত সম্প্রদায়ভেদ থাকিত না। সকলে এক উপায়ে ভগবানকে পাইবে না জানিয়াই করুণাময় সর্ব্বান্তর্যামী স্বয়ং অভয় দান করিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।"

উক্ত পত্রিকা [illegible] 'বেদব্যাসে'র ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্ম প্রচার [illegible] উহাতে হিন্দু মত-বিরোধী কোন [illegible] থাকিবে, আমি হিন্দু—তাহা পড়িব না বা তাহার উপদেশ চলিব না। কিন্তু তাই বলিয়া যে, তাহাতে প্রকাশিত দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য বা অপর সাধারণ হিতকর প্রবন্ধ মাত্রই পাঠ্য বা গ্রহণীয় নহে ইহা কিরূপ যুক্তি? যদি ব্রাহ্মদলের পত্র বলিয়া তাহা গৃহীত না হয়, [illegible] হিন্দুদলের পত্র বলিয়া 'জন্মভূমি'ও [illegible] গৃহীত না হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে, জন্মভূমির লোক শিক্ষাব্রত সম্পূর্ণ হইবে কিসে?—তাহার পক্ষান্তরে গ্রাহকই বা জুটিবে কিরূপে?—আর যদি চিন্তাশীল* পাঠকগণ কর্ত্তৃক উহা পঠিত না হইয়া কেবল মুদীর দোকানেই শোভা পায়, তবে 'জন্মভূমি'র প্রকৃত মর্য্যাদা না রক্ষিত হইবে কিরূপে?—আর যদি হিন্দু ভিন্ন অপরের রচিত প্রবন্ধ মাত্রই অপাঠ্য হয়, তবে 'জন্মভূমি, হিন্দু-মাহাত্ম্য গাহিতে না গাহিতেই হিন্দুমত-বিরোধী, বিলাত প্রত্যাগত, "ভারতেশ্বরীর সহিত পান-ভোজনে পরিতৃপ্ত Mr T. N. Mukherjiর প্রবন্ধ সাদরে আপন অঙ্কে স্থান দিলেন কি বলিয়া?

আর এক কথা। ধীর ও প্রশান্ত ভাবে সংশিক্ষা দেওয়াই সাধু লোকের কার্য্য। সৌম্য মূর্ত্তিই হিন্দুর প্রধান লক্ষণ। সর্ব্ব-জীবে নিষ্কাম ভাবে দয়া প্রকাশই হিন্দুর একমাত্র [illegible]। এ সকল উপদেশ আমরা সময়ে সময়ে বঙ্গবাসী হইতেই শিক্ষা করিয়াছি। এখন মুখে এক উপদেশ, কার্য্যে তাহার বিসদৃশ ভাব করা সদ্বিবেচনার কার্য্য নহে। ব্রাহ্ম মতিভ্রান্ত হইয়া পথভ্রষ্ট হইয়া থাকে, প্রীতিপূর্ণ সদুপদেশ দ্বারা তাহাকে সংপথে আনিতে চেষ্টা করাই পরম সদ্ধর্ম্মের কার্য্য। যদি তাহাকে আদৌ না ধরিলে, তাহার প্রতি আদৌ চাহিয়া না দেখিলে, তবে সেত অসৎ হইতে অসত্তর পথে ধাবমান হইবে। ব্রাহ্ম নিজ পত্রিকায়, বা নিজ প্রবন্ধে,

---

* কংগ্রেস সভায় শ্রীযুক্ত ঘোষজ মহাশয় কর্ত্তৃক যে অর্থে 'চিন্তাশীল' কথা ব্যবহৃত হইয়াছিল, আমরা সে অর্থে উহা ব্যবহার করি নাই, 'জন্মভূমি'স্থ 'বেদান্ত, দর্শন' ব্যাখ্যাকার তদীয় প্রবন্ধের উপসংহারে উহা যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, আমরাও সেই অর্থে ব্যবহার করিলাম।

মিথ্যা যুক্তি, অসার তত্ত্ব বা অধর্ম্মকর প্রস্তাব উত্থাপিত করে, তাহা দেখিয়া, তাহা পড়িয়া তাহার সরল প্রতিবাদ কর, প্রকৃত যুক্তি, সারতত্ত্ব, প্রকৃত ধর্ম্মোদ্দীপক ভাব তাহার সম্মুখে ধর—তবে তাহার মোহ ঘুচিবে, হিন্দুধর্ম্মের অবিনশ্বর বিজয় নিশান উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর ভাবে উড্ডীয়মান হইবে। যদি সে প্রবন্ধ চক্ষেই না দেখিলে, তবে তাহার অসারতা বুঝিবে কিরূপে?—মতিভ্রান্তের সদ্গতি সম্পাদনই বা করিবে কিরূপে? যে হিন্দু সে ত হিন্দু আছেই, তাহার জন্য কষ্ট কেন? যে হিন্দু ছিল, এখন কালবিপর্য্যয়ে মতিভ্রান্ত হইয়া অহিন্দু হইয়াছে, তাহাকে পুনরায় হিন্দু করিতে পারিলেই ত হিন্দুর কার্য্য হইবে,—হিন্দুর মাহাত্ম্য রক্ষিত হইবে। আমরা তাই বলি, অসূয়া আত্মম্ভরিতা ত্যাগ করিয়া, শ্লেষ ব্যঙ্গ পরিহার করিয়া অভিমান মাৎসর্য্য ভুলিয়া গিয়া, ধীর ভাবে আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হও, মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা বাক্যে আপন ক্রোড়ে সকলকে স্থান দাও, আর্য্যঋষিগণের কথিত সারতত্ত্ব সকল সরলহৃদয়ের অবিকৃত ভাবে সকলের নিকট উদ্ঘাটিত কর,—প্রকৃত জন্মভূমির কার্য্য হইবে,—স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া উহার প্রতি অধম সন্তানের শ্রদ্ধা জন্মিবে, নচেৎ অনেকেই দূর হইতে নমস্কার পূর্ব্বক "Dear, damn'd native land, good byo!" করিয়া বিদায় গ্রহণ করিবে। পাশ্চাত্য দার্শনিক হইলেও Horbert Spencer এর মতেই আজকাল নীতি শিক্ষা দেওয়া ভাল, নচেৎ প্রহার ও তিরস্কারের বলে বালক বিগড়াইয়া যায়, সংস্কৃত হয় না।

আমরা জন্মভূমির সুচনা লইয়াই অনেক কথা বলিলাম। উহার উদ্দেশ্য মহৎ—সন্দেহ নাই, এখন তাহা কার্য্যে পরিণত হইলেই পরম সুখী হইব। উহার অন্যান্য প্রবন্ধ সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

'হিন্দুরমণী'র প্রতি আমাদিগের প্রগাঢ় ভক্তি আছে, প্রকৃত হিন্দুরমণীর সতীত্ব গুণেই আমরা আজ পর্য্যন্ত হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে সক্ষম হইতেছি। আর্য্যশাস্ত্রে "স্ত্রী জাতির ও ভার্য্যার মর্য্যাদা" যথেষ্ট পরিমাণে বিহিত থাকিলেও, কি জন্য বর্ত্তমান অবস্থায়, "বিদ্যাশিক্ষা ও স্বাধীনতা হইতে স্ত্রীজাতিকে অন্তরে" রাখা হয়,—এ কথা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া দিলে আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের সম্পূর্ণতা বুঝিতে পারিব। "বাল্যবিবাহ" প্রসঙ্গে বঙ্গবাসীর স্তম্ভে এ কথার কতক আলোচনা হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু, যত দূর স্মরণ হয়, তাহাতে স্ত্রীজাতিকে বিদ্যাশিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখার কারণ ব্যাখ্যাত হয় নাই। আর্য্য শাস্ত্রেরই বিধান—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ"

অথচ, বর্ত্তমান (প্রাচীন?) হিন্দুরা স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী কেন, এ শিক্ষা বর্ত্তমান সমাজের পক্ষে কিরূপ ক্ষতিকর, এ সকল বিষয় আমরা "জন্মভূমি"র নিকট শিক্ষাপ্রার্থী। স্ত্রী পুরুষের আশ্রয়—আশ্রিত ভাবে আমাদিগের মতদ্বৈধ নাই, ইদানীং সাম্যবাদিদিগের ন্যায় আমরা স্ত্রীজাতিকে সকল বিষয়ে সম্যক্ স্বাধীনতা দিতেও প্রস্তুত নহি। তবে সামঞ্জস্যের সহিত সংস্কার

সাধন 'করিতে দোষ কি? * সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায়' অবরোধ ও অবগুণ্ঠন প্রথার প্রয়োজন কি? আমরা যতদূর জানি, ভারতের প্রাচীন হিন্দু রাজত্বকালে এ সকল প্রথা পূর্ণমাত্রায় ছিল না, মুসলমান শাসন কালে তদানীন্তন পাশব প্রকৃতির লোকদিগের উৎপীড়নে এ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এখন সেরূপ উৎপীড়নের আশঙ্কা নাই, তথাপি ঐ প্রথা সমাজে অপ্রতিহত প্রভাবে কার্য্য করিতেছে কেন? একজন রসপ্রবীণ কবি বলিয়াছেন—

"ঘোমটা টানা, যায় না জানা,
ভিতরে কেমন কাজ,
* * * *
মনটি ভাল, হলেই হ'ল
কাজ কি অত লাজ।"*

কবির এই সমাজ-সংস্কার চিন্তায় আমরা পরম মুগ্ধ। এইরূপ ও অন্যান্য সামান্য বিষয়ে স্ত্রীজাতিকে, সম্ভবমত, স্বাধীনতা দিলে ক্ষতি কি—জন্মভূমির নিকট আমরা এ সকল তথ্য শিখিতে চাই।

'মহাবিদ্যাসাধন' সাধনপ্রিয় হিন্দুর জীবনের অন্যতম লক্ষ্য, "ভক্তের আরাধ্য বস্তু এবং কাব্যপ্রিয় ব্যক্তির প্রিয়তম পদার্থ"—তৎপক্ষে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কবিবর রসিকচন্দ্র প্রবীণ বয়সে প্রগাঢ় ভক্তিভাব বিমিশ্রিত রসে জন্মভূমির পাঠকমাত্রকে সেই 'মহাবিদ্যাসাধন' শিক্ষা দিয়া প্রকৃত ভক্তের কার্য্য করিতেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান রুচির বাজারে এ সাধন বঙ্গীয় পাঠকের কতদূর চিত্তাকর্ষক হইবে—বলিতে পারি না। আজ কাল যখন সহজেই লোকে 'ন্যাংটা পা' ন্যাংটো পা, দেখিয়া শিহরিয়া উঠে, তখন "বিপরীত রতাতুরা দিগম্বরী" মহাবিদ্যাগণের কেবল দিগম্বর ভাব দেখাইলে, লোকের অরুচি ভিন্ন ভক্তি জন্মিবার অল্পই সম্ভাবনা। আজ কাল ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের কথা তুলিলেই লোকে বলিয়া বসে—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

এখন আর সে ধ্রুব প্রহ্লাদের ভক্তির কাল নাই; এখন যুক্তি, তর্ক দর্শন ভিন্ন লোকে কিছু বুঝিতে চাহে না, বিশ্বাস করিতে চাহে না, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও তাই এখন বৈজ্ঞানিক মতে 'ধর্ম্মব্যাখ্যা' করিতে বসিয়াছেন। আমরা তাই বলিতেছিলাম, দশ মহাবিদ্যার বাহ্যিক ভাব এখন সকল লোকের চিত্তাকর্ষক হইবে না,—কালী-তারা ভুবনেশ্বরী প্রভৃতি মহাবিদ্যাগণকে অশেষবিধ ভক্তিবাচক বিশেষণে বিশেষিত করিলেও এখন তাঁহারা সকলের ভক্তি উদ্দীপন করিতে পারিবেন না। এখন উঁহাদিগের আভ্যন্তরিক ও আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করা সমধিক সমীচীন বোধ হয়, কবি হেমচন্দ্র তাহা যথেষ্ট পরিমাণে প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহার দশমহাবিদ্যার পার্শ্বে 'কবিবর' রসিকচন্দ্রের দশমহাবিদ্যা কিরূপ আসন পাইবেন, বলিতে পারি না।

'তারাচাঁদ সর্দ্দার' এর উপাখ্যান বেশ উপদেশপ্রদ। আজকাল সন্তসন্তান যেরূপ হীনবল ও অকৃতজ্ঞ হইয়া দাঁড়াইতেছে,

---

* সংস্কার ও সামঞ্জস্য সম্বন্ধে আমাদিগের বারান্তরে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

* সাতনরী।—ছোট বৌ ১৯। ২১ পৃঃ।

তাহাতে তাবাচাঁদের সাহস ও বিক্রম এবং সর্ব্বোপরি অকৃত্রিম প্রভুপরায়ণতা বাস্তবিক শিক্ষার সামগ্রী। ইহার সঙ্গে ক্রমশঃ আমরা পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত সঙ্কলিত ভারতীয় "আর্য্যকীর্ত্তি" শুনিতে পাইলে সমধিক সুখী হইব। 'বঙ্গবাসী'র প্রথমাবস্থায় এইরূপ উপাখ্যান পাঠে আমরা পরম প্রীতিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম। তারাচাঁদ, মডেলভগিনী প্রভৃতি উপন্যাস-রচয়িতা বঙ্গসাহিত্য সংসারে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, বঙ্গভাষার উপর তাঁহার সম্পূর্ণ আধিপত্য এবং সমাজচিত্র অঙ্কনেও তিনি বিলক্ষণ পটু। তাঁহার প্রণীত 'রাধানাথ' উপন্যাসও উপন্যাস-পাঠকের বিশেষ তৃপ্তিকর হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার সকল উপন্যাসই যেমন এক ছাঁচে ঢালা — তাঁহার বর্ণনাচাতুর্য্যময় উপকথার স্রোত যেমন একই ভাবে প্রবাহিত—

"অবিশ্রাম-গতি নদী বাধা নাহি মানে।
বিরাম বিরতি কভু নাহি জানে॥"

মডেলভগিনী, কালাচাঁদ, চিনিবাস, বাস্তবীচরিত—সকলগুলিই যেমন একই ভাব, একই ভাষা, একই ছন্দ, একই ছাঁচ। আধুনিকার কল্পিত রূপসৃষ্টি থাকিলেও, সব গুলি যেমন একই উপাদানে সংগঠিত। উহাদিগের মধ্যে যে কোন একখানি গ্রন্থ পড়িলেই সকলগুলি পাঠ করার ফল পাওয়া যায়। সংক্ষেপতঃ, ইংরাজি সাহিত্যে Reynolds উপন্যাসকারের যে আসন লাভ করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে "রাধানাথ"-রচয়িতাও সেই আসনের যোগ্য। আমরা জন্মভূমির অঙ্গে তাঁহার হস্তপ্রসূত দুই এক খান Ivanhoe, Kenilworth বা Adam Bede এর ন্যায় নবন্যাস দেখিতে ইচ্ছা করি। তিনি একজন সুরসিক, সন্দেহ নাই, কিন্তু অনেকস্থলে 'কবিবর' রাজকৃষ্ণের 'প্রহ্লাদ-চরিত্র'-গত রসাভাসের ন্যায় রস গড়াইয়া যায়। পাশ্চাত্য রসিকেরা বলেন —

Brevity is the soul of wit"

কথাটা বোধ করি, আমাদিগের প্রাচ্য রসিকেরাও বড় অগ্রাহ্য করিতে পারেন না, 'রাধানাথে' কিন্তু brevity অপেক্ষা Tautology ই অধিক—এক "দারিদ্র্যদলনী দেবী"র নামপ্রসঙ্গেই চূড়ান্ত নিদর্শন লক্ষিত হইবে।

'বেদান্ত-দর্শন' আমাদিগের জন্মভূমির উপাদেয় সৃষ্টি। "জীব ব্রহ্মের ঐক্য" প্রতিপাদন, "নাম রূপাদি ও শমদমাদির প্রয়োজনীয়তা" নির্দ্ধারণ, 'জীবন্মুক্ত ও নির্ব্বাণ মুক্তের লক্ষণ' নির্ণয়, "পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতি-সমন্বয় প্রভৃতি 'গভীর বিষয়' সকল জ্ঞানলিপ্সুমাত্রেরই জ্ঞাতব্য। আমাদিগের ঈপ্সিত সকল তত্ত্ব যথা "ধারণা করিবার উপযুক্ত শক্তি না থাকিলেও" বাক্যাড়ম্বর স্বার দ্বারা তাহা উদ্ধার করিবার যেরূপ প্রয়াস করিতেছেন, আমরাও যথাশক্তি তাহা বুঝিতে ও বুঝাইবার অন্যতম লক্ষিত চেষ্টা করিব। আমরা সংস্কারের বশে, আমাদিগের সকল বাক্যই পাণ্ডিত্যমানী, এবং অবস্থা, সংসারের সাহচর্য্য দিতেছি। 'বিড়ম্বনা' ভোগ করাও অবাঞ্ছনীয় নহে। এই বেদান্তদর্শনই নবপ্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের অস্থি মজ্জা প্রাণ, অন্ততঃ ব্রহ্মবাদীরা ইহাই বলিয়া থাকেন। "পরস্পর-বিরুদ্ধ শ্রুতি-সমন্বয়"ই যখন সেই বেদান্তদর্শনের অন্যতম প্রতিপাদ্য, তখন 'জন্মভূমিস্থ' 'বেদান্তদর্শন' দ্বারা আধুনিক হিন্দু ও ব্রাহ্মদলের পরস্পর বিরুদ্ধ মত-সমন্বয় দেখিতে পাইলে আমরা পরম সুখী

হইব,-'জন্মভূমি'রও মহদুদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে।

'পঞ্চপাল' ও 'ভাবতে সুবর্ণ'—উভয়ই বঙ্গের বর্ত্তমান সাময়িক প্রসঙ্গ এবং তত্তৎ বিষয়ের বিশেষ তত্ত্বজ্ঞদিগেব দ্বারা তাহা সুচারুরূপে আলোচিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে কোন কথা উত্থাপন কবা আমাদিগের পক্ষে ধৃষ্টতা।

পরিশেষে, পুনরায় বলিতেছি, 'জন্মভূমি'ব যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়াই আমরা আপন জ্ঞান ও বুদ্ধিমতে এবং কর্ত্তব্যানুবোধে উহার দোষ-গুণের আলোচনা করিলাম। কোন কথা অপ্রীতিকব বোধ হইলে, উহার অনুষ্ঠাতাগণ আমাদিগের প্রতি যেন কোন-রূপে বিরূপ না হয়েন, ইহাই আমাদিগের বিনম্র প্রার্থনা।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

ভক্তিকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতেব পর।)

৩০৮। মীন যেমন তড়াগাদিব জলে জীবিত থাকে, মানবাত্মা সেইরূপ ব্রহ্ম-সত্বা-সাগরেব সলিলে জীবিত থাকে। মীনেব পক্ষে জল যেমন জীবন, আমাদিগেব নিত্য প্রসাব পক্ষে সেইরূপ ব্রহ্মানন্দ-সাগরে প্রবাহ জীবন। আমরা সেই আনন্দ সাগরে যতই মগ্ন হই, ততই স্ফূর্ত্তি, বল, বীর্য্য ও পবিত্রতা লাভ কবি।

৩০৯। সর্ব্বদা নিজ মঙ্গলেব জন্য আপনার ছিদ্রান্বেষণ কর, কখন পরছিদ্রান্বেষী হইওনা। যখন কাহার বাক্য, বা ব্যবহারে তোমাব মনঃকষ্ট হইবে, তখন দেখিও, তুমি নিজে কতদূর তাহার কারণ। যদি তোমার বিবেক বলে, তুমি নির্দ্দোষী, তবে তুমি প্রসন্ন চিত্তে তোমার কষ্টদানকাবী ব্যক্তির দোষ ক্ষালন্ জন্য মঙ্গলময়ের মঙ্গল পূর্ণ চরণে প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইবে, তাহার প্রতি ক্রোধ দৃষ্টিপাত করিলে তোমাব জীবন পাপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইবে।

৩১০। সকল কার্য্য কর্ত্তব্য জ্ঞানা-নুবোধে নিষ্কাম মনে মঙ্গলময়ের মঙ্গলপূর্ণ কৃপাব উপব নির্ভর করিয়া সম্পাদন কবিবে। সৎক্রিয়াব ফল প্রত্যাশা করিলে স্বার্থপরতা দোষে দূষিত হইতে হইবে।

৩১১। ১১ ই মাঘোৎসব উপলক্ষে ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন হইতেছে। আনন্দেব স্রোত বহিতেছে। নহবৎ বাজিতেছে। মনে হইল, আত্মা পরমাত্মাব সহিত উদ্বাহ সূত্রে বদ্ধ হইবে। পতিপ্রাণা সতীব ন্যায় সে তাঁহাবই মঙ্গলপূর্ণ চরণাশ্রয়ে অবিচ্ছেদে নিত্যকাল বাস করিয়া তাঁহারই সেবা কবিবে, ও তাঁহাবই আনন্দ, অমৃত, শান্তি, মঙ্গল, পবিত্রতা ও শোভাদি কতই নিত্য সুখভোগ করিতে থাকিবে। ইহারি জন্য এত আনন্দোৎসব, ইহারি জন্য এত বাদ্য বাদন, এত নাম সঙ্কীর্ত্তন।

৩১২। কোন আত্মীয়ের মাতৃ আদ্য-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নিয়ম ভঙ্গদিনে ও তাহার পূর্ব্বে তাঁহার বাটীতে গমন করিয়া আমি তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

আজ আপনার জীবনের একটী বিশেষ দিন, এরূপ দিন আর আপনার হইবেনা। যাহার বিয়োগে এক মাসকাল অশুচি থাকিয়া শুচি হইবার এই শেষ দিনে তাঁহাকে মঙ্গলময়ী জগজ্জননী তাঁহার মঙ্গলপূর্ণ চরণে স্থান দান করিয়া আমার গৃহে অন্নপূর্ণারূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আজ তিনি আপনাদিগকে অন্নদান ও পরিবেষণ করিতেছেন। আজ তিনি আপনাদিগকে তাঁহার নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা এবং অমোঘ আশীর্ব্বাদ দান করিতেছেন। আজ আপনি নিজ পরিবারসহ পবিত্রতা ভোগ করুন। আপনাকে অন্ততঃ এক বৎসর কাল পবিত্র ভাবে চলিতে হইবে। আপনার সদ্ব্যবহার যেন আপনার প্রিয়া ভার্য্যা ও প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রদ্বয় অনুকরণ করিতে সমর্থ হয়েন। যে সৎপুত্র তাহার পিতৃ বা মাতৃ বিয়োগে এক বৎসরকাল শুদ্ধাচারে অতিবাহন করিতে পারেন, তিনি তাঁহার সেই দীর্ঘ ব্যাপী অভ্যাসের বলে তাঁহার অবশিষ্ট জীবনে হয়ত সেই পবিত্রতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। কি চমৎকার ঋষিদিগের এই বিধি। ইহা কেমন জ্ঞানগর্ভ ও মধুময় ফলোৎপাদক।

৩১৩। পাপ কখন পাপ দ্বারা বিনষ্ট হয় না। পুণ্যই পাপের বিনাশক। তুমি যখনই কাম ও ক্রোধ, ভোগাদি দ্বারা উত্তেজিত বা আক্রান্ত হইবে, সেই মুহূর্ত্তে অনন্যগতিচিত্ত পবিত্রস্বরূপের স্মরণাগত হইয়া তাঁহার নিকট নীরবে পুণ্যবলের জন্য প্রার্থনা করিবে। তাহার পর তোমার মনঃ প্রাণ প্রশান্ত হইলে, তুমি যথোচিত ব্যবহারে সমর্থ হইবে। তুমি কিছুদিন এই রূপে আপনাকে শাসন করিবার অভ্যাস করিলে, পুণ্যপথে পাদচারণা করিতে সমর্থ হইবে। তোমার সেই উন্নত ধর্ম্মজীবন হৃদয়ঙ্গম করিবে যে, পুণ্যই পাপের একমাত্র বিনাশক।

৩১৪। সত্যস্বরূপের যে সকল সত্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছে বা হইবে, তাহা অবিনশ্বর, আর মানবীয় ক্ষীণতা দোষে যে সকল তাঁহার ইচ্ছার বিরোধী অসত্য তাহাতে প্রবেশ করিয়াছে বা করিবে, তাহা নিশ্চয়ই নশ্বর। প্রত্যেক ব্রাহ্ম যেন এই নিত্য নিয়ম বিস্মৃত না হইয়া ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলোন্নতি সাধনে যত্নবান থাকেন।

৩১৫। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা মতে কোন একটী ঔষধের যতই সারভাগ গ্রহণ করা যায় (অর্থাৎ আটেনিউএসন (Attenuation) প্রক্রিয়া সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, তত সেই ঔষধের অসার ভাগ হইতে বিযুক্ত হইয়া তাহার সারাংশ প্রকাশিত হয়, ততই তাহার সূক্ষ্মতা ও বল বাড়িতে থাকে। সেইরূপ মানবাত্মা যতই ধর্ম্ম সাধনরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা বিমল হইতে থাকে, (অর্থাৎ তাহার পাপ, তাপ, শোক, সন্তাপ, কামনা, বাসনা, পাশবর্বৃত্তি, অভিমান, অহঙ্কার, আত্মাদর, অহংজ্ঞান, অজ্ঞানতা প্রভৃতি অসার ও স্থূলভাগ বিনষ্ট হয়, ততই সে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া নূতন হইতে নূতনতর বল বীর্য্য লাভ করিতে থাকে।

৩১৬। পিতা গো। পাপেতাপে সদা

আমি মরি জ্বলেপুড়ে। আমায় রাখ রাখ মা গো। তোমার অভয় ক্রোড়ে।

৩১৭। এই বঙ্গদেশে প্রত্যেক নূতন বৎসর আসিবার সময় তরুরাজী কেমন মনোহর নূতন বেশ ধারণ করিয়া প্রকৃতি-নাথের মহিমা প্রকাশ করিতে থাকে। তাহাদিগের পুরাতন জীর্ণ বেশ কালসাগরে পতিত হইয়া আপনাদিগের শোভার পুষ্টি সাধন করে। মানব! তুমি কেন ঐ বৃক্ষাদির পবিত্র অনুসরণ কর না? তোমার আত্মার পাপরূপ পুরাতন বেশ কালসাগরে নিক্ষেপ করিয়া তুমি পুণ্যরূপ নব বেশে শোভিত হইয়া নূতন বৎসরে প্রাণেশ্বরের পূজারম্ভ কর। পাদপাদির শিক্ষা অবহেলা করিও না।

৩১৮। সুচতুর বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাহাকে যে কিছু সদ্গুণ দেখিতে পান, তিনি তাহা লইয়া সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন। তিনি জানেন যে, একাধারে সকল গুণ থাকে না। তাই তিনি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে গুণের তারতম্য দেখিয়া যাহাতে প্রত্যাশিত গুণের অসদ্ভাব বা অভাব রহিয়াছে, তাহাকে তজ্জন্য অশ্রদ্ধা করেন না। তত্ত্ব তাহাদেরও অবজ্ঞা করেন না।

৩১৯। জীবনকে পবিত্র ও উন্নত করিবার জন্যই বিদ্যা, জ্ঞান ও ধর্ম্মচর্চ্চার প্রয়োজন। যে বিদ্যা, জ্ঞান বা ধর্ম্মালোচনায় ঐ আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ না হয়, তাহা বৃথা।

৩২০। একজন চিন্তাশীল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি অল্প পাঠ বা বিদ্যালাভ করিয়া যেরূপ সত্যাবধারণে ও আপনার পবিত্রতা ও উন্নতি সাধনে সমর্থ হন, সেরূপ উৎকৃষ্ট ফল লাভে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া স্থূল বুদ্ধিদোষে দূষিত লোক কখনই সমর্থ হয় না। তাহার জীবন বলদের মত কেবল পুস্তকের বোঝা বাহক হয়। অতএব বেশী পুস্তক পাঠ না করিয়া অধিকতর চিন্তাশীল হও।

৩২১। বহুদর্শিতাজনিত জীবনলব্ধ-জ্ঞান, কেবল পুস্তক পাঠ নিবন্ধন জ্ঞান অপেক্ষা অধিকতর আদরণীয় ও নির্ভর করিবার যোগ্য। এই জন্য যাঁহারা নানা শাস্ত্র নানা বিদ্যাবিশারদ না হইলেও তাঁহাদিগের বচন অনেক সময় অধিক গ্রাহ্য হয়। পঞ্চাশৎ বৎসরাধিক না হইলে প্রথমোক্ত জ্ঞান লাভ হয় না।

৩২২। একাধারে সদিচ্ছা ও তাহা পূর্ণ করিবার যথাবশ্যক অর্থ থাকিলে মনুষ্য সদনুষ্ঠানে রত হইয়া থাকে। কিন্তু সেই সদিচ্ছার বিরোধী আধারে তাহা পূর্ণ করিবার অর্থ থাকিলে বিবাদ বিপ্রবাদি সংঘটিত হইয়া অমঙ্গলের পরিবর্তে গরল উঠিয়া থাকে। পরস্পর-বিবাদী দুই শক্তির সংঘর্ষে [illegible]। কিন্তু মঙ্গল ও অমঙ্গল বিবাদে তাহা অধিক দিন থাকে না। ঐ দুই শক্তির মধ্যে একের জয় অবশ্যম্ভাবী [illegible]।

৩২৩। পবিত্রস্বরূপ। যতই পবিত্র সহবাস ভোগ, যতই তাঁহার কৃপাবর্ষণ, যতই তাঁহার উপর নির্ভরতা, ততই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পাপের প্রকাশ। সেই অপাপবিদ্ধ, পূর্ণ ও অভ্রান্ত স্বরূপ বিনা ঈদৃশ পাপ সকল দেখাইবার কোন পতনশীল ভ্রান্ত ও অপূর্ণ মানুষের সাধ্য নাই। ইহা ভক্ত জীবনের পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত।

৩২৪। যতই পাপ, ততই পিতা পুত্রে বিচ্ছেদ। যে পরিমাণে পাপের অবসান ও পুণ্যের উদয়, সেই পরিমাণে পিতৃ চরণে পুত্রের পুনঃ সম্মিলন। আমরা এইরূপে

বলিয়া প্রমাণ করিতে বড়ই ব্যস্ত। এই বিষম তর্কের মীমাংসা করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে, তবে আমরা এইমাত্র বলিতেপারি যে, অধিকাংশ পণ্ডিতের মত এই যে, মধ্য আসিয়াই আর্য্যজাতির আদি নিবাস-ভূমি ছিল।

যে সকল যুক্তি অবলম্বন করিয়া, পণ্ডিতেরা শেষোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা ভট্ট মোক্ষমুলরের অধুনাতন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথমতঃ, আর্য্য জাতিদিগের দুইটী প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটী ভারতবর্ষাভিমুখে, অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে এবং আর একটী ইয়ুরোপের অভিমুখে অর্থাৎ উত্তর পশ্চিম দিকে। এই দুইটি প্রবাহের সংযোগস্থল, আসিয়া মহাদেশ।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনতম কালের সভ্য-দেশ সমূহ আসিয়া খণ্ডেই অবস্থিত। আর্য্য ভাষা সমূহের মধ্যে ঋগ্বেদের ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। সুতরাং আসিয়াখণ্ডের মধ্যে, এবং ঋগ্বেদের জন্মস্থান পঞ্জাব প্রদেশ হইতে অনতিদূরে কোনও প্রদেশে আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান হওয়াই সম্ভব।

তৃতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মধ্য আসিয়া হইতে বার বার অনেক পরাক্রান্ত জাতি উদ্ভূত হইয়া ইয়ুরোপ মহাদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর হূনজাতি ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোগল জাতি তাহার উদাহরণ স্থল। অতএব, প্রাচীন কালেও আর্য্যগণ মধ্য আসিয়া হইতে উদ্ভূত হইয়া ইয়ুরোপ বিজয় করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

চতুর্থতঃ, যদি ইয়ুরোপ, বিশেষতঃ স্কাণ্ডানেভিয়া হইতে আর্য্য জাতির উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে, আর্য্য ভাষাসমূহে সমুদ্র সম্বন্ধীয় বহুসংখ্যক সাধারণ শব্দ পাওয়া যাইত। এই সকল ভাষায় পশুবিশেষ বা পক্ষিবিশেষের সাধারণ নাম পাওয়া যায়, কিন্তু এই সকল ভাষায় সমুদ্র বা জলচর জীবের সাধারণ নাম পাওয়া যায় না।

আর্য্যভাষা সমূহে যে সকল সাধারণ শব্দ আছে, তাহার অর্থসংগ্রহ করিয়া, পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আদিম আর্য্যজাতির অবস্থার অনেক কাল্পনিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আমরা প্রাচীন আর্য্যজাতির সেরূপ কোনও চিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টা পাইব না। তবে বিভিন্ন পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক আর্য্যজাতি সম্বন্ধায় যে সকল কথা অবিসংবাদিত রূপে স্বীকৃত হইয়াছে, এস্থলে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিব।

আধুনিক আর্য্য সমাজে পিতা যেরূপ পরিবারের ভিত্তিস্বরূপ, প্রাচীন আর্য্যসমাজেও সেইরূপ ছিল। অন্যান্য প্রাচীন জাতির মধ্যে পিতৃপুরুষ উল্লঙ্ঘন করিয়া মাতা হইতে বংশের পরিচয় দিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা সম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্ব পুরুষ অনুক্রমে নির্ণীত না হইয়া নারী অনুক্রমে নির্ণীত হয়, এবং বিবাহ প্রণালীর শৈথিল্যের অন্যান্য প্রমাণও পাওয়া যায়। আর্য্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ আর্য্য জাতির ইতিহাসে এইরূপ কোনও পদ্ধতির অস্তিত্ব দেখিতে পাইবেন না। পরন্তু, আর্য্য সমাজে পিতা গৃহের পাতা ও ভরণকর্ত্তা, মাতা স্নেহময়ী, গৃহিনী ও পালয়িত্রী। দুহিতা। গাভী

দোহ্ত্রী, বিবাহ সমাজের বন্ধন রজ্জু।

আদিম আর্য্যদিগেব মধ্যে অনেক প্রকার বন্য ও পালিত পশু পরিচিত ছিল। গাভী, ষণ্ড, বলদ, মেষ, ছাগ, শূকর, অশ্ব, বৃক, শশক, হংস, কাক, বর্ত্তিকা ও পেচক প্রভৃতি পশু পক্ষীব সাধাবণ নাম আর্য্য-ভাষাসমূহে পাওয়া যায়। (যথা গো—Cow; • উক্ষ—ox ইত্যাদি।

আদিম আর্য্যগণ নানা রূপ শিল্প কার্য্যেবও কিছু কিছু জানিতেন, তাহাব প্রমাণও আর্য্য ভাষা সমূহে পাওযা যায। গৃহ ও নগব নির্ম্মাণ, জল পথে গমনা-গমনেব জন্য নৌকানির্ম্মাণ এবং সামান্য রূপ বাণিজ্য পদ্ধতি আর্য্য-দিগেব পবিচিত ছিল। তাঁহাবা সেচন ও বয়ন কবিতে জানিতেন ও পশুলোম ও চর্ম্ম হইতে পবি-ধেয় বস্ত্র প্রস্তুত কবিতেন। সূত্রধরের ব্যবসায়েব বিশেষ উন্নতি হইযাছিল, এবং বস্ত্রাদি ধৌত ও বঞ্জিত কবিবার প্রণালীও আবিষ্কৃত হইযাছিল।

বলা বাহুল্য যে, আদিম আর্য্যেবা কৃষিকার্য্য কবিয়া জীবন নির্ব্বাহ কবিতেন। কৃষিকার্য্য হইতেই, তাঁহাদেব কর্ষক-ধাত্বার্থ-মূলক আর্য্য নাম হইযা থাকিবে। লাঙ্গল, শকট প্রভৃতি কৃষিকার্য্যেব উপকবণ সমূহেব সাধারণ নাম আর্য্য ভাষা সমূহে পাওয়া যায়। অতএব, এই উপকবণগুলি, আদিম আর্য্য জাতিব পবিচিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। যবাদি পেষণ কবিয়া তাহা রন্ধন কবিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। পালিত গো মেষাদি হইতে দুগ্ধ ও মাংসেব সংস্থান হইত। কৃষি কার্য্যই অধিকাংশ লোকের জীবিকা ছিল বটে, তথাপি, অনেকেই কৃষকেব অনেকে কৃষকের ন্যায় এক স্থানে না থাকিযা, গো মেষাদি সহ, দেশ দেশান্তরে নূতন ও উর্ব্বব চারণ ভূমির উদ্দেশে ভ্রমণ কবিতেন।

তাদৃশ প্রাচীন সময়ে, সচবাচব প্রায়ই যুদ্ধ ঘটিত। তখন, যুদ্ধ কালে অস্থি, কাষ্ঠ, প্রস্তর ও ধাতু নির্ম্মিত অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহৃত হইত। ধনুর্ব্বাণ, খড্গ, ও বল্লম যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল।

প্রাচীন আর্য্যদিগেব মধ্যে, স্বর্ণ ও বৌপ্যের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। অতএব স্পষ্টই বোধ হয, তাঁহাবা সভ্যতাব কতকটা উন্নতি লাভ কবিযাছিলেন। অযস্-নামে আর একটা ধাতুও আর্য্যদিগেব পবিচিত ছিল। প্রাচীন আর্য্য ভাষায় "অযস্" লৌহ কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

তৎ কালে কিরূপ শাসন প্রণালী প্রচ-লিত ছিল, তাহা অনুমান কবাও অসম্ভব। সমাজে বৃদ্ধ ও অগ্রণী ব্যক্তিদেব যে বিশেষ প্রাধান্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধা-রণ লোকেরা, তাঁহাদিগেকে "পতি" অর্থাৎ পালন কর্ত্তা, "বিশ্পতি" অর্থাৎ লোক-পালক, এবং "রাজা" অর্থাৎ উজ্জ্বল প্রভু বলিযা মানিত। সভ্য মনুষ্যেব স্বাভাবিক বুদ্ধিতে ন্যায অন্যায়েব বিচাব চলিত এবং প্রচলিত আচাব ও স্বজাতিব মঙ্গলের বিরুদ্ধ কার্য্য অবিধি বলিযা গণ্য হইত।

প্রকৃতিব সুন্দব ও বিস্ময়কব পদার্থ দেখিয়া আর্য্য জাতিব সবল হৃদয়ে যে স্বাভা-বিক ভাবেব সঞ্চাব হইত, তাহা হইতেই তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রণালী গঠিত হইয়াছিল। জ্যোতির্ম্ময় আকাশ (দ্যৌঃ) তাঁহাদের চির বিস্ময় ও উপাসনাব বিষয় ছিল। সূর্য্য, উষা, অগ্নি, পৃথিবী, বাত্যা, মেঘ, বজ্র, তাঁহারা এ সকলেরই উপাসনা কবিতেন

ধর্ম্ম ভাব তখন অতি সরল ও অকপট ছিল। দেবতাদের সম্বন্ধে পুরাণ ও ইতিহাস এবং তাঁহাদের বৈবাহিক সম্পর্কাদি তখনও কল্পিত হয় নাই। যাগযজ্ঞের আড়ম্বর তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আর্য্যজাতি সমূহের তেজস্বী পিতৃপুরুষেরা, প্রকম্পিত সুন্দর ও বিস্ময়কর প্রাকৃতিক বায়ু সম্প্রদায়কেই স্বাভাবিক ভক্তিসহকারে সম্মান করিতেন, কৃতজ্ঞ ও উৎসাহিত চিত্তে তাঁহাদের স্তুতি করিতেন।

আর্য্যেরা, আহার্য্য, গোচারভূমি, ও অভিনব রাজ্য লোভে দলে দলে আদিম গৃহ পরিত্যাগ করিতেন। আর্য্যজাতি সমূহের পিতৃপুরুষেরা, কত দিন বা কত পরে, এইরূপে আদি স্থান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই, এবং হইবারও সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, আর্য্যেরা প্রথমে দুই দলে বিভক্ত হইয়া, এক দল ইউরোপ এবং অন্য দল দক্ষিণ আসিয়ার অভিমুখে যাত্রা করেন। এই বিচ্ছেদের পর, আর তাঁহাদের দুই দলের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় নাই। ইউরোপ-যাত্রী আর্য্যেরা পাঁচ জাতিতে বিভক্ত হইয়া, ইউরোপের পাঁচ অংশে অধিকার স্থাপন করিলেন। কিন্তু কোন্ জাতি কখন এইরূপে অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। কেল্ট জাতীয়েরা, স্বেচ্ছায় হউক বা টিউটন্ প্রভৃতি জাতির তাড়নায় হউক, ফরাসি, আয়র্লণ্ড, ব্রিটেন এবং বেলজিয়ম অর্থাৎ ইউরোপের পাশ্চাত্যতম দেশ সমূহে বাসস্থাপন করিলেন। টিউটন্ জাতীয়েরা মধ্য ইউরোপে বাস করিলেন এবং রোম রাজ্য পতনের পর সমগ্র ইউরোপ জয় করিবার চেষ্টা করিলেন।

দক্ষিণ আসিয়া-যাত্রী আর্য্যেরা দক্ষিণ দিকে চলিয়া, সপ্ত সিন্ধু বা পঞ্জাব পর্য্যন্ত আসিয়া পঁহুছিলেন। হিন্দু ও ইরানি (পার্সি) জাতি তখনও এক সঙ্গে ছিলেন। দক্ষিণ পূর্ব্বাভিগামী আর্য্যেরা সপ্তসিন্ধু দেশে আসিয়া, সংস্কৃত ও জেন্দ, এই দুই ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন কোনও এক সাধারণ ভাষার ব্যবহার করিতেন। তদনন্তর ধর্ম্ম বিষয়ে বিবাদ হওয়াতে, তাঁহারা দুই স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত হইলেন। 'দেবোপাসক' হিন্দুরা পঞ্জাবে রহিলেন, আর 'অসুরোপাসক' ইরানীয়েরা পারস্যে গমন করিলেন।*

এই দেবোপাসক হিন্দু আর্য্যেরাই জগদ্বিখ্যাত ঋগ্বেদের প্রণেতা। মানব জাতির মধ্যে যত গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে ঋগ্বেদের ন্যায়, কৌতূহলোদ্দীপক ও উপদেশজনক গ্রন্থ আর দ্বিতীয় নাই। কেবল আর্য্য জাতি সমূহের প্রাচীনতম আচার প্রণালীর এবং সমুদায় পৌরাণিক প্রবাদাদির মূল বলিয়াই যে ঋগ্বেদের এত সম্মান, তাহা নহে।

ঋগ্বেদ সমাদরের সম্ভব এতদপেক্ষা অনেক গুরুতর কারণ আছে। মানবজাতির আধ্যাত্মিক উন্নতির ইতিহাস-লেখক, এই ঋগ্বেদে মনুষ্যের ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মবিশ্বাসের বীজ দেখিতে পাইবেন। কেবল মাত্র এক বেদ পাঠেই জানা যায়, কিরূপে মনুষ্য-হৃদয় সর্ব্ব প্রথমে প্রকৃতির সমুজ্জল ও জ্যোতির্ম্ময়, শক্তিশালান ও বিস্ময়কর

---

* অনেকে বলেন, সিন্ধুনদে আগমন করিবার পূর্ব্বেই হিন্দু ও ইরাণীদের মধ্যে ধর্ম্ম বিষয়ক মতভেদ উপলক্ষে মনোবাদ জন্মে। এবং হিন্দুরা ইরাণীদের কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া পঞ্চনদে প্রবেশ করেন। মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয়ের এই মত।

ক্রীয়ার স্তব স্তুতি করে। ব্যাধি ও বিপত্তি-ভয়ে দুর্ভাগ্য জাতিদের ধর্ম্মের উৎপত্তি। কিন্তু জ্যোতির্ম্ময় দ্যৌঃ, লজ্জাবতী উষা, উদীয়মান সূর্য্য, জাজ্জ্বল্যমান অগ্নি, প্রকৃতির উজ্জ্বল ও চিত্তমুগ্ধকর পদার্থপুঞ্জ নয়নগোচর করিয়া, আর্য্যদের সরল হৃদয়ে গভীর ভাবের উদয় হইয়াছিল। তাঁহাদের কৃতজ্ঞতা-ব্যঞ্জক স্তুতি, ও সাধুবাদ-পূর্ণ গাথা সকল আপনি যেন তাঁহাদের মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল। সেই হৃদয়-নিঃসৃত গাথাই ঋগ্বেদ-সংহিতা।

কিন্তু ঋগ্বেদের সমাদর ও গৌরবের আরও বিশিষ্ট কারণ রহিয়াছে। কি প্রকারে মানব হৃদয়ে, প্রকৃতি হইতে প্রকৃতির নিয়ন্তা ঈশ্বরের জ্ঞান জন্মে, ঋগ্বেদ তাহার প্রমাণ স্বরূপ। কারণ ঋগ্বেদের ঋষিরা, অনেক সময়ে প্রাকৃতিক বস্তুর স্তব করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই। তাঁহারা চিন্তাশক্তির উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া, সূর্য্য, আকাশ, বাত্যা, বজ্র,—সকলই এক অজ্ঞেয় পরমেশ্বরের প্রকাশ চিহ্ন মাত্র, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের শেষাংশের অনেক মন্ত্রে এই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর-বিষয়ক ধারণার ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

যদি সমস্ত মানবজাতির নিকট ঋগ্বেদের এত আদর হয়, তবে আর্য্যজাতি সমূহের নিকট ইহার মূল্য যে কত অধিক, তাহার পরিমাণ করা দুষ্কর। ঋগ্বেদ আর্য্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ। আর্য্যেরা পৃথিবীর নানা স্থানে যে সভ্যতা লাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যাহা প্রাচীনতম, ঋগ্বেদে তাহার চিহ্ন রহিয়াছে। আর্য্যজাতি সমূহের প্রাচীনতম দেবদিগের নাম এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রীকদিগের Zeus, রোমকদিগের Jupiter, টিউটনদিগের Tiu, ঋগ্বেদের দ্যৌঃ ভিন্ন আর কেহ নহেন। Uranos ঋগ্বেদের বরুণ, Daphne ঋগ্বেদের দহনা অর্থাৎ উষা, Prometheus ঋগ্বেদের প্রমন্থ অর্থাৎ অগ্নি।

হিন্দুদের নিকট ঋগ্বেদসংহিতা মহা আদরের গ্রন্থ। ঋগ্বেদে আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা রহিয়াছে, কি প্রকারে দেবতাগণ ও তাঁহাদিগের উপাখ্যান আখ্যায়িকা প্রভৃতি কল্পিত হইয়াছে, ঋগ্বেদ পাঠে এ সকল বিষয়ের সুস্পষ্ট জ্ঞান জন্মে। অতি প্রাচীনতম সময় হইতে অধুনাতন সময় পর্য্যন্ত হিন্দুজাতির মানসিক ভাবের বৃত্তান্ত, ঋগ্বেদ না পড়িলে, বুঝিতে পারা যায় না। উদয়কালীন, মধ্যাহ্ন ও অস্তগামী সূর্য্যই পুরাণে বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের রুদ্র পুরাণে মহেশ্বর রূপ ধারণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ব্রহ্ম স্তোত্র পুরাণে ব্রহ্মা রূপ ধারণ করিয়াছেন। ঋগ্বেদ হইতে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, রাম ও কৃষ্ণ, দুর্গা ও লক্ষ্মী, গণেশ ও কার্ত্তিক, এই সকল দেবতার উল্লেখ ঋগ্বেদে নাই।

কেবল আধ্যাত্মিক কেন, ঋগ্বেদ পাঠে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়ও অনেক জানিতে পারি। ঋগ্বেদে হিন্দুসমাজের যেরূপ চিত্র রহিয়াছে, তাহাতে জাতিভেদ [illegible] না, বিধবাদিগের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না, স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুর পিঞ্জরচারিণী ছিলেন না, ও তাঁহারা বাল্যাবস্থায় বিবাহ করিতেন না।

ঋগ্বেদে ১০২৮ সূক্ত ও দশ সহস্র ঋক্। যে প্রাকৃতিক দেবতাদের উদ্দেশে সূক্তগুলি রচিত হইয়াছে, তাঁহাদের সবিশেষ বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

স্তুতি-মন্ত্রগুলি প্রায়ই অতি সরল। মন্ত্র-প্রণেতারা যজ্ঞ করিয়া সোমরস প্রদান করিতেন এবং গাভী ও ধন জনাদি বৃদ্ধির আশায় এবং কৃষ্ণত্বক দাসদিগের জন্য দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করিতেন। এই সকল প্রার্থনার, দেবতাদের প্রতি, মন্ত্র-প্রণেতাদের সরল ও অকপট বিশ্বাসের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের মন্ত্র দশ মণ্ডলে বিভক্ত। প্রথম ও দশম মণ্ডল ভিন্ন অপর আট মণ্ডল আট জন ঋষির রচিত। একজন ঋষি বলিতে বোধ হয়, সেই ঋষির বংশীয় ব্যক্তি অথবা তদনুসারী শিষ্যপরম্পরা বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রণেতা গৃৎসমদ। এই গৃৎসমদ ও শৌনক একই ব্যক্তি বলিয়া প্রবাদ আছে। তৃতীয় মণ্ডলের প্রণেতা বিশ্বামিত্র, চতুর্থ মণ্ডলের প্রণেতা বামদেব, পঞ্চম মণ্ডলের প্রণেতা অত্রি, ষষ্ঠ মণ্ডলের প্রণেতা ভরদ্বাজ, সপ্তম মণ্ডলের প্রণেতা বশিষ্ঠ, অষ্টম মণ্ডলের প্রণেতা অঙ্গিরা। প্রথম মণ্ডলে ১৯১ সূক্ত, দশম মণ্ডলেও ১৯১ সূক্ত। তাহা নানা কাল্পনিক ঋষির প্রণীত বলিয়া পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিয়াছে।

মন্ত্রের ভাষা ও অন্যান্য বিষয় বিচার করিয়া তাহাদিগকে প্রাচীন ও অপ্রাচীন, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু সে চেষ্টা যে কখনও ফলবতী হইবে, তাহা বোধ হয় না। তথাপি ঋগ্বেদের পাঠকমাত্রেই দেখিতে পাইবেন যে, দশম মণ্ডল অপর নয় মণ্ডল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহা যেন ঋগ্বেদের পরিশিষ্টস্বরূপ। দশম মণ্ডলের অধিকাংশ সূত্রই অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন। এই সকল সূক্তে চিন্তাশক্তির বিকাশ ও উন্নতি এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অতি জটিল অবস্থায় পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল সূক্তে পরলোকের বর্ণনা, বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার মন্ত্র এবং সকল দেবতার দেবতা একমাত্র পরব্রহ্মের আভাস রহিয়াছে।

রোগ প্রতীকারের উদ্দেশে রচিত যে সকল মন্ত্র রহিয়াছে, তাহা অপ্রাচীন। অথর্ব্ব বেদ যে ঋগ্বেদের ন্যায় প্রাচীন নয়, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। অথর্ব্ব বেদে এরূপ মন্ত্র অনেক আছে। আবার দশম মণ্ডলের অনেক মন্ত্রের প্রণেতা স্ব স্ব নাম গুপ্ত রাখিয়া মন্ত্রগুলি দেবতাদের নামে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। দেবতাদের রচিত বলিলে এই সকল মন্ত্র প্রাচীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যাইবে, বোধ হয় এইরূপ অভিপ্রায়।

ঋগ্বেদের মন্ত্র সকল আবহমানকাল পুত্র পৌত্রাদিক্রমে অথবা গুরু শিষ্যপরম্পরায় শ্রবণমাত্রে আবদ্ধ ছিল। যে সময় মন্ত্রগুলি মণ্ডলাদিতে বিভক্ত হইয়া সংগৃহীত হয়, সেই সময়ে দশম মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্র রচিত হইয়া থাকিবে, সেই সময়েই তাহা সঙ্কলিত ঋগ্বেদের শেষভাগে সংযুক্ত হইয়া যায়। ঋগ্বেদের সংগ্রহকার্য্য দ্বিতীয় যুগে সমাপ্ত হইয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় যুগের অবসান হইবার পূর্ব্বেই, ঋগ্বেদের সূক্ত, ঋক্, পদ ও অক্ষর পর্য্যন্তের সংখ্যা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ঋক্ সংখ্যা ১০,৪০২ অথবা ১০৬২২। পদসংখ্যা ১৫৩, ৪২৬ এবং অক্ষর সংখ্যা ৪৩২০০০।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃষি, গোচারণ ও বাণিজ্য।

অধুনাতন হিন্দুদের ন্যায় প্রাচীন-হিন্দুদেরও কৃষিকার্য্যই প্রধান জীবিকা ছিল।

ঋগ্বেদেও ভূয়োভূয়ঃ তাহার উল্লেখ করিয়াছে। যে আর্য্যশব্দে হিন্দুদের পূর্ব্বপুরুষেরা আপনাদিগকে দাস ও আদিম নিবাসী হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দিতেন, সেই শব্দ কর্ষণ-বোধক ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইরাণ্ বা পারস্য হইতে এরিণ্ বা আয়র্লণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যভূমে এই শব্দের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন হিন্দুরা আর্য্যশব্দ দ্বারা আপনাদিগের পরিচয় দিতেন, ঋগ্বেদে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। ঋষিরা যে আর্য্যশব্দের ধাতুগত অর্থ বিস্মৃত হয়েন নাই, ঋকগ্বেদের অনেক সূক্তে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। একটী উদাহরণই এস্থানে যথেষ্ট হইবে। "হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আর্য্য মনুষ্যের জন্য লাঙ্গল দ্বারা (চাষ করাইয়া) যব বপন করাইয়া ও অন্নের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া, এবং বজ্রদ্বারা দস্যুকে বধ করিয়া, তাহার প্রতি বিস্তীর্ণ জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়াছ। মণ্ডল ১১৭২।

ঋগ্বেদে চর্ষণ (১ মণ্ডল ৩। ৭) এবং কৃষ্টি (১ মণ্ডল ৪।৬) নামক যে দুইটী শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কৃষিবাচক চৃষ বা কৃষ ধাতু হইতে উৎপন্ন। জাতিবাচক অর্থে স্পষ্ট ব্যবহার না থাকিলেও এই দুই শব্দ মনুষ্য অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত।

ঋগ্বেদে, কৃষি সম্বন্ধে ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ রহিয়াছে। তন্মধ্যে যে মন্ত্রের দেবতা ক্ষেত্রপতি, তাহাই অতি প্রসিদ্ধ। নিম্নে তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত হইতেছে। (৪র্থ মণ্ডল, ৫৭ সূক্ত)।

১। "আমরা বন্ধু সদৃশ ক্ষেত্রপতির সহিত ক্ষেত্র জয় করিব, তিনি আমাদিগকে গো ও অশ্বের পুষ্টি প্রদান করুন, কারণ তিনি উক্ত প্রকার দান করিয়া আমাদিগকে সুখী করেন।"

২। "হে ক্ষেত্রপতি! ধেনু যেরূপ দুগ্ধ দান করে, সেইরূপ তুমি মধুস্রাবী, সুপবিত্র, ঘৃত তুল্য, মাধুর্য্যোপেত ও প্রভূত (জল) দান কর। যজ্ঞের স্বামিগণ আমাদিগকে সুখী করুন।"

৩। "ওষধি সমূহ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, দ্যুলোক সমূহ জল সমূহও অন্তরীক্ষ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, ক্ষেত্রপতি আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউন। আমরা (শত্রু কর্ত্তৃক) অহিংসিত হইয়া তাহাকে অনুসরণ করিব।"

৪। "বলীবর্দ্দ সমূহ সুখে বহন করুক, মনুষ্যগণ সুখে কার্য্য করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক। প্রগ্র সমূহ সুখে বদ্ধ হউক, এবং প্রতোদ সুখে প্রেরণ কর।"

৫। "হে শুন! হে সীর! তোমরা আমাদিগের এই স্তুতি সেবা কর, তোমরা দ্যুলোকে যে জল সৃষ্টি করিয়াছ, তাহার দ্বারা এই পৃথিবীকে সিক্ত কর।"

৬। "হে সৌভাগ্যবতী সীতা! তুমি অভিমুখী হও, আমরা তোমাকে বন্দনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে সুন্দর ধন প্রদান কর ও সুফল প্রদান কর।

৭। "ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুক, পূষা তাহাকে পরিচালিত করুন। তিনি জলবতী হইয়া বৎসরের পর বৎসর (শস্য) দোহন করুন। *

* এই দুই ঋকে সীতাকে স্ত্রীরূপে বর্ণনা করিয়া প্রচুর শস্য প্রদানের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। সীতা অর্থ—হলে যে কর্ষণ চিহ্ন রাখিয়া যায়। যজুর্ব্বেদে এই সীতার স্তুতি রহিয়াছে। যখন আর্য্যেরা

৮। "ফাল সকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক; রক্ষকগণ বলীবর্দ্দের সহিত সুখে গমন করুক, পর্জ্জন্য মধুর জল দ্বারা (পৃথিবী) সিক্ত করুন)। হে শুনসীর। আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।"

কৃষকের সামান্য আশা ভরসা এরূপ অবিকৃত ভাবে প্রকাশ করিয়া, ঋগ্বেদ ভিন্ন অপর কোন্ সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়? ঋগ্বেদের সংহিতায় এই এক বিশেষত্ব এবং মনোহারিত্ব রহিয়াছে। দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধের বিবরণই হউক, পরম সহায় ইন্দ্রের স্তুতিই হউক, অথবা সামান্য কৃষকের গানই হউক, ঋগ্বেদ যেমন আমাদিগকে তেজস্বিতায় পরিপূর্ণ অথচ সরল নিষ্কপট হৃদয়ের সঙ্গী করিয়া দেয়, কোন অপ্রাচীন গ্রন্থে তাহা হইবার নয়।

কৃষি সম্বন্ধে আর একটী মন্ত্রের কিয়দংশ এ স্থলে অনুবাদ করিতেছি। (১০ মণ্ডল, ১০১ সূক্ত)।

৩। "লাঙ্গলগুলি যোজনা কর, যুগগুলি বিস্তারিত কর, এই স্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে বীজ বপন কর, আমাদিগের স্তবের সহিত আমাদের অন্ন পরিপূর্ণ হউক। শৃণিগুলি নিকটবর্ত্তী পক্ক শস্যে পতিত হউক।

৪। "লাঙ্গলগুলি যোজিত হইতেছে। কর্ম্মকারগণ যুগ সমস্ত পৃথক করিতেছে। বুদ্ধিমানগণ দেবোদ্দেশে সুন্দর স্তব পড়িতেছেন।

৫। "পশুদিগের জলপান স্থান প্রস্তুত কর। বরত্রা যোজনা কর। এই উদ্রিক্ত, অক্ষয় ও সৌকার্য্যযুক্ত গর্ত্ত হইতে জল সেচন করি।

৬। "পশুদিগের জলপান স্থান প্রস্তুত হইয়াছে। এই উদ্রিক্ত, অক্ষয় জলপূর্ণ গর্ত্তে সুন্দর চর্ম্মরজ্জু বিদ্যমান আছে। অক্লেশে জল সেচন করা যায়। ইহা হইতে জল সেচন কর।"

৭। "ঘোটকদিগকে পরিতৃপ্ত কর, ক্ষেত্রে সংস্থাপিত ধান্য গ্রহণ কর, নিরুপদ্রবে ধান্য বহন করে এতাদৃশ রথ প্রস্তুত কর। এই জলপূর্ণ পশুদের জলাধার এক দ্রোণ প্রমাণ হইবেক। ইহাতে প্রস্তর নির্ম্মিত চক্র আছে। আর মনুষ্যদের পানোপযোগী জলাধার স্কন্দ পরিমাণ হইবেক। ইহা জল পূর্ণ কর।"

পঞ্জাব প্রদেশে কূপ-জল না হইলে জল সেচন ও কৃষিকার্য্য অসম্ভব, সুতরাং মনুষ্য ও গবাদির জল পানের জন্য কূপ খনন করা হইত। আবার উদ্ধৃত মন্ত্রে ঋগ্বেদ-সময়ে কৃষিকার্য্যে অশ্ব ব্যবহৃত হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আধুনিক ভারতবর্ষে এই আচার লোপ পাইলেও অদ্যাপি ইউরোপ খণ্ডে কৃষিকার্য্যে অশ্বের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

দশম মণ্ডলের ২৫শ সূক্তের ৪র্থ ঋকে এবং অন্যান্য অনেক স্থানে কূপের উল্লেখ রহিয়াছে। "হে সোম। যেরূপ কলসগুলি জল উত্তোলন করিবার জন্য কূপের মধ্যে যায়, তদ্রূপ আমাদের স্তব সমস্ত তোমাতে যাইতেছে।" উক্ত মণ্ডলের ৯৩ সূক্তে কূপ হইতে কি প্রকারে জল উত্তোলন করা হইত, তাহার বর্ণনা রহিয়াছে। "যেরূপ

সমস্ত ভারতবর্ষ জয় করিয়া বন বিনাশ করিয়া তাহাতে সীতা পরিচালিত করিলেন, তখন লাঙ্গল চিহ্ন সীতা মনুষ্য আকার ধারণ করিয়া অবশেষে দাক্ষিণাত্য জয় বিবরণ পূর্ণ রামায়ণের নায়িকা রূপে স্থান পাইলেন।

ঘটীচক্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অগ্র পশ্চাৎ ভাবে উঠিতে থাকে, আমার স্তবগুলিও তদ্রূপ।" ১৩শ ঋক্। অদ্যাপি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই উপায়ে জল উত্তোলিত হয়। অনেকগুলি ঘটী রজ্জুতে একাদিক্রমে বদ্ধ করিয়া একটী চক্রের সাহায্যে কূপে অবতরণ করাইয়া তাহা পূর্ণ করা হয়। চক্র যেমন ঘুরিতে থাকে, ঘটী জলপূর্ণ হইয়া উপরে আনীত হয়। ঋগ্বেদে ইহার নাম ঘটীচক্র, অদ্যাপিও এই নামে তাহা পরিচিত।

দশম মণ্ডলের ৯৯ সূক্তের ৪র্থ ঋকে দ্রোণে পয়োনালী পরিপূর্ণ করিয়া ক্ষেত্র সেচন করিবার উল্লেখ রহিয়াছে। "তিনি মেঘের দিকে গমন করিয়া মেঘে ভ্রমণ পূর্ব্বক উর্ব্বরা ভূমিতে প্রচুর জল সেচন করেন। সেই সকল ক্ষেত্রে অনেক ক্ষুদ্র নদী একত্র হইয়া ঘৃত তুল্য জল বহাইয়া দেয়, তাহাদের চরণ নাই, রথ নাই, দ্রোণিই তাহাদিগের অশ্ব।" পুনরপি উক্ত মণ্ডলের ৬৮ সূক্তের প্রারম্ভে রহিয়াছে, "জল সেচনকারী কৃষাণগণ পক্ষীদিগকে শস্য ক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিবার সময় কোলাহল করে।"

ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি—কৃষিকার্য্যের যেরূপ প্রচুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, গোচারণের উল্লেখ তাদৃশ পরিমাণে দৃষ্ট হয় না। পূষা, গোপাল বা মেষ পালের দেবতা, তাহাদের নিকট পূষা সূর্য্যস্বরূপ। মধ্য আসিয়ায় থাকিতে এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াও আর্য্যেরা যে গো মেষাদির চারণভূমি অনুসন্ধানে ইতস্ততঃ যাত্রা করিতেন, ঋগ্বেদে তৎসম্বন্ধে কিংবদন্তী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ৪২ সূক্তে রহিয়াছে;—

১। "হে পূষা! পথ পার করাইয়া দাও। (বিঘ্নহেতু) পাপ বিনাশ কর; হে মেঘপুত্র দেব! আমাদিগের অগ্রে যাও।

২। "হে পূষা! আঘাতকারী, অপহরণকারী ও দুষ্টাচারী যে কেহ আমাদিগকে বিপরীত পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাকে পথ হইতে দূর করিয়া দাও।

৩। সেই মার্গপ্রতিবন্ধক, তস্কর কুটিলাচারীকে পথ হইতে দূরে তাড়াইয়া দাও।

৪। "যে কেহ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) উভয়ই হরণ করে এবং অনিষ্ট সাধন ইচ্ছা করে, হে পূষা, তাহার পরসন্তাপক দেহ, তোমার পদের দ্বারা দলিত কর।

৫। "হে শত্রুবিনাশী ও জ্ঞানবান্ পূষা! যেরূপ রক্ষণাদ্বারা পিতৃগণকে উৎসাহিত করিয়াছিলে, তোমার সেই রক্ষণা প্রার্থনা করিতেছি।

৬। "হে সর্ব্বধনসম্পন্ন, অনেক স্বর্ণায়ুধযুক্ত লোকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূষা! তুমি অনন্তর ধনসমূহদিগকে শোধন কর।

৭। "বিঘ্নকারী শত্রুদিগকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে লইয়া যাও, সুখগম্য শোভনীয় পথদ্বারা আমাদিগকে লইয়া যাও। হে পূষা! তুমি এই [পথে] আমাদিগের রক্ষণের উপায় অবগত হও।

৮। "শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদিগকে লইয়া যাও, পথে যেন নূতন সন্তাপ না হয়। হে পূষা! তুমি এই [পথে] আমাদের রক্ষণের উপায় অবগত হও।

৯। "[আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে] সক্ষম হও। (আমাদিগের গৃহ ধনে) পরিপূর্ণ কর। (অন্য অভীষ্ট বস্তুও) দান কর।

(আমাদিগকে) তীক্ষ্ণতেজা কর। আমাদের উদর পূরণ কর। হে পূষা! তুমি এই পথে আমাদের রক্ষণের উপায় অবগত হও।

১০। "আমরা পূষাকে নিন্দা করি না, সূক্তদ্বারা স্তুতি করি, আমরা দর্শনীয় পূষার নিকট ধন যাঞ্চা করি।"

দশম মণ্ডলের ১১৯শ সূক্তে গাভীদিগকে বাহির করিয়া গোষ্ঠে নেওয়া এবং পুনর্ব্বার বাটীতে ফিরাইয়া আনা সম্বন্ধে বর্ণনা রহিয়াছে। তাহা হইতে কয়েকটী ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি।

৪। "যিনি গোপাল অর্থাৎ রাখাল, তাঁহাকে আমি আহ্বান করিতেছি, তিনি এই গাভীদিগকে বাহির করিয়া লইয়া যান, গোষ্ঠে চারণ করুন, চিনিয়া চিনিয়া লউন, বাটীতে ফিরাইয়া আনুন, ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিক বিচরণ করাইয়া দিন।

৫।"যে রাখাল চতুর্দ্দিকে গাভীর অন্বেষণ করে, বাটীতে ফিরাইয়া আনে, ইতস্ততঃ বিচরণ করায়, সে যেন নিরুপদ্রবে বাটীতে ফিরিয়া আসে।

৮। "হে নিবর্ত্তন (গোচারণকারী পুরুষ) গাভীগণকে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করাও এবং ফিরাইয়া লইয়া এস। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এবং চারিদিকে বিচরণ করাইয়া ফিরাইয়া লইয়া এস।

পূর্ব্বোদ্ধৃত সূক্তসমূহে আর্য্য দেশের চতুঃপার্শ্বে উপদ্রবকারী শত্রুদের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহারা আদিম পরিচিত জাতিভুক্ত লোক, আর্য্য গ্রাম ও কৃষিক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী বনে লুকায়িতভাবে বাস করিত এবং অবসর পাইলে আর্য্যদের গবাদি চুরি ও অন্যান্য প্রকারে উপদ্রব করিত। ইতঃপশ্চাৎ ইহাদের সবিশেষ বিবরণ লিখিত হইবে।

ঋগ্বেদ দেবতাদের স্তব সংগ্রহ। তাহার মধ্যে পণ্যবাণিজ্যের অধিক উল্লেখ থাকা সম্ভব নয়। তথাপি যাহাতে তাৎকালীক বাণিজ্য সম্বন্ধীয় নীতি অবগত হইতে পারি, ঈদৃশ বর্ণনা কুত্রাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। টাকা ধার দেওয়ার নিয়ম সুপ্রচলিত ছিল। এক স্থানে ঋষিরা নিজদের ঋণাবদ্ধতার দুঃখ অতি সরলভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। (স্মরণ রাখা উচিত যে, ঋগ্বেদে ঋষিরা পরবর্ত্তী কালের সন্ন্যাসী ও বানপ্রস্থগত মনি নহেন, তাঁহারা বিষয়ী গৃহস্থ লোক)। এক স্থানে লিখিত আছে, একবার কোন বস্তু বিক্রয় হইলে, পুনর্ব্বার সেই বিক্রয় অতিক্রম করিয়া আর বিক্রয় হইতে পারে না। চতুর্থ মণ্ডল, ২৪ সূক্তে ৯ম ঋক্, যথা—"(কেহ) অনেক (পণ্যের) দ্বারা অল্প ধন প্রাপ্ত হয়, পরে (ক্রেতার নিকট) গমন করতঃ "আমি বিক্রয় করি নাই" বলিয়া অবশিষ্ট মূল্য প্রার্থনা করে। বিক্রেতা 'অনেক দিয়াছি' বলিয়া অল্প মূল্য অতিক্রম করিতে পারে না। সমর্থ হউক বা অসমর্থ হউক, বিক্রয়কালে যে কথা বলে, তাহাই থাকিয়া যায়।"

উদ্ধৃত ঋক্ হইতে বোধ হয় যে, ক্রয় বিক্রয়ে মুদ্রা ব্যবহার করিবার প্রথা তৎকালে প্রচলিত হইয়াছিল। অনেক স্থানে ঋষিরা শত স্বর্ণ মুদ্রা দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন। "এ্যরুণ আমাকে শত (সুবর্ণ), বিংশতি গো এবং শকট বাহনক্ষম অশ্বদ্বয় প্রদান করিয়াছেন। ৫।২৭।২। এই কথা নিশ্চয় যে, এই সকল ঋকে কোন নির্দ্ধারিত মূল্যের স্বর্ণ মুদ্রার উল্লেখ করা হইয়াছে; কিন্তু সে মুদ্রা প্রকৃত মুদ্রা (coined money) নহে, কেবল নিরূপিত ওজনের স্বর্ণ ছিল

মাত্র। অনেক স্থলে লিঙ্ক বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। "আমি কক্ষীবান তাঁহার নিকট শত লিঙ্ক, শত লক্ষণ যুক্ত অশ্ব ও শত বলীবর্দ্দ গ্রহণ করিলাম।" কোথাও ইহার অর্থ মুদ্রা কোথাও বা আভরণ। এই দুই অর্থ পরস্পর বিরোধী নয়। কারণ অতি প্রাচীন কাল হইতে মুদ্রাকে অলঙ্কার স্বরূপ ব্যবহার করা ভারতবর্ষের রীতি রহিয়াছে।

অনেক স্থলে সমুদ্র যাত্রার উল্লেখ রহিয়াছে। প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সূক্তে ভুজ্যুর ও অশ্বিদ্বয় কর্ত্তৃক তাহার প্রাণ রক্ষার বর্ণনা আছে। "কোন ম্রিয়মান মনুষ্য যেরূপ ধন ত্যাগ করে, সেইরূপ তুগ্র (অতি কষ্টে তাঁহার পুত্র) ভুজ্যুকে সমুদ্রে পাঠাইলেন। হে অশ্বিদ্বয়। তোমরা আপনাদিগের নৌকা সমূহ দ্বারা তাহাকে ফিরিয়া আনিয়াছিলে, সে নৌকা জলে ভাসিয়া যায়, তাহাতে জল প্রবেশ করে না।" * ৩ ঋক্। এই মণ্ডলের ২৫ সূক্তে বরুণ "অন্তরীক্ষগামী পক্ষীদিগের পথ জানেন এবং সমুদ্রের পথ জানেন" বলিয়া বর্ণনা রহিয়াছে। ৪র্থ মণ্ডলের ৫৫ সূক্তে ধনলাভার্থ সমুদ্র গমনের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।

"৬। হে দ্যাবা পৃথিবী দ্বয়! যেমন ধন লাভেচ্ছু ব্যক্তিরা (সমুদ্র মধ্যে) গমনের জন্য সমুদ্রকে স্তুতি করে, সেইরূপ আমি অভিলষিত কার্য্য লাভের জন্য অহির্বুধ্ন্য নামক দেবতার সহিত তোমাদিগকে স্তুতি করি।"

সপ্তম মণ্ডলের ৮৮ সূক্তে ৩ ঋকে বশিষ্ঠ বলিতেছেন—"যখন আমি ও বরুণ, উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম, সমুদ্রের মধ্যে নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, জলের উপরে গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ (নৌকারূপ) দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।"

সমুদ্র গমন সম্বন্ধে ঋগ্বেদে এতদ্ভিন্ন অনেক স্থলে উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু সমুদ্র গমন করিবে না, করিলে অপকার্য্য হয়, ঋগ্বেদের কুত্রাপি এরূপ কথা নাই।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

কামাতুরদের জন্য মানব ধর্ম্মশাস্ত্র নহে।

১। গর্ভাধান।

মনু লিখিয়াছেন,—

গার্ভৈর্হোমৈর্জাতকর্ম্মচৌড়মৌঞ্জীনিবন্ধনৈঃ।
বৈজিকং গার্ভিকঞ্চৈনো দ্বিজানামপমৃজ্যতে॥ ২।২৭

"গার্ভ" হোম বা গার্ভসংস্কার সমূহ এবং জাতকর্ম্ম চৌড় মৌঞ্জীনিবন্ধন দ্বারা দ্বিজ বা হিন্দুদের বৈজিক ও গার্ভিক দোষ ক্ষালন হয়।

সন্তান গর্ভে থাকিতে যে সংস্কার, তাহা গার্ভ সংস্কার। মনু অন্যত্র বলিয়াছেন,—

* সায়নাচার্য্য বলেন, তুগ্রনামে অশ্বিদিগের প্রিয় একজন রাজর্ষি ছিলেন. তিনি দ্বীপান্তরবর্ত্তী শত্রুদিগের উপদ্রবে ক্লিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে জয় করিবার জন্য আপন পুত্র ভুজ্যুকে সেনার সহিত নৌকায় প্রেরণ করেন। সমুদ্রে অনেক দূরে গিয়া সেই নৌকা ভাঙ্গিয়া যায়। ভুজ্যু অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলেন। তাঁহারা ভুজ্যুকে সসৈন্যে আপনাদের পোতে অবস্থান করাইয়া তিন দিন তিন রাত্রিতে তাহাদিগকে তুগ্রের নিকট পৌঁছাইয়া দিলেন।

নিষেকাদিশ্মশানান্তো মন্ত্রৈর্যস্যোদিতঃ বিধিঃ।
তস্যশাস্ত্রেঽধিকারোঽস্মিন্ জ্ঞেয়োনান্যস্যকস্যচিৎ॥২।১৬

"নিষেক হইতে আরম্ভ করিয়া শ্মশানে দাহ পর্য্যন্ত মন্ত্রানুসারে সংস্কার যে ব্যক্তির বিধি রহিয়াছে, সেই ব্যক্তি শাস্ত্রে অধিকারী, অপর লোকেরা শাস্ত্রের অধিকারী নহে।"

মনুর মতে "গার্ভ সংস্কার" মধ্যে নিষেক সর্ব্ব প্রথম। টীকাকার মেধাতিথি নিষেক শব্দের গর্ভাধান অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু টীকাকার মেধাতিথি অপেক্ষা শতসহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অর্থাৎ স্বয়ং শাস্ত্রকারেরা নিষেক সংস্কারের যে অর্থ ও ব্যবস্থা-করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। মহর্ষি বিষ্ণু বলিয়াছেন—

"গর্ত্তস্য স্ফুটতা জ্ঞানে নিষেককর্ম্ম। ১ স্পন্দনাৎ পুরা পুংসবনম্। ২। ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তোন্নয়নম্। ৩। সপ্তবিংশ অধ্যায়।

অর্থাৎ গর্ভ হইয়াছে তাহা স্পষ্ট জানিতে পারিলে নিষেক কর্ম্ম। স্পন্দনের পূর্ব্বে পুংসবন। ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে সীমন্তোন্নয়ন এই কথাই করিতা বরিয়া মহর্ষি শঙ্খ লিখিয়াছেন,—

"গর্ভস্য স্ফুটতা জ্ঞানে নিষেকঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
ততস্তু স্পন্দনাৎকার্য্যং সবনন্তু বিচক্ষণৈ॥ ২। ১

মহর্ষি অঙ্গিরা লিখিয়াছেন,—

পূর্ব্বশ্চ স্রাবিতো যশ্চ গর্ভো যশ্চাপ্যসংস্কৃতঃ।
দ্বিতীয়ো গর্ভসংস্কারাস্তেন শুদ্ধি বিধীয়তে॥৬৭

"প্রথম গর্ত্ত যদি অসংস্কৃত হইয়া স্রাবিত হয়, তবে দ্বিতীয় গর্ত্তে গর্ত্তসংস্কার করিবে। তাহা হইলে বিশুদ্ধি হয়।"

তবে এই হইল যে, নিষেক সংস্কার এমন সময়ে হইবে যে, তাহা না হইতেই গর্ত্তস্রাব সম্ভব ছিল। মহর্ষি বিষ্ণু ও শঙ্খের মত (ভর্ত্তস্য স্ফুটতা জ্ঞানে নিষেকঃ) অঙ্গিরাবাক্যে দৃঢ়ীকৃত হইতেছে। মহর্ষি ব্যাস লিখিয়াছেন,—

গর্ভাধানং প্রথমত স্তৃতীয়ে মাসিপুংসবঃ
সীমন্তশ্চাষ্টমে মাসিজাতে জাতক্রিয়া ভবেৎ॥১।১৬,১৭

প্রথম মাসে গর্ত্তাধান, তৃতীয় মাসে পুংসবন অষ্টম মাসে সীমন্ত; সন্তান জন্মিলে, জাতকর্ম্ম।

কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি করেন, একমাস মধ্যে গর্ত্ত হইয়াছে কি না, তাহা জানা যায় না, সুতরাং প্রথমত শব্দের অর্থ প্রথম মাস নয়। যদি প্রথম মাস জানা না গেল, তবে তৃতীয় ও অষ্টম মাস কি প্রকারে গণনা হইবে? ব্যাস, গর্ভের প্রথম মাস নির্দ্ধারণ করা যায়, বিশ্বাস করিয়া প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম মাস ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল স্থানে বিষ্ণু ও শঙ্খ "গর্ত্তের স্ফুট জ্ঞানে" এবং "স্পন্দনের পূর্ব্বে" এইরূপ বিধি করিয়াছেন। কুমারী ভার্য্যার প্রথম রজোদর্শনে গর্ত্তাধান-সংস্কার মনু, বিষ্ণু, শঙ্খ, অঙ্গিরা ও ব্যাস, কেহই এই কথা বলেন নাই।

মনু যে নিষেক সংস্কারের কথা লিখিয়াছেন, যে সময়ে সেই নিষেক সংস্কার হওয়া উচিত, বিষ্ণুসংহিতা ও শঙ্খ সংহিতায় তাহার সময় নির্দ্দেশ রহিয়াছে। মানব ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে যে কোন সময়ে উপযুক্ত বর মিলিবে, তখনই বিবাহ দিবে। সুতরাং ঋতুমতী হইয়া অনেক কন্যার বিবাহ হইত। বাঙ্গালাদেশে কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাদের অনেকের রজস্বলা হইলে বিবাহ হয়। প্রথম রজোদর্শনে নিষেক-সংস্কার কখনই মনুর অভিপ্রেত অর্থ নহে। এবং

শঙ্খ ও বিষ্ণুমতে এই প্রকার কদর্থ নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

ব্যাসাদি কৃত ধর্ম্ম শাস্ত্রে নিষেক শব্দ নাই। তাঁহারা গর্ভাধান শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য, মনুর ব্যবস্থা—"নিষেকাদিশ্মশানান্তোস্তেষাং বৈ মন্ত্রতঃ ক্রিয়া"

যাজ্ঞবল্ক্য ১।১০

উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—

গর্ভাধানমৃতৌ পুংসঃ সবনং স্পন্দনাৎ পুরা।
ষষ্ঠেঽষ্টমে বা সীমন্তঃ প্রসবে জাতকর্ম্ম॥ ১।১১

ঋতু হইলে গর্ভাধান, স্পন্দনের পূর্ব্বে সবন, ষষ্ঠ বা অষ্টমে সীমন্ত এবং প্রসবে জাতকর্ম্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন, "ঋতুকালে গর্ভাধান সংস্কার হইবে।" প্রথম ঋতুতেই গর্ভাধান, এইরূপ অর্থ না করিয়া বিবাহের পর প্রথম ঋতুতে গর্ভাধান, এই অর্থ করিলে কোনও প্রকারে কদর্থ হয় না। তবে কিনা যাজ্ঞবল্ক্য অবজস্কা অবস্থায় কন্যার বিবাহ হওয়া উচিত, বক্ষমাণ শ্লোকে এই ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অপ্রযচ্ছন সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যা মৃতাবৃতৌ।১।৬২

কন্যা ঋতুমতী হইলে কন্যাদাতার ভ্রূণহত্যাপরাধ হয়।

জিজ্ঞাসা করি, "গর্ভাধানম্ ঋতৌ"—প্রথম ঋতুতে গর্ভাধান, এই অর্থ কি করিয়া হইবে? ঋতুকালে অর্থাৎ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ষোড়শ দিনমধ্যে গর্ভাধান সংস্কার হইবে, অনৃতুকালে অর্থাৎ এই ষোল দিন অতিক্রান্ত হইলে আর গর্ভাধান সংস্কার হইবে না, ইহাই প্রকৃত অর্থ।

মনুর ব্যবস্থা "ঋতুকালাভিগামীস্যাৎ" টীকায় মেধাতিথি তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঋতুকালে স্ত্র্যভিগামী হইবে, কিন্তু অনৃতুকালে স্ত্রীগমন করিবে না। "গর্ভাধানম্ ঋতৌ" এই বিধির অর্থ এই যে "ঋতুকালে গর্ভাধান হইবে, অনৃতু কালে গর্ভাধান সংস্কার হইবে না।" প্রথম ঋতু বা দ্বিতীয় ঋতু বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্যের শাস্ত্রে কোন নির্দ্দেশ নাই। "সমে যজেত" অর্থ সমদেশে যজ্ঞ করিবে, বিষমদেশে যজ্ঞ করিবে না। তদনুসারে "ঋতু কালাভিগামীস্যাৎ" অর্থ ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে, অনৃতুকালে স্ত্রীগমন করিবে না। "গর্ভাধানম ঋতৌ" বিধির অর্থ ঋতুকালে গর্ভাধান সংস্কার হইবে, অনৃতু কালে গর্ভাধান সংস্কার হইবে না। "সমে যজেত" এই সূত্রের এইরূপ কেহ ব্যাখ্যা করেন নাই যে, যত সমদেশ আছে, তন্মধ্যে যে সমদেশ সর্ব্ব প্রথমে দৃষ্টিগোচর হইবে, তাহাতে যজ্ঞ করিবে। সুতরাং "ঋতুকালাভিগামীস্যাৎ" সূত্রের "প্রথম" ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে, অথবা "গর্ভাধানম্ ঋতৌ" ইহার "প্রথম" ঋতুতেই গর্ভাধান করিবে, ঈদৃশ ব্যাখ্যা কোনও মতে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

নিষেক সম্বন্ধে দুই মত দৃষ্ট হইতেছে। এক মতে গর্ভ নিশ্চয় হইয়াছে, জানিলে অথবা গর্ভের প্রথম মাসে সংস্কার। বিষ্ণু, শঙ্খ ও মনু এই মতের পোষক। অপর মতে গর্ভ হউক, এই ইচ্ছা করিয়া যে কোন ঋতুতে প্রথম স্ত্রী-সঙ্গম হয়, সেই ঋতুতে গর্ভাধান সংস্কার হইত। যাজ্ঞবল্ক্য * এই মতের প্রবর্ত্তক। যে শাস্ত্রই অনুসরণ কর, স্ত্রীর "প্রথম" ঋতুতে গর্ভাধান সংস্কার না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, ইহা কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রের অভিপ্রেত নয়। †

* ব্যাসকেও এই মতের পোষক স্বীকার করা যাইতে পারে।

† এই সুযুক্তিপূর্ণ তর্ক সম্বন্ধে অন্যান্য পণ্ডিতগণ কি বলেন, আমরা জানিতে চাই। ন, স।

কুমারী কাহাকে বলে ?

মনু বলিয়াছেন—

রেতঃসেকঃ স্বযোনীষু কুমারীষন্ত্যজাসু চ।
সখ্যুঃ পুত্রস্য চ স্ত্রীষু গুরুতল্পসমং বিদুঃ॥ ১১।৫৯

স্বযোনি, কুমারী, অন্ত্যজা, সখি স্ত্রী, পুত্র স্ত্রী, ইহাদের সঙ্গে রেতসেক হইলে গুরুতল্প পাপ হয়।

যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—

সখিভার্য্যাকুমারীষু স্বযোনিষন্ত্যজাসু চ।
সগোত্রাসু পুত্রস্ত্রীষু গুরুতল্প সমংস্মৃতম্॥
আচার্য্যপত্নীং স্বসুতাং গচ্ছংস্তু গুরুতল্পগঃ॥
ছিত্বালিঙ্গং বধস্তস্য সকামায়াঃ স্ত্রিয়া অপি॥ ৩।২৩৩

সখিভার্য্যা গমন ও কুমারী গমন, আচার্য্য পত্নী গমনে গুরুতল্প অপরাধ হয়। এই সকল স্ত্রীলোক সকামা হইলেও অপরাধীর লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া প্রাণদণ্ড হইবে।

মনুর টীকাকার মেধাতিথি "কুমারী" শব্দের "অনূঢ়া স্ত্রী" অর্থ করিয়াছেন। হিন্দু সমাজের পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় সেই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কুমারী শব্দের " অনাগতার্ত্তবা, " প্রথম বয়োবিশিষ্টা, এই রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে কি ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দ সমূহের অর্থ এত অনিশ্চিত যে, কল্পনা বলে কোন একটা অর্থ অবলম্বন করিলেই হইল ? পুরাণেতিহাসাদি-ব্যবহৃত শব্দের অর্থ নির্ণায়ক অনেক কোষ রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল কোষ সৃষ্টি হইবার অনেক পূর্ব্বে দুই মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক ব্যক্তি বেদসংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, এক ব্যক্তি শব্দের ধাতু প্রত্যয় ও অর্থ নির্ণয় করিয়া ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন। বেদব্যাস ঈশ্বরাবতার বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস না থাকিতে পারে, কিন্তু আপামর সকলের নিকট পাণিনি মহেশাবতার বলিয়া আদৃত। বেদব্যাস ভ্রম ক্রমে ছাড়িয়া গিয়াছেন বলিয়া আমরা কোন মন্ত্র আর ঋক্‌বেদে নূতন প্রবেশ করাইতে পারি না, অথবা পাণিনি-সম্মত ধাতু প্রত্যয় ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কোন শব্দের অভিনব অর্থ করিতে পারি না। পাণিনি বলিয়াছেন আচার্য্যাণী।" শব্দের অর্থ "আচার্য্যের স্ত্রী" এবং "আচার্য্যা" শব্দের অর্থ "স্বয়ং ব্যাখ্যাত্রী।" যদি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভার্য্যাকে আচার্য্যা বলি, আর পণ্ডিতা রমাবাইকে আচার্য্যাণী বলি, তবে পাণিনির অবমাননা অথবা পাণিনি-জ্ঞান-শূন্যতার পরিচয় প্রদান করা হয়। মেধাতিথি গোবিন্দ রাজ তো অতি সামান্য লোক, সায়নাচার্য্য ও শঙ্করাচার্য্যকেও পাণিনি ধৃত অর্থ অবলম্বন করিয়া চলিতে হইয়াছে। পাণিনি উনাদি সূত্রে কহিয়াছেন "পুবশ্চ হ্রস্বঃ ১৬৪। পঞ্চম পাদঃ" অর্থাৎ পৄ ধাতুর উত্তর "বত্র" প্রত্যয় হয়, আর দীর্ঘ ঊ হ্রস্ব হয়। এইরূপে "পুত্র" শব্দ উৎপন্ন। কল্পনা বলে পুং নামে নরকের আবিষ্কার করিয়া ত্রৈ ধাতুর উত্তর ডচ্‌ প্রত্যয় করিলে বাহাদুরি প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু পাণিনিকে অশ্রদ্ধা করা হয়।

পাণিনি বলেন "বয়সি চ।৩।২।১০। উদ্যমানার্থং সূত্রম্। কবচহরঃ, কুমারঃ।" এখন যদি আমি বলি, কুমার শব্দ বয়োবাচক নহে, কিন্তু বিবাহ-বাচক, আমার কথায় কে বিশ্বাস করিবে ?

পাণিনি বলেন "প্রথমে বয়সি।৪।১।২০। প্রথম-বয়োবাচিনোঽদন্তাৎ স্ত্রিয়াং ঙীপ্‌ স্যাৎ। কুমারী।" কুমার শব্দের উত্তর প্রথমবয়স বুঝাইতে স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্‌ প্রত্যয় হয়। এখন

যদি পাণিনিকে তুচ্ছ করিয়া বলি, কুমারী শব্দের অর্থ "প্রথম বয়োবিশিষ্টা স্ত্রী" নহে, কুমারী অর্থ "অনূঢা স্ত্রী," মূর্খ ছাড়া কে আমার কথায় আস্থাস্থাপন করিবে? তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ন্যায় যে সকল ব্যক্তিরা ঋক্‌বেদোল্লিখিত আর্য্যের সন্তান অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রোল্লিখিত দ্বিজের সন্তান বলিয়া আত্মপরিচয় দেন, এবং মহেশ্বরাগত-পাণিনি-প্রোক্ত-অষ্টাধ্যায়ী যাহাদের কণ্ঠস্থ, তাঁহারা কখনই মেধাতিথি সম্প্রদায়ের কপোলঃকল্পিত অর্থ গ্রহণ করিয়া পাণিনির মস্তকে পদাঘাত করিবেন না। বাঙ্গালা ভাষায় ব্রাহ্মণকে "দ্বিজ" বলে, কিন্তু মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে দ্বিজ শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য।" কুমারী শব্দও বাঙ্গালী গ্রন্থকারেরা অনেকে অনূঢা অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তবে কি প্রচলিত বাঙ্গালা অর্থ গ্রহণ করিয়া মন্বাদি সংস্কৃত শাস্ত্রের অর্থ করিতে হইবে? পল্লবগ্রাহিতা আর কাহাকে বলে?

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, কুমারী সহবাস ভগিনী-সহবাস তুল্য মহাপাপ। দণ্ড, মুণ্ডচ্ছেদন বা লিঙ্গচ্ছেদন পূর্ব্বক প্রাণবধ। একি সম্ভব কথা, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাকরণ জানিতেন না, অথবা পাণিনি মানবশাস্ত্র ও যাজ্ঞবল্ক্যের শাস্ত্রাদির ভাষা বুঝিতেন না?

মনুর মতে সকামা কন্যাদূষণের শাস্তি অর্থদণ্ড। যাজ্ঞবল্ক্য মতে

কন্যাদূষণশ্চৈব পরিবেদক যাজনম্। ৩।২৩৬

*　　*　　*　　*

ভার্য্যায়া বিক্রয়শ্চৈষাম্ একৈকম্ উপপাতকং।

৩।২৪১

কন্যাদূষণ প্রভৃতি অপরাধ উপপাতক মধ্যে গণ্য। তাহার শাস্তি চান্দ্রায়ণ।

উপপাতকশুদ্ধিঃস্যাৎ এবংচান্দ্রায়ণেন বা। ৩।২৬৫

তবে দেখুন, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য এই দুই ব্যবস্থাকারের মতে কুমারীগমন ও কন্যাগমনের দণ্ডেতে কত তারতম্য। রাজপুরুষেরাই শাস্তি বিধান করুন, আর সামাজিক শক্তির কেন্দ্রীভূত বিদ্বন্মণ্ডলিই শাস্তি বিধান করুন, মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়ে বলিতেছেন, কুমারীগমনে মুণ্ডচ্ছেদন বা লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া প্রাণদণ্ড, আর কন্যাগমনে লঘুশাস্তি। কন্যা ও কুমারী শব্দ একার্থক হইলে, তাঁহারা কি দণ্ডের এত তারতম্য করিতেন? কুমারী "প্রথম বয়োবিশিষ্টা স্ত্রী" আর কন্যা "অনূঢা স্ত্রী" এই অর্থ গ্রহণ করিলে মনু ও পাণিনিতে বিরোধ হয় না, অথবা যাজ্ঞবল্ক্য বা মনুকৃত বিধি সমস্ত পরস্পর বিসংবাদী হয় না। শ্রীযুক্ত তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের বিরোধী ব্যক্তিরা পুনর্ব্বার পাণিনি সূত্র ও মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া দেখুন। সামান্য টোলের ছাত্রের ন্যায় টীকা টীপ্পনী চটিকে মান্য করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকারকের মস্তকে পদাঘাত করিবেন না।

বিধবাবিবাহ-প্রচারক পরাশর বলিয়াছেন,—

নশ্যন্তি চাগ্নিহোত্রাণি গুরুপূজা প্রণশ্যতি।
কুমারীচ প্রসূয়ন্তে তস্মিন্ কলিযুগে সদা। ১। ৩১

এই কলিযুগে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ অবসন্ন হয়, গুরুপূজা নষ্ট হয়, আর কুমারী অবস্থায় স্ত্রীলোকেরা সন্তান প্রসব করে।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে কুমারীগমন ছিল, তাহার দণ্ড মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া প্রাণবধ। কলিযুগে কুমারীর সন্তান হইতে লাগিল। কলির এমনি মাহাত্ম্য। কুমারীর সন্তান সম্বন্ধে মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন—

কুমারী সম্ভবস্তেকঃ সগোত্রায়াং দ্বিতীয়কঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রজনিতশ্চাণ্ডালস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ॥ ১।১০

চণ্ডাল ত্রিবিধ। ১। কুমারী স্ত্রীর সন্তান। ২। সগোত্রাজাত সন্তান। ৩। শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণী জাত সন্তান। "কুমারী সম্ভব" কথনই "কানীন পুত্র" হইতে পারে না। পাণিনি কুমারী শব্দের "প্রথম বয়োবিশিষ্টা" স্ত্রী অর্থ করিয়াছেন। কানীন শব্দের বক্ষ্যমাণ ব্যাখ্যা পাণিনিতে দেখিতে পাই। "কন্যায়াঃ কনীন চ।৪।১ ১১৬। চকারাৎপবাদোহণ। তৎ সন্নিযোগেন কনীনাদেশশ্চ। কানীনো ব্যাসঃ কর্ণঃ। অনূঢায়া এবাপত্যমিত্যর্থম্।" অনূঢাকে কন্যা বলে। ব্যাস ও কর্ণ উভয়ে কানীন পুত্র ছিলেন, তাঁহারা কেহই চণ্ডাল নহেন। যে ধৃষ্ট ব্যক্তি বলে, ব্যাস চণ্ডাল ছিলেন, তাহাকে পুষ্প চন্দনে পূজা করিব, না পাদুকা মাতায় ভূষিত করিব?

স্ত্রীলোকের প্রথম বয়স্ কি? মনু ৯ অধ্যায়ে স্ত্রীলোকের বয়স তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, কৌমার, যৌবন ও স্থাবির। রজোদর্শন পর্য্যন্ত কৌমার, রজোদর্শন হইতে রজো-নিবৃত্তি পর্য্যন্ত যৌবন, রজো-নিবৃত্তি হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থাবির বা বার্দ্ধক্য।

পিতা রক্ষতি কৌমারে, ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি॥ মনু ৯।৩

কৌমারে অর্থাৎ রজোদর্শন যত দিন না হয়, ততদিন পিতা, যৌবনে অর্থাৎ রজোদর্শন হইতে যত দিন স্বাভাবিক মাসিক নিবৃত্তি না হয়, ততদিন স্বামী, এবং তাহার পর পুত্রগণ স্ত্রীলোকদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। স্ত্রীলোকদিগকে যেন স্বতন্ত্রা হইয়া থাকিতে না হয়।

বর কন্যার বিবাহ সময়।

পিতা, কন্যার রজোদর্শনের তিন বৎসর মধ্যে তাহার বিবাহ দিবেন। কিন্তু উপযুক্ত বর পাইলে অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। আর উপযুক্ত বর পাইতে বিলম্ব হইলে উক্ত তিন বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়া বিবাহ হইলেও দোষ নাই, এমন কি, উপযুক্ত বর না পাইলে কন্যা আমরণ পিতৃগৃহে থাকিবেক, মনু একপ ধর্ম্ম-নিয়ম বিহিত করিয়াছেন। যথা,—

ত্রীণি বর্ষাণ্যুদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধন্তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত সদৃশং পতিম। ৯। ৯০।

কুমারী ঋতুমতী হইলেও, তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে। অপিচ—

কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি।
ন চৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ।৯।৮৯

"ঋতুমতী কন্যাও আমরণ পিতৃ গৃহে অবস্থান করিবে, তথাপি ইচ্ছাপূর্ব্বক গুণহীন বরকে কখন কন্যা দান করিবে না।" ঋতু হইলেই গর্ভাধান করিতে হইবে, মনুর ব্যবস্থা একপ নয়।

বরের বয়স সম্বন্ধে মহর্ষি মনু লিখিয়াছেন, চতুর্ব্বিংশ বর্ষের পূর্ব্বে বিবাহ হওয়া নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ—

ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতম্।
তদর্দ্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা॥৩।১
গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাম॥৩।৪

গুরুগৃহে ৩৬ বর্ষ ত্রৈবেদিক ব্রত আচরণ করিবে, ৩৬ বর্ষ না হইলে ১৮ বৎসর, তাহা না হইলে ৯ বর্ষ, অথবা যে পর্য্যন্ত ব্রত গ্রহণ সমাপ্ত না হয়, ততদিন গুরুগৃহে এই ব্রত আচরণ সমাপন করিয়া গুরুর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্নান করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগত হইবে,

এবং তখন সুলক্ষণান্বিত সবর্ণা ভার্য্যা বিবাহ করিবে।

গুরুর নিকট পাঠ সমাপনের পূর্ব্বে ভার্য্যাগ্রহণ করা কোনও শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত নয়। পূর্ব্বকালে গুরুগৃহে থাকিয়া যুবকদের চরিত্র দোষ জন্মিত না। আজ কাল পিতৃগৃহে থাকিলেও শিশুদের চরিত্র দোষ জন্মিবে, এই আশঙ্কায় তাহাদের পাঠ ব্রত সমাপন না হইতেই গুরুর অনুমতি গ্রহণ না করিয়া বালক অবস্থায় বিবাহ দেওয়া হয়। মনু বলুন আর পরাশর বলুন, কোনও প্রাচীন কি আধুনিক শাস্ত্রকারের মতে পুরুষের বাল্য বয়সে, পাঠব্রত সমাপনের পূর্ব্বে, বিবাহ ধর্ম্ম-বিবাহ নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, কন্যাসম্বন্ধে মহর্ষি মনুর সার ব্যবস্থা এই যে, উপযুক্ত বর না পাইলে কন্যার বিবাহ দিবে না, এবং পাঠব্রত সমাপন না করিয়া বিবাহ করিবে না। পুরুষের বিবাহ বয়স কোনও শাস্ত্রকার পরিবর্ত্তন করেন নাই। মনু বলিয়াছেন, "কালেঽদাতা পিতা বাচ্যো"—উপযুক্ত বর মিলিলেও যথা কালে কন্যা সম্প্রদান না করিলে পিতা দোষী। মহর্ষি বশিষ্ঠ এই কথা আরো পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন—

> যাবচ্চ কন্যাম্ ঋতবঃ স্পৃশন্তি
> তুল্যৈঃ সকামাম্ অভিযাচ্যমানম্।
> ভ্রূণানি তাবন্তি হতানিতাভ্যাং
> মাতাপিতৃভ্যামিতি ধর্ম্মবাদঃ॥ ১৭ অধ্যায়।

তুল্য বর কন্যাকে যাচঞা করিতেছে, অর্থাৎ উপযুক্ত বর মিলিয়াছে, এবং কন্যাও তাহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত আছে, এমন অবস্থায়ও পিতা মাতা যদি কন্যা সম্প্রদান না করে, এবং কন্যা ঋতুমতী হইয়া থাকিলে পিতা মাতা ভ্রূণহত্যারূপ পাপে লিপ্ত হয়েন। সুতরাং উপযুক্ত বর না পাইলে এবং সম্মতা না হইলে কন্যা রজস্বলা হইলেও পিতা মাতা প্রভৃতি অভিভাবকেরা দোষভাগী নহেন।

কিন্তু মনু ও বশিষ্ঠের পরবর্ত্তী মতবিদের বিধি অনেক সঙ্কীর্ণ। মনু ও বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, কন্যার রজোদর্শনের তিনবৎসর মধ্যে কন্যার বিবাহ দিবে, যদি উপযুক্ত বর মিলে। অপর শাস্ত্রকারেরা বলেন, সদৃশ অভিরূপ বর মিলুক আর না মিলুক, রজোদর্শনের পূর্ব্বে অবশ্যই কন্যার বিবাহ হওয়া চাই, নতুবা পিতা ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইবেন। এই শ্রেণীর শাস্ত্রকর্ত্তাদের মধ্যে কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন যে, মনুকে তো একেবারে পায়ে ঠেলা যায় না, তবে দ্বাদশ বর্ষের পূর্ব্বে যদি কন্যা ঋতুমতী হয়, তবে পিতা মাতা ভ্রাতা দোষ ভাগী হইবেন না। কিন্তু দ্বাদশ বর্ষের পরে কন্যা (অনূঢাবস্থায়) ঋতুমতী হইলে পিতা মাতার ভ্রূণ হত্যা পাপে আর নিষ্কৃতি নাই।

শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুগ্রহে মহর্ষি পরাশর কাহারও অপরিচিত নহেন, পরাশর—

> নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবেচ পতিতে পতৌ।
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যোবিধীয়তে॥ ৪। ২৭

পতি নষ্ট, মৃত, প্রব্রাজিত, ক্লীব ও পতিত হইলে নারীগণ পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারেন, এই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। পরাশর যেমন বিধবাবিবাহের পক্ষপাতী, আবার তেমনি রজোদর্শনের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহের বিশেষ উদ্যোগী। তিনি বলিয়াছেন—

> অষ্টমবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষাতু রোহিণী।
> দশবর্ষা ভবেৎকন্যা অতউর্দ্ধং রজস্বলা॥ ৭।৬

প্রাপ্তে তু দ্বাদশে বর্ষে যঃ কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিবন্তি পিতরঃ স্বয়ম্॥ ৭।৭

"অষ্টবর্ষা বালিকাকে গৌরী, নববর্ষা বালিকাকে রোহিণী, দশবর্ষা বালিকাকে কন্যা এবং তদূর্দ্ধ বয়স্কা বালিকাকে (ঋতুমতী না হইলেও) রজস্বলা বলা যায়। দ্বাদশ বর্ষ বা তদধিক বয়সে যদি কন্যা (অনূঢ়াবস্থায়) ঋতুমতী হয়, তবে "পিতর" পিতা মাতা ভ্রাতা সেই রজঃ পান করেন।" সুতরাং কন্যা চতুর্দ্দশ, ষোড়শ বা ততোধিক বর্ষ পর্য্যন্ত রজস্বলা না হইয়া পিতৃগৃহে রহিলে পরাশর মতে পিতার কোন দোষ স্পর্শ হয় না। মহর্ষি যম কন্যার দ্বাদশ বর্ষের পূর্ব্বে কন্যার রজোদর্শনের পাপ হইতে পিতাকে অব্যাহতি দিয়াছেন।

প্রাপ্তে দ্বাদশমবর্ষে য' কন্যাং ন প্রযচ্ছতি।
মাসি মাসি রজস্তস্যাঃ পিতা পিবতি শোণিতম্॥ ২২

যম ও পরাশর ভিন্ন আর সমস্ত আধুনিক শাস্ত্রকারদের মত এই যে, যে বয়সেই হউক, পিতৃগৃহে কন্যার রজোদর্শন হইলেই পিতা মাতা ভ্রাতা ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইবেন। মুসলমানদের অধিকার কালে এই সকল (আধুনিক) শাস্ত্র রচিত হইয়া থাকিবে।

মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন 'কুমার্য্যৃতুমতী ত্রিবর্ষাণ্যুপাসীতোর্দ্ধং ত্রিভ্যো বর্ষেভ্যঃ পতিং বিন্দেৎ তুল্যাম। (সপ্তদশ অধ্যায়।)"

কন্যা ঋতুমতী হইয়া পিতা মাতার অনুমতি অনুসারে বিবাহ করিলে স্বামী স্ত্রী কাহারও দোষ হয় না। ঋতুমতী কন্যা বর্ষত্রয় অপেক্ষা করিয়া পিতা মাতার অনভিপ্রায়ে স্বয়ং স্বামী বরণ করিলে বরকন্যা কেহই দোষভাগী হয় না। মহর্ষি মনু ও বশিষ্ঠ রজোদর্শনের ৩ বৎসর পরে কন্যাকে স্বয়ম্বরা ক্ষমতা দিয়াছেন। *

মহর্ষি বিষ্ণু বলিয়াছেন,—

ঋতুত্রয়ং উপাস্যৈব কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ংবরম্।
ঋতুত্রয়ে অতীতে তু প্রভবত্যাত্মনঃ সদা॥ ২৪।৪০

কন্যা ঋতুত্রয় অপেক্ষা করিয়া স্বয়ং স্বামী বরণ করিবে। কারণ ঋতুত্রয় অতীত হইলে কন্যার আত্মপ্রভাব (majority) জন্মে। এইরূপ স্বয়ং স্বামী বরণ করিলে বর কন্যা কেহই দোষভাগী হয় না।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

অপ্রযচ্ছন্ সমাপ্নোতি ভ্রূণহত্যাম্ ঋতাবৃতৌ
গম্যন্ত্বভাবে দাতৄণাং কন্যা কুর্য্যাৎ স্বয়ংবরম্॥ ১।৬৪

কন্যা ঋতুমতী হইয়া অনূঢ়া থাকিলে কন্যাদাতা প্রতিঋতুতে ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হয়েন। কন্যাদাতা না থাকিলে কন্যা স্বয়ং স্বামী বরণ করিবে।

কন্যার স্বয়ম্বর ক্ষমতা এখানে খর্ব্ব হইয়া আসিল। বশিষ্ঠ ও মনু বর্ষত্রয় এবং বিষ্ণু ঋতুত্রয় অতিক্রান্ত হইলে কন্যাকে স্বয়ম্বর ক্ষমতা দিয়াছেন। যদি দাতার অভাব হয়, তবেই যাজ্ঞবল্ক্য মতে কন্যা স্বয়ম্বরা হইতে পারে। কিন্তু স্বয়ম্বর বিবাহে বিবাহিত বর ও কন্যা কেহই দোষভাগী নহে।

কোন কোন আধুনিক শাস্ত্রকার শুধু পিতা মাতাকে ভ্রূণহত্যা ও নরক গমন ভয় প্রদর্শন করিয়া নিরস্ত হয়েন না। কন্যা বৃষলী বা শূদ্রা বলিয়া গালি দিয়াছেন। জাতির শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ কুলীন মহাশয়েরা এই সকল অভিনব শাস্ত্র বোধ হয় ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন।

---

* ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে ২১ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে কন্যার স্বয়ম্বর ক্ষমতা জন্মেনা।

না। কুলীন কন্যাদের মধ্যে শত শত "বৃষলী" রহিয়াছে।

মহর্ষি যম স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন,—

যস্তাং বিবাহয়েৎ কন্যাং ব্রাহ্মণো মদমোহিতঃ
অসংভাষ্যোহপাঙ্‌ক্তেয়ঃ সবিপ্রো বৃষলীপতিঃ॥ ২৪

যেই মদমোহিত ব্রাহ্মণ ঋতুমতী কন্যা বিবাহ করিবে, সে শূদ্রা বিবাহ করিল বলিয়া জানিবে। তাহার সঙ্গে আলাপ করিবে না, তাহার সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে আহার করিবে না।

মহর্ষি পরাশরের বিধিও তদনুরূপ,—

যস্তাং সমুদ্বহেৎ কন্যাং ব্রাহ্মণোঽজ্ঞান মোহিতঃ।
অসম্ভাষ্যোহপাঙ্‌ক্তেয়ঃ সবিপ্রোবৃষলীপতিঃ॥ ৭।৯

যেই অজ্ঞান মোহিত ব্রাহ্মণ ঋতুমতী কন্যা বিবাহ করে, সে শূদ্রার স্বামী, সে অসম্ভাষ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয়। *

মহর্ষি যম বলেন, ঋতুর প্রাক্‌কালে কন্যা দান করিবে। এমনও ঘটিয়াছে যে, বিবাহ সময়ে কন্যা ঋতুমতী হইয়াছে।

মহর্ষি আপস্তম্ব নিয়ম করিয়াছেন—

বিবাহে বিততে যজ্ঞে সংস্কারে চ কৃতে তথা।
রজস্বলা ভবেৎ কন্যা, সংস্কারস্তু কথং ভবেৎ।
স্নাপয়িত্বা তদা কন্যাং অন্যৈর্বস্ত্রৈরলঙ্কৃতাম্।
পুনঃ প্রত্যাহুতিংহুত্বা শেষং কর্ম্ম সমাচরেৎ॥ ৭।৯, ১০

প্রশ্ন এই, বিবাহ যজ্ঞ বিতত হইয়া সংস্কার হইবার সময় যদি কন্যা রজস্বলা হয়, তবে কি প্রকারে সংস্কার হইবে?

উত্তর। কন্যাকে তখন স্নান করাইয়া ও অন্য কাপড় পরাইয়া পুনর্ব্বার প্রত্যাহুতি করিয়া বাকী যে সকল কর্ম্ম থাকে, তাহা শেষ করিবে।

প্রথমতঃ কথা হইল যে, রজোদর্শনের তিন বৎসর মধ্যে কন্যা সম্প্রদান সময়, যদি উপযুক্ত বর মিলে। উপযুক্ত বর মিলিলে ইহার পূর্ব্বেও কন্যা সম্প্রদান করা যাইতে পারে, উপযুক্ত বর না পাইলে কন্যা চিরকাল পিতৃগৃহে রহিবেক। আর রজোদর্শনের তিন বৎসর পর ঋতুমতী কন্যা স্বয়ং স্বামী বরণ করিতে পারে। স্বয়ংবর বিবাহ প্রশস্ত প্রথা, তদ্দ্বারা বর কন্যা কেহই দোষ ভাগী হয় না। কিন্তু উপযুক্ত বর সত্ত্বেও কন্যা দাতা সকামা কন্যা দান না করিলে দোষী হইবে, যদি উপযুক্ত বর না মিলে, তবে কন্যাদাতার কোন দোষ নাই। মহর্ষি মনু ও বশিষ্ঠ এই প্রশস্ত বিধি প্রণয়ন করিয়াছেন।

ইহার পরবর্ত্তী মহর্ষিদের মত অল্পে অল্পে সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিল। গুণহীন হউক, সবর্ণ বর হইলেই উপযুক্ত বর হইল, এই যেন ইঁহাদের বিধি। আর রজোদর্শনের পূর্ব্বে যে প্রকারে হউক, কন্যা সম্প্রদান করিতেই হইবে। না করিলে পিতা মাতা ভ্রূণহত্যা অপরাধে অপরাধী হইবেন। তবে দুই এক ঋষি অনুগ্রহ করিয়া বলিলেন, দ্বাদশ দর্শন পূর্ব্বে যদি কন্যা ঋতুমতী হয়, তবে দোষ নাই। অনেক দিন স্বয়ংবর বিধি প্রচলিত রহিল। আধুনিক ঋষিরা নিয়ম করিলেন, সে কি কথা? ঋতুমতী কন্যাকে সম্প্রদান না করিয়া কন্যা-দাতার ভ্রূণহত্যাপরাধ হইবে, আর ঋতুমতী কন্যাকে বিবাহ করিয়া বর সুখে কাল কাটাইবে? তাহা কথনই হইবে না, যে ব্যক্তি ঋতুমতী

---

* "পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন, ৬, ৭, ৮ও ৯ শ্লোক স্বার্থ ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের রচিত। প্রাচীন কালের বিবাহ প্রথা পর্য্যালোচনা করিলে এই শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়।' বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত পরাশর সংহিতা, ৪৫ পৃষ্ঠা।

কন্যা বিবাহ করিবে, সে অসম্ভাষ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয়, আর ঋতুমতী কন্যা—

সা কন্যা বৃষলী জ্ঞেয়া হরন্তাং ন বিদূষ্যতি।

বিষ্ণুসংহিতা। ২৪।৪১ *

ঋতুমতী কন্যা বৃষলী অর্থাৎ শূদ্রা স্বরূপ, তাহাকে হরণ করিলে কোন দোষ হয় না।

৪। স্ত্রীগমন।

ঋষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন "বৃত্তে রজসি গম্যা স্ত্রী গৃহ কর্ম্মনি চেন্দ্রিয়ে" ঋতুকালের রজঃ নিবৃত্ত হইলে (পঞ্চম দিবস হইতে) স্ত্রীলোক গৃহকার্য্য ও ঐন্দ্রিয় কর্ম্মের উপযুক্তা হয়।

ঋষি আপস্তম্বেরও এই বিধি। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন "ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ পর্ব্ববর্জং স্বদারে বা। ১২ অধ্যায়।" পর্ব্ব-বর্জে ঋতুকালে স্বদার গমন করিবে।

মহর্ষি গৌতম বলেন, "ঋতাবুপেয়াৎ সর্ব্বত্র বা প্রতিষিদ্ধ বর্জ্জন্। ৫ অধ্যায়।" সর্ব্বত্র স্ত্রীর ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে, কিন্তু প্রতিষিদ্ধ দিনে নহে। কেহ কেহ বলেন, সর্ব্বত্র 'ঋতৌ' শব্দের বিশেষণ, সর্ব্বত্র ঋতৌ পদের অর্থ 'প্রতি ঋতুতে'। যদি ইহা প্রকৃত অর্থ হয়, তবে মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত এই বিরোধের সূত্রপাত। কিন্তু 'সর্ব্বত্র' সকল অবস্থায় "ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে, অনৃতুকালে স্ত্রীগমন করিবে না," এই অর্থ প্রকৃত অর্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদার নিরতঃ সদা।
পর্ব্ববর্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্ব্রতো রতিকাম্যয়া ॥৩।৪৫

স্বদার-নিরত ব্যক্তি সদা (পুত্র কামনায়) ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে। আর রতি কামনায় পর্ব্ব দিন ভিন্ন অন্য সময়ে স্ত্রীগমন করিবে।

মূলে "পুত্র কামনায়" নাই। কিন্তু পর্ব্ব বর্জ দিনে রতি কামনায় স্ত্রীগমন হইতে ঋতুকালে পুত্র কামনায় স্ত্রীগমন অনুমান করা যাইতেছে।

'ঋতু কালাভিগামী স্যাৎ'—এই পদের অর্থ কি? প্রত্যেক ঋতুতে স্ত্রীগমন করিবে, অথবা যে কোন ঋতুকালে হউক পুত্র কামনায় ঋতুকালে স্ত্রীগমন করিবে, না ঋতুকাল ভিন্ন অন্য সময়ে পুত্র কামনায় স্ত্রীগমন করিবে না? মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রের টীকাকার অর্থসৌকর্য্যার্থে একটী অতি উৎকৃষ্ট শাস্ত্রীয় উদাহরণ দিয়া 'ঋতুকালাভিগামীস্যাৎ' বিধির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈদিক ব্যবস্থা "সমে যজেত" অর্থাৎ সমদেশে যাগ করিবে। সমদেশ তো অনেক আছে। তবে কি প্রত্যেক সমভূমিতে যাগ করিতে হইবে? না, যে সমভূমি সর্ব্বপ্রথমে চক্ষুগোচর হয়, সেই সমভূমিতেই যাগ করিতে হইবে। না, যাগ করিবার সময় অতিক্রান্ত না হওয়ার পূর্ব্বে যে সকল

---

* কোন কুলীনবিদ্বেষী চণ্ডাল বিষ্ণুসংহিতায় এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়া থাকিবে। রজোদর্শনের ঋতুত্রয় পরে কন্যাকে স্বয়ং স্বামিবরণ ক্ষমতা দিয়া মহর্ষি বিষ্ণু কি বলিবেন, রজস্বলা কন্যা হরণ করিলে দোষ হয় না? যদি ইংরেজ রাজত্ব না থাকিত, উদ্ধৃত শ্লোক শাস্ত্র হইলে, বাঙ্গালা দেশের রজস্বলা কুলীন কন্যাদের দশা কি হইত? আর মহীশূর, বরদা, রাজপুতানা প্রভৃতি হিন্দু রাজ্যে রজস্বলা কন্যা হরণ করিলে কি শাস্তি হয় না? ইংরেজদের আসিবার অনেক পূর্ব্বে দেবীবর ঘটকের মেল বন্ধন হেতু কুলীন কন্যাদের রজস্বলা হইয়া বিবাহ হইত। কোন ব্যক্তি কি রজস্বলা কন্যাকে হরণ করিয়া বিনা দণ্ডে অব্যাহতি পাইয়াছে?

"সম্মতির আইনের পাণ্ডুলিপির প্রতিবাদে যাঁহারা প্রবৃত্ত, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কুলীন ব্রাহ্মণ। শত সহস্র রজস্বলা অবিবাহিতা কন্যা যাঁহাদের গৃহে, তাঁহাদের পক্ষে নীরব থাকা কি ভাল নয়।" ন, স।

সমদেশ রহিয়াছে, তাহার যে কোনটী হউক, যাগকর্ত্তার ইচ্ছানুসারে বাছিয়া লইবে? কিন্তু যাগ করিতে হইলে সমভূমি ভিন্ন অসমভূমিতে যাগ করিতে নিষেধ। ঋতুকালে পুত্র কামনায় স্ত্রীগমন সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা। চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ন্যূনাধিক চত্বারিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের ঋতু সময় দেখা যায়। এই পঞ্চবিংশতি বর্ষে ৩০০ তিন শত বার ঋতুকাল উপস্থিত হয়। ইহার প্রতিবারে পুত্র কামনায় স্ত্রীগমন করিবে, এইরূপ যদি মনুর বিধির অর্থ হয়, তবে, যে অসংখ্য সমদেশ রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক স্থানে যজ্ঞকারীর যাগ করা উচিত। যদি প্রত্যেক ঋতুকালে স্ত্রীগমন হিন্দুর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম না হয়, তবে প্রথম ঋতুকালে অবশ্য স্ত্রীগমন করিবার যে আধুনিক দেশাচার রহিয়াছে, তাহাও শাস্ত্রানুসারে অবশ্য কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য নহে। স্ত্রীর প্রথম রজোদর্শনে স্ত্রীগমন করিলে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে কেহ পাতকী হয় না, আবার স্ত্রীর প্রথম রজোদর্শনে স্ত্রীগমন না করিলেও কেহ পাতকী হয় না। ২০০ কি ৩০০ বার স্ত্রীর ঋতুকাল উপস্থিত হয়। পুত্রকামী ব্যক্তি তাহার যে কোন সময়ে স্ত্রীগমন করিতে পারেন, ইহাই শাস্ত্রের বিধি। "ঋতু কালাভি গামীস্যাৎ স্বদার নিরত সদা।" সদা অর্থাৎ প্রথম রজোদর্শন হইতে শেষ রজোদর্শন পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে পুত্রকামনায় যে সময়কে শাস্ত্রকার 'ঋতুকাল" নাম করিয়াছেন, সেই সময়ে স্ত্রীগমন করিবে। সেই সময় পরিত্যাগ করিয়া অন্য সময়ে স্ত্রীগমন করিলে রতিকামনায় স্ত্রীগমন হইল, তাহা মনে করিতে হইবে। তাহা হইলে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই ব্রহ্মচর্য্য * ব্রতের পুণ্যসঞ্চয় হয় না।

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

ঋতুঃ স্বাভাবিকঃ স্ত্রীণাং রাত্রয়ঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ।
চতুর্ভিরিতরৈঃ সার্দ্ধমহোভিঃ সদ্বিগর্হিতৈঃ॥ ৩। ৪৬

স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ঋতু ষোড়শ রাত্রি, তন্মধ্যে অশুচি চারি রাত্রি অন্তর্গত।

তাসামাদ্যাশ্চতস্রস্তু নিন্দিতৈকাদশী চ যা।
ত্রয়োদশী চ শেষাস্তু প্রশস্তা দশ রাত্রয়ঃ॥ ৩।৪৭।

আদ্য চারি রাত্রি, একাদশী রাত্রি ও ত্রয়োদশী রাত্রি, এই ছয় রাত্রি পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট দশ রাত্রি স্ত্রীগমনে প্রশস্ত।

এই স্থানে "সমে যজেত" স্মরণ রাখিবে। এই দশ রাত্রির প্রতি রাত্রিতেই স্ত্রীগমন করিতে হইবে, না করিলে দোষ হয়, এমন কথা নয়। তাহার পর শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

যুগ্মাসু পুত্রা জায়ন্তে স্ত্রিয়োঽযুগ্মাসু রাত্রিষু।
তস্মাদ্ যুগ্মাসু পুত্রার্থী সংবিশেদার্ত্তবে স্ত্রিয়ম্॥ ৩। ৪৮

যুগ্মরাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে পুত্রসন্তান এবং অযুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীগমন করিলে কন্যা সন্তান জন্মে। সুতরাং পুত্রার্থী ব্যক্তি যুগ্মরাত্রিতেই ঋতু কালে স্ত্রীগমন করিবে। পুত্রার্থীর পক্ষে যুগ্মরাত্রি ভিন্ন অযুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রীগমন অনিয়ম বলিয়া সিদ্ধ হইল। ঋতুকালের প্রত্যেক যুগ্ম রাত্রিতেই স্ত্রীগমন করিবে, এমন কথা নয়।

সনাতন আর্য্যধর্ম্ম ইন্দ্রিয় সংযমের ধর্ম্ম। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিয়া পশুত্ব লাভের জন্য নহে। তাহা বিশদ রূপে হৃদয়ঙ্গম করাতেই মনু যে বিধি করিয়াছেন, তাহা শুনুন।

নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্।
ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥ ৩। ৫০।

নিন্দিত (ছয়) রাত্রি, এবং অন্য অষ্ট রাত্রি এই রূপে চতুর্দ্দশ রাত্রি পরিত্যাগ করিয়া ঋতুকালে অবশিষ্ট দুই রাত্রির অধিক যে ব্যক্তি স্ত্রীগমন না করেন, তিনি যেখানে সেখানে থাকুন, অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও তিনি ব্রহ্মচারী। আর দেখুন, যদি এই দুই রাত্রিতে অমাবস্যা, অষ্টমী, পৌর্ণমাসী ও চতুর্দ্দশী তিথি হয়, তবে স্ত্রীগমন নিষিদ্ধ।

অমাবাস্যামষ্টমীঞ্চ পৌর্ণমাসীং চতুর্দ্দশীম্।
ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যমপ্যৃতৌ স্নাতকো দ্বিজঃ॥ ৪। ১২৮

---

* নিন্দ্যাস্বষ্টাসু চান্যাসু স্ত্রিয়ো রাত্রিষু বর্জ্জয়ন্।
ব্রহ্মচার্য্যেব ভবতি যত্র তত্রাশ্রমে বসন্॥ মনু ৩।৫০

"স্নাতক, গৃহস্থ, দ্বিজ (হিন্দু) স্ত্রীর ঋতুকালে অমাবস্যা অষ্টমী, পূর্ণিমা, ও চতুর্দ্দশী এই কয়েক তিথিতে ইন্দ্রিয় সংযম করিবেন।" অরজস্কা-গমনকারীরা বলেন যে, হিন্দুধর্ম্মটা শুধু কামরিপু সেবার জন্য, অরজস্বলা অবস্থায়ও স্ত্রীকে নিষ্কৃতি দিবে না, স্ত্রীর প্রথম ঋতুকাল হইতে আরম্ভ করিয়া কোন ঋতুকাল যেন স্ত্রীগমনে বাদ না যায়, শুচি অশুচি যেন বিচার করা না হয়, যুগ্মাযুগ্ম রাত্রি যেন মনে না পড়ে, ইন্দ্রিয় সংযম করিবে, এই বিধি যেন গৃহস্থের জন্য শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই। তাহাদের মতে শুধু ইন্দ্রিয় সেবার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র। কিন্তু শুনুন, মনু কি বলিতেছেন,—

যস্মিন্নৃণং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যং শ্নুতে।
সএব ধর্ম্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান বিদুঃ॥ ৯।১০৭

যে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃঋণ হইতে মুক্তি ও মোক্ষলাভের অনন্ত উপায়, সেই জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মজ পুত্র। পণ্ডিতেরা অপর পুত্রদিগকে "কামজ" পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পঞ্চদশ বর্ষ হইতে অন্ততঃ চত্বারিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত ঋতু হয়। ২৫ বর্ষে ৩০০ বার ঋতুকাল উপস্থিত হয়। এই ৩০০ ঋতুকালে ৩০০০ প্রশস্ত রাত্রি। তন্মধ্যে ১৫০০ যুগ্ম রাত্রি। পিতৃঋণ পরিশোধ ও মোক্ষ লাভের উপায় স্বরূপ একটী মাত্র ঔরস পুত্র জন্মিবার আবশ্যক। ঔরস পুত্র না হইলেও দত্তক পুত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই ইন্দ্রিয়-সংযমের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কি আমাদের এই অধোগতি হইল যে, অরজস্কা অবস্থায়ই দুহিতাকে জামাতার পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিতে না পাঠাইলে সমাজে নিন্দার ভাগী হইব? পুত্রকামী না হইয়া স্ত্রীগমন করিবে না; ঋতুকাল ভিন্ন অপর সময়ে স্ত্রীগমন করিবে না, স্বদার অতিক্রম করিবে না; কোনও ঋতুকালে অর্থাৎ কোনও মাসে দুই রাত্রির অধিক স্ত্রীগমন করিবে না, মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে সংলোকের পক্ষে এই ব্যবস্থা। আজ সেই ধর্ম্ম বিকৃত করিয়া আমরা সমাজে কি পশ্বাচারই প্রচলিত করিয়াছি! ঋতুমতী ও অনৃতুমতী বিচার করিবে না, কোনও ঋতুকাল পরিত্যাগ করিবে না, কোনও রাত্রি পরিত্যাগ করিবে না, স্ত্রীর রোগ, শোক, শারীরিক মানসিক দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিবে না। একটা সামান্য ষণ্ড বা শূকরের যে বিচার আছে, অনেক মহাত্মা নরপতির সেই বিচার নাই, আবার এই মহাশয় ব্যক্তিরাই নির্লজ্জ ভাবে বলিয়া থাকেন, মহর্ষি মনুর ধর্ম্মশাস্ত্রই এই পাশব কাণ্ডের নিয়ম বিধি বহিয়াছে। হা ধর্ম্ম!!

শ্রীশ্রীনাথ দত্ত।

ফুলরেণু।

প্রেতযোনি।

পাঁচটী বছর আজ—দীপ্ত দিবালোকে
যাকে মেখে দেখিয়াছি—কভু স্বপ্ন নয়।
শারদ সন্ধ্যার শোভা উষার আলোকে
দেখেছি সে দেবতার নব অভ্যুদয়।
পাঁচটী বছর আজ—আজো দেখি তারে
অবিকৃত সেই মূর্ত্তি সেই রূপ রাশি,
অধর দু'খানি ঢেউ লোহিত সাগরে,
সুধার জোয়ারে তার প্রাণ যায় ভাসি।
কিন্তু সে কেন যে আজ কাছে নাহি আসে,
একি তবে সে কি নহে আর কোন্ জন?
অথবা "আরেক আমি" দেখিয়া তরাসে,
সবলা সভয়ে বুঝি করে পলায়ন?
কি জানি কেমন মনে লাগিছে সন্দেহ,
আমরা কি আগেকার 'প্রেতযোনি' কেহ?

পত্র।

নেও পত্র ফিরে নেও নাহি চাহি আর,
অগ্নিময় উপেক্ষায় পূর্ণ প্রতি কথা,
পদাঘাতে করিয়াছ প্রেম প্রত্যাহার,
ফিরে নেও ফিরে নেও দগ্ধ-আত্মীয়তা!

স'রে যাই—চলে যাই দূর পরবাসে,
আর না করিব তব দৃষ্টি কলুষিত,
আর না করিব বায়ু বিষাক্ত নিশ্বাসে,
অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসী পাপী কদাচিৎ।
জীবন আমার চির-দগ্ধ-চিতাভূমি,
আমার সম্বল আহা চির অশ্রুজল,
আবার দু'ফোঁটা অশ্রু বাড়াইলে তুমি,
ঝরিবে যাবৎ বাঁচি—নিত্য অবিরল।
বেঁচে থাক, সুখে থাক—এই শেষ কথা,
ফিরে নেও, ফিরে নেও দগ্ধ আত্মীয়তা।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। প্রসূতি—শ্রীরাসমোহন দাস গুপ্ত প্রণীত, মূল্য ।৶০ আনা। কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী দ্বারা প্রকাশিত। বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের ধাত্রীশিক্ষা বঙ্গদেশের আপামর সাধারণের মহা উপকার সাধন করিয়াছে। রাসমোহন বাবুর "প্রসূতিও" এই শ্রেণীর গ্রন্থ। প্রসূতিতে সন্তান পালন, রোগনির্ণয়, ঔষধ ও পথ্যের নিয়ম এবং প্রসূতির অবশ্য পালনীয় বিধি ব্যবস্থা সরল ভাষায় অতি পরিষ্কার রূপে লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তক দ্বারা ডাক্তারের সাহায্য ভিন্নও প্রসূতি এবং সন্তান চিকিৎসিত হইতে পারে। পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে।

২। অশোকা—(উপন্যাস) শ্রীমতী "বনলতা," "নীহারিকা"ও 'আর্য্যাবর্ত্ত,' রচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ।০ আনা। গ্রন্থকর্ত্রী নব্যভারত পাঠকের নিকট অপরিচিত নহেন। ইনি এক জন ভাল কবি, কিন্তু ভাল কবি হইলেই যে ভাল উপন্যাস লিখিতে পারেন, গ্রন্থ পাঠে সে পরিচয় পাওয়া গেল না।

৩। হৃদস্রোত—শ্রীকালীহর বসু প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কবিতায় গ্রন্থ খানি পূর্ণ। লেখক বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন "এই পুস্তকে ছন্দের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয় নাই।" বাস্তবিক তাই বটে, পুস্তক পাঠের সময় গদ্য কি পদ্য পড়িতেছি, ঠিক করা যায় না। গ্রন্থকারের বোধ হয় এই প্রথম উদ্যম,—এরূপ নব উদ্যমপ্রসূত ফল লোকচক্ষুর গোচরে না আনিলেই ভাল হইত। কবিতাগুলির মধ্যে "ভাতৃবধূর প্রতি" কবিতাটির ভাব ভাল হইয়াছে। "সীতা হরণে লক্ষ্মণের খেদোক্তি" লিখিতে গিয়া গ্রন্থকার কেমন একটা বিকৃত ভাবের পরিচয় দিয়াছেন।

৪। বক্তৃতা—কুমার শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন পরিব্রাজকের বক্তৃতার সার সংগ্রহ। শ্রীভূদেব কবিরত্ন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। বারাণসী ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। মূল্য ।৶০ আনা। কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বক্তা। তাঁহার বক্তৃতাগুলি এরূপে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্ত্তমান পুস্তকে "তৃষ্ণার জল" এবং "অন্ধের যষ্টি" নামক যে দুইটী বক্তৃতার সারাংশ লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া আমরা সাতিশয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের সহিত স্থানে স্থানে অমিল থাকা সত্ত্বেও একথা আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি যে, হিন্দু কি মুসলমান,

লোক কি খ্রীষ্টান, সকল শ্রেণীর ধর্ম্মার্থীর নিকটই এ পুস্তক আদরনীয় হইবে। তর্কাস্ত্রে জগৎ জিত হয় না, ভাবময় ভক্তি কথায় সকলেরই মন গলিয়া যায়। এ পুস্তকে দুইই আছে, ভাষার লালিত্য আছে এবং ভগবদ্ভক্তি পূর্ণ ভাবোচ্ছ্বাস আছে।

৫। পুনর্জ্জন্ম আছে কি না? শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন প্রণীত। কুঞ্জ বাবু অতি সংক্ষেপে এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে গুটিকত যুক্তিযুক্ত কথা লিখিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন, বেশ ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে। ক্ষুদ্র পুস্তকে যাহা আশা করা যায়, এ পুস্তকে তাহা আছে।

৬। রমণী—সমর্থক্লোয় প্রেস হইতে প্রকাশিত। এখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই, তিনি যিনিই হউন, কবিতা লিখিবার তাঁহার ক্ষমতা আছে। পুস্তকের নামটি "রমণী" না দিয়া "প্রেমিকার প্রতি প্রেমিকের উক্তি" হইলেই ভাল হইত।

৭। বন-প্রসূন—শ্রীরাখাল চন্দ্র মিত্র কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত, মূল্য /০ আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে দুটী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধ দুটির ভাব মন্দ নয়, কিন্তু ভাষাতে ছাত্র-সুলভ ভাবের গন্ধ পাওয়া যায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ অতি বিনীত ও শান্তভাবে লেখা কর্ত্তব্য।

৮। শৈলজা—বাবল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত। এ খানি সামাজিক নাটক। বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে বিবাহ-পণ প্রথা কি কুফল ফলিতেছে এই নাটকে তাহা অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। বৈচিত্র্য লইয়াই নাটককারের কবিত্ব, এ নাটক-লেখক তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। শৈলজাকে দেখিলে হৃদয় ব্যথিত হয়, চক্ষে জল আইসে, আবার অর্থপিশাচ কুলাভিমানী চণ্ডাল প্রকৃতির বাম সাধনকে দেখিলেই অবিমিশ্র ঘৃণার উদ্রেক হয়। সামান্য সামান্য দোষ থাকিলেও চরিত্র-অঙ্কন কার্য্যে লেখকের খুব পটুতা আছে।

৯। শিশুপালন—ডাক্তার বিনোদবিহারী রায়কর্তৃক প্রণীত, রাজসাহী বিনোদ প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ।/০ আনা। আয়ুর্ব্বেদ মতে কিরূপে শিশুপালন করিতে হয়, এ গ্রন্থে তাহা সংক্ষেপে সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১০। সত্য-সবলা—শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। এখানি নাটক, কিন্তু প্রকৃত নাটকত্ব এ গ্রন্থে দুর্লভ। এ পুস্তক নভেলের আকারে লিখিত হইলেই সুবুদ্ধির কাজ হইত।

১১। কণ্ঠহার—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ পাইন প্রণীত। মূল্য ১৲। গ্রন্থকার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন, এ গ্রন্থ তাঁহার প্রথম উদ্যমের ফল। প্রথম চেষ্টা বলিয়া, এ পুস্তকের কঠোর সমালোচনার প্রয়োজন না থাকিলেও, এ কথা বলা আবশ্যক যে, এ উপন্যাস পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই। ভাষা ভাবের দাসী। ভাব-শূন্য ভাষা কামান বন্দুকের আওয়াজের মত কার্য্যকরী নহে। এ পুস্তকে ভাষা আছে ভাব নাই, বীরত্বের কথা আছে, বীরত্ব নাই, অনেকগুলি চিত্র আছে, বৈচিত্র্য নাই। তার উপর স্থানে স্থানে অনুকরণ দোষও ঘটিয়াছে।

১২। জন্মএয়োস্ত্রী—শ্রীস্বননাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। এখানি নাটক। কুরুচির ভাণ্ডার এ পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি নাই।

১৩। ভগ্নতরী।—এম্ এম মজুমদার কর্তৃক ৫৫ নং কালেজ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। এখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। গ্রন্থকারের ইহা প্রথম উদ্যম, সুতরাং নাম দেন নাই। কবিতার বিষয়গুলি ভালই নির্ব্বাচন করিয়াছেন এবং সুরুচিসম্মত হইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য মহৎ ও সাধু। কালে ভাল লেখক হইলে, তাঁহার লেখনী অনেক সুফল প্রসব করিবে।

হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আহার্য্য, পরিধেয় ও গৃহোপযোগী দ্রব্য।

কৃষির মধ্যে যব ও গোধূমের প্রচুর চাস হইত এবং এই গুলিই প্রধান আহার্য্য-বস্তু ছিল। যে নামে শস্যগুলির পরিচয় ঋক্‌-বেদে পাওয়া যায়, আধুনিক সংস্কৃতে তাহা ভিন্নার্থে প্রযোজিত হয়। সুতরাং তৎ-কালীন শস্যের নির্ণয় করা একটু কঠিন ব্যাপার। আধুনিক সংস্কৃতে যব শব্দে শুধু যব বুঝায় পুরাকালে যব গোধূমাদি সমস্ত খাদ্য (Grains) বুঝাইত। ধান্য শব্দে ঋগ্বেদে ভাজা যব হইতে প্রস্তুত খাদ্য বিশেষ বুঝাইত। দেবতাদিগকে ইহা নৈবিদ্য দেওয়া হইত। ঋগেদে ব্রীহির (চাউলের) উল্লেখ নাই।

ঋগ্বেদে যবাদি হইতে প্রস্তুত পক্তি, পুরোডাশ, অপূপ ও করম্ভ প্রভৃতি নানা প্রকার পিষ্টকের উল্লেখ আছে। এই সক-লই দেবতাদিগকে নিবেদন করা হইত। "হে ইন্দ্র। তুমি ভৃষ্ট যবযুক্ত, দধিমিশ্রিত সক্তুযুক্ত, পিষ্টকযুক্ত ও উক্‌থবিশিষ্ট আমাদের (সোম) প্রাতঃ সেবনে গ্রহণ কর। হে ইন্দ্র, পক্ব পুরোডাশ গ্রহণ কর।"

পঞ্জাবের আর্য্যেরা যে সেই প্রাচীন সময়ে মাংস ভোজন ও দেবতা-দিগকে ভোজনার্থ মাংস প্রদান করি-তেন, তাহা অনায়াসেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে। গাভী, মহিষ ও বলীবর্দ্দাদির মাংস রন্ধনের প্রণালী ও যজ্ঞে প্রদান করিবার কথা অনেক স্থানে পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ৬১ সূক্তে আছে "১২। হে ইন্দ, তুমি এই বৃত্রকেই বজ্রপ্রহার কর, গরুর ন্যায় বৃত্রের শরীরের সন্ধিগুলি তির্য্যক্ অবস্থিত বজ্র দ্বারা কর্ত্তন কর।" দ্বিতীয় মণ্ডলের সপ্তম সূক্তে বলিয়াছে, "৫। হে অগ্নি। তুমি আমাদিগের। তুমি বন্ধ্যাগাভী ও বৃষ ও গর্ভিনী গাভী সকলের দ্বারা আহুত হইয়াছ।" পুনশ্চ পঞ্চম মণ্ডলের ২৯ সূক্তে আছে; "৭। ইন্দ্রের মিত্রভূত অগ্নি শীঘ্রই ইন্দ্রের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য সকল তিন শত মহিষ পাক করিলেন। ৮। হে ইন্দ্র। তুমি তিন শত মহিষের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলে।" পুনরপি ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ১৭ সূক্তে আছে "১১। হে ইন্দ্র। তোমার জন্য পূষা ও বিষ্ণু শত মহিষ পাক করুন।" এই মণ্ডলের ১৬ সূক্তে আছে, "৪৭। হে অগ্নি। আমরা তোমাকে হৃদয় দ্বারা সংস্কৃত ঋক্‌ রূপ হব্য প্রদান করিতেছি। আমাদের বৃষভ ও ধেনুগণ তোমার নিকট পূর্ব্বোক্তরূপ হব্য হউক।" ২৮ সূক্তে আছে "৪। রেণু সকলের উত্থা-পনকারী সামরিক অশ্ব * * যেন যজ্ঞে বিশসনাদি (বলিদানাদি) সংস্কার প্রাপ্ত না হয়।" অপরন্তু দশম মণ্ডলের ২৭ সূক্তে আছে "২। হে ইন্দ্র। তোমার নিমিত্ত পুরোহিতদের সহিত একত্র স্থূলকায় বৃষকে পাক করি।" ২৮ সূক্তে আছে "৩। হে ইন্দ্র! * * * তাহারা বৃষভ পাক করে; তুমি তাহা ভোজন কর।"

দশম মণ্ডলের ৮৯ সূক্তে গোহত্যা স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে। "১৪। যেরূপ গোহত্যাস্থানে গাভীগণ হত হয়, তদ্রূপ তোমার এই অস্ত্রের দ্বারা নিহত হইয়া বন্ধুদ্বেষী রাক্ষসগণ পৃথিবীতে পতিত হইয়া শয়ন করে।" গোহত্যা প্রথা বিশেষ রূপ প্রচলিত না থাকিলে তজ্জন্য ভিন্ন স্থান নির্দ্ধারিত থাকা সম্ভব নহে। ৫১ সূক্তে আছে "১৪। যে অগ্নির উদর বিস্তর ঘোটক, বলবান বৃষ, পুরুষত্ব-বিহীন মেষ আহুতিরূপে অর্পণ করা হইয়াছে, * * * সেই অগ্নির উদ্দেশে মনে মনে চিন্তা করিয়া এই সুন্দর স্তব রচনা করিতেছি।" গোবধ, অশ্ববধ ও মেষবধের প্রমাণ রহিয়াছে। অশ্বভোজনের উল্লেখ অতি কদাচিত পাওয়া যায়। বোধ হয়, আর্য্যহিন্দুরা মধ্য এসিয়া হইতে এই রীতি লইয়া পঞ্জাবে আসিয়াছিলেন, কিন্তু এখানে আসিলে তাহা এক রকম উঠিয়া যায়। অপ্রাচীনতম সময়ে দিগ্বিজয় করিয়া সম্রাট মহারাজ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিতে হইলে অশ্ববধ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইত। প্রাচীন সময়ে যাগ পূর্ব্বক অশ্বমাংস ভোজনের যে নিয়ম ছিল, তাহা রহিত হইয়াই যে অবশেষে প্রতাপশালী নৃপতি-বর্গের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অপ্রাচীন সময়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ উপলক্ষে যে আড়ম্বরপূর্ণ ক্রিয়া-কাণ্ড প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, বৈদিকযুগে তাহার কিছুই প্রচলিত ছিল না।

বৈদিক সময়ে অশ্বমেধ যজ্ঞ যে প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইতে, ঋগ্বেদে প্রথম মণ্ডলে ১৬২ সূক্তে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ হইলেও নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

"১। যেহেতু আমরা যজ্ঞে দেবজাত দ্রুতগতি অশ্বের বীরকর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি। অতএব মিত্র বরুণ, অর্য্যমা, আয়ু, ইন্দ্র, ঋভুক্ষা এবং মরুৎগণ যেন আমাদিগের নিন্দা না করেন।

"২। সুন্দর স্বর্ণাভরণে বিভূষিত অশ্বের সম্মুখে (ঋত্বিকগণ) উৎসর্গার্থ ছাগ ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। বিবিধ বর্ণ ছাগ শব্দ করতঃ তদভিমুখে গমন করিতেছে, উহা ইন্দ্র ও পূষার প্রিয় অন্ন হউক।

"৩। সকল দেবতার উপযুক্ত ছাগ পূষারই ভাগে পড়ে, উহাকে দ্রুতগতি অশ্বের সহিত সম্মুখে আনা হইতেছে। অতএব দেবতাগণের মহাভোজনের নিমিত্ত অশ্বের সহিত এই অজ হইতে সুখাদ্য পুরোডাশ প্রস্তুত করুন্।

"৪। যখন ঋত্বিকগণ দেবতাগণের লভ্য হবির্যোগ্য অশ্বকে প্রতি ঋতুতে তিন বার অগ্নির নিকট লইয়া যায়, সেই সময় পূষার প্রথম ভাগের ছাগ দেবতাগণকে যজ্ঞের কথা জ্ঞাপন করিয়া অগ্রে গমন করে।

"৬। যাঁহারা যূপ বৃক্ষচ্ছেদন করে, যাহারা যূপবৃক্ষ বহন করে, যাহারা অশ্বযূপের জন্য চষাল (যূপাগ্রভাগ) প্রস্তুত করে, যাহারা অশ্বের জন্য পাত্র সংগ্রহ করে, আমাদের সঙ্কল্পই যেন তাহাদের সঙ্কল্প হয়।

"৭। আমাদের মনোরথ আপনিই সিদ্ধ হউক, মনোহর পৃষ্ঠবিশিষ্ট অশ্ব দেবতাগণের আশা পূরণার্থ আগমন করুক। দেবতাগণের পুষ্টির জন্য আমরা উহাকে উত্তমরূপ বন্ধন করিব, মেধাবী ঋত্বিকগণ আনন্দিত হউন।

"৮। যে রজ্জু দ্বারা অশ্বের গ্রীবা বদ্ধ হয়, যাহার দ্বারা উহার পদ বদ্ধ হয়, যে রজ্জু উহার মস্তকে বদ্ধ থাকে, সেই রজ্জু সকল এবং উহার মুখে যে ঘাস নিক্ষেপ্ত হয়, সে সমস্তই দেবগণের নিকট গমন করুক।

"৯। অশ্বের অপক্ক মাংসের যে অংশ মক্ষিকা ভক্ষণ করে, ছেদন কালে বা পরিষ্কার করিবার সময় ছেদন ও পরিষ্কার সাধন অস্ত্রে যাহা লিপ্ত হয়, ছেদকের হস্ত দ্বয়ে এবং নখে যাহা লিপ্ত থাকে, সে সমস্তই দেবগণের নিকট গমন করুক।

"১০। উদরের যে অজীর্ণ তৃণ বাহির হইয়া যায়, অপক্ক মাংসের যে লেশ মাত্র থাকে, ছেদন কর্ত্তা তাহা নির্দ্দোষ করুন, এবং পবিত্র মাংস দেবতাগণের উপযোগী করিয়া পাক করুন।

"১১। হে অশ্ব। অগ্নিতে পাক করিবার সময় তোমার গাত্র হইতে যে রস বাহির হয়, এবং যে অংশ শূলে আবদ্ধ থাকে, তাহা যেন ভূমিতে পড়িয়া না থাকে, এবং তৃণের সহিত মিশ্রিত না হয়। দেবতারা লালায়িত হইয়াছেন, সমস্তই তাঁহাদিগকে প্রদান করা হউক।

"১২। যাহারা চারিদিক হইতে অশ্বের পাক দর্শন করে, যাহারা বলে উহার গন্ধ মনোহর হইয়াছে, এখন নামাও, এবং যাহারা মাংস ভিক্ষা জন্য অপেক্ষা করে, তাহাদিগের সঙ্কল্প আমাদিগেরই সঙ্কল্প হউক।

"১৩। যে কাষ্ঠ দণ্ড মাংস পাক পরীক্ষার্থ ভাণ্ডে দেওয়া যায়, যে সকল পাত্রে রস (ঝোল) রক্ষিত হয়, যে সকল আচ্ছাদন দ্বারা উষ্ণতা রক্ষিত হয়, যে বেতস শাখা দ্বারা অশ্বের অবয়ব প্রথমে চিহ্নিত করা হয়, এবং যে ছুরিকা দ্বারা (পরে এই চিহ্ন অনুসারে অবয়ব কর্ত্তিত হয়) ইহারা সকলেই অশ্বের মাংস প্রস্তুত করিতেছে।

"১৪। যে স্থানে অশ্ব গমন করিয়াছিল, যেস্থানে উপবেশন করিয়াছিল, যেস্থানে লুণ্ঠন করিয়াছিল, যাহাদ্বারা উহার পদ বদ্ধ হইয়াছিল, যাহা সে পান করিয়াছিল, এবং যে ঘাস আহার করিয়াছিল, সে সমস্তই দেবতাগণের নিকট গমন করুক।

"১৫। হে অশ্বগণ, অগ্নি যেন তোমাকে শব্দ করাইতে না পারে, অত্যন্ত অগ্নি সংযোগে প্রতপ্ত সুগন্ধী ভাণ্ড যেন চলিত না হয়। (যজ্ঞের) জন্য অভিপ্রেত, (হোমের) জন্য আনীত সম্মুখে প্রদত্ত বষটকার দ্বারা শোভিত অশ্ব দেবগণ গ্রহণ করুন।

"১৬। অশ্বকে যে আচ্ছাদন-যোগ্য বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা যায়, উহাকে যে হিরণ্ময় আভরণ সকল প্রদান করা যায়, যদ্দারা তাহার মস্তক ও পাদ বদ্ধ করা যায়, এই সকল বস্তু দেবতাগণের প্রিয়। ঋত্বিকগণ দেবগণকে এই সকল প্রদান করিতেছেন।

"১৬। হে অশ্ব! তুমি সবলে নাসাধ্বনি করতঃ গমনে বিরত হইতে কশাঘাত দ্বারা অথবা তোমার পার্শ্ব দেশে পদাঘাত দ্বারা যে ব্যথা উৎপন্ন হইয়াছিল, যজ্ঞে স্রুক দ্বারা যে হব্য প্রদত্ত হয়, সেই রূপ মন্ত্র দ্বারা তোমার সেই সমস্ত ব্যথা আহুতি প্রদান করি।

"১৮। দেবতাগণের বন্ধু স্বরূপ অশ্বের বক্রীভূত চতুস্ত্রিংশৎ পার্শ্বাস্থি ছেদনের জন্য স্বধিতি (খড়্গ) গমন করিতেছে। (হে অশ্ব-ছেদক!) এরূপ বুদ্ধি প্রকাশ কর যেন

ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গগুলি ছিন্ন হইয়া না যায়; লক্ষ করিয়া ও দেখিয়া দেখিয়া ছেদন কর।

"১৯। ঋতুই তেজঃপুঞ্জ অশ্বের একমাত্র বিনাশকর্ত্তা এবং দুইজন তাহাকে ধারণ করেন। হে অশ্ব! তোমার শরীরের যে অবয়ব সকল যথাকালে কর্ত্তন করি, তাহা পিণ্ডাকারে অগ্নিতে প্রদান করি।

"২০। হে অশ্ব! যখন তুমি দেবতাদের নিকট গমন কর, তখন তোমার প্রিয় দেহ যেন তোমাকে ক্লেশ না দেয়। স্বধিতি তোমার অঙ্গে যেন অধিক ক্ষণ না থাকে। মাংসলোলুপ ও অনভিজ্ঞ ছেদক অস্ত্র দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ গুলি অতিক্রম করিয়া তোমার গাত্র যেন বৃথা ছিন্ন না করে।

"২১। হে অশ্ব! তুমি মরিতেছ না, অথবা লোকে তোমায় হিংসা করিতেছে না; তুমি উত্তম পথে দেবতাগণের নিকট গমন করিতেছ। ইন্দ্রের হরি নামক অশ্বদ্বয়, এবং মরুৎগণের পৃষতীনামক বাহন দ্বয়, তোমার রথে যোজিত হইল। অশ্বিদ্বয়ের বাহন রাসভের পরিবর্ত্তে কোন দ্রুতগতি অশ্ব তোমার রথে সংযুক্ত হইবে।

"২২। এই অশ্ব আমাদিগকে গো ও অশ্ববিশিষ্ট জগৎপোষক ধন প্রদান করুন, আমাদিগকে পুরুষ অপত্য প্রদান করুক, তেজস্বী অশ্ব আমাদিগকে পাপ হইতে বিরত করুক। হবির্ভূত অশ্ব আমাদিগকে শারীরিক বল প্রদান করুক।"

বৈদিক সময়ে সোমরস ভিন্ন অন্য কোন মাদক দ্রব্য পান করা হইত না। প্রাচীন আর্য্যেরা সোমরসের ভক্ত ছিলেন। ভারতবর্ষে সোম নামে, আর ইরাণে 'হওম' নামে ইহার স্তব পর্য্যন্ত হইত, এবং ঋগ্বেদের একটী সমগ্র মণ্ডল এই সোমের স্তুতিতে পরিপূর্ণ। ভারতের তেজস্বী আর্য্যেরা ইরাণের শান্তিপ্রিয় আর্য্যদের অপেক্ষা এই মাদক সোমরসের বিশেষ আদর করিতেন, এবং ইরাণীয় জেন্দাভেস্তাতে ভারত-আর্য্যদের এই ঘৃণিত সোম-রসাসক্তির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ রহিয়াছে। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত মনে করেন যে, এই সোমরসানুরক্তিই ভারত-আর্য্য ও ইরাণি আর্য্যের (দেব ও অসুরের) বিচ্ছেদের প্রধান কারণ।

যে প্রণালীতে সোমরস প্রস্তুত হইত, নবম মণ্ডলের ৬৬ সূক্তে এবং অপরাপর সূক্তে তাহার বিস্তর বর্ণনা রহিয়াছে। এস্থলে প্রথমোক্ত সূক্তের কতিপয় ঋকের অনুবাদ করিতেছি।

"২। হে সোম! তোমার যে দুইটী পত্র বক্রভাবে অবস্থিত ছিল, তদ্দ্বারা তোমার সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার শোভা হইয়াছিল।

"৩। হে সোম! তোমার চতুর্দ্দিকে লতা অবস্থায় যে সকল পত্র বিদ্যমান, তদ্দ্বারা তুমি তাবৎ ঋতুতে সুশোভিত ছিলে।

"৭। হে সোম! তোমাকে নিষ্পীড়ন করা হইয়াছে, তুমি আনন্দ বিধান করিতে করিতে ধারারূপে ইন্দ্রিয়ের দিকে যাও এবং অক্ষয় আহার বিতরণ কর।

"৮। সাতটি স্ত্রীলোক অঙ্গুলিদ্বারা তোমাকে চালনা করিতে করিতে এক স্বরে তোমার বিষয়ে গান করিল, তাহারা কহিল যে, তুমি যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির যজ্ঞ স্থলে সকল কার্য্য স্মরণ করাইয়া দাও।

"৯। যখন তুমি শব্দ করিতে করিতে জলের সহিত মিশ্রিত হও, তখন কয়েকটী অঙ্গুলি একত্র হইয়া মেষলোমের উপর তোমাকে শোধন করিতে থাকে, তৎ-

কালে তোমার ফেণা বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং মেষ লোম হইতে শব্দ উঠিতে থাকে।

"১০। হে সৎ কর্ম্মশালী ও বলশালী সোম! যখন তুমি ক্ষরিত হও, তখন তোমার ধারাগুলি এরূপভাবে বহিতে থাকে, যেরূপ ঘোটকগণ খাদ্য আহরণ করিবার অভিপ্রায়ে ধাবিত হইয়া থাকে।

"১১। কলসের উপর মেষলোম সংস্থাপন পূর্ব্বক অঙ্গুলিবর্গ সুমধুর রসের ক্ষরণকারী সোমকে পুনঃ পুনঃ চালিত করিতে লাগিল।

"১২। সোমরসগুলি কলসের মধ্যে সেইরূপ অন্তর্হিত হইয়া গেল, যেমন নবপ্রসূত গাভীগণ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে।

"১৩। হে সোম। যখন তুমি ক্ষীর প্রভৃতি বস্তুর সহিত মিশ্রিত হও, তৎকালে জলপ্রবাহিত হইয়া বিলক্ষণ শব্দ করিতে করিতে তোমার দিকে যাইয়া থাকে।

"২৯। এই যে সোমরস, ইনি গোচর্ম্মের উপর প্রস্তরের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, ইনি আনন্দ লাভের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছেন।"

সিদ্ধিসেবক মহাশয়েরা যে প্রণালীতে সিদ্ধি প্রস্তুত করেন, উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, সোমরস ও তদ্রূপ প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া দুগ্ধের সহিত পীত হইত। ঋগ্বেদের কবিগণ সোমরসের মাহাত্ম্য ও গুণগান করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহাদের তাদৃশ বর্ণনা হইতে অনেক পৌরাণিক উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছে। নবম মণ্ডলের ১০৮ মন্ত্রে আছে "৩। হে সোম! তোমার উজ্জ্বল কিছুই নাই। তুমি যখন ক্ষরিত হও, তখন দেবতাবংশজাত তাবৎ ব্যক্তিকে অমরত্ব দিবার নিমিত্ত আহ্বান করিতে থাক।" ১১০ মন্ত্রে আছে "৮। প্রশংসিত সোম প্রাচীন কাল হইতে দেবতাদের পেয়বস্তু হইয়াছেন। স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হইতে তাঁহাকে দোহন করা হইয়াছিল। ইন্দ্রের উদ্দেশে তিনি প্রস্তুত হইলেন, তখন তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিল।" পুনরপি ১১৩ মন্ত্রে আছে "৭। যে ভুবনে সর্ব্বদা আলোক, যে স্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত আছে, হে ক্ষরণশীল। সেই অমৃত ও অক্ষয়ধামে আমাকে লইয়া চল। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।"

নবম মণ্ডলে এইরূপ ঋক্ অনেক রহিয়াছে। কে ভাবিয়াছিল যে, ঋগ্বেদের এই সামান্য সোমরস বর্ণনা হইতে পৌরাণিক সমুদ্র মন্থন ও অমৃত উৎপত্তির উপাখ্যান সৃষ্টি হইয়াছে? সোমরস দেবগণের প্রাচীন পানীয় দ্রব্য, স্বর্গধামের নিগূঢ় স্থান হইতে সোমকে দোহন করা হইয়াছে। ঋগ্বেদে আকাশকে জলীয় বলিয়া বিশ্বাস করিত, এবং অনেক সময় সমুদ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপে ভাবময়ী কল্পনার সাহায্যে সমুদ্র হইতে অমৃত মন্থনরূপ পৌরাণিক গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্র হইতে বোধ হয় যে, তৎকালে অনেক প্রকার শিল্পপ্রণালীর বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। বস্ত্রবয়ন প্রথা অতি উত্তমরূপে প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোকেরা তানাপোড়েন সাহায্যে কাপড় প্রস্তুত করিত। *

* দ্বিতীয় মণ্ডলের ২ সূক্তে আছে "৬। আমাদের সাধু কর্ম্মকারের চিরপ্রথাখ্যা (অগ্নিরূপ) উষা ও নক্ত-বয়নকুশল রমণীদ্বয়ের ন্যায় সাহায্যার্থ পরস্পর সমাগমন করতঃ যজ্ঞের রূপ নির্ম্মাণার্থ পরস্পরকে অনুকূল্য করিয়া বিস্তৃত তন্তু বয়ন করিতেছেন।" উক্তমণ্ডলের ৩৮ সূক্তে আছে "৪। বস্ত্রবয়নকারিণী রমণীর ন্যায় রাত্রি পুনর্ব্বার আলোককে সম্যক্‌রূপে বেষ্টন করিতেছেন।"

ষষ্ঠ মণ্ডলের ৯ সূক্তে "আমি তন্ত (তানা-সূত্র) অথবা ওতু (পড়্যানসূত্র) জানি না, কিম্বা সতত চেষ্টাদ্বারা যে (বস্ত্র) বয়ন করে, তাহার কিছুই অবগত নহি।" যজ্ঞের তন্ত্র ও ওতু জানেন না বলিয়া ঋষি ভরদ্বাজ আক্ষেপ করিযাছেন। ১০ মণ্ডলের ২৬ সূক্তে আছে "৬। পূষাদেবই * মেষলোমের বস্ত্র বয়ন করেন; তিনিই বস্ত্র ধৌত করেন।"

বোধ হয়, সেই প্রাচীন সময়েও প্রত্যেক গ্রামে এক এক জন নাপিত ছিল, এবং প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের ৪৪ ঋকে অরণ্য-দাহ করিয়া ভূমি পরিষ্কার করাকে কি এক অর্থে ভূমি-কামান বলিয়া বর্ণনা আছে। † সূত্রধরের ব্যবসায়ও প্রচলিত হইয়াছিল, অনেক স্থানে রথ ও শকটের উল্লেখ রহিয়াছে। তৃতীয় মণ্ডলের ৫৩সূক্তে আছে, "১৯। রথের খদির কাষ্ঠের সারকে দৃঢ় কর, রথের শিশপা কাষ্ঠকে দৃঢ় কর। হে দৃঢ় ও আমাদের দৃঢ়ীকৃত অক্ষ! দৃঢ় হও, এই রথ হইতে আমা-দিগকে ফেলিয়া দিও না।" চতুর্থ মণ্ডলের ২।১৪ ঋকে রথের এবং ১৬ সূক্তের ২০ ঋকে ভৃগুগণ অর্থাৎ সূত্রধরগণের উল্লেখ আছে। স্বর্ণ, লৌহ, প্রভৃতি ধাতুরও প্রচলন ছিল। পঞ্চম মণ্ডলের নবমসূক্তে ৫ঋকে কর্ম্মকার-গণের ভস্ত্রাদি দ্বারা অগ্নিকে সংবর্দ্ধিত করিয়া অগ্নির তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধির বর্ণনা আছে, এবং ষষ্ঠ মণ্ডলের তৃতীয় সূক্তের ৪ ঋকে স্বর্ণকারের ধাতু দ্রবীভূত করিবার বর্ণনা রহিয়াছে।

বৈদিক সময়ের স্বর্ণালঙ্কার, লৌহযন্ত্র এবং যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র বর্ণনা হইতে তৎকালে কর্ম্মকার ও স্বর্ণকারাদির ব্যবসায়ের কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ভূয়োভূয়ঃ স্থলে এতাবৎ সম্বন্ধীয় বর্ণনা রহিয়াছে, কিন্তু আমরা যে কয়েকটী উদা-হরণ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতে তৎ-কালীন শিল্পাদির আভাস পাওয়া যাইবে। প্রথম মণ্ডলের ১৪০ সূক্তের ১০ ঋকে বর্ম্ম শব্দের প্রয়োগ আছে; দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩০।৪ ঋকে খৃগলাশব্দের ব্যবহার আছে, তাহার অর্থ তনুত্রাণ *। চতুর্থ মণ্ডলের ৫৩।২ ঋকে 'পিশঙ্গদ্রাপি' উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ হিরণ্ময় কবচ। আর উদাহরণ উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় মণ্ডলের ৩৪।৩ ঋকে সিপ্র শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে; ইহার অর্থ শিরস্ত্রাণ। † ৪র্থ মণ্ডলের ৩৪।৯ ঋকে অংসত্র নামে স্কন্ধকারী ঢাল বিশেষের উল্লেখ পাওয়া যায়। পঞ্চম মণ্ডলের ৫২।৬ ও ৫৪।১১ ঋকে ঋষ্টি নামক বল্লভ-অস্ত্রের বর্ণনা আছে। পঞ্চম মণ্ডলের ৫৭ সূক্তে আছে "২। হে সুবুদ্ধিমরুৎগণ! তোমাদিগের বাশী ‡ ও ঋষ্টি ও উৎকৃষ্ট ধনুক, বাণ, তূণীর, শ্রেষ্ঠ অশ্ব ও রথ আছে।" ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ২৭।৬ ঋকে ত্রিংশৎবর্ম্মী যোদ্ধার, ৪৬।১১ ঋকে পক্ষবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণাগ্র, দীপ্তবাণের এবং ৪৭।১০ ঋকে লৌহময় (খড়্গ) ধারার

---

* পূষা মেষপাল ও গোপালের দেবতা, তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি।

"৪। কেশবিশিষ্ট তিনজন (অগ্নি, আদিত্য ও বায়ু) সংবৎসরের মধ্যে যথাসময়ে ভূমি পরিদর্শন করেন। উহাদের মধ্যে একজন পৃথিবীকে কামাইয়া দেন, একজন নিজ কর্ম্ম দ্বারা পরিদর্শন করেন, আর এক জনের রূপ দৃষ্ট হয় না, কেবল গতি দৃষ্ট হয়।

* সায়ন।

† আধুনিক সিরপা বা শিরোভূষণ এই সিপ্র হইতে উৎপন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

‡ বাশী অস্ত্রবিশেষ সূত্রধরের বাইশের ন্যায় সুতো-পযোগী অস্ত্রবিশেষ।

উল্লেখ দেখিতেছি। এই ৪৭ সূক্তের ২৬ ঋকে যুদ্ধোপযোগী রথের এবং ২৯ ঋকে যুদ্ধ-দুন্দুভি বর্ণনা আছে। ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে যুদ্ধের সাজসজ্জা ও অস্ত্রশস্ত্রের যে বর্ণনা রহিয়াছে, আমরা পরবর্ত্তী কোন অধ্যায়ে তাহার অনুবাদ করিয়া দিব।

চতুর্থ মণ্ডলের ২। ৮ ঋকে "হেম্যাবান অশ্ব" হইতে অশ্বের সুবর্ণ নির্ম্মিত সজ্জার ব্যবহার ছিল, তাহা জানিতে পারি। চতুর্থ মণ্ডলের ৩৭। ৪, পঞ্চম মণ্ডলের ১৯। ৩ এবং অন্যান্য অনেক স্থলে নিষ্ক নামক স্বর্ণময় কণ্ঠাভরণের উল্লেখ আছে। ৫ মণ্ডলের ৫৩ সূক্তের ৪ ঋকে মারুৎগণের দীপ্তির সহিত অঞ্জি, বাশী, স্রক্, রুক্ম (বক্ষস্ত্রাণ) ও খাদির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। উক্ত মণ্ডলের ৫৪।১১ ঋকে পুনর্ব্বার "অংশে ঋষ্টি, পাদদেশে খাদি, বক্ষে রুক্ম এবং শিবে সিপ্রা" বা স্বর্ণ মুকুটের উল্লেখ দেখিতে পাই।

এই সকল উদ্ধৃত মন্ত্র হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যদ্ধাস্ত্র, সজ্জা ও আভরণাদির প্রস্তুত করণ শিল্পের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৮। ১৮ ঋকে দৃতি নামক চর্ম্মাধারের এবং পঞ্চম মণ্ডলের ৩০। ১৫ ঋকে অস্কর নামক লৌহ-কার্সের এবং অনেক স্থলে অয়োনির্ম্মিত পুরীর* উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ৪র্থ মণ্ডলের ৩০।২০ ঋকে এবং অন্যান্য মন্ত্রে শতসংখ্যক অশ্মময়ী (প্রস্তর নির্ম্মিতা) নগরীর কথা আছে।

যে সকল প্রস্তরময় ও পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রাচীন আর্য্যেরা স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তথাকার প্রস্তর হইতে অল্প পরিশ্রমে যে, স্থায়ী গৃহাদি প্রস্তুত করিতে তাঁহারা অতি অল্প সময় মধ্যে শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর গৃহাদি প্রস্তর প্রাচীর বেষ্টিত করিতেন, তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে পারি। গৃহনির্ম্মাণ প্রণালীর যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, দ্বিতীয় মণ্ডলের ৪১।৫ ঋকে এবং পঞ্চম মণ্ডলের ৬২। ৬ 'সহস্র স্তম্ভ' সৌধাদিরূপ গৃহের উল্লেখে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ঋগ্বেদের সময়ে কোন প্রকার মূর্ত্তি বা প্রতিমা গঠন প্রণালী বা প্রস্তর লিখন প্রচলিত ছিল না, একথা নিঃসন্দেহ। বৌদ্ধগণের বহুদিনের পূর্ব্বকার কোন প্রকার খোদিত প্রস্তর প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত করিতে পারেন নাই। এবং ইউরোপের মিউজিয়ম সমূহে মিসর, বেবিলন, গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ষের যে রাশীকৃত প্রস্তর লিখন ও প্রস্তর মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহার মধ্যেও বৌদ্ধ যুগের বহুদিন পূর্ব্ববর্ত্তী কালের কোন চিহ্ন নাই।

আমাদের গৃহে যে সকল পশু পক্ষ্যাদি গৃহপালিত হইতেছে, ঋগ্বেদের সময়ে তাহার সমস্তই গৃহে পোষিত হইত। অনেক মন্ত্রে তেজস্বী যুদ্ধাশ্বের বিবরণ রহিয়াছে।

বস্তুতঃ আদিম দাস জাতির সহিত যুদ্ধাদিতে অশ্বের এত প্রয়োজন হইয়া উঠিল এবং তাহার আদর এত বাড়িল যে, দধিক্রানামে শীঘ্রই অশ্ব-পূজা প্রবর্ত্তিত হইল। ৪র্থ মণ্ডলে ৩৮ সূক্তে আছে "৭। সেই অশ্ব সহনশীল এবং বলবান্, এবং সমরে স্বশরীর দ্বারা কার্য্যসাধন করেন। তিনি ঋজুগামী ও বেগগামী শত্রু সেনামধ্যে বেগে গমন করেন। তিনি ধলি উত্থিত করত ভ্রূদেশের উপরে বিক্ষেপ করেন।

"৮। যুদ্ধাভিলাষীগণ দীপ্যমান অশনির

* সপ্তম মণ্ডল ২। ৭ ১৫। ১৪ এবং ১৫। ১

ছায় হিংসাকারী এই দধিক্রাকে ভয় করে। যখন তিনি চতুর্দ্দিকে সহস্র লোককে প্রহার করেন, তখন তিনি উত্তেজিত হইয়া ভীম ও দুর্বার হইয়া উঠেন।

"১০। সূর্য্য যেরূপ তেজঃ দ্বারা জলদান করেন, সেইরূপ দধিক্রাদেন ানদ্বারা পঞ্চ কৃষ্টিকে বিস্তৃত করিয়াছেন। শতসহস্র দাতা বেগবান অশ্ব আমাদিগের স্তুতিবাক্য মধুর ফলের দ্বারা সংযোজিত করুন।"

চতুর্থ মণ্ডলের ৪। ১ ঋকে 'অমাত্যের সহিত গজ স্কন্ধারূঢ় রাজার উল্লেখ আছে। পালিত পশুর মধ্যে গাভী, ছাগ, মেষ, মহিষ এবং কুকুরের বর্ণনা আছে। কুকুর ঋক-খেদের সময়ে ভার বহন করিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধবিগ্রহ।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, প্রাচীন আর্য্যেরা পঞ্জাবের আদিম নিবাসীদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া সিন্ধু ও তৎসন্নিহিত নদীসমূহের পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত উর্ব্বর ভূমি অধিকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু আদিমনিবাসীরা যে দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজ অধিকার ছাড়িয়া দিল, তাহা নহে। অনার্য্যেরা সমরক্ষেত্রে ও সম্মুখ যুদ্ধে হিন্দুরশৌর্য্য দ্বারা পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইলেও আর্য্যদের নবাধিকৃত গ্রাম ও উপনিবেশের নিকটবর্ত্তী অরণ্যে ও গিরিকন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া হিন্দুদিগকে বিপাকে পাতন, গ্রামলুণ্ঠন ও তাহাদের গাভীচৌর্য্য প্রভৃতি যে কোন উপায়ে হউক উত্ত্যক্ত করিত এবং সময়ে সময়ে বহুসংখ্যক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিত। এ কথা বলা বাহুল্য যে, বিজেতারা বিজিত অনার্য্য জাতীয় সমূহকে একান্ত বিদ্বেষ ও ঘৃণাচক্ষে দেখিতেন। খ্রীষ্টের সপ্তদশ শতাব্দীর পরে আমেরিকা দেশে বিজিত আদিম জাতিদিগের যে দশা, আর খ্রীষ্টের সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পঞ্জাবে বিজিত অনার্য্য জাতিদিগেরও সেই দশা ঘটিল। আধুনিক সময়ে আমেরিকায় ইউরোপীয় বিজেতাগণ সাহসী ও তেজস্বী আদিমজাতিদিগের নির্ম্মূল করিয়াছেন, প্রাচীন পঞ্জাবে আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে তেমনি নির্ম্মূল করিলেন।

অনার্য্যের সহিত যুদ্ধবিরোধের কথা ঋগ্বেদের অনেক স্থলে রহিয়াছে। তাহার কতিপয় মন্ত্র নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। "ইন্দ্র বজ্ররূপ অস্ত্র লইয়া বীরকার্য্যে উৎসাহ পূ হইয়া দস্যুদিগের নগর সমূহ বিনাশ করি বিচরণ করিয়াছিলেন। হে বজ্রধারি আমাদিগের স্তুতি অবগত হইয়া দস্যুর প্রত অস্ত্র নিক্ষেপ কর, হে ইন্দ্র, আর্য্যদি বল ও যশঃবর্দ্ধন কর।" ১ মণ্ডল ১০৩।৪।৯

ইহার পরে মন্ত্রেই সিকা, অঞ্জসী শবের ও বীরপত্নী, ক্ষুদ্রনদী চতুষ্টয়ের ৫২।৬ গুপ্তগৃহে দস্যুদের অবস্থানের উল্লে-অশ্বের পাওয়া যায়। এই সমুদয় নদী। সূক্তে নাম জানা যায় নাই। সেই দস্যুমাদিগের ভীলসর্দ্দার তাঁতিয়া যেমন অধুনাতন বাণ, মধ্যভারতবর্ষে শান্তিপূর্ণ গ্রামে লু ষষ্ঠ করিয়া বেড়াইত, তাহার পূর্ব্ব পুরুষের তদ্রূপ গুপ্তগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আর্য্যদিগকে উত্তেজিত করিত। "কুয়র পরের ধন জানিতে পারিয়া স্বয়ং অপহরণ করে, জলে বর্ত্তমান থাকিয়া স্বয়ং ফেন (যুক্ত জল) অপহরণ করে, কুয়রের দুই ভার্য্যা সেই জলে স্নানকরে, তাহারা যেন শিফা-নদীর গভীর নিম্নভাগে হত হয়। অযু

(অর্থাৎ উপদ্রবকারী কুয়ব দস্যু) জল মধ্যে অবস্থান করে এবং তাহাব বাসস্থান গুপ্ত ছিল; সেই শূব পূর্ব্ব অপহৃত জলেব সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বিবাজ করে। অঞ্জসী, কুলিসী ও বীবপত্নী নদীত্রয় স্বকীয় জলদ্বাবা তাহাকে প্রীত কবিয়া জলদ্বাবা তাহাকে ধাবণ করে। বৎসপ্রিয় গোরু যেরূপ গোষ্ঠেব পথ জানে, আমরা সেইরূপ সেই অসুবেব গৃহেবদিকে যে পথ গিয়াছে, তাহা দেখিয়াছি। হে মঘবন্! সেই অসুবেব পুনঃ পুনঃ কৃত উপদ্রব হইতে আমাদিগকে বক্ষা কব।” প্রথম মণ্ডলেব ১০৪ সূক্তেব ৪, ও ৫ ঋক।

অন্যত্র বহিয়াছে,—“ইন্দ্র যুদ্ধে আর্য্য যজমানকে বক্ষা কবেন। অসংখ্য বাব বক্ষা কবেন। ইন্দ্র সমস্ত যুদ্ধে তাহাকে বক্ষা কবেন। মনুষ্যেব জন্য ব্রত বহিত ব্যক্তিদিগকে শাসন কবেন। তিনি (কৃষ্ণ অসুবেব) ত্বক উন্মোচন কবিয়া তাহাকে বধ কবেন। তিনি উহাকে ভস্মীভূত কবেন। তিনি হিংসকদিগকে দগ্ধ কবেন এবং নিষ্ঠুব ব্যক্তিদিগকে দগ্ধ কবেন।” ১৩০।৮। পুনবপি এই মণ্ডলেব ১৭৪ সূক্তেব ২ হইতে ৫ ঋকে আছে—“হে বক্ষক ইন্দ্র। তুমি হিংসাবতী সেনাকে একত্র কবিয়া তোমাব বিস্তৃত ভুজ দ্বাবা ছেদন কর। তোমাব পদ মহা বিস্তীর্ণ। হে মঘবন্* এই হিংসাবতী (সেনাব) বল চূর্ণ কর এবং কুৎসিৎ শ্মশানে বা মহা-শ্মশানে নিক্ষেপ কব। হে ইন্দ্র। তুমি এইরূপ ত্রিগুণিত পঞ্চাশৎ সংখ্যক সেনা নাশ করিয়াছ। লোকে তোমাব এই কার্য্যকে বড ভাল বলিয়া মনে কবে। কিন্তু তোমাব পক্ষে এ কার্য্য সামান্য। হে ইন্দ্র। তুমি অতি ভয়ঙ্করী পিশাচীকে * বিনাশ কর, এবং সমস্ত রাক্ষসগণকে* নিঃশেষ কব।” “হে ইন্দ্র! অর্চ্চনীয় অন্ন লাভেব জন্য কবি তোমাব স্তব কবিতেছে, তুমি পৃথিবীকে দাসেব শয্যা কবিয়া দিযাছ। অথবা তিন ভূমিকে দাসদ্বাবা বিচিত্র কবিয়াছ, এবং দুর্য্যোনি বাজাব জন্য কুযবাচকে হনন কবিযাছ। হে ইন্দ্র! নব্য ঋষিগণ তোমাব সনাতন প্রসিদ্ধ বীবকর্ম্মেব স্তুতি কবে, তুমি অনেক হিংসকদিগকে সংগ্রাম নিবাবণেব জন্য বিনাশ কবিযাছ। তুমি দেব-বহিত বিপক্ষ নগব সকল ভেদ কবিযাছ এবং দেববহিত শত্রুব অস্ত্র নত কবিযাছ।” (প্রথম মণ্ডলেব ১৭৪ সূক্ত, ৭ ও ৮ ঋক) “হে অশ্বিদ্বয়! জঘন্য শব্দ কবতঃ কুক্কুবেব ন্যায যাহাবা আমাদিগকে বিনাশ কবিতে আসিতেছে, তাহাদিগকে বিনাশ কব। যাহাবা সংগ্রাম কবিতে চাহে, তাহাদিগকে মাবিযা ফেল। তাহাদিগকে মাবিবাব উপায তোমবা জান। তোমাদিগকে যাহাবা স্তুতি কবে, তাহাদেব প্রত্যেক কথা বত্নবতী কব। হে নাসত্যদ্বয়! তোমবা উভযে আমাব স্তুতি বক্ষা কব।” (প্রথম মণ্ডলেব ১৮২ সূক্ত, ৪ ঋক্) “দ্যুতিমান, কীর্ত্তিমান অতিশয দর্শনীয ইন্দ্র মনুষ্যেব জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন, শত্রুনাশক বলবান্ ইন্দ্র যেন শোক অনিষ্ঠকাবী দাসেব প্রিয মস্তক নিম্নে ক্ষেপণ কবেন। বৃত্রহা পুবনাশন ইন্দ্র কৃষ্ণযোনি দাস সেনাকে বিনাশ কবিয়া-ছেন তিনি যেন। যজমানেব উচ্চ অভি-লাষ পূবণ কবেন। “২ মণ্ডল, ২০ সূক্ত ৬ ও ৭ ঋক।

* এখানে পিশাচ ও রাক্ষস শব্দদ্বারা বোধহয় অনার্য্য বর্ব্বরকে উল্লেখ করা হইয়াছে।

আমেরিকায় পূর্ব্বে অশ্বের ব্যবহার ছিল না। স্পেনজাতীয়েরা আমেরিকা জয়কালে এই অশ্ব চালনা করিয়া আদিম নিবাসীদের অন্তরে যৎপরোনাস্তি ভয়ের উদ্রেক করিয়া সহজে জয়লাভ করিয়াছিলেন। আদি আর্য্যদের অশ্বচালনা দর্শনে ভারতীয় অনার্য্যজাতীয়েরাও তদ্রূপ ভয়ে অভিভূত হইত, প্রমাণার্থ অশ্বদেবতা দধিক্রাব * স্তুতি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। "লোকে যেরূপ বস্ত্রাপহারক তস্করকে দেখিয়া চীৎকার করে, সেইরূপ সংগ্রামে শত্রুগণ ইহাকে দেখিয়া চীৎকার করে। যেরূপ পক্ষিগণ নিম্নাভিমুখে আগমনকারী ক্ষুধার্ত্ত শ্যেনপক্ষীকে দেখিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ, লোকে এই অন্ন ও পশু লুণ্ঠনকারী দধিক্রাকে দেখিয়া চীৎকার করে। যুদ্ধাভিলাষিগণ দীপ্তিমান্ অশনির ন্যায় হিংসাকারী এই দধিক্রাকে ভয় করে। যখন তিনি চতুর্দ্দিকে সহস্র লোককে প্রহার করেন, তখন তিনি উত্তেজিত হইয়া ভীম ও দুর্ব্বার হইয়া উঠেন।" চতুর্থ মণ্ডল ৩৮ সূক্ত, ৫ ও ৮ ঋক্।

ঋগ্বেদের অনেক স্থানে দেখা যায় যে, কুৎস নামে এক প্রবল পরাক্রমশালী ও দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন—, তিনি অনেক কৃষ্ণকায় অনার্য্য বিনাশ করিয়াছিলেন। চতুর্থমণ্ডলের ষোড়শ সূক্তে কথিত আছে, "মায়াবান্ ঋত্বিকশূন্য দস্যুকে বিনষ্ট করিয়া ইন্দ্র কবি-কুৎসের অভিমুখে ধন প্রসাদের জন্য গমন করিয়াছিলেন" (৯ ঋক্), "ইন্দ্র মনে মনে দস্যুবধে কৃতসংকল্প হইয়া কুৎসের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন এবং কুৎসের সখ্যতার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন।" ১০ ঋক্। ইন্দ্র কুৎসের সাহায্যে "পঞ্চাশৎ *সহস্র কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকে বিনাশ করিয়াছিলেন"* (১৩ ঋক্)। চতুর্থ মণ্ডলের ২৮ সূক্তে কথিত আছে যে, ইন্দ্র দস্যুদিগকে সমস্ত সদ্‌গুণ হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে মনুষ্যের নিন্দনীয় করিয়াছেন, এবং তাহাদিগের বধের জন্যই ইন্দ্র ও সোম মনুষ্যের পূজা গ্রহণ করিতেন। ৪র্থ ঋক্। উক্ত মণ্ডলের ৩০ সূক্ত পাঠে জানা যায়, ইন্দ্র পঞ্চ শতাধিক-সহস্র সংখ্যক দাসকে বিশেষরূপে বধ করিয়াছিলেন। ১৫ ঋক্।

দাস ও দস্যুদের পরাজয় ও বিনাশের কথা পঞ্চ মণ্ডলের ৭০।৩, ষষ্ঠ মণ্ডলের ১৮।৩, ও ২৫ ১ ও ২ ঋকে দেখিতে পাওয়া যায়। দস্যুরা যে অজ্ঞাত গুপ্ত স্থানে বাস করিত, ষষ্ঠ মণ্ডলের সূ ৪৭।২০ ঋকে তাহার বিশেষ উল্লেখ রহিয়াছে। "আমরা ভ্রমণ করিতে করিতে গোচারণভূমি-রহিত দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সুবিস্তীর্ণ ধরিত্রী দস্যুগণের আশ্রয় প্রদান করিতেছে। হে বৃহস্পতি। তুমি ধেনুগণের অনুসন্ধান বিষয়ে আমাদিগকে পরিচালিত কর। হে ইন্দ্র। এইরূপে পথভ্রষ্ট ত্বদীয় উপাসককে তুমি পথ প্রদর্শন কর।"

ইতিপূর্ব্বে কুযব ও আযু নামে দুই দস্যুর উল্লেখ করিয়াছি। তাহারা নদীবেষ্টিত গুপ্তস্থানে লুকায়িত রহিয়া সুযোগ পাইলেই আর্য্য গ্রাম সমূহ আক্রমণ করিত। কৃষ্ণ নামে আর একজন পরাক্রান্ত ব্যক্তির বন্ধন বর্ণনা দৃষ্ট হয়। বোধহয়, ইহার কৃষ্ণবর্ণ হইতে আর্য্যেরা ইহাকে কৃষ্ণ নাম দিয়াছিলেন। একটী সূক্ত এস্থলে অনুবাদযোগ্য,— "দশ সহস্র সৈন্যের সহিত দ্রুত গমনকারী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীতীরে অবস্থান করিতেছিলেন, ইন্দ্র প্রজ্ঞাদ্বারা

* অশ্বরূপী অগ্নির নাম দধিক্রা। সায়ন।

সেই শব্দকারীকে প্রাপ্ত হইলেন। মনুষ্যদিগের হিতাভিপ্রায়ে হিংসাকারিণী সেনাদিগকে বধ করিলেন। (ইন্দ্র বলিলেন) দ্রুতগামী কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলাম, সে অংশুমতী নদীর গূঢ়স্থানে বিস্তৃত প্রদেশে বিচরণ করিতেছে ও সূর্য্যের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে। হে অভিলাষপ্রদ মরুৎগণ। আমি ইচ্ছাকরি, তোমরা যুদ্ধকর, এবং যুদ্ধে তাহাকে সংহার কর। দ্রুতগামী কৃষ্ণ অংশুমতী নদীর সমীপে দীপ্তিমান হইয়া শরীর ধারণ করিতেছে। ইন্দ্র বৃহস্পতির সহায় লাভ করিয়া দেবশূন্য আগমনশীল সেনাগণকে বধ করিলেন।" (অষ্টম মণ্ডল, সূঃ৯৬, ঋঃ ১৩—১৫)।

অনার্য্যদিগকে কেবল চীৎকারপ্রিয় ভাষাহীন জীব বলিয়া আর্য্যেরা ক্ষান্ত হয়েন নাই, অনেক স্থলে অনার্য্যেরা মনুষ্যই নয়, এইরূপ ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। "আমাদিগের চতুর্দ্দিকে দস্যু জাতি আছে, তাহারা যজ্ঞ কর্ম্ম করে না, তাহারা কিছু মানে না, তাহাদিগের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তাহারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়। হে শত্রু সংহারকারী (ইন্দ্র)। তাহাদিগকে নিধন কর; সেই দাস জাতিকে হিংসা কর।" (মঃ ১০, সূঃ ২২, ঋ ৮) দশম মণ্ডলের ৪৯ সূক্তে ইন্দ্র বলিতেছেন, "আমি দস্যু জাতিকে 'আর্য্য' এই নাম হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছি।" (ঋঃ ৩), "দাসজাতীয় নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথ নামক দুই ব্যক্তিকে ভগ্ন করিয়াছি" (ঋঃ ৬), "যখন মনুষ্য সোম প্রস্তুত করিয়া শোধন করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করে, আমি তখন দাস জাতীয় ব্যক্তিকে প্রহার করিয়া দিখণ্ড করি, এই দশার জন্যই সে জন্মিয়াছে।" ঋঃ ৭।

ঈদৃশ অনার্য্য দস্যুদের সহিত প্রাচীন আর্য্যেরা অশেষ যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্তছিলেন। বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে সদ্ভাব ছিল না, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। অবিশ্রান্ত যুদ্ধ সংগ্রাম করিয়া বিজেতাগণ নবার্জ্জিত রাজ্য রক্ষা, ক্রমশঃ কৃষি ভূমি বিস্তার, নবগ্রাম স্থাপন, এবং অরণ্য মধ্যে নূতন শাসন ও অধিবাস পত্তন করিয়া আর্য্য-গৌরব বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অনার্য্যদিগকে ঘৃণা করিতেন, সুযোগ পাইলেই তাহাদিগের ধ্বংস সাধন করিতেন। অনার্য্যেরাও সুযোগ পাইলেই এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইত। তাহারা নদী মধ্যে ও গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত রহিয়া আর্য্যদিগকে অসহায় অবস্থায় পাইলেই লুণ্ঠন করিত, গ্রাম আক্রমণ করিয়া গবাদি অপহরণ করিত, নতুবা তাহা বিনাশ করিয়া চলিয়া যাইত। কখন কখন বহু সংখ্যক ব্যক্তি হঠাৎ আর্য্যদিগকে আক্রমণ করিত। প্রত্যেক সূচ্যগ্র ভূমির জন্য অনার্য্যেরা প্রাণপণে চেষ্টা না করিয়া ছাড়িয়া দেয় নাই। তাহারা বিজেতা আর্য্যদের হোম যাগাদি কার্য্যে বাধা দিত, আর্য্য দেবতাদিগকে ঘৃণা করিত, এবং আর্য্যদের ধনাদি লুণ্ঠন করিত। কিন্তু এত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও আর্য্য জাতীয়দের গ্রাম, নগর, অধিবাস, কৃষি চতুর্দ্দিকে বৃদ্ধি হইতে লাগিল, নিবিড় অরণ্য কৃষি ভূমিতে পরিণত হইয়া মধ্যে মধ্যে গ্রাম ও নগর সংস্থাপিত হইল, এবং এইরূপে সমগ্র পঞ্জাবে প্রাচীন আর্য্যদের অধিকার দৃঢ়ীভূত হইল। হয়, এইরূপে পঞ্জাবের সমস্ত অনার্য্য জাতির বিনাশ হইয়া থাকিবে, নতুবা ধ্বংসাবশিষ্ট অনার্য্যেরা, ভারতবর্ষের অসংখ্য গিরিকন্দর

ও অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকিবে। অনার্য্যদেব মধ্যে দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তিরা কেহ কেহ যে মৃত্যু বা স্বদেশ নির্ব্বাসনের পবিবর্ত্তে আর্য্যদেব বশ্যতা স্বীকার কবিয়াছিল, তাহা অনায়াসেই কল্পনা কবা যাইতে পাবে। ঋগ্বেদে দস্যুদেব বর্ণনাব মধ্যেও তাহাদেব আর্য্য বশ্যতা স্বীকাব করাব কথা দেখা যায়।

আর্য্য-অনার্য্য যুদ্ধ বিগ্রহের অনেক উদাহবণ সংগৃহীত হইলেও, পবাক্রান্ত বিজেতা সুদাসেব যুদ্ধ বিববণ সম্বন্ধে ৭ মণ্ডলেব ১৮ সূক্তের কতিপয় ঋক অনুবাদ কবিতেছি

"৮। দুরভিসন্ধিবিশিষ্ট মন্দমতিগণ খনন কবতঃ অদীনা নদীব কূল ভেদ কবিযা দিয়াছিল। সুদাস মহিমাদ্বাবা পৃথিবী ব্যাপ্ত কবিয়াছিলেন। চযমানেব পুত্র কবি পালিত পশুব ন্যায় শযন কবিযাছিল। ৯। নদীব জল গন্তব্য প্রদেশাভিমুখেই নদীতে গমন কবিয়াছিল, অগন্তব্য প্রদেশাভিমুখে গমন কবে নাই, এবং সুদাসেব অশ্বগম্য প্রদেশে গমন কবিয়াছিল। ইন্দ্র, সুদাসেব জন্য মনুষ্যগণেব মধ্যে অপত্যবিশিষ্ট জল্পক অমিত্রদিগকে অপত্যগণেব সহিত বশ কবিযাছিলেন। ১১। বাজা সুদাস যশোলাভেব জন্য দুইটী জনপদেব একবিংশ জন সেনাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। যজ্ঞগৃহে যুবা (অধ্বর্য্য) যেরূপ কুশাছেদন কবে, সেইরূপ তিনি শত্রুগণকে ছেদন করেন। শূর ইন্দ্র তাঁহার সাহায্যার্থ মরুৎগণকে প্রসব কবিয়াছিলেন। ১৪। অনুব ও দ্রুহ্যুর গবাভিলাষী ষষ্টীশত এবং ষট্সহস্র ষডাধিক ষষ্টীসংখ্যক পুত্রগণ পরিচর্য্যাভিলাষী সুদাসের জন্য শাযিত হইয়াছিল। এই সমস্ত কার্য্য ইন্দ্রেব বীর্য্যসূচক। ১৭। ইন্দ্র তখন দরিদ্র সুদাসের দ্বারা এক-কার্য্য করাইয়াছিলেন। প্রবল সিংহকে ছাগদ্বাবা হত করিয়াছিলেন, সূচীদ্বাবা কূপাদিব কোণ কাটিয়া ফেলিযাছিলেন। সমস্ত ধন সুদাস রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন।"

যে কবি অবিনশ্বব ভাষায় সুদাসেব এই কীর্ত্তিকলাপেব প্রশংসা কবিযাছেন, সুদাস হইতে তিনি তদনুরূপ পুবস্কৃত হইযা থাকিবেন। কাবণ ২২।২৩ ঋকে কবি কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকাব কবিতেছেন যে, দেববান বাজাব পৌত্র পিজবনেব পুত্র, সুদাসেব নিকট দুই শত গো, দুইখানি বথ ও স্বর্ণালঙ্কাববিশিষ্ট চাবিটী অশ্ব পাইযাছিলেন।

সপ্তম মণ্ডলেব ৮৩ সূক্তে সুদাশ দশজন বাজাকর্ত্তৃক হিংসিত হইযা যুদ্ধে জয়লাভ কবিয়াছিলেন, তাহা বশিষ্ঠরচিত সূক্তে আমবা জানিতে পাবি। এই সূক্তোক্ত যুদ্ধ বর্ণনায় কিছু বিশেষত্ব আছে, তাহা এস্থলে অনুবাদ কবিতেছি। "২। যেখানে মনুষ্যগণ ধ্বজা উত্তোলন কবতঃ মিলিত হয, যে যুদ্ধে কিছুই অনুকূল হয় না, যাহাতে দূতগণ স্বগ দর্শন কবে ও ভীত হয, সেই সংগ্রামে, হে ইন্দ্র ও বরুণ। আমাদেব পক্ষ হইয়া কথা কও। ৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ, ভূমিব খণ্ড সকল ধ্বংস প্রাপ্ত বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে, কোলাহল দ্যুলোকে আরোহণ কবিতেছে। সৈন্যের শত্রু সকল আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। হে প্রার্থনা পূর্ণকাবী ইন্দ্র ও বরুণ। বক্ষা কবিবাব জন্য আমাদের নিকট আগমন কব। ৪। হে ইন্দ্র ও বরুণ। আয়ুধদ্বারা অনাহত ভেদকে হিংসা করতঃ তোমবা সুদাসকে রক্ষা করিয়াছ, তৃৎসুদিগেব

স্তোত্র শ্রবণ করিয়াছ, যুদ্ধকালে তৃৎসুদিগের পৌরহিত্য সফল হইয়াছিল। ৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ! শত্রুর আয়ুধ সকল আমাকে চতুর্দ্দিক হইতে বাধা দিতেছে, হিংসকদিগের মধ্যে শত্রুরা বাধা দিতেছে। তোমরা উভয় প্রকার ধনের ঈশ্বর। অতএব যুদ্ধদিনে আমাদিগকে রক্ষা কর। ৬। যুদ্ধকালে উভয় প্রকার লোকেই ইন্দ্র ও বরুণকে ধন লাভার্থে আহ্বান করে। এই যুদ্ধে দশজন রাজাকর্ত্তৃক হিংসিত সুদাসকে তৃৎসুগণের সহিত তোমরা রক্ষা করিয়াছিলে। ৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ! দশজন যজ্ঞ-রহিত রাজা মিলিত হইয়াও সুদাসকে প্রহার করিতে সক্ষম হয় নাই। হব্যসক্ত যজ্ঞে নেতাগণের স্তোত্র সফল হইয়াছিল। ইহাদের যজ্ঞে সকল দেবগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন।”

ষষ্ঠ মণ্ডলের ৪৭ সূক্তে মন্ত্রাবসানে দুন্দুভির স্তব রহিয়াছে। এই রণবাদ্য যন্ত্রকে নিজ শব্দদ্বারা স্বর্গ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ করিয়া স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণীদিগকে ভীত করিতে এবং শত্রুদিগের অন্তরে ভয় সঞ্জাত করিয়া তাহাদিগকে সুদূরে তাড়িত করিতে প্রার্থনা করিতেছেন। সূক্তের শেষাংশে আছে “দুন্দুভি সকল ব্যক্তির নিকট সমরকাল ঘোষণা করিবার নিমিত্ত নিয়ত উচ্চরব করিতেছে। আমাদিগের নায়কগণ অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সমবেত হইয়াছেন। হে ইন্দ্র! আমাদিগের রথারূঢ় সৈন্যগণ যেন যুদ্ধে জয়লাভ করে।”

ষষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫ সূক্তে যুদ্ধ সামগ্রী ও যুদ্ধাস্ত্রের বর্ণনা রহিয়াছে। প্রাচীন সময় কীদৃশ যুদ্ধাস্ত্র ও বর্ম্ম ব্যবহৃত হইত, তাহার আভাষ পাওয়া যাইবে। “১। সংগ্রাম উপস্থিত হইলে এই রাজা যখন বর্ম্ম পরিধান করিয়া গমন করেন, তখন জীমূতের ন্যায় তাঁহার রূপ হয়। হে রাজন্! তুমি অবিদ্ধ শরীরে জয় লাভ কর, বর্ম্মের সেই মহিমা তোমাকে রক্ষা করুক। ২। আমরা ধনুঃ দ্বারা গাভী জয় করিব। ধনুদ্বারা যুদ্ধ জয় করিব। ধনুদ্বারা তীব্র মদোন্মত্ত (শত্রু সেনা) বধ করিব। ধনুঃ শত্রুর কামনা নষ্ট করুক। আমরা ধনুঃদ্বারা সর্ব্বদিক জয় করিব। ৩। এই ধনু-সংলগ্ন জ্যা সংগ্রামকালে যুদ্ধের সময়ে লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া, যেন প্রিয়বাক্য বলিবার জন্যই ধনুর্দ্ধারীর কর্ণের নিকট আগমন করে। এবং স্ত্রী যেমন প্রিয় পতিকে আলিঙ্গন করিয়া কথা কহে, জ্যা সেইরূপ বাণকে আলিঙ্গন করিয়া কথা কহে। ৫। এই তূণীর বহুতর বাণের পিতা, অনেকগুলি বাণ ইহার পুত্র। বাণ তুলিবার সময় এই তূণীর চিশ্বা শব্দ করে, এবং যোদ্ধার পৃষ্ঠভাগে নিবদ্ধ থাকিয়া যুদ্ধকালে বাণ প্রসব পূর্ব্বক সমস্ত সেনা জয় করে। ৬। সুসারথি রথে অবস্থান করিয়া পুরস্থিত অশ্বগণকে যেখানে যেখানে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করে, সেই খানেই লইয়া যায়। রশ্মিসমূহ অশ্বের পশ্চাতে থাকিয়া ইচ্ছামত নিয়মিত করে। তাহাদিগের মহিমা কীর্ত্তন কর। ৭। অশ্ব সকল খুর দিয়া ধূলি উড়াইয়া রথের সহিত বেগে গমন করতঃ শব্দ করিতে থাকে এবং পলায়ন না করিয়া হিংস্র শত্রুগণকে পদাঘাতে তাড়ন করে। ১১। (বাণ) সুপর্ণ ধারণ করে, মৃগ শৃঙ্গ উহার দণ্ড। উহা গাভীচর্ম্ম কর্ত্তৃক* সম্যক রূপে বদ্ধ ও প্রেরিত হইয়া পতিত হয়। নেতাগণ

* গোবিকার স্নায়ুসমূহ অথবা জ্যা।

একত্র ও পৃথক রূপে বিচরণ করেন, বাণ সমূহ আমাদিগকে সেই স্থানে সুখদান করুন্। ১৪। হস্তঘ্ন * জ্যাব আঘাত নিবারণ করতঃ সর্পের ন্যায় শবীবের দ্বারা প্রকোষ্ঠকে পবিবেষ্টন করে এবং সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হয় ও পৌরুষশালী হইয়া পুরুষকে সর্ব্বতোভাবে বক্ষা কবে। ১৫। যাহা বিযাক্ত, যাহাব শিবোদেশ হিংসাকাবী এবং যাহাব মুখ লৌহময়, সেই পর্জ্জন্য ‡ কার্য্যভূত বৃহৎ ইষুংদেবতাকে এই নমস্কাব।

এই সকল উদাহবণই যথেষ্ঠ। অন্যত্র আমরা প্রমাণ কবিয়াছি যে, যোদ্ধারা যে শুধু বর্ম্ম ব্যবহাব কবিতেন, তাহা নয়। সিপ্রা (শিবঃ মুকুট) ও অংসত্রা নামক এক প্রকাব ঢালের ব্যবহাব ছিল। বাশী নামে কুঠার ও ঋষ্টি নামে ভল্ল, শাণিত খড়্গধাবা ও ধর্নুবাণ তৎকালিক যুদ্ধাস্ত্র। পৃথিবীব অন্যান্য দেশে পুবাকালে যে কোন যুদ্ধাস্ত্রেব উল্লেখ পাওয়া যায, তৎসমস্তই চতুঃসহস্র পূর্ব্বে আর্য্যদেব জ্ঞাত ছিল। দুন্দুভিব আহ্বানে সকলে দলবদ্ধ হইযা পতাকায় অনুগমন কবিতেন, এবং বথাবোহণ ও অশ্বারোহণে যুদ্ধে প্রবেশ কবিতেন।

বৈদিক যোদ্ধা পুরুষেবা যে যগে যুদ্ধাদি কবিয়াছিলেন, তাহা যে অতিবিপদ-সঙ্কুল সময় ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। একদিকে আদিম অনার্য্যেব বিরুদ্ধে অশেষ যুদ্ধ ব্যাপাবে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল, অপব দিকে আর্য্যাধিকৃত দেশ সমূহ বিভিন্ন নেতাব অধীন হওয়াতে, যখন যে নেতা পবাক্রান্ত হইতেন, তখনই তিনি অত্যাসন্ন দেশকে করায়ত্ত কবিতে চেষ্টা করিতেন। যজ্ঞলিপ্ত ঋষিরা শক্রদিগেব জয় লাভের জন্য এবং যুদ্ধে জয়কাবী বীরপুত্রের জন্য দেবতাদেব নিকট পুনঃপুনঃ প্রার্থনা কবিতেন। যৌবন উপস্থিত হইলেই প্রত্যেকে যোদ্ধা সাজিয়া বাহুবলে স্বীয় গৃহ, ভূমি ও গাভী বক্ষা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। সিন্ধু হইতে সরস্বতী প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রদেশে যে সকল আর্য্য বংশীয় লোকেবা বাস কবিতেন, তাঁহাবা সকলেই কর্ম্মঠ, সাহসী, যোদ্ধৃ পুরুষ ছিলেন, এবং অনার্য্যদেব সহিত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ কবিযাই তাঁহাবা জাতীয় অস্তিত্ব ও জাতীয় স্বাধীনতা বক্ষা কবিতে পাবিয়াছিলেন।

এই প্রকাব অবস্থাব কথা মনে কবিতে কষ্ট বোধ হয। কিন্তু প্রাচীন কালে এমন জাতি কোথায ছিল। যাঁহাবা স্বাধীনতা বক্ষা, বা অধিকাব বিস্তারেব জন্য সর্ব্বদা সমব সজ্জায সজ্জিত না থাকিতেন এবং এই বর্ত্তমান সময়েও, গৌতম, বুদ্ধ ও যীশু খ্রীষ্টেব শান্তি-ধর্ম্ম প্রচারের দুই সহস্র বৎসব পবে, এমন জাতি কোথায আছে যে, প্রতিবেশীব আক্রমণ হইতে আত্ম বক্ষার্থ সতত সমবসজ্জা না কবিয়া কৃষিবাণিজ্যাদি ব্যবসা কবিয়া নিবাপদে ফল ভোগ করিতেছেন? যদি ইউবোপে পঞ্চাশৎ বৎসরকাল কোন ঘোবতব যুদ্ধ না হইয়া অতিবাহিত হইয়া, থাকে, অনেকে তাহা বিশেষ সৌভাগ্যেব বিষয মনে কবেন। বর্ত্তমান সময়ে ইউবোপের সমস্ত দেশ আপাদ মস্তক যুদ্ধ সাজে, সজ্জিত। বৃহৎ দেশ ও সাম্রাজ্য সমূহে লক্ষ লক্ষ লোক সর্ব্বদাই যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, তাহারা স্বগৃহ, পরিবার ও ব্যবসা পবিত্যাগ করিয়া

* ধনুর জ্যাঘাত হইতে প্রকোষ্ঠকে রক্ষা করার জন্য যে চর্ম্ম বন্ধন করা যায়, তাহার নাম হস্তঘ্ন।

‡ বাণমুখ লৌহে নির্ম্মিত হইত। পর্জ্জন্য বৃষ্টির দেবতা। পর্জ্জন্যাইষু বোধ হয় বর্ষাকালে জাত নল।

প্রতিবেশীর সীমন্ত প্রদেশে যাইয়া সপ্তাহ মধ্যে উপস্থিত হইতে প্রস্তুত। সভ্যতার গুণে মনুষ্য অনেক উপকার লাভ করিয়াছে, কিন্তু যুদ্ধ বা যুদ্ধাস্ত্র এখনও জগতে বিলুপ্ত হয় নাই। প্রতিবেশী জাতিদের সহিত যুদ্ধ করিতে চির প্রস্তুত না থাকিয়া কোন জাতি শান্তিপূর্ণ কৃষি বাণিজ্যের ফল উপভোগ করিতে পারে নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সামাজিক ও গার্হস্থ্য আচার প্রণালী।

(রমণীদিগের সামাজিক অবস্থা।)

ভারতভূমির আদিম নিবাসীদের সঙ্গে এইরূপে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ সংগ্রাম করিয়া প্রাচীন আর্য্যেরা সিন্ধু হইতে সরস্বতী ভূখণ্ডে আধিপত্য স্থাপন করিলেন।

বলা বাহুল্য যে, ঋগ্বেদে সিন্ধুনদ ও তাহার পঞ্চ শাখার ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ রহিয়াছে। দশম মণ্ডলে সিন্ধু সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর (৭৫) সূক্ত রহিয়াছে, নিম্নে তাহা সমগ্র অনুবাদ করিতেছি। "১। হে জল সকল। যজমানের গৃহে কবি তোমাদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিমা ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাহারা সাত সাত করিয়া তিনশ্রেণীতে চলিল; সকল নদীর উপর সিন্ধু নদীর তেজই শ্রেষ্ঠ। ২। হে সিন্ধুনদি! যখন তুমি অন্নশালী (শস্যশালী) প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলে, তখন বরুণদেব তোমার যাইবার পথ কাটিয়া দিলেন। তুমি ভূমির উপর উন্নত পথ দিয়া গমন কর। তুমি সকল গমনশীল নদীর উপর বিরাজ কর। ৩। পৃথিবী হইতে সিন্ধুর শব্দ উঠিয়া আকাশ পর্য্যন্ত আচ্ছাদন করিতেছে। মহাবেগে উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে ইনি চলিয়াছেন। ইহার প্রবল শব্দ হইতে জ্ঞান হয় যেন মেঘ হইতে ঘোর রবে বৃষ্টি পড়িতেছে। সিন্ধু আসিতেছেন, যেন বৃষ গর্জ্জন করিতে করিতে আসিতেছেন। ৪। হে সিন্ধু! যেমন শিশুবৎসের নিকট তাহাদের জননী গাভীরা দুগ্ধ লইয়া যায়, তদ্রূপ আর আর নদী শব্দ করিতে করিতে জল লইয়া তোমার চতুর্দ্দিকে আসিতেছে। যেমন যুদ্ধ করিবার সময় রাজা সৈন্য লইয়া যায়, তদ্রূপ তোমার সহগামিনী এই দুইটী নদী শ্রেণীকে * লইয়া তুমি অগ্রে অগ্রে চলিতেছ। ৫। হে গঙ্গা! হে যমুনা ও সরস্বতী ও শতদ্রু এবং পরুষ্ণি (রাভি), আমার এই স্তবগুলি তোমরা ভাগ করিয়া লও। হে অসিক্নী (চেনাব)-সঙ্গতা মরুৎবৃধা নদী! হে বিতস্তা (ঝিলাম) ও সুসোমা-সঙ্গতা আর্জীকীয়া (বিয়াস্) নদী! তোমরা শ্রবণ কর †। হে সিন্ধু! তুমি প্রথমে তৃষ্টমা নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া চলিলে। পরে সুসর্ত্তু ও রসা ‡ ও শ্বেতীর সহিত মিলিলে। তুমি ক্রুমু (কুরুম্ নদী) ও গোমতী (গোমাল) নদীকে, কুভা (কাবুল নদী) ও মেহৎনুর সহিত মিলিত করিলে। এই সকল নদীর সঙ্গে তুমি একরথে অর্থাৎ একত্র যাইয়া থাক। ৭। এই দুর্দ্ধর্ষ সিন্ধু সবলভাবে যাইতেছে। তাহার বর্ণ শুভ্র ও উজ্জ্বল, তিনি অতি মহৎ, তাহার জল সকল মহাবেগে যাইয়া

---

* পূর্ব্বদিক হইতে শতদ্রু প্রভৃতি আর পশ্চিমদিক হইতে তৃষ্টমা প্রভৃতি এই দুই শ্রেণী নদী আসিয়া সিন্ধুতে পতিত হইয়াছে।

† পঞ্চম ঋকে সিন্ধু নদীর পূর্ব্বদিকের অর্থাৎ পঞ্জাব প্রদেশের শাখাগুলির নাম পাওয়া যায়। ৬ ষ্ঠ ঋকে পশ্চিম দিকের অর্থাৎ কাবুল প্রদেশের নাম পাওয়া যায়।

‡ Ramha Araxes (?)

চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ করিতেছে। যত গতি-শালী পদার্থ আছে, ইহার তুল্য গতিশালী কেহ নাই। ইনি ঘোটকীর ন্যায় অদ্ভুত, ইনি স্থূলকায়া রমণীর ন্যায় সৌষ্টব-দর্শন। "৮। সিন্ধু চির যৌবনা ও সুন্দরী, ইহার উৎকৃষ্ট ঘোটক ও উৎকৃষ্ট রথ এবং উৎকৃষ্ট বস্ত্র আছে, সুবর্ণের অলঙ্কার আছে, ইনি অতি উত্তমরূপে সজ্জিত হইয়াছেন। ইহার বিস্তর অন্ন আছে, বিস্তর পশুলোম আছে, ইহার তীরে সীলমা-খড় আছে, ইনি মধু প্রসবকারী পুষ্পের দ্বারা আচ্ছাদিত। ৯। সিন্ধু ঘোটকযুক্ত অতি সুখকর রথ যোজনা করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা এই যজ্ঞে অন্ন আনিয়া দিয়াছেন। ইহার মহিমা অতি মহৎ বলিয়া স্তব করে। ইনি দুর্দ্ধর্ষ, আপনার যশে যশস্বী এবং মহৎ।"

এই সূক্তে কবি সুদূর দৃষ্টিতে যেন তিনটী বৃহৎ নদীশ্রেণী নয়ন গোচর করিতেছেন। একশ্রেণী উত্তর পশ্চিম, আরেক শ্রেণী উত্তর পূর্ব্ব হইতে ধাবিত হইয়া সিন্ধুতে পতিত হইতেছে, তৃতীয় শ্রেণী গঙ্গা যমুনা নানা শাখা প্রশাখা সহ পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিতেছে। বৈদিক কবিদের ভূভাগ যত দূর পরিজ্ঞাত ছিল, এই সূক্ত তাহার পরিচয় দিতেছে। উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে সিন্ধু নদী ও সালিমান পর্ব্বত শ্রেণী। দক্ষিণে সিন্ধু বা সমুদ্র, পূর্ব্বে গঙ্গ-যমুনা। এতদ্ভিন্ন সমস্ত জগৎ বৈদিক ঋষিদের অজ্ঞাত ছিল।

পঞ্জাব প্রদেশের নদী শ্রেণীকে এক স্থানে সপ্তনদী বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে, আর একস্থলে এই সপ্তনদীর মধ্যে সিন্ধুমাতা এবং সরস্বতী সপ্তম স্থানীয়া বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীন আর্য্যদের সেই প্রথম বাস্তু ভূমি পঞ্জাবে অদ্যাপি সিন্ধুনদ ও তাহার পঞ্চ (শাখা) বিতস্তা, অসিক্নী, পরুষ্ণি অর্জিকিয়া ও শতদ্রু) প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু সেই প্রাচীন নদী সমূহ মধ্যে পবিত্র-তমা ও দেবতা সম্মান-প্রাপ্তা সরস্বতী নদীর লোপ হইয়াছে। সরস্বতীর স্রোত রাজপুতানার মরুভূমে লীন হইয়াছে।

রাজা সুদাস দত্ত রথ, অশ্ব ও অন্যান্য পুরস্কার লইয়া ঋষি বিশ্বামিত্র বিপাস ও শুতুদ্রী উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া বেগবতী স্রোতস্বতীর ক্রোধ প্রশমনার্থ এক সহস্র স্তব প্রণয়ন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, এই সুদাস নৃপতি মহাপরাক্রান্ত যোদ্ধা ছিলেন, দশজন রাজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে তাঁহা-দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং অনান্য অনেক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অনেক সূক্তে বর্ণিত আছে। তিনি ধর্ম্মানুষ্ঠানে ও বিদ্যা চর্চ্চায় উৎসাহ দিতেন, এবং বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ উভয়বংশীয় ব্যক্তিদিগকে সমভাবে আদর ও সম্মান করিতেন। এজন্য এই দুই বংশের মধ্যে যথেষ্ঠ দ্বেষ চলিত; ইহারপর তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা যাইবে।

ঋগ্বেদে পঞ্জাবীয় নদীসমূহের উল্লেখ পুনঃ ২ মিলে বটে, কিন্তু গঙ্গাযমুনার উল্লেখ কদাচিৎ পাওয়া যায়।

পঞ্জাবই যে ভারতীয় আর্য্যদের আদি স্থান, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালে তাঁহারা পাঁচ জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। মঃ ১।৭।৯, মঃ ১।১৭৬।৩, মঃ ৬।৪৬।৭ ঋকে এবং অন্যান্য অনেক স্থানে "পঞ্চক্ষিতির" বা পাঁচটী দেশের উল্লেখ আছে। মঃ ২।২।১০, মঃ ৪।৩৮।১০, ঋকে অন্যান্য স্থানে পঞ্চকৃষ্টি

বা পঞ্চ "কৃষক" সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। এবং মঃ ৩।১১।৪, মঃ ৬।৫১।১১, মঃ ৮।৩২।২২, মঃ ৯।৬৫।২৩ ঋকে "পঞ্চজন" বা পঞ্চজাতির উল্লেখ পাইতেছি।

এই সরল হৃদয়, সাহসী, উদ্যমপূর্ণ পঞ্চবংশের লোকেরা পঞ্জাবীয় নদীসমূহের উর্ব্বরকূলে কৃষি ও গোচারণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। হিমাদ্রি হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র আর্য্য হিন্দুগণ এই পঞ্চজন হইতে উৎপন্ন।

পঞ্জাবের এই পঞ্চ জাতির সামাজিক ও গার্হস্থ্য আচার ব্যবহার ও দৈনন্দিন জীবন পর্য্যালোচনারূপ কুতূহলজনক ও আনন্দজনক কার্য্যে আমরা এখন প্রবৃত্ত হইতেছি। এক মনুষ্য হইতে অনেক মনুষ্যকে এবং এক শ্রেণী হইতে আর এক শ্রেণীকে স্পষ্টরূপে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য পরবর্ত্তী সময়ে যে জন্মগত জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে, ঋগ্বেদের সময় সেই অশুভকর নিয়ম বিধির কোনও চিহ্ন দেখা যায় না, এবং তৎকালে গোমাংস ভোজনে কোন আপত্তি ছিল না, এবং বণিকগণ আনন্দ ও উৎসাহের সহিত সমুদ্র পথে গমন করিতেন, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সে সময়ের ঋষিগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া ধ্যান তপস্যায় জীবন যাপন করিতেন না, পরন্তু ঋষিরা বিষয়ী লোক ছিলেন, বহু গো ও কৃষিভূমি অধিকার করিয়া যুদ্ধে দস্যুদের দণ্ডবিধান করিতেন এবং গোধন ও যুদ্ধে জয়লাভ ও বীরপুত্র লাভ, স্ত্রী ও পুত্রের কল্যাণের জন্য দেবতাদের নিকট প্রার্থনা করিতেন। বস্তুতঃ গৃহীমাত্রেই একপ্রকার ঋষি ছিলেন, স্বগৃহে, সাধ্যানুসারে সপরিবারে, স্বীয় দেবতার স্তুতি করিতেন। এই দৈবকার্য্যে পুত্রকন্যা সকলেই সাহায্য করিত। এই গৃহি-সমাজের মধ্যে কেহ কেহ মন্ত্র রচনায় ও কেহ কেহ যজ্ঞের আড়ম্বরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজা ও ধনী ব্যক্তিরা তাঁহাদের দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করাইয়া তাঁহাদিগকে বিশেষরূপ সমাদর করিতেন। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র-প্রণেতারাও কোন জন্মগত বা ব্যবসায়গত জাতিভুক্ত ছিলেন না। তাঁহারা সাংসারিক লোক ছিলেন, আর্য্যজাতীয় সমস্ত লোকের সঙ্গে মিশিতেন, তাহাদের সহিত বিবাহাদি আদান সম্প্রদান হইত, তাহাদের সঙ্গে একত্রে ধন ও গাভী অধিকার করিতেন, তাহাদের জন্য যুদ্ধে অগ্রসর হইতেন, বস্তুতঃ তাহাদিগের অন্তর্গত লোক ছিলেন।

একজন বীর ঋষি (মঃ ৫।২৩।২) অগ্নির নিকট "সৈন্য পরাজয়ে সমর্থ" একটী পুত্রের জন্য স্তব করিতেছেন। অন্যত্র (মঃ ৬।২০।১) ভরদ্বাজ ঋষি ইন্দ্রের নিকট "সহস্র প্রকার ধন ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রের অধিকার ও শত্রুনিহন্তা একটী পুত্রের" জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। অন্যত্র (মঃ ৯।৬৯।৮) সংসারী ঋষি হিরণ্য স্তব করিতেছেন "হে সোম। তুমি এইরূপে ক্ষরিত হও, যাহাতে আমরা ধনসম্পত্তি, সুবর্ণ, ঘোটক, গাভী, যব ও সন্তান সন্ততি প্রাপ্ত হই।" যোদ্ধা ও কৃষক সম্প্রদায় ভিন্ন ঋষিরা, এক ভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিলেন, সমস্ত ঋগ্বেদের মধ্যে কুত্রাপি তাহার প্রমাণ নাই। *

* ঋগ্বেদের সর্ব্বশেষ মণ্ডলের ৯০ সূঃ ১২ ঋকে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি জাতির উল্লেখ আছে সত্য। কিন্তু সুক্তটী আধুনিক, ঋগ্বেদের অন্যান্য অংশের সমসাময়িক নহে, তাহা ভাষাবিৎ পণ্ডিত মাত্রেই জানেন। ঋগ্বেদের দশ সহস্র মন্ত্রের মধ্যে অন্য কোনও অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির উল্লেখ নাই, এই শব্দ গুলি কুত্রাপি জাতি বিশেষ বুঝাইতে ব্যবহৃত হয় নাই। ব্যাকরণ

সে সময়ে জাতি বিভাগ ছিল না, তাহা ঋগ্বেদে উহার উল্লেখ না থাকা হইতেই প্রমাণীত হইতেছে। পাঁচ কি ছয়শত বৎসর ব্যাপিয়া ঋগ্বেদের মন্ত্রসমূহ প্রণীত হইয়াছিল, ইহাতে আর্য্যদের আচার নীতির ব্যবহার বিশ্বাসের বিস্তর বর্ণনা রহিয়াছে, আর্য্যদের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধসংগ্রাম, বিবাহ ও গার্হস্থ্য রীতিপ্রণালী, স্ত্রীলোকের অবস্থা ও কর্ত্তব্য, যজ্ঞাদি ধর্ম্মাচার, জ্যোতিষ—সকলই বর্ণিত রহিয়াছে। ঋগ্বেদের সময়ে জাতিভেদ ছিল, তথাপি ঋগ্বেদের দশ সহস্র ঋকের কোনও একটী স্থানে এই বিস্ময়কর জাতিভেদ প্রথার কথাটা নাই, তাহা কি সম্ভব? আকারে ঋগ্বেদের এক দশমাংশমাত্র এইরূপ কোনও অধুনিক ধর্ম্মগ্রন্থ আছে কি, যাহাতে জাতিভেদের উল্লেখ নাই?

ঋগ্বেদের সময়ে জাতিভেদের নাস্তিত্ব সম্বন্ধে এই যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বিস্ময়কর প্রমাণ ঋগ্বেদে লক্ষিত হয়। পরবর্ত্তী সংস্কৃত ভাষায় যে "বর্ণ" শব্দ জন্মগত জাতি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ঋগ্বেদে আর্য্য ও অনার্য্যের (গৌর ও কৃষ্ণের) বিভিন্ন শারীরিক বর্ণ (রং) অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। আর্য্যেরা তিন "বর্ণে" বিভক্ত ছিলেন, এমন কুত্রাপি উল্লেখ নাই। (মঃ ৩।৩৪।৯)। ক্ষত্রিয় শব্দ পরবর্ত্তী সংস্কৃতে জন্মগত জাতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু ঋগ্বেদের ইহা বিশেষণ মাত্র, অর্থ "বলশালী", দেবতাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা আছে। ৭।৬৪।২ ঋকে মিত্র ও বরুণকে 'সিন্ধুপতি ও ক্ষত্রিয়' ৭।৮৯ সূক্তের প্রথম চারি মন্ত্রের শেষে বরুণ দেবকে 'সুক্ষত্র' বলিয়া সম্বোধন রহিয়াছে। পুরোহিত জাতি বুঝাইতে আধুনিক সংস্কৃতে বিপ্র শব্দের ব্যবহার আছে, কিন্তু ঋগ্বেদে "জ্ঞানী" "বিজ্ঞ" এই থানে অর্থে বিপ্র শব্দ দেবতাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। ৮।১১।৬ ঋকে "বিপ্রং দেবং অগ্নিং" আছে, অর্থাৎ মেধাবী অগ্নিদেব। পুরোহিত জাতি-বোধক ব্রাহ্মণ শব্দ ঋগ্বেদের শত শত স্থানে শুধু 'ঋক্ প্রণেতা কবি' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ৭।১০৩।৮ ঋকে "ব্রহ্ম কৃণ্বন্ত ব্রাহ্মণাসঃ" আছে অর্থ "স্তুতিকারী স্তোতৃগণ।" ১০।৭১।৯ ঋকে আছে—"যাহারা দেব স্তুতি করেনা এবং সোমযাগ করেনা, তাহারা পাপযুক্ত হইয়া কেবল লাঙ্গল চালনার উপযুক্ত হয়। অর্থাৎ যাহারা ইহকাল পর্য্যালোচনা করিত ও স্তুতি অভ্যাস ও সোম যাগ করিত, তাহারাই স্তোতা হইত, জন্মগুণে স্তোতা হইত না। যাহারা ঐ ধর্ম্মক্রিয়া সাধনে অসমর্থ, তাহারা কৃষক বা তন্তুবায় হইত, জন্মদোষে কৃষক বা তন্তুবায় হইত না।

এইরূপ অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত করা যায় স্থানাভাবে বিরত রহিলাম। কিন্তু একটী উদাহরণ এস্থলে সংগ্রহ না করিয়া পারিলাম না। ঋগ্বেদ-সুলভ নিষ্কপট ভাবে এক ঋষি সকরুণচিত্তে বলিতেছেন, "দেখ, আমি স্তোত্রকার, আমার পিতা চিকিৎসক, আমার মাতা প্রস্তরের উপর যব-ভর্জন-কারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি। যেরূপ গাভীগণ গোষ্ঠ মধ্যে তৃণ কামনায় ভিন্ন দিকে বিচরণ করে, তদ্রূপ আমরা ধন কামনায় তোমার পরিচর্য্যা করিতেছি। অতএব, হে সৌম্য! ইন্দ্রের

বিৎ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ঋকের ভাষাও বৈদিক ভাষা নহে। ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। এই সূক্তের ভাবও আধুনিক।

জন্য ক্ষরিত হও।" যাঁহারা বৈদিক সময়ে জাতিভেদ প্রথা ছিল মনে করেন, তাঁহারাই বলুন, যে পরিবারে পুত্র মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি, পিতা বৈদ্য, এবং মাতা ময়দা-ওয়ালী, তাঁহারা কোন জাতি ভুক্ত? আমরা ইতি-পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি, ঋগ্বেদীয় ঋষিরা বলবান্ যোদ্ধা ছিলেন। বিশ্বামিত্র যেমন মন্ত্র-প্রণেতা ঋষি, তেমনি দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা ছিলেন। পরবর্ত্তী হিন্দুরা ঋষি আবার যোদ্ধা, এই কথায় স্তম্ভিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে গুণবলে ব্রাহ্মণ হইলেন, এইরূপ অতি মনোরঞ্জক পৌরাণিক গল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন। সত্য সঙ্গোপনের বৃথা চেষ্টা। আসল কথা এই, বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণও নহেন, ক্ষত্রিয়ও নহেন। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বিভেদ প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বকালীন ঋক্‌বেদীয় ঋষি, একাধারে পুরোহিত ও যোদ্ধা।

ঋগ্বেদের কুত্রাপি দেবতার প্রতিমূর্ত্তি অথবা প্রতিমা রক্ষা করিবার জন্য মন্দির, অথবা পূজাদি সম্পাদন করিবার জন্য বিশেষ স্থানে সমবেত হইবার উল্লেখ নাই। প্রত্যেক গৃহই স্বগৃহে গৃহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে সরল ও মনোহর স্তব কীর্ত্তন করিতেন। ঋগ্বেদীয় স্তব আর্য্য জাতীয় সকল ব্যক্তির সাধারণ সম্পত্তি ছিল। স্ত্রীলোকেরা এই সকল যজ্ঞে সাহায্য করিতেন, আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির আয়োজন করিতেন, উদূখলে তাহা প্রেষণ করিতেন, সোমরস বাহির করিতেন, এবং কখন হস্তে মেষলোমে তাহা ছাকিয়া পরিষ্কৃত করিতেন। অনেক স্থানে স্বামী স্ত্রী একত্রে যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া প্রার্থনা করিতেন, যেন তাঁহারা এক সঙ্গে স্বর্গে যাইতে পারেন। * এতৎ সম্বন্ধে একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ ঋষির (বৈবস্বত মনুর) কয়েকটী কথা পাঠকবর্গের কুতূহল নিবৃত্ত্যর্থ উদ্ধৃত করিতেছি। "৫। ৬ হে দেবগণ। যে দম্পতী একমনে অভিষব করে, সোম শোধন করে, এবং মিশ্রণ দ্রব্য দ্বারা সোম মিশ্রিত করে, তাহারা ভোজনযোগ্য অন্নাদি লাভ করে এবং মিলিত হইয়া যজ্ঞে উপস্থিত হয়, তাহারা অন্নার্থ কোথাও গমন করে না। ৭। তাহারা দেবগণকে অবলাপ করে না, তোমাদের অনুগ্রহ নিবারণ করিতে ইচ্ছা করে না, মহা অন্ন দ্বারা তোমাদের পরিচর্য্যা করে। ৮। তাহারা পুত্রবিশিষ্ট, কুমার বিশিষ্ট, স্বর্ণ ভূষিত হইয়া উভয়ে সমস্ত পূর্ণ আয়ু লাভ করে। ৯। প্রিয় যজ্ঞ বিশিষ্ট এই দম্পতীর স্তুতি দেবগণ কামনা করেন, ইহারা দেবগণকে সুখপ্রদ অন্ন প্রদান করে। অমরত্বের জন্য অর্থাৎ সন্ততি লাভার্থ পরস্পর আলিঙ্গন করেন এবং দেবগণের পরিচর্য্যা করেন।" অষ্টম মণ্ডল ৩১ সূক্ত। এইরূপে একত্রে যজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন ও সংসার সুখ লাভের কথা ঋগ্বেদের সর্ব্বত্র রহিয়াছে।†

বিদুষী রমণীগণ নিজেই ঋষি, স্তোত্র-মন্ত্র নিজে প্রণয়ন করিয়া পুরুষদের ন্যায় হোম করিতেন, এই সকল বৃত্তান্ত পাঠ করিলে কোন্ হিন্দুর হৃদয়ে আনন্দ না হয়? প্রাচীন

---

* ১। ১৩১। ৩ ঋকে আছে "তোমার সেবক ও পাপদ্বেষী যজমান দম্পতী তোমার (ইন্দ্রের) তৃপ্তির অভিলাসে অধিক পরিমাণে হব্যপ্রদান করতঃ * * * যজ্ঞ বিস্তার করিতেছে। তাহারা গোধন ইচ্ছাকরে এবং স্বর্গ গমনে উৎসুক।" ৫। ৪৩। ১৫ ঋকে আছে "হে অগ্নি! তুমি বলশালী, পরিণীত দম্পতী ধর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা জীর্ণ হইয়া তোমাকে প্রচুর হব্য প্রদান করিতেছে।"

† স্ত্রীলোকেরা স্তোত্র মন্ত্রে-অনাধিকারিণী, নিরিন্দ্রিয়, শীলস্নেহশূন্য মিথ্যা পদার্থ, এই পৈশাচিক মত অতি আধুনিক।

কালে স্ত্রীলোকদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে কোন অনিষ্টকর অন্তরায় ছিল না, তাহাদিগকে অন্তঃপুরে বদ্ধ বা অশিক্ষিত রাখিয়া সমাজে তাহাদের প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখিবার কোন চেষ্টা করা হইত না। অন্তঃপুরবদ্ধ রমণীর কথা সমস্ত ঋগ্বেদে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। পরন্তু সেকালের নারীগণ সমাজে তাহাদের প্রাপ্য স্থান অধিকার করিয়া মর্য্যাদা সহকারে যজ্ঞ সম্পাদনে সহায়তা করিয়া এবং সমাজে স্ব স্ব পবিত্র মহিমা বিস্তার করিয়া কালযাপন করিতেন। যে বিদুষী "ঋষি" বিশ্ববারা ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা করিয়াছেন, হিন্দু মাত্রই সমাদরে তাঁহার চিত্র হৃদয়ে ধারণ করিবেন। ধর্ম্মনিষ্ঠ বিশ্ববারা নিজে ঋক্-স্তোত্র প্রণয়ন করিয়া নিজে যজ্ঞাহুতি করিতেন এবং দম্পতিরা দেহমনোবাক্-সংযত হইয়া দাম্পত্য জীবন যাপন করুক, নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অগ্নিদেবের নিকট এই প্রকার স্তুতি করিতেন। (৫।২৮।৩)* ঋগ্বেদে এইরূপ অনেক রমণী 'ঋষির' প্রমাণ রহিয়াছে।

সেকালে কন্যামাত্রেরই বিবাহ দিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম ছিল না। পরন্তু কন্যারা কেহ কেহ আমরণ পিতৃগৃহে অনূঢ়াবস্থায় থাকিত, এবং পৈতৃক সম্পত্তি দাবী করিয়া তাহার অংশভাগী হইত, এইরূপ অনেক প্রমাণ ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। † অন্যত্র (১।১২৪।৪) ঊষা "যেমন জগতীজনকে জাগরিত করেন" গৃহিণী তেমনি সর্ব্বাগ্রে জাগরিত হইয়া সকলকে জাগরিত করিতেন এবং গৃহস্থিত সকলকে স্বকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া গৃহকার্য্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতেন। এইরূপ গৃহিণীপনার জন্য হিন্দুরমণী সেই প্রাচীন সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত জগতের সর্ব্বত্র আদৃত ও সম্মানিত। তথাপি গুপ্তপ্রসবিনী (২।২৯।১) ভ্রাতৃরহিতা বিপথগামিনী ও পতি-বিদ্বেষিণী দুষ্টাচারিণী ভার্য্যার (৪।৫।৫) উল্লেখ আছে। দশম মণ্ডলের ৩৪।৪ ঋকে কথিত আছে, "পাশার আকর্ষণ বিষম কঠিন, যদি কাহার ধনের প্রতি পাশার লোভ-দৃষ্টি পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার পত্নী পর্য্যন্ত ব্যভিচারিণী হয়।"

পিতামাতারা কন্যাদিগকে স্বামিমনন বিষয়ে অধিকার দিতেন, একবারে তাহাদিগের অভিমত না জানিয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিতেন না। কিন্তু সকল স্থানেই যে কন্যারা সৎ বরে স্বয়ংবর করিতেন, তাহা অনুরক্ত হয়। কিন্তু যে স্ত্রীলোক ভদ্র,

* প্রথম ঋকে আছে 'বিশ্ববারা পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া এবং দেবগণের স্তবোচ্চারণ পূর্ব্বক হব্যপাত্র লইয়া অগ্নির অভিমুখে গমন করিতেছে।" অত্রি গোত্রজা বিশ্ববারা নাম্নী রমণী এই সূক্তের ঋষি। তিনি ৩ ঋকে বলিতেছেন "হে অগ্নি আমাদিগের বিপুল ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত শত্রুগণকে দমন কর, তোমার দীপ্তি সকল উৎকর্ষ লাভ করুক, তুমি দাম্পত্য সম্বন্ধ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ কর, এবং শত্রুগণের পরাক্রম আক্রমণ কর।" বিশ্ববারা স্বদেশ হিতৈষণায় অনুপ্রাণিত।

† ২।১৭।৭ ঋকের সায়ন ব্যাখ্যা করিতেছেন, "পতিং অলভমানা সতী দুহিতা সমানাৎ আত্মনঃ পিত্রোশ্চ সাধারণাৎ সদসঃ গৃহাৎ * * * যথা ভাগং যাচতে।" ইহা হইতে সপষ্ট অনুমান হয়, অনূঢ়া কন্যা পিতৃসম্পত্তির অংশ পাইতেন। প্রাচীন মনুস্মৃতিতে 'কন্যা ঋতুমতী হইয়া আমরণ গৃহে থাকুক, তথাপি পিতা তাহাকে গুণহীন বরে সম্প্রদান করিবেন না' এবং অন্যত্র "ভ্রাতারা অনূঢ়া ভগিনীদিগকে স্ব স্ব অংশ হইতে এক চতুর্থাংশ প্রদান করিবেন, না দিলে অধোগতি প্রাপ্ত হইবেন" এই রূপবিধি আছে।

নয়। কেহ কেহ "কেবল অর্থেই প্রীত হইয়া নারীসহবাসাভিলাষী মনুষ্যের প্রতি অনুরক্ত হয়। কিন্তু যে স্ত্রীলোক ভদ্র যাহার শরীর সুগঠন, সেই (কন্যা) অনেক লোকের মধ্য হইতে আপনার মনোমত প্রিয়পাত্রকে পতিত্বে বরণ করিবে।" (১০।২৭।১২) এক সময়ে হিন্দুদের মধ্যে যে স্বয়ংবর প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, আমরা উদ্ধৃত ঋকে তাহারই পূর্ব্বাভাস পাইতেছি। তথাপি কন্যা স্বামিবরণে পিতা মাতার আদেশ উপদেশে চালিত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, এবং তাহা হওয়াও পিতৃবংশজা কন্যার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। এখনকার ন্যায় সেই প্রাচীন সময়েও পিতা মাতা কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা করিয়া সম্প্রদান করিতেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

বিবাহ সম্বন্ধীয় আচার এবং স্বামিস্ত্রী প্রতিজ্ঞা বন্ধন সর্ব্বপ্রকারে বিবাহোচিত বলিয়া বোধ হয়। যে প্রণালীতে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইত, ঋগ্বেদের সর্ব্বশেষ মণ্ডল (৮৫ সূক্ত) হইতে তাহার মনোহর বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকবর্গ প্রথম ঋকে দেখিবেন যে, অস্বাভাবিক বাল্যবিবাহ প্রথা তখন প্রচলিত ছিল না। পরন্তু কন্যাদের যৌবন উপস্থিত হইলে বিবাহ হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। "২১। হে বিশ্ববসু (বিবাহের দেবতা)। এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর, যেহেতু এই কন্যার বিবাহ হইয়াছে। নমস্কার ও স্তবের দ্বারা বিশ্ববসুকে স্তব করি। আর যে কোন কন্যা পিতৃগৃহে বিবাহলক্ষণযুক্তা হইয়া আছে, তাহার নিকট গমন কর*, সেই তোমার ভাগস্বরূপ জন্মিয়াছে, তাহার বিষয় অবগত হও। ২২। হে বিশ্ববসু! এই স্থান হইতে গাত্রোত্থান কর। নমস্কারদ্বারা তোমাকে পূজা করি। নিতম্ববতী অন্য অবিবাহিতা নারীর নিকটে যাও, তাহাকে পত্নী করিয়া স্বামি-সংসর্গিনী করিয়া দাও। ২৩। যে সকল পথ দিয়া আমাদিগের বন্ধুগণ বিবাহের জন্য কন্যা প্রার্থনা করিতে যান, সেই সকল পথ যেন সরল ও কণ্টকবিহীন হয়। অর্য্যমা এবং ভগ আমাদিগকে উত্তমরূপে লইয়া চলুন। হে দেবগণ। পতিপত্নী যেন পরস্পর উৎকৃষ্টরূপে গ্রথিত হয়। ২৪। হে কন্যা! সুন্দর মূর্ত্তিধারী সূর্য্যদেব যে বন্ধনের দ্বারা তোমাকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বরুণের বন্ধন হইতে তোমাকে মোচন করিতেছি। যাহা সত্যের আধার, যাহা সৎকর্ম্মের আবাসস্থানস্বরূপ, এইরূপ স্থানে তোমাকে নিরুপদ্রবে তোমার পতির সহিত স্থাপন করিতেছি। ২৫। এই নারীকে এই স্থান হইতে মোচন করিতেছি, অপর স্থান হইতে নহে।† ২৬। (হে কন্যা) পূষা তোমাকে হস্তে ধারণ করিয়া এ স্থান হইতে লইয়া যাউন। অশ্বিদ্বয় তোমাকে রথে বন্ধন করুন। গৃহে যাইয়া গৃহের কর্ত্রী হও। তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভুত্ব কর। ২৭। এই স্থানে সন্তানসন্ততি লাভ করিয়া তোমার প্রীতি লাভ হউক। এই গৃহে সাবধান হইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন কর। এই স্বামীর সহিত আপন শরীর সম্মিলিত কর, বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত নিজগৃহে প্রভুত্ব কর। ৩৩। এই বধূ অতি লক্ষণান্বিতা, তোমরা এস, এ সৌভাগ্যবতী অর্থাৎ স্বামীর প্রিয়পাত্রী হউক, এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজ

* বিশ্বাবসু বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বিবাহ হইয়া গেলে তাহার অধিষ্ঠাতৃত্ব থাকে না।

† অর্থাৎ পিতৃকুল হইতে মোচন করিয়া স্বামিকুলে গ্রথিত করিলাম।

নিজ গৃহে প্রতিগমন কর। ৩৪। এই বস্ত্র দূষিত, অগ্রাহ্য, মালিন্যযুক্ত ও বিষযুক্ত। ইহা ব্যবহারের যোগ্য নহে। যে ব্রহ্মনামা ঋত্বিক বিদ্বান, সে বধূর বস্ত্র পাইতে পারে (১) ৩৯। অগ্নি, লাবণ্য ও পরমায়ুঃ দিয়া বনিতাকে প্রদান করিলেন। এই বনিতার পতি দীর্ঘায়ুঃ হইয়া একশত বৎসর জীবিত থাকিবে। ৪০। (হে কন্যা) প্রথমে তোমাকে সোম বিবাহ করে, পরে গন্ধর্ব্ব বিবাহ করে, তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি, মনুষ্য সন্তান তোমার চতুর্থ পতি। (২) ৪১। (বর বলিতেছেন) সোম সেই নারী গন্ধর্ব্বকে দিলেন, গন্ধর্ব্ব অগ্নিকে দিলেন, অগ্নি ধনপুত্রসমেত এই নারী আমাকে দিলেন। (৩) ৪২। হে বরবধূ! তোমরা এই স্থানেই উভয়ে থাক, পরস্পর পৃথক হইও না, নানা খাদ্য ভোজন কর, আপন গৃহে আসিয়া পুত্রপৌত্রদিগের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ ও ক্রীড়া বিহার কর। ৪৩। (বরবধূ বলিতেছেন) প্রজাপতি আমাদিগের সন্তানসন্ততি উৎপাদন করিয়া দিন, অর্য্যমা আমাদিগকে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত মিলন করিয়া রাখুন। হে বধূ! তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্ন হইয়া পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর। আমাদিগের দাসদাসী এবং পশুগণের মঙ্গল বিধান কর।

৪৪। তোমার চক্ষু যেন দোষশূন্য হয়, তুমি পতির কল্যাণকরী হও, পশুদিগের মঙ্গলকারিণী হও, তোমার মন যেন প্রফুল্ল এবং লাবণ্য যেন উজ্জ্বল হয়। তুমি বীরপুত্রপ্রসবিনী এবং দেবতাদিগের প্রতি ভক্ত হও। আমাদিগের দাসদাসী ও পশুগণের মঙ্গল বিধান কর। ৪৫। হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! এই নারীকে তুমি উৎকৃষ্ট পুত্রবতী ও সৌভাগ্যবতী কর। ইহার গর্ভে দশপুত্র সংস্থাপন কর। পতিকে লইয়া একাদশ ব্যক্তি কর। ৪৬। বধূর প্রতি) তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রূকে বশকর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাটের ন্যায় হও। ৪৭। (বরবধূ বলিতেছেন) তাবৎ দেবতাগণ আমাদিগের উভয়ের হৃদয় মিলিত করিয়া দিন। বায়ু, ধাতা ও বাগ্দেবী আমাদিগের উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত করুন।"

উদাহরণটী সুদীর্ঘ হইলেও পাঠকের পক্ষে তাহা বিরক্তিকর হইবে না। বিবাহ দিনে যে সমুচিত আচার ব্যবহার হইত, এবং যুবতী নববধূ স্বামি-গৃহে ও স্বামি-হৃদয়ে যে অধিকার প্রাপ্ত হইতেন, এই মন্ত্র হইতে তাহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারি।

অপরাপর জাতি এবং আপরাপর দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও প্রাচীন সময়ে হিন্দু রাজা ও ধনাঢ্য ব্রাহ্মণের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। সপত্নী বিদ্বেষ বহু বিবাহের অবশ্যম্ভাবী ফল, এবং ঋগ্বেদের শেষভাগে দশমমণ্ডলের ১৪৫ ও ১৫৯ সূক্তে স্ত্রীরা সপত্নীদিগকে অভিসম্পাত করিতেছেন, তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। ঋগ্বেদের সর্ব্বশেষ ভাগে এই কুপ্রথা প্রবল হইয়া থাকিবে, কারণ প্রথম নয় মণ্ডলে কদাচিৎ বহু বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়।

---

(১) ঋকবেদের সময়ে আচার এই ছিল। এক্ষণে যেমন নাপিত বিবাহের বস্ত্র লাভ করে, তৎকালে সেই বস্ত্র ঋত্বিকের প্রাপ্য ছিল।

(২) মনুষ্য জীবনের সীমা ঋগ্বেদের শতবৎসর বর্ষ। ঋগ্বেদের অনেক স্থলে এইরূপ উল্লেখ আছে। সহস্র বৎসর ঋষিদের পরমায়ুর গল্প পৌরাণিক সময়কার সৃষ্টি।

(৩) কন্যাকে বোধ হয় সোম ও গন্ধর্ব্ব ও অগ্নির নিকট সমর্পণ করিয়া পরে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইত।

দশম মণ্ডলের ১৬২, ১৮৩, ও ১৮৪ সূক্তে গর্ভাধানের উল্লেখ আছে। ৫।৭৮।৭ ঋকে জাত কর্ম্মের কথা রহিয়াছে। ৩।৩১ সূক্তে উত্তরাধিকারের বিধি সম্বন্ধে যে দুইটী ঋক্ আছে, তাহা আজ গুরুতর বিবেচনায় এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি "১। পুত্রহীন পিতা রেতোধা জামাতাকে সম্মানিত করতঃ শাস্ত্রানুশাসন ক্রমে দুহিতাজাত পৌত্রের নিকট গমন করে। (অপুত্র) পিতা দুহিতার গর্ভ হইবে বিশ্বাস করতঃ প্রসন্ন মনে শরীর ধারণ করে। * ২। ঔরস পুত্র দুহিতাকে পৈতৃক ধন দেয় না। তিনি উহাকে বিবাহ দিবেন। যদি পিতা মাতা পুত্র ও কন্যা উভয়কেই উৎপাদন করেন, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ক্রিয়া কর্ম্ম করেন, এবং অন্য সম্মানিতা।" তৃতীয় মণ্ডলের ৩১ সূক্ত।

হিন্দুদিগের দায়ভাগের এই প্রথম অঙ্কুর। পুত্র ও কন্যা উভয় বর্ত্তমানে পুত্র পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী, আর পুত্রাভাবে দৌহিত্র অধিকারী। দেখিতে নিম্নোদ্ধৃত ঋকে দত্তক গ্রহণ করিবার সূত্রপাত পাওয়া যায়। "৭। অঋণী ব্যক্তির ধন পর্য্যাপ্ত হয়, অতএব আমরা নিত্যধনের পতি হইব। হে অগ্নি। যেন অপত্য 'অন্যজাত' না হয়। অবেত্তার পথ জানিও না। ৮। অন্যজাত পুত্র সুখকর হইলেও তাহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে বা মনে করিতে পারা যায় না। আর সে পুনরায় আপন স্থানেই গমন করে। অতএব অন্নবান্ শত্রু নাশক নবজাত পুত্র আমাদের নিকট আগমন করুক।" সপ্তম মণ্ডল ৪র্থ সূক্ত।

এই পরিচ্ছেদে বিবাহ ও দায়ভাগের কথা লিখিয়াছে। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার কথা আনুষঙ্গিক হইবে না। ঋগ্বেদের যম নরকের দেবতা নহেন, তিনি ন্যায়বান্ ব্যক্তিদের স্বর্গের দেবতা, এবং মৃত্যুর পরে সৎ লোকের পুরস্কার দাতা। দশম মণ্ডলের ১৪ সূক্ত হইতে কতিপয় ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি—"৭। (যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহাকে সম্বোধন করিয়া এই উক্তি) আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে পথ দিয়া যে স্থানে গিয়াছেন, তুমিও সেই পথ দিয়া সেই স্থানে যাও। সেই যে দুই রাজা যম আর অরুণ, তাঁহারা সুধা প্রাপ্ত হইয়া আমোদ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যাইয়া দর্শন কর। ৮। সেই চমৎকার স্বর্গধাম পিতৃলোকের সঙ্গে মিলিত হও, ও যমের সহিতও ধর্ম্মানুষ্ঠান ফলের সহিত মিলিত হও। পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত নামক গৃহে প্রবেশ কর এবং উজ্জ্বল দেহ ধারণ কর। ৯। (শ্মশানদাহ কালে উক্তি) হে ভূত প্রেতগণ। দূর হও, চলিয়া যাও, সরিয়া যাও, পিতৃলোকেরা তাঁহার জন্য এই স্থান প্রস্তুত করিয়াছেন। এই স্থান দিবা দ্বারা, জল দ্বারা, আলোক দ্বারা শোভিত। যম এই স্থান মৃত ব্যক্তিকে দিয়া থাকেন। ১০। হে মৃত। এই যে দুই [যম দ্বাররক্ষী] কুক্কুর, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষুঃ ও বর্ণ বিচিত্র, ইহাদের নিকট দিয়া শীঘ্র চলিয়া যাও। তৎপরে যে সকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোক যমের সহিত সর্ব্বদা আমোদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়া তাহাদিগের নিকট গমন কর। ১১। হে যম। তোমার প্রহরীস্বরূপ যে দুই কুক্কুর

---

*পূর্ব্বকালে পুত্র না হইলে কন্যার বিবাহ দিবার সময় জামাতার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইত যে, ঐ কন্যার পুত্র কন্যার পিতার হইবে। কন্যার পুত্র দৌহিত্র হইয়াও পৌত্রের কার্য্য করিবে।

আছে, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষু, যাহারা পথ রক্ষা করে, যাহাদিগের দৃষ্টিপথে সকল মনুষ্যকেই পতিত হইতে হয়, তাহাদিগের কোপ হইতে এই মৃত ব্যক্তিকে রক্ষা কর। হে রাজা! ইহাকে কল্যাণভাগী ও নীরোগী কর।'" বৈদিক যুগে পরকালের সুখসম্বন্ধে লোকের যে প্রকার বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছিল, পূর্ব্ব উদ্ধৃত সূক্ত হইতে তাহা জানা যাইতেছে।

প্রাচীনকালে মৃতদেহ দাহ না করিয়া সমাধি করিত, এমন কথা কোন্ কোন্ মন্ত্রে পাওয়া যায়? "১০। হে মৃত! এই জননীস্বরূপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকটে গমন কর। ইনি সর্ব্বব্যাপিনী। ইহার আকৃতি সুন্দর। ইনি যুবতী স্ত্রীর ন্যায় তোমার পক্ষে রাশাকৃত মেষলোমের মত কোমল স্পর্শ হয়েন। তুমি দক্ষিণা দান অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়াছ। ইনি যেন নিঋতি হইতে তোমাকে রক্ষা করেন। হে পৃথিবী! তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়া রাখ, ইহাঁকে পীড়া দিও না। ইহাঁকে উত্তম উত্তম সামগ্রী, উত্তম উত্তম প্রলোভন দাও। যেরূপ মাতা আপন অঞ্চলের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কর। ১২। পৃথিবী উপরে স্তূপাকার হইয়া উত্তমরূপ অবস্থিতি করুন। সহস্র ধূলি এই মৃতের উপর অবস্থিতি করুক। তাহারা ইহার পক্ষে ঘৃতপূর্ণ গৃহস্বরূপ হউক। প্রতিদিন এই স্থানে তাহারা ইহার আশ্রয় স্থান স্বরূপ হউক।" দশম মণ্ডল ১৮ সূক্ত।

বৈদিকযুগে যে শবদাহ করা হইত, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়—"হে অগ্নি! এই মৃত ব্যক্তিকে একেবারে ভস্ম করিও না, ইহাকে ক্লেশ দিও না। ইহার চর্ম্ম বা ইহার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিও না। হে জাতবেদা! যখন ইহার শরীর তোমার তাপে উত্তমরূপে পক্ক হয়, তখনই ইহাঁকে ইহলোকের নিকট পাঠাইয়া দাও।"১০।১৬।১

দশম মণ্ডলের ১৮ মন্ত্রে বিধবা বিবাহ বিধেয়, তৎসম্বন্ধে যে সুবিখ্যাত দুইটী ঋক্ রহিয়াছে, এস্থানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। "৮ হে নারী! সংসারের দিকে ফিরিয়া চল। গাত্রোত্থান কর, তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ সে গতাসু হইয়াছে, চলিয়া এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহণ করিতেছেন এবং বিবাহ করিতে প্রস্তুত, সেই পতির পত্নী হও।"

সায়নাচার্য্য তৈত্তিরিয়া আরণ্যকে এই ঋক উদ্ধৃত করিয়া তাহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমি তাহার অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা অনুবাদ করিলাম। উক্তস্থলে যে দিধীষু শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষায় তাহার একভিন্ন দুই অর্থ নাই—স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় স্বামীকে "দিধীষু" বলে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মহাপণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের এক প্রবন্ধের শেষাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। "বৈদিকযুগে যে বিধবার বিবাহ প্রচলিত ছিল, তৎসম্বন্ধে অনেক অকাট্য যুক্তি ও নিঃসন্দেহ প্রমাণ রহিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় অতি প্রাচীন সময় হইতে বিধবাবিবাহকারী পুরুষকে "দিধীষু", দ্বিতয়-পতি বিবাহকারিণী বিধবাকে পরপূর্ব্বা, এবং বিধবার দ্বিতীয়-পতির ঔরসজাত পুত্রকে 'পৌনর্ভব' বলে। এই সকল প্রমাণই যথেষ্ট।"

নিতান্ত দুঃখ ও লজ্জার সহিত উপসংহারকালে আমরা এই সূক্তের অন্যতম ঋক্ উদ্ধৃত করিতেছি। এই ঋকের কোন

অপরাধ নাই; কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তন ও দুষ্ট অর্থ কল্পনা করিয়া সতীদাহ নামক বিধবা দাহ-প্রথার সমর্থন চেষ্টা করা হইয়াছিল। এই নিষ্ঠুর প্রথা ঋগ্বেদ-সম্মত কার্য্য নহে। ১০।১৮।৭ ঋক্‌টী এস্থানে অনুবাদ করিতেছি, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর গৃহস্থ নারীগণের পুনরায় গৃহে আসিবার কথা বলিয়াছে মাত্র। "এই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া মনোমত পতি লাভ করিয়া অঞ্জন ও ঘৃতের সহিত গৃহে প্রবেশ করুন্। এই সকল বধূ অশ্রু পাত না করিয়া রোগে কাতর না হইয়া উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করিয়া (সকলের) অগ্রে আগমন করুন।"

মূলে "আরোহন্তু জনয়ঃ যোনিমগ্রে" আছে। বিধবা দাহের কথা কুত্রাপি নাই। উদ্ধৃত ঋকের শেষোক্ত "অগ্রে" শব্দকে "অগ্নেঃ" এইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া, মূলের পরিবর্ত্তন এবং কদর্য্য কল্পনা পূর্ব্বক বাঙ্গালা-দেশের পণ্ডিতেরা জঘন্য বিধবাদাহ প্রথার সমর্থন চেষ্টা করিয়াছিলেন। আধুনিক কুপ্রথাগুলি সংরক্ষণার্থে কপট ব্যবসায়িগণ। প্রাচীন শাস্ত্রের যে ভূরি ভূরি অযথা ও মিথ্যা অর্থ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই কার্য্যটী সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও জঘন্য।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

সরস্বতীপূজা। (১)

এক সময় কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—আমরা মাটির সরস্বতী পূজা করি কেন? এ দেশে কি এইরূপই সরস্বতীর পূজা হইত? আমি তাহাতে উত্তর দিয়াছিলাম,—না মহাশয়। এই ভারতভূমি যত দিন প্রকৃত সারস্বত আশ্রম ছিল, তত দিন ভগবতী মৃণ্ময়ী ছিলেন না, চিন্ময়ী ছিলেন। যতদিন মা সরস্বতী,—

"পুণ্যদা পুণ্যজননী পুণ্যতীর্থস্বরূপিণী।
পুণ্যবদ্ভির্নিষেব্যা চ স্থিতিঃ পুণ্যবতাং সদা।
তপস্বিনাং তপোরূপা তপস্যাকাররূপিণী।
কৃতপাপেধ্মদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী।
জ্ঞানে সরস্বতীতোয়ে মগ্নং যৈর্মানবৈর্ভুবি।
তেষাং স্থিতিশ্চ বৈকুণ্ঠে সুচিরং হরিসংসদি॥"

পুণ্যদাত্রী, পুণ্যজননী ও পুণ্যতীর্থস্বরূপিণী ছিলেন, যত দিন মা পুণ্যাত্মা সাধুগণের আরাধ্যা ও স্থিতিরূপিণী ছিলেন, যত দিন তিনি তপস্বিগণের তপস্যারূপিণী ও তপস্যার মাপ্রকৃতি ছিলেন, তত দিন ভারতবর্ষে তাঁহার চিন্ময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির পূজা হইত, ভক্তগণ সেই জ্বলদগ্নিরূপিণী ব্রহ্মময়ীর তেজঃপ্রভায় তৃণকাষ্ঠের ন্যায় সমস্ত কলুষরাশি দগ্ধ করিত; সেই জ্ঞানময় সরস্বতী-সলিলে নিমগ্ন হইয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন-

(১) এ প্রস্তাবে যে সকল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা বলা হইয়াছে, তাহা শঠগণেরই পক্ষে, আজ যাঁহারা ভক্তিভাবে বিদ্যাদেবীর পূজা করিয়া থাকেন, সেই পূজনীয় আচার্য্যগণ আমাদের পরমারাধ্য গুরু।

পূর্ব্বক অনন্তকালের জন্ত শ্রীহরির সহবাস লাভ করিত। ক্রমে অদৃষ্টচক্রে ভারতবর্ষ সারস্বত আশ্রম ঘুচিয়া পাষণ্ড-ভূমিতে পরিণত হইতে লাগিল, মা সরস্বতীও আমাদের দুর্দ্দশা ভাবিয়া ভাবিয়া 'মাটি' হইলেন, তাই আমরা এক্ষণে মাটির সরস্বতী পূজা করিয়া থাকি।

খ্যাতনামা স্বর্গীয় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের দারুময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া খেদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা শয়নমুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ॥"

এক ভার্য্যা স্বভাবত বড়ই প্রবলা,
আর ভার্য্যা স্বভাবত বড়ই চপলা,
পুত্র এক বিশ্বজয়ী দুরন্ত মদন,
সমুদ্রে সর্পের শয্যা, বিহঙ্গ বাহন, (২)
এ সব ঘরের দুঃখ দিবা বিভাবরী,
ভাবিয়া ভাবিয়া কাষ্ঠ হ'য়েছেন হরি।

এইরূপে আমাদের হাতে প'ড়িয়া সকল দেবতাই মাটি হইয়াছেন, কেহ কাষ্ঠ হইয়াছেন, কেহ বা পাথর হইয়াছেন।

ভক্তচূড়ামণি তুলসীদাস বলিয়াছিলেন,—
তুলসী পিঁদনে হরি মেলে তো,
মেয়্ পেদে কুঁদা আউর ঝাড়্,
পাথর পূজনে হরি মেলে তো,
মেয়্ পূজে পাহাড়্" ॥

"কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খানাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা"

পূজার পরদিনেই আমরা মা সরস্বতীকে বিসর্জ্জন দিয়া থাকি; এটা মড়ার উপর খাড়ার ঘা, কেন না আমরা বহুকাল হইতেই মাকে অতল জলে বিসর্জ্জন করিয়াছি। এক্ষণে তাঁহার পরিবর্ত্তে ছষ্ট সরস্বতী আসিয়া আমাদের ঘাড়ে চাপিয়াছেন, তিনিই বৎসর বৎসর মূর্ত্তিরূপে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগের টোলে আসিয়া দর্শনী কুড়াইয়া থাকেন। পূজার পরদিনেই ভোঁ ভাঁ, কা কস্য পরিদেবনা, টোলে আর সন্ধ্যা দেওয়া হয় না। স্থানভ্রষ্ট শৃগাল, কুকুর ও বিড়াল প্রভৃতিরা পুনরায় আসিয়া স্ব স্ব স্থান অধিকার করে। ঐ সকল কৃতজ্ঞ জন্তরাই আশ্রয়দাতা ভট্টাচার্য্যদিগের নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করে 'যজন' 'যাজন' 'অধ্যয়ন' 'অধ্যাপন' ও 'দান' প্রকারান্তরে উহারাই সম্পন্ন করে, ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে কেবল 'প্রতিগ্রহ' কার্য্যটি ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ভট্টাচার্য্যেরা অতি দয়ালু, বৎসরের মধ্যে একটি দিন মাত্র ঐ সকল জন্তর আশ্রম পীড়া উৎপাদন করেন।

আমাদের পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় পাঠদশায় অধ্যাপকের অনুরোধে মৃণ্ময়ী সরস্বতীর একটি স্তব লিখিয়াছিলেন। সত্যপ্রিয় সুরসিক অধ্যাপক ঐ সুগ্রন্থিত স্তবটি দেখিয়া আমোদ করিয়াছিলেন। স্তবটি এই,—

মৃণ্ময়ী সরস্বতীর স্তব।

"লুচী-কচুরী-মতিচুর-শোভিতম্
জিলেপি-সন্দেশ-গজা-বিরাজিতম্।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম্॥"
কিন্তু সেই ফলারইবা এখন কোথায়?

(২) 'স্বভাবত বড়ই প্রবলা' ভার্য্যাটি সরস্বতী, 'স্বভাবত বড়ই চপলা' ভার্য্যাটি লক্ষ্মীঠাকুরাণী, ইনি কোথাও স্থির থাকিতে পারেন না। জগন্নাথ অর্থাৎ নারায়ণের এই দুইটি ভার্য্যা। বিহঙ্গ অর্থাৎ গরুড় পক্ষী ইহার বাহন। শিবের ভাগ্যে তবু একটা ষাঁড় জুটিয়াছিল, কিন্তু ইহার ভাগ্যে একটা চতুষ্পদও জুটে নাই।

লুচি মুচির বাড়ী পাইলেও খাই; কচুরি চুরি করিতেও রাজি আছি; মতিচুর প্রচুর পাইলেও আশ মিটে না; এ ক্ষুদ্র লিপি জিলিপির মহিমা কি বর্ণিবে? সন্দেশের শেষ কোনও কালেই নাই, বলিতে কি, পেটে ঠাঁই না হইলেও মিঠাই খাইতে পরাঙ্মুখ নহি। কিন্তু পাই কোথা? এখনকার ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা যে দর্শনটি কল্পনা করিয়াই বিদায় করেন। তুমি নিমন্ত্রণ খাও আর নাই খাও, দর্শনীটি কিন্তু তোমাকে দিতেই হইবে, বরং নীলের দাদন হইতে পরিত্রাণ আছে, কিন্তু পূজার দর্শনীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ নাই।

বঙ্গদেশে কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে এরূপ দুর্দ্দশা ছিল না, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান সকলই তাহার সাক্ষী। এস্থলে তৎকালের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে নবদ্বীপে রামনারায়ণ নামে এক অধ্যাপক ছিলেন। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রম-কুটীরের (৩) চতুর্দ্দিকে বন জঙ্গল থাকায় তাঁহাকে সকলে 'বুনো রামনারায়ণ' বলিত। পণ্ডিতকুলজীবন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সময়ে সময়ে ভট্টাচার্য্যগণের কুটীরে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া স্বচক্ষে তাঁহাদের অধ্যাপনাকার্য্য দেখিয়া গুণোচিত দানে মানে সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া আসিতেন। তিনি একদিন বুনো রামনারায়ণের গৃহে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন,—ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহের বহিঃপ্রাঙ্গণে ছাত্রমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া অধ্যাপনা করিতেছেন। রাজা অধ্যাপকের এরূপ উদ্যম, সম্মুখে স্বয়ং পৃথ্বীপতি আসিয়া দণ্ডায়মান, তাঁহার উদ্বোধই নাই, তিনি তখন বাহ্য নেত্র নিমীলিত করিয়া শাস্ত্রচর্চ্চায় নিমগ্ন ছিলেন। রাজা কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহার পদপ্রান্তে গিয়া প্রণাম করিলে, তাঁহার যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া রাজার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা তাঁহার অধ্যাপনা দর্শনে পরম প্রীত হইয়া পুরস্কার দিবার মানসে জিজ্ঞাসিলেন, মহাশয়! আপনার কোনও বিষয়ে অসঙ্গতি আছে? রাজার অভিপ্রায় এই যে, সাংসারিক কোনও বিষয়ে অসঙ্গতি অর্থাৎ অভাব থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ পূরণ করেন। কিন্তু

---

(৩) 'কুটীর' শব্দে খড়ের ঘর। একালে 'কুটীর' বলিলে আর কুঁড়ে বুঝায় না। এখন অভিধান উল্টাইয়াছে, এখন 'কুটীর' শব্দে অট্টালিকা, যথা 'কমল কুটীর', 'শান্তি কুটীর' 'আনন্দ কুটীর' প্রভৃতি। যদি এখন আচার্য্যদিগের বেশভূষা হ্যাটকোট হয়, তবে তাঁহাদের কুটীর সাহেবী বাড়ী না হইবে কেন? পূর্ব্বকালে আচার্য্যেরা কিন্তু ঐশ্বর্য্যভোগে একেবারেই উদাসীন ছিলেন। যে চাণক্যের ভ্রূকুটীমাত্রেই পৃথিবীর রাজারা ভয়ে শিহরিয়া উঠিত, যিনি নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সার্ব্বভৌমপদে স্থাপন করিয়া তাঁহার মন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বেশ্বরের সর্ব্বেসর্ব্বা মন্ত্রীর নিজগৃহের ঐশ্বর্য্য দেখ। কঞ্চুকী চাণক্যের গৃহে প্রবেশ করিয়া মনে মনে কহিলেন, আহা! এই রাজাধিরাজের মন্ত্রী মহাশয়ের গৃহের কি ঐশ্বর্য্য!!

"উপলশকলমেতদ্ ভেদকং গোময়ানাম্
বটুভিরুপহৃতানাং বর্হিষাং স্তূপমেতৎ।
শরণমপি সমিদ্ভিঃ শুষ্যমাণাভিরাভিঃ
বিনমিতপটলান্তং দৃশ্যতে জীর্ণকুড্যম্॥"

শুষ্ক গোময় ভাঙ্গিবার জন্য এই প্রস্তরখণ্ড পড়িয়া আছে, দ্বিজবালকগণের আনীত এই স্তূপাকার কুশ পড়িয়া আছে, ঘরের দেওয়ালটি জীর্ণ হইয়াছে, চালের উপর যজ্ঞকাষ্ঠসকল শুকাইতে দেওয়ায় তাহার ভারে চালের ধারগুলা ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

(মুদ্রারাক্ষস)

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দৃষ্টি অন্য দিকে, তিনি শাস্ত্রই ভাবিতেছিলেন, উত্তর করিলেন,—হাঁ মহারাজ! আমার পঠদ্দশায় অধীতশাস্ত্রের অনেক স্থলে অসঙ্গতি ছিল বটে, কিন্তু ক্রমাগত সেই সকল বিষয়ের চিন্তা ও অনুশীলন করায়, এক্ষণে আর কোনও স্থলে অসঙ্গতি নাই, যাহা পূর্ব্বে অসঙ্গত বোধ হইত, তাহা এক্ষণে বিশদ হইয়াছে। রাজা কহিলেন, আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, আপনার সাংসারিক বিষয়ে কি কোনও অভাব আছে? ভট্টাচার্য্য তখন গদগদকণ্ঠে কহিলেন, আমার আবার অভাব! মহারাজের দত্ত যে নিষ্কর ব্রহ্মত্র আছে, তাহা হইতেই আমার স্বচ্ছন্দে জীবিকা চলে। যে ধান্য পাই, আমার গৃহিণী তাহা স্বহস্তে কণ্ডন ও রন্ধন করিয়া উপাদেয় অন্ন প্রস্তুত করেন। গৃহিণী প্রতিদিন প্রাতঃস্নান করিয়া আসিবার সময় বাটীর পার্শ্বস্থ তিন্তিড়ী বৃক্ষ (তেঁতুলগাছ) হইতে পত্র চয়ন করিয়া আনেন, এবং তদ্দ্বারা অপূর্ব্ব জুষ (ঝোল) প্রস্তুত করেন। আহা! সেই অন্নব্যঞ্জন অমৃত! অমৃত! অমৃত! আমি, গৃহিণী ও আমার এই ছাত্রগণ তাহা পরমানন্দে ভোজন করি, এবং পুলকিত হইয়া মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করি।

হায় রে! সে শাস্ত্রচর্চ্চা, সে সরস্বতী-পূজা কি এদেশে আর হইবে? সে জ্ঞান-বুভুক্ষা, সে তন্ময়তা, সে আত্মবিস্মৃতি কি আর দেখিব? "তে হি নো দিবসা গতাঃ" আমাদের সে দিন গিয়াছে।

চিন্ময়ী সরস্বতীর স্তব।

ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী।
সর্ব্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ ॥১॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং শশ্বৎ জীবন্মৃতং পরম্।
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমোনমঃ ॥২॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মূকমুন্মত্তবৎ সদা।
বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী যা তস্যৈ নিত্যং নমোনমঃ ॥৩॥
হিমচন্দনকুন্দেন্দুকুমুদাম্ভোজসন্নিভা।
বর্ণাধিদেবী যা তস্যৈ চাক্ষরায়ৈ নমোনমঃ ॥৪॥
বিসর্গবিন্দুমাত্রাসু যদধিষ্ঠানমেব চ।
তদধিষ্ঠাতৃদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ ॥৫॥
যয়া বিনাত্র সংখ্যাবান্ সংখ্যাং কর্ত্তুং ন শক্যতে।
কালসংখ্যাস্বরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমোনমঃ ॥৬॥
ব্যাখ্যাস্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
ভ্রমসিদ্ধান্তরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমোনমঃ ॥৭॥
স্মৃতিশক্তিজ্ঞানশক্তিবুদ্ধিশক্তিস্বরূপিণী।
প্রতিভা কল্পনাশক্তির্যা চ তস্যৈ নমোনমঃ ॥৮॥
শ্রেষ্ঠা শ্রুতীনাং শাস্ত্রাণাং বিদুষাং জননী পরা।
প্রাণাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ ॥৯॥
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা যা কবীনামিষ্টদেবতা।
সচ্চিদানন্দরূপা চ তস্যৈ বাণ্যৈ নমোনমঃ ॥১০॥
(ইতি যাজ্ঞবল্ক্যকৃতং বাণীস্তোত্রম্)

যিনি ব্রহ্মময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী, যিনি সর্ব্ববিদ্যার অধীশ্বরী, সেই পরাৎপরা বাগ্দেবীকে বারবার নমস্কার। ১। যাঁহার বিহনে এ বিশ্ব-সংসার জীবন্মৃত হয়, যিনি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেই সরস্বতীকে বারবার নমস্কার। ২। যাঁহার অধিষ্ঠান বিনা সমস্ত জগৎ মূক ও উন্মত্তের অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেই শব্দব্রহ্মের অধিদেবতাকে বারম্বার নমস্কার। ৩। তুষার, চন্দন, কমল, কুমুদ, কহ্লার ও চন্দ্রমার ন্যায় যিনি মাধুর্য্যময়ী, যিনি বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেই অক্ষরা-দেবীকে বারবার নমস্কার। ৪। বিসর্গ, বিন্দু ও মাত্রা প্রভৃতির মধ্যে যাঁহার নিত্য অধিষ্ঠান, সেই বর্ণমালার অধিদেবতাকে বারবার নমস্কার। ৫। যাঁহার বিহনে কিছুরই সংখ্যা করা যায় না, কিছুরই হিসাব হয় না, সেই কালরূপিণী সংখ্যারূপিণী পরম

দেবতাকে বারবার নমস্কার। ৬। যিনি নিখিল বাক্যের ব্যাখ্যাস্বরূপা এবং নিখিল ব্যাখ্যার অধিষ্ঠাত্রী, যিনি সমস্ত ভ্রান্তিজালের সিদ্ধান্তস্বরূপা, সেই দেবীকে বারবার নমস্কার। ৭। যিনি স্মৃতিশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও বুদ্ধিশক্তি, যিনি প্রতিভা ও কল্পনাশক্তি, সেই মহাশক্তিকে বারবার নমস্কার। ৮। যিনি সমস্ত শ্রুতি ও সমস্ত শাস্ত্রের সর্বোপরি বিরাজমানা, প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেই বাণীকে বারবার নমস্কার। ৯। যিনি বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়ী, কবিকুলের ইষ্টদেবতা, সচ্চিদানন্দরূপিণী, সেই বীণাপাণিকে বারবার নমস্কার। ১০।

কস্যচি'

ঢাকার পুরাতন কাহিনী।

(চতুর্থ প্রস্তাব)

রাজা আদিশূর।

সেন রাজগণের পূর্ব্বতন কালে পূর্ব্ববঙ্গে আদিশূর নামে একজন পরাক্রান্ত রাজা অভ্যুদিত হন। জনপ্রবাদের নির্দ্দেশ অনুসারে, রামপাল নগরীতে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বপ্রকাশিত সংস্কৃত বেণীসংহার নাটকের ভূমিকায় পণ্ডিতবর মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ সর্ব্বপ্রথম এই বিষয় প্রচারিত করেন। তিনি কোন্ সময় কিভাবে কোথা হইতে আগমন করেন, বা তাঁহার শাসিত রাজ্য কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল,—আজিও তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে মীমাংসিত হয় নাই। সুতরাং এই সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাতত্ত্ববিদের মত সংগৃহীত করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব এবং আমাদের নিকট যে মত অধিকতর সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়, তাহা নির্দ্দেশ করিব।

যদিও মহারাজা আদিশূরের সম্পর্কে পুরাতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ রহিয়াছে, যদিও তাঁহার আবির্ভাব কালসম্বন্ধে নিশ্চিতরূপে কোন সময় নির্দ্দেশ করা যায় না, যদিও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধভাবে কোনও কথা জানা যায় নাই, যদিও পাল ও সেন রাজবংশের ন্যায় তাঁহার নামাঙ্কিত কোনও মুদ্রা, প্রস্তর লিপি বা তাম্রশাসন এই সময় পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হয় নাই—তথাপি প্রাচীন প্রবাদও কুলজী লেখকদিগের মত অনুসারে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, আদিশূরের অভ্যুত্থানে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্মের পুনর্ব্বার আবির্ভাব ও বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি সংঘটিত হয়। প্রবল ধর্ম্মবিপ্লব আদিশূরকে বঙ্গের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। আদিশূরের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল এবং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজবংশ বাঙ্গলার শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেছিল। আদিশূরের অভ্যুদয়ে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্ম সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম উন্মূলনের সবিশেষ চেষ্টা করে। তিনি গৌড় (পশ্চিম বাঙ্গালা) ও বঙ্গ (পূর্ব্ববাঙ্গালা) এই উভয় অঞ্চলেই আপনার আধিপত্য বদ্ধমূল করিতে সক্ষম হইয়া-

ছিলেন কি না, তাহা নিশ্চয়রূপে বলিবার কোনও উপায় নাই। গৌড়ের অন্তর্গত বরেন্দ্র অঞ্চলে তাঁহার অধিকার বিস্তৃত না হইলে, জনপ্রবাদ অনুসারে তিনি বারেন্দ্র-শ্রেণীয় ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষগণকে তথায় স্থাপিত করিতে পারিতেন না। আদিশূর শব্দটী নাম কি উপাধি, তাহাও নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। ইহা নামবাচক শব্দ না হইয়া উপাধিবাচক হওয়াই সম্ভবপর।

আদিশূর সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ এই যে, তিনি হিন্দুধর্ম্মের প্রধান সহায় ও আশ্রয়দাতা প্রবল-পরাক্রান্ত কান্যকুব্জপতির নিকট প্রার্থনা করিয়া বঙ্গে পাঁচজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের সহচর পাঁচজন কায়স্থ আনয়ন করেন। কান্যকুব্জ হইতে আনীত এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থই বঙ্গদেশীয় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির আদিপুরুষ। কুলজীকারদিগের মধ্যে এই ঘটনার কারণ-সম্বন্ধে বিশেষ অনৈক্য দৃষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহের “আদিশূর ও বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ” শীর্ষক প্রবন্ধে যে চারিটী কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা এই স্থলে লিখিত হইল। আদিশূরের কালনির্ণয় প্রসঙ্গে পশ্চাৎ কৈলাস বাবুর প্রবন্ধের সংক্ষেপ আলোচনা করিব।

(১) আদিশূর পুত্রেষ্টিযজ্ঞ সম্পাদনের সঙ্কল্প করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধ রাজগণের সময়ে উৎসাহ অভাবে বাঙ্গলায় বেদবিৎ ব্রাহ্মণ বিলুপ্ত হইয়াছে। (২) রাজপ্রাসাদের উপরি গৃধ্রপাত ও রাজ্যে অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দৈবোৎপাতের শান্তি কামনায় যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিতে রাজার সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। (৩) তিনি কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীকে বিবাহ করেন, এবং রাজ্ঞীর চান্দ্রায়ণব্রত নিষ্পন্ন করিবার জন্য বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ অসমর্থ হইলে রাজা পত্নীর অনুরোধে সাগ্নিক বেদবিৎ ব্রাহ্মণ প্রেরণের নিমিত্ত কনোজপতি বীরসিংহকে পত্র লিখেন। (৪) কাশীর রাজাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া আদিশূর বারাণসী হইতে করস্বরূপ পাঁচজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইয়া স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। (৫) পঞ্চ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ কাম্বোজ (ভারতের পাশ্চাত্য প্রান্তবর্ত্তি গান্ধার) হইতে আনীত হয়। এই সকল বিভিন্ন মতের মধ্যে এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায় যে আদিশূরের সময়ে ব্রাহ্মণদের আদিম বাসস্থল উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ হইতে একদল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আগমন করিয়া বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট হয়।

সভৃত্য ব্রাহ্মণগণ রাজধানী রামপালে উপনীত হইলে, রাজা তাঁহাদিগকে বহু সম্মাননা করেন এবং পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম ও চটগ্রাম নামক পাঁচটী গ্রামে তাঁহাদের বাসস্থল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ বাঙ্গলার আদিম নিবাসী “সপ্তসতী” ব্রাহ্মণদিগের কন্যা বিবাহ করিয়া যে পাঁচটী সন্তান লাভ করেন, তাঁহারাই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ। কিছুকাল পরে সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের স্বদেশীয়া পত্নীগণের গর্ভজাত সন্তানগণ পিতৃপদ অনুসরণ করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করিলে, আদিশূর তাঁহাদিগকে বরেন্দ্রদেশে সংস্থাপিত করেন। ইহাদের সন্তানগণই বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত।

চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী ঘটকচূড়ামণি

বেণীদেবের মতে ক্ষিতীশ (শাণ্ডিল্যগোত্রজ), সুধানিধি (কাশ্যপগোত্রজ), বীতরাগ (বাৎস্যগোত্রজ), তিথিমেধা (ভরদ্বাজগোত্রজ), সৌভরি (সাবর্ণগোত্রজ)—এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ গৌড়দেশে আগমন করেন। কুলজীগ্রন্থ 'কুলরাম' প্রণেতা বাচস্পতি মিশ্রের মতে এই পঞ্চগোত্রজ পঞ্চ ব্রাহ্মণ স্ত্রীপুত্র ও ভৃত্যসহ ৯৫৪ শকাব্দে (১০৩২ খ্রীঃ) কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। নবদ্বীপের রাজবংশের ইতিহাস 'ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত' মতে ৯৯৯ শকাব্দে (১০৭৭ খ্রীঃ) এই ঘটনা সংঘটিত হয়। ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ (রাঢীয়) ও দামোদর (বারেন্দ্র), সুধানিধির পুত্র ছান্দড় (রাঢীয়) ও ধরাধর (বারেন্দ্র), বীতরাগের পুত্র দক্ষ (রাঢীয়) ও সুষেণ (বারেন্দ্র), তিথিমেধার পুত্র শ্রীহর্ষ (রাঢীয়) ও গৌতম (বারেন্দ্র), এবং সৌভরির পুত্র বেদগর্ভ (রাঢীয়) ও পরাশর (বারেন্দ্র) হইতে যথাক্রমে রাঢীয় ও বারেন্দ্রকুল উদ্ভূত হইয়া সমস্ত বঙ্গদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। ইহাঁদের মধ্যে ভট্টনারায়ণ ও শ্রীহর্ষ উভয়েই সুকবি ছিলেন। ভট্টনারায়ণ "বেণীসংহার" নাটক এবং শ্রীহর্ষ "নৈষধচরিত" নামে মহাকাব্য ও "খণ্ডন খণ্ডখাদ্য" নামে দর্শনশাস্ত্রীয় ছয় প্রধান দর্শনের সমালোচনা পুস্তক রচনা করেন। এইরূপে আদিশূরের রাজত্বকালে পূর্ব্ববঙ্গে ধর্ম্মবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরতর সমাজবিপ্লব সংঘটিত হয়, সংস্কৃত সাহিত্যের সবিশেষ চর্চ্চা আরম্ভ হয়, বাঙ্গলাদেশের ভাষা সংস্কৃতের অনুযায়ী হইতে থাকে। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে এই সর্ব্ববিধ বিপ্লব কালক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশে বিস্তৃত হয়। তাঁহারই সময়ে সমাজপতি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ পূর্ব্ববঙ্গে আনীত হইয়া বঙ্গদেশের বর্ত্তমান সমাজবন্ধনের সূত্রপাত করেন। যে রাজা এই সকল বিপ্লবের সূত্রপাত করেন, তিনি অবশ্যই অসাধারণ পরাক্রমশালী ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বোল্লিখিত পঞ্চ বেদজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে মকরন্দ ঘোষ (সৌকালিন গোত্রজ), দশরথ বসু (গৌতমগোত্রজ), কালিদাস মিত্র (বিশ্বামিত্রগোত্রজ), বিরাট গুহ (কাশ্যপগোত্রজ), ও পুরুষোত্তম দত্ত (মৌদ্গল্যগোত্রজ) নামে কায়স্থদিগের পঞ্চ সমাজপতি পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করেন। তাঁহাদের বংশধরগণ বঙ্গজ কায়স্থ নামে পরিচিত। তাঁহাদের একশাখা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে দক্ষিণরাঢ়ে গিয়া কালক্রমে বসতি করিতে থাকেন, তাঁহারাই দক্ষিণরাঢ়ী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কায়স্থগণ বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ী এই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া, আদিশূরের রাজধানী যে রামপালে ছিল, প্রকারান্তরে তাহা নির্দ্দেশ করিতেছে।

মহারাজ আদিশূরের সম্পর্কে প্রচলিত জনপ্রবাদ ও কুলজীগ্রন্থ লেখকদিগের বিভিন্ন মত হইতে কি পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব অনুমান বলে পাওয়া যাইতে পারে, সংক্ষেপে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। 'সম্বন্ধনির্ণয়' নামক বংশাবলীর বিবরণ পুস্তকে পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি বারেন্দ্রশ্রেণীয় একটী প্রবাদ অবলম্বনে লিখিয়াছেন যে, আদিশূরের পর তাঁহার পুত্র ভূশূর, তদনন্তর ভূশূরের দৌহিত্র অশোক সেন, সুরসেন ও বীরসেন ক্রমান্বয়ে বাঙ্গলায় রাজত্ব করেন। এই প্রবাদ তিনি মুরশিদাবাদের কোন সুদক্ষ ঘটকের নিকট অবগত হন বলিয়া ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয়ের নিকট প্রকাশ

করেন। লেখকচূড়ামণি বঙ্কিম বাবুর কোন আত্মীয়ের দ্বারা সম্পাদিত "ভ্রমর" নামে এক খানি মাসিক পত্রিকায় আদিশূর ও তাঁহার বংশধরগণের নামের একটী তালিকা বাহির হইয়াছিল, তাহা লেখকের স্বকপোল-কল্পিত বা সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক আবুলফাজলের রচিত "আইনি আকবরি' কি অন্য কোন পুস্তক হইতে গৃহীত—এই সম্পর্কে কোনও কথা তথায় লিখিত ছিল না। আদিশূরের বংশধরদিগের অন্য কোন বৃত্তান্ত আমরা জানি না। বাবু পার্ব্বতীশঙ্কর রায়ের প্রণীত 'আদিশূর ও বল্লাল সেন' নামক পুস্তকে প্রচলিত কিংবদন্তীর বিবরণাদি ভিন্ন ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে কি না, কৌতুহলাক্রান্ত পাঠকবর্গ তাহা পাঠ করিয়া দেখিতে পাবেন।

এক্ষণে আমরা আদিশূরের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে বিভিন্ন মত সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিব। পণ্ডিতকুলতিলক ডাক্তর রাজেন্দ্র মিত্রের মত, ডাক্তর হার-নলির 'শতাব্দী সমালোচন' নামক কলিকাতা এসিয়াটিক্ সোসাইটীর শতবার্ষিকী কার্য্যবিবরণী পুস্তকে, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের উৎকৃষ্ট 'বাঙ্গলার ইতিহাসে,' ও শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্তের ও রজনীকান্ত গুপ্তের 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে' পরিগৃহীত হইয়াছে। এই মত এতদূর সুপ্রচলিত হইয়াছে যে, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা লিখিলে আমরা পাঠকবর্গের নিকট উপহাসাস্পদ হইব বলিয়া শঙ্কিত হইতেছি। এই অভিমত ১৮৭৮ খ্রীঃ ডাক্তর মিত্র কর্ত্তৃক 'পাল ও সেন রাজগণ' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হয় এবং বিশেষ বিবেচনা না করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রসিদ্ধ ইতিহাস-লেখক পণ্ডিতগণ তাহা অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বত্র প্রচারিত করিয়াছেন। বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ ডাক্তর মিত্রের মতের তথ্যাতথ্য-নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া স্বাধীন গবেষণার পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক বিশেষ প্রশংসার কাজ করিয়াছেন। আমরা যত দিন পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান কার্য্যে বিজ্ঞলোকের মত স্বাধীনভাবে, ধীরতা, গাম্ভীর্য্য, বিনয় ও সুযুক্তির সহিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া অভ্রান্ত বলিয়া তাহা গ্রহণ করিতে থাকিব, যত দিন পর্য্যন্ত যথোচিতরূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া অন্যের গ্রন্থ হইতে অপহরণ অথবা কোন অনুবাদ ও অনুকরণ মাত্রে আমাদের ইতিহাস আলোচনা নিবদ্ধ থাকিবে,—তত দিন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় প্রকৃত ইতিহাসের জন্ম এবং ঐতিহাসিক জ্ঞানের উৎপত্তি ও সমাদর অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতেছে। দাম্ভিকতা, বাগাড়ম্বর, বৃথা আস্ফালন, সুযোগমতে বহুভাষাধিকারের পরিচয় প্রদান, স্বকীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনার্থ অন্যায়রূপে অন্যকে তৎকৃত ভ্রমের জন্য আক্রমণ, কঠোর ও নির্দ্দয় ভাবে লেখনী সঞ্চালন প্রভৃতি বহু দোষ কৈলাস বাবুর লিখিত পুস্তক ও প্রবন্ধে দেখিতে পাওয়া যায় বটে,—কিন্তু স্বাধীনভাবে বাঙ্গালা ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া তিনি যে সত্যানুরাগ ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার প্রশংসা করি। যথাযোগ্য প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক তিনি স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিতে সর্ব্বথা সমর্থ ও কৃতকার্য্য হইতে পাবেন নাই বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাঁহার ঐতিহাসিক তত্ত্ব উদ্ধারের উদ্যমকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা না করিলে তাঁহার প্রতি অবিচার ও অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা

হয়। ইতিহাস লেখকের পক্ষে সত্যানুরাগ, অপক্ষপাত, নিরহঙ্কার, সরলতা, সমদর্শিতা ও সুযুক্তিপ্রিয়তা থাকা একান্ত আবশ্যক। প্রতি কথায় নিজের বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্য, অরসজ্ঞতা ও কপটতা প্রদর্শনের চেষ্টা না পাইয়া, অভিমানশূন্য চিত্তে তাহার সমস্ত প্রমাণ যথাযথরূপে একত্র সংগৃহীত করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা উচিত। অপর পক্ষের মত অকাট্য প্রমাণ ও সুদৃঢ় যুক্তিতর্কের বলে খণ্ডন করিয়া ধীরভাবে স্বমতের পরিপোষক যাবতীয় প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজের মত সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের নিমিত্ত বিচারকের পবিত্র আসনে উপবিষ্ট হইয়া, বিপক্ষের অযথা নিন্দা কুৎসা প্রকাশ দ্বারা স্বীয় পদের অবমাননার সহিত ইতিহাসের গৌরব ও মাহাত্ম্য নষ্ট করা সর্ব্বতোভাবে অনুচিত। কঠোর ও নির্দ্দয় ভাবে লেখনী সঞ্চালনে নিরপেক্ষ পাঠকের প্রীতি না জন্মিয়া বরং বিরক্তি জন্মে, এবং প্রতিপাদিত সত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা জন্মে। যৎসামান্য ঐতিহাসিক জ্ঞানের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া, কোনও ভ্রমপূর্ণ মত প্রচারের জন্য বিজ্ঞ বা অনভিজ্ঞ কোনও লেখককে বিদ্রূপ ও উপহাস করা কদাপি উচিত নহে। অনুবাদ ও অনুকরণ এবং পরমুখাপেক্ষিতা ছাড়িয়া কবে আমরা দেশীয় ও বিদেশীয় ইতিহাসের যথোচিত আলোচনাদ্বারা স্বদেশের ইতিহাস পড়িতে ও লিখিতে শিখিব,—কবে আমরা নাটক উপন্যাস, টীকা টিপ্পনী ও বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থাবলী প্রণয়নে সমস্ত শক্তি ও বিদ্যা বুদ্ধির নিয়োগে দেশ প্লাবিত না করিয়া আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইউরোপীয় শিল্প ও বিজ্ঞানের দিকে সঙ্গে জাতীয় সাহিত্য ও ইতিহাসের চর্চ্চায় মনোযোগী হইবেন, কবে এই পতিত জাতি বর্ণ, ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে ভারতের অতীত গৌরব ও মাহাত্ম্যের অনুশীলন দ্বারা আত্মবল বিক্রমের পরিচয় পাইয়া বহুশতাব্দীর মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইবে,—কবে এই হতভাগ্য দেশের অধিবাসীগণ স্ব স্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ও বিরোধ ভুলিয়া একতার মহামন্ত্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সম্পূর্ণ নবজীবন লাভ পূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে এক বিশাল জাতিতে পরিণত হইবে, এবং এই পতিত জাতির ভাবী সৌভাগ্য ও উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কেবল অতীত কালেই যে ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্য্যবসিত হয় নাই, জগৎকে তাহা প্রদর্শন পূর্ব্বক জাতীয় জীবনে নবযুগের অবতারণা করিবে, তাহা জগদীশ্বরই জানেন।

যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালরাজগণ পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ শাসন করিতেছিলেন, সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে (বিক্রমপুরে) হিন্দুধর্ম্মানুরক্ত আদিশূরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আদিশূর সেনরাজবংশের সংস্থাপক বীরসেন হইতে অভিন্ন ব্যক্তি। এই বীরসেন বা আদিশূর সম্ভবতঃ ৯৮৬ খ্রীষ্টীয় অব্দে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপিত করেন। সেনবংশের প্রথম রাজা বলিয়া এই বীরসেন বা শূরসেন আদিশূর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বীরসেন ও তাঁহার পুত্র ও পৌত্র সামন্ত ও হেমন্ত সেনের রাজ্য পূর্ব্ববঙ্গেই নিবদ্ধ ছিল। তদনন্তর বিজয় (সুখ) সেন, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন, মাধব সেন, কেশব সেন এবং লাক্ষণেয় (অশোক) সেনের আধিপত্য সমগ্র বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পালবংশীয় বৌদ্ধরাজগণ

(পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ)

১। গোপাল (৮৫৫-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ)
২। ধর্ম্মপাল (৮৭৫-৯৫ খ্রীঃ)
৩। দেবপাল (৮৯৫-৯১৫ খ্রীঃ)
৪। বিগ্রহপাল (প্রথম) (৯১৫-৩৫)
৫। নারায়ণপাল (৯৩৫ ৫৫)
৬। রাজ্যপাল (৯৫৫-৭৫)
৭। ——পাল (৯৭৫-৯৫)
৮। বিগ্রহপাল (দ্বিতীয়) (৯৯৫-১০১৫)
৯। মহীপাল (১০১৫-৪০)
১০। নয়পাল (১০৪০-৪৬)

(বিহার)

১০। নয়পাল (১০৪৬)
১১। বিগ্রহপাল (তৃতীয়)
স্থিরপাল
বসন্তপাল
মহেন্দ্রপাল
মদনপাল
গোবিন্দপাল

(সেনবংশীয় হিন্দুরাজগণ)

(পূর্ব্ব বঙ্গ ও অনুগঙ্গ বঙ্গ)

১। বীরসেন (আদিশূর) (৯৮৬-১০০৬)
২। সামন্তসেন (১০০৬-১০২৬ খৃঃ)
৩। হেমন্তসেন (১০২৬-৪৬)

(সমগ্র বঙ্গদেশ)

৪। বিজয়সেন (১০৪৬-৬৬)
৫। বল্লালসেন (১০৬৬-১১০৬)
৬। লক্ষ্মণসেন (১১০৬-৩৬)
৭। মাধবসেন (১১৩৬-৩৮)
৮। কেশবসেন (১১৩৮-৪২)
৯। অশোক (লাক্ষ্মণের)সেন (১১৪২-১২০৫)

(বিক্রমপুর)

১০। বল্লালসেন (দ্বিতীয়)
১১। সুষেণ
১২। সুরসেন

স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত ও রজনীকান্ত গুপ্ত তাঁহাদের প্রণীত বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের ইতিহাসে ডাক্তার মিত্রের এই মতই নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিয়াছেন। রজনী বাবু আদিশূরের সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে কোনও কথা উল্লেখ করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি বিক্রমপুর ও গৌড়ে সেনরাজগণের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হিয়াংসাঙের সময় হইতে সেনরাজগণের সময় পর্য্যন্ত (খ্রীষ্টীয় সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত) উত্তরে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও দক্ষিণে সমতট (রামপাল-বিক্রমপুর) এই দুইটী স্থলে বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল, গৌড় নগরীতে অথবা রাঢ়দেশের দক্ষিণভাগে কস্মিন কালেও যে প্রাচীন বৌদ্ধ বা হিন্দু সময়ে বাঙ্গলার রাজধানী ছিল, এবম্বিধ কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। চৈনিক পরিব্রাজক হিয়াংসাঙের ভারতবর্ষে অবস্থান কালে বাঙ্গালার রাজধানী সমতট (রামপাল) সাগর তীরে অবস্থিত ছিল এবং নৈষধচরিত রচনা কালেও কবিবর শ্রীহর্ষ বাঙ্গলার রাজধানীর অনতিদূরে সমুদ্র দর্শন করেন—কৈলাস বাবু কোথা হইতে এই বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, বলিতে পারি না। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা দনুজমর্দ্দন দেবের সম্বন্ধে প্রচলিত জনপ্রবাদ অনুসারে বিক্রমপুরের দক্ষিণভাগে সাগর অবস্থিত ছিল।

রাজকৃষ্ণ বাবুর মতে আদিশূর বা বীরসেনের রাজ্যারম্ভ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ-

আসে বটে। রমেশ বাবুর মতে বাঙ্গালার পাল রাজবংশ ৮৩০—১১৫০ খ্রীঃ এবং সেনরাজবংশ ১০০০-১২০৪ খ্রীষ্টীয় অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সেনবংশের প্রথম রাজা আদিশূর। তাঁহার প্রকৃত নাম বীরসেন বা শূরসেন। পক্ষান্তরে ডাক্তার হ্যারনলি অনুমান করেন যে, গৌড়েশ্বর নারায়ণ পালের সময়ে (১০০৬-২৬খ্রীঃ) সেনবংশীয় সামন্ত ও হেমন্ত সেন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের শাসন কর্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহাদের পরামর্শ মতে নারায়ণ পাল বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলায় হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। এদিকে রাজা মহীপালের অধীনে বিহার, বারানসী ও অযোধ্যাতে বৌদ্ধধর্ম্মই প্রবল থাকে। রাজা নারায়ণ পালের উত্তরাধিকারীকে পরাজিত করিয়া ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিজয় সেন বাঙ্গলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিজয়সেনই আদিশূর নামে পরিচিত হইয়াছেন।

বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রচলিত কিম্বদন্তীকে অগ্রাহ্য করিয়া আদিশূরের সময় নির্ণয় প্রসঙ্গে যে অভিনব মত নব্যভারতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। তাঁহার প্রদত্ত যুক্তি ও প্রমাণ নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব স্থাপনের পক্ষে সম্পূর্ণ ও যথেষ্ট না হইয়া থাকিলেও প্রচলিত জনপ্রবাদ ও পূর্ব্বোক্ত সুপ্রসিদ্ধ মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি যে নির্ভীকতা ও স্বাধীন গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তন্নিমিত্ত তাঁহাকে সবিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। "বৎসরাজদেব, তাঁহার পিতা দেবশক্তিদেবের মৃত্যুর পর ৭৮০খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৮০৫ খ্রীঃ (৭০২-২৭ শকাব্দ) পর্য্যন্ত কান্যকুব্জে ২৫ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এই সময়ে কণোজ রাজ্যের সীমা কাশ্মীর ও মালয়রাজ্য হইতে গৌড় দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া, কনোজপতিদিগকে আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বপ্রধান নরপতি করিয়া তোলে। ১৮৩৭ খ্রীঃ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় নাসিকের এক খানি ৭৩০ শকাব্দের (৮০৮ খ্রীঃ) লিখিত তাম্রশাসনের যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, তাহাতে লিখিত আছে যে, রাষ্ট্রকোটার অধীশ্বর গোবিন্দরাজের পিতা ধ্রুবরাজ গৌড়বিজেতা বৎসরাজকে পরাজিত করেন। এই বৎসরাজকে কান্যকুব্জপতি বৎসরাজ দেব হইতে অভিন্ন অনুমান করিয়া আরও কয়েকটী অপ্রামাণিক অনুমানের সাহায্যে কৈলাস বাবু আদিশূর সম্বন্ধে আপনার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কনোজপতি এই বৎসরাজ গৌড় দেশ আক্রমণপূর্ব্বক তত্রত্য বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নরপতিকে উচ্ছেদ করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে স্বীয় রণবিজয়ী রাজবংশীয় শিবোপাসক হিন্দু সেনাপতিকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপিত করেন। কনোজরাজের এই সেনাপতির নামই আদিশূর। কনোজ ও মগধের গুপ্ত সম্রাটগণ উড়িষ্যা হইতে বৌদ্ধ রাজবংশকে দূরীভূত করিয়া নবনিয়োজিত হিন্দুরাজার সহিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ ও রাজ্য শাসনের নিমিত্ত যেমন ব্রাহ্মণ ও করণ কায়স্থদিগকে উড়িষ্যায় প্রেরণ করেন, সেইরূপ বৎসরাজও গৌড় জয় করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য পাঁচ জন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থকে আদিশূরের সহিত গৌড়ে প্রেরণ করেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থই বঙ্গীয় ও রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থগণের আদিপুরুষ। বৎসরাজ শৈব ছিলেন, সুতরাং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজা আদিশূরও

শেষ হওয়াই সম্ভব। এই দুইটী অনুমানের কোনও প্রমাণ প্রদর্শন কৈলাস বাবু আবশ্যক বোধ করেন নাই। দিনাজপুর জিলার কোনও অজ্ঞাত স্থানের শিবমন্দিরের প্রস্তরলিপি হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া, তাহা আদিশূর বা তাঁহার উত্তর পুরুষ কোন রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, অনুমান করিয়াছেন। উক্ত শ্লোক "কাম্বোজ বংশজ গৌড়পতিনা" র অংশ দৃষ্টে বংশাবলী কল্পিত সেনাপতি আদিশূরকে কাম্বোজবংশীয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতীত কেবল অনুমানের সাহায্যে ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে গিয়া, কৈলাস বাবুর প্রবন্ধের সারাংশ এবম্বিধ স্বকপোল কল্পিত কল্পনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে এবং লেখকের সমস্ত আয়াস নিষ্ফল করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি ৪৭৯ হইতে ১১১৬ শকাব্দ পর্য্যন্ত (৫৫৭-১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) কনোজের নৃপতিবর্গের নামমালার যে তালিকা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বীরসিংহ নামে কুলাচার্য্যগণের উল্লিখিত কোনও নাম দৃষ্ট হয় না। এই সম্বন্ধে এত সংক্ষিপ্ত ভাবে আপনার বক্তব্য শেষ না করিয়া, বা বান্ধব পত্রিকার পাঠককে বঞ্চিত না দিয়া, বিস্তৃতভাবে কনোজরাজবংশাবলীর যথোচিত আলোচনা পূর্ব্বক কুলজিলেখকদিগের ভ্রম প্রদর্শন করা উচিত ছিল। হিন্দু শাসনকালে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে কায়স্থজাতি যে হিন্দু রাজন্যবর্গের শাসন সংক্রান্ত প্রধান পদ গুলি অধিকার করিয়া ধর্ম্মাধিকরণে উপবেশন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ অপরাধীর দণ্ড বিধান করিতেন, কায়স্থগণ ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় প্রধানতঃ (কদাচিৎ দুই এক জন ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্য) রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতেন—আদিশূরের অন্যূন সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে কায়স্থজাতি ভারতের রাজন্যবর্গের প্রধান মন্ত্রী ও মহাসন্ধিবিগ্রহী প্রভৃতি বিশেষ সম্মানিত পদগুলি অধিকার করিয়াছিলেন—রাজসভায় কায়স্থগণ সর্ব্বদা ব্রাহ্মণদিগের প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে উপস্থিত থাকিতেন,—বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, স্মৃতি, জীবনচরিত, ইতিহাস, প্রস্তরলিপি, মুদ্রালিপি, কি তাম্রশাসনাদি হইতে বিশিষ্ট প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এই সকল কথার যথার্থতা প্রতিপাদন পূর্ব্বক পাঠকবর্গের নিকট কায়স্থজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তিনি স্বরচিত প্রবন্ধের অঙ্গহীনতা ও অসম্পূর্ণতা কেন দূরীভূত করেন নাই, বুঝিতে পারিতেছি না।

যাহা হউক, আদিশূর কোথা হইতে আসিয়া গৌড় ও বঙ্গদেশ অধিকার করেন, তৎসম্পর্কে কৈলাস বাবুর প্রদর্শিত যুক্তি ও অনুমান সম্পূর্ণ ও যথেষ্ট না হইলেও, আদিশূর ও বীরসেন যে এক ব্যক্তি নহেন, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। আদিশূরের সময়ে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলপতিরূপে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বাঙ্গলায় উপনিবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত হন, কুলজিকারদিগের প্রদত্ত বংশাবলী অনুসারে দেখা যায় যে, কৌলিন্যপ্রথার প্রবর্ত্তক মহারাজ বল্লাল সেনের সময়ে তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণের সহিত সেই সমাজপতিদিগের ৮ হইতে ১৫ পুরুষ এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ৩৪ হইতে ৩৯ পুরুষ অন্তর হইতেছে। ইহা হইতে কৈলাস বাবু আদিশূরকে বল্লাল সেনের অন্ততঃ ৯ পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ও বর্ত্তমান সময়ের ৩৮।৩৯ পুরুষ পূর্ব্বতন অনুমান করিয়া, বল্লালের তিন শত বৎসর ও বর্ত্তমান সময়ের এগার শত বৎসর

পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় অব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে আদিশূরের আবির্ভাব কাল নির্ণয় করিয়াছেন। এক স্থলে ৯ পুরুষে ৩০০ বৎসর ও অন্যত্র ৩৯ পুরুষে ১৩০০ বৎসরের পরিবর্ত্তে ১১০০ বৎসর কেন গণনা করিতে হইবে, কৈলাস বাবু তাহার যথোপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করেন নাই। কুলাজিকারদিগের মতে আদিশূর এক বৌদ্ধ রাজবংশ জয় করিয়া গৌড়ের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। কাশ্মীরের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, ৬৯৫ শকাব্দে (৭৭৩খ্রীঃ) গৌড়ে এক জন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। এই বৌদ্ধ রাজার পরে তাঁহার বিজেতারূপে আদিশূরের আবির্ভাব হওয়া বিচিত্র নহে। ডাক্তর মিত্র ও হারনলি সাহেব আদিশূরের যে সময় অবধারণ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা কুলজীকার ব্রাহ্মণদিগের প্রদত্ত বংশাবলী হইতে কৈলাস বাবু যে কাল নির্ণয় করিয়াছেন, উহা অধিকতর সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে।

সম্রাট আকবরের প্রিয় বয়স্য ও প্রধান মন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ আবুলফাজল আকবরের সময়ের ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রাচীন হিন্দুদিগের লিখিত ঐতিহাসিক বিবরণ ও জনপ্রবাদাদি অবলম্বনে সংক্ষিপ্তভাবে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ সময়ের ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস স্বরচিত 'আইনি আকবরী' গ্রন্থের ভূমিকারূপে লিখিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের বিবরণে বাঙ্গলার যে রাজবংশাবলী প্রদান করেন, তাহাতে আদিশূর ও তাঁহার বংশধরদিগের পর বৌদ্ধ পাল রাজগণের বংশাবলী এবং তদনন্তর বিজয় (সুখ) সেন রাজবংশের স্থাপয়িতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তিনি যে কেবল স্বকপোলকল্পিত কল্পনা বা অনুমানের সাহায্যে তাঁহার সংগৃহীত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, ইহা আমরা বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতিরেকে কাহারও কথায় কোনও কালে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। বহু আয়াস ও পরিশ্রমে তিনি যে সকল লিখিত ও প্রচলিত ঐতিহাসিক বিবরণ ও জনশ্রুতি অবলম্বনে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের বৃত্তান্ত ও রাজবংশাবলী সংগ্রহ করিয়া স্বরচিত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করেন, তাহা বিভিন্ন জাতির ভারতবর্ষ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও বিষম রাষ্ট্রবিপ্লব—ভারতবর্ষের জলবায়ুর দোষে ও মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে—বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে। সেই সকল লিখিত ও প্রচলিত বিবরণ এক্ষণে বিলোপ প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া, মহাত্মা আবুলফাজলের ন্যায় অতি উচ্চদরের এক জন ইতিহাস লেখকের কোনও কথা বিশিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত একবারে অগ্রাহ্য বা বিশ্বাসের অযোগ্য বলা যাইতে পারে না। আবুলফাজলের লিখিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অনেক ভ্রম থাকিতে পারে। কিন্তু তিনিই ভারতবিজেতা মুসলমানদিগের মধ্যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সংগ্রহে প্রথম প্রবৃত্ত হইয়া যে মহত্ত্ব ও উদারতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য এই মহাত্মার নিকট সর্ব্বতোভাবে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। যদি খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পাল রাজগণের অভ্যুদয় হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী আদিশূর খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এই অনুমান কোনক্রমে অযৌক্তিক ও অসম্ভব নহে।

কোন কোন কুলজ্ঞ ও কুলজীলেখক জনশ্রুতি অবলম্বনে সেনবংশীয় মহারাজ

বল্লাল সেনকে আদিশূরের দৌহিত্র, কেহ কেহ বা তাঁহাকে আদিশূরের কন্যা কুল হইতে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধে বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে এই জন-প্রবাদকে অমূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করার কোনও কারণ দেখিতেছি না। আদিশূর ও সেন রাজগণ বিভিন্ন বংশে না জন্মিলে প্রবাদ মতে তাঁহাদের মধ্যে বৈবাহিক বন্ধন ঘটিতে পারিত না।

এই সমস্ত কারণে বীরসেন ও আদিশূর যে অভিন্ন ব্যক্তি, অথবা আদিশূর যে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে গৌড়েশ্বর পাল রাজগণের ১৩০ বৎসরের পরে পূর্ব্ববঙ্গে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন—বহুমানাস্পদ ডাক্তর মিত্র মহাশয়ের এই কাল্পনিক মত সুযুক্তির অনুমোদিত বলিয়া গ্রহণীয় হইতে পারে না। পক্ষান্তরে চোলরাজ্যের রাজা কুলোতুঙ্গের সেনাপতিরূপে সেনবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেনের বাঙ্গলা অধিকার এবং কনোজের অধীশ্বর বৎসরাজ দেবের সেনাপতিরূপে কাম্বোজবংশীয় আদিশূরের বঙ্গের রাজাসনে অধিষ্ঠান—বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে কৈলাস বাবুর এই দুই অভিনব আবিষ্ক্রিয়ার কোনটাই যথাযোগ্য প্রমাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক তিনি নিঃসন্দিগ্ধরূপে ঐতিহাসিক তত্ত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া আমাদের ক্ষীণ বুদ্ধিতে বোধ হয় না। বিশিষ্ট যুক্তি প্রমাণ ভিন্ন কেবল ব্যক্তিগত অনুমানের উপর কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্ব দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না।

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের * রচিত কায়স্থ-কারিকায় লিখিত আছে, আদিশূরের শাসন কালে পূর্ব্বোল্লিখিত পাঁচ জন কায়স্থ ভিন্ন আরও দ্বাবিংশতি জন কায়স্থ বাঙ্গলায় আগমন করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। আদিশূর তাহাদিগের ২৭ জনকে বসতি করিবার জন্য

* প্রায় দুই শত বৎসর গত হইল শাণ্ডিল্য-গোত্রজ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে এই ঘটকচূড়ামণি ধ্রুবানন্দ মিশ্রের জন্ম হয়। তিনি বঙ্গজ কায়স্থদিগের সমাজপতি চন্দ্রদ্বীপের অধীশ্বর রাজা প্রেমনারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি আশ্রয়দাতা রাজার আদেশে বঙ্গজ কায়স্থদিগের বংশাবলী সহ বিশেষ বিবরণ এই 'কায়স্থ-কারিকা' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। কৈলাস বাবু "চন্দ্রদ্বীপের আদি রাজবংশ যে বাঙ্গলার সেন রাজবংশ হইতে উদ্ভূত—এরূপ অনুমান করিবার বিশেষ কারণ প্রাপ্ত" হইয়াছেন। বোধ হয়, তাঁহার প্রতিশ্রুত ও নব্যভারতের 'ত্রিপুরা রাজ্য' নামক প্রবন্ধের বিজ্ঞাপিত বাঙ্গলার ইতিহাস প্রকাশের পূর্ব্বে তাহা প্রচারিত করিয়া উহার নূতনত্ব বিলোপ করিতে তিনি প্রস্তুত নহেন। এই প্রবন্ধ লিখার পর কৈলাস বাবু দনুজমর্দ্দন দেবের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব আমরা এস্থলে ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব ১৮৭৪খ্রীঃ কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় বাঙ্গলার 'দ্বাদশ ভৌমিকের' অন্যতম চন্দ্রদ্বীপ পতির যে বিবরণ প্রকাশ করেন, তাহা হইতে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা লিখিয়া কৈলাস বাবুর অনুমানের কারণ আমরা যেরূপ বুঝিতেছি, উহা নির্দ্দেশ করিতেছি।

১২৮০খ্রীঃ সুলতান মঘিস উদ্দিন তোগরলের বিদ্রোহ দমনার্থ দিল্লীশ্বর গিয়াসউদ্দিন বলবন বিদ্রোহীর অনুসরণক্রমে সোনারগাঁয় উপনীত হইলে, দনুজ রায় সম্রাটের অভ্যর্থনা করিয়া বিদ্রোহীর দমন বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করেন। তুগ্রল যাহাতে পশ্চিমে পলাইয়া না যাইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক প্রতীকার করিতে সম্রাটের নিকট প্রতিশ্রুত হন। চন্দ্রদ্বীপের অধিকার মেঘনা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিলে এবম্বিধ অঙ্গীকারের অর্থসঙ্গতি হইতে পারে। মঘিসউদ্দিন তোগরল সোনারগাঁয় বিদ্রোহী হইয়া তাঁহার রাজধানীতে কোনও হিন্দু নৃপতিকে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে দিয়াছিলেন, ইহা সম্ভবপর নহে। মুসলমান ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরণীর উল্লিখিত সোনারগাঁর

২৭ খানি গ্রাম প্রদান করেন। কৈলাস বাবুর প্রবন্ধ হইতে এস্থলে তাহাদের নাম উল্লিখিত হইল। দেবদত্ত ও মহৌজা নাগ, চন্দ্রভানু নাথ, চন্দ্রচূড় দাস, জয়ধর সেন, ভূমি-গুপ্ত কর, ভূধর দাস, জয়পাল পাল, চক্রধর পালিত, চন্দ্রধ্বজ চন্দ্র, রিপুঞ্জয় শাহা, বীরভদ্র ভদ্র, দণ্ডধর ধর, তেজোধর নন্দী, শিখিধ্বজ দেব, বশিষ্ট কুণ্ড, ভদ্রবাহু সোম, বীরবাহু

দনুজরায়কে পূর্ব্বোক্ত হযুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক, ডাক্তর ওয়াইজ চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা ও বঙ্গজ কায়স্থগণের সমাজপতি দনুজমর্দ্দন দে বলিয়া অনুমান করেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি বিক্রমপুরবাসী চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামক ভগবতীর প্রিয় উপাসক জনৈক অলৌকিক ক্ষমতাশালী ব্রাহ্মণের ভৃত্য ছিলেন। বিক্রমপুরের দক্ষিণভাগ পর্য্যন্ত সেই সময়ে সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। একদা সভৃত্য চন্দ্রশেখর সাগর যাত্রায় বহির্গত হইয়া স্বপ্নাবেশে ভগবতীর সন্দর্শন লাভ করেন। ভগবতীর আদেশে কতিপয় দেবমূর্ত্তি উদ্ধারার্থ চন্দ্রশেখর ভৃত্যকে নৌকার নিকটে সাগরগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে আজ্ঞা দেন। দুইবারে যে দুইটী প্রস্তরময়ী দেবমূর্ত্তি দনুজমর্দ্দন প্রভুর আদেশে উত্তোলন করেন, তাহা বর্ত্তমান সময় পর্যন্তও চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ কর্ত্তৃক কুলদেবতারূপে পূজিত হইতেছে। চন্দ্রশেখর ভৃত্যকে কহিলেন যে, 'শীঘ্রই সাগর শুষ্ক হইয়া স্থলে পরিণত হইবে এবং তুমি তথায় রাজা হইবে। আমার নাম অনুসারে এই স্থলের নাম চন্দ্রদ্বীপ রাখিও'। ইহা হইতে চন্দ্রদ্বীপ নামের উৎপত্তি হয়।

বর্ত্তমান জিলা বাখরগঞ্জ (সলিমাবাদ পরগণা ভিন্ন) লইয়া বাকলা চন্দ্রদ্বীপ সংগঠিত হইয়াছিল। আদিশূরের আনীত পঞ্চ প্রধান কায়স্তের আবাসস্থল এখানে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় চন্দ্রদ্বীপের রাজাগণ বঙ্গজ কায়স্থগণের সমাজপতি পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা দনুজমর্দ্দন খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ থানার নিকটবর্ত্তী কচুয়া নামক স্থানে যে চন্দ্রদ্বীপের বহু সম্মানিত রাজবংশের স্থাপন করেন, ঘটকদিগের মতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সেই চন্দ্রদ্বীপে ১৭ জন নরপতি আবির্ভূত হইয়াছেন। কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থের বংশধরগণের ২৩ পুরুষ গত হইয়াছে বলিয়া ডাক্তর ওয়াইজ ঢাকার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু ব্রজসুন্দর মিত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে লিখিয়াছেন। জন প্রবাদ মতে দনুজমর্দ্দন দে বিক্রমপুর হইতে আগমন করেন। রাজা বল্লাল সেনের পর তিনি পুনরায় বঙ্গজ কায়স্থদিগের শ্রেণী বিভাগ করিয়া কায়স্থ কুলাচার্য্য ব্রাহ্মণ ঘটকদিগের বাসস্থল ইদিলপুর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। কুলীন কায়স্থদিগের সম্বন্ধ বন্ধনাদি কার্য্য নির্ব্বাহের ভার ঘটকদিগের প্রতি অর্পিত হয়। [illegible] নির্ম্মাণ ও সভাতে সমবেত হইয়া সম্মান অনুসারে যে কোন স্থানে উপবেশন করিতে অধিকারী হইবে, তাহা নির্ণয় করিয়া সেই সকল নিয়ম যথাবিহিত মত পালিত হইতেছে কি না, উহা দেখিবার ভার এক দল কায়স্থের প্রতি প্রদান করেন। আজিও তাহাদের বংশধরগণ রাজা দনুজমর্দ্দনের বিধান অনুসারে ঘটকদিগের স্থায় কায়স্থসমাজে বিশেষ সম্মাননা প্রাপ্ত হইতেছে।

রাজা দনুজমর্দ্দনের পর তাঁহার পুত্র রমাবল্লভ রায় চন্দ্রদ্বীপের আধিপত্য লাভ করেন। রমাবল্লভের পর তাঁহার পুত্র কৃষ্ণবল্লভ, তৎপর কৃষ্ণবল্লভের পুত্র জয়দেব রায় পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালার কায়স্থদিগের সমাজপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। জয়দেবের সহোদরা কমলা রাজধানী কচুয়াতে যে বৃহৎ দীঘিকা খনন করাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। জয়দেব রায়ের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর তাঁহার ভাগিনেয় চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত দিহরঘটী নিবাসী বসুবংশজ কুলীন পরমানন্দ রায় মাতুলের রাজ্য ও সমাজপতি পদ প্রাপ্ত হন। আবুলফাজলের 'আইনি আকবরী' গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ১০৮৩ খ্রীঃ ভীষণ ঝটিকাবর্ত্ত হইতে পরমানন্দ রায় সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পান। ১৫৭৪ খ্রীঃ আকবরের সেনাপতি মুরাদ খাঁ চন্দ্রদ্বীপ আক্রমণ করিয়া তাহা দিল্লীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরমানন্দের পর তাঁহার পুত্র জগদানন্দ ও পৌত্র কন্দর্পনারায়ণ রায় যথাক্রমে চন্দ্রদ্বীপের আধিপত্য লাভ করেন। ১৫৮৬ খ্রীঃ ইংরেজ পর্য্যটক রালফফিচ্ বাকলায় রাজা এই কন্দর্প-

সিংহ, ইন্দুধর রক্ষিত, হরিবাহু অঙ্কুর, লোম-পাদ বিষ্ণু, বিশ্বচেতা আঢ্য, মহীধর নন্দন, সমুদয়ে এই ২২ জন কায়স্থ বঙ্গদেশে উপনীত হন। কোনও যুক্তি কি প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কৈলাস বাবু কিরূপে যে সকল "মিত্র, নাগ, পাল, সেন, দত্ত, বর্দ্ধনবংশীয় প্রাচীন হিন্দু রাজন্যবর্গের সহিত বাঙ্গলার ঐ সকল উপাধিধারী কায়স্থগণের অবশ্যই কোনরূপ ঘনিষ্ট সম্পর্ক রহিয়াছে" বলিয়া অদ্ভুত সিদ্ধান্ত দ্বারা বাঙ্গলার কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিয়া উঠিলেন,—স্থূল বুদ্ধিতে আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। ইতিহাসের আলোচনায় তাহাকে এবম্বিধ কবিকল্পনার আশ্রয় লইতে দেখিয়া, আমাদের ন্যায় 'নব্যভারতের' (অষ্টম খণ্ড, ৩৭৯ পৃষ্ঠা) অন্য কোনও স্থূলবুদ্ধি পাঠক অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছেন কি না, বলিতে পারি না।

আবুলফাজলের মতে আদিশূর কায়স্থ ছিলেন। গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্বের উপক্রমণিকায় তাঁহাকে দাল্‌ভ্য মুনির বংশধর ক্ষত্রিয় জাতীয় কায়স্থ বলা হইয়াছে এবং গিরিধর, পৃথ্বীধর, সৃষ্টিধর, প্রভাকর ও জয়দ্ধর নামে কয়েক জন কাল্পনিক রাজাকে আদিশূর বংশীয় বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে। কৈলাস বাবু তাঁহাকে কাম্বোজ বংশীয় ক্ষত্রিয় ও শৈব নরপতি কান্যকুব্জের অধীশ্বর বৎসরাজ দেবের সেনাপতি বলিয়া প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

নারায়ণের সভায় উপস্থিত হন। কন্দর্পনারায়ণ কি তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র রায়ের সময়ে, চট্টগ্রামের পর্ত্তুগিজ ও মগদস্যুদিগের ভীষণ উপদ্রবে কচুয়া হইতে মাধবপাশায় রাজধানী নীত হয়। রামচন্দ্র রায় যশোহরের রাজা সুপ্রসিদ্ধ প্রতাপাদিত্যের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ১৫৯৩ খ্রীঃ প্রতাপাদিত্যের রাজা মানসিংহের হস্তে পরাজয় ও মৃত্যুর পর তাঁহার পতিব্রতা তনয়া স্বামী রামচন্দ্র রায়ের দর্শন মানসে পৈতৃক রাজবাটী হইতে যাত্রা করিয়া স্বামীর আদেশ প্রতীক্ষায় পথিমধ্যে যেস্থলে অবস্থিতি করেন, তথায় সেই ঘটনার চিরস্মারকরূপে যে হাট প্রতিষ্ঠিত হয়, অদ্যাপি তাহা "বৌঠাকুরাণীর হাট" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রামচন্দ্রের পুত্র কৃষ্ণনারায়ণ দুর্দ্ধর্ষ মগ ও পর্ত্তুগিজদিগের বিরুদ্ধ অনেকানেক যুদ্ধে ঢাকার নবাবকে বিশেষ সাহায্য করেন। কৃষ্ণনারায়ণ স্বীয় কনিষ্ঠভ্রাতা বাসুদেব রায়ের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করেন। বাসুদেবের পৌত্র নিঃসন্তান হওয়াতে, তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পিতৃস্বসার কি মাতুলের পুত্র ঢাকার নিকটবর্ত্তী উলাইলের উদয় নারায়ণ মিত্র মজুমদার চন্দ্রদ্বীপের আধিপত্য লাভ করেন। মুরসিদাবাদের নবাব তাঁহার সম্পত্তি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে উদয় নারায়ণ মুরসিদাবাদে নবাবের আদেশে দ্বন্দ্বযুদ্ধে একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রকে নিহত করিয়া চন্দ্রদ্বীপের আধিপত্য পুনরায় প্রাপ্ত হন। উদয়নারায়ণের পৌত্র জয়নারায়ণ অতি শৈশবে জমিদারীর ভার প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার দুরাচার ও বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারী শঙ্কর বক্সী ৭ বৎসর পর্য্যন্ত চন্দ্রদ্বীপে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। তদনন্তর তাঁহার মাতা দুর্গারাণী দেওয়ান গোবিন্দ সিংহের সাহায্যে জমিদারীর শাসনভার গ্রহণ করিয়া নষ্টোদ্ধারে প্রবৃত্ত হন। জয়নারায়ণের পরবর্ত্তী রাজা নৃসিংহ সৌন্দর্য্যের জন্য বাঙ্গলায় সুবিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু শাসনকার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। ১৭৯৯ খ্রীঃ বাকী খাজানার জন্য জমিদারীর কিয়দংশ বিক্রীত হয়। মাধবপাশার রাজবংশ এক্ষণে সামান্য সিকমি তালুকদারে পরিণত হইয়া, অতীত গৌরবের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়াছে।

ভালবাসা-কালকূট।

ভালবাসা-কালকূটের কথা আমাকে বলিও না, ভাব তার দাসী, চঞ্চলা নদীর তীরে কলঙ্ক-চন্দন-বৃক্ষমূলে সেই কুসুম-দেহী কোমলাঙ্গীর বাস। সে কালকূট পান করিয়া আমি জর্জ্জরিত হইয়াছি,—আর আমাকে তার কথা বলিও না। সে না করিতে পারে এমন কাজ নাই,—সে যে কি নেশায় ভুলায়, জানি না, কিন্তু জগৎ তার জন্য পাগল। শিব পাগল সতীর জন্য, সীতা পাগলিনী শ্রীরামের জন্য,—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা এবং শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের জন্য পাগল এবং পাগলিনী। কেন, কি জন্য, আমি তাহা বুঝিলাম না। দর্শন নাস্তিবাদ লইয়া, বিজ্ঞান অস্থি বা জড়বাদ লইয়া কতরূপে প্রতিপন্ন করিল, মনুষ্যের শরীরের অবয়ব নাই, সে মায়া, সে ছায়া, সে পরমাণু সমষ্টি—অথবা শ্মশানের ছাই। মৃত্যুর অপেক্ষা আর দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত কোথায় পাইব? সে প্রত্যক্ষবাদ চক্ষুর সম্মুখে ধরাইয়া চক্ষু ভাঙ্গিয়া দেখাইল, বাস্তবিকই মানুষ শ্মশানের ছাই, তবুও, কি জানি কেন, তবুও মানুষের জন্য মানুষ পাগল। শ্যাম বাঁশরী আর বৃন্দাবনে নাই, কিন্তু তবুও শ্রীরাধার কুল ডুবাইল, মান ডুবাইল, জীবন ডুবাইল। হায় হায় আর রহিল কি? আমার সম্মুখে কেহ নাই, পশ্চাতে কেহ নাই—চতুর্দ্দিকে কেবল ফাঁপা নীরবতা, কেবল অনন্তপুরের অনন্ত তৃষ্ণা, আমি বিষে জর্জ্জরিত, আমার প্রাণ দিবানিশি হু হু ধু ধু করিয়া জ্বলিতেছে। লোকে বলে "আমি মানুষের ভালবাসা কাড়িয়া লইয়াছি, কিন্তু কাহাকেও ভালবাসা দেই নাই—আমি অনুরাগ করি, আমি মাতাইতে জানি, কিন্তু মাতি না। আমি যশের কুহকে, স্বার্থের ধাঁধায়, প্রলোভনের ছলনায় আমি ঘুরি, ফিরি, উঠি, বসি।' বাস্তবিকও আমি তাহাই। বন্ধু আমাকে ক্ষমা করিয়া, পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া যাও, আর বৃথা ভালবাসার কথা বলিও না।

বাল্যকাল হইতে আমার বড় অহঙ্কার ছিল, তাই দম্ভ-সহকারে বলিতাম "লোকের জন্য আমি পাগল হইব? না—তা কখনই হইবে না।" এজন্য আমি লোকের ঘর বাঁধি নাই—এজন্য চাল খেলায় দৃষ্টি নাই। বড় [illegible] কঠোর তপস্যা, কর্ত্তব্যের সেবায় পিতা মাতা গুরুজনের স্নেহ, ভ্রাতা ভগ্নীর স্নেহ, স্কুলের সহপাঠিগণের স্নেহ, যৌবনে বন্ধুদিগের স্নেহ, সব স্নেহ ভুলিয়াছি। মাতা কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া চলিয়া গেলেন, পিতা নীরবে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইলেন,—আর যাঁহারা গুরুজন তাঁহারা অনেক করিলেন, অনেক সহিলেন, শেষে আর পারিলেন না, আমাকে বিদায় দিলেন। কলেজ বা স্কুলে পড়িবার সময় সকলে আমার বাড়ী আসিত, আমি কাহারও বাড়ী যাই নাই,—ইহাতেই সব কথা বুঝিতে পারিবে। বাল্য-সুহৃদ "কা ও গো" সহোদর "ব", যৌবন-সুহৃদ্ "চ, অ, পা, ও ম"—সকলে নিরাশ হইয়া অন্ধকারে [illegible] ডুবাইয়া চলিয়া গেল। তাঁহারা সকলে আজ অদৃশ্য পুরে মনপ্রাণ বাঁধিয়াছেন। হায়, হায়, আমি কি পাষাণ? আমি আজও স্বপ্নে তাহাদের ছবি দেখিয়া অবাক হই, কিন্তু ধরা ছোঁয়া দেই না। হায়, আমি কি মানুষ? না আমি সত্যই পাষাণ। এতদূর পর্য্যন্তও

পাষাণ। কিন্তু অনন্তপুরের অনন্তদ্বারে তপস্যা করিয়া—"ক" হইতে "অ" সকলে মিলিয়া বিশ্বেশ্বরের যোগ ভাঙ্গিয়া মন গলাইয়া অবশেষে প্রেম-বিষ আমার প্রাণে ঢালিয়াছে। "অপরাজিতা" আমাকে কি করিয়া কোন্ তীর্থে কোন নৌকায় যেন উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে। সত্যই সে আসিয়াছিল—আর আজ সত্যই সে গিয়াছে? হায় হায়, আমি মানুষ হইলাম, পাখী হইলাম না কেন? আমি উড়িতে অক্ষম, সীমায় আবদ্ধ—অসীম অনন্তপুর কতদূর, কিছুই বুঝিলাম না। সে আমার প্রাণ বাঁধাইল। এতদিন পরে আমি কলঙ্ক-সাগরে ডুবিলাম। মানুষ শ্মশানের ছাই, তাত বেশ বুঝিয়াছি, কিন্তু তবুও আমি তার জন্য পাগল। বন্ধু, তুমি ঠাট্টা করিলে, মুখ বক্র করিলে, কিন্তু আমার প্রাণ ত বুঝিলে না। প্রাণ বুঝা—তোমার কাজ নয়। ঠাট্টা, তিরস্কার, যশ, নিন্দা, প্রশংসা—তোমার হাসিমাখা মুখ বা চক্ষের জল, ওসব আমার নিকট সমান। বন্ধু, বল নগরে—'ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ কলঙ্কসাগরে।' দেখিলাম ত আবো দেখিলাম না কেন? পাইলাম ত আবো পাইলাম না কেন? তার কথা শুনিলাম ত আবো শুনিলাম না কেন, এ সকল বুলি আমার নিকট শুনিবে না। আমার ভাষা—"কি দেখিলাম।" "কি দেখিলাম।" সে অমৃত সাগরের ঢেউ, সে সুধা-সিন্ধুর নবনী, সে চাঁদ ছাঁকিয়া অমিয়া, সে কুসুমজগতের সুষমা, অথবা সে যে কি, আমি তা জানি না। মানুষ, মানুষকে ভুলিয়া তারপর স্বপ্নে দেখে। আমি তাকে আর স্বপ্নেও দেখি না। সে প্রত্যক্ষ, চিরপ্রত্যক্ষ, চির উজ্জল, চির নিকটস্থ। সে দেবীপুরের দেবী-মূর্ত্তি, মাতৃমূর্ত্তি।

ছি, ছি, ছি—মানুষীকে দেবী বলিলাম? ছি, ছি, ছি—এই বলিয় সব বন্ধু, সব ভাই আজ দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। পাগলের বাণী, প্রলাপের উক্তি শুনিতে কেহ আজ কাছে নাই। স্বার্থের পর স্বার্থ, তার পর স্বার্থ—সপ্তম স্বার্থ-দেশের পর তাঁহারা বাড়ী বাঁধিয়াছেন। আমি শুনিতেছি, তাঁহারা আমাকে ঘৃণা করিয়া এখন ভালই আছেন। আমি শুনিতেছি, তাদের ধর্ম্মকর্ম্ম এখন ভালই হইতেছে। কেহ তোষামোদে, কেহ যশে, কেহ প্রশংসা স্তুতিবাদে তাঁহারা দলের মধ্যে একজন হইয়া আজকাল ভাল ভাবেই দিন কাটাইতেছেন। আর আমি? ভবপুরে ভবঘুরে—যেই একাকী, সেই একাকী—কোলে সেই মাতৃমূর্ত্তি। নিমতলার ঘাটে মায়ের রূপ ভাসাইয়াছি—আমার মা এখন নিরাকারা—চিন্ময়ীমূর্ত্তি। তিনি রূপের অতীত—অরূপা, অথবা রূপ জমিয়া মহামায়ার মহারূপ মা আমার, আমি মায়ের, এই একটী কথায় আমার সব বেদ, বাইবেল, কোরাণ পরিসমাপ্ত। তোমার ব্রহ্মাণ্ডবেদ, রাশি রাশি পাঁজাপুঁথি আমার এই একটী কথায়। আমি তর্কযুক্তি জানি না, দর্শনবিজ্ঞান ধুঁইয়া যাহা পান করিতে হয়, তোমরা কর, আমি আর কিছুরই নই, কেবল মায়ের। মা আমার কথা বলেন না, হাসেন না, কিছু দেন না, এইরূপ যত যুক্তি তর্ক থাকে, আমার নিকট লইয়া আসিয়া ভুলাও, আমি অলড়, আমি দেখিয়াছি, পাইয়াছি, তাঁর কথা শুনিয়াছি, আমি কিছুতেই তোমার ঐ সকল কথায় ভুলিব না। তোমার জন্য অবিশ্বাস থাকে, ভাই তুমি তাই লইয়াই থাক, আমি তাহা চাই না। আমার যাহা, আমি তাই লইয়াই থাকিতে চাই। আমি চাই। সেই স্নেহ

বিগলিতা, পাপ-প্রলোভনের অস্পৃশ্যা, পুণ্য-সলিলা ভাগীরথিতে দেহ মন ডুবাইতে। সেই সংসারের অতীতা, অপরাজিতা মাতৃ-মূর্ত্তি লইয়া আমি পাগল হইতে চাই। আমি নিমেষ-হারা যোগী, ভাব-হারা কর্ম্মী, জ্ঞান-হারা শিশু,—আমি সব হারা হইয়া মায়ের হইতে চাই। আমি ছুটিতেছি, ফিরিতেছি, —আমি অস্থির হইয়াছি। আর আমাকে ভালবাসার কথা বলিও না, আমি তার জ্বালায় সংসারে থাকিয়াও সংসার-ত্যাগী সন্যাসী।

তোমাদের ভালবাসার মায়ায় আমাকে আর পায়ে জড়াইও না। ভাই, তুমি অনেক দিয়াছ, এখন একটু ক্ষমা কর। আমি তোমাদিগকে ধরিয়া অনন্তপারে যাইব, ভাবি-য়াছিলাম, কিন্তু স্বার্থের হাটে আসিয়া হঠাৎ আমার চমক ভাঙ্গিয়াছে এখন দূর হও। আমি আর ভালবাসিব না। ভালবাসিলে কি হয়, বুঝিয়াছি। আমি সব দিয়াছি, সত্য বলিতেছি, আমি হৃদয়ের সব ঢালিয়াছি, বৃথা শূন্যেরদিকে আর তাকাইও না। যে প্রেম-সিন্ধুতে সকলের প্রীতি, সকলের ভক্তি, বিমি-শ্রিত, সেই সিন্ধুরদিকে নয়ন ফিরাও। আর বৃথা মজিও না। বৃথা হলাহল পান করিও না। অনন্তে সান্তকে ডুবাইয়া নির্লোভী, নিস্পৃহ, নিষ্কর্ম্মাযোগী হও। ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিবে, অনন্তের আস্বাদন পাইবে। সান্তে,—সাকারে,—এ ভবপুরে তাহা পাইবে না। আলোকের অতীত ধামে, রূপের অতীত নামে একবার আসক্ত হও, আমি যাহা বলিতেছি, বুঝিবে। আর যশ-মান, দর্শন বিজ্ঞান চাও, সংসারের বাজারে অন্বেষণ কর। ভক্তির শ্রীঅঙ্গন সেখান হইতে অনেক দূর।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৪২)

ভক্ত সমাগম।

শ্রীচৈতন্য দক্ষিণাপথে গমন করিলে উৎকল রাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র এক দিন কটক হইতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকা-ইয়া পাঠাইলেন। ভট্টাচার্য্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শুনিলাম গৌড় দেশ হইতে এক মহাত্মা নীলাচলে আসিয়া আপনার গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন ও আপনাকে নাকি বহুকৃপা করিয়াছেন? আমি কি তাঁহার দর্শন পাইতে পারি না?" ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন, "আপনি যাহা শুনিয়াছেন, সকলই সত্য, কিন্তু তিনি বিরক্ত সন্ন্যাসী, নির্জ্জন স্থানে থাকেন। রাজদর্শন নিষিদ্ধ বলিয়া প্রাণান্তেও রাজ সমীপে যান না। তথাচ কোন কৌশলে আপনাকে দেখাইতে পারি-তাম, কিন্তু সম্প্রতি তিনি দক্ষিণ দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন।"

রাজা বলিলেন। "জগন্নাথ দর্শন ছাড়িয়া দক্ষিণে যাইবার কারণ কি?"

সর্ব্বভৌম উত্তর করিলেন, তিনি সামান্য মহাপুরুষ নহেন, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য দেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তীর্থ সকলকে

পবিত্র করিতেই তিনি তীর্থ যাত্রা করিয়াছেন।

রাজা বলিলেন, আপনি মহা বিজ্ঞ ব্যক্তি, আপনি যখন তাঁহাকে কৃষ্ণ বলিতেছেন, তখন আপনার কথা অবিশ্বাস করিতে পারি না। যাহা হউক, তিনি আসিলে যেন একবার তাঁহার দর্শন পাই।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন "তিনি অল্প কালেই প্রত্যাগত হইবেন, কিন্তু তাঁহার জন্য একটা বাসার প্রয়োজন। শ্রীমন্দিরের নিকট অথচ নিৰ্জ্জন স্থান হইলেই ভাল হয়। আপনাকে এরূপ একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে।"

রাজা একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমার ইষ্টদেব কাশী মিশ্রের বাড়ীতে তাঁহার সুন্দর বাসা হইতে পারিবে। আপনি আমার নামে মিশ্র মহাশয়কে বলিয়া সেই স্থান ঠিক করিয়া রাখুন।"

ভট্টাচার্য্য রাজ সমীপ হইতে বিদায় লইয়া আসিয়া রাজার ইচ্ছা কাশী মিশ্রকে নিবেদন করিলে কাশী মিশ্র আপনাকে মহা ভাগ্যবান্ মনে করিয়া বাসার স্থান ঠিক ঠাক করিয়া রাখিলেন।

প্রতাপ রুদ্র গঙ্গাবংশের শেষ রাজা, ১৫০৪ হইতে ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি উড়িষ্যার সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ইনি প্রথম বয়সে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়া ছিলেন। কিন্তু পরে বৈষ্ণব হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মকে একবারে উৎকল হইতে দূরী ভূত করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যের জীবনের প্রভাবে ইহার ধর্ম্মানুরাগ আরও সুদীপ্ত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, শ্রীচৈতন্য তীর্থ যাত্রা হইতে আসিয়া প্রথম রজনী সার্ব্বভৌমের আলয়ে যাপন করিলেন। রজনী প্রভাতে ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে জগন্নাথ দর্শন করাইয়া কাশী মিশ্রের ভবনে লইয়া যাইয়া বলিলেন, এই বাড়ী তোমার জন্য বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। ইহা তোমার পছন্দ হয় তো?

শ্রীচৈতন্য বাসস্থান দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। বাড়ীটী যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তেমনি নিৰ্জ্জন, অথচ জগন্নাথ-মন্দিরের সন্নিকট। ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'প্রভু! এই বাসা অঙ্গীকার করিয়া কাশী মিশ্রের আশা পূর্ণ কর। এই সময়ে কাশী মিশ্র সগোষ্ঠিবর্গে আসিয়া তাঁহার চরণতলে পতিত হইলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে আলিঙ্গন দানে কৃপা করিলেন। এবং বলিলেন, 'আমার এই দেহ তোমাদেরই, তোমরা ইহাকে যেমন করিয়া রাখিতে চাও, রাখ, আমার তাহাতে মতামত কি?'

এই সময়ে নীলাদ্রির প্রধান২ লোক শ্রীচৈতন্যের নিকট পরিচিত হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলে উপবিষ্ট হইলে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য একে একে এই সকল ব্যক্তির পরিচয় দিয়া দিলেন। যথাঃ—

জগন্নাথের সেবক জনার্দ্দন, স্বর্ণ বেত্রধারী কৃষ্ণদাস, লিখনাধিকারী শিখি মাহিতি, প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামে বৈষ্ণব, জগন্নাথের মহাসোয়ার দাস নামক ব্যক্তি, শিখি মাহিতির ভ্রাতা মুরারি মাহিতি, চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি নামক ব্রাহ্মণ, বিষ্ণুদাস, প্রহররাজ মহাপাত্র এবং পরমানন্দ মহাপাত্র প্রভৃতি। এই সকল লোক এইক্ষণ হইতে শ্রীচৈতন্যের একান্ত অনুগত হইয়া থাকিলেন। এই সময়ে রামানন্দ রায়ের পিতা ভবানন্দ রায় চারি পুত্র সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলে ভট্টাচার্য্য

তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। ভবানন্দ প্রণাম করিলে চৈতন্যদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন দিয়া বলিতে লাগিলেন "রামানন্দের ন্যায় রত্ন যাঁহার পুত্র, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা কি? তুমি সাক্ষাৎ পাণ্ডু, তোমার স্ত্রী কুন্তী দেবী ও তোমার পাঁচ পুত্র পঞ্চ পাণ্ডব। ভবানন্দ বলিলেন, 'আমি শূদ্রাধম, তাহাতে আবার বিষয়ী, তবে যে তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে স্পর্শিলে, সে কেবল তোমার ঈশ্বর লক্ষণ। যাহা হউক, পঞ্চপুত্র সহ তোমায় আত্ম সমর্পণ করিলাম। এই বাণীনাথ তোমার সমীপেই থাকিবে, যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, আপনার জন বিবেচনায় ইহাকে আদেশ করিও, সঙ্কোচ করিলে মহা দুঃখিত হইব। মহাপ্রভু বলিলেন, "তোমাদের কাছে আর সঙ্কোচ কি? তোমরা তো আমার পর নও। দিন পাঁচেকের মধ্যে রামানন্দ আসিবেন, তখন আমার আনন্দ বাজার পূর্ণ হইবে।' ইহার পর ভবানন্দকে বিদায় দিয়া শ্রীচৈতন্য বাণীনাথকে নিকটে থাকিতে অনুমতি দিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ছাড়া আর সকল লোক বিদায় হইয়া গেলে শ্রীচৈতন্য তাঁহার দক্ষিণ যাত্রার সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে নিকটে ডাকাইলেন এবং ভট্টমারীতে তাঁহাকে ছাড়িয়া কামিনী কাঞ্চনের লোভে যেরূপে সে পলাইয়া গিয়াছিল ও তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে যে বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিয়া বলিলেন 'এখন আমি ইহাকে দেশে আনিয়া দিলাম ও বিদায় দিতেছি। উহার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাউক, আমার নিকট থাকিতে পাইবে না।' এই কথা শুনিয়া কৃষ্ণদাস কাঁদিতে লাগিল। সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল। শ্রীচৈতন্য মধ্যাহ্ন করিতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

নিত্যানন্দাদি কৃষ্ণদাসের ক্রন্দনে দুঃখিত হইয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া নিকটে রাখিলেন এবং সময়ান্তরে শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, 'তোমার দক্ষিণ গমন সংবাদে শচী মাতা ও অদ্বৈতাদি নবদ্বীপের ভক্ত সকল উৎকণ্ঠিত আছেন। তোমার আগমন বার্ত্তা দিতে গৌড় দেশে একজন লোক পাঠাইতে চাই, ইহাতে কি অভিপ্রায় হয়? গৌরচন্দ্র বলিলেন, 'তোমাদের যাহা ইচ্ছা কর'। তখন প্রচুর মহাপ্রসাদ সঙ্গে দিয়া মহাপ্রভুর নীলাচলে প্রত্যাগমন সংবাদ দিতে নিত্যানন্দ কৃষ্ণদাসকে বঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস নবদ্বীপে আসিয়া শচী মাতাকে ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে সংবাদ সহ মহাপ্রসাদ দিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের সমাচার প্রদান করিলেন। শুভ সংবাদ পাইয়া ভক্তগণের আনন্দের পারসীমা থাকিল না। বাসুদেব দত্ত, মুরারি গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, আচার্য্য রত্ন, বক্রেশ্বর পণ্ডিত, আচার্য্য নিধি দামোদর পণ্ডিত, শ্রীমান পণ্ডিত, বিজয় দাস, খোলা বেচা শ্রীধর রাঘব পণ্ডিত হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি যাবতীয় ভক্ত মণ্ডলী এই আনন্দের সংবাদে আচার্য্য গৃহে উপনীত হইলে অদ্বৈতাচার্য্য এতদুপলক্ষে দুই তিন দিন উৎসব করিলেন। তখন সকলে নীলাচলে যাইতে যুক্তি দৃঢ় করিয়া একত্রে নবদ্বীপে শচী মাতার ভবনে যাইয়া তাঁহার আজ্ঞা লইলেন। কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ, রামানন্দ প্রভৃতি ও শ্রীখণ্ডবাসী মুকুন্দ, নরহরি ও রঘুনন্দন এই কথা শুনিয়া নীলাচলে প্রভু দর্শনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া নবদ্বীপে আসিয়া তাঁহাদিগের

সহিত একত্রিত হইলেন। গৌর বিরহে মৃতপ্রায় নবদ্বীপ যেন আবার নব জীবন পাইয়া উঠিল। এই সময়ে পরমানন্দপুরী দক্ষিণাপথ হইতে নবদ্বীপে আসিয়া শচী-গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শচীমাতা তাঁহাকে অতি যত্নের সহিত সেবা করিতেছিলেন। তিনি গৌরের নীলাচলে আগমন শুনিতে পাইয়া পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞানুসারে গৌরের জনৈক ভক্ত কমলাকান্তকে সঙ্গে লইয়া ভক্তমণ্ডলীর গমনোদ্যোগ না হইতে হইতে অগ্রসূচি চলিয়াগেলেন এবং অচিরে নীলাচলে পৌছিয়া গৌরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে পাইয়া প্রণাম করিয়া মহানন্দে বলিলেন 'আপনার সঙ্গে থাকিতে আমার বড় ইচ্ছা, এখন কৃপা-করিয়া নীলাদ্রি আশ্রয় করুন।' পুরী উত্তর, করিলেন 'বঙ্গদেশে তোমার আগমন বার্ত্তা পাইয়া শচীদেবী ও ভক্তগণ মহাসুখী হইয়াছেন। ভক্তগণ এখানে আসিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাহাদের বিলম্ব দেখিয়া আমি ত্বরিতে চলিয়া আসিয়াছি। তখন গৌরচন্দ্র পুরীর জন্য কাশীমিশ্রের সেই বাড়ীর মধ্যে নির্জ্জনে একখানি ঘর ও সেবার জন্য একটী কিঙ্কর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

দিন দিন কাশীমিশ্রের বাড়ী জমকাইয়া উঠিতে লাগিল। প্রাতঃকালে সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য, পরমানন্দপুরী প্রভৃতি নানা ভক্ত-গণ গৌরাঙ্গ সভায় বসিয়া নানা সৎপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। একদিন এমনি সময় স্বরূপ দামোদর আসিয়া গৌরের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ইহার নিবাস নবদ্বীপে, পূর্ব্বাশ্রমে নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস লইলে ইনিও অনুরাগে বারাণসী নগরীতে যাইয়া শিখা সূত্র ফেলাইয়া সন্ন্যাসী হইলেন, কিন্তু যোগ-পট্ট গ্রহণ করিলেন না। ইনি পরম বিরক্ত, শ্রীকৃষ্ণ-ভক্ত এবং শ্রীচৈতন্যের একান্ত অনু-রাগী। সন্ন্যাসাশ্রমে ইহার নাম স্বরূপ হইল। বেদান্তাদি অশেষ শাস্ত্রে ইহার ন্যায় পণ্ডিত আর দেখা যায় না। ভক্তিশাস্ত্রে, রসশাস্ত্রে ও কাব্যশাস্ত্রেও ইনি অদ্বিতীয়। ইহার কণ্ঠস্বর অতি মধুর। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, ইনি সঙ্গীতশাস্ত্রে গন্ধর্ব্ব সম। শ্রীগৌরের নীলাচল আগমন সংবাদ পাইয়া গুরুর অনুমতি লইয়া এই সর্ব্বগুণান্বিত ব্যক্তি আজ চৈতন্যচন্দ্রের দল আলোকিত করিতে মিলিত হইলেন। শ্রীচৈতন্য পদ-তলে পতিত স্বরূপকে তুলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া ক্ষণকাল উভয়ে নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে গৌর বলিলেন, 'তুমি যে আসিবে, তাহা আজ স্বপ্নে দেখি-য়াছি। ভাল হ'ল। আমি অন্ধ ছিলাম, আজ চক্ষুরত্ন লাভ করিলাম।'

স্বরূপ কাঁদিয়া বলিলেন, 'প্রভু! আমি তোমার চরণে ঘোর অপরাধী। তা নইলে তোমাকে ছাড়িয়া অন্যত্র যাইব কেন? আমি তোমাকে ছাড়িয়াছিলাম বটে, কিন্তু তুমিতো ছাড়িলে না, তাই কৃপাপাশ গলায় জড়া-ইয়া বাঁধিয়া আনিলে। এখন আমার অপ-রাধ ক্ষমা করিয়া চরণে স্থান দাও।' তখন স্বরূপ দামোদর নিত্যানন্দাদির চরণ বন্দনা করিলে গৌরচন্দ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, ও পরমানন্দপুরীর সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। স্বরূপ যথাযোগ্য সকলের পাদ-বন্দনা করিলেন। শ্রীচৈতন্য স্বরূপের জন্য কাশীমিশ্রের বাড়ীর নিভৃত স্থানে একখান

ঘর নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া পরিচর্য্যার্থ একটী ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এখন হইতে স্বরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের প্রধান সভাসদ্ হইলেন। কেহ কোন গীত, শ্লোক বা গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীচৈতন্যের নিকট দেখাইতে আনিলে, ভক্তি সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইয়াছে কি না, তাহা স্বরূপ পরীক্ষা করিয়া না দিলে প্রভুর নিকটে উহা যাইতে পাইত না। স্বরূপ সর্ব্বদা নির্জ্জন সাধনে রত থাকিতেন, বড় একটা কথা কহিতেন না, কেবল নিভৃতে বসিয়া বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গীত গোবিন্দের সুললিত পদ মহাপ্রভুকে শুনাইয়া তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতেন। অল্পদিন, মধ্যেই স্বরূপ সকল ভক্তগণের প্রিয়তম ও মহাপ্রভুর যেন দ্বিতীয় স্বরূপ হইয়া উঠিলেন।

আর একদিন গৌরচন্দ্র সভা করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় গোবিন্দ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমার নাম গোবিন্দ, আমি ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য। সিদ্ধি প্রাপ্তকালে পুরী গোঁসাই আমাকে কৃষ্ণ চৈতন্যের নিকট থাকিয়া তাঁহাকে সেবা করিতে আদেশ করিয়াছেন, তাই আপনার নিকট আসিলাম। পুরীর অপর ভৃত্য কাশীশ্বরও তীর্থদর্শন করিয়া শীঘ্র আসিবেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'পুরীশ্বর নাকি আমাকে বড় কৃপা করেন, তাই তোমাকে পাঠাইয়াছেন। সার্ব্বভৌম বলিলেন, 'পুরী গোঁসাই মহাবিজ্ঞ হইয়া শূদ্রসেবক রাখিলেন কেন?' শ্রীচৈতন্য বলিলেন 'ভগবৎপরায়ণ মহানুভবদিগের চরিত্র সাধারণের বোধগম্য নহে। তাঁহারা বেদধর্ম্ম হইতে প্রেমের ধর্ম্মই গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকেন, ও স্নেহসেবা পাইলে বেদমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে, কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। এই বলিয়া তিনি গোবিন্দকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন ও সকলের সহিত যথাযোগ্য পরিচয় করিয়া দিয়া সার্ব্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভট্টাচার্য্য। বল দেখি এখন উপায় কি? গুরুর ভৃত্য আমার মান্য ব্যক্তি। তাঁহাকে কি প্রকারে আপন সেবায় নিযুক্ত করি, অথচ গুরুর আজ্ঞাই বা কিরূপে অবহেলা করি? ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়া গুরুর আজ্ঞাই পালনীয় বলিয়া স্বীয়-মত প্রকাশ করিলে শ্রীচৈতন্য গোবিন্দকে নিজ সেবকরূপে অঙ্গীকার করিলেন। সেই হইতে গোবিন্দ গৌরের মহা প্রিয়পাত্র ও প্রধান সেবক হইয়া সকল ভক্তের সমাধান করিতে লাগিলেন। রামাই ও নন্দাই নামে আর দুই ব্যক্তি ও ছোট হরিদাস ও বড়হরিদাস দুই কীর্ত্তনীয়া তাঁহার সাহায্যার্থে নিযুক্ত হইয়া সেবার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

অপরদিনে মুকুন্দ দত্ত গৌরকে সংবাদ দিলেন যে, ব্রহ্মানন্দ ভারতী আসিয়াছেন। গৌরচন্দ্র সম্ভ্রমে বলিলেন 'কোথায়? তিনি গুরু, আমিই তাঁহার নিকট যাইব। এই বলিয়া মুকুন্দের সহিত তিনি ব্রহ্মানন্দের সমীপে যাইয়া উপনীত হইলেন। ভারতীর মৃগচর্ম্ম পরিধেয় দেখিয়া গৌরচন্দ্র মনে মনে কিছু দুঃখিত হইলেন এবং দেখিয়াও যেন দেখেন নাই এইরূপ ভাবে মুকুন্দকে কহিলেন 'তিনি কোথায়?' মুকুন্দ বলিলেন 'এই দেখ সম্মুখে বিদ্যমান।'

গৌর বলিলেন, 'মুকুন্দ। তোমার কি বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে যে একজনকে আর এক-ব্যক্তি বলিতেছো? ভারতী গোঁসাই চর্ম্মাম্বর পরিবেন কেন? 'এই কথায় গৌরের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া ভারতী মনে

মনে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, সত্যইতো আমি বড় সন্ন্যাসী, এই মনে করিয়াই কি কেবল দাম্ভিকতার জন্য চর্ম্মাম্বর পরি না। ইহাতে ধর্ম্মপথে কিছু সাহায্য হয় না। তবে আর ইহা পরিব না। এই ভাবিয়া ব্রহ্মানন্দ ভারতী তখনই মৃগচর্ম্ম ছাড়িয়া বহির্ব্বাস পরিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহার পাদ-বন্দনা করিলে তিনি গৌরকে আলিঙ্গন দিলেন। তখন উভয়ে শিষ্টাচার আলাপ হইতে লাগিল। ব্রহ্মানন্দ গৌরকে সচল ব্রহ্ম বলিয়া স্তুতি করিলে গৌরও তাঁহাকে সচল ব্রহ্ম বলিলেন। ইহাতে উভয়ের মধ্যে কৌতুক তর্ক বাধিলে সার্ব্বভৌম ভারতীর দিক্ হইয়া গৌরের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিলেন। গৌর বলিলেন 'বিষ্ণু। বিষ্ণু। ভট্টাচার্য্য কি বলিতেছো? অতিস্তুতি সর্ব্বনাশের কারণ। সাবধান এরূপ স্তব আর করিও না। ইঁহার পর ব্রহ্মানন্দ সমুদায় ছাড়িয়া গৌর সন্নিধানে বাস করিলেন। ভগবান্ আচার্য্য ও রাম ভট্টাচার্য্য নামে দুই ব্যক্তিও সর্ব্বকার্য্য ছাড়িয়া গৌরের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কতকদিন পরে ঈশ্বরপুরীর অপর ভৃত্য কাশীশ্বর আসিয়া উপনীত হইলেন। ইনি অতি বলবান ছিলেন। লগুড় হস্তে লোকের ভিড় ঠেলিয়া গৌরকে জগন্নাথ দর্শন করান তাঁহার সেবার কার্য্য নিরূপিত হইল।

একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে বলিলেন, 'যদি অভয় দাও, তাহা হইলে একটী নিবেদন করিতে চাই।' গৌর উত্তর করিলেন, 'নির্ভয়ে বল, উপযুক্ত হইলে শুনিব, নচেৎ নয়।' সার্ব্বভৌম সঙ্কিতভাবে বলিলেন 'রাজা প্রতাপ রুদ্র তোমারে দর্শন করিতে বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।' শ্রীচৈতন্য কর্ণে হস্তদিয়া বলিলেন, 'বিষ্ণু। বিষ্ণু। ভট্টাচার্য্য। এরূপ অযোগ্য কথা বলিলে কেন? আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী। আমার পক্ষে রাজদর্শন স্ত্রীদর্শনের ন্যায় অতীব গর্হিত। সার্ব্বভৌম বলিলেন 'কিন্তু রাজা জগন্নাথ সেবক এবং পরমভক্ত।' শ্রীচৈতন্য। তথাচ রাজা কালসর্পের ন্যায় পরিত্যাজ্য। কাষ্ঠনির্ম্মিত রমণী-মূর্ত্তি দেখিলে যেমন বিকার জন্মিবার সম্ভাবনা, তেমনি ঐশ্বর্য্যশালী নৃপতি দর্শনে ধনতৃষ্ণা প্রবল হইয়া প্রলোভন জন্মিতে পারে। এরূপ কথা আর যেন তোমার মুখে না আইসে। পুনরায় বলিলে আমাকে আর এখানে দেখিতে পাইবে না। সার্ব্বভৌম আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেলেন।

কথিত আছে রাজা প্রতাপ রুদ্র শ্রীচৈতন্যের দর্শন জন্য এতই ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, তিনি সার্ব্বভৌমকে একপত্রে লিখিলেন যে, ভট্টাচার্য্য যেন গৌরভক্তদিগকে তাঁহার নামে অনুনয় করিয়া তাঁহাদের দ্বারা অনুরোধ করাইয়া মহাপ্রভুর সম্মতি করান্। এই পত্রে তিনি আরও লিখিলেন যে, যদি গৌরচন্দ্র তাঁহাকে দর্শন না দেন, তাহাহইলে তিনি রাজ্য ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইবেন। সার্ব্বভৌম ঐ পত্র নিত্যানন্দাদিকে দেখাইলে তাহারা প্রথমত এসম্বন্ধে কোন কথা গৌরকে জানাইতে সাহসী নহেন বলিলেন। পরে সার্ব্বভৌমের অত্যন্ত অনুরোধে অনুরুদ্ধ হইয়া গৌরের নিকট কেবল এইকথা মাত্র, বলিলেন কোন অনুরোধ করিবেন না বলিয়া নিত্যানন্দ অঙ্গীকার করিলেন। তদনুসারে ভক্তবৃন্দ ঐ পত্রের কথা গৌরের নিকট বলিলে তিনি রুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তবে তোমাদের ইচ্ছা

যে আমি রাজসেবী হইয়া বিষয় ভোগ করি? নিতাই বলিলেন, 'তা নয়, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, কিন্তু রাজা বড় ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহার উৎকণ্ঠা নিবারণ জন্য তোমায় একখানি বহির্ব্বাস পাঠাইতে চাই। গৌর তাহাতে সম্মত হইলে একখানি বহির্ব্বাস রাজসমীপে পাঠান হইল। রাজা নাকি মহাপ্রভুর পরিধেয় বলিয়া সেখানিকে মাথায় রাখিয়া পূজা করিতে লাগিলেন। ইহার পর রাজা রামানন্দ রায় দ্বারা পুনর্বার অনুরোধ করিলে গৌর সেবার সম্মত হইয়া রাজার পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং রাজা সেই পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

তদনন্তর রাজা প্রতাপরুদ্র নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে রামানন্দ রায়ও আসিয়াছিলেন। রামানন্দ নীলাচলে আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে গৌরসমীপে যাইয়া দণ্ডবৎ করিলেন। গৌরচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া মহা আনন্দিত হইলেন এবং সকল ভক্তের সহিত তাঁহার যথা-যোগ্য মিলন করাইয়া দিলে রামানন্দ বলিলেন, তোমার পরামর্শানুসারে বিষয় ছাড়িয়া নীলাচলে তোমার চরণে অবস্থিতি করিব। রাজাকে জানাইলে, রাজা তোমার নাম শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে আমার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়াছেন। আমাকে আমার নির্দ্দিষ্ট বেতন দিবার অঙ্গীকার করিয়া তোমার চরণসেবা করিতে বলিয়াছেন, আর তিনি তোমার দর্শনলাভের জন্য কত মিনতি করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'তুমি ভক্ত, তোমাকে যে রাজা এত অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কৃপা করিবেন।' ইহার পর শ্রীচৈতন্য রামানন্দকে জিজ্ঞাসিলেন, 'রায়! কমলনয়ন দেখিয়াছ তো?' রামানন্দ বলিলেন 'না'। গৌর বলিলেন, 'বড় অন্যায় করিয়াছ, আগে জগন্নাথ দেখিয়া এখানে আসা উচিত ছিল, যাও এখন দর্শন করগে।' রামানন্দ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, 'কি করিব, চরণ-রথ, হৃদয়-সারথি যেখানে লইয়া যায়, জীবরথী সেইখানেই যায়।' এখন হইতে রামানন্দ নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

নীলাচলে আসিয়া রাজা প্রতাপ রুদ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার বিষয় প্রভুকে বলিয়াছিলে কি?' ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 'হাঁ' কিন্তু তিনি রাজদর্শন করিবেন না। অধিকন্তু আবার যদি বলি, তাহা হইলে অন্যত্র চলিয়া যাইবেন, ইহাও বলিয়াছেন।'

ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, জগাই মাধাই প্রভৃতি পাপীকে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন, কেবল প্রতাপ রুদ্র ছাড়া আর সকলেই কি তাঁর দয়ার পাত্র? আচ্ছা তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আমায় দর্শন দিবেন না। আমিও প্রতিজ্ঞা করিলাম, তাঁহাকে না দেখিয়া ছাড়িব না। সার্ব্বভৌম রাজার অনুরাগ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, 'দেব! বিষাদ ছাড়ুন। অবশ্যই আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ হই'ব। তিনি প্রেমাধীন, আপনার গাঢ় প্রেমের নিকট অবশ্যই পরাজিত হইবেন। আজও রামানন্দ রায় আপনার জন্য বলিয়াছিলেন, তাহাতে মন অনেক নরম হইয়াছে। তবে আপনি এককাজ করিবেন, রথ যাত্রার দিনে প্রভু জগন্নাথ

বল্লভ উদ্যানে যখন বিহার করিবেন, তখনই দীনভাবে তাঁহার নিকটে যাইয়া ভাগবত আবৃত্তি করিবেন। রাজা বলিলেন, স্নানযাত্রা কবে? ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন, আর তিনদিন বাকী আছে। রাজাকে এইরূপে আশ্বস্ত করিয়া ভট্টাচার্য্য বিদায় হইয়া আসিলেন।

স্নানযাত্রা দেখিয়া শ্রীচৈতন্য কে জানে কি ভাবিয়া ভক্তমণ্ডলী ছাড়িয়া বিরহ বিহ্বলচিত্তে একাকী আলালনাথে চলিয়া গেলেন। সার্ব্বভৌম এই সংবাদ পাইয়া ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার অনুগমন করিয়া গৌরের ভক্তগণ আসিতেছে ইত্যাদি অনুনয় বিনয় করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন এবং তাঁহাকে বাঁসায় রাখিয়া রাজসমীপে উপনীত হইয়া গৌরের প্রত্যাগমন সংবাদ রাজাকে জানাইলেন। এই সময়ে গোপীনাথ আচার্য্য রাজসভায় আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ভট্টাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'বঙ্গদেশ হইতে মহাপ্রভুর দুইশত ভক্ত বৈষ্ণব আসিয়া নগরে উপসন্ন হইয়াছেন। তাঁহাদের জন্য বাঁসার স্থান ও মহাপ্রসাদ চাই। রাজা বলিলেন, 'পড়িছাকে আদেশ পাঠাইয়া দাও সে যেন সব সরবরাহ করে।' এই বলিয়া প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমকে কহিলেন 'মহাপ্রভুর ভক্তদিগকে একে একে আমাকে চিনাইয়া দাও দেখি।' সার্ব্বভৌম বলিলেন, 'তবে চলুন, প্রাসাদশিখরে আরোহণ করা যাউক, গোপীনাথ সকলকে চিনাইয়া দিবেন। আমি সকলকে চিনিনা। ভক্তদল এই পথ দিয়াই যাইবেন।'

তখন প্রতাপ রুদ্র, সার্ব্বভৌম ও গোপীনাথ তিনজনে অট্টালিকার উপর উঠিলেন। এমন সময় বৈষ্ণবদলও নিকটস্থ হইল ও পথের অপর পার্শ্বদিয়া স্বরূপদামোদর ও গোবিন্দ মালা ও মহাপ্রসাদ লইয়া তাঁহাদিগকে আগবাড়াইয়া লইতে আসিলেন। স্বরূপ সর্ব্বপ্রথমে অদ্বৈতাচার্য্যের গলায় মালা দিয়া প্রণাম করিলেন ও গোবিন্দ মহাপ্রসাদ দিলেন। আচার্য্য গোবিন্দের দিকে তাকাইলে স্বরূপ তাঁহার পরিচয় করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে শ্রীবাস পণ্ডিত আদি সকলকেই মালা প্রসাদ দিয়া স্বরূপ গোঁসাই অগ্রসারি লইয়া চলিলেন। গোপীনাথ অট্টালিকার উপর হইতে রাজাকে একে একে সকলের পরিচয় দিয়া দিলে রাজা বলিলেন, 'এইরূপ তেজঃপুঞ্জ বৈষ্ণব আর কোথায়ও দেখি নাই, ইঁহাদের প্রেমচেষ্টা, নৃত্যকীর্ত্তন সকলই অদ্ভুত।

সার্ব্বভৌম উত্তর দিলেন, 'এই প্রেমিকদল ও প্রেমসংকীর্ত্তন চৈতন্যের সৃষ্টি। কলিযুগের ধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিয়া প্রভু এবারে পাপী আর রাখিবেন না।'

রাজা। যদি চৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণ, তবে পণ্ডিতগণ তাঁহাতে বিতৃষ্ণ কেন?

ভট্টাচার্য্য। তাঁহার কৃপা ভিন্ন তো তাঁহাকে চেনা যায় না!'

রাজা। আচ্ছা এই সব বৈষ্ণব জগন্নাথ না দেখিয়া চৈতন্যের বাঁসারদিকে কেন চলিল?

ভট্টাচার্য্য। প্রেমের রীতিই এই। ইঁহারা সকলেই মহাপ্রভুকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন। তাই আগে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে জগন্নাথ দর্শন করিবেন। এইরূপ আলাপের পর রাজা অট্টালিকা হইতে নামিয়া কাশীমিশ্র ও পড়িছাকে ডাকাইয়া ভক্তগণের জন্য বাঁসা ও মহাপ্রসাদ সরবরাহ করিতে আদেশ দিলেন।

এদিকে ভক্তদল কাশীমিশ্রের ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সে হরিধ্বনি, হুঙ্কার, গর্জন ও উৎসাহ দেখিলে মৃতপ্রাণেও উৎসাহ সঞ্চার হয়। গোপীনাথ ও সার্ব্বভৌম রাজসমীপ হইতে বিদায় লইয়া ভক্তদলের অনুগমন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রীচৈতন্য পথিমধ্যে আসিয়া ভক্তদিগকে দর্শন দিলেন। তখন একটা যে আনন্দোচ্ছ্বাস উঠিল, তাহা বর্ণনার যোগ্য নহে। শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত প্রভৃতি ভক্তগণকে এক একে প্রেমালিঙ্গন ও স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া সুখী করিলেন।

মুকুন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ বাসুদেব দত্তকে শ্রীচৈতন্য বলিলেন, 'তোমার জন্য ব্রহ্মসংহিতা ও কৃষ্ণকর্ণামৃত দুই পুঁথি আনিয়াছি, উহা স্বরূপের নিকটে আছে, চাহিয়া লইয়া পাঠ করিও।' সকলের সঙ্গে মিলন করিয়া শ্রীচৈতন্য বলিলেন, আমার হরিদাস কোথায়? কোন ভক্ত উত্তর করিল, 'হরিদাস রাজপথে পড়িয়া কাঁদিতেছেন ও বলিতেছেন, আমি নীচ জাতি। মন্দিরের নিকটে আমার যাইবার অধিকার নাই, কেমন করিয়া প্রভুর দর্শন পাইব? এই সময় কাশীমিশ্র ও পড়িছা আসিয়া বলিলেন, ভক্তগণের বাসা ঠিক হইয়াছে ও মহাপ্রসাদান্ন প্রস্তুত। শ্রীচৈতন্য গোপীনাথকে বলিলেন, 'তুমি বৈষ্ণবদিগকে লইয়া বাঁসায় যাও ও বাণীনাথ। তুমি মহাপ্রসাদ আনাইয়া আমার বাঁসায় রাখ। সকলে একত্র ভোজন করিব। ভক্তদিগকে গৌর বলিলেন, 'এখন বাঁসায় গিয়া দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিয়া সমুদ্র স্নানান্ত আমার এখানে ভোজন করিতে আসিবে।' এই বলিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া তিনি রাজপথে যেখানে হরিদাস পড়িয়া ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইয়া হরিদাসকে তুলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। হরিদাস বলিলেন, 'ছি প্রভু! আমি নীচ জাতি, আমাকে ছুঁইও না।' শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, 'তোমাকে স্পর্শ করি পবিত্র হইতে।' এই বলিয়া কাশীমিশ্রকে বলিলেন, 'আমার বাঁসার নিকট পুষ্পোদ্যানের মধ্যে নির্জ্জনে একখানি ঘর আছে, আমাকে সেইখানি ভিক্ষা দিতে হইবে।' কাশীমিশ্র বলিলেন, 'তোমারই সব, যা ইচ্ছা লইবে। তাহাতে আমাকে জিজ্ঞাসা কেন?' তখন শ্রীচৈতন্য হরিদাসকে সেই ঘরে লইয়া গিয়া বাঁসা দিলেন ও বলিলেন, এইখানে থাকিয়া হরিনাম করিবে। গোবিন্দ তোমার জন্য প্রত্যহ এখানে প্রসাদ দিয়া যাইবে। আমাকেও এখানে রোজ দেখিতে পাইবে।' নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর ও মুকুন্দ প্রভৃতি হরিদাসকে পাইয়া মহা সুখী হইলেন।

এদিকে গৌরচন্দ্র সমুদ্র স্নান করিয়া বাসায় আসিয়া বৈষ্ণবদিগের ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাদিও বাসা লইয়া স্নানান্তে ভোজনের জন্য গৌরের আবাসে উপনীত হইলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে যোগাক্রম করিয়া বসাইয়া স্বহস্তে মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। স্বরূপ গোস্বামী তাঁহাকে বলিলেন, 'তুমি না বসিলে কেহ খাইতে চাহেন না, নিত্যানন্দ, পুরী, ভারতী সকলে তোমার অপেক্ষায় হাত তুলিয়া বসিয়া আছেন, তুমি ভোজনে বসো, আমি পরিবেশন করিতেছি।' শ্রীচৈতন্য তখন গোবিন্দের দ্বারা হরিদাসের জন্য প্রসাদ পাঠাইয়া দিয়া ভোজনে বসিলে স্বরূপ, দামোদর ও জগদানন্দ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। সকলে হরিধ্বনি দিয়া

মহানন্দে ভোজন করিয়া আচমন করিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাদিগকে মাল্য চন্দন দিয়া বিশ্রামার্থে বাসায় পাঠাইয়া আপনিও বিশ্রাম করিলেন। স্বায়হ্নে সমস্ত বৈষ্ণব গৌরাঙ্গ সভায় সমাগত হইলে রামানন্দ রায় উপনীত হইলেন। গৌরচন্দ্র রামানন্দের সহিত অদ্বৈতাদি গৌড়ীয় ভক্তগণের পরিচয় করিয়া দিলে সকলে আনন্দে হরিকথায় ও প্রেমালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর শ্রীচৈতন্য সর্ব্বভক্ত সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ মন্দিরে গমন পূর্ব্বক সন্ধ্যারতি অন্তে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। আজ গৌরের উৎসাহ দেখে কে? বঙ্গীয় ভক্তগণের সঙ্গে উৎকলের ভক্তগণের মিলনে যে আনন্দ তরঙ্গ উঠিয়াছে, সেই তরঙ্গে গৌর আজ মাতোয়ারা হইয়া উল্লাসে কীর্ত্তনের চারিটী সম্প্রদায় বাঁধিয়া দিলেন। আটখান খোল ও বত্রিস জোড়া করতাল বাজিতে লাগিল। কীর্ত্তনের স্বর নৈশ আকাশ বিদীর্ণ করিয়া তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল। নিলাদ্রিবাসী নর নারী ধাইয়া দেখিতে আসিল, রাজা প্রতাপরুদ্র অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া অট্টালিকায় আরোহণ করিয়া দেখিতে শুনিতে লাগিলেন। গৌরচন্দ্র কীর্ত্তনের সম্প্রদায় মধ্যে জগন্নাথ-মন্দির বেষ্টন করিয়া নাচিতে লাগিলেন এবং অশ্রু কম্প পুলকে ভাসিয়া উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। লোক সকল দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। নৃত্যাবসানে গৌরচন্দ্র কীর্ত্তনের সম্প্রদায় লইয়া মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে দাঁড়াইয়া গান করিতে আদেশ দিলেন এবং নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীবাস ও বক্রেশ্বরকে এক এক সম্প্রদায়ে নাচিতে বলিলেন। তাঁহাদের মহানৃত্যে মন্দিরের প্রাঙ্গণ যেন কম্পিত হইতে লাগিল। এই রূপে সেদিনকার সংকীর্ত্তন শেষ হইলে শ্রীচৈতন্য বাসায় আসিয়া ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ ভোজন করাইয়া স্ব স্ব বাসায় বিশ্রামার্থে বিদায় দিলেন। বৈষ্ণবেতিহাসে এই কীর্ত্তন বেড়া-কীর্ত্তন নামে অভিহিত হইয়াছে।

নীলাদ্রির পবিত্র ক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্যের প্রেমের হাট বসিয়া গেল। নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গনে অল্প সংখ্যক ভক্ত লইয়া এত দিন যে লীলা হইয়া আসিয়াছে, তাহাই এখন বৃহদাকারে জগন্নাথ ক্ষেত্রে অভিনীত হইতে চলিল। চারিদিক হইতে নদীসকল প্রধাবিত হইয়া যেমন সমুদ্রে সম্মিলিত হয়, তেমনি ভারতের নানা স্থান হইতে ভক্তগণ আসিয়া উৎকলের জগন্নাথ ক্ষেত্রে গৌর-সাগরে মিলিতে লাগিল। বঙ্গের ভক্তগণ এখন হইতে প্রতি বৎসর রথযাত্রার পূর্ব্বে পুরুষোত্তমে আসিয়া ৪।৫ মাস গৌরের সঙ্গে একত্র থাকিয়া কার্ত্তিক মাসে দেশে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। যাবৎ গৌরচন্দ্র পৃথিবীতে ছিলেন, তাবৎ তাহাদের ইহা ব্রতের ন্যায় হইয়া গেল। ইহার পর তাঁহাদের স্ত্রী বালকগণও আসিতে লাগিলেন। ইহা ভিন্ন গদাধর, হরিদাস, মুকুন্দ প্রভৃতি একেবারেই নিলাদ্রি আশ্রয় করিয়া থাকিলেন। ইচ্ছা করে, এই লীলার হাটে মিশিয়া জনমের ন্যায় আত্ম বিক্রয় করিয়া থাকি।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

পাখী কি গায়—কি চায়?

১

আসে আর গায় পাখী
কি গায় কি চায়,—
গাহিয়া চাহিয়া চলে যায়।
অস্ফুট ভাষায় কিবা
কহে দিশে দিশে,—
কহিয়া আঁধারে যায় মিশে।

২

রবির উদয়ে আর
রবির গমনে,
একই সুরে গায় গান
আকুল নয়নে,
ছুটে যায় সুদূর গগনে।

৩

রবির সোণার ভূষা
হেরি নিতি নিতি
যেন আর জেগে ওঠে
সে দিনের স্মৃতি,—
ভেসে যেন আসে কত গীতি।

৪

যেন তার মনে হয়
কি-যেন-কি নাই,
যেন তার বোধ হয়
কি-যেন-কি চাই,—
পাইয়ে যেন বা নাহি পাই।

৫

যেন তাহা মনে হয়
এক দিন ছিল,
যেন তাহা ওই ঠাঁই
ফেলে এসেছিল,—
ফেলে দিয়ে কোথায় পশিল।

৬

ঊষার তপন আর
সাঁঝের তপন
যেন তার সে দিনের
এক এক জন,—
যেন সে স্মৃতির নিকেতন।

৭

যেন সে ওখানে কোথা
করিতেছে বাস,
যেন সে গাহিত গান
হোথা বারমাস—
অতীতের বিজন আবাস।

৮

যেন তাহাদের মাঝে
পরাণের আশা,
যেন তার সে দিনের
কত ভালবাসা,
কতই মদিরাময় ভাষা।

৯

যেন কত হাসি, অশ্রু,
কত সুখ দুখ,
ওইখানে হারায়েছে
যেন কার মুখ—
অভাবে আকুল যার বুক।

১০

যেন রবি প্রতিদিন
সেই ছায়া কোলে
নিতি নিতি আসে পাশে
তাই দিবে ব'লে,—
নিতি নিতি যায় পুনঃ ছ'লে।

১১

তাই পাখী প্রতিদিন
দুখ গান গায়,—
গাহিতে গাহিতে উঠে ধায়,
রবির চরণে শুধু
সে দিনটি চায়,—
চাহিতে চাহিতে ডুবে যায়,
অনন্তের আঁধার কোলেতে
কেঁদে কেঁদে আপনা লুকায়।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র ঘোষ।

যেতে চাই।

"O! to make a pilgrimage
Into Apollo's snug domain,
With a friendly jovial heart
Form a part in th' fervent train."

সকলে চলেছে দেখে আমিও যে যেতে চাই।
আমার এ ক্ষুদ্র 'আমি' অই পথ পানে চাহি'।
সাজিয়া সুন্দর বেশে অই সবে হেসে হেসে
ত্রিদিবের কোন দেশে চলিয়াছে গান গাহি'।
আমার এ ক্ষুদ্র 'আমি' ভরসা বেঁধেছে বুকে,
যাত্রিদের পাছু পাছু যাইবে তীর্থের দিকে,—
কিন্তু সে সামান্য প্রাণী বড়ই লাজুক মেয়ে,
চাহিতে অন্যের মুখে লাজে মুখ পড়ে ছেয়ে।
পাছে লোকে কিছু বলে ভয়ে ভয়ে সরে না পা,
—লোকে যদি রাগ করে, আঁধারে সে থাক্ চলা
এক পা ফেলিতে গিয়ে দুই পা পিছা'য়ে আসে।
লাজে ভয়ে জড় সড দাঁড়া'য়ে দোরের পাশে,
বাহিরে আসিতে যেন করে বুক দুরু দুরু,
একটু একটু যেন কাঁপে পদ কাঁপে উরু—
অঞ্চলে মু'খানি চাপি' চাহিয়া পথের পানে—
অই সবে চলে যায় অই প'থে প্রাণ টানে।
আমার এ ক্ষুদ্র 'আমি' যেতে চায় গান গাহি'
পেছনে থাকিয়া দূরে আমিও যে যেতে চাই!
বাসন্তী নীলিমা মাঝে বিমল চন্দ্রমা ভাসে,
মলয়ের সনে মিশি' ধরায় চন্দ্রিকা আসে,
কলিকার পাশে গিয়ে বাসন্তীর কা'ণে মাখি'
ঘুমন্ত কোকিল স্বরে স্বরগে তুলিছে ডাকি;—
প্রকৃতি মাধুরিময়ী, অসীম সুষমা যেন
সসীম শরীর ধরি' কবিতার বেশে শোভে!
প্রকৃতির মাধুরিতে বিভল হৃদয় গুলি
পূর্ণ প্রেম অন্বেষণে চলিছে আপনা ভুলি'!
দূরে—অই বহুদূরে কবিতা নন্দন বন
বিকচ কুসুমচয়ে আমোদিত অনুখন,
একটু সুরভি কণা এ ধরায় ছুটে আসি'
ডাকিছে সে বন পানে বিভোরি' মরত বাসী
যত তথা ধায় তারা তত মুগ্ধ, আমোদিত,
তত লুব্ধ, তত আশা ভীতি-ভক্তি-যুত চিত।
আমরা মরতে নর অমর নগর মাঝে,
পাইনা দেখিতে দিব্য কবিকুঞ্জবন রাজে,
অবনীতে শুধু তার মাধুরির সিত ছায়া
আবরি' মানব হৃদ' ধরিয়া প্রেমের কায়া।
হৃদি গুলি বুক বাঁধি ধাইতেছে সে নন্দনে,
কেহ পায়, কেহ ফিরে অর্দ্ধপথে ক্ষুণ্ণমনে,
বিরাম বিশ্রাম নাই—পূর্ণতার দিকে ধায়—
আপনার মাঝে তারা আপনা হারা'য়ে যায়।
স্বরগের সম্ভাষণ আমিও শুনিতে পাই,
সকলে চলেছে দেখে আমিও যে যেতে চাই।

শ্রীপ্রিয়নাথ।

আঁধারের কীট।

আঁধারের কীট। আঁধারে ডুবিয়া
কতকাল র'বি বল্।
যাবি কি আলোকে আঁধার ছাড়িয়া?
যাবি যদি আর চল্।
আঁধারের ছায়া পড়িয়াছে মুখে,—
আঁধারে হৃদয় মাখা;
উপরে আঁধার, ভিতরে আঁধার—
আঁধারে আছিস্ ঢাকা।

যাবি যদি আয়, আঁধারের কীট!
ছাড়িয়া আঁধার কারা।
দেখিবি আলোক কেমন মধুর—
প্রেমের জোছনা ধারা।
দেখবি আলোকে কতই সুন্দর—
কতই মধুর ছবি।
তৃষিত নয়নে দেখিতে দেখিতে
আনন্দে বিভোর হ'বি।
শুনিবি মধুর সুস্বর লহরী—
অমিয়া মাথান গীত।
শুনিতে শুনিতে সুমধুর গান—
পুলকে পূরিবে চিত।
হ'বি আত্মহারা ভক্তের সহিত
গাহিবি তুইও গান।
বিভুগুণগানে মোহিত হইবি।
মাতিবে তোরও প্রাণ।
ঝর ঝর ঝর ঝরিবে নয়ন—
বহিবে প্রেমের ধারা।
বিভুগুণ গান করিবি কেবল।
পাগল প্রেমিক পারা।
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলি গাবি একমনে
আনন্দে বিভুর গান।
সুখ, শান্তি হৃদে বিরাজিবে সদা
মোহিত হইবে প্রাণ।
আলোকে না গিয়া আঁধারে আছিস্—
আঁধার হৃদয় ল'য়ে।
আঁধারের কীট! যাবি যদি আয়—
কি হ'বে আঁধারে রয়ে?
আয় আয় আয়, আঁধারের কীট।
ত্যজিয়া আঁধার কারা।
দেখিবি আলোক কেমন মধুর—
বিমল প্রেমের ধারা!!

শ্রীশ্রীশগোবিন্দ সেন।

কপাল ভাঙ্গা।

কপাল ভেঙেছে যার সংসারে কি আছে তার?
কবন্ধের দাদা সেই সুখের কবম সার।
রবি তার তরে নয় কিরণ যে অন্ধতর,
চন্দ্র তার তরে নয় জোছনাও নিরুত্তর,
তারা অন্ধকারময় প্রকৃতি নীরবতর,
সাধের সংসার খানি মরুভূমি ভয়ঙ্কর।
সুকোমল অনুভূতি হিমাদ্রি পাষাণবৎ,
সুমেরুর সামুদ্রিক নিয়ত তুষারবৎ,
পাশব শার্দ্দূল বৃত্তি সাহারার মরুপ্রায়,
রাবণের চিতাসম হেক্লাগ্নুৎপাতময়,
আকাশের ধূমকেতু প্রচণ্ড অনলময়,
পণ্ডিতের গণীকৃত, কবির উচ্ছ্বাসময়,
স্বর্গের যন্ত্রণা নাশে শত পাশুপত জ্বলে,
সহস্র খাণ্ডব দাহ হৃদয়ের অন্তস্তলে।
ভয়ে ভয়ে কাঁপে মন ত্রিজগত অন্ধকার,
হাসিহীন রবহীন ত্রিজগতে হাহাকার;
দারুণ অগ্নির তাপে পুড়েছে-মুকুলকুল,
ঝড়ে গেছে.পাতা গুলি ঝড়িয়া পড়েছে ফুল।
সলিল শুকায়ে গেছে, চারিদিক অগ্নিময়,
আগুনের রাজ্যসৃষ্টি আগুন আকাশময়।
ছোট ছোট প্রাণীশত ছুটিয়া পড়েছে তায়,
আশার বিশাল গাথা চূর্ণ ভূর্ণ রেণুময়,
আশাহীন, শান্তিহীন, আগুনের হুহুরব,
জগৎ পরাণী শত ঘনীকৃত রাশি শব।
স্থিরতর মেরুদণ্ড কাঁপিয়া উঠিছে যেন,
সুমেরু কুমেরু গত কুমেরু সুমেরু হেন।
দ্রাঘিমা ও অক্ষরেখা চিরতরে গেছে চলে,
প্রলয়ের মহানাদে বিশাল সমুদ্রোথলে।
সকলি প্রলয় তার, প্রলয়ে আবাস তার?
প্রলয়ের মাঝে শুধু উচ্চতর হাহাকার!!
প্রলয়ে ডুবিবে যদি তবে কোন ভয় আর?
সংসারের মহাজ্বালা বহিতে হবে না আর,

খ্যাতি, মান, গানসহ পরাণ আকাশে মিলে,
ভূতদেহ ভূতে মিলে আলোকে আঁধারে মিলে'
ভেঙেছে কপাল, তবে ভেঙে যাক্ এই কায়া,
প্রলয় আঁধারে আত্মা হোক আঁধারের ছায়া॥

শ্রীজি, সেন।

জীবন-গতি।

অনন্ত আকাশ তলে,
শত উর্ম্মি দলে দলে,
উঠিতেছে, পড়িতেছে, হইতেছে লয়।
এ সংসার পারাবারে,
কে তার গণনা করে,
কে ভাবে জীবনগতি চির স্থির নয়।
কোথা হ'তে এ জীবন,
অনন্তের প্রস্রবণ,
কোথা হ'তে বাহিরিল, কেমন সে ঠাঁই।
কোথা হতে আসিয়াছি,
কোথা ভেসে চলিয়াছি,
জীবনের আদি অন্ত ভাবিয়া না পাই।
কি এক অজ্ঞাত বাস,
বিষম এ মোহ পাশ,
এ জীবন প্রহেলিকা বুঝিতে না পারি।
কি এক মায়ার ডোরে,
বাঁধা জীব চরাচরে,
কে বুঝিবে সে অগম্য মহিমা তাহারি।
কে জানে কেমনে পাব,
হইব এ পারাবার,
কে জানে কোথায় প্রাণ মিশাইবে শেষে!
জানি না তবুও কেন,
প্রাণপণ করি হেন,
অনন্ত সিন্ধুর পানে চলিয়াছি ভেসে।
এ মরত ভূমে আসি,
সময়ের স্রোতে ভাসি,
ছুটেছি অনন্ত পানে গতি অবিরাম।
কিন্তু কেন আসিলাম,
কেন ভেসে চলিলাম,
কোথা গিয়ে এ জীবন লভিবে বিরাম॥
জানিনা এসব কিছু
শুধু মরণের পিছু
আগ্রহে চলেছি ছুটে—অনন্ত পিয়াস।
প্রকৃতির অন্তরালে,
অনন্ত সমাধি তলে,
কি অপূর্ব্ব মহাশক্তি রয়েছে প্রকাশ॥

শ্রীশ্যামাচরণ দে।

সরস্বতী পূজা।

ভারতী আসিছে দেশে, নবীন বাসন্তি বেশে
উদ্গত নব কিশলয়,
কুঞ্জে কুঞ্জে ফোটে ফুল গুঞ্জরিছে অলিকুল
মৃদুমন্দ বহিছে মলয়।
কোকিলার উচ্চতান উল্লাস উন্মত্ত প্রাণ
হৃদে জাগে নব সমাচার
ভারতীর বীণা যন্ত্রে মাধুরী বিলাস তন্ত্রে
উথলিছে ভূমানন্দ, আবেশ ঝঙ্কার।
যেদিকে নয়ন যায় শৈশব সঙ্গীত প্রায়
জাগে ভূত আনন্দ কাহিনী।
নিয়তি বন্ধন টুটি প্রাণ যেতে চায় ছুটি
দেখিতে সে স্বপন রজনী।
বাতুল কল্পনা নয় সত্য সত্য সুনিশ্চয়
প্রকৃতির স্ফূরতি মাঝারে,
আদি ভূত স্মৃতি রেখা অনন্ত রয়েছে লিখা
ন'লে কেন জাগিবে অন্তরে?
নীরব প্রকৃতি মাঝে,এখনো সে বীণা বাজে,
ভারতির স্ফূরতি নিক্কন,
অভিব্যক্তি অনুভূতি আনন্দ মাধুরী স্মৃতি
আদি কাব্য উচ্ছ্বাস কীর্ত্তন।

কারণ কলিকা টুটি যেদিন হৃদয় ছুটী
সমুদিত প্রথম সংসারে,
দোঁহে দোঁহা মুখ চেয়ে, আবেশে উন্মত্ত হয়ে,
আত্মহারা প্রলয় পাথারে।
সেই আত্ম বিনিময় নব প্রেম পরিচয়
প্রকৃতির আদি ভূত, সে প্রেম সঙ্গীত
প্রকৃতির আদি প্রাণে, মিশে আছে সেই তানে,
কত যুগ হয়েছে অতীত।
সৃষ্টি স্থিতি পরিলয়, প্রকৃতির অভিনয়
নিতি নব উৎসব বিলাস,
সেই অনুভূতিময় অনাদি সঙ্গীতলয়
কাল চক্রে নিয়ত বিকাশ।
প্রলয় বিরত দেহে, আজি ঐ ঐ বহে
সঞ্জীবনী মলয় পবন,
নবীন জীবন দেশে, ডাকে পিক শাখে শাখে
উলসিত নিকুঞ্জ কানন।
কুসুমে কুসুমে হাসি, সৌরভ সৌন্দর্য্য রাশি
গুঞ্জে মত্ত মধুপ আকুল,
সপ্ত সুরে বাঁধি লয়, বাসন্তি সঙ্গীত হয়
শুষ্ক শাখে মুঞ্জরে মুকুল।
দেবতা ত্রিদিব ছেড়ে, পঞ্চমী কৌমুদী ঘেরে
শুনিছে সে অনাদি সঙ্গীত,
প্রেমের জনম কথা, অনন্ত মাধুরী গাথা
আবেশে হৃদয় পুলকিত।
নবীন পীরিতি রাগে প্রকৃতি উঠেছে জেগে
পিক কণ্ঠে প্রেম আবাহন,
কুহু কুহু কুহু ডাকে প্রেমের প্রতিমা জাগে
প্রেমাবেশে পূর্ণিত ভুবন।
দাও আত্ম বলিদান, মিশাও পরাণে প্রাণ
বিশ্ব প্রেমে ছুটিছে জোয়ার;
জাতি ধর্ম্ম ভুলে যাই, এস সবে ভাই ভাই,
খুলে গেছে স্বর্গের দুয়ার।
হিংসা দ্বেষ অভিমানে, ঈর্ষা বিক্ষোভিত প্রাণে,
কেন যত্নে পোষিছ নরক,
পীরিতি স্বর্গের দ্বার, সুখ-শান্তি সবাকার,
প্রেমময় বিশ্ববিনায়ক।

শ্রীরেবতীমোহন রায় মৌলিক।

শিশুর বল।

মরি কি সুন্দর শিশু। প্রফুল্ল আনন,
সরলতা পরিপূর্ণ, জুড়ায় নয়ন।
না জানি কি শক্তি আছে নিকটে উহার,
দুঃখ বিনোদন যাহে হয় সবাকার।
ক্ষুধায় কাতর হলে যবে শিশু কাঁদে,
তখনো কি বল দিয়ে মনপ্রাণ বাঁধে।
কিছুতেই ভীত নয় সদাই নির্ভয়,
জানেনা বোঝেনা কিছু সে যে অসহায়।
অস্ফুট বাক্যেতে তার শক্তি বিরাজিত,
শুনিলে কাহার প্রাণ না হয় মোহিত?
হাসি হাসি মুখখানি বড়ই নির্ম্মল,
দেখি বিমোহিত চিত্ত স্রষ্টার কৌশল।
পবিত্র স্বর্গীয় জ্যোতি আছে প্রাণে তার,
তাহাতেই পরাজিত অখিল সংসার।

উৎকল-ভ্রমণ।

(উৎকলের বৈষ্ণবধর্ম্ম ও চিল্‌কাহ্রদ)

পুরী হইতে কটক ৫৩, চিলকাহ্রদ ২৮ এবং অর্কক্ষেত্র বা কণারক ১৯ মাইল ব্যবধান। পুরী হইতে কটক পর্য্যন্ত অপূর্ব্ব বাঁধা রাস্তা বিদ্যমান আছে, কিন্তু চিল্‌কা বা কণারক যাইতে হইলে সৈকতময় সমুদ্র তীর ধরিয়া যাইতে হয়,—বাঁধা রাস্তা

নাই, কোনরূপ চটী বা আশ্রয় নাই—মধ্যে মধ্যে গ্রাম আছে, কিন্তু অনেক সময় পরিষ্কার পানীয় জল পর্য্যন্ত পাওয়া দুষ্কর। আমরা চৈত্র মাসের প্রারম্ভেই চিল্‌কা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। রাত্রের আহারান্তে আমরা দুই বন্ধু গো-যানে আরোহণ করিলাম। অল্পসময়ের মধ্যেই পুরী অতিক্রম করিলাম। বিশাল বিস্তৃত পাতালস্পর্শী বালুরাশির ভিতর দিযা অতি ধীরে ধীরে, শব্দ করিতে করিতে গাড়ী চলিল। এমন ভীষণ পথ আর কখনও দেখি নাই। গাড়ীর চাকা বালিতে পুঁতিয়া যাইতে লাগিল, গরু আর চলিতে চাহে না। অতি কষ্টে, গাড়োয়ানের তীব্র কষাঘাতে সমস্ত রাত্রি মৃদু মৃদু ভাবে গরু দুটী চলিল বটে, কিন্তু তাহাতে অতি অল্প রাস্তা অতিক্রান্ত হইল। এই পথে ভ্রমণ করিয়া পুরীজেলার কয়েকটী সুন্দর পল্লী দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। গ্রামের মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে, দুই ধারে সমশ্রেণীতে পরস্পরসংলগ্ন বহু মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহ অপূর্ব্ব ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রতি পল্লীর শেষে হরিসঙ্কীর্ত্তনের জন্য সাধারণের ব্যয়ে নির্ম্মিত ধর্ম্মমন্দির—তাহার ধারেই তুলসী-মণ্ডপ, এতদ্ভিন্ন প্রতি বাড়ীর সম্মুখেই একটী একটী তুলসী মণ্ডপ বিদ্যমান। আমরা বাঙ্গালার যত পল্লী পরিদর্শন করিয়াছি, সর্ব্বত্রই শাক্ত ধর্ম্মের প্রাধান্য দেখিয়াছি। এমন যে নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান, সেখানেও শাক্তধর্ম্মের প্রাধান্য বিদ্যমান। এ সকল স্থান দেখিয়া ধারণা হইয়াছে, বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গালীকে আজও পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই। এমন কি, অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর নর নারীদিগকে বাদ দিলে, অতি অল্প সংখ্যক বৈষ্ণব পরিবার দেখা যায়। বৈষ্ণবধর্ম্ম, মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমমূলক ধর্ম্ম যেন জ্ঞানীর জন্য নয়—কেবল অশিক্ষিতদিগের জন্য? উৎকল পরিভ্রমণ করিলেও এ কথার সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যে ধর্ম্ম বাঙ্গালীকে জয় করিতে সমর্থ হয় নাই, সে ধর্ম্ম উড়িষ্যাকে অতি সুকৌশলে পরাজয় করিয়াছে। ইহাতে উড়িষ্যার শিক্ষা-হীনতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উৎকলবাসী নরনারী যে বাঙ্গালী অপেক্ষা চরিত্রবান, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। সাধারণ একজন অশিক্ষিত বাঙ্গালী অপেক্ষা সাধারণ একজন অশিক্ষিত উৎকলবাসী যে অধিক ধর্ম্মপিপাসু, সেবিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। ভাল বল, আর মন্দ বল, উড়িষ্যার নিম্ন শ্রেণীর নরনারী এখনও ধর্ম্মকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। আর বাঙ্গালার নিম্ন শ্রেণী অশিক্ষার ঘোর তমসায় সমাচ্ছন্ন থাকিয়াও উচ্চশ্রেণীর অনুকরণে শনৈঃ শনৈঃ ধর্ম্মহীনতার রাজ্যে অগ্রসর হইতেছে। বাঙ্গলার মিথ্যা মকদ্দমার বৃদ্ধিতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গলার উচ্চ শ্রেণীর চরিত্র-প্রহেলিকা সাধারণ নরনারীর চরিত্রকে অতি কঠিন সমস্যায় নিমগ্ন করিতেছে। একথা কলিকাতার নিম্নশ্রেণী সম্বন্ধেও খাটে। শুনিয়াছি, কলিকাতাতে যে সকল উৎকলবাসী থাকে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অতি ঘৃণিত কাজে লিপ্ত। কলিকাতা-নিবাসী নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী যে কতদূর অধঃপতিত, যাঁহারা স্থির চিত্তে দেখিয়াছেন, তাঁহারা আর উড়েদিগকে ঘৃণা করিতে পারেন না। সামাজিক বিষয়েও, পাণ্ডাদিগকে বাদ দিলে, উৎকলবাসীরা অনেক বিষয়ে উন্নত। অনেক লোকের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রচলিত নাই, অনেকের মধ্যে

বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবা বিবাহ প্রচলিত না থাকায় বাঙ্গালার সমাজ সমূহ, বিশেষতঃ নিম্নশ্রেণীর সমাজ সমূহ যে কতদূর অধঃপতিত হইয়াছে, স্থির চিত্তে অনুসন্ধান করিলে গভীরদুঃখে প্রাণ সমাচ্ছন্ন হয়। ভ্রূণ-হত্যা বল, অসম-বিবাহ বল, ব্যভিচার বল, এ সকল কলঙ্ক বাঙ্গলার ধর্ম্ম ও নীতিকে কর্ম্মনাশার জলে ডুবাইয়া দিতেছে। বাঙ্গলার উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে তবুও অন্তঃপুর প্রথা বিদ্যমান, সুতরাং বিধবাগণ কতক সুরক্ষিতা, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কতক স্ত্রী-স্বাধীনতা বা অন্তঃপুর-প্রথা-হীনতা বর্ত্তমান, তারপর বাল্য বিবাহ প্রচলিত, তারপর বিধবা বিবাহ নাই, সুতরাং সেখানে বাল-বিধবাদিগের ধর্ম্ম বা চরিত্র রক্ষার আর উপায় কোথায়? ২৪ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্ক নিম্নশ্রেণীর পুরুষ সাধারণতঃ বাঙ্গলার ৮।১০ বৎসরের বালিকাকে বিবাহ করে। যৌবনের মত্ততায় নিম্নশ্রেণীর অনেক লোক চরিত্রহীন। যাহারা হরিমাইতির ন্যায় নয়, তাহারা প্রায়ই গুপ্ত প্রণয়ে অন্যত্র আবদ্ধ। সহর বা উপ-সহর, হাট বা বাজার ভিন্ন বেশ্যা অতি অল্প স্থানে থাকে, সুতরাং অশিক্ষিত ধর্ম্মহীন যুবকের যৌবন্-মত্ততার জন্য এদেশের হত-ভাগিনী বালবিধবা বিদ্যমানা। যাহাদের মুখের দিকে চাহিতে এ সংসারে কেহ নাই, এমন হতভাগিনী বালবিধবা পিতৃকুলে অব-হেলিতা, শ্বশুরকুলে পরিত্যক্তা। হায়! তাহাদের আশ্রয় কোথায়? বলিতে লজ্জা হয়, তাহাদিগকে ভাল কথা শুনাইতে বা মধুর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতে এ সংসারে যৌবনমত্ত নররূপী পশু গণ যেন কেবল বিদ্যমান। হায়! হায়! পুরু-ষের অত্যাচারে যাহারা বাল বিধবা, পুরুষের প্রলোভনেই তাহারা স্বৈরিণী, কল-ঙ্কিনী, কুলটা। বালিকাবিবাহ পুরুষ প্রচলন করিয়াছে, সুতরাং বাল-বিধবার স্রষ্টা তাহারা। বিপত্নীক পতি দশবার বিবাহ করিবে, সমাজে নিন্দা নাই, দশবার বিধবার সতীত্ব নষ্ট করিবে, সমাজে কলঙ্ক নাই—আর বাল-বিধবা—এজীবনে কেবল ব্রহ্মচর্য্য করিবে॥ হা ধর্ম্ম। তুমি কোথায়? এই ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ভঙ্গ করিবার জন্য প্রমত্ত-রিপু যুবকগণ যে দেশে অহঃরহ শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করিতেছে, পরিত্যক্তা, অবহেলিতা বিধবা সে দেশে কেমনে অবি-চলিতভাবে থাকিবে? সে যখন পাপে ডুবে, তখন তাকেই বা বাধে কে? পুরুষের সাত খুন মাপ, আর রমণীর কথা, রমণীর অবস্থা কে না জানেন? মহামতি বিদ্যাসাগর মহাশয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, কলিকাতার প্রায় বারো আনা বেশ্যা—বাল-বিধবা। রমণী পতিতা হইলে আর সমাজে থাকিবার স্থান পায় না। এমন হৃদয়-বিদারক পক্ষপাতী ব্যবস্থা যে দেশে, সে দেশের পরিণাম কে গণনা করিতে পারে? উড়িষ্যাবাসী নরনারী অশিক্ষিত বলিয়া বাঙ্গালীর নিকট ঘৃণিত, উপেক্ষিত, কিন্তু সামাজিক বিষয়ে, ধর্ম্মে, চরিত্রে, কাজে কর্ম্মে উৎকলবাসী বাঙ্গালীর আদর্শ। একটী উদাহরণ দেখ—সম্মতির আইনের ঘোরতর আন্দোলনে, রমণী অব-হেলার চূড়ান্ত নিদর্শন বাঙ্গলায় দেখিয়াছি, কিন্তু ধন্য উৎকল-ভূমি! উৎকল-ভূমি আই-নের পোষকতা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উৎকল রমণীর অবনতিতে ব্যথিত। আর একটী উদাহরণ দিব। বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণীর অধিকাংশ বৈষ্ণব চরিত্রহীন, "কামিনীর কোল, মুখে হরিবোল" মতের জীবন্ত শিখা,

কিন্তু যতদূর জানিয়াছি, এমন নেডানেড়ীর কাণ্ড উৎকলে নাই। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে, এমন কি, বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থানে বাঙ্গালী বৈষ্ণব ভিক্ষুকশ্রেণী দেখা যায়, কিন্তু উৎকলের বৈষ্ণবভিক্ষুক কলিকাতায় বা বাঙ্গালার অন্য কোথাও অতি বিরল। আমরা যতদূর অবগত হইযাছি, উৎকলে এরূপ সংসারত্যাগী কপট বৈরাগী এক শ্রেণীকে ভিক্ষাকেও সম্বল করিয়া জীবন কাটাইতে দেখা যায় না। উড়িষ্যার বৈষ্ণব গৃহী, সদাচারী, নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান। আর বাঙ্গলার বৈষ্ণব বৈরাগী, স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল, চরিত্রহীন। বাঙ্গলার সহিত উৎকলের তুলনা করিলে, একদিকে ধর্ম্মের জন্য ত্যাগস্বীকার, ধর্ম্মের জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় প্রভৃতি কার্য্যে যেরূপ উৎকল দেশীয় রাজাদিগের মহত্ত্ব দেখা যায়, বাঙ্গলায় সেরূপ বিরল, অন্যদিকে ধর্ম্মকে বজায় রাখিতে, পুণ্যকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে উৎকল যেমন লালায়িত, বাঙ্গলা কদাচ সেরূপ নহে। বাঙ্গলার অনেকেই ভেকধারী, গেরুয়া বা নামাবলী পরিধায়ী কপট সন্যাসী, ধর্ম্মকে পরিচ্ছদের ন্যায় ব্যবহার করেন, আর উৎকলের অনেকেই ধর্ম্মকে জীবনগত করিয়া স্বর্গীয় ভাবে মাতোয়ারা। চৈতন্য মহাপ্রভু শেষ জীবন উৎকলে যাপন করেন, একথা সকলেই অবগত আছেন। ইহার গূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বাঙ্গলার প্রতি বিরক্ত হইয়াই তিনি বাঙ্গলাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি, ধর্ম্মসুহৃদ্ নিত্যানন্দকে পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি বুঝিযাছিলেন, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম-জীবনের প্রতি কোনই আশা নাই। বাঙ্গালা, উৎকল, দাক্ষিণাত্য, ভারতের বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া তিনি উৎকলকেই ধর্ম্মের অনুকূল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। কবীর, নানক, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, বোধ হয়, ইঁহারা সকলেই উৎকলের প্রতি এই কারণে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। অন্যের কথা সাহস পূর্ব্বক বলিতে না পারিলেও, মহাপ্রভু সম্বন্ধে এ কথা নিঃশংসয়ে বলিতে পারি। তিনি উৎকলের নরনারীর হৃদয়ে ধর্ম্মের এক অপরূপ বিমল জ্যোতি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইযাছিলেন। আমরা উৎকল সম্বন্ধে যে অভিমত আজ সাহস পূর্ব্বক ব্যক্ত করিতেছি, মহাপ্রভুর শেষ জীবন এ কথার প্রমাণ দিতে বিদ্যমান। বৈষ্ণবধর্ম্ম উৎকলকে পরাজিত করিয়া আজও কতক পরিমাণে চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের স্বর্গীয় মধুর ভাব সংরক্ষণে সমর্থ হইতেছে। উৎকলের মন্দির সমূহ দেখিয়া আমরা যেরূপ মোহিত হইযাছি, উৎকলের ধর্ম্মজীবন দেখিয়া তেমনি বিমুগ্ধ হইয়াছি। এমন বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-মাতো য়ারা প্রেমিক জাব পৃথিবীতে বিরল। তবে পুরীর পাণ্ডাদের কথা স্বতন্ত্র। পুরোহিত শ্রেণী সর্ব্বত্রই কলুষিত চরিত্র। কাশী, বৃন্দাবন, বৈদ্যনাথ, কালীঘাট, কামাখ্যা, তারকেশ্বর, সর্ব্বত্রই পাণ্ডারা দুরাচারী। উৎকলের পল্লীর দৃশ্য অতি মনোরম। বহু পল্লীতে ধর্ম্মের ছায়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক কথায় বলিতে কি, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাঙ্গালা মৃত, উৎকল আজও জীবিত। ধন্য উৎকল। ধন্য পুণ্যভূমি।

চিল্কার পথের পল্লীর বিষয় উল্লেখ করিতে যাইয়া আমরা অনেক অবান্তবিক কথার সমাবেশ করিলাম। অনেক পল্লীই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অনেক পল্লীতে সুন্দর নারিকেল বৃক্ষ পরিশোভমান। আমাদের

আশা ছিল, সাতপাড়ার লবণ-আফিসে বেলা দুই প্রহরের সময় পৌছিতে পারিব, কিন্তু ক্রমে যখন দুই প্রহর অতীত হইল, তখন শুনিলাম, মানিকপাটনা ডাকবর বা সাতপাড়ার লবণ-আফিস এখনও বহুদূর। দুই প্রহরের পর আমরা গ্রাম সমূহ অতিক্রম করিয়া বালুকাময় প্রান্তরে পড়িলাম। সে দুর্গম পথে জল মেলে না, আহারের দ্রব্য কদাপি পাওয়া যায়। জলাভাবে স্নান হইল না, অনেক অনুসন্ধানের পর রাস্তা হইতে বহুদূর গমন করিয়া একটু কর্দমময় সামান্য জলাশয় পাওয়া যাইল। আমাদের সঙ্গে যে কিঞ্চিৎ খাদ্য ছিল, তদ্বারা এবং সেই কর্দ্দমময় জল দ্বারা আমরা সেদিনের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। উত্তপ্ত বালুরাশির ভিতর দিয়া যাইতে যে কি কষ্ট পাইতে হইল, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা অসাধ্য। কিন্তু এত অসহ্য কষ্টের ভিতরেও সুখ ছিল, কেননা এরূপ বিভীষিকাময় মরুভূমি সদৃশ প্রান্তর আমরা এ জীবনে অতি অল্পই দেখিয়াছি। কোথাও পর্ব্বতাকার বালুকার স্তূপ, কোথাও বালুকাস্তূপের বায়ু-তাড়নে তরঙ্গায়িত শোভা, কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জঙ্গল। ক্রমে বেলা অবসান হইতে লাগিল, আর ক্রমেই আমরা জনপ্রাণীহীন রাজ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। সে বিজন পাখী উড়ে না, গাভী চরে না, মনুষ্য কদাপি দেখা যায়। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্যই অতিক্রম করিতে হইল। সন্ধ্যার সময় জনপ্রাণী ও গ্রামের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গেল। দূর হইতে দুই-চারিটী বৃক্ষ দেখা গেল। সে দৃশ্যও অতি সুন্দর। কিন্তু কোথায় চলিয়াছি, কোথায় সে রাত্রি কাটাইব, এই দারুণ চিন্তায় প্রাণ আকুল হইল। এদিকে গাড়োয়ান বলিল, সাতপাড়ার রাস্তা সে ভাল জানে না, মানিকপাটনার পথ জানে। আমরা সাতপাড়া যাইব। সেখানে লবণের ইন্‌স্পেক্টর বাবু বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় বাস করেন। তাঁহার নিকট আমাদের বন্ধু বিজয় বাবু একখানি পত্র দিয়াছিলেন। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল, কিন্তু সাতপাড়া এখনও দূর। রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, অল্পে অল্পে সমুদ্রের নির্ঘোষ সে বিজনতা ভেদ করিতে লাগিল, আমরা বুঝিলাম, আমরা সাতপাড়ার নিকটে আসিয়াছি। অনেক অনুসন্ধানের পর সাতপাড়ার বেণী বাবুর আফিসের পরিচয় পাওয়া গেল। একে একে সেই বিজনস্থানে অনেকখানি গৃহ চক্ষুগোচর হইল, সে যেন মরুভূমির ওয়েসিস্, অকূলের কূল, গভীর অরণ্যের আশ্রয়। গৃহ দেখিয়া আনন্দ হইল বটে, কিন্তু ভাবিলাম, বেণী বাবু যদি না থাকেন? আরো ভাবিলাম, বেনী বাবু যদি স্থান না দেন। এখানে আশ্রয় না পাইলে আর কোথায় যাইব? ভাবিয়া কূল পাইলাম না। এরূপ বিজন স্থানে কেহ কখনও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়া থাকেন, আমাদের প্রাণের সে সময়ের আবেগ বতক বুঝিতে পারিবেন। ভাবিতে ভাবিতে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, অনুসন্ধানে জানিলাম, বেনী বাবু তখন নিদ্রা যাইতেছেন। মনের উদ্বেগ আরো বাড়িল। কিন্তু বিধাতার কি ইচ্ছা? কেমনে জানিব। হঠাৎ সেইস্থানে একজন ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়া আমাদের পরিচয় লইলেন। পরিচয়ের পর জানিলাম, তিনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত একজন বন্ধু। বিধাতা এই বিজন অরণ্যে আমাদের সেবার

জন্য সেই পরিচিত বন্ধুকে রাখিয়াছেন, পূর্ব্বে স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। সেই বন্ধুর যত্ন ও আকিঞ্চন দেখিয়া অবাক্ হইলাম। গাড়ীর দ্রব্যাদিসহ আমরা সাদরে বেণীবাবুর বাঙ্গলায় আশ্রয় পাইলাম। বাঙ্গলাটী চিল্‌কার উপকূলে একটী উচ্চপাহাড়ের ন্যায় স্থানে নির্ম্মিত। তাহার পূর্ব্বদক্ষিণদিকে সমুদ্র, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরের কতকাংশেই চিল্‌কা হ্রদ, ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইবে, স্থানটী কতদূর মনোরম্য। বাঙ্গলার ঠিক দক্ষিণদিক দিয়া একটী ছোট খাল সমুদ্র ও চিল্কাকে মিলিত করিয়া রাখিয়াছে। চিল্কা এবং সমুদ্রের মধ্যে একখণ্ড অপ্রশস্ত বালুকাময় ভূমিখণ্ড চিল্কাকে সাগর হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সেই অতুল শোভাময় স্থানে এমন আশ্রয় পাইব, জীবনে কখনও ভাবি নাই। বিধাতার কৃপা স্মরণ করিয়া চক্ষে জল পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পর বেণীবাবু আগত হইলেন। বেণী বাবু যেন সে রাজ্যের রাজা। চিল্কাতে যত লবণের কারখানা আছে, ইনি তাহার কর্ত্তা। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার, মধুর সম্ভাষণ, অতুল যত্ন, নিরহঙ্কার মূর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইলাম। তিনি সেখানে যেন পিতৃহীনের পিতা, ভ্রাতৃহীনের ভ্রাতা, বন্ধুহীনের বন্ধু। পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুর ন্যায় সযত্নে আমাদিগকে তিনি গ্রহণ করিলেন। আলাপে বুঝিলাম, তিনি সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত নহেন, অনেক শিক্ষিত চাকুরে লোকের ন্যায় তিনি পৃথিবীর সংবাদ-জগৎ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন নাই। দেখিলাম, তিনি সংবাদ রাখেন না, এমন ঘটনা নাই। "প্রচার" নামক বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকা এবং অন্যান্য অনেক সংবাদ পত্র তাঁহার টেবিলে দেখিলাম। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, বাঙ্গলা ভাষার প্রতি তিনি উদাসীন না হইয়া একান্ত অনুরাগী। রাত্রে তাঁহার সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথোপকথন হইল, দেশের বর্ত্তমান হীনাবস্থা স্মরণে যারপর নাই ব্যথিত হইলেন। মোট কথা, তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইলাম। অতুল শোভা, অল্প জ্যোৎস্নালোকে দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হইল। সমুদ্রের অবিশান্ত গভীর নির্ঘোষ শ্রবণে কর্ণ পরিতৃপ্ত হইল, বেণী বাবুর বিজ্ঞতাপূর্ণ নানা বিষয়ক আলাপনে মানসিক তৃষ্ণা চরিতার্থ হইল, এবং অবশেষে সুন্দর পরিপাটী সুখাদ্য রাজভোগের দ্রব্যাদি দ্বারা উদরপূর্ণ করিয়া মহাসুখে রাজশয্যায় শয়ন করিলাম। শয়ন করিয়া ভাবিলাম, বালুকাশয্যার পরিবর্ত্তে এ কি। চক্ষের জলে সুস্নাত হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা সেদিন নরবে বিধাতার চরণে অঞ্জলি দিয়া শয়ন করিলাম। তার পরদিন কি হইল, বারান্তরে লিপিবদ্ধ করিব।

মেঘ-দূত। *

জনক তনয়া-স্নান-পুণ্যতীরে
নিবিড় •মেরু-কানন মাঝে,

রামগিরি নাম ভূধর-কন্দরে
পবিত্র আশ্রম যথা বিরাজে,—

---

* মহাকবি কালিদাসের প্রসিদ্ধ খণ্ডকাব্যের বঙ্গকবিতানুবাদ

সেইখানে কান্তাবিরহ ব্যথায়
বর্ষ ভোগ্যশাপে, মলিন বেশে,
যাপিতেছে যক্ষ,—কর্ত্তব্যহেলায়
রোষিত প্রভুর আদেশ বশে। ১
কতিপয় মাস বঞ্চিয়া এ মতে,—
বিরহ বেদনে শীর্ণ-কায়,
কনকবলয় প্রকোষ্ঠ হইতে
খসিয়াছে রিক্ত করিয়া তায়,—
জলদ-পটল শিখরি শিখরে
হেরিলা, আষাঢ় প্রথম দিনে,
গজবাজি যেন আনন্দে বিহরে
বপ্রক্রীড়া করি সানুর সনে। ২
মদন সঞ্চার মেঘ দরশনে,
ব্যাকুল পরাণ বনিতা তরে,
বিষাদে সলিল-স্তম্ভিত নয়নে
চাহিল ক্ষণেক তাহার' পরে।
জলদ উদয়ে, মিলিত-প্রেমিকে
উপজে হৃদয় বিকৃত ব্যথা,
দূরে থাকি, প্রিয়া ধরিবারে বুকে
কত যে লালসা, কি তার কথা। ৩
বাঁচাইতে সতী দয়িতা জীবন,
পাঠায়ে আপন কুশল-বাণী
জলধর-যোগে, করিল মনন,
কাতর পরাণী প্রিয়ারে জানি,
পর্ব্বতমল্লিকা যতনে তুলিল,
যতনেতে অর্ঘ্য রচিল তায়,
পুজিয়া সবিধি মেঘে সম্ভাষিল
সাদর-সম্মানে প্রীতি কথায়। ৪
ধূমজ্যোতিঃ বায়ু সলিলে গঠন
অচেতন মেঘ সাধে কেমনে ?
বার্ত্তাবহ কার্য্য, যাহে প্রয়োজন
সক্ষম নিপুণ জীবিত জনে,—
পাশরি যুকতি হৃদয় উচ্ছ্বাসে,
জলধরে যক্ষ কহিল কথা,—
বিচ্ছেদ-উন্মাদে প্রেমিক সকাশে
সজীব-নির্জীব বিচার কোথা ? ৫
"ভুবন বিদিত আবর্ত্তপুষ্কর
তোমার জনম কুলেতে সেই,
ইচ্ছাতনু তুমি, ইন্দ্রসহচর,
মাগিতেছি ভিক্ষা কাতর তেঁই।
মহতের কাছে করিয়া প্রার্থনা,
অপূর্ণ লালসা, কি লাজ তাতে,
হইলেও যেন সফল-বাসনা
নাহি যাচি কভু অধম হাতে। ৬
"তাপিতশরণ তুমি, জলধর,
সেকারণে বলি বিনয়ে বাণী,—
লও মোর বার্ত্তা প্রিয়ার গোচর
যুড়াও আমার হৃদয়খানি,
কররগো গমন অলকা ভবনে
উপবনে যার হরের বাস,
ললাটশশাঙ্ক বিমল কিরণে
যাহার প্রাসাদ ধরে সুহাস। ৭
"আরোহিলে তুমি আকাশের পথে,
প্রিয়-আগমন আশায় কত,
সবারে কুন্তল নয়ন হইতে,
হেরিবে তোমায় যুবতী শত,—
তব উপচায়, কেনা আসি মিশে
বিরহ বিধুরা বনিতা পাশ,
ব্যতীত সেজন, দগ্ধ বিধিবশে
আমার মত যে পরের দাস ? ৮
"সমীরণ ধীরে সুস্বনে বহিবে
অনুকূল পথে তোমার সনে,
গর্ব্বিত চাতক মধুরে গাহিবে
তব বামভাগে পুলক মনে।
বলাকা-দম্পতি উল্লাসে স্মরিয়া
তব আগমনে, মিলন-সুখে,
তুষিবে তোমায় আদর করিয়া
গাঁথি শ্বেতমালা তোমার বুকে। ৯

"ভ্রাতাবধূ তব এখনো জীবিতা,
ধরে আছে প্রাণ মিলন আশে,
গণিতেছে দিন সাধ্বী পতিব্রতা,—
গিয়ে দেখ ভাই, কি দুঃখে ভাসে।
কুসুম-পল্লব রমণী-হৃদয়
বিরহ-তাড়নে পড়িত ঝরে,
আশাবৃন্ত যদি জড়ায়ে তাহায়
না রাখিত বাঁধি যতন করে। ১০

[ক্রমশঃ]

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

বঙ্গবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা

(প্রথম প্রস্তাব।)

বাঙ্গলার পাঠশালার বালকদিগের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা দেখিয়া অনেক চিন্তাশীল কৃতবিদ্য ব্যক্তি উপহাস করিয়া থাকেন। তাঁহাদের কথা এই যে, বিজ্ঞান শাস্ত্র বড় দুরূহ, বড় কঠোর, সুতরাং পাঠশালার বালকদিগের পক্ষে এ শিক্ষা সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কথাটা আমরা মানিনা। বরং অন্যতরপক্ষে ইহাই বুঝি যে, যদি কোন শিক্ষা বালকদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হয়, তবে সে বিজ্ঞান শিক্ষা। কুসংস্কার-পরিশূন্য করিয়া মানসিক বৃত্তির পরিস্ফুরণ করিতে হইলে বাল্যকাল হইতেই যে বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, একথা একালের পণ্ডিতাগ্রণী হক্স্লে ও স্পেন্সর প্রভৃতি অকাট্যরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। তবে যে বিজ্ঞান বালকেরা শিক্ষা করিবে, তাহা তেমনি সরল হওয়া চাই। যদি বাঙ্গলায় বিজ্ঞানের এই সরল ব্যাখ্যার অভাব দেখিয়া [illegible]ক্ষগণ এই শিক্ষাদানের প্রতি [illegible]

এপর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানের যে কয়েক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, পণ্ডিত রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহোদয়ের প্রাকৃত ভূগোল তন্মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু প্রাকৃত ভূগোল সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে কোন সমালোচনা হইবে না বলিয়া ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন কথা এখানে বলিব না। স্বর্গীয় মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্তের পদার্থ বিদ্যা—পাঠশালার উপযোগী প্রথম বিজ্ঞান গ্রন্থ। কিন্তু ঐ গ্রন্থ খানিতে অতি অল্প পরিমাণে বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচিত হইয়াছে বলিয়া শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহোদয়গণ অন্য কোন পুস্তক পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সুবিধার সময় বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, এবং সেইখানি পাঠ্য-তালিকা ভুক্ত হয়। সেও প্রায় ১২।১৪ বৎসরের কথা। অক্ষয় বাবুর পদার্থবিদ্যা ক্ষুদ্র এবং অসম্পূর্ণ, কিন্তু গুণের হিসাবে মহেন্দ্রবাবুর গ্রন্থ অপেক্ষা অনেক ভাল। মহেন্দ্রবাবুর পদার্থ বিদ্যায় নানা বিষয়ের আলোচনা থাকিলেও গ্রন্থ খানি যে বড়ই অকর্ম্মণ্য, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ১২৮৭ সালে এক সংখ্যা বঙ্গদর্শনে ঐ গ্রন্থখানির বিদ্রূপাত্মক তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল,* কিন্তু শিক্ষা

বিভাগের কর্তৃপক্ষীয়েরা অন্য পুস্তকের অভাবে সেইখানিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজি কালি ঐ বিষয়ে আরও অনেক গ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছে। টেক্‌ষ্টবুক কমিটিও তাহার মধ্য হইতে একখানি বিশেষরূপে চাহিয়া লইয়া পাঠ্য তালিকার অন্যতম পাঠ্য পুস্তক স্থির করেন। এখানি বাবু যোগেশ-চন্দ্র রায় প্রণীত সরল পদার্থ বিজ্ঞান। বোধ হয়, যোগেশ বাবুর গ্রন্থ প্রচারের পর প্রতি-দ্বন্দী গ্রন্থের উৎকর্ষ দেখিয়া ১৮৮৮ সালে মহেন্দ্র বাবু তাঁহার পদার্থ বিদ্যার নূতন এক সংস্করণ করিয়াছেন, তাঁহার এই পঞ্চদশ সংস্করণের গ্রন্থই যোগেশ বাবুর সরল পদার্থ বিজ্ঞানের সহিত প্রতিযোগী পাঠ্য পুস্তক রূপে এবৎসর পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। এবারে নূতন পাঠ্য পুস্তকের যে নিৰ্দ্ধারণ কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কোন বিশেষ গ্রন্থের নামোল্লেখ নাই। কেবল যে বিষয়গুলি পড়িতে হইবে, তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় পাঠশালার কর্তৃপক্ষীয়দিগকে বিবেচনা পূর্ব্বক গ্রন্থ নির্ব্বাচন করিয়া বালকদিগের হস্তে দিবার ভার ন্যস্ত হইয়াছে। সুতরাং এই সময়ে প্রচারিত বিজ্ঞান গ্রন্থগুলির সমা-লোচনার বিশেষ প্রয়োজন।

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গ্রন্থ যে অকর্ম্মণ্য, তাহা যদিও বঙ্গদর্শনে কোন কৃত-বিদ্য ব্যক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তথাচ এসময়ে একবার তাহার পুনঃ সমা-লোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি-তেছি। প্রথমতঃ বঙ্গদর্শনের অনেক দিনের পূর্ব্বের সমালোচনার কথা অনে-কেই জানেন না, দ্বিতীয়তঃ মহেন্দ্র বাবু তাঁহার পঞ্চদশ সংস্করণে পুস্তক খানিকে "সংশোধিত এবং সংবৰ্দ্ধিত" আকারে প্রচার করিয়াছেন।

প্রথমতঃ মহেন্দ্র বাবুর পদার্থ বিদ্যার ভাষার বিষয় আলোচনা করা যাউক। প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম পংক্তিতে পদার্থের সংজ্ঞা দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"পদার্থ শব্দে পদের অর্থ। পদের অর্থ দ্বারা যাহা উপলব্ধি হয়, তাহাকেই পদার্থ বলা যাইতে পারে। দ্রব্য, গুণ, কার্য্য প্রভৃতি সকলই পদের অর্থের দ্বারা প্রকা-শিত হইতে পারে, সুতরাং ইহারা সকলেই পদার্থ।" মহেন্দ্র বাবু তাঁহার পুস্তকের টাইটেল্ পৃষ্ঠায় টুলো রকমের পাণ্ডিত্যের অভিমান করিয়াছেন, এই উদ্ধৃত অংশটুকু তাহার অনুরূপ বটে। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যারণ্য লিখি-য়াছেন "যাহা উপলব্ধি হয়" এটা একটু আরণ্য রকমের বাঙ্গালা বটে; আমরাও জানি "যাহার উপলব্ধি হয়" অথবা যাহা উপলব্ধ হয়। আরও আছে। বিদ্যারণ্য মহাশয়—ঐ প্রথম পৃষ্ঠাতেই চেতন অচেতন পদার্থ বুঝাইতে গিয়া লিখিয়াছেন—"এক মাত্র পরমাত্মাই শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ"। বিদ্যা-রণ্য মহাশয় যে ধর্ম্মারণ্যও বটেন, একথা জানিয়া আমরা সুখী হইতে পারি; কিন্তু তাহাতে পদার্থতত্ত্ব শিক্ষার্থ কচিছেলেদের কি? ঐ প্রথম পৃষ্ঠাতেই আবার দেখুন, "জীবগণের আত্মা চৈতন্যময় বটে। কিন্তু উহারা জড়ময় দেহধারী, সুতরাং উহারা জড়চিৎ, এই উভয় স্বভাবাপন্ন"। ভো! ভো! ন্যায় কচকচি ঠাকুর। আপনাদের জ্বালায় শ্রাদ্ধের বাড়ীতে লুচি হজম হয় না, আবার ছেলেদের বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান হজমে বাধা দেন কেন? আসল কথা এই যে, যে গ্রন্থ এই প্রকার দুর্ব্বোধ্য জটিল ভাষায় লিখিত,

তাহা কোন ক্রমে বালকদিগের হস্তে অর্পিত হইতে পারে না। মহেন্দ্র বাবুর পদার্থ-বিদ্যার যে কোন পৃষ্ঠা খুলিয়া পড়ুন, দেখিবেন, হয়, তাঁহার ভাষা দুর্ব্বোধ্য ও জটিল, না হয়, অলঙ্কারের অতি সমাবেশে দুষ্ট। বিজ্ঞানের গ্রন্থ বুঝিতে পারা যায় না বলিয়া একেই লোকে কত আপত্তি উপস্থিত করে, তাহার উপর যদি আবার ভাষার ছটা করিয়া বিজ্ঞান লেখা যায়, তবে আদৌ তাহা কাহারও পড়িয়া বুঝিবার সাধ্য থাকে না। আরও কথা আছে। বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি প্রকাশ করিতে হইলে অতি সাবধানে ভাষা ব্যবহার করিতে হয়, নচেৎ এককথায় আর এক অর্থ বুঝিবার সম্ভাবনা থাকে। এই জন্য কোন ইংরাজপণ্ডিত কখনও বিজ্ঞানের গ্রন্থ সরল পরিস্ফুট ভাষায় ভিন্ন লিপিবদ্ধ করেন নাই। তবে মহেন্দ্র বাবু তাঁহাদের দুই এক ছত্র বাঙ্গালায় লিখিতে গিয়া, ভাষা সম্বন্ধে এতটা আদিমত্ব দেখাইতে গিয়াছেন কেন, বুঝিলাম না। দৃষ্টান্তস্থলে ১৩৯ পৃষ্ঠা হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। 'বায়ু না থাকিলে কি উষাকালীন পরম রমণীয় শোভা, কি প্রদোষকালীন জলদপটলের নিরুপম কান্তি, কিছুই নয়ন-গোচর হইত না। বায়ু না থাকিলে কাদম্বিনীর ললাটদেশ সৌদামিনী রূপ-সিঁথিতে সমুজ্জলিত হইত না" ইত্যাদি। আরো দেখুন; ১৫৭ পৃষ্ঠায় আছে, "কি মানব কণ্ঠ-সমুত্থিত অর্থসংযুক্ত সুস্পষ্ট বাক্য, কি পশুপক্ষী কণ্ঠ-বিনিঃসৃত অর্থবিরহিত অব্যক্ত ধ্বনি, কি জীমূতবাজি-সম্ভূত গভীর বজ্রনির্ঘোষ, কি প্রকাণ্ড মহীরুহ ভঙ্গকারী বেগবান্ প্রভঞ্জনের ভীষণ নিঃস্বন, কি বায়ুক্ষুভিত মহাসমুদ্রের কবালতম কল্লোল কোলাহল" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, এখানি কি পাঠ-শালার বালকদিগের জন্য বিজ্ঞানের বই, না নভেল, না বক্তৃতা, না জ্যাঠামি? তাঁহার যদি মনঘটাছায় "বিদগ্ধজননী" বাঙ্গালা লিখিবার ইচ্ছা ছিল, তবে বালক-দিগের বই না লিখিয়া অনায়াসে একখানা "উহু, মরি" "গেলাম গেলাম" বা "শশিরস্তা" নামের একখানি নভেল লিখিয়া সস্তামূল্যে বটতলায় ছাপাইলেই পারিতেন। আমাদের লজ্জা হয়, ঘৃণা হয়, যে বাবু সূর্য্যকুমার অধিকারী মহাশয়ের প্রকৃতিবিজ্ঞান, বাবু যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সরল পদার্থ-বিজ্ঞান প্রভৃতি ভাল ভাল গ্রন্থ থাকিতে এই পদার্থবিদ্যা শিক্ষাবিভাগের তালিকায় স্থান পাইয়াছে। এবারকার নিয়মানুসারে বিদ্যা-লয়ের কর্তৃপক্ষেরা স্বেচ্ছাক্রমে যে কোন পুস্তক ব্যবহার করিতে পারেন, সুতরাং বোধ হয় আর কেহ ইচ্ছা করিয়া এই কদর্য্য পুস্তক বালকদিগের ব্যবহারার্থ গ্রহণ করিবেন না।

যদিও এই এক ভাষার দোষেই পুস্তকখানি অগ্রাহ্য হওয়া উচিত, তবুও আমরা পুস্তকের অন্যান্য কয়েকটী দোষেরও উল্লেখ করিব।

বিজ্ঞানের গ্রন্থে শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন। যে শব্দ ঠিক যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা অন্যকোন অর্থে ব্যবহার করিতে গেলেই দোষ স্পর্শে। কিন্তু অমরকোষবিৎ বিদ্যারণ্য মহাশয় তাঁহার শব্দ জ্ঞানের প্রাচুর্য্য দেখাইবার জন্য বিজ্ঞানের সমুদয় কঠোর নিয়ম পদদলিত করিয়াছেন। চুম্বক—অয়স্কান্ত, অয়স্কর্ষক, চুম্বকের কবচ, অয়স্কান্ত সংরক্ষক, মহাকর্ষণ—সংকর্ষণ

বিপ্রকর্ষণ, বিকর্ষণ; বলগুণ্য-বলমন্দ; প্রতিক্ষলন, প্রতিক্ষেপণ, বিক্ষেপণ, পুরুষতাড়িৎ, ধনতড়িৎ, পরতড়িৎ (Positive electricity); ইত্যাদি ইত্যাদি। বালকেরা বিজ্ঞান শিখিবে, না একটা কথার জন্য রাশি রাশি অমরকোষ মুখস্থ করিবে? যিনি ভাষা পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য প্রয়াসী, বিজ্ঞানের গ্রন্থ লিখিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। বিদ্যা দেখাইতে গিয়া, স্থানে স্থানে আবার আপনার ফাঁদে আপনি পড়িয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে অনেক ভ্রম প্রমাদ ঘটাইয়াছেন। তিনি যেরূপ হওয়া উচিত তেমনি, বায়ু এবং বাতাসে প্রভেদ করিয়াছেন, অথচ স্থানে স্থানে উভয় শব্দই একার্থে ব্যবহার করিয়া গোল পাকাইয়াছেন। যথা, সংজ্ঞা দিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে "সচল বায়ুকেই বাতাস (wind) বলি", কিন্তু আবার অন্যত্র ১২৮ পৃষ্ঠায় বাতাসের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০০০ বলিয়া লিখিয়াছেন। এক স্থানে, "গতির হারক বেগ বলে", অন্যত্র "তাঁহার পদদ্বয় বেগপ্রাপ্ত হইয়া চালিত হয়", আবার অন্যত্র "সীসকের পরমাণু সকল হাতুড়ির বেগপ্রাপ্ত হইয়া বিকম্পিত ও উত্তপ্ত হয়।" একস্থানে (atom) অণু, অন্যস্থানে পরমাণু, আবার একস্থানে (molecule) পরমাণু অন্যত্র অণু। এমন একটি দুইটি শব্দ নয়, অনেক স্থলেই "গোশব্দে নানা অর্থ" ঘটাইয়াছেন। এরূপ দোষ বিজ্ঞানের গ্রন্থে সম্পূর্ণ অমার্জ্জনীয়।

এপর্য্যন্ত যে সমস্ত দোষের কথা উল্লেখ করা গেল, সেগুলি তাঁহার অন্যান্য দোষের সহিত তুলনায় যৎসামান্যই বলিতে হইবে। তাঁহার ক্ষুদ্র পুস্তকে বিজ্ঞানশাস্ত্র তাঁহার যতটুকু জানাছিল, তাহা বালকদিগের উপযোগী হউক আর নাই হউক, লিখিতে ছাড়েন নাই। সুতরাং অনেক বিষয়ের একত্র ঘেঁসাঘেঁসিতে কোনটাই ভাল ফুটিতে পায় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে একটির উল্লেখ করি, তিনি নিমজ্জিত ও ভাসমান দ্রব্যের সাম্যাবস্থার নিয়মটি যেরূপে লিখিয়াছেন, তাহাতে সেটি একেবারেই বুঝাইতে পারেন নাই। তাহার পর তাঁহার গ্রন্থ লিখিবার পদ্ধতিটা পর্য্যন্ত দূষনীয়। সকল স্থানেই, প্রথম একটা সূত্র আওড়াইয়াছেন, তাহার পর তাহার ভাষ্য করিতে গিয়াছেন। এপদ্ধতিতে বিদ্যারণ্যের মধ্যে শেয়ালকাঁটা ভিন্ন অন্য কোন বৃক্ষ জন্মিবার আশা করা যায় না। ইহাতে কেবল বালকদিগের মস্তিষ্ক অযথা পীড়িত হয়, এইমাত্র। বিজ্ঞানে, প্রথম দৃষ্টান্ত ও ঘটনার সমাবেশ করা চাই, তার পর সিদ্ধান্তে স্থূল কথাটি লিপিবদ্ধ করা উচিত। সহজ কথা Inductive প্রণালীই বিজ্ঞানের পক্ষে একমাত্র উপযোগী। আমরা দেখিতেছি যে, কেবলমাত্র যোগেশ বাবুর সরলপদার্থ বিজ্ঞানে এই পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে।

মহেন্দ্র বাবুর পুস্তকে আরও নানা প্রকারের ত্রুটী আছে, কিন্তু সেগুলি বলিবার আমাদের স্থানও নাই, সময়ও নাই। কেবলমাত্র তাঁহার গ্রন্থের রাশি রাশি ভুলের মধ্যে গোটাকতক তুলিয়া দেখাইয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। মহেন্দ্রবাবুর হাতে বৈজ্ঞানিক সত্যের এত গুরুতর অপলাপ ঘটিয়াছে যে, একজন বিজ্ঞান বিষয়ে গ্রন্থ লিখিতে সাহস করিয়া এত অজ্ঞতা দেখাইতে পারেন, বিশ্বাস হয় না।

তিনি লিখিয়াছেন যে, জলীয় বাষ্পের

অপ্রত্যক্ষ গূঢ় তাপের পরিমাণ প্রায় ১৮০ × ৫.৪ = ৯৭২' অংশ। এখানে উষ্ণতার অংশকে তাপ পরিমাণের একক করা হইয়াছে। এটা খুব নূতন আবিষ্কার নয় কি? ১৭৫ পৃষ্ঠায় আছে, "বাষ্পনিঃসরণ কালে কেবল (জলাদির) উপরিস্থ পরমাণু সকল বাষ্পাকার ধারণ করে, "জলের পরমাণু" (atom) আর সোনার পাথরের বাটি, একই কথা। বিদগ্ধ-জননার সম্পাদক নিউটন উপাধি প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত। আবিষ্কারের উপর আর এক আবিষ্কার দেখুন, ঐ পৃষ্ঠায় আর এক স্থানে আছে, "বায়ু নিষ্কাষণ যন্ত্রে কিঞ্চিৎ ইথর নামক এক প্রকার অতি তরল দ্রব দ্রব্য স্থাপন করিয়া বায়ু নিষ্কাষণ করিলে এরূপ প্রবল বেগে বাষ্পনিঃসরণ হইতে থাকে যে, অনতিবিলম্বেই উহা ফুটিয়া উঠে"। এখানে কার্য্যকারণ সম্বন্ধে বিশেষ গোল করিয়াছেন, দেখিতেছি। এরূপ গোলযোগ এ পুস্তকে রাশি রাশি। মহেন্দ্র বাবুর আবিষ্কারের আর গোটা কতক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াই এ সমালোচনা শেষ করিতে চাই। ১৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "বায়ু নিষ্কাষণ যন্ত্রের আবরণ পাত্র মধ্যে অতিশয় উগ্র গন্ধকদ্রাবক পূরিত কোন পাত্রের উপর একটি ক্ষুদ্র অথচ প্রশস্ত মুখসম্পন্ন পাত্রে কিঞ্চিৎ জল রাখিয়া আবরণ পাত্রের অন্তর্গত বায়ু নিষ্কাষণ করিলে অভ্যন্তরস্থ জল হইতে বায়ু উঠিতে উঠিতে নিম্নস্থ দ্রাবক দ্বারা পরিশোধিত হয়, ইহাতে প্রবল বেগে বাষ্পোদগম হইতে থাকে। জল হইতে বাষ্প না উঠিয়া যাঁহার প্রভাবে বায়ু উঠিয়া জল বায়ুতে পরিণত হয়, তিনি বায়ুগ্রস্ত বটেন।

আর প্রয়োজন নাই। ইহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন, টোল এবং কালেজের মিশ্রণে কি এক অদ্ভুতপূর্ব্ব বালক-মস্তিষ্ক-ভক্ষণ-কারিণী পদার্থ বিচার সৃষ্ট হইয়াছে।

ইহার পুস্তক ছাড়িয়া যোগেশ বাবুর কিম্বা সূর্য্য বাবুর পুস্তক বিচার করিয়া দেখিলে অনায়াসে প্রতীয়মান হইবে যে, সে গুলি কতদূর উপযোগী। সর্ব্বাংশে তুলনা করিতে গেলে বাবু যোগেশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের সরল পদার্থ বিজ্ঞান সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। ত্রিধারা।—শ্রীচন্দ্রনাথ বসু প্রণীত, মূল্য ১৲। একথা কেহ শুনে নাই, শুনিবার কেহ ছিলনা, তখন আকাশ ও ধরণী নীরব, বিহঙ্গ বা মানব জন্মে নাই, গাহিবে কে? তখন লতাপল্লব হয় নাই, পাষাণে সেহালা জড়ায় নাই। সেই দিন অতি প্রাচীন দিনে, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের মধ্য ক্ষেত্রে, বিশাল ব্যাপিনী ধরণী, তারকা খচিত নীলাম্বর, আঁধার-প্লাবিত পাতাল মধ্যক্ষেত্রে সহসা উচ্ছ্বাস উঠিল, অনন্ত বিদীর্ণ হইল, সপ্তর্ষি চমকিত হইল, বাণী-স্ফুরিতা তারকাগণ অনিমেষে চাহিয়া রহিল। অনন্ত বিদীর্ণ করিয়া এক অতুল উৎস নির্গত হইয়া শ্বেত, নীল শ্যাম ধারায় স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল

পবিত্র ও প্লাবিত করিল। বেদগানে জগত সেই শুভদিনের মঙ্গল ঘোষণা করিয়াছিল। ইহারই নাম ত্রিধারা। পবিত্র নামে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। ত্রিপাদে বিশ্ব পরিপূরিত, বর্ণীয় আর স্থান নাই। ত্রিপথ ও ত্রিপাদে ভিন্ন কি?

আলোকে ক্ষুদ্রতার পরিচয় হয়, আঁধারে ক্ষুদ্রতা লুকাইয়া যায়। ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে গায়ত্রীর জন্ম। কুরুক্ষেত্রের সমরকোলাহলে, ধূলী-মেঘে পাঞ্চজন্য নির্ঘোষে ভগবদ্গীতার অভ্যুদয়। নীল অনন্তে বিষাদের গোধূলী ছায়ায় ত্রিধারার উৎপত্তি। বিধুরের অশোক-ছায়ায় শান্ততপোবনে বাল্মিকী শিষ্যের নিকট রামায়ণ রচনা করিতেন, সুরধুনীর পবিত্র সলিলে স্নানপূত হইয়া কৌষেয় পরিধান করিয়া বীণা হস্তে বাল্মিকী শুভ্র-কেশ শুভ্রবেশ শান্ত অশোক তলে যে দিন রামায়ণ গান করিয়াছিলেন, ভারতের সে কি দিন ছিল? শোকশান্ত হৃদয়ে বিষা-দের গোধূলী ছায়ায় চন্দ্রনাথ আরম্ভ করি-লেন দুইটী ধারা, চক্ষু দিয়াও একটী মুখ পবিত্র করিয়া বাহির হইল। ত্রিধারার সূচনা এইরূপ।

"যাদু। এখন কোথায় আছ? ঠিক জানিনা। যেখানেই থাক, আশীর্ব্বাদ করি এবার দীর্ঘ জীবী হইও"। ভৈরবরাগে গায়ত্রী আরম্ভ হইল।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাত্বমগমঃ শাশ্বতীসমা" কোথায় ক্রৌঞ্চ মিথুন? কোথায় প্রাণপুত্তলি? হৃদয় স্তম্ভিত হইল, শরীর রোমাঞ্চিত হইল, নয়নে ধারা বহিল, আমিও কাঁদিয়া ডাকি-লাম "যাদু। এখন কোথায় আছ, ঠিক জানিনা" সপ্তর্ষিমণ্ডলে ত্রিধারার উৎপত্তি গীত হইবে। এমন দেব মন্দিরের আবৃত আলোকে ক্ষুদ্রতা ধরিবার সামর্থ্য সমালোচকের নাই। শান্ত পবিত্র হৃদয়ে এখানে প্রবেশ করিতে হয়।

২। মানসী।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, মূল্য ২৲। সৌন্দর্য্য-অনুভাবকতা এবং অনুভাবনা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে কেহ কবি হইতে পারে না। এই দুটী থাকিলেই যে কবি হওয়া যায়, সে কথা বলি না। কিন্তু এ দুটী প্রধানতঃ আবশ্যক, তাহাই বলা হইল।

যেখানে আমার চক্ষে কিছুই সুন্দর দেখায় না, কবি সেখানে সৌন্দর্য্য দেখেন, এবং আমাকে দেখাইয়া দেন। তাঁহাকে সাক্ষী করিয়া মরুভূমে জল মিলে, আঁধারে আলো দেখি, দিনে জ্যোৎস্না ফুটে, বোবার বোল। সৌন্দর্য্য অনুভাবকতা শক্তি বহু দর্শন, তীক্ষ্ণ দর্শন বা ইন্দ্রিয়-প্রখরতার ফল নহে, এ শক্তি স্বভাব-সিদ্ধ। সাধনায়ও লাভ করা যায়, কিন্তু সে শক্তি উচ্চ অঙ্গের নহে।

বর্ণনা শক্তি সাধনা-সিদ্ধ। টেনিস বা ক্রিকেট খেলা যেমন অঙ্গের জি, মনাষ্টিক, বক্তৃতা করা তেমনি জিহ্বার জি, মনাষ্টিক, লিখিবার ক্ষমতা তেমনি অঙ্গুলার জি,মনাষ্টিক, চেষ্টা করিলে সকলেই শিখিতে পারে। এই জন্য লিখিবার গুণে অনেক অকবি কবি নামে কিয়দ্দিনের জন্য লোকসমাজে পরি-চিত হয়। সৌন্দর্য্য-অনুভাবকতা শক্তি, অর্থাৎ কবি-কল্পনা-সত্ত্বে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা অভাবে অনেকের নাম কেহ জানিতে পারে নাই। কল্পনা ও বর্ণনাশক্তি একা-ধারে দুর্লভ। যাঁহার আছে, তিনিই প্রকৃত কবি।

কাব্য কেবল পদ্য বা গদ্যময় প্রবন্ধ নহে। চিত্রাঙ্কন,ভাস্করাদি কারুকার্য্য,সুললিত কাব্য। কিন্তু চিত্রকর ও ভাস্করাচার্য্যের

অপেক্ষা কবির ক্ষমতা কিছু উচ্চাঙ্গের। বর্ণ, যন্ত্র বা প্রস্তরাদি বহিঃ সাধনাও অন্যের সহায়। বায়ুময় বাক্য সহায়ে কবি জগতের রাজা। যন্ত্র বিনা গান, বর্ণ বিনা চিত্র করিবার ক্ষমতা তাঁহার। এ জন্য কবিকে দেবতা শ্রেণীতে গণ্য করা হইয়াছে।

কবির রুচি অনিন্দনীয়। নাগরিকতা তাঁহার লক্ষণ। দেহ পরিচ্ছন্ন, বেশ পরিচ্ছন্ন, ব্যবহার পরিচ্ছন্ন, ভাব পরিচ্ছন্ন, ভাষা পরিচ্ছন্ন। স্থূলতা, অমসৃণতা, অনুপযোগিতা গ্রাম্যতার লক্ষণ। গ্রাম্যের প্রকৃতি, সংযমনশূন্য, ভাষা স্থূল, ভাব স্থূল, ব্যবহার স্থূল। পার্ব্বতীয় নদীর মত কবি কল্পনা উচ্ছ্বাসময় নহে। ধীর স্থির মন্দগতি মনমোহনশ্যামের বাঁশীর মত মিষ্ট, অনুচ্চ, অনধীর, বসন্তের বায়ু।

তাই বলিয়া সে শক্তি অক্ষম নহে, ইচ্ছা করিলে জীমূত-মন্দ্র পরাজয়ে প্রবীণ, শূলের ন্যায় তীক্ষ্ণ, টঙ্কারে জগত আতঙ্কে কম্পিত করে। যাহার ক্ষমতা আছে, সে বিনীত, শূন্য কুম্ভ শব্দায়মান। এজন্য মধুরতা কবিকল্পনার স্বাত্বিক লক্ষণ। ইচ্ছা করিলে কবি হাস্যাত্মক, শোকাত্মক বা বীর্য্যাত্মক কাব্য রচনা করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতি-বিশেষত্ব নাগরিক বা কবির লক্ষণ নহে।

অল্পবয়সে রবীন্দ্রনাথ সুকবি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার কল্পনা ও বর্ণনাশক্তি উচ্চাঙ্গের এবং রুচি পরিচ্ছন্ন। এখনও তিনি এমন কোন কাব্য রচনা করেন নাই, যাহাতে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইবে। কিন্তু এখনও তাঁহার বয়স অল্প। এখন তিনি বৃন্দাবনের বনে বনে বাঁশী বাজাইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার কবিতাগুলি ক্ষণকালের জন্য মনোমুগ্ধ করে, অথচ প্রকৃতির প্রতি শোধে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে যে, স্থায়ী কবিতা লিখিবার ক্ষমতা তাঁহার অনতীত নহে। একটু প্রবীণতা হইলে উচ্চাঙ্গের স্থায়ী কাব্য তাঁহার নিকট আমরা আশা করি। রবিচ্ছায়া ও ভানুসিংহের পদাবলী তাঁহার গীতিকাব্য রচনা করিবার অসীম ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে যে কবিতা গ্রন্থখানি রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বালকত্বের কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছিল। ফিডিয়াস যে কল্পনায় সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে সাহস করিয়াছিলেন। উলঙ্গিনী রমণী বা যুবতীর স্তন চিত্র করিবার শক্তি কয় জনের আছে? ছুরি করে চাওয়ার মধুরতা রবীন্দ্রনাথ জানেন। অথচ যাহাতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়, আতঙ্কে দেবদূত পক্ষপুটে চক্ষু আবরণ করেন, সাহসে রবীন্দ্রনাথ তাহারই চেষ্টা করিয়াছিলেন দেখিয়া আমাদের মনে শক্রদমনের সিংহশিশুর দন্ত দর্শনের চেষ্টা মনে পড়িয়াছিল, বুঝিয়াছিলাম, রবীন্দ্রনাথ শিশু হইলেও বীরশিশু বটে।

মানসীতে সেরূপ বালকত্বের আভাস পওয়া যায় না বটে, কিন্তু অন্য লক্ষণে বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ এখনও পূর্ণ-প্রবীণতা লাভ করিতে পারেন নাই। মানসীর অধিকাংশ কবিতা সরস, উজ্জ্বল, মনোহর। কিন্তু কয়েকটীতে তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইবার সম্ভবনা নাই। এগুলি মুদ্রিত না করিলে ভাল হইত। মানসীতে কোন নূতন শক্তি প্রকাশ পায় নাই। কোন কোন কবিতায় অন্য কবির ছায়া পড়িয়াছে। তাঁহার কল্পনায় এত মৌলিকতা আছে যে, এ ঋণের

তাঁহার কোন আবশ্যকতা ছিল না। এবং মূল কবিকে যখন তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই, তখন এরূপ ঋণে দ্বিবিধ দোষ-স্পর্শ করিয়াছে।

এইরূপ কয়েকটী সামান্য দোষ উপেক্ষা করিলে মানসীকে মুক্তমালা বলিয়া পরিচয় দিতে আমাদের সঙ্কোচ হয় না। প্রণয়ের সুবসক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আনন্দ কুর্দ্দন, বিষাদের ছায়া প্রতিফলিত করিতে তিনি পারদর্শী, স্বভাবের শোভা তাঁহার চিত্র-ফলকে ঝলমল করে, ব্যঙ্গের তীব্রতায় মর্ম্ম-ভেদ হয়। রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর আদরের ধন। মানসী যে ভাবুক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে, আমাদের সন্দেহ নাই।

স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিলে রসভঙ্গ হয়। সমগ্র গ্রন্থ না পড়িলে কবির বহুধা কল্পনার পরিচয় পাওয়া যাইবে না। সুতরাং কোন স্থানই উদ্ধৃত করিলাম না।

৩, ৪, ৫, ৬ ও ৭। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত— কবিতাবলী মূল্য ।৶০, স্ত্রী জাতি মূল্য ৵০, ভারতভিক্ষা মূল্য ৵০, দেশানুরাগ মূল্য ।৶০, ভারত-সঙ্গীত মূল্য ।০ আনা। এ সমস্ত-গুলিই পুরাতন জিনিস নূতন ছাঁচে ঢালা। হেম বাবুর কবিতার নূতন করিয়া সমালোচনা করা বাহুল্য। সকলগুলি পুস্তকই উচ্চাঙ্গের কবিত্বে পূর্ণ, তথাচ পাঠককে বিশেষ করিয়া অনুরোধ, "ভারত সঙ্গীত" এবং "স্ত্রীজাতি" বারবার পাঠ করুন। "বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে" ইহার ন্যায় উদ্দীপনা ও আবেগময়ী কবিতা বঙ্গভাষায় আর একটিও নাই। লুপ্ত-গৌরব পরপদ-দলিত ভারতবাসীর দুর্ব্বল প্রাণে এই কবিতা বৈদ্যুতিক স্রোত প্রবাহিত করে। নিত্যশঃ পাঠ করিলেও ইহার নূতনত্ব বা সরসত্ব দূর হয় না। স্ত্রীজাতি নামক পুস্তক-খানি তাঁহার উদার হৃদয়ের আগ্নেয় ভাষায় প্রতিচ্ছায়া।

৮। জাতীয় সম্মিলনী—শ্রীসানুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ১৬৮নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। এখানিও ক্ষুদ্র সঙ্গীত পুস্তক। কলিকাতায় বিগত জাতীয় সমিতি অধিবেশনের বিষয় লইয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। দেশীয়দিগের প্রতি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, প্রজার প্রার্থিত বিষয় এবং পার্লিয়ামেণ্টের প্রসঙ্গ ইত্যাদি জটিল রাজনৈতিক কথা লইয়া কবিতা লেখা অতিশয় কঠিন। তাহাতে গ্রন্থকারের কবিত্ব শক্তিরও বিলক্ষণ অভাব আছে। এ অবস্থায় পদ্য না লিখিয়া গদ্য লিখিলে গ্রন্থকার সম্ভবতঃ সফলকাম হইতেন।

৯। প্রবন্ধ-পাঠ।—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি, এ, প্রণীত। এই পুস্তকে নৈতিক ও ঐতি-হাসিক এবং জীবন-বৃত্ত বিষয়ক ১৯টি প্রবন্ধ আছে। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "বিদ্যালয়ের বালক ও বালিকাগণের পাঠোপযোগী করিয়া 'প্রবন্ধ-পাঠ' লিখিত হইল।" আমরা আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, গ্রন্থকারের এই সাধু উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। গ্রন্থের ভাষা ভাব-ময়ী ও শ্রুতিমধুর, প্রবন্ধগুলি সুরুচিসঙ্গত এবং শিক্ষাপ্রদ, এবং বর্ণনা সংক্ষিপ্ত এবং লিপি-চাতুর্য্য পূর্ণ।

১০। দেবীপূজা।—কোঁচবিহার ইউ-নিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। এই পুস্তকে কোঁচ-বিহার রাজ্যের রাজকীয় দুর্গোৎসবের বিবরণ এবং দেবীপূজার পৌরাণিক ও

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা অতি সুন্দর হইয়াছে। আধ্যাত্মিক দুর্গামূর্ত্তি পৃথিবীর নানা শ্রেণীর ও নানা জাতীয় সাধকের হৃদয়ে বিশ্বজননী-রূপে সম্পূজিতা হইতেছে, বঙ্গদেশের মৃণ্ময়ী দেবীর রাজত্ব বিনাশ হইয়া আসিতেছে। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার লেখক ধর্ম্মচিন্তা ও লিখিবার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

১১। মীরাবাই।—শ্রীজয়চন্দ্র সরকার প্রকাশিত, রাজসাহী প্রেসে মুদ্রিত, মূল্য ৵০ আনা। এখানি ঐতিহাসিক পদ্য গ্রন্থ। মীরাবাইর পবিত্র জীবন লিখিলেই যে গ্রন্থ সুখপাঠ্য ও ভাবব্যঞ্জক হইবে, তাহা ভুল। এরূপ পুস্তক বঙ্গযন্ত্রালয় হইতে প্রসূত না হওয়াই প্রার্থনীয়।

১২। পা কুসুম।—শ্রীবিহারীলাল গুহ রায় প্রণীত। ৬৪ নং কলেজষ্ট্রীট, দাস গুপ্ত কোং দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ।৵০ আনা। এখানি বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী পুস্তক। এ পুস্তকে বালক বালিকাদিগের প্রীতিকর কয়েকখানি চিত্র এবং পদ্য ও গদ্য প্রবন্ধ আছে। কবিতাগুলি প্রাঞ্জল এবং সুখপাঠ্য হইয়াছে। লেখকের প্রকৃত কবিত্ব শক্তি আছে। গদ্য প্রবন্ধগুলিও মন্দ হয় নাই।

১৩। বিষাদ-সঙ্গীত।—শ্রীবিহারী-লাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। অনুরাগের স্তর ভেদ করিয়া কবির মনশ্চক্ষু বিষাদের অন্ধকার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যেখানে আকাঙ্ক্ষা নাই, আশা নাই, আলোক নাই, কবি সেই ভয়ঙ্কর অরণ্য প্রবেশ করিয়া নৈশ সংগীততান ধরিয়াছেন। কবির নৈপুণ্য অসাধারণ।

১৪ পরিণয় সংস্কার।—৭৫৫ নং কলেজষ্ট্রীটস্থ শ্রীমোহিনীমোহন মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বিবাহ সম্বন্ধীয় অত্যাবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি লইয়া এ পুস্তক রচিত হয় নাই। কতকগুলি অনাবশ্যকীয় বিষয়ে গ্রন্থ পূর্ণ। সুতরাং আমরা এ প্রকার পুস্তক প্রকাশের আবশ্যকতা অনুভব করিলাম না।

১৫। গীত-পঞ্চ।—শ্রীচন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। ঢাকা আরমানীটোলা শ্রীলছমন বসাক কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ১০ আনা। বাবু চন্দ্রনাথ রায় ঢাকার একজন বিখ্যাত গায়ক। সংগৃহীত সঙ্গীত-গুলিতে দেশ-হিতৈষণা ও জাতীয় ভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সঙ্গীতগুলি সুললিত হইয়াছে।

১৬। চিন্তানল।—শ্রীকমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রণীত। ২১১ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট কে, সি, দত্ত দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ।০ আনা। এখানি আসামী ভাষার জাতীয় কবিতা। আসামের ভাষা আমাদের অনায়ত্ত, কিন্তু যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, কবিতা-গুলি ভালই হইয়াছে। আসামী ভ্রাতা-গণের নিকট এ পুস্তক খুব আদৃত হইবে।

১৭। সতীর পতিভক্তি বা সাবিত্রী চরিত।—শ্রীমতিলাল দত্ত প্রণীত। ৬/১ নং পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন বি, বি, দে দ্বারা প্রকাশিত। এ পুস্তকের ছাপা ও বাঁধান উভয়ই পরিপাটী। বিষয়টীও ভাল।

১৮। অভিলাষ কুসুম।—শ্রীবিনয়-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। এখানি কবিতা পুস্তক। ছাপা অতি সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থকার পুস্তকের স্থানে২ কবিত্ব শক্তির সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন।

এ বৎসরের অন্যান্য পুস্তক আগামী মাসে সমালোচিত হইবে। এ মাসে স্থানাভাব।

নব্যভারত।

দশম খণ্ড।

পুরাতন ও নূতন।

নূতনের ধারে পুরাতন থাকে না। বৃক্ষে নূতন পত্রের উদ্গম হইলে, পুরাতন পত্র খসিয়া পড়ে। নূতন ফুল ফুটিতেছে দেখিলে পুরাতন ফুল ঝরিয়া পড়ে। নবীন সূর্য্য উঠিতেছে দেখিলে চাঁদ পলায়। নববসন্ত আসিতেছে দেখিলে শীত অন্তর্দ্ধান হয়। নূতন বন্ধুর উদয়ে পুরাতন বন্ধু লজ্জায় মুখ নত করিয়া চলিয়া যায়। নূতন বৎসর আসিতেছে দেখিয়া পুরাতন বৎসর থাকিবে কেন? ৯৯ উদয়ে ঐ দেখ ৯৮ সাল কালের গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে। নূতন, পুরাতনের উত্তরাধিকারী। নূতন পুরাতনের চিরসঞ্চিত সম্পদরাশিতে প্রতিষ্ঠিত।

পুরাতন যাহা, তাহাই যায, নূতন যাহা, তাহাই থাকে। সকল জিনিসেরই হ্রাস বৃদ্ধি আছে। বৃদ্ধি পাইতে পাইতে জিনিসগুলি এমন অবস্থায় পৌঁছে যে, আর বৃদ্ধি সম্ভবে না। তখন সে পুরাতনের মধ্যে গণ্য হয়। তখনই সে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে। আর কিছুদিন পর, তার ধারে আবার নূতন গজাইতেছে দেখিলেই সে মরণের কোলে ঢলিয়া পড়ে।

হ্রাস-বৃদ্ধির কথাটা বলিয়াছি ত আর একটু ভাল করিয়া বলি। ছোট ছেলেটী ক্রমাগতই বড় হইতেছে। কত ভাব, কত শিক্ষা, কত রূপ, কত শোভা, কত বুদ্ধি, কত প্রতিভা ক্রমে ক্রমে ফুটিতেছে। ক্রমাগত সে বাড়িতেছে। তেজ বল, সৌন্দর্য্য বল, বুদ্ধি বল, প্রতিভা বল, সব বাড়িতেছে। কাল সে যেরূপ ছিল, আজ আর সেরূপ নয়। বাড়িতে বাড়িতে যখন সে বার্দ্ধক্যে উপস্থিত, তখন আবার তাহার সব হ্রাস হইতে লাগিল। সৌন্দর্য্য ডুবিতেছে, বুদ্ধি কমিতেছে, স্মৃতি লোপ পাইতেছে। দন্ত নড়িল, চর্ম্ম শিথিল হইল, কালচুল পাকিল, সে ক্রমে ক্রমে আরো পুরাতন, আরো পুরাতন হইতে লাগিল। শেষে নবীনের পার্শ্বে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া, নবীনকে সকল সম্পদ ছাড়িয়া দিয়া, লজ্জায় মুখ নত করিয়া মরণকে চুম্বন করিল। নূতন আসিল, পুরাতন সরিল। অথবা একই শক্তি, একই দেবতার বিভিন্নরূপ ফুটিয়া বাহির হইল।

মানুষ সম্বন্ধে যাহা, জাতি সম্বন্ধে তাহা, দেশ রাজ্য সম্বন্ধে তাহা। ভৌতিক কি চেতন, সর্ব্বত্রই এই এক কথা। পূর্ণকলা প্রাপ্তির পর সকল জিনিসেরই হ্রাস হয়।

ক্রমে ক্রমে, নূতন যখন আইসে, পুরাতন তখন খসিয়া পড়ে। ক্ষুদ্র সম্বন্ধে এই নিয়ম, বৃহৎ সম্বন্ধেও এই নিয়ম। এই যে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পৃথিবী, ইহাও একদিন তাঁহার ইচ্ছায় নিবদ্ধ ছিল, আবার ভবিষ্যতে সৃষ্টিতত্ত্বে লীন হইবে। ঐ যে চন্দ্র সূর্য্য, উহাও একদিন নির্ব্বাণ হইবে। তখন ইহাদের স্থানে কি নূতনের অভ্যুদয় হইবে, আমরা কল্পনা করিতে পারি না। কল্পনা করিতে পারি না বলিয়াই যে সৃষ্টির অলঙ্ঘ্য বিধির ব্যতিক্রম ঘটিবে, এমন কোন কথা নাই। পুরাতন মরিবেই মরিবে, নূতন আসিবেই আসিবে। বিধির ইচ্ছা-তত্ত্বের বিকাশ এমনই করিয়া হইতেছে।

রোম ও গ্রীস যখন উন্নতির চরমসীমায় উঠিয়াছিল, তখন কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই যে, এই দুই জাতির আবার মহাপতন হইবে। তাহাদের বক্তমাংস, হাব ভাব, জ্ঞান-বিজ্ঞান সভ্যতা ও চরিত্র-বল লইয়া ইংলণ্ড মস্তক তুলিল যখন, তখন তাহারা মরণের কোলে শয়ন করিল। প্রাচীন আর্য্য-জাতির উন্নতির সময়ে কে ভাবিয়াছিল যে এই জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী? মুসলমানগণ যখন উন্নতির মুকুট মাথায় পরিল, তখন আর্য্যদের গৌরব-ভূষিত মস্তক অবনত হইয়া পড়িল। কালের দুর্জ্জয় প্রভাবে একজাতির উন্নতি-মুকুট অপর জাতির মস্তকে তুলিয়া দিলা বিধাতা জগতের যে কি মহা কল্যাণ সাধন করিতেছেন, জানি না, তবে একরূপ যে প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, একথা কে অস্বীকার করিতে পারে? ইংরাজ জাতি আজ উন্নত, কিন্তু যখন এই উন্নতির ষোল কলা পূর্ণ হইবে, তখন ইহাকেও যে মরিতে হইবে না, কে জানে? মরণ সকলেরই ভাগ্যে ঘটিবে, কিন্তু হায়, সকলেই মায়ার ঘোরে আচ্ছন্ন, কেহই এ বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাসী নয়। লীলাময়ের অপূর্ব্ব লীলা।

এই যে উত্থান ও পতন, ইহা ধর্ম্মের হ্রাস বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। ব্যক্তি সম্বন্ধেও যেমন, জাতি বা দেশ সম্বন্ধেও তেমনি। ধর্ম্মমূলক ভিত্তি হইলে উন্নতি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, নচেৎ পতন বা মৃত্যু অল্পেই ঘটে। রোম, গ্রীসের পতন, ধর্ম্ম-পতনের পূর্ব্বাভাস। ভারতীয় আর্য্য জাতির পতনও ধর্ম্ম পতনের শেষ আভাস। মুসলমান জাতির ধর্ম্মান্ধতা প্রাচীন ভারত গ্রাস করিয়াছিল, ইংলণ্ডের নবধর্ম্ম ভাব গ্রীস ও রোমের সভ্যতা গ্রাস করিয়াছে। আবার মুসলমান জাতির মহা পতন যদি ধর্ম্ম-পতনে হইয়া থাকে, তবে ধর্ম্মোদ্দীপ্ত নবীন ভারত যে তাহাকে পূর্ণ গ্রাস করিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? ইংলণ্ডের ধর্ম্মপতন এখনও হয় নাই, এখনও সেখানে তুলা-দণ্ডে পাপ ও পুণ্য সমতুল, সুতরাং ইংলণ্ডের পতনের এখনও বহু বিলম্ব আছে। কিন্তু পতন যে আসিবে প্রকৃতির প্রতি গাঢ় মনোনিবেশ করিলে এ সিদ্ধান্তে উপস্থিত না হইয়া আর থাকা যায় না।

নবীন ভারত এখন শুধুই নূতনের খেলা। বাল্যকালে চপলতা থাকে, ইহাতে তাহা আছে বাল্যে অদম্য উৎসাহ থাকে, ইহাতে তাহাও আছে। জাতীয় মহা-সমিতির প্রতি তাকাও, বাল্যের চঞ্চলতা দেখিবে, বাল্যের অদম্য দুর্জ্জয় উৎসাহও দেখিবে। নব্যভারত এখন নিত্য নূতন। শোভা সৌন্দর্য্য, বল বিক্রম, বুদ্ধি প্রতিভা নব্যভারতে নিত্য নব বেশ ধারণ করি-

তেছে। ছোট ছেলে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতেছে। প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞান, সভ্যতা গৌরব, বুদ্ধি প্রতিভা, পুণ্য ও চারিত্র্য-বল, নবীন ভারতের ভিত্তিমূল। এখানে মরণ নাই। এখানে পতন নাই। এখন কেবল উন্নতি, এখন কেবল উন্নতি। এই উন্নতির মূলের ধর্ম্ম যদি স্খলিত হয়, তবে বহুকাল নব্যভারত জগতে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপন গৌরব ধারণা করিবে বলিয়া বোধ হয় না। আর যদি তাহা না হয়, উন্নতির পর উন্নতি, অনন্ত উন্নতি লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইবে, কে বাধা দিবে? পুণ্য ও সত্য, ধর্ম্ম ও চারিত্রে, নবীন ভারত মহা তেজীয়ান হউন, পতন বহুদূরে পলায়ন করিবে। অদৃষ্টে পতন আছে—দশ বৎসর পরে, আর শত বৎসর পরে। এখন নানারূপ। নিরাশার কথা থাকিলেও আমরা একবারে আশাশূন্য হই নাই। এখন বৎসর বৎসর নব্যভারত উন্নতির দিকেই ছুটিতেছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সাহেবীকরণ একটু মন্দীভূত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। জাতীয় একপ্রাণতা বল, আর জাতীয় ভাষা বল, জাতীয় পোষাক পরিচ্ছদ বল, আর জাতীয় ধর্ম্মভাব বল, যেরূপেই হউক, এ সকলের প্রতি প্রগাঢ় মনোনিবেশ যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উন্নতির ষোল কলা পূর্ণ হইতে অনেক বাকী রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু নূতন হইতে আরো নূতনে নব্যভারত যাইতেছে না, এ কথা কেহই স্বীকার করিবে না। পৃথিবীর উন্নতি শেষ হইলে যেমন পৃথিবী লোপ পাইবে, নব্যভারতের উন্নতি শেষ হইলেও নব্যভারত লোপ পাইবে। আমরা অনন্ত অভাবেই ভাসিতে চাই। ধা করিয়া উন্নতির চরমসীমায় পৌঁছিতে চাই না। যে উন্নতির অবশ্যম্ভাবী ফল, মহা জাতীয় পতন, আমরা জড়বাদের সে উন্নতি চাই না। পরে কি আসিবে, কে রাজত্ব করিবে, আমরা তাহা জানি না। নব্যভারতের পর আর কি আসিবে, তাহা বিংশ ত্রিংশ শতাব্দীর গর্ভে লুক্কায়িত রহিয়াছে। তাহা আমাদের চিন্তা এবং বুদ্ধির অগম্য।

নব্যভারতের উন্নতির জন্য অংশতঃ আমরা সকলেই দায়ী। এদেশের জলবায়ুতে যখন জীবনধারণ করিতেছি, তখন এদেশের কোন না কোন বিভাগের কাজ আমাদিগকে করিতেই হইবে। প্রত্যেকের কাজ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, প্রত্যেকের কাজ আছে বলিয়াই বিধাতা সৃষ্টি করিয়াছেন, কাহাকে ঘৃণা বা তুচ্ছ করিলে চলিবে না। পুরাতন আর নূতন, একত্র সমাবেশ করিতে হইবে। যুবক বৃদ্ধ, জ্ঞানী মূর্খ, সব মিলাইতে হইবে। তুমি বড় ক্ষমতাশালী, বড় ধনী, বড় জ্ঞানী, তুমি ভাবিতেছ, ঐ রাস্তার মুটের, ঐ গরীবের, ঐ মূর্খের এজগতে কোন কাজ নাই। তুমি বড় বুদ্ধিমান, তুমি প্রাচীনপ্রথা সকলকে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিতেছ, তুমি জান না যে, তোমার ভিত্তি প্রাচীনে প্রতিষ্ঠিত। ভাই, এ অসার ভেদ-বুদ্ধি ছাড়। তোমারও যেমন দরকার, ঐ নিরেট বোকা মূর্খ অজ্ঞানেরও তেমনি দরকার। পুরাতনের ধারে নূতনের প্রয়োজন বলিয়াই নূতনের অভ্যুদয়। সময় আর কিছুই নয়, পুরাতন ও নূতনের বন্ধন-রজ্জু। তুমি বড় ধার্ম্মিক, তুমিও জগতের পাপী তাপীদিগকে এত ঘৃণা করিতেছ? উচ্ছৃঙ্খল যুবক বৃদ্ধকে ঘৃণা করে, প্রাচীন নবীনকে তুচ্ছ করে, তাহারা অন্ধ, তাহাদের

পক্ষে বরং এ সকল সাজে, কিন্তু তোমার এ ভাব কেন ? মনে রাখিও, তোমাকেও যিনি সৃজন করিয়াছেন, উহাদিগকেও তিনিই সৃজন করিয়াছেন, তোমাকে যিনি রক্ষা করিতেছেন, উহাদিগকেও তিনিই রক্ষা করিতেছেন। তিনি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন, সে সকলেরই কাজ আছে। মনে রাখিবে, তাঁহার ইচ্ছা, সকলের দ্বারা পূর্ণ হইবে, কেবল তোমার দ্বারা নহে। ঘৃণা কিসের জন্য, ভাই, অহঙ্কারই বা কিসের জন্য ? তোমার অর্থ, যশ, গৌরব—উহা কয় দিনের ? তোমার জ্ঞান, ধর্ম্মাভিমান, উহাই বা কয়দিনের ? আজ আছে ত কাল যাহার অস্তিত্বের স্থিরতা নাই, তাহার জন্য এত মাতামাতি কেন, ভাই ? মানুষ ডুবিবে, জাতি ডুবিবে, দেশ ডুবিবে,—অন্তে থাকিবে কি ? কেবল মহেশের মহান্ ইচ্ছা, কেবল প্রেমময়ের অপূর্ব্ব প্রেমলীলা-কাহিনী—কেবল অনন্ত কালসাগরের বৈচিত্র্যময় তরঙ্গ-রাশি। এমন এই ভূলোক, এত ভেদাভেদ বৈষম্যের মধ্যে আছে কি ? তাঁহারই মহা ইচ্ছা। তাঁহারই ইচ্ছায় তুমি আমি সকলেই আসিয়াছি, তাঁহারই ইচ্ছায় রহিয়াছি। বড় ছোট সকলের মধ্যেই তিনি, সৃষ্ট সকল বস্তুই তাঁহার বিকাশ। স্বাধীনতার জোরে ভেদ বুদ্ধি ধরিয়া তোমরা যে অহঙ্কার স্ফীত হইয়া পরস্পরকে ঘৃণা করিতেছ, ইহা পরিহার কর এবং সময়ের নিগূঢ় রহস্যজাল ভেদ করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুগত হইয়া দিন রাত্রি পরিশ্রম কর। মস্তকের ঘাম পায়ে ফেলাইয়া, ফলাফল নিরপেক্ষ হইয়া, ক্রমাগত খাট। তিনি যেমন জগতের জন্য খাটিতেছেন, তেমনি ভাবে খাট। সম্প্রদায়গত গণ্ডির বাঁধ ছিন্ন করিয়া, মহেশ্বরের মহান্ সিংহাসন তলে দাঁড়াইয়া, আত্মপর ভুলিয়া, তাঁহার ভাবে মাতোয়ারা হইয়া পরস্পরের জন্য ভাব এবং খাট। জ্ঞানী মূর্খ, হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খ্রীষ্টিয়ান—সকল ভাই ভাই, সকল এক প্রেমে, এক ধ্যানে মগ্ন। নব্যভারত তাঁহারই। এই নব্যভারতে তাঁহার ইচ্ছার তলে থাকিয়াও যদি ভেদ-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হও, তুমি ত ডুবিলেই, সেই সঙ্গে নব্যভারতকেও ডুবাইলে। নব্য-ভারতকে ধর্ম্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কর—সকল সম্প্রদায়ের উপরে যে বিশ্বজনীন প্রেমের ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কর। মহাত্মা বুথ, মহাত্মা ম্যাট্‌সিনি, মহাত্মা খ্রীষ্ট, মহাত্মা শ্রীচৈতন্য যে অহেতুকী অকৈতব প্রেমের মহাসাধনা করিয়া গিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই সামান্য কয়টী কথা "প্রেম" "Love" এর সাধনা কর। এস, তুমি আমি সকলে মিলিয়া পাঁচ ফুলের সাজি সাজাইয়া তাঁহার পূজা করি। তুমি আমি পাঁচ জনে তাঁহার নব্যভারত সিংহাসন তুলিয়া ধরি। যাহার যাহা করিবার, করিয়া যাই। উপেক্ষা, ঘৃণা, পরিত্যাগ করি। নিন্দা তিরস্কার, নির্যাতন, সব ভুলিয়া যাই। ভাই, এই ঘোর দুঃখের দিনে, আত্মবিচ্ছেদের সময় নয়। নবীন ভারত উঠিতে উঠিতে পড়িয়া যাইতেছে, দেখিতেছ না ? একতা, সাম্য, মৈত্রীর সমাবেশ ভিন্ন আর রক্ষা নাই। ভাই, দোহাই বিধাতার, এস, তাঁহার নামে এক মহা প্রাণতায় মাতি। তার পর তাঁহার ইচ্ছায় যাহা থাকে, হইবে। পুরাতন বৎসর ডুবিয়াছে যখন, তখন নিশ্চয় নূতন বিধান আসিয়াছে। নূতন বৎসরে পুরাতন ঝগড়া বিবাদ ছাড়িয়া, পুরাতন পাপ-পরিচ্ছদ

ছাড়িয়া, নূতন প্রেমে নবীন ও সরস হও। এস ভাই, নূতন বৎসরে এই নূতন প্রতিজ্ঞা করি যে, সকল সম্প্রদায়ের সকল লোককে ভাই বলিয়া পূজা করিব। সকলকে বিশ্ব পিতার সন্তান বলিয়া আদর করিব। ইহাই স্বর্গ, ইহাই মুক্তি, ইহাই বৈকুণ্ঠ। সকলের আশীর্ব্বাদ ও পদধূলি মস্তকে লইয়া, এস, সকলে জমাট প্রেমে দেহ প্রাণ ডুবাইয়া দেই। মহান্ ঈশ্বরের মহান্ ইচ্ছার জয় হউক।

ধৰ্ম্মবুদ্ধির ক্রম বিকাশ।

(১)

মনোবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মজ্ঞানের বিকাশ হয়। দেহ-স্ফুটতার বা বুদ্ধি স্ফুটতার পরিমাণ অনুসারে মানব জাতিকে যেমন বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়, ধর্ম্ম জ্ঞানের পরিমাণ অনুসারেও সেইরূপ করিতে পারা যায়। বুদ্ধিস্ফুটতার কোন্ সোপানে সমাজ বিশেষ অবস্থিত, নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে, ধর্ম্ম জ্ঞানের কোন্ সোপানে সে সমাজ অবস্থিত, নির্দ্ধারণ করা সহজ হইয়া পড়ে। আবার স্তর বিশেষ উদ্ভিন্ন করিয়া উন্নততর স্তরে মনোবৃদ্ধি বিকশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, যুগপৎ উন্নততর ধর্ম্মজ্ঞান সেই উন্নততর বুদ্ধি বিশিষ্ট সমাজ মধ্যে দেখা যায়।

সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য ভাব সর্ব্ব প্রথমে বুদ্ধি দর্পণে প্রতিভাত হয়, যদিও উভয় ভাবের উৎপত্তি একই সময়ে হইয়া থাকে, তথাপি সাদৃশ্য জ্ঞানের প্রতিভাতি বৈসাদৃশ্য জ্ঞানের প্রতিভাতির পূর্ব্বে লক্ষিত হয়। বৈসাদৃশ্য জ্ঞানে সম্ভাবনা না থাকিলে সাদৃশ্য জ্ঞানের সম্ভাবনা থাকেনা। একই জ্ঞানের দুই মুখ অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী—অন্বয়ী মুখের নাম সাদৃশ্য জ্ঞান, ব্যতিরেকী মুখের নাম বৈসাদৃশ্য জ্ঞান।

অস্ফুট বুদ্ধিতে সাদৃশ্য জ্ঞানের প্রাবল্য অধিক, স্ফুট বুদ্ধিতে বৈসাদৃশ্য জ্ঞানের গুরুত্ব অধিকতর। সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য জ্ঞানের উৎপত্তি সমকালীন হইলেও অনুভবে সাদৃশ্য প্রথম, বৈসাদৃশ্য দ্বিতীয়।

গতিশীল পদার্থ জীবন্ত অস্ফুট বুদ্ধির ভ্রান্ত অনুমান। জীবন্ত কোন পদার্থের ন্যায় গতিশীল, সুতরাং জীবন্ত, ইহা তাহার যুক্তি। পয়সা গড়াইয়া যায়, পয়সার প্রাণ আছে, গাড়ীর প্রাণ আছে—ইহারই ঊর্দ্ধতর স্তরে বায়ুর প্রাণ আছে, ঝটিকার প্রাণ আছে, বিদ্যুতের প্রাণ আছে, বজ্রের প্রাণ আছে, সূর্য্যের, চন্দ্রের, নক্ষত্রের প্রাণ আছে। গাছ নড়ে না, পৃথিবী নড়ে না, গাছের ও পৃথিবীর প্রাণ নাই।

আবার যাহার সঙ্গে আকারগত সাদৃশ্য আছে—সে সেই। শিশুর নিকট পুরুষ মাত্রই তাহার "বাবা", নারী মাত্রই তাহার "মা।" গরুও গরু, বলদও গরু। অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভে কি প্রভেদ, তাহা সে জানে না। একজন সাহেবের নাম টমাস হইলে, হ্যাট-কোট-পরিহিত শ্বেতাঙ্গ মাত্রই টমাস। শিশু ও চাষা, দুইজন সাহেবের আকারগত কি পার্থক্য আছে, বুঝে না—

সুতরাং দুইজন বিভিন্ন ব্যক্তি, অনুমান করিতে পারে না।

আবার দুইটী বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলে পদার্থ দ্বয়ের একতায় বিশ্বাস আরও অধিক হয়। সাদৃশ্য যত অধিক হইবে, অধিকতর স্ফুট বুদ্ধিরও তত প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা। প্রান্তরে একখণ্ড রজ্জু বায়ুবেগে আন্দোলিত হইতেছে, সারমেয় অমনি জীবন্ত সর্প ভাবিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। বায়ুবেগে তৃণখণ্ড আকাশে উড়িয়া যাইতেছে, পতঙ্গভ্রমে বিহঙ্গগণ তাহাকে চঞ্চুপুটে ধরিয়া ভক্ষণার্থ প্রস্থান করিল। কুরঙ্গের মরীচিকায় বারিবিভ্রমের কারণও এইরূপ। অতি প্রবীণ মনুষ্যও রাত্রিকালে পথপ্রান্তে অবস্থিত রজ্জু বা তৃণখণ্ডকে সর্প বলিয়া অনুমান করেন, শাখা প্রশাখা-বিহীন প্রোথিত কাষ্ঠখণ্ডকে চোর বলিয়া অনুমান করেন। চক্ষুর ন্যায় কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি সকলেই সাদৃশ্যে প্রতারিত হয়। বৈসাদৃশ্য অনুভবশক্তি যত প্রবল হয়—সাদৃশ্য-জনিত ভ্রম ততই সংশোধিত হইতে থাকে। আকাশে ধনুক উঠিয়াছে—সে ধনু কাহার সম্ভব? রাম বা ইন্দ্র? গগনে জ্যোতির্ম্ময় গোলক নক্ষত্র। যখন পতঙ্গী জ্যোতিম্ময় গোলক বিশেষ তোমার চক্ষুকে আকর্ষণ করিল, তাহাকে নক্ষত্র ভিন্ন তুমি আর কি অনুভব করিবে? উল্কাপিণ্ড তখনও তোমার অভিধানে সংগৃহীত হয় নাই। বৃহৎ দর্পণের পুরোভাগে দণ্ডায়মান সারমেয় দর্পণে আপন আকৃতির প্রতিবিম্ব দেখিয়া অন্য সারমেয় ভ্রমে আক্রমণ করিতে ধাবমান হয়—কাচে আঘাত পাইয়া প্রতিহত হইলেও তাহার ভ্রান্তি দূর হয় না—স্পর্শ অপেক্ষা দর্শন জ্ঞান প্রবলতর। সে চক্ষে দেখিতেছে, সারমেয় তাহার সম্মুখে আক্রমণোদ্যতের ন্যায় দণ্ডায়মান, সে কখন আপন প্রতিকৃতি দেখে নাই—দেখিয়া থাকিলেও সে এখানে, ওখানে আবার যাইবে কিরূপে? সে অন্য কুকুর দেখিয়াছে, তাহার সম্মুখে সেইরূপ একটী কুকুর স্ফীত-লাঙ্গুল, প্রসারিত-ওষ্ঠ, বিকশিত দন্ত বিজীগিষা সাধন করিতে বা আত্মসংরক্ষণে, তাহাকে তাহার আক্রমণ করিতে হইবে। পুরোভাগে প্রতিহত হইয়া সে দর্পণের পশ্চাতে যায়—পায় না কোথায় পলাইযাছে—আবার সম্মুখে আবার পশ্চাতে অবিরত ঘুরিতে থাকে। সারমেয় যে ভ্রমে প্রতারিত, বানর ও শিশুকে দর্পণ সমক্ষে পরীক্ষা কর, দেখিবে, তাহারাও সেই ভ্রমে প্রতারিত হইবে। কলিকাতা মহামেলায় দর্পণাগারে কত বয়স্ক নরনারী এইরূপে প্রতারিত হইয়াছে।

ক্রমে বালবুদ্ধি স্ফুটতর হইল। সে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। সে হাত তুলিলে দর্পণগত বালক হাত তুলে, পা তুলিলে পা তুলে, হাসিলে হাসে, মুখ বিকৃত করিলে মুখ বিকৃত করে। এই সকল দেখিয়া সে প্রথমে ভাবিয়াছিল, দর্পণগত বালক তাহাকে অনুকরণ করে, ক্রমে বুঝিল, দর্পণ-গত প্রতিবিম্ব তাহারই প্রতিকৃতি মাত্র। দর্পণে আপন প্রতিকৃতি দেখা যায়, একথা যখন সে বুঝিয়াছে, তখনও তাহার ভ্রমের শেষ ঘটে নাই। প্রতিকৃতি কি? এ গূঢ় রহস্যের মীমাংসা সে করিতে পারে না—কাচ কি কাচেরগুণ কি, সে জানে না। অথচ কাচে আপন প্রতিকৃতি দেখা যায়, সে বুঝিয়াছে। তখন আপনার দ্বিতীয়ে তাহাকে অগত্যা বিশ্বাস করিতে হইল—

প্রতিকৃতি তাহারই অনুরূপ, তাহারই মত সত্বাবলম্বী, তাহারই মত জীবন্ত, তাহারই মত নড়ে চড়ে, তাহারই মত কথা বলে, তাহারই মত উঠে বসে, খায় দায়। মানুষ একটী নহে দুইটী, তুমি সাধারণতঃ তাহাকে একটী বলিয়া দেখিতেছ, কিন্তু তোমার অলক্ষিতে তাহার আর একটী সত্বা আছে, দর্পণে তাহা দেখা যায়।

বনবাসী বর্ব্বর তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া করপুটে জলপান করিতে যখন স্বচ্ছসলিলা নির্ঝরিণী পার্শ্বে দণ্ডায়মান হয়, তখন জলমধ্যে আপন প্রতিকৃতি দেখিতে পায়। সভ্য-সামাজিকের সন্তান দর্পণের পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইয়া যে ভ্রম করে, যে পরীক্ষা করে, যে জ্ঞানলাভ করে, অসভ্য বনবাসী নির্ঝরিণী পুলিনে দাঁড়াইয়া সেই ভ্রমে পতিত হয়, সেইরূপ অঙ্গভঙ্গি করে, শেষে সভ্য শিশুর মত সেও আপন দ্বিতীয়ে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয়। সভ্যশিশু কাচেরগুণ জানে না—অসভ্য বনবাসী স্বচ্ছ সলিলের গুণ বুঝে না, উভয়ের বুদ্ধি ও অজ্ঞানতা সমান। বৈসাদৃশ্য অনুভব শক্তি উভয়েরই দুর্ব্বল—উভয় সমভাবে প্রতিরূতির মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করে।

দর্পণে বা স্বচ্ছ সলিলের ন্যায় ভানুকিরণে ধরিত্রী-বক্ষে সকলেই আপন আপন প্রতিকৃতি দেখিতে পায়। ছায়া প্রত্যেকের অনুরূপ, আমারই মত হস্তপদবিশিষ্ট, ধনুর্ব্বাণধারী, গমনশীল, ভোজনপটু, আমি ছুটিলে ছুটে, আমি বসিলে বসে, দাঁড়াইলে দাঁড়ায়, শয়ন করিলে শয়ন করে। ছায়া আমার অনন্যকর্ম্মা সহচর। আমি যাহা করি, সে তাহাই করে, আমি যেখানে যাই সে সেখানে যায়। কেবল নিবিড় জঙ্গলে তাহার দেখা পাই না, কিন্তু জঙ্গল ছাড়িয়া প্রান্তরে আসিলেই সে সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জুটে। জঙ্গল মধ্যে সে সঙ্গে আসিয়া না থাকিলে এখানে আসিতে পারিত না, তবে আমার মতন কণ্টকীবন পথে পথে হাঁটিয়া আসিয়াছে, কি গাছের ডালে ডালে আসিয়াছে, সে কথা আমি জানি না। আর রাত্রিতে যখন নিদ্রা যাই, তখন তাহাকে পার্শ্বে দেখি না।

আমি যখন ঘুমাইয়া থাকি, তখন কত দিন দেখিয়াছি, আমি জঙ্গলে শীকার করিতেছি, আমার শত্রুর সহিত বিবাদ করিতেছি, আত্মীয় স্বজনের সহিত আমোদ আহ্লাদে ব্যাপৃত আছি, স্থানান্তরে বনান্তরে বা দেশান্তরে। আমিত এইখানে শুইয়া ছিলাম, জাগিবা মাত্রই দেখিতেছি, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সেও বলে এই কুটীর, এই বৃক্ষতল, এই নির্ঝরিণী-কণবাহী সমীর-সেবিত শষ্পশয্যা হইতে তাহারা এক নিমেষ জন্য আমাকে স্থানান্তরিত হইতে দেখে নাই। অথচ আমি যে এতক্ষণ স্থানান্তরে কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত ছিলাম, সে আমি নিজেই জানি। আমি এখানে, আমি সেখানে, উভয়ই সত্য—বুঝিলাম আমি এখানে ছিলাম, আমার দ্বিতীয় আমার প্রতিকৃতি স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছিল। আমি এখানে নিদ্রিত নিস্পন্দ পড়িয়াছিলাম, আমার সদা জাগ্রত কর্ম্মশীল প্রতিকৃতি স্থানান্তরে কার্য্য করিতেছিল। আমার প্রতিকৃতি আমার মত হইলেও আমা অপেক্ষা কর্ম্মঠ, আমা অপেক্ষা সত্বাশালী, প্রতিকৃতিই আমার সার অংশ, প্রতিকৃতিই আমার প্রাণ।

নিদ্রাবস্থায় আমার চৈতন্য থাকে না।

আমি মড়ার মত পড়িয়া থাকি। নিদ্রা ও মৃত্যুতে প্রভেদ কি? নিদ্রা স্বল্পক্ষণ স্থায়ী, মৃত্যু অধিকক্ষণ স্থায়ী। মূর্চ্ছাদি রোগে লোক মরিয়া যায়, দুদণ্ড চারি দণ্ড দুদিন চারিদিন পরে আবার বাঁচিয়া উঠে। কিছু বেশী দিন পরে বাঁচিলে বলে সে মরিয়াছিল, তবে কোথায় যে পুনর্জ্জাগরিত হয়, সকল সময় জানা যায় না। দেহ নষ্ট হয়, হইলইবা দেহ ত সার পদার্থ নহে, দ্বিতীয় আছে, দ্বিতীয়টী সারতর! বনের জঙ্গলে, নদীর জলে, মৃত্যুবৎ নিদ্রায় প্রতিকৃতি নষ্ট হয় না, নিদ্রাবৎ মৃত্যুতেও সে বিনাশ পায় না। দেখিয়াছি, নিদ্রাবস্থায় আমার প্রতিকৃতি যেমন স্থানান্তরে চলিয়া যায়, তেমনি পিতা মাতা পিতামহ প্রভৃতি আমার সহিত ঘুরিতে ফিরিতে, আমোদ আহ্লাদ করিতে, কথা বার্ত্তা কহিতে, পরামর্শ বা উপদেশ দিতে আমার কাছে আসিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের দেহ কবরসাৎ করিয়াছি, শ্মশানে ভস্ম করিয়াছি, অস্থি কয়েক খানি মঞ্চোপরে বা তরু শাখে বিলম্বিত রহিয়াছে। সারল প্রতিকৃতি অনলে দগ্ধ হয়না, জলে ডুবেনা, মাটীতে চাপা থাকে না। আমাদিগের সহিত আমাদিগের প্রতিকৃতির বৈসাদৃশ্য এতটুকু। নতুবা প্রতিকৃতি আমাদিগের মত শরীরী, প্রতিকৃতি আমাদিগের ন্যায় হস্ত পদ বর্ণ বিশিষ্ট, মায়া মমতা আছে, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের প্রয়োজন হয়।

এইরূপে পিতৃ পূজার সৃষ্টি। ঐহিক জীবনে যাহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়াছি, যাহাদিগের আহার্য্য ও পরিধেয় যোগাইয়াছি, প্রতিকৃতিময় জীবনে কিরূপে তাঁহাদিগকে অশ্রদ্ধা করিব? কি বলিয়া ভোজ্য পানীয় পরিধেয়ের সঞ্চয় করিয়া না দিব? মনুষ্য যে অবস্থায় বাস করুক্ না কেন, ক্ষুধা তৃষ্ণা চিরদিন অবশ্যম্ভাবী, পরিহার করিবার সাধ্য নাই। দেহময় মনুষ্যও মনুষ্য, প্রতিকৃতিময় মনুষ্যও মনুষ্য, অমানুষী মনুষ্য বর্ব্বরের কল্পনা করিবার সাধ্য নাই, সভ্যেরও কি হইয়াছে? যাহা হউক, সাদৃশ্য অনুভবে প্রতিকৃতিময় মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। বৈসাদৃশ্য অনুভবে বর্ব্বরেরা প্রতিকৃতিময় পিতৃপুরুষের অধিকতর বল, অধিকতর ক্ষতি করিবার ক্ষমতা, অজ্ঞাত ভাবে ক্ষতি করিবার শক্তি ও দীর্ঘতর জীবন আরোপ করিয়া থাকে। প্রথম দেব সৃষ্টি, ভয় বা প্রেমজনিত মনিষীগণ বিচার করিয়াছেন। আদিম মানব-সমাজে প্রেম অপেক্ষা ভয়ের আধিক্য অধিক প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রীতি অপেক্ষা কলহ অধিক, সাম্য অপেক্ষা অসাম্য অধিক, শান্তি অপেক্ষা সামরিক প্রবৃত্তিনল বহুতর। বর্ব্বরগণ দেবতাকে তত ভালবাসেনা, যত ভয় করে, তত উপকার চাহেনা, অপকার হইতে অব্যাহতি যত আকাঙ্খা করে। অসভ্যের রাজা নিষ্ঠুর অত্যাচারী, প্রজাবাৎসল্য জানে না, অসভ্যের দেবতা হিংস্রক ভয়ঙ্কর, প্রেমময় নহে। বর্ব্বর পিতার স্নেহ অপেক্ষা কঠোরতা অধিক, আদর অপেক্ষা শাসন বেশী। তিনি যত পালনকর্ত্তা, তত সুখবিধাতা নহেন। প্রতিকৃতিময় পিতৃপুরুষে সেই সকল গুণ বিদ্যমান, ভয়ে ভয়ে অসভ্যেরা ভোজ্য পানীয় পরিধেয় উৎকোচ দিয়া প্রতিকৃতিময় পিতৃপুরুষের পূজা করে। (ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

রমণী।

১

রমণি রে সৌন্দর্য্যে তোমার,
সকল সৌন্দর্য্য আছে বাঁধা।
যেন বিধাতার দৃষ্টি জড়িত প্রকৃতি সনে,
দেব প্রাণ বেদ-গানে সাধা।

২

সৌন্দর্য্যের মেরু-দণ্ড তুমি,
শৃঙ্খলা দাঁড়ায়ে তোমা'পরে।
তপনের রশ্মি বলে চলে যথা গ্রহ-গণ,
তালে তালে গেয়ে সম-স্বরে।

৩

তোমারি ও লাবণ্য-ধারায়,
কালের মঙ্গল পরকাশ।
অসম্পূর্ণ এ সংসারে তুমি পূর্ণতার দীপ্তি,
মেঘ-ঘোরে স্বর্গের আভাস।

৪

প্রাণান্তক জীবন-সংগ্রামে,
তুমি বিধাতার আশীর্ব্বাদ।
নিত্য-জয়-পরাজয়ে পাছে পাছে ফিরিতেছ,
অঞ্চলে লইয়া সুখ-সাধ।

৫

বিধাতার মহাকাব্য তুমি,
সসীমে অসীমে সম্মিলনী।
ঘরে ঘরে কোটি যোগী—কোটি কবি সিদ্ধকাম,
তোমা-মাঝে পেয়ে প্রতিধ্বনি।

৬

স্বর্গ-চ্যুত, নরক-উত্থিত,
নিয়তি-তাড়িত—নর-মতি
ভুলে গেছে জন্মগত সে অতৃপ্তি, উদ্দামতা,
পেযে তব প্রেমের আরতি।

৭

দেবতারা স্বর্গ হ'তে নামে,
লভিতে তোমার ভালবাসা।
হেন ত্রিভুবন-ঘেরা সুধাসিন্ধু নাই বুঝি,
ব্রহ্মাণ্ডের জুড়াতে পিপাসা।

৮

নিজ করে গড়ি ও প্রতিমা,
নিজে বিধি মুগ্ধ-নেত্রে চাহি!
স্বর্গের স্খলিত-ধরা আবার উঠিছে স্বর্গে,
ও দেহে হৃদয়ে অবগাহি।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (৫১)

শ্রীরূপ সঙ্গোৎসব।

জগন্নাথের রথযাত্রায় গুণ্ডিচা স্থিতি, রাধাকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র মিলনাভিনয় স্মরণ করিয়া মহাপ্রভুর ভাবপ্রবণ হৃদয় পূর্ব্বোদ্ধৃত আদি রসের শ্লোকাবৃত্তি করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছিল। সুচতুর রূপ তাহা বুঝিতে পারিয়া এই শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

পরদিন রূপ সমুদ্র স্নানে গিয়াছেন, শ্রীচৈতন্য হরিদাসের বাসায় আসিয়া উর্দ্ধে চাহিতে হঠাৎ তালপত্রে সেই শ্লোক দেখিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। রূপ স্নানান্তে আসিয়া তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। চৈতন্য তাঁহার পৃষ্ঠে প্রেমের চাপড় মারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

'আরে! তুই আমার মনের ভাব কেমন করিয়া জানিলি?' এবং ঐ শ্লোক স্বরূপকে দেখাইয়া বলিলেন 'বল দেখি রূপ আমার মনের কথা কেমন করে টের পাইল?'

স্বরূপ উত্তর করিলেন "তোমার কৃপায়।" শ্রীচৈতন্য বলিলেন, প্রয়াগের প্রথম পরিচয়েই বুঝিয়াছিলাম, ইনি খুব উচ্চ প্রকৃতির লোক, যোগ্যপাত্র বিবেচনায় আমি ইঁহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছি। তুমিও তাঁকে রস শাস্ত্রের নিগূঢ়তত্ব সকল বলিয়া দিও।

শ্রীরূপ গোস্বামী বাসায় বসিয়া আপন অভিলষিত নাটক লিখিতেছেন। হঠাৎ শ্রীচৈতন্য আসিয়া 'কি পুঁথি লিখিতেছো?' বলিয়া একটী পাতা তুলিয়া লইলেন। রূপের হস্তাক্ষর মুক্তা-পংক্তির ন্যায় পরম সুন্দর। গৌর দেখিয়া বড় সুখী হইলেন এবং ভাবাবেশে অক্ষরের স্তুতি করিতে লাগিলেন। অক্ষরের বিষয়, শ্লোক দেখিয়া তাঁহার প্রেমাবেগ আরও উথলিয়া উঠিল; তিনি পড়িতে লাগিলেন,—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলি লব্ধযে
কর্ণ ক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নোজানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।"

জানিনা 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ কত অমৃত দিয়া গঠিত হইয়াছে? যখন ইহা রসনায় নৃত্য করিতে থাকে, তখন রসনাশ্রেণী লাভের জন্য বাসনা হয়। যখন কর্ণরন্ধ্রে অঙ্কুরিতা হয়, তখন দশকোটি কর্ণলাভের স্পৃহা বলবতী হয়, এবং চিত্তপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলে সকল ইন্দ্রিয় ব্যাপার স্তম্ভিত হয়।

শ্রীচৈতন্য নামানন্দে বিভোর হইলেন, হরিদাস নাচিতে লাগিলেন এবং শত মুখে শ্লোকের প্রশংসা করিয়া বলিলেন 'এমন নাম মাহাত্ম্য তো কখন শুনি নাই।' গৌর উঠিয়া যাইবার সময় রূপকে ইসারায় বলিলেন, "রূপ! কৃষ্ণকে ব্রজ হইতে বাহির করিও না, কৃষ্ণ কখন ব্রজ ছাড়িয়া অন্যত্র যান্ না। যদুবংশ সম্ভূত কৃষ্ণ অন্য ব্যক্তি; কিন্তু ব্রজেন্দ্র নন্দন কখন বৃন্দাবন ছাড়েন না।"

শ্রীচৈতন্য চলিয়া গেলে রূপ বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন 'পূর্ব্বে সত্যভামা দেবী স্বপ্নে দুই নাটক করিতে অনুমতি দিয়াছেন, এখন দেখিতেছি, প্রভুর আজ্ঞাও তাহাই। আগে দুই নাটকের একত্র রচনা করিয়াছি। যাহা হউক, এখন দুই নান্দী, দুই প্রস্তাবনা ও দুই সংঘটনা পৃথক রচনা করিব।" এইরূপে রূপ গোঁসাই নাটক রচনায় গাঢ় মনোযোগ করিলেন।

একদিন শ্রীচৈতন্য, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, রামানন্দ রায়, স্বরূপ, অদ্বৈত, গদাধর, নিত্যানন্দ প্রভৃতি বহুবিধ ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লইয়া হরিদাসের কুটীরে আসিয়া সভা করিয়া বসিলেন। রূপ ও হরিদাস পিঁড়ার নীচে উপবেশন করিলে গৌর তাঁহার হৃদয়ানুবাদের শ্লোকটী পড়িয়া শুনাইতে রূপকে আদেশ করিলেন। রূপ লজ্জায় মৌনী হইলে স্বরূপ গোঁসাই সেই শ্লোক ভক্তবৃন্দকে শুনাইয়া সুখী করিলেন। শ্রীচৈতন্য রূপকে নাটকের নাম মাহাত্ম্যের শ্লোক পড়িতে আদেশ করিলে রূপ তাহা প্রতিপালন করিলেন। ভক্তগণ শ্লোক শুনিয়া রূপের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। রামানন্দ রায় জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি কোন গ্রন্থ রচনা করিতেছো?' স্বরূপ রূপের হইয়া উত্তর করিলেন 'হাঁ, পুরলীলা, ব্রজলীলা বিষয়ক কৃষ্ণলীলাত্মক নাটক লিখিতেছিলেন, প্রভুর আজ্ঞায় এখন গ্রন্থ খানিকে দু'ভাগ করিয়া ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নামে দুইখানি

প্রেম রসপূর্ণ উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিতেছেন। রায় কহিলেন 'নান্দী শ্লোক পড় দেখি শুনি।'

রূপ তাহা পড়িলেন। রামানন্দ রায় একে একে প্রশ্ন করিয়া গ্রন্থের অনেকাংশ শুনিয়া লইলেন। শ্রীরূপ গৌরের অনুমতি লইয়া মধুরভাষায় পাত্র সন্নিবেশ, প্ররোচনা, প্রেমোৎপত্তি,পূর্ব্বানুরাগ, বিকার-চেষ্টা, প্রণয় পত্রিকা, ভাবের স্বভাব,সহজ প্রেমের প্রকৃতি, মুরলী-নিস্বন, ও দ্বিতীয় গ্রন্থের নান্দী প্রভৃতি অংশ আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিয়া সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করিলেন এবং অবশেষে অতি বিনীতভাবে রামানন্দ রায়কে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন :—কোথায় সূর্য্য সম আপনি, আর কোথায় ক্ষুদ্র খদ্যোতিক আমি। আপনার আগে যে ধৃষ্টতা করিয়া মুখ ব্যাদান করিলাম, অনুগ্রহ করিয়া সে অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে।

রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্বিতীয় নাটকের পাত্র সন্নিবেশের অংশ বল দেখি। 'কলানিধি নাচিতে নাচিতে রঙ্গভূমি মধ্যে কিরাত-রাজের প্রাণ সংহার করিয়া যথা সময়ে তারার পাণিগ্রহণ করিবেন' শ্লোক আবৃত্তি করিয়া রূপ কহিলেন, এ শ্লোক দ্ব্যর্থ। ইহাতে অব্যক্ত ভাবে নাটকের বিষয় সূচিত হইয়াছে। ইহার নাম উদ্‌ঘাত্যক প্রস্তাবনা। রামানন্দ রায় তখন শ্রীচৈতন্যকে বলিতে লাগিলেন 'সহস্রমুখে রূপের কবিতার প্রশংসা করিতে হয়। অমৃতধারার ন্যায় ইহাতে কি মধুর প্রেমপারিপাট্যই বর্ণিত হইয়াছে। সে কবি কবিই নয়, আর সে ধানুকী বীরই নয়, যাঁহাদের কাব্য রচনা ও শরনিক্ষেপ পরহৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া তাহার মাথা না ঘুরাইয়া দেয়। রূপের কবিতা উহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছে।' রূপকে বলিলেন, 'আচ্ছা রূপ! একবার তোমার নাটকদ্বয়ে ইষ্টদেব বন্দনা শুনাও দেখি?'

রূপ এবার মুস্কিলে পড়িলেন ও মাথা হেঁট করিয়া নীরবে থাকিলেন। গৌর বলিলেন, 'লজ্জা কি? বৈষ্ণব-সমাজে গ্রন্থের ফল শুনাইবে, এত তোমার সৌভাগ্য! রূপ অগত্যা পড়িলেনঃ—

"পূর্ব্বে যে মধুর রস জগতে আর কখন প্রদত্ত হয় নাই, সেই নিজ ভক্তিসম্পদ্ প্রদান করিবার জন্য যিনি কৃপা করিয়া কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ও যাঁহার অঙ্গকান্তি সুবর্ণকান্তি হইতেও সুন্দর, সেই শচীনন্দন হরি তোমাদের হৃদয় কন্দরে প্রকাশিত হউন্।'

এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই গৌর রোষাবেশে বলিয়া উঠিলেন—'আর না, ঢের হইয়াছে। হায়! কৃষ্ণরস কাব্য সুধাসিন্ধুর নির্ম্মল জলে অতিস্তুতিরূপ ক্ষারজল কেন মিশাইয়া ফেলিয়াছ? ইহাতে সব যে নষ্ট হয়ে গেল।'

রামানন্দ রায় হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন—'না, তা কেন হবে? রূপের অমৃত সুধারস কবিতার মধ্যে এক বিন্দু কর্পূর-কণা প্রদত্ত হয়েছে বইতো নয়? ইহাতে আস্বাদনের আরও ঔৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে।"

গৌর সেইরূপ বিরক্তির সহিত বলিলেন, 'ছি! ছি! ইহাতেও তোমার আনন্দ? এ যে উপহাসের কথা। কোথায় লজ্জিত হইবে, না আনন্দ প্রকাশ করিতেছ?

রামানন্দ উত্তর করিলেন 'অভীষ্টদেবের বন্দনা কে না করিয়া থাকে? আপনি ইহাতে এত আশঙ্কাই বা কেন করিতে-

ছেন? ইষ্টদেবতাকে কি কেহ কৃষ্ণ হইতে স্বতন্ত্র মনে করিতে পারে?

গৌর নীরব হইলেন। ভক্তগণ বলিয়া উঠিলেন, 'আমরা রূপের কবিতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। রামরায় গৌরকে বলিলেন, 'রূপ তোমার শক্তি পাইয়াছে, তাই এসব রসলীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হইয়াছে।'

গৌর। তোমরা সকলে কৃপা করিয়া ইহাকে বর দাও, যেন ইনি প্রেমরসপূর্ণ ব্রজলীলা বর্ণন করিতে সমর্থ হন্। ইহার জ্যেষ্ঠভাই সনাতনের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তি চক্ষে দেখা যায় না। তোমার ন্যায় তাঁহার বৈরাগ্য, পাণ্ডিত্য ও দৈন্য। ইহাদের দুই ভাইকে আমি বৃন্দাবনে ভক্তিশাস্ত্র প্রচার করিতে নিযুক্ত করিয়াছি।

রাম রায়। আপনার যখন ইচ্ছা হয়েছে, অবশ্যই তাহা পূর্ণ হইবে।

গৌর তখন রূপকে একে একে সকল ভক্তের পাদবন্দনা করিতে বলিলে রূপ তাহাই করিলেন।

সভাভঙ্গ হইল, ভক্তগণ বিদায় হইয়া গেলে হরিদাস রূপকে বলিলেন 'তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। যে সব তত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছ, তাহা অতি দুর্ল্লভ।'

রূপ বলিলেন 'আমি সামান্য ব্যক্তি। আমি কি জানি? মহাপ্রভুর প্রেরণায় যে কিছু বলিতে পারি।'

চারিমাস পরে গৌড়দেশের ভক্তমণ্ডলী চলিয়া গেলে, রূপ গোঁসাই দোলযাত্রা পর্য্যন্ত নীলাচলে থাকিয়া শ্রীচৈতন্যের সহিত জগন্নাথের দোলযাত্রা দর্শন করিলেন। ইহার পর চৈতন্যদেব রূপকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'বৃন্দাবনে যাও; দুই ভাই মিলিত হইয়া ভক্তি রস-শাস্ত্র প্রচার, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার ও কৃষ্ণ সেবা করিও। আমার একবার তথায় যাইবার ইচ্ছা আছে। আর সনাতনকে একবার এখানে পাঠাইয়া দিও।' রূপ গোঁসাই গৌরকে প্রণাম বন্দনা করিয়া হরিদাস ও অন্যান্য ভক্তগণের নিকট বিদায় লইয়া নীলাচল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বঙ্গদেশ দিয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

ছোট হরিদাসের দণ্ড।

শতানন্দ খাঁ নামে একজন লোক অতিশয় বিষয়াসক্ত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভগবান্ আচার্য্য বিষয় বিমুখ বৈরাগ্যপ্রবণ চিত্ত। পিতার অযথা বিষয়-পিপাসা দেখিয়া ভগবান্ বিরক্ত হইলেন এবং বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়া নীলাচলে যাইয়া শ্রীচৈতন্য চরণে আত্ম সমর্পণ করিলেন। ভগবান্ পরম বৈষ্ণব ও সুপণ্ডিত, সুতরাং ক্রমে স্বরূপ গোস্বামীর সঙ্গে তাঁহার প্রগাঢ় সখ্য জন্মিল। মহাপ্রভু ভগবান্‌কে বিশেষ কৃপা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সদ্‌গুণের মধ্যে ভগবান্ অতি সুপাচক ছিলেন। মাঝে মাঝে নানা সুস্বাদু ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। ভগবানের কনিষ্ঠ সহোদরের নাম গোপাল ভট্টাচার্য্য। ইনি কাশীতে বেদান্ত পাঠ সমাপন করিয়া পুরুষোত্তমে জ্যেষ্ঠের নিকট আগমন করিলেন। ভগবান্ ভাইকে পাইয়া খুব সুখী হইলেন এবং শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত করিয়া দিয়া দুই একটী বেদান্ত প্রসঙ্গ করিতে বলিলেন। গোপালের শারীরিক ভাষ্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া চৈতন্যদেব হৃদয়ে সুখ পাইলেন না; কিন্তু ভগবানের

খাতিরে মুখেও কিছু প্রকাশ না করিয়া গোপালকে মিষ্ট কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। অন্যদিনে ভগবান্ আচার্য্য স্বরূপ গোঁসাইকে বলিলেন 'এসো আজ সকলে মিলে গোপালের নিকট বেদান্ত ভাষ্য শুনিগে। গোপাল কাশী থেকে বড় সুশিক্ষিত হয়ে এসেছে।'

স্বরূপ গোঁসাই প্রণয়কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন "গোপালের সঙ্গে থেকে দেখ্‌ছি তোমার বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েছে, তাই মায়াবাদ ভাষ্য শুনিতে কৌতুক হয়েছে। মায়াবাদটা কি, তা কি জান না? তুমি আমি সকলই ব্রহ্ম, কৃষ্ণ যে সকলের সেব্য, তা তাতে নাই। এহেন মায়াবাদ শুনে শেষে কি পরমার্থ খোয়াবে?

ভগবান্ উত্তর করিলেন, 'আমাদের কৃষ্ণগত প্রাণ, আমাদের মন কি শারীরিক ভাষ্য ফিরাইতে পারে?"

স্বরূপ বলিলেন তথাচ মায়াবাদ শ্রবণ বৈষ্ণবের নিষিদ্ধ। জীব-জ্ঞান কল্পিত, ঈশ্বরে অজ্ঞান, এসব কথা শ্রবণার্হ নয়।

ভগবান্ লজ্জায় অধোবদন হইলেন। দিন দুই পরে গোপাল দেশে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর একদিন ভগবান্ আচার্য্য শ্রীচৈতন্যকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং নানাবিধ তরকারী পাক করিয়া ছোট হরিদাসকে বলিলেন, 'তুমি শিখি মাইতির ভগিনীর নিকট এক মণ উত্তম আতপ চাউল ভিক্ষা করিয়া আনগে। তাঁহাকে বলিও, প্রভু ঐ চাউলের অন্ন ভোজন করিবেন।'

ছোট হরিদাস শ্রীচৈতন্যের একজন কীর্ত্তনীয়া, সুমিষ্ট কীর্ত্তনে প্রভুর চিত্ত-বিনোদন করিত এবং তাঁহার বাসায় অবস্থিতি করিত।

শিখি মাইতির ভগিনীর নাম মাধবী দেবী। তিনি বৃদ্ধা তপস্বিনী ও পরম বৈষ্ণবী। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং অনেক সময়ে তাঁহাকে শ্রীরাধিকার পরিচারিকার মধ্যে গণনা করিয়া বলিতেন, জগতের মধ্যে সাড়ে তিনজন মাত্র শ্রীরাধিকার প্রিয়পাত্র, স্বরূপ, রামানন্দ ও শিখি মাহিতী এবং অর্দ্ধেক তাঁহার ভগিনী। যাহা হউক, সরলমতি হরিদাস চাউল আনিয়া দিলে অন্ন পাক হইল। শ্রীচৈতন্য ভোজনে বসিয়া অন্নের রূপ দেখিয়া ও সুগন্ধ লইয়া খুব আনন্দিত হইয়া আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এমন উত্তম তণ্ডুল কোথায় পেয়েছো?' আচার্য্য উত্তর করিলেন, 'মাধবী দেবীর কাছে ভিক্ষা করিয়া আনাইয়াছি।' শ্রীচৈতন্য পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, 'কে ভিক্ষা আনিতে গিয়াছিল?' আচার্য্য ছোট হরিদাসের নাম করিলেন। শ্রীচৈতন্য আর কিছু প্রকাশ না করিয়া ভোজন করিলেন এবং বাসায় আসিয়া গোবিন্দকে বলিয়া দিলেন, 'আজ হইতে হরিদাসকে এখানে আসিতে দিও না।' গোবিন্দ প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিল। ছোট হরিদাসের গৌরাঙ্গ দর্শনে যাওয়া বন্ধ হইল। সরলমতি কীর্ত্তনীয়া তাহার অপরাধ কি, বুঝিতে না পারিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইল এবং তিন দিন অনাহারে থাকিয়া গৌরবিরহে দগ্ধ হইতে লাগিল।

স্বরূপাদি শ্রীচৈতন্যের নিকটে যাইয়া বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, 'প্রভু! হরিদাস কি অপরাধ করিয়াছে যে, তাহার জন্য দ্বার নিষিদ্ধ হইয়াছে, বেচারা তিন দিন পর্য্যন্ত উপবাসী আছে।'

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন, "গৃহত্যাগী

বৈরাগী হইয়া যে প্রকৃতি সম্ভাষণ করে, আমি তাহার মুখ দেখিতে চাই না। জাননা কি আমাদের ইন্দ্রিয় সকল কেমন দুর্ব্বার, তাতে আবার স্ত্রীসঙ্গ। কাষ্ঠ-নির্ম্মিত স্ত্রীমূর্ত্তিও মুনিজনের মন টলাইয়া দিতে শুনা গিয়াছে। অন্য স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, বৈরাগীর পক্ষে মাতা, ভগিনী কিম্বা কন্যার সঙ্গেও নির্জ্জনে থাকা উচিত নয়। এই সব ক্ষুদ্রপ্রাণী লোক নির্ম্মল বৈরাগ্য ধর্ম্মে কলঙ্ক দিতে বসিয়াছে, তাই মর্কট বৈরাগ্যের ছলনায় স্ত্রী-সম্ভাষণ করিয়া ইন্দ্রিয় চালনার সুবিধা করিয়া লইতেছে।"

শ্রীচৈতন্য সঙ্গীদের উত্তর দিবার অবকাশ না দিয়া রোষভরে গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন।

অন্যদিনে অবসর পাইয়া বন্ধুগণ শ্রীচৈতন্যকে হরিদাসের জন্য নিবেদন করিলেন "তাহার বিলক্ষণ শিক্ষা হয়েছে। আর এমন কর্ম্ম করিবে না। আপনি প্রসন্ন হউন্।"

গৌর পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ়তা ব্যঞ্জকস্বরে উত্তর করিলেন, 'কি করিব বল? আমার নিজের মন আমার বশ নয়। প্রকৃতি সম্ভাষী বৈরাগীকে সে দেখিতে চায় না। তোমরা নিজ নিজ কর্ম্ম করগে, একথা ছাড়িয়া দাও। পুনরায় একথা তুলিলে আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না।"

ইহা শুনিয়া বৈষ্ণবগণ কাণে হাত দিয়া উঠিয়া গেলেন। এবারে সকলে যুক্তি আঁটিয়া পরমানন্দ পুরীকে ধরিলেন। পুরী গোঁসাই আসিয়া মহাপ্রভুর বাসায় উপস্থিত, প্রভু প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, 'কি জন্য আগমন হয়েছে? দাসের প্রতি কি আজ্ঞা?" পুরী একেবারেই বলিয়া বসিলেন, হরিদাসকে প্রসন্ন হও। একথা শুনিয়া চৈতন্যের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি বলিলেন, "গুরুদেব। আপনি এই সব বৈষ্ণব লইয়া এখানে থাকুন, আমাকে আজ্ঞা দিন, কেবল মাত্র গোবিন্দকে সঙ্গে লইয়া আমি আলাল-নাথে চলিয়া যাই।" এই বলিয়া গোবিন্দকে ডাকিয়া শ্রীচৈতন্য গমনোন্মুখ হইলেন। পুরী গোঁসাই মহা ফাঁফরে পড়িলেন এবং আস্তেব্যস্তে গৌরকে ফিরাইয়া বলিলেন, "তোমার যা ইচ্ছা কর, তোমাকে কে চালাইতে পারে? লোকের হিতের জন্য তুমি যাহা করিবে, আমাদের সাধ্য কি যে তাহার মর্ম্মাবধারণ করিতে পারি?"

তখন স্বরূপাদি ভক্তগণ নিরাশ্বাস হইয়া হরিদাসের নিকট যাইয়া বুঝাইতে লাগিলেন, "শুন ভাই হরিদাস। আমরা যে তোমার বন্ধু, তাহা বিশ্বাস কর। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও মহাপ্রভুর মনের গতি ফিরা-ইতে পারিলাম না। ইহার উপর তুমি যদি রাগ করিয়া থাক, তবে আরও বিপদ বাড়িবে। অতএব স্নান ভোজন করিয়া এখন সুস্থ হও। সময়ে সব চুকিয়া যাইবে।"

হরিদাস স্নান ভোজন করিয়া শাপান্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। যখন শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ মন্দিরে, বা সমুদ্র স্নানে যাইতেন অথবা অন্য কোন কারণে বাহির হইতেন, হরিদাস দূরে দণ্ডায়মান হইয়া প্রণাম করিত এবং একদৃষ্টে তাঁহার পানে তাকাইয়া থাকিত। চৈতন্যদেব কিন্তু, ফিরিয়াও চাহিতেন না। গৌরের অন্তঃকরণ প্রেমময় হইলেও কর্ত্তব্য-পালন সময়ে অযথা স্নেহে তিনি কখনই দ্রবীভূত হইতেন না। ইহার প্রমাণ আমরা তাঁহার জীবনে ভূয়োভূয়ঃ

দেখিয়াছি। হরিদাসের প্রতি যে তাঁহার আন্তরিক ভালবাসা ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না; কিন্তু মণ্ডলীর হিতের জন্য ও লোক শিক্ষা নিমিত্ত তাঁহাকে এই কঠোরভাব অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। পাছে পবিত্র বৈরাগ্যের নামে কলঙ্ক দিয়া লোক সকল কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত হইয়া পড়ে, এই ভয় তাঁহাব মনে সর্ব্বদা জাগরুক ছিল। এবং তাহাই নিবারণ করিতে রাজ দর্শন ও প্রকৃতি সম্ভাষণ বিষয়ে তাঁহাকে এত কঠোর নিয়ম অবলম্বন কবিতে হইয়াছিল। এই সব নিযম সত্ত্বেও ছোট হবিদাসেব ঘটনাব ন্যায় মধ্যে মধ্যে যে দুই একটা ঘটনা ঘটিত, ইহাই আশ্চর্য্যেব বিষয়। যাহাহউক, হরিদাসেব দণ্ড দেখিয়া সঙ্গীগণ বড়ই ভীত হইল। এবং সে সময়ের জন্য কেহ আর স্বপ্নেও স্ত্রীব ছায়া স্পর্শ করিত না।

দেখিতে দেখিতে হবিদাসেব এক বৎসব কাটিয়া গেল। তবুও শ্রীচৈতন্যের হৃদয়ে দয়াব আবির্ভাবেব কোন লক্ষণ দেখা গেল না। হরিদাস নির্ব্বেদে, দুঃখে ও অনুতাপে ফাটিয়া যাইতে লাগিলেন। বর্ষান্ত পূর্ণ দিনের বজনী শেষে বিশ্বাসী হরিদাস মনে মনে এক অলৌকিক সঙ্কল্প করিয়া ক্ষেত্র হইতে চলিয়া গেলেন এবং প্রয়াগে যাইয়া জন্মান্তরে গৌর পদলাভ কামনা কবিয়া ত্রিবেণী প্রবেশান্তর জীবন পরিত্যাগ করিলেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়া ছেন যে, মরণান্তে তিনি দিব্যদেহ লাভ করিয়া মহাপ্রভুর নিকটে অন্তর্দ্ধর্শনে থাকিলেন এবং অন্যেব অজ্ঞাতে প্রভুকে গান কবিয়া শুনাইতে লাগিলেন। শ্রীচৈতন্য ভিন্ন এসব রহস্য আর কেহ জানিতে পারিলেন না।

একদিন শ্রীচৈতন্য ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'হরিদাস কোথায়? তাহাকে লইয়া আইস।' সকলে উত্তর করিল, অভিশাপের বর্ষ পূর্ণ দিনে সে রাত্রিতে উঠিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কেহ বলিতে পারে না, শ্রীচৈতন্য শুনিয়া ঈষৎ হাসিলেন। অন্য দিনে জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ, কাশীশ্বব, দামোদর, শঙ্কর, মুকুন্দ প্রভৃতি দলবদ্ধ হইয়া সমুদ্র স্নানে গিয়া শুনিতে পাইলেন, বিস্তীর্ণ সৈকত ভূমিব দূবপ্রান্ত হইতে হরিদাসের কণ্ঠস্বরে যেন কে সুমিষ্ট সঙ্গীত কবিতেছে। তাঁহারা শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া আবও অগ্রসর হইলেন এবং শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, হবিদাসই যেন গান কবিতেছে, অথচ কাহাবও শরীর লক্ষিত হইল না। গোবিন্দাদি অনুমান কবিলেন যে, হরিদাস আত্ম গ্লানিতে বিষ খাইয়া মবিয়াছে এবং সেই পাপে ব্রহ্ম-রাক্ষস হইয়া সমুদ্রেব ধাবে ধাবে গান গাইয়া বেড়াইতেছে। স্বরূপ বলিলেন,"এ মিথ্যা অনুমান,যে ব্যক্তি আজন্ম কৃষ্ণ কীর্ত্তন ও প্রভুব সেবা কবিয়াছে এবং পুণ্যক্ষেত্র নীলাচলে দেহ রক্ষা কবিয়াছে, তাহার কি কখন অসদ্গতি হইতে পারে? এ ঘটনা এখন অতি আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার ধারণা যে ইহা নিশ্চয়ই মহাপ্রভুব ভঙ্গী। যাহা হউক, সময়ে প্রকাশ হইবে।"

হরিদাস সঙ্কল্প করিয়া যেখানে ত্রিবেণী প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেখানে আর কয়েক জন বৈষ্ণব ছিল। তাহাবা নবদ্বীপে আসিয়া ঐ বৃত্তান্ত শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে জ্ঞাপন করিয়াছিল। বঙ্গের ভক্তগণ শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বে উৎকলে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছেন। শ্রীবাসপণ্ডিত

হরিদাসের মরণ বৃত্তান্ত জানিয়া শুনিয়াও মহাপ্রভুর মন জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলেন—"হরিদাস কোথায় ?"

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন "স্বকর্ম্ম ফল-ভুক্ পুমান্।"

তখন শ্রীবাস বৈষ্ণবদিগের মুখে হরিদাসের সঙ্কল্প ও ত্রিবেণীতে প্রাণান্তের বিষয় যেমন শুনিয়াছিলেন, সকল বিবৃত করিলে শ্রীচৈতন্য প্রসন্নচিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "প্রকৃতি দর্শন করিলে বৈরাগীর পক্ষে এই বিহিত প্রায়শ্চিত্ত।"

এই সব ঘটনা হইতে স্বরূপাদি সিদ্ধান্ত করিলেন, হরিদাস দিব্যদেহে মহাপ্রভুর অন্তর্দর্শন লাভ করিয়াছে। শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

দেবতা।

১

আমি যারে ভালবাসি সেত গো দেবতা,
সে ত গো মানুষ নয়, সে ত নহে ক্ষুদ্রাশয়,
মানুষের সনে সে ত নাহি কহে কথা।
অনন্ত গগনবৎ, মহত্তের সে মহৎ,
সে জানেনা নতভাব সে শুধু উচ্চতা।
আমি যারে ভালবাসি সে ত গো দেবতা।

২

আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন,
আমি ত দেখিনি তারে, কে কবে দেখিতে পারে
মানবের আঁখি দিয়া দেবতা কেমন ?
মানুষে মানুষ দেখে, কাব্যে—কবিতায় লেখে,
সে শুধু ধ্যানের বস্তু ধ্যান করে মন।
আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন!

৩

সে ত গো দেবতা আমি যারে ভালবাসি।
শরত শশীর আলো, ফুলবনে যদি ঢালো,
হইলে হইতে পারে মানবী রূপসী!
বিজলী আঁখির ঠার, তারি বটে অহঙ্কার,
তুলনা মিলেনা সেই দেবরূপরাশি।
সে ত গো দেবতা আমি যারে ভালবাসি।

৪

সেত গো দেবতা আমি ভালবাসি যারে,
সে নহে সামান্য নারী, তাহারে কি ছুঁতেপারি ?
সে যে পূর্ণ দেবত্বের স্পর্দ্ধা অহঙ্কারে।
আলিঙ্গন চুমাচুমি, সে ত কবি আমি তুমি,
ধিক্ সে দেবত্বে যদি ছোঁয়া যেত তারে।
সে ত গো দেবতা আমি ভালবাসি যারে।

৫

আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন,
সে নহে সায়াহ্ন উষা, সে পরেনা বেশভূষা,
উন্মত্ত শ্মশান-কালী, নাহি আবরণ।
অকল্প অরূপ রূপ, কে জানে সে কোন্‌রূপ,
আমি ত জানিনা তার আছে প্রাণ মন।
আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন।

৬

আমি যারে ভালবাসি সেত গো দেবতা,
তার নাই প্রেম স্নেহ, সে নহে মানুষ কেহ,
মানুষে বুঝিবে কিসে দেবতার কথা ?
তোমরা কণার কণা, অতি ক্ষুদ্র একজনা,
তোমরা কেবল জান আদর মমতা!
আমি যারে ভালবাসি সেত গো দেবতা!

৭

সেত গো দেবতা আমি যারে ভালবাসি,
চির অমিলন তার, চিরকাল হাহাকার,
আছে তার অশ্রুজল রাশি রাশি রাশি!
মানুষ চাহেনা তাহা, পবিত্র পুণ্যের যাহা,
সে চায় বিলাস ভোগ—শুধু হাসাহাসি!
সে ত গো দেবতা আমি যারে ভালবাসি!

৮

আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন,
সে জানেনা মনে রাখা, সে জানেনা কাছে থাকা,
সে যে করে আগে আগে দূরে পলায়ন।
প্রাণ দিলে মন দিলে, তোমাদের প্রেম মিলে,
সে চাহেনা বিনিময়—কেনা-কাটা মন।
আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন।

৯

সে ত গো দেবতা আমি ভালবাসি যারে,
আমি শুধু চাহি তার, ঘৃণা-গালি-তিরস্কার,
সে যে করে অবহেলা উপেক্ষা আমারে।
আমি চাহি বার মাস, হা হুতাশ দীর্ঘশ্বাস,
অপমান অনাদর যত দিতে পারে।
সে ত গো দেবতা আমি ভালবাসি যারে।

১০

আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন,
আমি চাহি তার তরে, হৃদয়ের স্তরে স্তরে,
কালকূটে জ্বলে যেন কালান্ত দাহন।
আমি চাহি কণ্ঠভরা, শোণিত শোষণ করা
তাহার নিরাশ চিন্তা—নিশি জাগরণ।
আমি যারে ভালবাসি দেবতা সে জন!

১১

আমি যারে ভালবাসি সে ত গো দেবতা,
উদ্বেগ উৎকণ্ঠা তার, অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা আর,
প্রাপ্তিহীন চিরভিক্ষা—চির দরিদ্রতা,—
আমি বড় ভালবাসি, তার বিদ্রূপের হাসি,
ধ্রুব মরণের সেই মহা মধুরতা।
আমি ত চাহিনা তার সুরুচি সভ্যতা।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

মামলায় মরণ।

আমরা পূর্ব্বের অপেক্ষা সভ্য ও শিক্ষিত হইতেছি। কিন্তু যখন দেশের চতুর্দ্দিকের দুরবস্থা একবার ভাবিয়া দেখি, তখন আর উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি থাকে না। তখন যেন চারিদিকে হাহাকার শুনিতে পাই—যেন সমগ্র দেশ হইতে দিনরাত্রি অবিরাম ক্রন্দনের রোল সমুত্থিত হইতেছে। ম্যালেরিয়ার জ্বরে, ওলাউঠায়, দেশ উৎসন্ন যাইতেছে। নিত্য দুর্ভিক্ষে, অনাহারে সহস্র সহস্র লোক উদরের জ্বালায় ছটফট করিয়া মরিতেছে। সমুদয় সভ্য জগতে সকল দেশে ১৭৯০ সাল হইতে ১৮৯০ সাল পর্য্যন্ত এক শত বৎসর যুদ্ধে ৪৫ লক্ষ মরিয়াছে। আর ভারতবর্ষে আট বৎসর মাত্রে স্বাভাবিক মৃত্যুসংখ্যা হারের অতিরিক্ত ৪৩ লক্ষ লোক জ্বরে (অনাহারের নামান্তরে) মরিয়াছে। কি ভয়ানক, ভাবিয়া দেখুন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে জীবন নিরাপদ কিরূপে, যখন সভ্য জগতে একশত বৎসরে কাটাকাটি করিয়া যত লোক মরিয়াছে, ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষে আট বৎসরে অনাহারে প্রায় তত লক্ষ মরিয়াছে! এত লোক মরিবে না কেন? বাণিজ্য ব্যবসা ক্রমেই বিদেশীয়দিগের হস্তগত হইতেছে। ভারতবর্ষের সহস্র সহস্র তন্তুবায়ের এবং অন্যান্য দেশীয় শিল্পীর মুখের গ্রাস লাঙ্কাসয়ের বণিক্‌গণ কাড়িয়া খাইতেছে। বিংশতি ক্রোড় বা ততোধিক টাকার শস্য প্রকৃতপক্ষে বিনিময়ে ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে প্রেরিত হইতেছে।*

*"The net amount of land revenue in India in 1889—90 was less than twenty millions, while the Secretary of State for India received

চাকুরীতে প্রবিষ্ট শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত দেশীয় ব্যক্তিগণের আত্মসম্ভ্রম শ্বেতাঙ্গ পাদুকা পেষণে দিন দিন চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতেছে। এত বিপদ ও বিভ্রাট চারিদিকে। তাহার উপর আবার ইংরাজি সভ্যতার অন্তর্ব্বর্ত্তী আর একটা ঘোর অমঙ্গল সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, এবং দেশের দুর্দ্দশা দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছে।

এই পাপ-ব্যাধি, ম্যালেরিয়ার ন্যায়, দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ইহা ম্যালেরিয়ার ন্যায় সংক্রামক। ইংরাজি সভ্যতার প্রশ্রয়ে, রেলের রাস্তায় স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী বন্ধ হওয়ায়, যেমন উৎকট ম্যালেরিয়া উদ্ভব হইয়া দেশকে ছারখার করিতেছে, তেমনি এও, ইংরাজি সভ্যতার দেশীয় চিরপ্রচলিত পদ্ধতি বন্ধ করিয়া, বিদেশীয় ব্যবহার প্রচলিত করত দেশকে দিন দিন অধঃপাতে পাঠাইতেছে।

যেমন একদিকে ম্যালেরিয়াতে বাঙ্গালীদিগের প্রাণনাশ করিতেছে, তেমনি এই অনর্থে অন্যদিকে মামলাতে তাহাদিগের অর্থনাশ ও ধর্ম্মনাশ করিতেছে। জুয়া খেলা যেমন একটী নেশা, মামলা করা তেমনি একটী নেশা হইয়া দাঁড়াইতেছে। কিন্তু জুয়া খেলার অপেক্ষা ইহাতে অধিক অবনতি, অধিক জুয়াচুরি, অধিক অর্থনাশ, অধিক ধর্ম্মনাশ সম্পাদন করিতেছে। তাই বলি, মামলায় মরণ হইতেছে। সভ্যতার নামের বড় মোহিনীশক্তি। এমন অধর্ম্ম নাই, পাপ নাই, যাহাতে সভ্যতার ছাপ মারিলে বিকায় না। বলবান্ জাতি দুর্ব্বল জাতির দেশ কাড়িয়া লইতেছে, কোথাও বা দুর্ব্বল জাতিকে নির্ম্মূল করিয়া তাহাদিগের দেশে বসতি করিতেছে। সহজজ্ঞানের অসভ্য ভাষায় ইহা দস্যুবৃত্তি ও নরনারী হত্যা। কিন্তু দেখ মায়াবিনী সভ্যতার একটী বচন Survival of the fittest দস্যুবৃত্তিকে ভাষান্তরিত করিয়া মার্জ্জিত শুদ্ধীকৃত করিল, সর্ব্বমঙ্গলময় ঈশ্বরের অপরিবর্ত্তনীয় মঙ্গলময় নিয়ম, মানবজাতির ক্রমিক উন্নতির অবশ্যগম্য পথ বলিয়া প্রতিপন্ন করিল। দেখুন সহস্র নরহত্যা, সহস্র সহস্র নারীহত্যা, সহস্র সহস্র নিরপরাধী নির্ব্বিবাদী নরনারীকে গলায় পা দিয়া মারিয়া ফেলা, সভ্যতা নামের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে পাপ মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যবপু পরিগ্রহ করিল। তাই, বর্ত্তমান মামলা এবং আদালতের পদ্ধতি, ইউরোপীয় সভ্যতার

from India and expended in England more than twenty three millions" সেক্রিটারির নিকট টাকা নিম্নলিখিতরূপে প্রেরিত হয়। যত টাকা ইংলণ্ডের জন্য ভারত হইতে লওয়া হইবে, তত টাকার Council Bill সেক্রিটারি বিক্রয় করিবেন, ঘোষণা করেন। যে সকল বণিক ভারতবর্ষে টাকা পাঠাইবে তাহারা যত টাকা ভারতবর্ষে পাঠাইবে, তত টাকার স্বর্ণ মুদ্রা সেক্রিটারিকে দিয়া Council Bill নামক হুণ্ডি গ্রহণ করে সেই হুণ্ডি ভারত গভর্ণমেণ্টকে দেখাইলে বণিক ইংলণ্ডে প্রদত্ত স্বর্ণমুদ্রার মূল্য ভারতে রজত মুদ্রায় অর্থাৎ টাকাতে পাইয়া থাকেন। সেই টাকা দিয়া বণিক শস্যাদি ক্রয় করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। ভারতগবর্ণমেণ্ট হইতে বণিক যে টাকা পাইল, তাহা শস্য বিক্রেতাদিগকে দিল অর্থাৎ ভারতের টাকা ভারতে থাকিল, সুতরাং টাকার পরিমাণ ভারতে বৃদ্ধি হইল না, কিন্তু ভারতের শস্য বিনা বিনিময়ে ইংলণ্ডে প্রেরিত হইল, অর্থাৎ ভারতের তত টাকার শস্যের হ্রাস হইল, কিন্তু তাহাতে দেশের টাকার বৃদ্ধি হইল না। টাকা গবর্ণমেণ্টের হাত হইতে শস্য বিক্রেতার হাতে যাইল মাত্র। প্রতি বৎসর ভারতের নিরন্ন কৃষকের শস্য এইরূপে ইংলণ্ডে শোষিত হয়।

মোহিনীবেশে, কেমন আমাদিগের দেশের লোককে ভুলাইয়া, আদালত গুহায় লইয়া গিয়া, তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছে।'

কত রকমে সর্ব্বনাশ করিতেছে দেখুন। প্রথমে অর্থনাশ। তাহাতে কেবল কোর্ট ফি, প্রোসেস ফি, উকীল ফি, সাক্ষীর বার-বরদারি ইত্যাদি খরচ লাগে, এমন নহে। জয়লাভ করিবার জন্য বলে কলে আরও অনেক টাকা খরচ করিতে হয়। সাক্ষী-দিগের ঘুঁষ, আমলাদিগের ঘুঁষ, তদ্বিরকারক-দিগের লুঠে কত টাকা যে যায়, যাঁহারা মোকদ্দমা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই জানেন। আদালতে এমন কোন কাজ নাই, যাহাতে কৃতকার্য্য হইতে হইলে কোন না কোন আম-লার সন্তোষার্থে উপরি ব্যয় করিতে হয় না। এমন কি, কেবল ন্যায্য ফি দিয়া আপনার নিজের দলিল আদালত হইতে ফেরত লইতে পারিবেন না। দরখাস্ত করিয়া দেখুন, উত্তর পাইবেন, দলিল খোজ করিয়া পাওয়া যাইল না, অথবা ঐরূপ অন্য কোন কৈফিয়ত দেওয়া হইবে। আমি নিজে জানি, কোন একটী বৃহৎ জমীদারি অনেক দিন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের (Court of wards) অধীন ছিল। এই সময় ঘুষ না দেওয়াতে আদা-লতে দলিল দাখিল হইলে তাহা ফেরত পাওয়া বড়ই কঠিন হইত। এইরূপে অনেকগুলি, দলিল আদালতে আবদ্ধ হইল। যখন কোর্ট অব ওয়ার্ডসের হাত হইতে বিষয় মালিক যুবা মহারাজ বাহা-দুরের হাতে আসিল, তখনও মহারাজা ঘুষ দেওয়ার পাপে লিপ্ত হইতে অসম্মত। তিনি পাপের গুপ্ত পথ অনুসরণ করিয়া সামান্য ব্যয়েও কার্য্যোদ্ধার করিতে অসম্মত, কিন্তু প্রকাশ্য আইনসঙ্গত উপায়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত। তথাপি তাঁহার বিস্তর দলিল আদালতে আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহা বাহির করিবার উপায় হইতেছে না। আদালতে ঘুষ দেওয়া এমনি প্রচলিত এবং ঘুষ না দিলে কার্য্যোদ্ধার হওয়া এমনি কঠিন হই যাছে যে, মহারাজার এই নীতিসঙ্গত প্রশংসনীয় ব্যবহার বৈষয়িক এবং নীতি-ভ্রষ্ট লোকে অল্প বয়সের অজ্ঞতা বলিয়া বিবেচনা করে। এইত গেল ঘুষের খরচ।

তাহার পর বাদী, প্রতিবাদী ও সাক্ষী-দিগের মূল্যবান্ অর্থকরী সময় নষ্ট হওয়ার তাহাদিগের কার্য্যের ক্ষতি হওয়ায় পরোক্ষে কত অর্থনাশ হয়। মোকদ্দমা আরম্ভ হইল, তাহা গদাইলস্করী চালে চলিতে লাগিল, আজ কতক হইল, আবার দশ দিন পরে দিন পড়িল। সেদিন বাদী প্রতিবাদী সাক্ষীগণ নিজের কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া বটতলায় হাজির থাকিল। আবার দিন ভঙ্গ হইল, দুই মাস পরে দিন পড়িল। আবার দল বল সব হাজির। এইরূপে শ্রান্ত, পক্ষ ও সাক্ষীগণের হয়রা-নির সীমা নাই। মাস যাইল, বৎসর ঘুরিয়া আসিল, কিন্তু মোকদ্দমা আর নিষ্পত্তি হয় না। সাক্ষীগণের নিজের কাজ কর্ম্ম চুলোয় গেল। তত্ত্বাবধান অভাবে কাহারও সম্পত্তি ছারখার হইতে লাগিল। যে পরিশ্রম করিয়া প্রতিদিন রোজগার করে, তাহার রোজগার হয় না। কাছারী যাতায়াতে প্রতিদিন তাহার টাকার ক্ষতি হয়। কোর্ট ফি, উকিল ফি, ঘুষ সাক্ষীদিগের বারবরদারি, কার্য্য ক্ষতি ইত্যাদি সব ভাল করিয়া খতা-ইয়া দেখিলে মামলায় কত যে অর্থনাশ হয়,

তাহা কতক অনুভব হইবে। পশ্চিমাঞ্চলের একজন মাজিষ্ট্রেটের কথা এখানে মনে পড়িল। মোকদ্দমার জন্য কোন মূখলোক তাহার আদালতে আসিলে তিনি তাহাকে প্রথমত ফিরাইয়া দিতেন। তাহা না শুনিয়া সে আবার আসিলে তাহাকে গালি দিতেন, তথাপি যদি সে দরখাস্ত পেশ করিতে চাহিত, তাহা হইলে তাহাকে বলিতেন "পালাও পালাও, যে উকীল, মোক্তার, দালাল ও আমলারা দেখিতেছ, ইহারা তোমার টাকা লুঠ করিয়া লইবে, তোমাকে মজাইবে, পালাও।" কথাটা কি মিথ্যা?

ফৌজদারি মোকদ্দমাতে যদি আপনি পুলিশের হাতে গিয়া পড়িলেন, তাহা হইলে ত কথাই নাই, ঘুস না দিলে পদে পদে বিপদ। মোকদ্দমা ত টাকার শ্রাদ্ধ।

এত গেল অর্থনাশের কথা।—মোকদ্দমা করিতে যাইলে কতদূর ধর্ম্মভ্রষ্ট, নীতিভ্রষ্ট হইতে হয়, ভাবিয়া দেখুন। আরজিতে, বর্ণনাপত্রে, আফিডেভিটে, কত মিথ্যা কথা, কত মিথ্যা উকীলী ফন্দী, কত মোক্তারি ধাপ্পা থাকে। তার পর বাদী প্রতিবাদীদিগকে নিজে অনেক সময় মিথ্যা, কখন বা সত্য গোপন করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্যদেওয়ার পাপে পতিত হইতে হয়। ঘুষ দিয়া মিথ্যা সাক্ষী সংগ্রহ করিতে হয়, অর্থাৎ লোভ দেখাইয়া অন্য লোককে "প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক" মিথ্যাবাদী করিতে হয়।

সাক্ষীগণ সত্য কহিতে ইচ্ছা করিলেও, আদালতের নানাফেরে পড়িয়া তাহাদিগকে মিথ্যা বলিতে হয়। সাক্ষীকে উকীল কৌশলে বা ভয়প্রদর্শন করিয়া অনেক সময় সত্য কথা বলিতে দেন না। আবার বিরুদ্ধ সাক্ষী অসচ্চরিত্র প্রমাণ করিবার বিধি থাকায়, অনেক সময়ে, বিরুদ্ধ সাক্ষী কবে কি মন্দ কাজ করিয়াছে, উপস্থিত মোকদ্দমার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও, কেবলমাত্র বিরুদ্ধ সাক্ষীকে জব্দ বা অপদস্থ করিবার জন্য, ধূর্ত্ত উকীল তাহা পাক দিয়া পাক দিয়া জিজ্ঞাসা করেন। সংসারে এমন খুব কম লোক আছে, যাহারা জীবনে কখন কোন মন্দ কাজ করে নাই। এমন লোক নিতান্ত বিরল, যাহাদিগের জীবনের কোনও ঘটনা প্রকাশ পাইলে তাহাদিগকে লজ্জা পাইতে হয় না। সুতরাং অনেক লোক সাক্ষী দিবার ভয়ে, কোন বিষয় অবগত থাকিলেও, তাহা অস্বীকার করিয়া মিথ্যা কহে, অথবা যদি সাক্ষী হইল, নিজের জীবনের কুৎসিতকার্য্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইলে তাহা গোপন করিয়া মিথ্যাবাদ পাপে পতিত হয়। তাহার উপর সাক্ষী অনেক সময় সত্য বলিবার চেষ্টা করিয়াও চতুর ও সত্য-বধির উকীলের জেরার জালে জড়িত হইয়া, হতবুদ্ধি হইয়া, পরস্পর বিসম্বাদী কথা বলিয়া ফেলিয়া, লোকের নিকট মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণ হয়। যখন সত্য বলিলেও আদালতে অনেক সময় নিস্তার নাই, মিথ্যাবাদী বলিয়া গণ্য ও অপমানিত হইতে হয়, তখন সত্য কথা বলিবার ইচ্ছা ক্ষীণ হইয়া যায় এবং মিথ্যাভাষণে প্রবৃত্তি জন্মে। আদালতের বর্ত্তমান কার্য্যপ্রণালী কেবলমাত্র পক্ষগণের ধর্ম্মনাশ করে, এমন নহে, সাক্ষীদিগকেও অনেকস্থলে মিথ্যাবাদী ও ধর্ম্মভ্রষ্ট করে।

ওকালতী, কল্পনাতে, অতি মহৎ ও মাননীয় ব্যবসা। দুর্ব্বল ও অসমর্থকে রক্ষা করা, ন্যায্যস্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা, প্রযুজ্য আইন

নির্দ্দেশ ও সদ্ব্যাখ্যা করা, সত্য ঘটনা প্রতিপন্ন করা, সুবিচাবেব সহায়তা করা, এইত ওকালতীর উচ্চ ধর্ম্ম। কিন্তু বর্ত্তমান পদ্ধতিতে কাজ কিরূপে হইতেছে, একবার ভাবিয়া দেখুন। জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা মোকদ্দমাব পোষণ করা কি অধর্ম্ম নহে? মিথ্যাকে সত্য, সত্যকে মিথ্যা প্রমাণ কবা কি পাপ নহে? নাকে হাঁ, হাঁকে না করা, কি অনুচিত নহে? জানিয়া শুনিযা দোষী ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী, নির্দ্দোষীকে দোষী প্রমাণ করাব চেষ্টা কি ঘোর অধর্ম্ম নহে? কোন দুর্দ্ধর্ষ পাষণ্ড মক্কেল যখন একজন অসহায় অবলার সর্ব্বস্ব ধন অপহরণ কবিবার জন্য, একটা মিথ্যা মোকদ্দমা সাজাইয়াছে, তখন জানিয়া শুনিয়া কেবল পয়সার জন্য সেই মোকদ্দমা সমর্থন কবা কি পাষণ্ডতা নহে? যখন কোন অত্যাচারী ধনী জমাদাব অন্যায় করিয়া কেবলমাত্র দুর্ব্বল রাযতকে পীডন কবিয়া আপনাব দাসত্বে শৃঙ্খলবদ্ধ কবিবাব জন্য, বায়তকে নিষ্পেষিত কবিবাব জন্য, মিথ্যা মোকদ্দমা কাবিতেছে, তখন সেই মোকদ্দমা উকীল হইয়া সমর্থন কবা কি নবাধম পাপিষ্ঠেব কাজ নহে? যখন কোন দুর্ব্বলব্যক্তি, লোমহর্ষণ উৎপীডনে জর্জ্জবীভূত হইয়া, আত্মবক্ষাব জন্য কাতব হইয়া বিচাবালয়ের স্মরণ লয়, তখন জানিয়া শুনিয়া সবল ও ধনী ব্যক্তিব ওকালতী করিয়া উৎপীড়িত ব্যক্তির আত্মবক্ষাব চেষ্টা নিষ্ফল করা কি ঘোর অধর্ম্ম নহে? কোন নরাধম জমীদারের পাপচক্ষু দবিদ্র প্রজাব তরুণী ভার্য্যার উপর পড়িল। সতী তাহার স্বামীকে জমীদারের নারকী প্রস্তাবের কথা বলিয়া দিল। প্রজা দবিদ্র, কিন্তু কাপুরুষ নহে, জমীদারকে জানাইয়া দিল যে পুনরপি এবিষয় কোন কথা বা চেষ্টা করিলে সে জমীদাবের মস্তক চুর্ণ করিয়া দিবে। ধূর্ত্ত জমীদার কিছু দিন এমন ভাল ব্যবহাব করিল যে, সরল কৃষকের মনে আর কোন আশঙ্কা রহিল না। একরাত্রি বিশেষ কাজে সে গ্রামান্তরে ছিল। সেই রাত্রি জমীদাব তাহার পাশবরৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিযাছিল, কিন্তু বুদ্ধিমতী রমণী কৌশলে সে রাত্রি সতীত্ব রক্ষা কবিয়াছিল। পরদিন স্বামী ফিরিয়া আসিয়া সমুদয় শুনিল, এই বাব সে জমীদারকে চিরস্মবণীয় শিক্ষা দিবে, প্রতিজ্ঞা করিল। জমীদার তাহা শুনিতে পাইয়া তাহাকে একদিন পাঁচজন লাঠিয়াল দিয়া ধবিয়া লইয়া আসিয়া, তাহাকে বিষম প্রহার করিতে লাগিল এবং তাহার ভার্য্যা সম্বন্ধে অশ্রাব্য কথা দর্প কবিয়া বলিতে লাগিল। নির্ভীক কৃষকের তেজ অদমিত, প্রহারেব যন্ত্রণা তৃণজ্ঞান কবিয়া জমীদারকে ধিক্কার দিতে লাগিল এবং বলিল "ওরে—দেবতাবা তোকে একদিন ইহার দণ্ড দেবেনই নিশ্চিত।" তখন পাষণ্ড কোপে প্রজ্বলিত হইয়া তাহাকে চিত করিয়া ফেলিয়া জুতা শুদ্ধ তাহার পেটের উপর উঠিয়া দাঁডাইয়া ঘুরিতে লাগিল, জুতাব ঘোরে হতভাগ্য কৃষকের নাড়ীভুঁডি ছিঁডিতে লাগিল, কৃষক প্রাণত্যাগ কবিল। মোকদ্দমা হইল। এখন সমুদয় অবস্থা জানিয়া শুনিয়া পয়সার লোভে পাষণ্ড খুনীকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিবার চেষ্টাব এবং কাঙ্গালিনী নিরপরাধিনী উৎপীড়িতা অনাথা বিধবাকে মিথ্যা অভিযোগ করা অপরাধ আরোপ করিয়া, কারাবন্দিনী করার মহা পাতকী চেষ্টার, ওকালতী দ্বারা সহায়তা করা যদি মহাপাপ না হয়, তাহা হইলে জগতে

পাপ নাই। এইরূপ ওকালতী নরাধম কুলাঙ্গার পাষণ্ডের কার্য্য, এ বিষয় কে সংশয় করিবেন? কিন্তু এখন যেরূপ ভাবে আদালতের কার্য্যপ্রণালা চলিতেছে, ইংলণ্ডের ব্যবহারবিজ্ঞান, ইউরোপীয় আইন তত্ব, এখানে যেরূপে গৃহীত হইতেছে, তাহাতে উকীল সুবিধামত সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য, দোষীকে নির্দ্দোষী, নির্দ্দোষীকে দোষী প্রমাণ করিতে অসম্মত হইলে, ওকালতী ব্যবসা চালান নিতান্ত কঠিন বা অসম্ভব বলিলেও হইতে পারে। এইরূপ সত্যের বিপর্য্যয় সহজ জ্ঞানের চক্ষে জাজ্বল্যমান অধর্ম্ম, কিন্তু সভ্যতার কূটতর্কে, ইংলণ্ডের উকীল চূড়ামণি লর্ড ব্রুমের Lord Brougham মতে, ইহা অধর্ম্ম না হইতে পারে। হায়, সভ্যতার নামের কি যাদুগুণ। ইউরোপের চটক কেমন সহজেই চোকে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দেয়। অধিকাংশ উকীল সম্ভ্রান্ত সত্যবাদী সাক্ষীদিগকে অমার্জ্জনীয়রূপে অপমান করেন। এইরূপ আচরণ আদালতের নিষেধ করিবার অধিকার থাকা সত্বেও কার্য্যতঃ আদালত নিবারণ করিতে প্রায়ই অশক্ত হন। ইহার যে একটা আশু প্রতিকার হওয়া উচিত, তাহা ভারতবর্ষে বলিলে, বোধ হয়, অনুকরণপ্রিয় বাঙ্গালী সভ্য ইংলণ্ডের নজির দেখাইবেন। কিন্তু সম্প্রতি উকীলদিগের এই দুর্ব্যবহার লইয়া ইংলণ্ডে আন্দোলন হইতেছে, সুতরাং এখানে এখন একথা অনেক লোকে স্বীকার করিতে পারেন। এখন উকীল ব্যারিষ্টারের নীতির বর্ত্তমান আদর্শ ইউরোপে ও এখানে যে নিতান্ত নীচ, অধর্ম্ম-দূষিত, এবং আশু সংশোধনীয়, তাহা এই অধীন বাঙ্গালী জাতির বিবেক স্বাধীনভাবে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে? যাহা হউক, যত মোকদ্দমা হইবে, ততই কম ওকালতির আবশ্যক এবং ততই কম অধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা, ইহাই দেখান আপাততঃ আমার উদ্দেশ্য।

মোক্তার ও দালালগণের দ্বারা কত অধর্ম্ম, কতজনের সর্ব্বনাশ হয়, তাহা বর্ণনা করিয়া আবশ্যক নাই।

সভ্য জগতের বর্ত্তমান মোকদ্দমা প্রণালীতে পাপের ভয়ানক প্রশ্রয় দিতেছে। এমন কি, সরল কৃষকদিগের মধ্যেও ইংরাজি আদালতের কল্যাণে, প্রবঞ্চনা জুয়াচুরি প্রভৃতি পাপ কিরূপে প্রবেশ করে, তাহা পরমশ্রদ্ধেয় ভারতবন্ধু এবং এক সময়ে কৃষিসচিব হিউম Hume সাহেব তাঁহার লেখাতে বিশদরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে,যে কৃষক একবার সদরে মোকদ্দমা করিতে যায়, উকিল মোক্তারদিগের নিকট চিরকালের মত তৈয়ার হইয়া আসে। যখন ভদ্রলোকের নিকট মিথ্যা সাক্ষী প্রবঞ্চনা জুয়াচুরি বিষয় পরামর্শ পায়, তখন তার আর সত্যের প্রতি, ধর্ম্মের প্রতি আস্থা থাকে না। "ওরে বোকা কেবল সত্য কথার উপর কি মামলা দাঁড়ায়?" সাক্ষী না থাকিলে আদালত মানিবে কেন, সাক্ষী না থাকে সাক্ষী জুটাইতে হইবে, টাকা দিলে সাক্ষীর অভাব কি" এইরূপ দুইচারি বচনে কৃষকের দিব্যচক্ষু খুলিয়া যায়। সে যখন গ্রামে ফিরিয়া আসে, তখন সে একটা ওস্তাদ, মামলা মোকদ্দমার যোগাড় ও ফন্দী বেশ বুঝে, অন্য কৃষককে মামলা করিবার পরামর্শ দেয়। কারণ, মামলা বাধিলে সে তদ্বিরকারক হইয়া দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। এইরূপে মামলা যেখানে একবার প্রবেশ

করে, সেখানে সংক্রামক রোগের ন্যায় বিস্তৃত হয়।

এত অনর্থের কারণ যে মোকদ্দমা, তাহা যাহাতে কমে, তাহার জন্য কি আমাদের সকলেরই চেষ্টা করা উচিত নহে? আমাদিগের দেশে যে পূর্ব্বে মোকদ্দমা করার প্রথা ছিল না, তাহা অবশ্য নহে। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিগণ ধর্ম্মাধ্যক্ষ (বিচারক) সাক্ষীগণ ও প্রমাণ পরীক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ বিস্তৃত ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহাতে প্রাচীন কালেও বিচারকার্য্যের পদ্ধতি যে আয়ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তবে তখন এত মোকদ্দমা হইত না। কারণ তখন গ্রামের প্রায় সমুদয় বিবাদই গ্রাম্য-সমিতি বা পঞ্চায়ত দ্বারা নিষ্পত্তি হইত।

ব্রিটিশ শাসনে সেই গ্রাম্য সমিতি ও পঞ্চায়ত উঠিয়া গিয়াছে। এখন যে পঞ্চায়ত আছে,তাহা মৃত পঞ্চায়তের প্রেতাত্মা মাত্র। চৌকীদারী কর আদায় করার জন্য তাহা সংগঠিত। তাহার দ্বারা বিবাদের মীমাংসা হয় না।

পূর্ব্বের ন্যায় আবার গ্রামে গ্রামে গ্রাম্যসমিতি বা পঞ্চায়ত সংস্থাপন করা আবশ্যক। এবং গ্রাম্য সমিতির নিষ্পত্তিতে যাহাতে পক্ষগণ বাধ্য হন, তদ্বিষয়ক আইন হওয়া উচিত। পুনা নগরীতে এ বিষয়ে অনেক চেষ্টা করা হইয়া আসিতেছে।

আদালত যে কিরূপ ভয়ানক স্থান, ধন মান।ধর্ম্ম সুখ শান্তি সর্ব্বস্ব তাহাতে যে কেমন করিয়া গ্রাস করে, তাহা নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে প্রচার করা আবশ্যক।

যাহাদিগের বিবাদ গ্রাম্যসমিতিতে কোন মতেই মিটিবে না, তাহারাও আদালতে আসিলে যাহাতে রফানিষ্পত্তি হয়, তজ্জন্য বিচারকের চেষ্টা করিবার সুবিধা হওয়া আবশ্যক। এবং রফানিষ্পত্তি হইলে মোকদ্দমা রুজু করিবার ফীষ সিকিমাত্র গ্রহণ করা উচিত, এই প্রস্তাব অন্ততঃ কৃষক সম্বন্ধে পুনার জজ পলেন সাহেব এবং সুপবিজ্ঞাত সাহেব সার রেমাণ্ড ওয়েষ্ট (Sir Raymond West) অনুমোদন করিয়াছেন। আমরাও তাহাই প্রস্তাব করি।

প্রাচীন কালে, ভারতের সেই সুখের সময়, বিনাব্যয়ে, বিনা লাঞ্ছনায়, অতি অল্প সময়ের মধ্যে, গ্রামের সায়াহ্ণ সমীরণ-সেবিত চণ্ডীমণ্ডপে কয়েকজন শ্রদ্ধেয় বিজ্ঞ গ্রামবাসী সামান্য একটা পাটীতে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে কত বিবাদ মিটাইয়া দিতেন। গ্রামের লোক গ্রামের তাবৎ অবস্থা ও ঘটনা জানে, কে কেমন লোক, তাহা জানে, সুতরাং সেখানে সাক্ষীর বড় প্রয়োজন নাই, উকীলের ধাপ্পার ভয় নাই, প্রমাণ (Evidence Act) কার্য্যবিধির (Procedure Act) খুটি নাটি কণ্টক নাই, অতিশ্রমী বহুমূত্ররোগাক্রান্ত মুন্সেফের মস্তিষ্ক স্রাব নাই, মহামান্য হাইকোর্টের পরস্পরবিরোধী নজিরের কুয়াসা নাই। সুতরাং সেখানে সব সহজ ও স্বচ্ছ, দুই দণ্ডে সুবিচার হইয়া যাইত। আবার যাহাতে বিবাদ মিটিয়া সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়, গ্রামের শান্তি ও সুখের জন্য গ্রাম্যসমিতি তাহারও সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেন।

সহজে বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য, নরোয়ে ও সুইডেন দেশে এক প্রকার উৎকৃষ্ট গ্রাম্য সমিতি আছে। তাহার কার্য্য এরূপ সুচারুভাবে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে যে,ঐ সমিতির প্রতি দেশের সকল লোকেরই বিশেষ অনুরাগ

ও শ্রদ্ধা আছে। প্রত্যেক সমিতিতে দুই-জন মাত্র সভ্য আছেন। একজন সভাপতি এবং একজন কেরাণির কাজ করেন। এই দুই জনই গ্রামবাসীর "ভোট দ্বারা" নির্ব্বাচিত হন। প্রতি সপ্তাহে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থলে এই সমিতির বৈঠক হয়। ইহাতে সাধারণের প্রবেশের অধিকার নাই। দ্বার রুদ্ধ করিয়া ইহার কার্য্য হয়। এবং সমিতিও ইহার কার্য্যবিবরণ গোপন রাখিতে বাধ্য। এখানে যাহা হয়, বাহিরে তাহা প্রকাশ হয় না। এবং এখানে যে কথা কোন পক্ষ স্বীকার করেন, যদি রফা না হয়, পরে আদালতে তদ্বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারে না। পীড়া, বা অন্য কোন অনতিক্রম্য কারণ না থাকিলে বাদী ও প্রতিবাদীকে এই সমিতি সমক্ষে স্বয়ং উপস্থিত হইতে হয়। উকীল নিজের বিবাদ সম্বন্ধে ব্যতীত এককালে সেখানে প্রবেশ করিতে পারেন না। এটী অতি সুন্দর ব্যবস্থা। ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যে কৃষিগণের উপকারার্থে যে আইন হইয়াছে, তাহাতে উকীল নিয়োগ নিষিদ্ধ। নরোয়ে এবং সুইডেনের গ্রাম্যসমিতির বিন্দুমাত্র আড়ম্বর নাই। সমিতির দুইজন সভ্যই বাদী ও প্রতিবাদীর নিকট সুপরিচিত এবং বাদী ও প্রতিবাদীদিগের শ্রদ্ধাভাজন। নিরপেক্ষ বিচারক উভয়পক্ষকে বন্ধুভাবে যে পরামর্শ ও উপদেশ দেন, তাহা উভয়পক্ষ প্রশান্ত ও সরলভাবে আলোচনা করে এবং এইরূপে সহজে অধিকাংশ স্থলেই মিট মাট হইয়া যায়।

ভারতবর্ষে, অগ্রগণ্য পুনাতে একটী সালিসী আদালত (Poona Arbitration Act) আছে। তাহা ১৮৭০ সালে স্থাপিত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার কাজ সুন্দররূপে চলিয়া আসিতেছে। জনসাধারণের তাহার উপর বেশ বিশ্বাস আছে, বোধ হয়। এই সালিসী সমিতি সংস্থাপনের প্রথম বৎসরেই তাহাতে ১৫৩৪ আরজি দাখিল হয়। তাহার মধ্যে ৬৪৮ সমিতি নিষ্পত্তি করিয়া দেন, ২২৫ আপোষে নিষ্পত্তি হয় এবং ৬০৬ অগ্রাহ্য হয়। এইরূপে যে সকল বিবাদ নিষ্পত্তি হইয়াছিল, তাহার মোট দাবি ১,৩৯, ৪৭৩৷৶৬। গত বৎসর ইহাতে ১৮৮৬টী আরজি দাখিল হয় এবং ২৫৯৬০৩৷৶৪ মোট দাবি নিষ্পত্তি হইয়াছিল। ৯৭ জন সালিস আছেন। কোন আরজি দাখিল হইলে উভয়পক্ষকে সালিসের নামের ফর্দ্দ দেখান হয় এবং প্রত্যেক পক্ষ এক বা ততোধিক সালিস মনোনীত করিয়া লয়েন। তাহার পরে উভয় পক্ষ সালিসী বিচারে বাধ্য হই-বেন এই মর্ম্মে রাজীনামা বা স্বীকারপত্র লিখিয়া দেন। তদনন্তর উভয়পক্ষের জবান-বন্দি এবং প্রয়োজন হইলে সাক্ষীও লওয়া হয়। এবং এইরূপে সহজে সত্য নিরূপণ হয়। ইহার কার্য্য প্রণালীর নিয়ম সরল এবং বিচার ব্যয়সাধ্য নহে। দেওয়ানি আদালতে বিবাদীদিগের মধ্যে যেরূপ শক্র-তার সঞ্চার হয়, এই সালিসী বিচারে তদ্রূপ হয় না। ইন্দুপুর, সোলাপুর, আহমদ নগরে এইরূপ সালিসী সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ওয়াই নগরে এখনও একটী সালিসী সমিতির কার্য্য হইতেছে।

বাঙ্গালা দেশে সালিসী বিচার প্রবর্ত্তন করিবার জন্য শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় প্রশংসনীয় চেষ্টা করিতেছেন, এবং

প্রধানতঃ তাঁহারই যত্নে আজ প্রায় দুই বৎসর হইল জমীদারী পঞ্চায়ত সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে এই সভা দ্বারা এ পর্য্যন্ত কি পরিমাণে উপকার হইয়াছে, তাহা আমি অবগত নহি। ভরসা করি, রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়ের উদ্যম, ধন ও বুদ্ধিবলে গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য-সমিতি স্থাপন এবং বাঙ্গালা দেশে সম্যক্‌রূপে সালিসী বিচার প্রবর্ত্তিত হইবে। আমার বোধ হয়, জমীদারী পঞ্চায়ত সভার সালিসী বিভাগের কার্য্যবিধি আরও সরল হইলে ভাল হয়, এবং সালিসী বিচারের খরচ আরও কম করা প্রয়োজন। এ বিষয় এই সভা নরোয়ে এবং সুইডেনের Court of Conciliation * নামক গ্রাম্য বা নাগরিক সমিতির সত্ত্বানুযায়ী অনুকরণ করিতে পারিলে ভাল হয়। প্রত্যেক জমীদারী পঞ্চায়ত সভার অন্ততঃ একজন কেরাণী থাকার ব্যবস্থা দেখা যায়, ইহাদিগকে অবশ্য বেতন দিতে হইবে। নরোয়ে এবং সুইডেনের গ্রামবাসী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত দুই জন সালিসের মধ্যে, এক জন সভাপতি এবং একজন কেরাণী।

জমীদারী পঞ্চায়ত সভার সালিসী বিচারপ্রার্থীদিগকে ৫৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত ফি গচ্ছিত রাখিতে হইবে। দেওয়ানি আদালতে দাবির পরিমাণ ১০৲ টাকার কম হইলে ৫৲ টাকার কম কোর্ট ফি দিতে হয়, দাবির পরিমাণ ১০৲ টাকা হইলে ৸০ মাত্র দিতে হয়, ৫৲ হইলে ।৵০ দিতে হয়। নরোয়ে এবং সুইডেনের কন্‌সিলিয়েসন্ কোর্টে প্রথমে ৸৵০ চৌদ্দ আনার অধিক দাখিল করিতে হয় না। বিবাদ নিষ্পত্তি করণে যদি কন্‌সিলিয়েসন কোর্ট সফল হন, তাহা হইলে আর ১৸০ মাত্র দিতে হয়। এই কোর্টে ইহার অধিক আর কোন খরচা লাগে না। নিষ্পত্তি এবং বিচারক দ্বয় কেবল মাত্র এই যৎসামান্য ফি লইয়া বিচার মীমাংসার গুরুতর কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। পুনা সালিসী সভার নিষ্পত্তি ব্যয়সাধ্য নহে, প্রকাশ আছে, কিন্তু তাহার অর্থ কি, ঠিক্, জানি না। যাহা হউক, আমাদিগের দেশে যে সকল সালিসী নিষ্পত্তির উপায় হইবে, তাহা বিনা ব্যয়ে অথবা যৎসামান্য ব্যয়ে হওয়া প্রয়োজন। অধিকাংশ বিবাদই যদি গ্রাম্য সমিতিতে মিটিয়া যায়, তাহা হইলে খরচের বড় প্রয়োজন হয় না। পক্ষগণ এবং সালিসিগণ যদি এক গ্রামবাসী হন, তাহা হইলে সালিসগণ অধিকাংশ আলোচ্য অবস্থা ও ঘটনা স্বয়ং অবগত থাকেন, এবং সত্য সহজেই নিরূপণ করিতে পারেন। যেখানে সালিসগণ বিবাদের অবস্থা ও ঘটনা স্বয়ং কিছুই জানে না এবং উকীলদিগের জেরা ও বক্তৃতা নিষিদ্ধ নহে, সে সালিসী বিড়ম্বনা মাত্র।

সালিসীতে প্রয়োজনঃ—১। ব্যয় নাই অথবা নিতান্ত কম। ২। সালিসগণ বিশ্বাসভাজন এবং স্বয়ং বিবাদীগণের অবস্থা অনেকটা অবগত। ৩। উকীল নিয়োগ নিষিদ্ধ।

যত দিন এইরূপ সালিসীবিচার প্রবর্ত্তিত না হইবে, যত দিন বর্ত্তমান আদালত-ব্যবহার প্রণালী প্রচলিত থাকিবে, তত দিন দেশের মঙ্গল নাই, তত দিন লোকের

* Vide the Atlantic Monthly for September, 1892.

মামলায় মরণ হইবে, ধন ধর্ম্ম সর্ব্বস্ব যাইবে। সম্প্রতি পশ্চিমাঞ্চলের এক জন পেন্‌সন ভোগী বিজ্ঞ বৃদ্ধ আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমাদিগের অধিকাংশ লোকের উপার্জ্জন ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় ব্যয় হয়। চিকিৎসা করিয়া যাহা কিছু কাহারও উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা মামলায় নষ্ট হয়। এই কথায় অতি সংক্ষেপে আমাদিগের দেশের ঘোর দুর্দশা প্রকাশিত হইয়াছে। এখন অনেক লোক মোকদ্দমা এবং তন্নিহিত প্রতারণা একটা শিল্পবিদ্যার ন্যায় অনুশীলন করে, এবং মোকদ্দমা করিবার বহু বর্ষ পূর্ব্ব হইতে প্রতারক অবস্থাঘটিত প্রমাণ সৃষ্টি করিতে থাকে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, বর্ত্তমান মোকদ্দমা প্রণালীতে দেশের কিরূপ অবনতি হইতেছে—দেশ কিরূপ অধঃপাতের নিম্নতম নরকে আসিতেছে।

এখন উপসংহারে বক্তব্য, আমরা কথায় কথায় গবর্ণমেণ্টের নিকট নানা প্রকার আবেদন করি। কিন্তু দেশের যে সকল মঙ্গলজনক কার্য্য আমাদিগের নিজের হাতে আছে, তাহার প্রতি আমরা মন দেই না। যখন উন্নতি উন্নতি করিয়া ডাক ছাড়িতেছি, তখন যে দেশের লোকের অধোগতি হইতেছে, আমরা যে ক্রমেই উৎসন্ন যাইতেছি, তাহা দেখি না, তাহা ভাবি না, তাহার প্রতীকারের জন্য একটু মাত্র চেষ্টা করি না। একজন দেশীয় মহাত্মা ঠিক বলিয়াছেন যে, বিনীত আবেদন পত্রে (By humble petition) ভিক্ষাতে কোন দেশ কখন উন্নতি সাধন করে না, পরমুখাপেক্ষিতা, ভিক্ষাবৃত্তি, যাচ্ঞাপটুতা ত্যাগ করিয়া আত্ম সহায়তা, আত্মবলের উপর করে আমরা নির্ভর করিতে শিক্ষা করিব?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

শকাব্দ।

ভ্রমসংশোধন এবং কুমার গুপ্তের মুদ্রা।

গত চৈত্রমাসের নব্যভারতে মল্লিখিত "শকাব্দ" শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটি মারাত্মক ভ্রম দৃষ্ট হইল। এগুলি মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ হইয়াছে কিম্বা আমাদের লেখার ত্রুটিতে হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারি না।

৬৫৫ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভের টীকায় "Sachau স্থলে Sachan এবং উক্ত পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভের শেষ পংক্তিতে "২২৩" স্থলে ১২৩ মুদ্রিত হইয়াছে।

৬৫৭ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় স্তম্ভের ১২,১৮ এবং ২০ পংক্তিতে "কুমার গুপ্তের" স্থলে বুধগুপ্ত মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত পৃষ্ঠায় গুপ্তসম্রাটদিগের নামাঙ্কিত যে মুদ্রার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের মুদ্রা (Seal) বটে। উক্ত মুদ্রায় দুইজন কুমার গুপ্তের নাম দৃষ্ট হইতেছে। বুধ গুপ্তের নাম আদবেই নাই। তবে যে কেন এরূপ ভ্রম হইল, তাহা বুঝিতে পারিনা। মন্দসরের শিলা-লিপিতে কুমার গুপ্তের নাম সংযুক্ত হইয়াছে। মহারাজাধিরাজ কুমার গুপ্ত যৎকালে পৃথিবী শাসন

করিতেছিলেন, সেই সময় বন্ধুবর্ম্মণ নামক জনৈক (সামন্ত) নরপতি দাসপুরের রাজদণ্ড পরিচালন করিতেন। এখানা তাঁহারই ক্ষোদিত লিপি। উক্ত লিপিতে ৪৯৩ মালব সম্বতের (বিক্রম সম্বতের) উল্লেখ আছে। বিজ্ঞবর ফ্লিট্ গুপ্ত-বংশের বংশাবলী নিম্নলিখিতরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন।

গুপ্ত,
মহারাজ।
|
ঘটোৎকচ,
মহারাজ।
|
চন্দ্রগুপ্ত (প্রথম),
(বিক্রম, বিক্রমাদিত্য। মহারাজাধিরাজ)
|
সমুদ্র গুপ্ত।
(মহারাজাধিরাজ।)
|
চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়)।
(বিক্রম, বিক্রমাদিত্য, বিক্রমাঙ্ক, মহারাজাধিরাজ।)
|
কুমার গুপ্ত,
(মহেন্দ্র বা মহেন্দ্রাদিত্য, মহারাজাধিরাজ।)
|
স্কন্দগুপ্ত,
(ক্রমাদিত্য, মহারাজাধিরাজ।)

উল্লিখিত চন্দ্রগুপ্তের (দ্বিতীয়ের) পুত্র কুমার গুপ্তের সময় ৪৯৩ মালব (বিক্রম) অব্দ অবধারণ করিয়া ফ্লিট্ সাহেব গুপ্ত সম্রাটদিগের সময়াবধারণ করিয়াছেন। কিন্তু কুমার গুপ্তের মুদ্রা অনুসারে গুপ্ত-বংশের নিম্নলিখিত বংশাবলী প্রস্তুত করা হইল।

১। মহারাজ শ্রীগুপ্ত।
|
২। মহারাজ শ্রীঘটোৎকচ।
|
৩। মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত।
মহাদেবী কুমার দেবী।
|
৪। মহারাজাধিরাজ শ্রীসমুদ্র গুপ্ত।
মহাদেবী দত্ত দেবী।
|
৫। মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়)
মহাদেবী ধ্রুব দেবী।
|
৬। মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমার গুপ্ত।
মহাদেবী অনন্ত দেবী।
|

৭। মহারাজাধিরাজ স্কন্দ গুপ্ত। *

৮। মহারাজাধিরাজ শ্রীপুরগুপ্ত।
মহাদেবী শ্রীবৎস দেবী।
|
৯। মহারাজাধিরাজ শ্রীনরসিংহ গুপ্ত।
মহাদেবী শ্রীমতী দেবী।
|
১০। মহারাজাধিরাজ শ্রীকুমার গুপ্ত। (দ্বিতীয়)

মন্দসরের শিলালিপিতে দ্বিতীয় কুমার গুপ্তের নাম সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিলে, ফ্লিট্ সাহেবের সিদ্ধান্ত যে তিনি কিরূপে স্থির রাখিবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। ইহাই ৬৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা আমাদের অভিপ্রেত, এবম্প্রকার অবস্থায় কিরূপে যে কুমার গুপ্তের স্থলে বুধগুপ্ত মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।　শ্রীকৈলাস চন্দ্র সিংহ।

* কুমারগুপ্তের মুদ্রায় স্কন্দগুপ্তের নাম লিখিত হয় নাই।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা। (২)

অনন্তের মূর্ত্তি।

পরমেশ্বর অনন্ত। মূর্ত্তি বলিলেই পরিমিত বুঝায়, সুতরাং তাঁহার মূর্ত্তি নাই। এ কথায় সাকারবাদী জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মূর্ত্তি বলিলেই পরিমিত বুঝাইবে কেন? অসীম মূর্ত্তি কি অসম্ভব? যাঁহার সীমা নাই, তাঁহার মূর্ত্তিও কি অসীম হইতে পারে না?

কখনই না। ত্রিকোণ বৃত্ত, কাঁটালের আমসত্ত্ব, সোণার পাথরবাটী ও অসীম মূর্ত্তি, এ সকলই সমান সম্ভব। মূর্ত্তি থাকিলেই হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকিবে। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ। একটি যেখানে শেষ হইয়াছে, আর একটি সেখানে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট শরীর হইলেই, প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবশ্য সীমা থাকিবে। সকল অঙ্গই সকল স্থানে, ইহা অবশ্য অসম্ভব কথা। অঙ্গ সকলের সীমা থাকিলেই, হস্ত পদাদি প্রত্যেক অঙ্গকে অবশ্য পরিমিত পদার্থ বলিতে হইবে। যাহার প্রত্যেক অংশ পরিমিত, তাহার সমষ্টি অবশ্য পরিমিত। সুতরাং সমগ্র দেহ অবশ্য পরিমিত। যত কেন প্রকাণ্ড হউক না, দেহ মাত্রেই অবশ্য পরিমিত। অসীম দেহ কখন সম্ভব নহে। পরমেশ্বর অনন্ত; সুতরাং তিনি পরিমিত দেহধারী হইতে পারেন না।

যদি তিনি দেহধারী না হন, তবে তাঁহাকে বিশ্বরূপ বলা হয় কেন? এই জগৎ কি তাঁহার দেহ নহে? সাকারবাদী এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন। এই প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বেদান্ত দর্শন অবলম্বন পূর্ব্বক এইরূপ বলিতেছেন,—

"যাবৎ নামরূপময় মিথ্যা জগৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্যরজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায়, বস্তুতঃ সে রজ্জু সর্প হয়, এমত নহে। সেইরূপ সত্যস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তিনি মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন না। এই হেতু বেদান্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে, ব্রহ্ম বিবর্ত্তে অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চস্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়াদ্বারা প্রকাশ পায়েন। কিরূপে এখানকার পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন বিনাশযোগ্য মূর্ত্তিমান্ কহিতে সাহস করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েন? ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য অন্য আর কি আছে যে, ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মনঃ, মনঃ হইতে পর যে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা, তাঁহাকে বুদ্ধির অধীন যে মনঃ; সেই মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয়, তাহার মধ্যে এক ইন্দ্রিয় যে চক্ষু, সেই চক্ষুর গোচরযোগ্য করিয়া কহেন?"

রাজা রাম মোহন রায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। রজ্জু সত্য, সর্প মিথ্যা। সেইরূপ বেদান্তের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, জগৎরূপবিশিষ্ট। যাহা রূপবিশিষ্ট তাহা ভ্রান্তি, মায়ামাত্র, মানুষের মনের অজ্ঞানতা মাত্র। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের বাস্তব সত্তা

নাই, সুতরাং রূপ ইত্যাদি জীবের মনেতেই রহিয়াছে, উহা ব্রহ্মস্বরূপ নহে।

যাঁহারা বলেন, পরমেশ্বর স্বয়ং এই বিশ্ব হইয়াছেন, তাঁহার আর স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তাঁহাদিগকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করি,—পরমেশ্বর নিত্য, জগৎ অনিত্য। পরমেশ্বর সার সত্য, জগৎ অসার, অসত্য। পরমেশ্বর স্থায়ী, অপরিবর্ত্তনীয়, জগৎ অস্থায়ী চিরপরিবর্ত্তনশীল। যখন উভয়ের লক্ষণে এতদূর পার্থক্য, বা বৈপরীত্য, তখন কেমন করিয়া বলিবে যে, জগৎ ও ঈশ্বর এক,—তিনি স্বয়ং এই জগৎ হইয়াছেন? এই জগতের অতীত তাঁহার স্বতন্ত্র সত্তা আছে কি না?

ব্রহ্মশক্তি হইতে জগতের উৎপত্তি,—ব্রহ্ম স্বয়ং জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, তাঁহার আর জগতের অতীত স্বতন্ত্র সত্তা নাই, এমন কথা বলিলে তাঁহার নির্ব্বিকারস্বরূপে আঘাত করা হয়। সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর বিকার প্রাপ্ত হইয়া জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিলে, তাঁহার নির্ব্বিকার অপরিবর্ত্তনীয়স্বরূপে দোষস্পর্শ হয়।

কিছু ছিল না, আপনা হইতে জগৎ হইল, ইহা সম্ভব নহে। কিছুনা হইতে কখন কিছু হয় না। না হইতে হাঁ হয় না। "নাসতোসজ্জায়তে।" বিনাকারণে কার্য্য হয় না। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন দর্শন বলেন, মহিষের শৃঙ্গ হয়, মনুষ্যের হয় না। মহিষদেহে অবশ্য এরূপ কারণ আছে, যাহাতে শৃঙ্গোৎপত্তি হয়, মানবদেহে সেরূপ কারণ বিদ্যমান নাই, সুতরাং মনুষ্যের শৃঙ্গ হয় না। অসৎ হইতে কখন সৎ হয় না।

এই জগৎ কেমন করিয়া হইল? ইহার কারণরূপী পূর্ব্ববর্ত্তী কি? ব্রহ্মশক্তি। ছিল ব্রহ্মশক্তি, হইল জগৎ। ব্রহ্ম জগৎ হইয়া গেলেন, তাঁহার আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকিল না, এরূপ বলিলে নিত্যকে, অনিত্য, সত্য সার পদার্থকে অসার অস্থায়ী; অপরিবর্ত্তনীয়কে পরিবর্ত্তনশীল; নির্ব্বিকার পূর্ণব্রহ্মকে বিকার প্রাপ্ত বলা হয়, ব্রহ্মস্বরূপে আঘাত করা হয়।

ব্রহ্মশক্তি জগৎ হইল। পদার্থকে ছাড়িয়া তাহার শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা সম্ভব নহে। সুতরাং ব্রহ্মশক্তি জগৎরূপে প্রকাশ হইয়াছে বলিলে, ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রকাশ হইয়াছেন, বলা হয়। ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মস্বরূপ হইতে ভিন্ন নহে। ব্রহ্মশক্তি জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে বলিলে, সৎস্বরূপ ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রকাশ হইয়াছেন বলিতে হয়। ব্রহ্মের জ্ঞান, আনন্দ, প্রেম, দয়া, শান্তি, পবিত্রতা সকলই তাঁহার সৃষ্টি-লীলায় প্রকাশ হইয়াছে। এ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার সত্তায় সত্তাবান্।

কিন্তু ব্রহ্মাণ্ড অসার, অনিত্য, পরিবর্ত্তনশীল। সকলই ক্ষণবিধ্বংসী। তবে ব্রহ্মকে জগৎ ও জগৎকে ব্রহ্ম কেমন করিয়া বলা যায়? তিনি জগতের অতীত, নিত্য, সত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, অনাদ্যনন্ত পুরুষ। এ জগৎ তাঁহার সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ। জ্ঞানীগণ তাঁহাকে বিশ্বরূপ বলেন। কিন্তু বিশ্বরূপ তাঁহার সাময়িক প্রকাশমাত্র,—তাঁহার সৃষ্টিলীলা। উহা তাঁহার প্রকৃতস্বরূপ নহে। তিনি সচ্চিদানন্দ। অন্তরে সচ্চিদানন্দরূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিলে, তাঁহাকে প্রকৃতরূপে দেখা হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দে তাঁহার প্রকাশ। কিন্তু ঐ সকল অস্থায়ী, বহির্ব্বিষয়ে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পায়না। তিনি সচ্চিদানন্দ। প্রহ্লাদ-চরিত্র-যাত্রায় হাতী দেখিলে, যে

ব্যক্তি ছাতী সাজিয়াছে তাহাকে দেখা হয় না, তাহার সহিত পরিচয় হয় না। এজগৎ,—এই সকল রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দও সেইরূপ।

যদি এমনও কল্পনা করা যায় যে, পরমেশ্বর মানবদেহ ধারণ করিয়া উপাসকের সম্মুখীন হন, তাহা হইলে ঐ সম্মুখস্থ বৃক্ষটি দেখা, আর সেই প্রকাশিত মূর্ত্তি দেখা, একই কথা। ঐ বৃক্ষটি ঈশ্বরেচ্ছায় সৃষ্ট হইয়াছে, সেই মূর্ত্তিও ঈশ্বরেচ্ছায় সৃষ্ট। উভয়ই সৃষ্ট পদার্থ। ঐ বৃক্ষ নিত্যপদার্থ নহে, সেই মূর্ত্তিও নিত্য পদার্থ নহে। ঐ বৃক্ষ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় স্থিতি করিতেছে, সেই মূর্ত্তির স্থায়িত্বও পরমেশ্বরের ইচ্ছায়। ঐ বৃক্ষে পরমেশ্বরের সত্তা রহিয়াছে, সেই মূর্ত্তিতেও পরমেশ্বরের সত্তা। সুতরাং ঐ বৃক্ষটি দেখিলে, পরমেশ্বরকে যেমন দেখা হয়, যদি তিনি কোন মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশ হন, সেই মূর্ত্তি দেখিলেও তাহাকে সেইরূপ দেখাই হয়। সৎ, চিৎ, আনন্দরূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না করিলে তাহার প্রকৃত দর্শন হয় না। ভক্ত বিশ্বাসীজন, স্থাবর জঙ্গমে তাঁহাকে যে ভাবে দর্শন করিতেছেন, তিনি যদি রূপ ধরিয়া আসেন, তদপেক্ষা অধিক আর কিছুই হয় না। এস্থলে আর একটি কথা মনে করা উচিত। যদি কোন ব্যক্তি হঠাৎ কোন দিন শূন্যমার্গে শিব কৃষ্ণাদি কোনরূপ দেখিয়া মনে করেন যে, তাঁহার ইষ্ট দেবতার দর্শন হইল, তাহা হইলে সে ব্যক্তির যে ভ্রান্তি জন্মে নাই, তাহার কি কোন প্রমাণ প্রদর্শিত হইতে পারে? উহা যে তাঁহার মস্তিষ্কেরই ক্রিয়া নহে, অথবা কোন অজ্ঞাত অদৃশ্য শক্তিদ্বারা যে উহা উৎপন্ন নহে, কে ইহা প্রতিপন্ন করিতে পারে?

পরমেশ্বর চিন্ময়, অরূপ। তিনি অনাদ্যনন্ত মহান্। তিনি পরিমিত ক্ষুদ্র পদার্থ নহেন। তাঁহার প্রতিমা অসম্ভব। উপনিষদ্ বলিতেছেন,—"ন তস্য প্রতিমা অস্তি।" তাঁহার প্রতিমা নাই। প্রতিমা অবলম্বন তাঁহার পূজা, কল্পিত পূজা।

সৃষ্ট পদার্থ অবলম্বনে ঈশ্বর-পূজা এবং প্রতিমা অবলম্বনে পূজা, এ উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কল্পনা ও সত্যে যত প্রভেদ, এ উভয়ের মধ্যেও তত প্রভেদ।

জড়জগৎ ঈশ্বর-পূজার সাহায্য করে। সৃষ্টি ও স্রষ্টা এ উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ। জগৎ ও জগদীশ্বর, এ উভয়ের মধ্যে অতি নিকট, অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং অতি সহজে, অতি স্বাভাবিকরূপে, এই জগৎ জগদীশ্বরকে স্মরণ করাইয়া দেয়,—তাঁহার ভাব হৃদয়ে প্রতিভাত করিয়া দেয়। এই সুকৌশল-সম্পন্ন, অত্যাশ্চর্য্য, সৌন্দর্য্যময় ব্রহ্মাণ্ড, সেই পরমজ্ঞান, ভূমা মহান্, নিরবদ্য সৌন্দর্য্যসার, পূর্ণ পুরুষের রচিত। তাঁহার শক্তি, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার মঙ্গলভাব, সমগ্রভাবে সকল ব্রহ্মাণ্ডে, এবং তাহার অন্তর্গত ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক পদার্থে প্রতিনিয়ত প্রকাশিত। ক্ষুদ্রতম বালুকাকণা হইতে প্রকাণ্ড, অত্যুচ্চ হিমালয় পর্য্যন্ত, তৃণকণিকা হইতে বৃহৎ বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত, সামান্য কীটাণু হইতে সুবৃহৎ মাতঙ্গ পর্য্যন্ত, শিশির কণিকা হইতে অকূল, সুগভীর সাগর পর্য্যন্ত;—নিম্নে এই সসাগরা সকাননা ধরণী হইতে উর্দ্ধে গণনাতীত লোকমণ্ডল পর্য্যন্ত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে, ব্রহ্মাণ্ডপতির

নিরুপম মহিমা, অদ্ভুত শক্তি, অপার জ্ঞান, এবং অতুল গভীর করুণা ও প্রেমের অসংখ্য অগণ্য নিদর্শন অহোরাত্র নবচক্ষুর সম্মুখে প্রদর্শন করিতেছে।

কার্য্য দেখিলেই, মানসিক নিয়মানুসারে, তাহার কারণকে স্মরণ হয়। জগৎ দেখিলেই জগৎ কর্ত্তাকে স্মরণ হওয়া স্বাভাবিক। জগৎকার্য্যে তাঁহার যে শক্তি, জ্ঞান ও মঙ্গল ভাব প্রকাশিত রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং জগৎকার্য্য অবলম্বনে পরমেশ্বরের পূজা যারপর নাই সহজ ও স্বাভাবিক।

কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে বলিয়া জগৎকার্য্য অবলম্বনে জগদীশ্বরের পূজা যেমন স্বাভাবিক, একটা পুত্তলিকা অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরপূজা কখনই সেরূপ নহে। সৃষ্টি দেখিলেই স্রষ্টাকে মনে হয়, প্রকৃতি দেখিলেই পুরুষকে মনে হয়, ইহা মানবমনের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। তোমার কোন প্রিয়জনের হস্তরচিত একটি সামগ্রী দেখিলে যেমন সহজে, স্বভাবতঃ তাঁহাকে স্মরণ হইবে, কুম্ভকার নির্ম্মিত একটি মৃন্ময় মূর্ত্তি দেখিলে সেইরূপ সহজে তাঁহাকে স্মরণ হইবার কি সম্ভাবনা আছে?

এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, কার্য্য কারণ সম্বন্ধের ন্যায় সাদৃশ্যও স্মৃতিকে সাহায্য করে। কোন ব্যক্তির হস্তরচিত কোন সামগ্রী দেখিলে যেমন সেই ব্যক্তিকে স্মরণ হয়, সেইরূপ, তাঁহার একখানি ছবি দেখিলে কি তাঁহাকে স্মরণ হয় না?

নিশ্চয়ই হয়। মানুষের সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কোন পরিচিত ব্যক্তির প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই স্মরণ হয়। কিন্তু সেই অনাদ্যনন্ত মহান্ পুরুষের ছবি আঁকিবে কে? সেই ইন্দ্রিয়াতীত, অপার, অগম্য চিন্ময় আদিকারণের প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে কে? সে শিল্পী, সে চিত্রকর কোথায়? পূজ্যপাদ প্রাচীন মহর্ষি উপনিষদে যাঁহার বিষয়ে বলিতেছেন,—
যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ।
আনন্দং ব্রহ্মণোবিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন॥

মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, তিনি কদাপি ভয় প্রাপ্ত হন না।

ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নোমনো
ন বিদ্মো ন বিজানী মোযথৈ তদনুশিষ্যাৎ।
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যেনস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে॥

তিনি চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, এবং মনেরও গম্য নহেন, আমরা তাঁহার বিশেষ কিছুই জানিনা, এবং ইহাও জানিনা যে, কি প্রকারে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়। তিনি বিদিত কি অবিদিত তাবৎ বস্তু হইতে ভিন্ন। যে সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যেরা আমাদিগকে ব্রহ্মবিষয় ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের সন্নিধানে এই প্রকার শুনিয়াছি।

যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধিনেদং যদিদমুপাসতে॥

যিনি বাক্যের বচনীয় নহেন, বাক্য যাঁহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে।

ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যেরা কহেন, লোকে

মনের দ্বারা যাহাকে মনন করিতে পারেনা, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখন ব্রহ্ম নহে।

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যোনস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥

আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি,এমনও নহে,জানি যে এমনও নহে, এই বাক্যের মর্ম্ম যিনি আমাদিগের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।

যস্যামতং তস্য মতং মতংযস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥

যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে, আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানি নাই, তাঁহারই ব্রহ্মকে জানা হইয়াছে। আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে, আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি, তাঁহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই। উত্তম জ্ঞানবান্ ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে, আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানি নাই; যে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানবান্ নহে, তাহার এই বিশ্বাস যে, আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি।

ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদি হা বেদীমহতী বিনষ্টিঃ
ভূতেষু ভূতেষু বিচিন্ত্য ধীরাঃ
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥

এখানে তাঁহাকে জানিতে পারিলে জন্ম সার্থক হয়, না জানিতে পারিলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয়; অতএব ধীরেরা স্থাবর জঙ্গম সমুদায় বস্তুতে একমাত্র পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া এ লোক হইতে অবসৃত হইয়া অমর হয়েন।

প্রাচীন মহর্ষিগণ যাঁহাকে অনাদ্যনন্ত ভূমা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং স্থাবর জঙ্গম সমুদায় পদার্থে তাঁহাকে উপলব্ধি করার কথা কহিতেছেন, যিনি বাক্যের অতীত, মনের অতীত, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে কে? মহর্ষিগণ উপনিষদে স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্তকরিয়াছেন, "ন তস্য প্রতিমা-অস্তি।"

সৃষ্ট পদার্থকে অবলম্বন করিয়া স্রষ্টার উপাসনা, এই আশ্চর্য্য, সুন্দর জগৎ অবলম্বন করিয়া জগদীশ্বরের উপাসনা যুক্তিযুক্ত ও সম্ভব বটে, কিন্তু নিরবলম্বভাবে তাঁহার উপাসনা কি সম্ভব নহে? এস্থলে এ প্রশ্ন কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। সাধনের প্রথমাবস্থায় অবলম্বন প্রয়োজন। জগৎ-কার্য্যের আলোচনা, শাস্ত্রপাঠ, মহাত্মাদিগের মহৎ জীবনের অনুশীলন, নামজপ প্রভৃতি উপায় সাধকগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু নিরবলম্বভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত হওয়া সাধনের উচ্চ অবস্থায় সম্ভব। সমাধিস্থ যোগী নিরবলম্ব ব্রহ্মযোগ সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হন। বহির্জগৎ হইতে প্রস্থান করিয়া, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের অতীত অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সিদ্ধ মহাত্মা ব্রহ্মসহবাসসুখে পরিতৃপ্ত হন।

অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বাধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।"

ধীর ব্যক্তি পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সংযোগদ্বারা অধ্যাত্মযোগে সেই পরম দেবতাকে জানিয়া হর্ষ শোক হইতে মুক্ত হন।

তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।

তাঁহাকে যে ধীরেরা স্বীয় আত্মাতে সাক্ষাৎ দৃষ্টি করেন, তাঁহাদের নিত্য শান্তি

হয়, অপর ব্যক্তিদিগের তাহা কদাপি হয় না।

ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাত্মাগণ সেই ইন্দ্রিয়াতীত সত্য রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সত্যস্বরূপের সঙ্গে একীভূত হইয়া যান। জড়জগৎ যদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তথাচ তাঁহারা অবিচলিত ভাবে পরমানন্দস্বরূপে অবস্থিতি করেন। উচ্চতম অবস্থায় ভিতর বাহির সমান হইয়া যায়। চক্ষু মুদিয়া তিনি, চক্ষু খুলিয়াও তিনি। তিনি সর্ব্বশক্তিমান। সুতরাং মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিবেন না কেন?

এখন কেহ বলিতে পারেন যে, পরমেশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ হইলেও তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান্, তখন ইচ্ছা করিলে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারিবেন না কেন? ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভগবান রূপ ধারণ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? মানিলাম, তিনি স্বরূপতঃ নিরাকার চৈতন্যময়। কিন্তু যখন তাঁহার শক্তির সীমা নাই, তখন তিনি ইচ্ছা করিলে সাকার রূপে প্রকাশ হইতে পারিবেন না কেন? অথবা জগতের হিতের জন্য দেশ বিশেষে কাল বিশেষে মনুষ্যদেহধারণ করিয়া তাহার পৃথিবীতলে অবতার হইবার অসম্ভাবনা কি?

এই আপত্তির উত্তরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কি বলিয়াছেন, দেখুন।— "জগতের স্রষ্ট্যাদিবিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান্ বটেন, কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপের নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে, এমত স্বীকার করিলে, জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের নাশ হওনের সম্ভাবনা, সুতরাং স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু যাহার নাশ সম্ভব সে ব্রহ্ম নহে; অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান হয়েন, আপনার স্বরূপের নাশে শক্তিমান্ নহেন। এই নিমিত্তই স্বভাবতঃ অমূর্ত্তি ব্রহ্ম কদাপি সমূর্ত্তি হইতে পারেন না। যেহেতু সমূর্ত্তি হইলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় অর্থাৎ পরিমাণ এবং আকাশাদির ব্যাপ্যত্ব ইত্যাদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকল তাঁহাতে উপস্থিত হইবেক।"

রাজা রামমোহনরায় যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় বিষয়ে সর্ব্বশক্তিমান হইলেও তাঁহার আপনার স্বরূপ নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে, এমন স্বীকার করা যাইতে পারে না, কেননা ব্রহ্ম যেমন জগৎকে বিনাশ করিতে পারেন, সেইরূপ তিনি আপনাকে আপনি বিনাশ করিতে পারেন, এরূপ কথা বলিলে ব্রহ্মের নাশের সম্ভাবনা রহিল। কিন্তু যাঁহার নাশের সম্ভাবনা আছে, সে কখন ব্রহ্ম নহে। সুতরাং ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া আপনার স্বরূপের বিপর্য্যয় করিয়া মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারেন, ইহা যুক্তি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। নিরাকার ব্রহ্ম, মূর্ত্তি ধারণ করিলে যে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় হয়, তদ্বিষয়ে মহাত্মা রামমোহনরায় বলিতেছেন,—"যখন মূর্ত্তিস্বীকার কি ধ্যানে কি প্রত্যক্ষে করিবে, সে যদি অত্যন্ত বৃহদাকার হয়, তথাপি আকাশের মধ্যগত হইয়া পরিমিত এবং আকাশের ব্যাপ্য অবশ্য হইবেক, কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হয়েন, কোনমতে পরিমিত এবং কাহারও ব্যাপ্য নহেন।"

ক্রমশঃ

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

পুলিস ও লোকরক্ষা। (১)

সর্ব্বদেশে, সর্ব্বরাজ্যে চৌর্য্য, হত্যা, বলাৎকার প্রভৃতি অত্যাচার ঘটিয়া থাকে। এই মর্ত্তালোকে কাম, ক্রোধ, লোভ, আদি দোষ-পরায়ণ লোকের সংখ্যাই অধিক। নিষ্পাপ লোক বিরল। সময়ে সময়ে কাম, ক্রোধ আদি দোষবশে সুশিক্ষিত ব্যক্তিরও পদস্খলন ও অধঃপতন দেখা যায়। এই সকল রিপুর আবির্ভাবে বিজ্ঞ এবং অজ্ঞের মধ্যে কোনও বৈলক্ষণ্য থাকে না। তাহাদের কার্য্যাকার্য্য ও হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। মনুষ্যও পশুবৎ ব্যবহার করে। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ এবং উত্তম ও অধম পরস্পরের মুখাপেক্ষা রাখে না এবং পরস্পরকে ভয় করে না। পাপাচারী যমদণ্ড বা পরলোকের ভয় করে না। কেবল রাজদণ্ডকে ভয় করে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন রাজার ধর্ম্ম। স্বেচ্ছাচারী দুর্বৃত্ত দণ্ডনীয়। তাহার নিগ্রহ করাই ধর্ম্ম। ইহাকেই রাজদণ্ড বলে। ইহাতেই শিষ্টের ও দুষ্টের মঙ্গল সম্পাদন হয়। এই দণ্ড ভয়ে সমস্ত লোক নত ও ভীত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে যথানিয়মে ব্যবস্থিত রহিয়াছে এবং ইহাতেই গৃহস্থ ও ভিক্ষু প্রভৃতি সকল আশ্রমধারীর লোকযাত্রা সিদ্ধ হইতেছে। সকল লোকের নিদ্রাবস্থাতেও এই দণ্ড জাগরিত রহিয়াছে এবং সর্ব্বত্র সকলকে সদাই রক্ষা করিতেছে। যে ন্যায়পরায়ণ রাজা লোক রক্ষা স্বরূপ এই দণ্ডকে নিয়ত সমুদ্যত রাখিয়াছেন, তিনিই ধন্য এবং তাঁহার প্রজাই নিয়ত নির্বিঘ্ন। আর যে রাজা এই ধর্ম্মের সম্যক্ প্রতিপালনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেন, তাঁহার রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হয়।

রাজ্য মধ্যে যত অত্যাচার ঘটিয়া থাকে, তৎসমুদায় রাজার গোচর হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা গোচরে আইসে, তাহাতেও সকল অত্যাচারীর অনুসরণ হয় না। অপরাধীর অনুসন্ধান হইলেও সকল স্থলে তাহার দণ্ডবিধান হওয়ার সম্ভাবনা নাই। রাজার শাসনপ্রণালী যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, দণ্ড যতই কঠিন হউকনা কেন, দুর্বৃত্তের অত্যাচার সম্পূর্ণরূপে উন্মূলিত করিবার সম্ভাবনা নাই। তবে দুর্বৃত্তের উপরে রাজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে, এই জ্ঞানই তাহার পাপাচার-চেষ্টা সংযত করিয়া রাখে। কখন কখন রাজার দণ্ডবিধান প্রয়াস বিফল হয় এবং প্রকৃতদোষী এড়াইয়া যায়। ইহাতে তত দোষ হয় না, কিন্তু রাজার ঔদাসীন্য, অনবধানতা, অসীম অনর্থের মূল।

এই বিষয় ভারতের ভূতপূর্ব্ব আর্য্য রাজগণের ভূরি ভূরি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে, কিন্তু সে সকল আজ কাল অনেকের নিকটে কেবল গল্প বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে।

প্রজানাং বিনয়াধারাদ রক্ষণাৎ ভরণাদপি
স পিতা পিতর স্তেষাং কেবলং জন্মহেতবঃ।

সে রাজা প্রজাদিগের ভরণ পোষণ, শিক্ষাদান এবং আপদ হইতে রক্ষা করিয়া নিয়ত পিতার কার্য্য করিতেন, তাহাদের পিতা মাতা কেবল জন্মদাতা মাত্র ছিল।

এক্ষণে ভারতের অপার পরিবর্ত্তন। কালক্রমে ভারত সম্রাট শূন্য হইল। বিভিন্ন প্রদেশে বহুতর রাজ্য সমুত্থিত হইল ও শত শত রাজা যথেচ্ছরূপে বিরাজ করিতে

লাগিল। ক্রমে ভারত ছিন্নভিন্ন কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অন্তঃসারশূন্য ও দুর্ব্বল হইতে লাগিল, কিন্তু কোন বিজাতীয় রাজা ভারত অধিকার করিবে, ইহা কাহারও মনে উদয় হইল না। উত্তরে ও পূর্ব্বে সমুন্নত পর্ব্বত প্রাকার এবং পশ্চিমে ও দক্ষিণে বিস্তীর্ণ মহার্ণব ভারতকে নিয়ত রক্ষা করিবে বলিয়া বলবতী ধারণা ছিল। কালক্রমে ইহার অন্যথা ভাব দৃষ্ট হইতে লাগিল। খ্রীষ্টাব্দের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীকদেশাধিপতি বীরবর আলেক্‌জাণ্ডার হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গমালা অতিক্রম করিয়া সসৈন্যে ভারতের উত্তরাংশে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইলেন এবং উত্তর প্রদেশ অধিকার করিলেন। কিন্তু ইহাতে ভারতের তাদৃশ অনিষ্ট ঘটে নাই, বরং ভারতবাসীর সঙ্গে গ্রীকদিগের সম্মিলনে উভয় দেশে অনেক অংশে মঙ্গল সাধন হইয়াছিল। গ্রীকসেনাপতি সেল্‌ফিউকসের প্রেরিত দূত প্রবীণ মেগাস্থিনিস্ মহোদয় চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বহুদিবস অবস্থান করিয়া ভারতের তাৎকালিক অবস্থা সম্যক্‌রূপে পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা অন্য কোন সভ্যজাতি অপলাপ করিতে পারেন নাই। তখন তিনি ভারতবর্ষে ১১৮টি স্বাধীন রাজ্য দেখিয়াছিলেন। মনুপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে সমস্ত রাজ্যের শাসন ব্যাপার ও লৌকিক ব্যবহার সম্পন্ন হইত। এক একটি জনপদ প্রজাপরতন্ত্র রাজ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত। গ্রামে কোন প্রকার অত্যাচার ঘটিলে গ্রামবাসীরাই তাহার প্রতিবিধান করিত। ভারতবাসীদের সত্যপ্রিয়তা, স্ত্রীজাতির সতীত্বপরায়ণতা, পুরুষের সাহসিকতা, মামলা মোকদ্দমার ন্যূনতা, দেশ মধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সমস্ত বস্তুর সদ্ভাব, দাসত্বের একান্ত অভাব, লোকদের অপার রাজভক্তি ও অদ্ভুত শিল্পশক্তি দেখিয়া মেগাস্থিনিস্ মহোদয় সাতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। এই সকল অবস্থা দ্বারা ভারত মধ্যে যে রাজ্যশাসন প্রণালীর বিশুদ্ধ ভাব এবং চিরশান্তি সুখের সদ্ভাব ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয়। অনন্তর খ্রীষ্টাব্দের প্রায় ৮ শত শতাব্দী হইতে ১৭ শত শতাব্দী পর্য্যন্ত আরব, তুরস্ক, তাতার দেশীয় বিভিন্ন যবন সৈন্য দলে দলে হিমাচল অতিক্রম করিয়া ভারতের মস্তকে পদাঘাত করিতে এবং ইহাকে যথেচ্ছরূপে ভোগ করিতে লাগিল। এই দীর্ঘকাল ম্লেচ্ছগণের স্বেচ্ছাচারিতা নিবন্ধন ভারতের পূর্ব্বতন আচার ব্যবহার বিচলিত ও কলুষিত হইতে থাকিল। যবন রাজপ্রবর আকবর বাদসার সময়ে আবার রাজা মানসিংহ ও রাজা তোডরমল্ল বহুতর বিষয়ে আর্য্য রাজগণের অনুষ্ঠিত নিয়ম সকল বহুমান পূর্ব্বক অব্যাহত রাখিয়াছিলেন।

কালক্রমে প্রায় চারিশত শতাব্দী পূর্ব্বে দ্বীপান্তরবর্ত্তী শ্বেতমূর্ত্তি কতিপয় বণিকদল বিস্তীর্ণ মহার্ণব উত্তীর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে ভারতের তীরে পণ্যতরী লাগাইয়া উকিঝুকি মারিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ স্থান পাইলে পণ্যদ্রব্য মেলিয়া দেখাইবার ইচ্ছা। তন্মধ্যে ব্রিটিশ বণিকেরা ক্রমে ক্রমে কাল কৌশলে সৌরাষ্ট্র, বোম্বে, মান্দ্রাজ, মসলীপত্তন, কলিকাতা, গোবিন্দপুর প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যকার্য্য খুলিয়া বসিলেন এবং স্বদেশীয় অন্যান্য বণিক সম্প্রদায়দিগকে পরাভূত ও দূরীভূত করিলেন। কিন্তু তখনও উঁহাদের রাজ্য লাভের লালসা জন্মে নাই এবং

এই বণিকদল যে প্রবল রাবব দল হইয়া ভারতের পাদদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া বসিবে,ইহা কাহারও মনে উদয় হয় নাই। যবন-রাজগণ ক্রমে কামপরায়ণ ও ক্ষীণচেতন হইয়া পড়িল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাসির প্রান্তর কুরুক্ষেত্র হইয়া উঠিল। যবনজিত-ভারত পুনর্ব্বার বিজিত এবং ব্রিটনিয়ার করতলগত হইল। কিন্তু ব্রিটিস বণিক সম্প্রদায় তখন রাজ্য শাসন কার্য্যে একান্ত অপ্রস্তুত। দেশের অবস্থা একবারে অপরিজ্ঞাত। ভারতবর্ষ ধন ও রত্ন বর্ষণ করিয়া থাকে, বৈদেশিকদিগের এই বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী ইংরাজেরা প্রথম উদ্যমেই আপনাদের নির্ম্মিত নবাবের রুধির নিঃশেষে পান করিলেন। নবাব নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন, কিন্তু বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রজাপুঞ্জের রুধির টানিতে লাগিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিস বণিক দল বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যায় দেওয়ানী পদ পাইয়া সুবেদার হইলেন এবং কোম্পানী বাহাদুর এই নামে দেশমধ্যে পরিচিত হইলেন। কোম্পানি বাহাদুর তখন কেবল বাণিজ্য বিস্তার ও রাজস্ব সংগ্রহের উপায় অবলম্বন করিতে থাকিলেন। অসভ্য পরাজিত জাতি! ইহাদের সঙ্গে কাপড় তামাক ও লবণের টাকা এবং রাজস্ব আদায় করা মাত্র সম্পর্ক, এই রূপ ব্যবস্থা হইল। যবন রাজগণের কল বিকল হইয়া পড়িল। ইংরাজদিগের নূতন যল কলান হইল না— উপযুক্ত পরিচালকের অভাব। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ কোম্পানি বাহাদুরের মনোনীত হইয়া তখন গবর্ণর জেনেরেলের পদে অধিষ্ঠিত। তিনিই প্রথমে ভারতে ব্রিটিস রাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি সংস্থাপন করেন। কোন কোন বিষয়ে তাহার দক্ষতা ও দৃঢ়তা থাকিতে পারে, কিন্তু অসীম অর্থলালসা নিবন্ধন তাহাকে নিয়ত টলমল দেখা যাইত। প্রধান দেবতার যেরূপ প্রকৃতি, বাহনগণের প্রকৃতি প্রায় সেইরূপ হইয়া থাকে। এই নিয়ম অনুসারে গবর্ণর সাহেব মহাশয় কতকগুলি স্বদেশীয় এবং কতকগুলি এতদ্দেশীয় নরপিশাচ মনোনীত করিয়া পারিষদবর্গ স্থির করিলেন। প্রধান পুরুষের মতই প্রবল ও সর্ব্বত্র তাহারই বেশী দল বল।

কলিকাতায় একটি কাউন্সিল সংস্থাপিত হইল, কিন্তু তাহা নাম মাত্র থাকিল। কোম্পানির দাদন ও রাজস্ব আদায় সম্পর্কে নানা অত্যাচার ঘটিতে লাগিল। বণিক দলের মধ্যে অনেকেই রাজস্বের কালেক্টর হইলেন এবং নিজ নিজ নামে নানা কারবার চালাইতে লাগিলেন। বুদ্ধি, বিদ্যা ও মর্য্যাদার তিরস্কার এবং চাতুরী ও শঠতার পুরস্কার হইতে লাগিল। এই সময়ে আবার দারুণ দুর্ভিক্ষ আসিয়া বঙ্গমধ্যে দেখা দিল। দেশ কৃষকশূন্য উৎসন্ন প্রায় হইল। দস্যুদল সর্ব্বত্র প্রবল হইয়া উঠিল। বিলাতের ডাইরেক্টর সমিতি অন্ধকারাচ্ছন্ন। তথায় এখানকার প্রকৃত অবস্থার গোচর হইল না। দুর্ভাগ্য বশতঃ এই সমিতি হইতে প্রভূত অর্থরাশির নিমিত্ত তাগিদ হুকুম আসিতে লাগিল। এই হুকুম তামিল করিবার নিমিত্ত গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরকে নানা ছলে ও কৌশলে অর্থরাশি সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অত্যাচার পরম্পরা চলিতে থাকিল। ইহার পর ভারতের ভাগ্যে শুভগ্রহের উদয় হইল। এই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনারেল হইয়া

আসিলেন। ইহার পূর্ব্বে এইরূপ উন্নত-বংশীয় ও উন্নতমনা ইংরাজ ভারতে পদার্পণ করেন নাই। সেইরূপ উন্নতাশয় মন্ত্রিদ্বয় স্যারজন সোর ও সার জর্জ্জ বার্লো সাহেব মহোদয় গবর্ণর জেনেরেলের ডাইনে ও বামে বিরাজ করিতে লাগিলেন। এই তিন মহাত্মার প্রযত্নে নূতন রাজ্য পরিপালনের নিয়মাবলী এবং কোম্পানি বাহাদুরের কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য পদ্ধতি রীতি-মতে বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল। পণ্ডিত ও মৌলবীগণের সাহায্য সংগৃহীত হইতে লাগিল এবং লোকরক্ষা বিষয়ে ভারতের ভূতপূর্ব্ব আর্য্য ও যবন রাজন্যগণের অনুষ্ঠিত নিয়মাবলী সংশোধিত হইয়া আইন কানু-নের সৃষ্টি হইতে লাগিল। কথিত মহাত্মা-দিগের অনুষ্ঠিত সুনিয়মের শুভ ফল ফলিবার আশা জন্মিতে লাগিল সত্য, কিন্তু রাষ্ট্র বিপ্ল-বের আনুষঙ্গিক বিবিধ অনিষ্টাপাতের নিবারণ হইল না। ক্রমশঃ।

শ্রীরামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস।

সপ্তম অধ্যায়।

রাজবিধি, জ্যোতিষ এবং অন্যান্য শাস্ত্র।

অপরাধীদিগের সমুচিত দণ্ডবিধান এবং ব্যবস্থা শাস্ত্রানুমোদিত নিরপেক্ষ সুশাসনের উপরই সভ্যজগতের যাবতীয় সমাজ প্রণা-লীর সর্ব্বাঙ্গীন সুশৃঙ্খলা নির্ভর করে। ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থ সমূহে ব্যবস্থাশাস্ত্রের উপকারিতা সম্বন্ধে অনেক অনুকূলোক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"রাজবিধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই, ইহাই ক্ষত্রিয়ের পবিত্র-মন্ত্র। রাজবিধি রাজশক্তির প্রতিনিধিস্বরূপ, ইহারই সাহায্যে দুর্ব্বল সবলকে শাসনাধীনে রাখিতে সমর্থ হয়, ইহাতে আর সত্যেতে প্রভেদ নাই। যিনি সত্যের ঘোষণা করেন, সকলে তাঁহাকে রাজবিধিরই প্রচারক বলিয়া থাকে, এবং কেহ রাজবিধানের ঘোষণা করিলে, লোকে বলে, তিনি সত্যে-রই প্রচার করিতেছেন; সুতরাং সত্য এবং রাজবিধি ইহারা একই বস্তু" (বৃহদারণ্যক ১ম, ৪,১৪)।* কোন দেশে কোন ব্যবস্থা-শাস্ত্রবিদ্ রাজবিধির ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর এবং উচ্চতর সংজ্ঞা আজ পর্য্যন্ত উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন নাই।

তথাপি এই সময়ের শাসন প্রণালী কোনক্রমেই সর্ব্বাবয়ব সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ ছিল না, এবং অন্যান্য অনেক প্রাচীন জাতির ন্যায় ভারতবর্ষেও অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা অপরাধীর দোষপ্রমাণের প্রথা প্রচলিত ছিল।

"একজনের হস্ত ধারণ করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক কেহ কেহ বলে 'এই ব্যক্তি চুরি করিয়াছে, এ চৌর্য্যাপরাধে অভিযুক্ত, অভিযুক্ত ব্যক্তি অস্বীকার করিলে লৌহ শলাকা উত্তপ্ত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে চুরি করিয়া থাকিলে, তপ্ত লৌহশলাকা ধারণে চোরের হাত পুড়িয়া যায় এবং তাহার প্রাণবিনাশ করা হয়। যদি চুরি না করিয়াই থাকে, তবে তপ্ত লৌহশলাকা

ধরিলেও অভিযুক্তের হাত পুড়িয়া যায় না, সুতরাং তাহাকে মুক্তি প্রদান করা হইব" (ছান্দোগ্য ৬ষ্ঠ, ১৬)। নরহত্যা, পরস্বাপহরণ, মদ্যপান এবং ব্যভিচার, সচরাচর এই সকল অপরাধেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদেই জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক জ্ঞানের আদিম অস্ফুট অঙ্কুরাদি পরিদৃষ্ট হয়। দ্বাদশ চান্দ্র মাসে সংবৎসর বিভক্ত ছিল, সুতরাং সৌরবৎসরের সহিত চান্দ্র বৎসরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত একটী ত্রয়োদশ পরিপূরক মাসের সমাবেশ আবশ্যক হইত। (১ম, ২৫,৪)। বৎসরে মধু, মাধব, শুক্র, শচি, নভ এবং নভস্য—এই ষড়ঋতু বিভাগের প্রত্যেক ঋতুর ভিন্ন ভিন্ন অধিদেবতা ছিল (২য়,৩৬)। চন্দ্রের বিভিন্ন কলা নিচয়ের প্রত্যেক কলা স্বতন্ত্র দেবতারূপে পরিকল্পিত হইত। পূর্ণিমা, কৃষ্ণচতুর্দ্দশী এবং অমাবস্যার নাম ক্রমান্বয়ে রাকা, সিনিবালী এবং গুঙ্গু ছিল (২য়,৩২) চন্দ্রমণ্ডলে নক্ষত্র সম্পাতভেদে চন্দ্রকলার হ্রাস বৃদ্ধিরও উল্লেখ আছে (৮ম, ৩,২০), এবং কোন কোন নক্ষত্রের মঘা ও ফল্গুনী নামও প্রদত্ত হইয়াছিল (১০ম,৮৫,১৩)। বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ প্রধান উপনিষৎ প্রভৃতির সময়ে চন্দ্রের রাশিচক্র সম্যকরূপে অবধারিত হয়।

দ্বিতীয় যুগে, অর্থাৎ মহাভারতের সময়ে আর্য্যগণ উন্নতিপথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই সময়ে জ্যোতিষ শাস্ত্র বেদাঙ্গ মধ্যে পরিচালিত হয় এবং জ্যোতিষীগণ নক্ষত্রদর্শ এবং গণক আখ্যায় অভিহিত হন। (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ৪র্থ,৫ এবং শ্বেত(শুক্ল) যজুর্ব্বেদ ৩০শ,*১০,২০ দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে ক্রমান্বয়ে অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র গণনা পরিদৃষ্ট হয় এবং তৎপরবর্ত্তী অথর্ব্ব সংহিতা ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণেও ঐ গণনার পুনরুল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল নক্ষত্র সন্নিধি হেতু চন্দ্রের অবস্থান্তর ভেদানুসারে কি প্রকারে যাগানুষ্ঠানাদি পরিচালিত এবং অনুষ্ঠিত হইত, তাহা শতপথব্রাহ্মণের এক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে (১১শ,১,২) এই বর্ণনা অতিশয় দীর্ঘ বিধায় আমরা কেবল মাত্র দুই এক স্থান হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিব।

"১। কৃত্তিকা নক্ষত্রে দুইটী অগ্নিকুণ্ড সমিদ্ধ হইতে পারে, কেননা অগ্নিই কৃত্তিকাগণের অধিপতি। * *

"৬। রোহিণী নক্ষত্রে ও অগ্নি (কুণ্ড) সমিদ্ধ হইতে পারে, কারণ প্রজাপতি প্রজাবৃদ্ধি মানসে রোহিণী নক্ষত্রেই হোম করিয়াছিলেন। * *

"৮। মৃগশিরসা নক্ষত্রেও অগ্নি সমিদ্ধ হইতে পারে, কারণ মৃগশিরসাই প্রজাপতির মস্তক। ফল্গুনীতেও অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হওয়া বিধেয়, ফল্গুনীগণের অধিপতি ইন্দ্র এবং ইন্দ্রের সহিত ইহাদের নামেরও ঐক্য আছে, কারণ ইন্দ্রের গূঢ়নাম অর্জ্জুন এবং ফল্গুনীদ্বয়েরও অপর নাম অর্জ্জুনী।

"১২। উপহার প্রত্যাশীদিগের পক্ষে হস্তা নক্ষত্রে অগ্নি সমিন্ধন প্রশস্ত, তাহাতে অচিরাৎ অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা; কারণ হস্তদ্বারা যাহাই উৎসর্গীকৃত হয়, প্রতিদান স্বরূপ লোকে তাহাই প্রাপ্ত হয়।

"১৩। চিত্রা নক্ষত্রেও অগ্নি সমিদ্ধ হইতে পারে।" ইত্যাদি।

পূর্ব্বে উল্লেখিত হইয়াছে, বৈদিক যুগের অবসানকালে কিম্বা মহাভারতীয় যুগের প্রারম্ভেই আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ১৪০০ অব্দে চন্দ্রের রাশিচক্র নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ভারতীয় আর্য্যগণ স্বকীয় পর্য্যবেক্ষণ বলেই চন্দ্রের জ্যোতিশ্চক্র নির্দ্ধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই মত সর্ব্বপ্রথমে মহামতি কোলব্রুক সাহেব প্রচার করেন। বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডের সহিত তিথিনক্ষত্রাদির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা দ্বারাও অবশেষে নিঃসংশয়রূপে স্বিকৃত হইয়াছে যে, হিন্দুজ্যোতিষ ভারতবর্ষেই সমুদ্ভূত এবং উৎপন্ন হইয়াছিল,ইহাতে বৈদেশিক জ্যোতির্ব্বিদ্যা সমূহ হইতে কোন সাহায্য পরিগৃহীত হয় নাই। তথাপি কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত এ বিষয়ে যে তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন, তাহা বড়ই হাস্যজনক।

১৮৬০খ্রীষ্টাব্দে বিও নামক প্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত চীনদেশীয় "সিয়ু' নামক জ্যোতিষ প্রণালীকে তদ্দেশবাসীগণ দ্বারাই সমুদ্ভাবিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহা হইতে অনুমিত হইয়াছে যে,হিন্দুদিগের নক্ষত্রবিদ্যা এবং আরবীয়দিগের মনজিল অভিধেয় জ্যোতির্বিদ্যা এই উভয়ই চীনদেশীয় প্রথার রূপান্তর মাত্র। জার্ম্মাণ পণ্ডিত ল্যাসেনও এই মতে সায় দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবীণ পণ্ডিত ওয়েবার এই বিষয়ের গবেষণাতে প্রবৃত্ত হইয়া ১৮৬০ এবং ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দুইটী সুদীর্ঘ প্রস্তাব দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, চীনদিগের 'সিয়ু' হিন্দুদিগের অপেক্ষাকৃত আধুনিক নক্ষত্র-বিদ্যার রূপান্তর মাত্র। এই প্রকারে ওয়েবার সাহেব—হিন্দুগণ চীনদিগের নিকট হইতে নক্ষত্রজ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন—এই প্রাপ্ত মতের প্রত্যাখ্যান করেন, অধিকন্তু আরবীয় চান্দ্র রাশিচক্র যে ভারতবর্ষ হইতেই পরিগৃহীত হইয়াছে—যুক্তিবলে ইহাও সপ্রমাণ করেন। অতএব ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে মহামতি কোলব্রুক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বলিয়াছিলেন—"হিন্দুদিগের অয়নমণ্ডল তাহাদের নিজ উদ্ভাবিত বলিয়াই মনে হয়, আরবগণ নিশ্চয়ই ইহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল" সেই সিদ্ধান্তই ঠিক্, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

চীন এবং আরব সম্বন্ধীয় অনুমান প্রত্যাখ্যান করিয়া অধ্যাপক ওয়েবার আবার স্বকপোলকল্পিত এক অভিনব সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে হিন্দু চান্দ্র রাশিচক্র সম্ভবতঃ বাবিলন হইতে পরিগৃহীত হইয়া থাকিবে। এটী কেবল কল্পনা মাত্র, ইহাতে প্রমাণের লেশ মাত্র নাই, অতএব এ সিদ্ধান্ত পণ্ডিতদিগের আলোচনারও অযোগ্য। আসীরিয় পণ্ডিতগণ ব্যাবিলনিয়ানদের অশেষবিধ প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের মধ্যে চন্দ্রের রাশিচক্রের কোন আভাষই এপর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—ব্যাবিলনীয়গণ চান্দ্ররাশিচক্র সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। অধ্যাপক মোক্ষমূলর এ বিষয়ে যে সকল অভিমতটী ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়াই আমরা এই কথার উপসংহার করিব। "কেহ কেহ বলেন, ভারতবাসীদের চান্দ্র রাশিচক্রে যে সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের সমাবেশ আছে, তাহা ব্যাবিলন হইতে পরিগৃহীত; কিন্তু ব্যাবিলনে কেবলমাত্র সৌর রাশিচক্রই ছিল, বহু অনুসন্ধানের পর প্রাচীন দুর্ব্বোধ্য জটিল-

লিপি প্রভৃতি হইতে অন্যান্য অনেক বিবরণ সংগৃহীত হইয়া থাকিলেও চান্দ্ররাশিচক্র সম্বন্ধীয় কোন তত্ত্বই আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু ব্যাবিলনিয়াতে চান্দ্র রাশিচক্র ছিল— একথা মানিয়া লইলেও, যাঁহারা বৈদিক সাহিত্য এবং প্রাচীন বৈদিক যাগানুষ্ঠানাদির তত্ত্ব অবগত আছেন—তাঁহারা কোনমতেই সহসা বিশ্বাস করিতে পারিবেন না যে, আকাশমার্গের এই সামান্য বিভাগের জন্য হিন্দুগণ ব্যাবিলনিয়ানদের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন।"

এই সময়কার হিন্দুগণ যে কেবল চন্দ্রের জ্যোতিশ্চক্রই নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন— এমন নহে, তাঁহারা অয়নান্তবৃত্ত অবধারণ দ্বারা আবশ্যকীয় ঘটনাবলীর শুভলগ্নাদি নির্ণয় করিতেন, সংবৎসরকে দ্বাদশ মাসে বিভক্ত করিতেন এবং পূর্ণিমা তিথিস্থ নক্ষত্রের নামানুসারে প্রত্যেক মাসের নাম প্রদান করিতেন। অশ্বিনী নক্ষত্রে যে মাসে পূর্ণচন্দ্র সে মাসের নাম আশ্বিন, কৃত্তিকা নক্ষত্রে যে মাসে পূর্ণচন্দ্র সে মাসের নাম কার্ত্তিক, ইত্যাদি। বেণ্টলীর মতানুসারে দ্বাদশ মাসের এবম্বিধ নামকরণ খ্রীঃ পূঃ ১১৪১ অব্দে এবং চান্দ্র জ্যোতিশ্চক্র সংগঠন খ্রীঃ পূঃ ১৪২৬ অব্দে হইয়াছিল।

মহাভারতীয় যুগে জ্যোতিষের ন্যায় অন্যান্য অনেক বিদ্যারও উন্নতি হইয়াছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮ম, ১, ২) নারদ সনৎকুমারকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"আর্য্য, ঋক্‌বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, ৪র্থ অথর্ব্ববেদ, পঞ্চম ইতিহাস পুরাণ, প্রভৃতিতে আমার অধিকার (জ্ঞান) আছে। ইহা ভিন্ন বেদের বেদ (১), পিত্র্য (২), রাশি (৩), দৈব (৪), নিধি (৫), বাকবাক্য (৬), একায়ন (৭), দেববিদ্যা (৮), ব্রহ্মবিদ্যা (৯), ভূতবিদ্যা (১০), ক্ষত্রবিদ্যা (১১), নক্ষত্রবিদ্যা (১২), সর্পবিদ্যা (১৩), দেবজ্ঞান বিদ্যা (১৪), এই সমুদায়ও আমি অবগত আছি। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কত প্রকার শাস্ত্রের আলোচনা ছিল, এই তালিকা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে।

শ্রীরমেশ চন্দ্র দত্ত।

দুইখানি পত্র।

লণ্ডন ১৩, ফেব্রুয়ারি, ১৮৯১।

যেদিন প্রথম ইউরোপীয়নগর মেসিনাতে (Messina Sicily) পদার্পণ করি, যেদিন নাপোলি ও বিসুবিয়স (Naples and Vesuvius) দেখি, যেদিন প্রণালী পার হইয়া ডোবরে (Dover) আসি ও এই অসাধারণ লণ্ডন লোকারণ্যে পঁহুছি, সেই একদিন, আর আজ এই এক দিন।

---

(1) Grammar
(2) Rules for Sacrifices to ancestors.
(3) Arithmetic
(4) Science of Portents.
(5) Science of time
(6) Logic
(7) Ethics.
(8) Etymology
(9) Pronunciation and Prosody.
(10) Science of demons.
(11) Science of weapons.
(12) Astronomy.
(13) Science of Snakes
(14) Science about Spirits

দেখিতে দেখিতে তিন বৎসর কাল ভূতের গর্ভে বিলীন হইল, আমারও ইউরোপীয় প্রবাসের দিন ফুরাইল। প্রথম প্রথম ভাবিতাম, কবে আবার পুনরায় প্রাণপ্রিয় জন্মভূমির সহিত সাক্ষাৎ হইবে, আর অদ্য গভীর দুঃখের সহিত ইউরোপের নিকট, ইংলণ্ডের নিকট, ব্রিটীশ মিউজিয়মের নিকট বিদায় লইতে দাঁড়াইয়াছি।

প্রথম ব্রিটীশ মিউজিয়ম:—আজ মন বড়ই ব্যাকুল, বাস্তবিক অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে হইতেছে, কোন্ প্রাণে জন্মের মত তোমার নিকট বিদায় লই? তোমার এই অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডারে অল্প কয়বৎসর নানাপ্রকার উপাদেয় সামগ্রীর আস্বাদ গ্রহণ করিয়া চিত্ত পূত ও পুলকিত হইয়াছে, কিন্তু যখন দেখি, এই কালমধ্যে তোমার অসীম জ্ঞান-জলধির একবিন্দু মাত্রও আত্মসাৎ করিতে সক্ষম হই নাই, তখন নিজের অবস্থাকে দারুণ ধিক্কার করিতে ইচ্ছা হয়, আপশোষ হয় কেন আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত তোমার পরম পবিত্র ঘরে কাটাইতে পাইলাম না। প্রাতঃকাল হইতে একপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত তোমার মন্দিরে সময় যে কোথা দিয়া গিয়াছে, কিছুই টের পাই নাই। ভগবানের নিকট অভিমান করি বটে, কিন্তু পরক্ষণেই নিজের বিষম অযোগ্যতার দিকে তাকাইয়া কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বলি 'দয়াল হে! আমার মত নরাধমের ভাগ্যে যে এই কয়বৎসরকাল এরূপ মহাতীর্থ স্থান সম্ভোগের অধিকার দিয়াছ, ইহার জন্য তোমার চরণে অসংখ্য ধন্যবাদ সহ বারবার নমস্কার করি।" সার কথা **Ars longa, vita brevis**—লক্ষ লক্ষ বৎসর পরমায়ু হইলেও তোমার মন্দিরে জ্ঞানময়ের পূজা শেষ করা অসম্ভব। বর্ত্তমান বিশ লক্ষের উপর তুমি প্রত্যেক বৎসর চল্লিশ হাজার নূতন গ্রন্থ বক্ষে স্থান দিতেছ; সাধ্য কি মানুষ তাহার ক্ষুদ্র ক্ষমতা লইয়া তোমার সহিত দৌড়িতে পারে।

সে যাহা হউক, কল্য হইতে আর তোমার ঘরে আসিতে পারিব না, একথা ভাবিতে প্রাণের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিতেছে। নিষ্ঠুর সংসারের কঠোর নিয়মাধীন হইয়া তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেই হইবে, শোকে ফল কি? শুধু জ্ঞান কেন? তোমার ঘরে বসিয়া পৃথিবীর চারিখণ্ডের নানা দেশের বহু শ্রেণীর জীবের সহিত আলাপ পরিচয় বন্ধুতা হইল, সার্ব্বলৌকিক প্রেম ও ভ্রাতৃভাব তুমি কার্য্যত শিক্ষা দিলে, কোন কালে এ কথা ভুলিবার নয়। তোমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করে, এমন সাধ্য মানুষে সম্ভবে না। ধন্য ব্রিটীশ জাতি। বহু পুণ্য বলে তোমাকে এই বিশ্ব রাজধানী মহা নগরে সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে।

দ্বিতীয় ইংলণ্ড—তোমার গুণ গ্রাম অনেকদিন হইতে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু সকল কথা বিশ্বাস করি নাই। বিশ্বাসের দুর্ব্বলতা, বা বুঝিতে অক্ষমতা তাহার কারণ নয়, কারণ অন্যত্র বিদ্যমান। যাহা হউক, এই কয় বৎসর তোমার প্রকৃত মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করিয়া নবজীবন লাভ করিলাম। ধনে মানে যশে যে পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছ, তুমি তাহার অযোগ্য নও। তবে কি তোমার মন্দ সন্তান নাই? তাহা অসম্ভব। মূল কথা এই যে, তোমার বহু সন্তান অত্যুৎকৃষ্ট, অন্য কোথাও এরূপ সুদুর্ল্লভ; মন্দের ভাগ কম। তোমার কতক গুলি সন্তান যে বাহিরে গিয়া দারুণ বিকৃত

ভাবাপন্ন হন, তাহা তোমার দোষ নয়, তাঁহাদের ব্যক্তিগত মূঢ়তা ও স্থানীয় জল বায়ুর দোষ। তোমার গৃহ ক্ষুদ্র, কিন্তু তুমি সমগ্র পৃথিবী ইহার ভিতর ধরিতে প্রস্তুত বলিলে চলে। প্রধান কথা, তোমার অত্যুদার স্বাধীন সার্ব্বভৌমিক ভাব জগতের প্রত্যেক জাতির বিশেষ শিক্ষার সামগ্রী। বিদেশীয় প্রবাসীগণের প্রতি তোমার আবাল বৃদ্ধ বণিতার ব্যবহার প্রকৃত মনুষ্যোচিত। তোমার শাসন প্রণালী ও রাজকীয় ব্যবস্থা সমূহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আর কোথাও ওরূপ কলের মত কারখানা দেখিলাম না। ধন্য তুমি যে, তোমার সন্তানগণ স্বদেশীয় ও বিদেশীয় প্রত্যেক অধিবাসীকে সকল প্রকার স্বাধীনতা দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। তুমি জগৎপূজ্য, এ ক্ষুদ্র পত্রে তোমার গুণগ্রামের বর্ণনা অসম্ভব।

জিব্রল্টার, ১০ ই মার্চ্চ, ১৮৯২।

"কঁহি নদীয়া কঁহি নালা, কঁহি দরিয়াকে কেনারা,
কঁহি জঙ্গল কঁহি শহরা, কঁহি মর্‌দাঁ বিরাবাঁ হ্যায়॥"

মরক্কো হইতে এখানে আসিয়াছি। মরক্কো ও স্পেনের পশ্চিমাংশ হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত একদিন মুসলমান ঘোড়া সদর্পে দৌড়িয়াছে। মহম্মদের ধর্ম্মবল যে বিপুল ছিল, তাহার প্রমাণ, ইউরোপে মূর ও তুরুষ্কের প্রভাব। প্যাগম্বরের অমিত শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আরবগণ যে এক কালে প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়াছিলেন, তাহার জের ইউরোপ আজও মিটাইতে পারে নাই। খ্রীষ্টান ইউরোপে অদ্যাপিও সতেজে নিত্য কোরাণ পাঠ হইতেছে, গোয়াডাল্‌কুইবার (Guadalquiver) তীরে কোরাণ সূত্রাঙ্কিত সুন্দর প্রকোষ্ঠাদি সহ মুসলমান রাজপ্রাসাদ আজও বিরাজ করিতেছে। গতবৎসর কনষ্টাণ্টিনোপলে দুই প্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রে সুলতান প্রাসাদান্তর্গত আহমদীয়া মসজিদের মিনারচূড়ায় যে সুমধুর আজান্‌ধ্বনি শুনিয়াছি, তাহা এ জীবনে ভুলিবার নয়। ওরূপ ভাবে দিনে পাঁচবার যাঁহারা চতুর্দ্দিকস্থ ভ্রাতৃবর্গকে ভগবদুপাসনার জন্য আহ্বান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ধর্ম্ম চিরজীবন্ত থাকিবারই কথা। কেবলমাত্র ১৬ বৎসরের বালক আলি ও স্ত্রী খাদিজাকে অবলম্বন করিয়া যিনি সংসারে সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে সাহসী ও প্রবৃত্ত হন, এবং সেই প্রচারের ফলে সহস্রাধিক বর্ষ পৃথিবীর অর্দ্ধেক স্থান ব্যাপিয়া যে ধর্ম্ম চলিতেছে, তিনি ও তাঁহার সেই ধর্ম্ম যে বিধাতার প্রেরিত, তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ নাই। এবিষয়ে খ্রীষ্টান কারলাইল (Carlyle) বলেন, "*Allah Akbar*, God is great;—and then also '*Islam*', that we must submit to God That our whole strength lies in resigned submission to Him, whatsoever He do to us. For this world, and for the other! The thing He sends to us, were it death and worse than death, shall be good, shall be best; we resign ourselves to God—'If this be Islam' says Goethe 'do we not all live in *Islam*?' Yes, all of us that have any moral life, we all live so. It has ever been held the highest wisdom for a man not merely to submit to Necessity,—Necessity will make him submit,—but to know and believe well that the stern thing which Necessity had ordered was the wisest, the best, the thing wanted there. To cease his frantic pretension of scanning this great God's World in his small fraction of a brain, to know that it *had* verily, though deep beyond his soundings, a Just Law, that the

soul of it was Good;—that his part in it was to conform to the Law of the Whole, and in devout silence follow that; not questioning it, obeying it as unquestionable." ইহাই যখন মহম্মদের প্রচারিত ধর্ম্ম, তখন ইহা সার্ব্বভৌমিক সনাতন ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

যদি কোন বিঘ্নবাধা না উপস্থিত হয়, অদ্য আমেরিকা যাত্রা করিবার কথা আছে। পরে পাসিফিক পাড়ি দিয়া জাপান চীন হইয়া দেশে যাইবার সঙ্কল্প, মালিক ভগবান; তাঁহার শক্তি ভিন্ন দুর্ব্বল ঘরবোনা বাঙ্গালী দ্বারা এতখানি সম্পূর্ণ অসম্ভব। এইখানে ইউরোপের নিকট বিদায়। বস ফোরসের ওপারে ও মরক্কোতে কতক সময় ব্যতীত ক্রমাগত এ যাবতকাল ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে কাটাইলাম। মেসিনা হইতে উত্তরাগুবীপ পর্য্যন্ত, কুস্তন্তনিয়া হইতে লিসবন ও সেণ্ট পিটার্স বর্গ হইতে আমষ্টার্ডাম্ পর্য্যন্ত দেশ সমুহ ও প্রধান প্রধান তীর্থ ও দৃশ্য এক প্রকার দেখা হইল। নাগরিক দৃশ্য মধ্যে গোল্ডন্ হর্ণ (Golden Horn) হইতে কন্‌ষ্টান্টি-নোপ্‌ল (Constantinople) ও টেগস্ নদী বক্ষ (Tagus) হইতে লিস্‌বন্ (Lisbon) দুইটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃশ্য, ইহা পর্য্যটকগণ একমুখে স্বীকার করিয়া থাকেন। ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিষয় সময়ান্তরে বলিবার মানস রহিল। এখন কেবল মোটামুটী গোটাকতক মনের কথা নিবেদন করিবার ইচ্ছা আছে।

পণ্ডিতবর ফ্রিম্যান বলেন—"Among the Greek themselves a vague remembrance of days long past—of days whose direct practical effect on modern affairs is slight indeed—has stood in the way of the development of a true and healthy national life" আমরা গ্রীকদের ধাড়ে যাই। এ ক্ষেত্রে বর্ত্তমান সময়ে একমাত্র উপায়,—ঢালিয়া সাজা। এতদ্ভিন্ন যিনি যত কথা বলিবেন, যত অভিনব প্রকারে জীর্ণসংস্কারের আন্দোলন করিবেন, পঙ্কোদ্ধারের পরামর্শ দিবেন, রিপুকর্ম্ম বা তালিতুলি দ্বারা সম্ভ্রম রাখিবার চেষ্টা পাইবেন, সমস্ত বানের জলে ভাসিয়া যাইবে। আর "কানা গরুর ভিন্ন গোয়াল" স্থাপনের উদ্যোগ সহ যত বিগত "আর্য্য গৌরবের" চীৎকার করা হইবে, ততই রসাতলে যাইবার কিকির মাত্র। এ কানসেঁড়ে ভাব (Exclusiveness) বহুকাল হইতে আমাদের সমগ্র ক্ষতি করিয়াছে, এখনও যদি তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়, আরও সমূহ ক্ষতি অনিবার্য্য। কবি মাঞ্জনী (Manzoni) গাইয়াছেন।

Are we not creatures of one hand divine,
Formed in one mould, to one redemption born,
Kindred alike where'er our skies may shine,
Where'er our sight first drank the vital morn?

ভগবানের ঘর হইতে কেহ "আর্য্য" "অনার্য্য" প্রভৃতি ছাপ লইয়া আসে না, জীবাত্মা বিশিষ্ট জীব মাত্রেই মহৎ মনুষ্য নামের অধিকারী ও পরমাত্মার প্রধান প্রিয় সামগ্রী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি উচ্চ নীচ আখড়া ত মহাদোষের কথা; হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ইত্যাদি প্রভেদ বাচক শব্দ সমূহও বিধাতার নিকট ঘৃণিত। ঈশ্বরের নিকট 'মানুষ' একমাত্র শ্রেণীবাচক শব্দ আছে। এই পৃথিবী গৃহে তিনি তাঁহার সেই মানব পরিবারকে সংস্থাপন করিয়াছেন, সকলে মিলিয়া জ্ঞান প্রেম পুণ্যে উন্নত হইবার জন্য। মানুষ এই ক্ষুদ্র গৃহে আসিয়া একরূপ দলাদলি করিবে, ভিন্ন

ভিন্ন প্রকোষ্ঠবাসীগণ ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়া পরস্পরের মধ্যে বৈরভাব স্থাপন করিবে, ইহা কখনই তাঁহার অভিপ্রেত নয়।

স্রষ্টা এক, মানুষ তাঁহার এক পরিবার, এই অনন্ত সত্যের উপর দাঁড়াইয়া কি দেখা যায়? সমগ্র মানবমণ্ডলীর উন্নতি একত্রে হওয়াই উচিত। একাংশকে পরিত্যাগ করিয়া অপরাংশ উঠিলে কালে উন্নতাংশের বিপদ সম্ভাবনা। যদি স্থানীয় বা অবস্থাগত কোন বিশেষ কারণে একাংশ উঠিতে সক্ষম হয়, নিজের উন্নতি রক্ষা হেতু তাহাদের কর্ত্তব্য পার্শ্বস্থ ভ্রাতৃগণকে উত্তোলন করিবার চেষ্টা করা। যদি সে কর্ত্তব্যে তাঁহারা ত্রুটি করেন, তাঁহাদের অধঃপতন অনিবার্য্য। ইহার প্রমাণ প্রাচীন হিন্দু, গ্রীক ও রোমানগণ। হিন্দুর ম্লেচ্ছ, গ্রীকের বার্ব্বেরিয়ান ও রোমাণের পেরিগ্রিনীর প্রতি বিজাতীয় উপেক্ষাভাব থাকা হেতু তিন জনেই যথা সময়ে কঠোর নিয়মাধীনে পতিত হইয়াছিলেন। যদি হিন্দুগণ তাঁহাদের চতুর্দ্দিকস্থ অনার্য্য শূদ্রদিগকে, গ্রীকগণ প্রতিবেশী ভিন্ন জাতীয় জীবগণকে ও রোমাণগণ পরদেশী পরাজিতগণকে ক্রমে আপনাদের সঙ্গে মিশাইয়া সমান উন্নত পদে আনিবার চেষ্টা করিতেন, কাহারও এরূপ পতন হইত না। যাহা হউক, গ্রীক ও রোমাণগণ পতনের পর খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভাবে নিজেদের ত্রুটি দেখিয়া ও স্বীকার করিয়া পুনরায় উঠিতে সমর্থ হইয়াছেন; আর আমরা দেখিয়াও আপনাদের ভ্রম-প্রমাদ দেখিব না, কাজেই অবনতির নিম্নতর সোপানে নামিতেছি। এরূপ ক্ষেত্রে ঢালিয়া সাজা ভিন্ন গত্যন্তর দেখি না। বাবা আদমের কালের বেদে কি বলিয়াছে, বা মান্ধাতার আমলের পুরাণে কি লিখিতেছে, তাহা দলীল করিয়া এই রেলওয়ে-টেলিগ্রাফ-টেলিফোন যুগের ব্যবস্থা ঠিক করা নেহাত বাতুলের কাজ। বেদ, পুরাণ, বাইবেল, কোরাণের স্থান এখন মিউজিয়মের মহাফেজখানায়, বর্ত্তমান সাংসারিক জগতে উহাদের বিশেষ ব্যবহার দেখা যায় না। মানবোন্নতির ইতিহাস সম্বন্ধে বা প্রত্নতত্ত্বাদির মীমাংসা ব্যতীত অন্য কোন কাজে ঐ সকল তামাদি গ্রন্থ আসিতে পারে না। জগতের শৈশব কালের পুঁথি, সেইকালে উহাদের বিশেষ ব্যবহার ও উপযোগীতা ছিল, এখন উহারা পুরাতন পঞ্জিকার মধ্যে। উহাদের মতে চলিতে গেলে সহস্র সহস্র বৎসরের গবেষণার ফল বর্ত্তমান সময়ের বিশেষ উপযোগী জীবন্ত বৈজ্ঞানিক সত্য গুলিকে পদদলিত করিয়া গারো, কুকি, সাঁওতালের দলে গিয়া মিশিতে হয়। তাই বলি ভাই, পুরাতন কল্কি ঢালিয়া নূতন কল্কিকে ভালরূপে অম্বুরি তামাক ভরিয়া, উত্তম একখানি তাওয়া তাহার উপর দিয়া তদুপরি টাট্‌কা গুল সাজাইয়া, বৈদ্যুতিক অগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত করিয়া, কলের পাখাতে বাতাস দিয়া, খস্ খস্ ও থার্ম্মাণ্টিডোটের হাওয়াতে বসিয়া অটোমাটিক্ গুড়গুড়িতে টানা যাউক, খুব আরাম সম্ভোগ হইবে। পোড়া কল্কিতে বারম্বার নূতন টিকা চড়াইয়া গুড়ুক সেবনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। যাঁহারা এই পত্র পাঠে কটুবোধ করিবেন, তাঁহাদিগকে বলি—

"The brain is the palest of all the internal organs, and the heart the reddest. Whatever comes from

the brain carries the hue of the place it came from, and whatever comes from the heart carries the heat and color of its birth place"
O. W Holmes

কাজেই একটু কড়া লাগিবে।

পরিশেষে জিব্রল্টারের কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য বর্ণনা বোধ হয় দোষের হইবে না। ইউরোপ, দক্ষিণে আমেরিকা, বামে আশিয়া ও পদতলে আফ্রিকাকে লইয়া এই গোলকের পরে শীর্ষস্থ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তৎসীমাস্থ এই জিব্রল্টারের অন্তরীপ ইউরোপা পয়েণ্টে (Europa Point) দাঁড়াইলে দেখা যায়, সম্মুখের পারে আফ্রিকা দৃষ্টিগোচর হইতেছে, দক্ষিণে খাড়া পাড়ি মারিলে আমেরিকা, এবং বামে লম্বা তাগে খেয়া জমাইলে আশিয়াতে পঁহুছান যায়, মধ্যে কোথাও কোন ভূখণ্ড প্রতিবন্ধক নাই। সুতরাং ইহা চারি মহাদেশের চৌমাথায় বিদ্যমান এক প্রধান তীর্থ বলিতে হইবে। স্থানীয় হোটেলাদিতে ভূখণ্ডের চারি দিকের যাত্রী সমবেত। এইরূপ স্থান হইতে মনের কথা আপনাদের চরণে নিবেদন করিয়া বহুকালের অভিলষিত * মার্কিন তীর্থ যাত্রায় ভাসিলাম। যদি দুরন্ত আটলাণ্টিক বা দুস্তর পাসিফিকে এই ক্ষুদ্র জীবনতরি ডুবিয়া যায়, এই আমার শেষ পত্র; আর যদি ভবকর্ণধারের কৃপায় পাড়ি জমাইতে পারি, পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।

এখন ভাসিলাম, ভাসিলাম, ভাসিলাম অকূলে। যদি হরি দেন কূল, পঁহুছিব কূলে, নতুবা এ জীবনতরি ভাই। ডুবিল অতলে॥ ভাসিলাম, ভাসিলাম, ভাসিলাম অকূলে—

সেবক, শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

মুক্তিফৌজের অদ্ভুত কীর্ত্তি।

নগরের পথে পথে মধ্যে মধ্যে যে আমরা সন্ন্যাস-বেশধারী গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি নর নারীকে দেখিতে পাই, ইহারা কে, কাহার লোক, কি ইহাদের উদ্দেশ্য, তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত বোধ হয় অনেকে অবগত নহেন। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ বৈরাগ্য ব্রতধারী আত্মত্যাগী মহা উদ্যমশীল দয়ালু ধর্ম্মসম্প্রদায় একটী অতি বিরল দৃশ্য। ইঁহাদের প্রধান অধিনায়ক এবং সংস্থাপক মহাত্মা জেনারেল বুথ গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে ইয়ুরোপ আমেরিকার সভ্যতাবেষ্টিত ঘোরান্ধকারময় নরকের অভ্যন্তরে কিরূপ

---

* ২০ বৎসর অতীত হইল প্রথম চেষ্টা করা হয়। কলিকাতায় তাৎকালিক মার্কিন মিশনরি ৺ডল সাহেব (Rev C H. A Dall) প্রশ্নোত্তরে এই পত্র লেখেন। এত কালের পর বিধাতা লইয়া যাইতেছেন।

Calcutta,
1st February, 1872,

My Friend, I have received your letter not without a feeling of gladness to see that there are men like you in India longing to run round this little world, and see the different rooms our Father has created for His one Family of Man. The deluge of prejudices and difficulties you shall have to meet with and plunge through, would fairly test your courage and sincerity, but would be trifles to look back upon when you once get into the Promised Land ;—The reward would be great, the work being great, too, the higher the wages, you know, the harder the work &c, &c, &c.

মুক্তিস্বর্গ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা বলিবার পূর্ব্বে আমি এই উদারচেতা মহাপুরুষের মহাসঙ্কল্পের সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার উচ্চ অন্তঃকরণের উচ্চ এবং পবিত্র কামনার কথা শুনিলেও সঙ্কীর্ণ হৃদয় প্রসারিত এবং স্বার্থপর চিত্ত পরপ্রেমিক হয়।

সংপ্রতি এই মহাত্মা "অন্ধকার ইংলণ্ড এবং ইহার মুক্তির উপায়" নাম দিয়া এক খানি উৎকৃষ্ট এবং বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের ত্রিশ লক্ষ দুর্ভাগ্য নিরাশ্রয় অন্নহীন নিষ্কর্ম্মা চোর দস্যু, উন্মাদ, মদ্যপায়ী এবং পতিত নরনারীকে মহাঘোর নরক হইতে কি প্রণালীতে উদ্ধার করা যায়, তদ্বিষয়ে এক অতি আশ্চর্য্য প্রস্তাব এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে। সহসা এরূপ আকাঙ্ক্ষা দুরাকাঙ্ক্ষা বলিয়া মনে হইতে পারে। বাস্তবিক তোমার আমার মত লোকের নিকট ইহা আকাশকুসুমবৎ স্বপ্ন কল্পনা বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু যিনি ইতিপূর্ব্বে শত সহস্র পতিত মানবসন্তানদিগকে নবজীবনের পথে আনিয়া পৃথিবীতে এক মহাবিপ্লব আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ইহা অসম্ভব নহে। যে খ্রীষ্টশক্তিপ্রভাবে আজ দশ সহস্র নর নারী পথের ভিখারী হইয়া দেশে দেশে পাপী উদ্ধার করিয়া বেড়াইতেছে, শত সহস্র জগাই মাধাই ধার্ম্মিকের উচ্চ পদে উত্থিত হইতেছে, যে স্বর্গীয় মহাবলে মনুষ্য আপনারা নরক হইতে উঠিয়া আবার অন্যকে জীবন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ভাল করিতেছে, সে শক্তিতে কি না সম্ভব হইতে পারে? পতিত নারকী দীন দুঃখীর জন্য যাঁহার পৃথিবীতে আগমন, দুই সহস্র বৎসর পরে আবার জেনারেল বুথের মধ্যে আমরা তাঁহারই পুনরুত্থান দেখিতে পাইতেছি।

জেনারেল বুথের দুঃখী অনাথজনের প্রতি দয়া অতি আশ্চর্য্য। বাল্যকালে যখন আপনার জন্ম স্থানে এই সকল ব্যক্তিকে দেখিতেন, তখন তাঁহার প্রাণ ক্রন্দন করিত। তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার কিম্বা ধর্ম্মসম্প্রদায় সংগঠনের উদ্দেশ্য কেবল ঐ সকল লোককে ভাল করা। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি লণ্ডন নগরের নরকতুল্য পূর্ব্ব বিভাগে পিশাচ রাক্ষস সদৃশ দুঃখীদিগের পল্লীতে কার্য্য আরম্ভ করিলেন, তখন কে তাঁহার সহায় ছিল? কেহই নয়, কেবল ধর্ম্মগুরু ঈশার জ্বলন্ত জীবন এবং তাঁহার দৃষ্টান্তশক্তি। তদনন্তর ধর্ম্ম প্রচার কালে যে সকল লোক তাঁহাকে উপহাস এবং উৎপীড়ন করিত, ক্রমে তাহারাই তাঁহার সহচর অনুচর হইল। ঠিক্ অন্ধকারের মধ্যে যেন এক নূতন জগৎ সৃষ্ট হইল। বাস্তবিক ইহা এক নূতন রাজ্য, স্বর্গরাজ্যের আদেশ-গঠিত মানব পরিবার।

উপরি উক্ত গ্রন্থে জেনারেল বুথ যাহা যাহা করিয়াছেন এবং যে মহাকীর্ত্তি করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাহা বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে। স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই উহা পাঠ করা উচিত। পড়িলেই তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, একটী বিশ্বাসী আত্মা দ্বারা পৃথিবীতে কি কাজ হইতে পারে।

ইংলণ্ডে, বিশেষতঃ বহুজনসমাকীর্ণ লণ্ডন নগরে কিরূপ দুঃখী কাঙ্গাল সব বাস করে, কিরূপ রাক্ষস সমান নরনারী পাপী দুরাত্মা হতভাগ্য জীব সকল অদ্যাপি তথায় বিষম দুরবস্থায় পতিত আছে, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শুনিলে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

স্বাস্থ্যরক্ষক নগরপালেরা দুর্গন্ধময় গলিত পদার্থ দূর করিয়া দূষিত জল বায়ুকে সংশোধন করিয়া সাধারণের মঙ্গল করিতে চাহেন, কিন্তু লক্ষ লক্ষ নরনারীর নরককুণ্ড্য জীবন সংশোধিত না হইলে, তাহাদের দেহ এবং আত্মা ব্যাধি-বিমুক্ত না হইলে প্রকৃত স্বাস্থ্য বৃদ্ধির আশা কোথায়? শত শত গৃহহীন শ্রমজীবী নদীর ধারে, মুক্ত স্থানে, পোলের নীচে, লোকের দ্বারদেশে রাত্রি যাপন করে। কেহ কেহ পথে পথে ঘুমাইয়া বেড়ায়। শত শত পরিবার সামান্য একটু মলিন স্থানে স্ত্রী পুত্র বালক বালিকা যুবক যুবতীর সহিত একত্র বস্তাবন্দী হইয়া পড়িয়া থাকে। তাহাদের ব্যবহার পশুর সমান। সহস্র সহস্র লোক নিষ্কর্ম্মা হইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, কেহ তাহাদিগকে কাজ দেয় না। যুবতী এবং কিশোর বয়স্কা বালিকাগণ পথে পথে বিচরণ করে, কেহ তাহাদের সংবাদ লয় না। হয়তো পিতা মাতা কিম্বা মনিবে তাহাদিগকে বিদায় দিয়াছে। বহু শত স্ত্রী পুরুষ মদ্য পানে এমনি মত্ত যে, অন্ন হউক, না হউক, অগ্রে তাহাদের মদ্য প্রয়োজন। কেহ অন্নাভাবে, কেহ পানাসক্তিতে, কেহবা কুসঙ্গদোষে শেষ চোর ডাকাত হয়, ধরা পড়ে, পুলিসে যায়, জেল খাটে, মুক্তিলাভ করিয়া পুনরায় চুরি করে, করিয়া আবার জেলে যায়। পেটের দায়ে কত ব্যক্তি নরহত্যা এবং আত্মহত্যা করে। পিতা মাতার যখন এই দশা, তখন তাহাদের সন্তান সন্ততি ভাল হইবে, সম্ভাবনা কি? তাহারা প্রথম হইতেই পাপ দুরাচারে শিক্ষিত এবং বর্দ্ধিত হয়। তাহাদের সংসর্গে পড়িয়া প্রতিবাসীরা ক্রমে নরকের সীমাকে প্রসারিত করে। পাপের মহাসমুদ্রে পতিত লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশু বালক বালিকা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে? অকূল পাথার, দাঁড়াইবার স্থান নাই। এই সকল জীবকে যদি জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় অন্নাচ্ছাদন, বাসস্থান অগ্রে না দিতে পার, তবে ধর্ম্মোপদেশ শুনিবে কে? যে ব্যক্তি অন্নচিন্তায় সদা কাতর, পরিশ্রমে ক্লান্ত, নরকের কীট সদৃশ হইয়া কীটের দ্বারা আবৃত, সুখ শান্তি আরাম বিশ্রাম কি তাহা যে জানে না, সে মঙ্গলময় বিধাতাকে বিশ্বাস করিয়া ধার্ম্মিক হইবে, অবসর কোথায়? সে দিকে তাহার মন যাবে কেন? যদিই বা ক্ষণকালের জন্য যায়, তাহা থাকিবে কেন? চারি দিকের অবস্থা ভয়ানক প্রতিকূল, শত শত নরকের যাত্রী তাহাকে শতদিকে টানিতেছে। হে ধর্ম্মযাজক! তোমার উপদেশ বক্তৃতা শুনিবে কে? শুনিলেই বা কি হইবে? ঈদৃশ দুরবস্থায় পতিত হইলে তুমি কি না করিতে পারিতে? মানুষ যে বহু পরিমাণে অবস্থার একান্ত দাস, তাহা অস্বীকার করা যায় না। দুঃখী হতভাগ্য জীব সাধারণের ঈদৃশ দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া এবং তাহা ভাবিয়া জেনারেল বুথ সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে অন্ন বস্ত্র আশ্রয় দিয়া বাঁচাইতে চান। পরে তাহাদিগকে মুক্তিফৌজের ধার্ম্মিক কর্ম্মচারীদিগের অধীনে সুনিয়মে রাখিয়া ভাল করিতে চাহেন। এই সকলের জন্য তাঁহার আশ্রম দ্বার উদ্ঘাটিত। প্রতি দিন ৪ পেনি রোজগার করিয়া আন, তাহার জন্য পরিশ্রম কর, তথায় সুখে স্থান পাইবে, কিন্তু বসিয়া খাইতে পাইবে না। কাজ যোগাড় না করিতে পার, সে জন্য

ইহাদের নিজের শিল্পাগার প্রস্তুত আছে, তাহাতে নিযুক্ত হও। বেশী কাজ করিতে পার, বেশী বেতন পাইবে। তাহা তোমারই থাকিবে। তদ্দ্বারা অন্ন এবং যন্ত্রাদি ক্রয় কর। এই শেল্টারে যথা নিয়মে খাইতে, স্নান করিতে এবং শুইতে পাইবে। পরে সন্ধ্যাকালে এক সঙ্গে বসিয়া পরস্পরে বন্ধুভাবে আলাপ কর, গান গাও, বাদ্য বাজাও। মধ্যে মধ্যে প্রার্থনা, বক্তৃতা কর এবং শুন। পূর্ব্বে যাহারা অতিশয় জঘন্য চরিত্র ছিল, তাহারা কেমন ভাল হইয়া সুখী হইয়াছে, মুক্তি পাইয়াছে, তাহা তাহাদের নিজমুখে শুনিতে পাইবে। যে বন্ধুহীন অসহায় দরিদ্র ভবঘুরে হইয়া এখানে আসিয়াছিল, সে ভাই বন্ধু সদ্গুরু পাইয়া সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছে। সুনিয়মে, কর্ত্তৃপক্ষের অধীনে বশীভূত থাকিয়া অনায়াসে এই সকল সুবিধা তাহারা সেখানে পায়। কেহ মদ্য পান করিতে পাইবে না, মিথ্যা কিম্বা মন্দ কথা বলিবে না, আর প্রত্যেককে কাজ করিতে হইবে, এই মাত্র নিয়ম। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যোগ দাও না দাও, তজ্জন্য পীড়াপীড়ি নাই। কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের এমনি ভালবাসা এবং দয়া স্নেহ, এমনি তাঁহাদের সদ্ব্যবহার যে কেহ তদ্বিষয়ে উপেক্ষা করিতে পারে না। পরে বেশ ভাল হইয়া, কাজ কর্ম্ম শিখিয়া সার্টিফিকেট লইয়া যাহাতে স্থানান্তরে গিয়া তাহারা চাকরী করিতে পারে, তজ্জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গরিব স্ত্রী পুরুষের সুবিধার জন্য আশ্রমাধ্যক্ষগণ নিজেরাই দোকান করিয়াছেন। তাহাতে চা, কাপি, চিনি, ময়দা খরিদমূল্যে পাওয়া যায়। কাজের জন্য মিস্ত্রীখানা আছে, তথায় কাজ পাওয়া যায়। খাওয়া শোয়া নাওয়ার জন্য প্রকাণ্ড বাড়ী আছে।

অল্প পরিমাণে এখন কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, ইহাই ক্রমে বিস্তার হইবে। ইহা বিস্তারের জন্য দূরে এবং নিকটে, সমুদ্রতটে উপনিবাস হইবে। তথায় গ্রাম নগর বসিবে। দেশ হইতে দলে দলে লোক সকল সেখানে গিয়া বাস করিবে। অষ্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার মধ্যে অনেক পতিত ভূমি আছে, তথায় সকলে গিয়া থাকিবে। ইহার জন্য আপাততঃ লক্ষ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

বিদেশে এই সকল সদনুষ্ঠান হইবার পূর্ব্বে নগরে উপনিবাস স্থাপিত হইতেছে। কতক কাজ আরম্ভ হইয়াছে, অবশিষ্ট ক্রমে হইবে। লোকের যাহা যাহা প্রয়োজন, এবং তাহাদের যত প্রকারে সুবিধা হইতে পারে, তাহার জন্য কার্য্যালয়, আশ্রম, কর্ম্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। সমূলে একবারে দারিদ্র্যকষ্ট উৎপাটন করা ইহার উদ্দেশ্য।

একটী রেজিষ্টারি আফিস আছে; তথায় কর্ম্মহীন শ্রমজীবীরা নাম লিখাইয়া আসিবে, এবং যাহারা লোক নিযুক্ত করিতে চায়, তাহারাও নাম ঠিকানা লিখিয়া দিবে। মুক্তিফৌজের কর্ম্মচারীরা উভয়ের মধ্যে এমন বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন, যাহাতে কেহ কাহাকে ঠকাইতে না পারে, অথচ উভয়েরই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। এই আফিস দ্বারা বহু লোক চাকরী পাইতেছে, ভবিষ্যতে আরও পাইবে। যাহারা লোক খুঁজিয়া বেড়ায়, তাহাদেরও ইহাতে সুবিধা।

জেলখানার নিকট আশ্রম। ইহাতে কারামুক্ত নিরাশ্রয় ব্যক্তিরা আশ্রয় পায়,

ধার্ম্মিক কর্ত্তৃপক্ষের যত্নে তাহারা চৌর্য্য দস্যুতা ত্যাগ করে, ভাল হইয়া শেষে বিষয় কার্য্যে মন দেয়। কেহ কেহ মুক্তিফৌজের কাজে জীবন উৎসর্গ করে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এবং বিচারপতিরা যে সকল অপরাধীকে পুনঃ পুনঃ দণ্ড দিয়া কারাবদ্ধ করিয়া শ্রান্ত হইয়াছেন, তাহারা উহাদিগকে উক্ত আশ্রমে পাঠাইয়া দেন। ইহার জন্য অর্থ সাহায্যও করিয়া থাকেন। যে সকল রাজ গোলা গুলি বন্দুক তলয়ারে হয় না, বিচারপতি এবং কারাদণ্ড দ্বারা হয় না, তাহা প্রেমের শাসনে দয়ার ব্যবহারে সাধিত হইতেছে। মুক্তিফৌজের সেনাদল বিনা অস্ত্রে এবং বিনা যুদ্ধে মানবের হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিতেছে।

আর একটী অনুসন্ধান আফিস আছে। কারো ছেলে, কারো স্ত্রী বা স্বামী, কারো ভৃত্য বা কন্যা পলাইয়াছে। হয় তো তাহারা আমেরিকা কিম্বা আফ্রিকার কোন অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে। আত্মীয় অভিভাবকগণ উপরিউক্ত আফিসে সংবাদ দিলেন, ফটোগ্রাফ কিম্বা রূপের বর্ণনা দিলেন। "ওয়ার-ক্রাই' পত্রিকায় তাহা বিজ্ঞাপিত হইল, পরে সকলে তাহা পড়িয়া পলায়িতকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিল।

আর একটী আশ্রম পতিত স্ত্রীলোকদিগের জন্য। প্রতি বর্ষে দুই হাজার রমণী এবং বালিকা ইহাতে স্থান পায়। কিছু দিন থাকিয়া ভাল হইয়া কেহ কেহ গৃহস্থের বাড়ীতে চাকরাণীর কাজ করে, কেহ অন্যরূপ কাজ শেখে, কেহ বিবাহ করিয়া ঘর কন্নায় মন দেয়, কেহ বা মুক্তিফৌজদলে ভর্ত্তি হয়।

আর একটী কাজ নূতন খোলা হইবে। তাহার উদ্দেশ্য লণ্ডনের বাড়ী বাড়ী হইতে পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট বস্তু সংগ্রহ করা। পচা জুতা, ভাঙ্গা ছাতা, বোতল টিন, সংবাদ পত্র, ছেঁড়া কাপড, পাত্রাবশিষ্ট ভোজ্য সমস্ত সংগৃহীত হইবে। তাহাকে রূপান্তর করিয়া বিজ্ঞানবলে নূতন বস্তু প্রস্তুত করিয়া অল্প মূল্যে গরিবদের কাছে বিক্রয় এবং বিতরণ করা হইবে।

এক জন মহা মহা রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতের মাথায় যে সকল চিন্তা স্থান পায় না, দুঃখীর প্রেমে মত্ত বুথ তাহা গভীর ভাবে আলোচনা করিয়া গ্রন্থ খানি লিখিয়াছেন। গরীব গৃহস্থদের টাকা জমাইবার জন্য ব্যাঙ্ক, হাওয়া বদলাইবার জন্য স্বাস্থ্য নিবাস, মোকর্দ্দমা মামলা মিটাইবার জন্য শালিসি, বিচারালয়ে সাহায্য দিবার জন্য উকিলের সমিতি, টাকার মহাজনদিগের উপর শাসন, পুত্র কন্যাগণের বিবাহের পূর্ব্বে গার্হস্থ্য শিক্ষা, সম্বন্ধ ঘটাইবার উপায়, অর্থাৎ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, এবং মৃত্যু হইতে পরলোকের সম্বন্ধ সংগ্রহ পর্য্যন্ত মানবের বিষয়ের মত এবং কিছু কিছু অনুষ্ঠান ইনি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি যে কাজের উপযুক্ত, সে তাহা দ্বারাই এই ধর্ম্মরাজ্য বিস্তার করিতে পারিবে। তাহাদের প্রত্যেক বৈষয়িক কার্য্য দ্বারা দয়া, ন্যায়, প্রেম, স্নেহ সাধারণের মনের ভিতরে ছড়াইয়া পড়িবে। সমস্ত কার্য্য ধর্ম্মময় হইবে। প্রবন্ধটী বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িল। কিন্তু পুস্তক খানি না পড়িলে বুথের মহৎ সঙ্কল্পের গভীরতা, বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা, এবং ভাবের উচ্চতা বুঝা যাইবে না। এই দলের বর্ত্তমান অবস্থার কিছু কিছু বাহ্যবিবরণ দিয়া আমি প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

বার সহস্র স্ত্রী পুরুষ মুক্তিফৌজের কার্য্যে একবারে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইহারা বিনা বেতনে কাজ করেন। আহার পরিচ্ছদ বাসস্থান বিষয়ে নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় থাকেন। তিনি যে দেশে যান, সেই দেশের খাওয়া পরার রীতি গ্রহণ করেন। এমনি নিয়ম এবং শাসন, জেনারেল বুথের আজ্ঞা ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া সকলে মানেন। যাহাকে যেখানে যে কাজে নিযুক্ত করিবে, তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ রাজী। কিন্তু ব্যক্তিগত বিবেকাদেশের স্বাধীনতাও আছে। ৩৪টী স্থানে বা দেশে ফৌজ আছে। ৪৯,৮০০ শত সভা ধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রতি সপ্তাহে হয়। সর্ব্বশুদ্ধ ২৭ খানি সাপ্তাহিক পত্রিকা, একত্রিশ লক্ষ তাহার গ্রাহক। ইহার ধর্ম্ম প্রচারকগণ কেবল মার্ব্বেলের পুলপীঠে বসিয়া, গ্যাসের আলোকে

দীর্ঘ উপদেশ দিয়া সন্তুষ্ট হন না, অন্ধকারময় গুণ্ডিকা-ভবনে, বেশ্যাগৃহে, কারাগারে, অতি দুর্গম স্থানে গিয়া সঙ্গীত এবং প্রার্থনা করেন। পতিত নরনারীকে হাতে পায়ে ধরিয়া কাকুতি মিনতি করেন। সহজে কাহাকেও ছাড়েন না।

ইঁহাদের অধিকারে সাত লক্ষ পচাত্তর হাজার টাকার সম্পত্তি আছে, তাহার বার্ষিক আয় দুই লক্ষ বিশ হাজার। সর্ব্বশুদ্ধ বার্ষিক আয় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। যাহারা দীন দরিদ্র, অধিকাংশ অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত, পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তাহাদের এত টাকা আয় হইল কিরূপে? ধর্ম্মের বলে।

যাহারা আগে এ সম্প্রদায়ের মহা শত্রু, অত্যাচরী ছিল, তাহারাই এখন ধর্ম্মের জন্য পথের ভিখারী এবং নিপীড়িত। ইহারা এত কষ্টসহিষ্ণু, অথচ এমন প্রফুল্লচিত্ত প্রেমিক যে সকলকেই বশীভূত করে। বড় বড় অসুর সমান মদ্যপায়ী চোর,ডাকাত,মাতাল, রাক্ষসীর মত স্ত্রীলোককে মেষের মত করিয়া ফেলিয়াছে। যাহাদের উদ্ধারের কোন আশা ভরসা ছিল না, তাহারাও ভাল হইয়া গিয়াছে। তীর্থস্থানে যেমন লোকে হত্যাদিয়া পড়িয়া থাকে, উপাসনার সময় ইহারা তেমনি ব্যাকুলতার সহিত হত্যা দেয়। অনেকে স্বাস্থ্য সুখের আশায়, প্রাণের আশায় পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়া লোকের সেবা করে। ত্যাগস্বীকার, বৈরাগ্য, ভ্রাতৃপ্রেম, নিয়মাধীনতা, বাধ্যতা, তৎসঙ্গে উৎসাহ, উদ্যম, ব্যাকুলতা, অধ্যবসায় এবং অন্যান্য সদ্‌গুণের ইঁহারা দৃষ্টান্ত স্থল হইয়াছেন। আগে ইহাদিগকে ছোট লোক, আড়ম্বরপ্রিয়, ফ্যানিটিক্, অজ্ঞান, অসভ্য বলিয়া বাবু-ইংরাজেরা ঘৃণা করিত, এখন কাজ কর্ম্ম দেখিয়া তাহারা মান্য এবং শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারিতেছে না। বড় বড় বিশপ, পাদরী, আর্চডিকেন্, কার্ডিনেল যাহা পারেন না,ইহারা তাহাই করিতেছে। অথবা যাহা ক্রুশবিদ্ধ ঈশমসি করিতেন, তাহাই করিতেছে। ধর্ম্মোৎসাহে এবং পরিশ্রম অধ্যবসায়ে আগুনের মত। মাতালের অপেক্ষা মাতাল, ডাকাতের অপেক্ষা ডাকাত। উপাসনাস্থানে কেহ উপস্থিত হইলে তাহাকে যেন বেড়া আগুনে ঘেরিয়া ফেলে। এক জন প্রার্থনা করিতেছে, তৎসঙ্গে কেহ "হেলিলুজা" বলিয়া চেঁচাইতেছে, কেহ বলিতেছে "এ—মেন্"। মহা সোর হাঙ্গাম। তৎসঙ্গে সকলে মিলে গান, হাততালি, নৃত্য, সবলে অঙ্গসঞ্চালন। প্রায় সকলেই প্রার্থনা, সঙ্গীত ও বক্তৃতা করে। কেহ কেহ শ্রোতার নিকটে গিয়া কাণে কাণে কথা কয়। এইরূপে লোক ধরিয়া আনে। স্ত্রীলোক গুলিকে দেখিলে ভক্তি হয়। প্রতিদিন ২।৩ ঘণ্টা উপাসনা, প্রার্থনা, সঙ্গীত, বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ, মাঠে বক্তৃতা, কাজের আর বিশ্রাম নাই।

কিন্তু একটা বিষয়ে আমার মনে বড় ভাবনা হইতেছে। জেনারেল বুথ, গরিব অনাথ নিরাশ্রয় নিষ্কর্ম্মা অজ্ঞান মাতাল চোর ডাকাত বেশ্যাদিগকে ভাল অবস্থায় আনিয়া, জীবন ধারণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া,তাহাদিগকে ধার্ম্মিক সচ্চরিত্র করিবেন, ইহা বুঝিলাম। কিন্তু ইহা ব্যতীত যে লক্ষ লক্ষ নর নারী আছে, যাহাদের অন্নকষ্ট নাই, যাহারা বড় বড় অট্টালিকায় ধনরাশির উপর বাস করে, কাজে অলস হইয়া ঘুমায়, কিম্বা সময় কাটাইবার জন্য নিত্য নূতন আমোদের সৃষ্টি করে, লেখা পড়াও বেশ শিখিয়াছে, তাহাদের কি গতি হইবে? তাহারা সুখৈশ্বর্য্য ধন মান পাইয়া যে আপনারাই ভগবান্ হইয়া বসিয়া আছে, অথচ পাপ দুরাচার মিথ্যা প্রতারণা নিষ্ঠুরতা পশুত্ব সম্বন্ধে নীচ শ্রেণীর অসভ্য গরিবদিগের অপেক্ষা কিছুই ন্যূন নহে, বরং সভ্যতার আবরণে ঢাকিয়া সমস্ত কুকর্ম্মই করে, ইহাদের জন্য এক জন জেনারেল বুথ কবে আসিবেন? ইহাদিগকে অন্ন বস্ত্র স্বাস্থ্য সুখে ভুলান যাইবে না। ভগবান ইহাদিগের মতি গতি ফিরাইয়া দিন। তিনি জেনারেল বুথকে যে কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহার সুফল দেখিয়া অবিশ্বাসী স্বার্থপর সভ্য জনসমাজ শিক্ষা করুক। গরীব দুঃখীকে ভালবাসিতে শিখুক। পৃথিবীতে জেনারেল বুথের ন্যায় ধার্ম্মিক লোকেরাই রাজা এবং শাসনকর্ত্তার উপযুক্ত পাত্র।

শ্রীদ্বিজজীব শর্ম্মা।

সৌন্দর্য্য ও শ্লীলতা।

দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, পদার্থের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এইটি গোড়ার কথা। যে উপাদানে ও যে কৌশলে মনুষ্যের চক্ষু-যন্ত্র গঠিত, তাহাতে কোন বর্ণ বা চক্ষুর তৃপ্তিদায়ক, এবং কোনটি বা তাহার পক্ষে যন্ত্রণা-উৎপাদক। যেমন সকল শব্দই সঙ্গীত নহে, সকল গন্ধই সুবাস নহে, সকল রসই মধুর নহে, এবং সকল স্পর্শই কমনীয় নহে, তেমনি এ জগতের সকল দৃশ্যই রূপ নহে। উজ্জ্বল শুভ্রবর্ণে, বা প্রদীপ্ত রক্তবর্ণে, চক্ষু ঝলসিয়া যায়, কিন্তু হরিৎ ও নীলবর্ণ, চক্ষুর স্নিগ্ধতা বিধান করে। এই জন্যই শ্যামল-পত্র-শোভিত উদ্ভিদ-জগৎ সুন্দর, নীলিমাময় আকাশ সুন্দর, সমুদ্রে নীলাম্বুরাশি সুন্দর। কিন্তু সহস্র সুন্দর বা স্নিগ্ধতা পূর্ণ হইলেও নিরবচ্ছিন্ন একই রূপ, মানসিক জড়তা, অতৃপ্তি ও বিরক্তি বিধান করে। একঘেয়ে হইলে কিছুই ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করিতে পারে না। এই জন্য, সৌন্দর্য্যের আর একটি উপাদান বিচিত্রতা। পঞ্চমের সুর মিষ্ট বটে, কিন্তু আগাগোড়া একই পঞ্চম তৃপ্তিদায়ক নহে। নরম বিছানায় শুইয়া সুখ আছে বটে, কিন্তু অবিরত দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন, কঠোরতা অপেক্ষাও কঠোর। অতিরিক্ত মিষ্টরসের পর একটু চাটনির প্রয়োজন হয়। তাই রূপ গোস্বামী ঠাকুর, হংসদূতে, গ্রাম্য-রমণী প্রেম-বিস্মিত, পুরবধূ-বিভ্রম-মুগ্ধ, সুধাপূর্ণ-চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে একটুখানি তক্র বা ঘোলের ব্যবস্থা করিয়াছেন। "বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা শিমূলের ফুল গাছ আলো করিয়া থাকে", কিন্তু গাছটি নাকি একেবারে নেড়া, তাই শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন যে "ফুলগুলি পাতা ঢাকা হইলে ভাল হইত, কারণ পাতার মধ্য হইতে যে অল্প অল্প রাঙ্গা দেখা যায়, সে সুন্দর।" এই জন্য বিবিধ বর্ণ সমাবেশে সৌন্দর্য্য বিহিত হয়।

বহিরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনের সঙ্গে সঙ্গে, যখন কোন দৃশ্য বা শব্দ, মানসিক ভাবেরও তৃপ্তি সাধন করে, তখন, তাহা অধিকতর সুন্দর বা সুখশ্রাবী হইয়া উঠে। প্রথমতঃ শব্দের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগিণী বা সুর, মানসিক হর্ষ বিষাদাদির মূর্ত্ত প্রতিকৃতি মাত্র। বালকের হর্ষ হইলে, সে হাতে তালি দিয়া চিৎকার করিয়া আনন্দ প্রকাশ করে, শোকের সময় প্রবীণও করুণস্বরে বিলাপ করিয়া মানসিক যাতনা প্রকাশ করে। সঙ্গীতের বিভিন্ন সুর এই সকল বিভিন্ন ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। বোধ হয়, অনেকেই রাগিণীর আলাপচারী শুনিয়া থাকিবেন। যখন কোন সঙ্গীত-নিপুণব্যক্তি রাগিণী আলাপ করিতে থাকেন, তখন অর্থযুক্ত কোন পদ ব্যবহার করেন না, অথচ সেই সুর টুকুর মাধুরীতে আমরা বিমুগ্ধ হই। এস্থলে কেবল মাত্র কর্ণের পরিতৃপ্তিই, আমাদের মোহের কারণ নয়। সেই সুরের পরদায় পরদায়, কত যে সুখ দুঃখের লুকান স্মৃতি আধ আধ জাগিয়া উঠে, কত যে হারাণ প্রেমের মাধুরী পুনরুদ্দীপ্ত হয়, কত যে কি, যাহা চাহিয়া পাই নাই—আজিও চাহিতেছি, তাহারই হর্ষ বিষাদময় আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষার তরঙ্গ হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, কত যে অতীত, কত যে ভবিষ্যৎ, অজ্ঞাতে প্রাণের রঙ্গভূমিতে অভিনয় করিয়া যায়, তাহা বুঝিয়াও বুঝি না বলিয়া সঙ্গীত এত মধুর। আবার দেখ, সকলেই সুকণ্ঠ নহে, অথচ স্নেহ প্রীতি ভালবাসা বা ভক্তি প্রসূত, আদর সম্ভাষণাদির কথাগুলি কত মিষ্ট। জগতের সমগ্র বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান একদিকে, আর সহস্র কর্কশ কণ্ঠ হইলেও, পিতা মাতার আদরের একটি ডাক, বা পুত্র কন্যার অনুরাগের একটি কথা, বা বন্ধুর একটু সম্ভাষণ, বা প্রণয়িনীর একটুখানি মমতাময় কথা, আর এক দিকে। এ সকল স্থলেই শব্দের পশ্চাতে একটা ভাবের ছায়া আছে বলিয়াই, শব্দে এত মোহ।

শব্দ সম্বন্ধে যাহা বলা গেল, রূপ সম্বন্ধেও তাহাই প্রযুজ্য। চক্ষুর তৃপ্তির কথা ভুলিয়া গিয়া, ভাবের তৃপ্তিতেই আমরা কত পদার্থ সুন্দর দেখি। হরিৎবর্ণ, চক্ষুর

আনন্দ বিধান করে, সুতরাং বৃক্ষাদি সুন্দর। তাহা ছাড়া আবার যখন একটি সজীব সতেজ বৃক্ষ দর্শন করি, তখন, তাহার দৃশ্যে স্বাস্থ্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে, দেখিতে পাই। সুস্থতা নাকি আমাদের পরম অভিলাষের সামগ্রী, তাই সেই স্বাস্থ্যের ছবি দেখিয়াই কত আনন্দ হয়। এই জন্য, কোমলতা ও সুস্থতা ব্যঞ্জক বালকের সুপুষ্ট দেহ, রমণীর যৌবনশ্রী, আমাদের চক্ষে এত সুন্দর। অবশ্য এই শেষ দৃষ্টান্তের মধ্যে, সৌন্দর্য্যের মূলীভূত আরও কতকগুলি কারণ আছে, যাহা এখানে উল্লেখ করিলাম না। কিন্তু যেদিক্ দিয়াই দেখ, দেখিবে, সৌন্দর্য্যের মূলে, কতকগুলি স্বীয় মানসিক তৃপ্ত ভাবের ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে। রূপকথায় আছে, যে একজন রাজা, তাঁহার সভাস্থ সকলকে, পৃথিবীর মধ্যে পরম সুন্দর যাহা, তাহাই আনিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সভাসদ্গণের মধ্যে কেহবা ফুল, কেহবা চিত্রিত পক্ষী কেহবা অন্য কিছু লইয়া রাজার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। রাজার একটি পোষা পেচক ছিল, সেই আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া আপনার কদাকার ছানাগুলি লইয়া আসিল। বাস্তবিক সেই পেচকের চক্ষে তাহার ঘনীভূত স্নেহ মমতার চিহ্নস্বরূপ, সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাবকগুলি অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর পদার্থ আর কি ছিল? প্রবাসী কবি, প্রকৃতির কাম্য কাননের মধ্যে উপবেশন করিয়াও তাঁহার ক্ষুদ্র পল্লীর ক্ষুদ্র গৃহের কথা মনে করিয়া লিখিয়াছেন :—

প্রিয়স্মৃতি বিজড়িত কাঁটাবনে, ভূমণ্ডিত,
তাই ভাললাগে ক্ষুদ্র গৃহের প্রাঙ্গন,
শোভাহীন হেরি এই বন উপবন।

মানুষের মুখ চোক দিয়া, লাবণ্য প্রফুল্লতা অনুরাগ প্রভৃতি ফুটিয়া পড়িলেই মুখশ্রী সুন্দর হয়। আর যদি চক্ষুর দৃষ্টি, ঘৃণার বাণ বর্ষণ করে; অধর, আত্মাভিমানে কুঞ্চিত থাকে; তবে সেই চক্ষু ও অধর, চিত্রকরের আদর্শ বস্তু হইলেও, দেখিতে বিষবৎ বোধ হয়।

তবে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের, কতকগুলি বাহ্যিক গঠন প্রণালী বিশেষ; সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইল কেন? ইহার মীমাংসা করিতে হইলে অনেক কথা লিখিতে হয়। সংক্ষেপ সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব মাত্র।

প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নীচশ্রেণীর জন্তুদিগের ক্রম বিকাশে মনুষ্যের জন্ম। মনুষ্য, যতটা পরিমাণে পশুদিগের অপেক্ষা ভিন্নরূপ হইয়া উঠিতে পারেন, এবং যতটা পরিমাণে সেই বিভিন্নতায়, তাঁহার মস্তিষ্কের ব্যাবৃতি ও ও স্নায়ুচক্রের জটিলতা বাড়িয়া উঠে, ততই তিনি উন্নতি লাভ করিয়াছেন, বলা যায়। এইকারণে অতি পূর্ব্বকাল হইতে, আমাদিগের প্রতি অস্থিমজ্জায়, এই সংস্কারটুকু সংস্কারবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে যে, পশু প্রকৃতি এবং পশু আকৃতি হইতে, মনুষ্য প্রকৃতি ও আকৃতি, যত বিভিন্ন ভাব অবলম্বন করে, ততই ভাল। কেবলমাত্র মুখদিয়া, একটি পশুকে কত কার্য্যই না করিতে হয়। তৃণ হউক, মাংস হউক, যাহা কিছু আহার্য্য, তাহারা তাহা সমুদায়ই, মুখের সাহায্যে সংগ্রহ করে, আহারোপযোগী করিয়া প্রস্তুত করে, এবং পরে আহার করে। এই কারণ বশতঃ তাহাদের হাঁ খুব বড় হয়। এবং হাঁ বড় হইতে হইলেই, হনু দীর্ঘ হয়, এবং মুখের মাংসপেশিতে ক্রমাগত টান লাগিয়া, নাক থাঁদা হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মানুষকে এতটা অধিক পরিমাণে মুখ খাটাইতে হয় না বলিয়া, হনু খর্ব্ব হয়, নাসিকা উন্নত হয়, হাঁ ছোট হয়। সুতরাং আমাদিগের স্বাভাবিক সংস্কারের ফলে, আমরা শেষোক্ত প্রকার গঠনকেই সুন্দর গঠন বলিয়া মনে করি। মুখের সম্বন্ধে যাহা কিঞ্চিন্মাত্র বলা গেল, সমগ্র শরীরাবয়বের সম্বন্ধে তাহা যে বিশেষ প্রযুজ্য, তাহা প্রদর্শন করা যাইতে পারে। কিন্তু সেরূপ বিস্তৃত ব্যাখ্যা একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আয়ত্তাধীন নহে। যাহা হউক, এস্থলেও দেখা গেল যে, এই বাহ্যিক সৌন্দর্য্যও ভাবযোগজনিত।

এ পর্য্যন্ত যাহা লেখা গেল, তাহা হইতে দুইটি কথা প্রতিপন্ন হইতেছে। (১) বাহ্যিক দৃশ্য, কেবলমাত্র চক্ষুর তৃপ্তি সাধন করিতে পারে বলিয়া সুন্দর; (২) ভাবযোগে প্রথমতঃ

মানসিক তৃপ্তি, এবং পরে অনুরাগ নিবন্ধন চক্ষুর তৃপ্তি সাধন করে বলিয়া সুন্দর।

মানুষমাত্রেরই চক্ষু নাক একই উপাদানে এবং একই কৌশলে গঠিত, তাই জড়-সৌন্দর্য্যের অনুভূতি সম্বন্ধে কোন প্রকার পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন লোকের মানসিক ভাব, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ও শিক্ষায় বিকশিত হয় বলিয়া, প্রত্যেকেরই মানস-সৌন্দর্য্যানুভূতিতে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যাহার মন যেমন, যাহার আকাঙ্ক্ষা ও বাসনা যেমন, তাহার সৌন্দর্য্যানুভূতিও তদনুরূপ। যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, সে রমণীর ইন্দ্রিয়-লালসা-সূচক হাবভাব দর্শন করিয়া মুগ্ধ হয়। এবং তাহার চক্ষে সরলতা ও পবিত্রতার স্ফূর্ত্তি, সতীত্ব ও সংযমের ছবি, নীরস ও বিরক্তি উৎপাদক। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে, নগ্নতা বহুল পরিমাণে চিত্রিত হইত। কিন্তু এ চিত্রাঙ্কনেও অনেক সময়েই স্বাস্থ্য এবং বিকাশই চিত্রিত হইত। নৈতিক অনুৎকর্ষও যে এ প্রকারের আদর্শ গ্রহণের হেতুভূত ছিল, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যখন খ্রীষ্টীয় সভ্যতা, প্রাচীন সভ্যতা বিনষ্ট করিয়া রাজত্ব বিস্তার করিল, তখন নগ্নসৌন্দর্য্য অপেক্ষা, বস্ত্রাবৃত সৌন্দর্য্যে লোকের অধিকতর অনুরাগ জন্মিল। তাহারা দেখিল যে, বিনয়, লজ্জা ও শ্লীলতার যে সৌন্দর্য্য, তাহার কাছে নগ্নতার সৌন্দর্য্য কিছুই নহে। মানসিক গুণ ও মাহাত্ম্যের প্রভাবেই, মনুষ্য দেহের অধিক সৌন্দর্য্য সুতরাং যাহাতে সেই গুণ ও মাহাত্ম্য প্রকাশ থাকে, নূতন চিত্রকরেরা সেই পন্থাই অবলম্বন করিলেন। এই স্থানেই রাফেল (Raphael) এবং তাঁহার শিষ্যদিগের প্রাধান্য। এই সকল কথা মনে করিয়াই ইংরাজ-সমালোচক-কুল-গৌরব মেথু আর্ণল্ড বলিয়াছেন, যে,খ্রীষ্টীয় সভ্যতা প্রাচীন রোমক সভ্যতা পদদলিত করিয়া ভালই করিয়াছে। একবার কেন,যদি সহস্রবারও ঐরূপ সভ্যতার বিনাশ সাধন করিয়া খ্রীষ্টীয় পবিত্রতা লাভ করা যায়, তবে তাহাও প্রার্থনীয়।"

এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা বলেন যে, বহির্জগৎ, মানস ভাবপরম্পরার সমষ্টি। সে কথা সত্য হউক আর মিথ্যা হউক, কিন্তু আমরা যে আমাদের বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা দিয়া মনের মত করিয়া বাহ্যজগৎ গড়িয়া থাকি, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যিনি সংযতচিত্ত ও পবিত্র, তাঁহার পক্ষে বাহ্য-জগৎ সংযম ও পবিত্রতার চিত্র লইয়াই উপস্থিত হয়। সুতরাং তাঁহার সৃষ্টিও সংযম ও পবিত্রতা লইয়া। কলুষিত চিত্ত শ্রীশ রমণীকে একখানা "মান্মথ মঞ্চ" পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার স্তন বর্ণনায় ঘৃণিত ইন্দ্রিয়লালসা পরিপূর্ণ। আর কবি রবীন্দ্র নাথ, স্তন বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন,—

> চির স্নেহ-উৎস-ধারে অমৃত নির্ঝরে
> সিক্ত করি তুলিতেছে বিশ্বের অধর।
> জাগে সদা সুখ-সুপ্ত ধরণীর পরে
> অসহায় জগতের অসীম নির্ভর।
> ধরণীর মাঝে থাকি স্বর্গ আছে চুমি,
> দেবশিশু মানবের ওই মাতৃভূমি।

তাই বলিতেছিলাম যে, যাহার মন যেমন, সে বাহ্যজগৎকে তেমনি করিয়াই দেখে, এবং সে জগতের সেই প্রকার ছবিই অঙ্কিত করে। রবীন্দ্র নাথ যেখানে বিবসনাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

> অসীম নীলিমা মাঝে হও নিমগন,
> তারাময়ী বিবসনা প্রকৃতির মত।
> অতনু ঢাকুক মুখ বসনের কোণে
> তনুর বিকাশ হেরি লাজে শির নত।
> আসুক বিমল উষা মানব ভবনে,
> লাজহীনা পবিত্রতা—শুভ্র বিবসনে।

তখন কেমন একটা অপার্থিব স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য, প্রাণ মন ঘেরিয়া ফেলে। এনগ্নতার ইন্দ্রিয় লিপ্সা নাই, বরং পার্থিব বসনেও যাহা আবৃত করিয়া, প্রকৃত সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে পারেনা, এ নগ্নতায় তাহা আবৃত হইয়াছে। যাহার অনুভূতি আছে, সে দেখিবে যে এ "বিবসনা" নহে, এ "সুবসনা"। আর যদি কেহ রমণীর "নগ্ন জঘন দেশে কামের" ছবি দর্শন করেন, তবে তাঁহার কল্পনাকে অপবিত্র বলিব না কেন? যাহার মন যেমন, তিনি সেইরূপই দেখিবেন, তাহা জানি; কিন্তু এদৃশ্য, তিনি বিজনে দেখিয়া তৃপ্ত হইতে চাহেন, হউন, এবং শতবার এরূপ দৃশ্য দেখিয়া "কো বিহাতুংসমর্থঃ" বলিতে থাকুন; কিন্তু রমজনার

সমক্ষে ইহার চিত্র লইয়া উপস্থিত করিবার তাঁহার অধিকার কি? আমি যাঁহার কবিতা লক্ষ্য করিয়া শেষ কথাটা বলিলাম, আমি তাঁহার কবিত্বের অনুরাগী। কিন্তু এ প্রকার চিত্র যে অশ্লীল, নিন্দনীয় এবং সুকবির অনুপযোগী, তাহা সহস্রবার বলিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

প্রাপ্তগ্রন্থের সমালোচনা।

বিংশ শতাব্দী—আশাকাব্য।—শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা বিরচিত। ভিক্টোরিয়া প্রেসে মুদ্রিত, ৩২৯ পৃষ্ঠা, মূল্য এক টাকা মাত্র।

কল্পনার দেশ-কাল ভেদ-বিরহিত প্রকাণ্ড টেলিস্কোপটী ভূত এবং বর্ত্তমান রূপ দুই পায়ে খাড়া (adjust) করিয়া, এবার শর্ম্মা মহাশয় ভবিষ্যতের বুকে লক্ষ্য স্থাপন করিয়াছেন, এবং সেই অনাগত দেশের ইতিহাস ভূগোল যাহা কিছু আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই দূরবীণটী কিছু দিন পূর্ব্বে একবার পশ্চাৎ দিকে ফিরাইয়া তিনি চৈতন্য-বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এইরূপ ত্রিকালদর্শন-যন্ত্র যদি কাহারো বিশুদ্ধ এবং নির্ম্মল অবস্থায় থাকে, তবে তিনি স্বল্পায়ু হইয়াও বাস্তবিক চিরঞ্জীব, কেন না ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এবং তাহাদের সন্তান সন্ততি তাঁহার করতলস্থ রেখারাশিবৎ প্রত্যক্ষ এবং সম্মুখস্থ। চিরঞ্জীব শর্ম্মা যেমন বাঙ্গালী পাঠকের নিকট সুপরিচিত—বঙ্গসাহিত্যসৌধের একটী সমুন্নত চূড়া, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালও তেমন কিম্বা ততোধিক ভাবে ব্রাহ্মসমাজের নিকট সম্মানিত এবং ইহার একটী জীবন্ত কীর্ত্তিধ্বজা। তাই এই মহাশয় ব্যক্তির নিকট ভবিষ্যতের আশাকাহিনী শুনিতে আমরা বড় আগ্রহান্বিত। শর্ম্মার ভাষার দীর্ঘিকাটী যেমন পরিষ্কার, স্বচ্ছ এবং অনাবিল, ভাবের তরঙ্গগুলিও তেমনি আবেগময়, স্ফূর্ত্তিযুক্ত, চির উচ্ছ্বাসপূর্ণ।

ষোড়শ শতাব্দীর ইংলণ্ডে—রাজনীতি, সমাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি-সংস্কার ব্যাপারে সার টমাস মোরের "উটপিয়া" কাণ্ড যদি যুগান্তর উপস্থিত করিতে পারিয়াছিল, তবে চিরঞ্জীব শর্ম্মার এই আশাকাব্যও ভারতের ভাবী ত্রিবিধ উন্নতি সাধনে একটী প্রকৃষ্ট সহায় হইবে, ইহাই আমাদের ধারণা। "উটপিয়া" অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে ইংলণ্ডের যাবতীয় অভাব এবং দুর্গতির ইতিহাস স্বরূপ, "বিংশ শতাব্দীও" বর্ত্তমান ভারত-সমাজের দুঃখের কাহিনী। যদৃচ্ছাচারী রাজার ভয়ে মোরকে তাৎকালিক ইংলণ্ডীয় সমাজের সমালোচনা কল্পিত অনির্দ্দিষ্ট দেশের বিবরণ ছলে প্রকাশিত করিতে হইয়াছিল, সৌভাগ্য ক্রমে আমাদের সে ভয় নাই, সুতরাং শর্ম্মাজীর দেশান্তরিত হইতে হয় নাই।

শর্ম্মা মহাশয়ের কল্পনা ভাবী ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি প্রায় সমুদায় ব্যাপারই চিত্রিত করিয়াছে, অতি সামান্য সামান্য ঘটনাও ইঁহার হাত এড়াইতে পারে নাই। সমুদায় উল্লেখ করা আমাদের পক্ষে এক রকম অসম্ভব।

আফিং-মোহবিকারগ্রস্ত চিন্তামণির ঘুমন্ত চক্ষে রুশের ভারতবিজয় এবং রুশ শাসনের ফলাফল, হেড মোর্গেলিং এপিডেমিক, জীবনের উদ্দেশ্য বিষয়ে বিংশ শতাব্দীর গবেষণা, বিশ্ব প্রাচীন এবং প্রৌঢ়দিগের নীতি বিদ্যালয় প্রভৃতি অতিশয় কৌতুকাবহ এবং উপদেশপূর্ণ হইয়াছে।

সংস্কার সম্বন্ধে শর্ম্মার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্ম্মনৈতিক আন্দোলন ঈশ্বর বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তিতে না দাঁড়াইলে উন্নতির পথে এক ইঞ্চিও অগ্রসর হইতে পারে না। যে সংস্কারের মূলসূত্র হরিভক্তি এবং ভ্রাতৃপ্রেম, তাহা নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হইবে, সাহেব এবং দেশীয়দিগের মধ্যে সৌহার্দ স্থাপনের ইহাই একমাত্র সেতু। ন্যাসন্যাল কন্‌গ্রেসের সকল আশা ভরসা এই খানেই কেন্দ্রীভূত। অসংযতেন্দ্রিয় বিশ্বাসবিহীন ধর্ম্ম-শূন্য জাতীয়

মহাসমিতি দ্বারা দেশের কোন স্থায়ী কল্যাণই সাধিত হইতে পারে না। একথাটী সকলেরই একবার বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখা উচিত। যে দেশ এবং যে সমাজ এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত এবং অনুপ্রাণিত, তাহার ভবিষ্যৎ বড় মনোরম প্রীতিপ্রদ, সেখানে অবিশ্বাসীর প্রতি বিশ্বাস নাই, জ্ঞান গরিমার পসার হীনপ্রভ, সমস্ত আদর, সমস্ত সম্মান কেবলমাত্র বিশ্বাসী ভক্তদিগের সেবায় পর্য্যবসিত, দায়িত্বপূর্ণ সমুদায় রাজকার্য্য বিশ্বাসীর একচেটিয়া, "শিক্ষা বিভাগের কর্তৃত্ব" পদ কোন নাস্তিক অবিশ্বাসীকে দেওয়া হয় না, "জ্ঞানময়কে ছাড়িয়া জ্ঞানোপার্জ্জন" অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়, যে যত বেশী ধর্ম্মপরায়ণ, সে তত সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সমর্থ। সংস্কারের মূলমন্ত্র ভ্রাতৃপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেমের জন্মস্থান স্বগৃহ, তাই বিশ্বম্ভরের ক্ষুদ্র সংসার মানব পরিবারের আদর্শস্থল, ক্রমে ক্রমে এই ক্ষুদ্র পরিবার প্রসারিত হইয়া সমগ্র ভারতকে ক্রোড় পাতিয়া গ্রহণ করিল। আদর্শ পরিবারের এমন সুন্দর প্রতিকৃতি বঙ্গভাষায় আর দেখি নাই। ইহারই শেষ পর্য্যাপ্তি এবং অভিব্যক্তি—"আদর্শ রাজ্য", ইহার ভিত্তি সার্ব্বভৌমিক প্রেম, "প্রেমেতেই সামঞ্জস্য," "সামঞ্জস্যই বিজ্ঞান—স্বর্গরাজ্য, তাহাই ধর্ম্ম এবং মুক্তি", এখানে—উন্নতি ধর্ম্মমূলক, "প্রত্যেকের উপযুক্ততানুসারে সুখের স্থান আছে," ব্যক্তিত্বের চালক ভ্রাতৃপ্রেম,—স্বাধীনতা আছে—স্বেচ্ছাচার নাই। বিচিত্রতার কোলে একতা। আদর্শ রাজ্য, প্রেমের রাজ্য, প্রেমের রাজ্য স্বর্গেরই রাজ্য, সম্রাট—ভগবান।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবীন গ্রন্থকারের মতামত বড় মূল্যবান, বিশেষতঃ এই সংস্কার-বাহুল্যের দিনে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজ—উভয়েরই ভবিষ্যৎ কালিমাময়। একটীতে "উদারতার" নামে ব্যভিচার, উচ্ছৃঙ্খলতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; অপরটীতে ভ্রাতৃপ্রেমের অভাবে—বিবেকের আদেশের নামে ধর্ম্মাভিমান, আত্মগীতি—অবশেষে কেবল নিরীশ্বর "সমাজ সংস্কার" অন্তঃসারবিহীন বাহ্যাড়ম্বর—প্রশ্রয় পাইতে লাগিল। উভয়ের অবনতির শেষ দিনে হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মযোগ এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের ভক্তিযোগ লইয়া এক নূতন ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইল। এই যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হিন্দুও নহেন, (তখনকার হিসাবে) ব্রাহ্মও নহেন, এই বিচিত্র বীর্য্যশালী মহাপুরুষ কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও প্রেমের মধ্য দিয়া পতিত আসন্নমৃত্যু দেশের উদ্ধার শাসন করিলেন। উঁহার ভ্রাতৃপ্রেমের অভাবে প্রচলিত ধর্ম্ম সমূহ অকাল মৃত্যুর ক্রমশঃ বিস্ফারিত ভয়ঙ্কর গ্রাসে অতর্কিত ও অজ্ঞাত ভাবে একটু একটু করিয়া আশ্রয় লইতেছিল। এই ধ্বংস এবং মৃত্যুর অন্ধকারময় দিনে ভগীরথের ন্যায় স্বর্গ হইতে প্রেম-সুরধুনীকে লইয়া যুগপ্রবর্ত্তক বিশ্বম্ভর অবতীর্ণ হইলেন। ইঁহার প্রেমপীযূষ সেকে শত শত বিবেক-বিচ্যুত বিকারগ্রস্ত নরনারীর পাপ বিমোচন হইল, দেশের মুখশ্রী ফিরিয়া গেল।

বিশ্বম্ভর ভ্রাতৃপ্রেমের জীবন্ত প্রতিকৃতি, জীবেই শিবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া জীব পরিচর্য্যা ও ভ্রাতৃসেবাকেই সাধনের লক্ষ্য করিলেন। অনাবিল, অপরাশ্রিত, বিশ্বগ্রাসী ভ্রাতৃপ্রেমের প্রশান্ত স্বচ্ছ সরোবরে মধ্যাহ্ন ভাস্কর-তুল্য পূর্ণ জ্যোতিষ্মান পিতৃপ্রেমের মুনি-জন-বাঞ্ছিত হরি-প্রেমের সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া বিশ্বম্ভর ভীত, স্তম্ভিত, বিমোহিত হইলেন। তাঁহার দিব্য বিশ্বাস-চক্ষুতে আর কেহই অবিশ্বাসী, অধার্ম্মিক, অপ্রেমিক রহিল না, সর্ব্বত্রই দেবপ্রকৃতি বিরাজিত, কোথায়ও বা জাগ্রত, কোথায়ও বা নিদ্রিত, কোথায়ও বা অৰ্দ্ধসুপ্ত। ভূতভাবন সর্ব্বভূতেই অধিষ্ঠিত। জলন্ত বিশ্বাস বলে বিশ্বম্ভর সেবাতেই মুক্তির সোপান আবিষ্কার করিতে, কর্ম্মকেই ধর্ম্মের পরম হিতৈষী বলিয়া চিনিতে যখন সক্ষম হইলেন, তখন তাঁহার প্রেমামৃত-স্নাত পবিত্র হৃদয়ে "শান্তিধামের" শান্তিপূর্ণ আলেখ্য প্রতিভাত হইল। বিশ্বাসের সমান শক্তি বুঝি আর নাই, খাঁটি বিশ্বাসের একটী মাত্র কণিকা শত সহস্র গিরিনদী বন তোলপাড় করিয়া তুলিতে পারে। পারে বলিয়াই বিশ্বম্ভরের আশালতা মুঞ্জরিত হইল—দেবসেব্য সুফল

প্রসব করিল; বিশ্বাসের পরোক্ষ রাজ্য ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও প্রত্যক্ষ হইল; কল্পনা ও স্বপ্ন কার্য্যে পরিণত হইল, নিরাকার সাকার হইল, মানব-লোকে দেবত্ব বিকশিত হইল, অমরধাম ধরাধামে অবতীর্ণ হইল।

বিশ্বম্ভর চরিত মহা সুগন্ধযুক্ত স্বর্গের চিত্র, ইহার চিন্তা অনুধাবন করিলে মস্তিষ্ক উন্নীত হয়, হৃদয় প্রশস্ত হয়, মানব-হৃদয়-নিহিত দেবভাবগুলি সঞ্জীবিত হইয়া উঠে।

ইংলণ্ডের শোচনীয় দুর্দ্দশা দর্শনে ব্যথিত-হৃদয় কবিপুঙ্গব ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ পরলোক-বাসী মহাকবি মিল্টনের আত্মার উদ্দেশে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন—

"Milton! thou should'st be living at this hour
England hath need of thee she is a fen
Of stagnant water altar, sword and pen,
Fireside, the heroic wealth of hall and bower,
Have forfeited their ancient English dower
Of inward happiness We are selfish men,
Oh! raise us up, return to us again
And give us manners, virtue, freedom, power
Thy soul was like a star, and dwelt apart
Thou hadst a voice whose sound was like the sea
Pure as the naked heavens, magestic, free,
So didst thou travel on life's common way,
In cheerful godliness, and yet thy heart
The lowliest duties on herself did lay"

ভবিতব্য শিশু অনাগত-লোকবাসী বিশ্বম্ভরকে সম্বোধন করিয়া আমাদেরও ঠিক ঐ কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমাদেরও ইচ্ছা করে, বিশ্বম্ভরের বাড়ী সুদূর ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে একবার উচ্চৈঃস্বরে বলি—হে পুণ্যশ্লোক মহাত্মন! ভ্রাতৃবিরোধ জর্জ্জরিত, আত্মগৌরব বিচ্যুত, পৈতৃক রীতি-কলাপ-বিধ্বংসকারী অবিশ্বাসী ভারতের তোমা ভিন্ন আর গতি নাই। বিজ্ঞান দর্শন ঐশ্বর্য্য বীর্য্য—ইহার মলিনতা, জীর্ণতা, দুরবস্থা ঘুচিবে না। তুমি যদি আসিবেই, তবে এখনি এস। তোমার প্রেম-কমণ্ডলু হইতে এই উত্তপ্ত শুষ্ক সাহারার চতুর্দ্দিকে সুশীতল প্রেমবারি ছড়াইয়া দাও, অশান্তির কোলাহল নিবিয়া যাউক।

সংসারের সকলই বৈচিত্র্যপূর্ণ, সকলেরই বিশেষত্ব আছে। দুই জন মানুষ এক রকম নহে, দুইটী কল্পনা কিম্বা চিন্তাশক্তিও যে সর্ব্ব-বিষয়ে এক মতাবলম্বী হইবে, তাহা বলা যাইতে পারে না। সুতরাং অনুমানাত্মক এই আশা কাব্যের বর্ণনার সহিত অনেকেরই মতদ্বৈধ থাকিবার সম্ভাবনা, আমাদেরও কোন কোন স্থানে আছে, কোন কোন স্থানে আবার পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য এবং সংলগ্নতার কিঞ্চিৎ ন্যূনতাও বোধ হইল, দুই একটী দৃষ্টান্ত দেই—

(১) "আদর্শ পরিবারে" পাচক ব্রাহ্মণ কেন? (২) পররাষ্ট্র নীতির সমালোচনাটী নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও একদেশদর্শী হইয়াছে। (৩) বিংশ শতাব্দীতেও কি "কন্যাদায়" ঘুচিবে না? (৪) এত উন্নতি ও পরিবর্ত্তনের মধ্যেও মহারাজা সুচেতাসিংহের বাড়ী যাইতে "বজরা" কেন? ষ্টিম-সুবিধা নাই? (৫) যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ব্রাহ্ম সমাজ যদি দেশের নিকট ততদূরই ঘৃণাস্পদ ও হেয় হন, তবে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" এই নামটীরও স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ করা যাইতে পারে। (৬) বিশ্বম্ভরের পুত্র বিয়োগটী নিতান্ত নিরর্থক, আকস্মিক এবং অনাবশ্যক বলিয়া মনে হইল।

উপন্যাস জ্ঞানে যাঁহারা বিংশ শতাব্দী পড়িবেন, তাঁহারা প্রতারিত হইবেন, তাঁহাদের নিকট উহা নীরস, বিরক্তিজনক বোধ হইবে। কিন্তু তথাপি বলিব, বিংশ শতাব্দী একখানি মহা মূল্যবান শিক্ষাপ্রদ গ্রন্থ, এ আয়নাতে সকল সম্প্রদায়ই নিজ নিজ মুখশ্রী দেখিতে পাইবেন এবং ইহাতে গ্রন্থকারকে চিরঞ্জীব করিবে। এই বৃহদায়তন গ্রন্থখানির মূল্যও খুব কম, এক টাকা মাত্র।

মেঘনাদ-বধ-চিত্র।

(১)

তিলোত্তমাসম্ভব প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পরেই মধুসূদন মেঘনাদবধকাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। মেঘনাদ বধের সঙ্গে তাঁহার আরও দুই খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম কৃষ্ণকুমারী এবং দ্বিতীয় ব্রজাঙ্গনা। মেঘনাদবধ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য শেষ করিয়া, আমরা, অবসর পাইলে, অপর দুই খানি গ্রন্থের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মেঘনাদবধ-কাব্যের অবলম্বনীয় বিষয় কি, তাহার পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। এ দেশে এমন হিন্দু সন্তান, বোধ হয়, অতি অল্পই আছেন, যিনি ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় কোন না কোন আকারে পাঠ বা শ্রবণ না করিয়াছেন। রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ড অবলম্বনে ইহা বিরচিত, বীরকেশরী মেঘনাদের মৃত্যু ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়। যদিও রামায়ণ-বর্ণিত ঘটনা অবলম্বনেই ইহার চিত্র হইয়াছে, কিন্তু ইহার প্রত্যেক ঘটনা রামায়ণের অনুরূপ নহে। বাবু রাজ নারায়ণ বসু ইহার সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন যে, ইহা 'আসিয়ারূপ জনয়িতা এবং ইয়ুরোপরূপ জনয়িত্রীর সন্তানস্বরূপ।" রামায়ণের ন্যায় ইলিয়াড্ এবং ইনিয়াড্ প্রভৃতি অনেক পাশ্চাত্য কাব্যের ঘটনাও পরিবর্ত্তিত আকারে ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। মেঘনাদ বধ যদিও রামায়ণের সেই পুরাতন কথা লইয়া রচিত, কিন্তু সেই পুরাতন কথার মধ্যেও ইহাতে কিছু নূতনত্ব আছে। মেঘনাদবধ বুঝিতে হইলে, সেই কথা গুলি স্মরণ রাখা আবশ্যক। মেঘনাদবধ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, ইহার রাক্ষস বীরগণ, রামায়ণের সেই তীক্ষ্ণদংষ্ট্র, রক্তনেত্র, নরশোণিত প্রিয় জীব নহেন। তাঁহারা আমাদিগেরই ন্যায় মনুষ্য। বীরত্বে, গৌরবে, ঐশ্বর্য্যে এবং শারীরিক সৌন্দর্য্যে তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য হইতে কিয়ৎ পরিমাণে শ্রেষ্ঠ, এই মাত্র বিভিন্নতা। সামাজিক আচার ব্যবহারেও আর্য্যসমাজ হইতে তাঁহাদিগের কোন পার্থক্য নাই। আর্য্যসমাজের ন্যায় তাঁহারাও যাগ, যজ্ঞ ও দেব পূজা করেন। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও গঙ্গাজল তাঁহাদিগেরও পূজার অঙ্গ। তাঁহাদিগেরও কুললক্ষ্মীগণ স্বামী পুত্রের কল্যাণের জন্য শিবারাধনা করেন। তাঁহাদিগেরও গৃহে পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী রূপে রাজলক্ষ্মীর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত এবং মহামায়া তাঁহাদিগেরও পুরাধিষ্ঠাত্রী। যে রাক্ষসরাজ সীতা দেবীকে প্রাতরাশ রূপে ভক্ষণ করিবে বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, মেঘনাদ বধে পাঠককে সর্ব্ব প্রথমেই সেই নরমাংসাসী রাক্ষসরাজ ও তাঁহার পরিজনবর্গের কথা বিস্মৃত হইতে হইবে। রাক্ষস পরিজনগণের ন্যায় মেঘনাদ বধের বানর বীরগণও বৃহল্লাঙ্গুল রোমশপশু নহেন, তাঁহারাও মানব। সাধারণ মানব হইতে তাঁহাদিগের কোন পার্থক্য নাই। মেঘনাদবধ-কাব্যের দ্বিতীয় কথা এই যে, ইহার রামচন্দ্র এবং সীতা দেবী নারায়ণ ও লক্ষ্মীর অবতার নহেন। তাঁহারাও মানব মানবী। সাধারণ নর নারীগণের ন্যায় তাঁহারাও সুখদুঃখভাগী ও কর্ম্মানুসারে দেবগণের ইচ্ছানুসারে পরিচালিত।

সাধারণ মনুষ্য হইতে তাঁহাদিগের এইমাত্র বিভিন্নতা যে, তপোবলে ও কর্ম্মবলে তাঁহারা দেবগণকে প্রত্যক্ষ করিতে, এমন কি, সময়ে সময়ে আপনাদিগের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের অংশ গ্রহণ করাইতেও পারেন। এই আদর্শ ইলিয়াড হইতে কল্পিত হইযাছে। কবি ইলিয়াডের দেব দেবী গণের ন্যায় হিন্দু দেবদেবীগণকেও রামচন্দ্র ও রাক্ষসরাজ, ইহাদিগের অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করাইয়াছেন। মেঘনাদ বধ সম্বন্ধে শেষকথা এই যে, ইহাতে রামায়ণে অনুল্লিখিত, এমন কি, রামায়ণবিরোধী অনেক কথাও লক্ষিত হইবে। রামায়ণের কবি, রাক্ষসদিগের প্রতি ঘৃণা এবং রামচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য তাঁহার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। রাক্ষসদিগের প্রতি অনুকম্পা ও সহানুভূতির উদ্রেক মেঘনাদবধের চরিতার উদ্দেশ্য, তিনি সেইজন্য রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের অপেক্ষা রাক্ষস পরিজন দিগের চরিত্র উন্নতভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। মেঘনাদবধ-কাব্য নয় সর্গে বিভক্ত। তিন দিন ও দুই রাত্রির ঘটনা এই নয় সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। ভগ্ন দূতের মুখে, বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ কর্তৃক মেঘনাদের সেনাপতি ভাবে অভিষেক প্রথম দিবসের ঘটনা। হরপার্ব্বতীর অনুগ্রহে লক্ষ্মণের স্বপ্ন ও অস্ত্রলাভ রাত্রির ঘটনা। মেঘনাদ বধের মধ্যে এই রাত্রিই সর্ব্বাপেক্ষা ঘটনাপূর্ণ। দেবরাজ ও শচীদেবীর কৈলাসে গমন, লক্ষ্মণের দেবী পূজা, প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ এবং সীতা দেবীর সঙ্গে সরমার কথোপকথন প্রভৃতি কাব্যের অনেক প্রধান প্রধান বিষয়, এই রাত্রির ঘটনা রূপে বর্ণিত হইয়াছে। মেঘনাদেরমৃত্যু ও লক্ষ্মণের শক্তিশেল, দ্বিতীয় দিবসের ঘটনা। রামচন্দ্রের যমপুরীদর্শন দ্বিতীয় রাত্রির ও প্রমীলার চিতারোহণ তৃতীয় দিবসের ঘটনা। কবির অনুপম কল্পনা গুণে এই তিন দিনের ঘটনা কত দীর্ঘ কালের কার্য্য বলিয়া মনে হয়। আমরা বর্ত্তমান বিস্মৃত হইয়া অতীতের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাই এবং কাব্যোক্ত অনেক বিষয় প্রত্যক্ষের ন্যায় দর্শন করি। গ্রন্থের প্রারম্ভেই সভাসীন রাক্ষসরাজ পাঠকের দৃষ্টিগোচর হইবেন। কবি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি এবং বিলাসসুখ-প্রিয় রাক্ষস রাজের সভার অতি সুন্দর চিত্র প্রদান করিয়াছেন। ত্রিভুবন যাঁহার পদানত এবং ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মী যাঁহার গৃহে মূর্ত্তিমতী রূপে অধিষ্ঠিতা, তাঁহার ঐশ্বর্য্যের তুলনা কোথায়? কাঞ্চনসৌধকিরীটিনী লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ন্যায় রাক্ষসরাজ সেই সভামণ্ডপে কনক সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। চারুলোচনা কিঙ্করী তাঁহাকে চামর বীজন করিতেছে, দ্বিতীয় কামদেবের ন্যায় সুন্দরবপুঃ ছত্রধর ছত্র ধারণ করিয়া রহিয়াছে। রুদ্রেশ্বর শূলপাণির ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি দ্বারপালগণ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। দূরস্থিত কোমল যন্ত্র ধ্বনি বায়ুহিল্লোলে বাহিত হইয়া সভাসীনগণের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে এবং রত্নসম্ভবা বিভা, ক্ষণপ্রভার ন্যায় দীপ্তিতে মুহুর্মুহু সভাগৃহ আলোকিত করিতেছে। কিন্তু হায়। এই অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যেও রাক্ষসরাজের প্রাণে শান্তি নাই। সভাগৃহ নীরব, সভাসদ্গণ বিষণ্ণ, রাজদূত শোণিতসিক্ত ধূলিধূসরিত কলেবরে সম্মুখে দণ্ডায়মান। রাক্ষসরাজের প্রিয়তম পুত্র বীরবাহু সমরে নিপতিত হইয়াছে, দূত সংবাদ দিবার জন্য রাজ সভায় উপস্থিত হইয়াছে। নীরব অশ্রুধারা দর্ দর্ প্রবাহিত হইয়া রাক্ষসরাজের রত্নখচিত পরিচ্ছদ সিক্ত করিতেছে। তাঁহার ন্যায় মর্ম্মা

স্তিক যন্ত্রণা আর কে কবে ভোগ করিয়াছে? তাঁহার অদৃষ্ট ক্রমে অসম্ভবও সম্ভব হইয়াছে। দেবগণের সহিত সংগ্রামে বিজয়ী বীরগণও একজন তুচ্ছ মানবের সহিত সংগ্রামে নিপতিত হইতেছে। বিধাতা যেন তাঁহার অদৃষ্ট গুণে কঠিন শাল্মলি তরুকেও পুষ্পদল দিয়া ছেদন করিতেছিলেন। তাঁহার কুসুমদাম সজ্জিত, দীপাবলী তেজে উদ্ভাসিত নাট্যশালা সদৃশী পুরী, তাঁহারই দোষে শ্মশান পুরীতে পরিণত হইতেছিল। তাহার কুসুমদাম বিশুষ্ক, মুরজ রবাব ধ্বনি নীরব এবং দীপাবলী নির্ব্বাণ হইয়া আসিতেছিল। চিরান্ধকার তাহাকে গ্রাস করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইতেছিল। হায় তাহার যন্ত্রণা কে বুঝিবে? অসংযত বাসনায় এবং সৌভাগ্য মদে অন্ধ হইয়া তিনি পতিপ্রাণা সীতা দেবীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। তখন তিনি বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু এখন বুঝিতেছিলেন যে, তাঁহার কার্য্যের পরিণাম কি বিষময় হইয়াছে। তিনি যাঁহাকে স্বর্ণকমল বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময়ী জানকী দাবানল শিখার আকার ধারণ করিয়া তাঁহার হৈমগৃহ দগ্ধ করিতেছিলেন। সমস্তই তাঁহার নিজের কার্য্যের ফল। পুত্র শোকের অপেক্ষাও নিদারুণ অনুতাপের যন্ত্রণা তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল। ভূধর স্বভাবতঃ ধীর, কিন্তু যন্ত্রণা অসহ্য হইলে, ধাতুনিঃস্রাব, তাহার বক্ষদেশ বিদীর্ণ করিয়া নিঃসরিত হয়, কোন পার্থিব শক্তি তাহার নিরোধ করিতে পারে না। হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ গৈরিক অগ্নি স্রোতের ন্যায় রাক্ষসরাজের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া নিঃসারিত হইল। মধুসূদন যে ভাবায় পুত্র শোকাতুর রাক্ষসরাজের হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, বঙ্গভাষায় তাহার সমতুল্য কিছু নাই। যে কোন ভাষার যে কোন কাব্যের পক্ষেই তাহা গৌরবজনক।

ভগ্নদূত রাক্ষসরাজের আদেশে বীরবাহুর মৃত্যুবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল। সে বর্ণনা অতি উত্তেজনাপূর্ণ। বীরত্বের বর্ণনায় বীর হৃদয় চিরদিন উত্তেজিত হইয়া থাকে। পুত্র বীরের ন্যায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে শুনিয়া, রাক্ষসরাজ ক্ষণকালের জন্য পুত্র শোক বিস্মৃত হইলেন এবং সভাসদগণকে সঙ্গে লইয়া রণক্ষেত্রশায়ী বীরপুত্রকে দেখিবার জন্য প্রাসাদ শিখরে আরোহণ করিলেন। সুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় মধুসূদন সে দৃশ্যের একটি অতি উৎকৃষ্ট দৃশ্যপট পাঠকের সম্মুখে অবতারিত করিয়াছেন। উন্নত প্রাসাদচূড়ায় তেজঃপুঞ্জকলেবর দশানন, উদয়াচলস্থিত দিবাকরের ন্যায় দণ্ডায়মান, তাহার পদতলে কাঞ্চন সৌধ কিরীটিনী লঙ্কাপুরী প্রসারিত, তাহার সৌন্দর্য্যে অমরাবতীও পরাজিতা। কোথাও পুষ্পোদ্যান স্থিত শ্রেণীবদ্ধ সৌধরাজী, কোথাও রজত সলিলোদ্গারী উৎস সমূহ, কোথাও কমল দলপূর্ণ সরোবর, কোথাও হীরকালঙ্কৃতশির দেবগৃহ এবং কোথাও বা নানারাগে রঞ্জিত রত্নপূর্ণ বিপণিসমূহ। ত্রিজগৎ যেন রত্নরাজী সংগ্রহ করিয়া ভুবনসুন্দরী লঙ্কাপুরীর পূজার জন্য সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। বিশাল প্রাচীর এই রত্নময়ী পুরীকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এবং অস্ত্রধারী প্রাচীররক্ষকগণ তাহার উপর অনবরত পরিভ্রমণ করিতেছে। লঙ্কার গর্ব্বিত সিংহদ্বার এক্ষণে শত্রুভয়ে অবরুদ্ধ। নগর প্রাচীরের বহির্দ্দেশে শত্রুদল, সিন্ধু-কূলস্থিত বালিবৃন্দের ন্যায় অগণিত সংখ্যায় লঙ্কাপুরীকে বেষ্টন করিয়া

রহিয়াছে। প্রাচীরের অবিদূরে রণক্ষেত্র, সেই রণক্ষেত্রে নিহত অসংখ্য রক্ষোবীরগণের সঙ্গে তাঁহার প্রিয়তম পুত্র বীরবাহু ও শত্রু সৈন্যকে নিষ্পেষিত করিয়া মহাশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। বীরপুত্রের এইরূপ পরিণাম দর্শন করিলে, বীর পিতার হৃদয়ে যেরূপ ভাব উদিত হইবার সম্ভাবনা, রাক্ষসরাজ মৃতপুত্রকে উদ্দেশ করিয়া সেই ভাবে বলিলেন,—

"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার
প্রিয়তম, বীরকুল সাধ এ শয়নে
সদা। রিপুদলবলে দলিয়া সমরে
জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে,
যে ডরে ভীরু সে মূঢ়, শত ধিক্ তারে।
তবু বৎস, যে হৃদয় মুগ্ধ মোহ মদে,
কোমল সে ফুল সম ও বজ্র আঘাতে
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন
অন্তর্যামী যিনি, আমি কহিতে অক্ষম।"

রণক্ষেত্রের এই শোচনীয় দৃশ্য বিস্মৃত হইবার জন্য রাক্ষসরাজ দূরস্থিত মহাসমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। অচল মেঘ শ্রেণীর ন্যায় শিলাখণ্ডে নির্ম্মিত সেতু মহাসমুদ্রকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া প্রসারিত রহিয়াছে। ফেণময় তরঙ্গরাজী তাহার উভয় পার্শ্বে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে আঘাত করিতেছে। বর্ষাকালীন জলস্রোতের ন্যায় শত্রুসৈন্যস্রোত তাহার উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। (১) যে মহাসমুদ্র এতদিন দুর্লঙ্ঘ্য পরিখার ন্যায় লঙ্কাপুরীকে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতেছিল, আজ তাহাকে এইরূপ শত্রুদত্ত শৃঙ্খল পরিধান করিতে দেখিয়া রাক্ষসরাজের হৃদয় যন্ত্রণায় অধীর হইল। তিনি মহাসমুদ্রকে অতিকঠোর তিরস্কার করিলেন। সে তিরস্কার অতি তীব্র ব্যঙ্গোক্তিতেপূর্ণ। মজ্জমান ব্যক্তি আশ্রয়ার্থ একটি তৃণখণ্ডকেও ধারণ করে, রাক্ষসরাজ আজ বিপদ্ সমুদ্রে নিমগ্ন প্রায়, তিনি অচেতন মহাসমুদ্রকেও সচেতন জীবের ন্যায় সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

'উঠ বলি বীরবলে এ জাঙ্গাল ভাঙি
দূরকর অপবাদ জুড়াও এ জ্বালা
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু,
রেখনাকো তব ভালে এ কলঙ্ক রেখা
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।

যে দুর্বিষহ যন্ত্রণায় রাক্ষসরাজের হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, এই প্রার্থনার বর্ণে বর্ণে যেন তাহা উদ্গীর্ণ হইতেছে। মেঘনাদ বধের অনুতপ্ত এবং যন্ত্রণাগ্রস্ত রাক্ষসরাজের চরিত্র ইহা হইতে অতি সুন্দররূপে অনুমিত হইতে পারে।

রণক্ষেত্র দর্শন করিয়া, রাক্ষসরাজ পুনর্ব্বার আসিয়া সভামণ্ডপে উপবিষ্ট হইলেন। এমন সময় অতি গম্ভীর রোদন ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, এবং বীরবাহুর জননী রাজমহিষী চিত্রাঙ্গদা দেবী সঙ্গিনীদিগকে সঙ্গে লইয়া আলুথালু বেশে সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। বীর-রসের ন্যায় কারুণ্য রসের উদ্দীপনেও মধুসূদন কিরূপ নিপুণ ছিলেন, এই অংশ তাহার পরিচায়ক। যে

(১) "অপূর্ব্ব বন্ধন সেতু, রাজপথ সম
প্রশস্ত, বহিছে জলস্রোত কলরবে
স্রোতঃ পথে জল যথা বরিষার কালে।"

মুদ্রিত মেঘনাদবধে "জলস্রোত" এইরূপ আছে, কিন্তু মধুসূদন রাজনারায়ণ বাবুকে যে পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে "জনস্রোত" এইরূপ আছে। জনস্রোত করিলেই অর্থ সুসঙ্গত হয়। জলস্রোত কথাটী লইয়া ভারতী সমালোচক মধুসূদনকে অতি কঠোর ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন। জনস্রোত কথাটী মধুসূদনের অতীব প্রিয়, তাঁহার গ্রন্থের বহুস্থানেই ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ভ্রম ক্রমেই জনস্রোতের স্থলে মুদ্রিতপুস্তকে জলস্রোত এইরূপ হইয়াছে।

কারুণ্যপূর্ণ ভাষায় চিত্রাঙ্গদা দেবী রাক্ষসনাথের নিকট আপনার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। হায়! বিধাতা চিত্রাঙ্গদাকে একটী মাত্র রত্নের অধিকারিণী করিয়াছিলেন। বিহগী যেমন সস্নেহে আপনার শাবকটীকে তরুকোটরে রাখিয়া দেয়, কাঙ্গালিনী চিত্রাঙ্গদাও তেমনি রাজার নিকট সে রত্ন গচ্ছিত রাখিয়াছিল। দরিদ্রধনরক্ষণ রাজধর্ম্ম। রাজকুলেশ্বর লঙ্কানাথ কাঙ্গালিনী চিত্রাঙ্গদার সে রত্ন কোথায় রাখিয়াছেন? পুত্র শোকাতুরা জননীর এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কি সম্ভব? রাক্ষসরাজের পক্ষে ইহার উত্তর দেওয়ার সম্ভাবনা ছিলনা। যে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণায় তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, তিনি কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়া বলিলেন—

"এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা ললনে,
শত পুত্র শোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবা নিশি। হায় দেবি, বনে যথা বায়ু
প্রবল, শিমুল শিম্বী ফুটাইলে বলে
উড়ি যায় তুলা রাশি, এ বিপুল-কুল
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু
বিনাশিতে লঙ্কা মম কহিনু তোমারে।"

চিত্রাঙ্গদা দেবী পুত্র শোকে উন্মাদিনী হইলেও বীরমাতা বীরপত্নী, রাক্ষসরাজ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন,—

'এ বিলাপ কভু দেবি সাজে কি তোমারে,
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব
গেছে চলি স্বর্গপুরে। বীর মাতা তুমি,
বীর কর্ম্মে হত পুত্র হেতু কি উচিত
ক্রন্দন? এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি
তব পুত্র পরাক্রমে, তবে কেন তুমি
কাঁদ ইন্দুনিভাননে তিত অশ্রুনীরে?"

বীরমাতার পক্ষে এরূপ সান্ত্বনা অবশ্যই শান্তিজনক।' কিন্তু চিত্রাঙ্গদা দেবীর পক্ষে এ সান্ত্বনা তৃপ্তিপ্রদ হইল না। সুগন্ধিকুসুম যখন দেবোদ্দেশে হোমানলে অর্পিত হয়, তখন তাহার পুষ্প জন্ম সফল হইল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই কুসুম যখন আবার শ্মশানাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়, তখন তাহা কেবল শোকেরই কারণ হইয়া উঠে। সন্তানকে স্বদেশের কল্যাণের জন্য ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইতে দেখিলে, বীর জননীর প্রাণে সান্ত্বনা আসিতে পারে সত্য, কিন্তু অপরের পাপ তৃষারূপ অগ্নিতে হৃদয়ের ধনকে আহুতি রূপে সমর্পিত হইতে দেখিলে, বীর জননীর প্রাণে যে যন্ত্রণা হয়, তাহা কে বুঝিবে? যে অগ্নিকুণ্ডে চিত্রাঙ্গদার হৃদয়ের ধন সমর্পিত হইয়াছিল, তাহা হোমানল নয়, লঙ্কেশ্বরের অসংযত বাসনারূপ চিতানলেই তাহা ভস্মীভূত হইয়াছিল, জননীর প্রাণ শান্তি মানিবে কেন? রাক্ষসরাজকে দেশবৈরীর প্রসঙ্গ করিতে দেখিয়া চিত্রাঙ্গদা দেবী বলিলেন,—

———"দেশবৈরী নাশে যে সমরে
শুভক্ষণে জন্ম তার, ধন্যবলে মানি
হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে
কোন লোভে কহ রাজা এসেছে এদেশে
রাঘব? এ স্বর্ণলঙ্কা দেবেন্দ্র-বাঞ্ছিত,
অতুল ভবমণ্ডলে, ইহার চৌদিকে,
রজত প্রাচীর সম শোভেন জলধি।
শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার
ক্ষুদ্রনর। তব হৈম সিংহাসন আশে
যুঝিছে কি দাশরথি? বামন হইয়া
কে চাহে ধরিতে চাঁদে? তবে দেশরিপু
কেন তারে বল, বলি? কাকোদর সদা
নম্রশিরঃ, কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি
কেহ, উর্দ্ধফণা ফণী দংশে প্রহারকে।
কে কহ, এ কালঅগ্নি জ্বালিয়াছে আজি

লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম ফলে,
মজালে রাক্ষসকুল, মজিলা আপনি।"

সুশীতল বারিধারা হৃদয়ে ধারণ করিয়াও কাদম্বিনী যেমন অশনি নিক্ষেপ করে; পতিপরায়ণার হৃদয় স্বভাবতঃ স্নেহপ্রবণ হইলেও, অবস্থা বিশেষে তেমনি তাহা হইতে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা বিনির্গত হয়। চিত্রাঙ্গদা চরিত্রে ইহা সুন্দররূপ প্রমাণিত হইয়াছে। এ চিত্র বাল্মীকি রামায়ণে নাই, ইহা মধুসূদনেরই সৃষ্টি। কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণে চিত্রাঙ্গদার কেবল নাম মাত্রই আছে। মধুসূদনের যে কল্পনা বীরাঙ্গনা কাব্যের দলিতা ফণিনী রূপিণী জনার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল, মেঘনাদবধের চিত্রাঙ্গদায় তাহারই রেখা পাত হইয়াছে। চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের প্রবর্ত্তন না করিলে রাবণের চরিত্র এরূপ পরিস্ফুট হইত না।

আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়াই রাক্ষসরাজ পতিপ্রাণা সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছিলেন, বিধাতা যদিও তাঁহাকে তাঁহার উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিতেছিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার চেতনা হয় নাই। পাপগোপন করিবার ন্যায় যে কোন উপায়ে হউক, তাহার সমর্থন করিবার প্রবৃত্তিও মনুষ্যহৃদয়ে প্রবল। পাপের সমর্থন করিতে যাইয়া, মনুষ্য কত সময় যে জগতের সকলকে, এমন কি, নিজের হৃদয় কেও বঞ্চনা করে, তাহার সংখ্যা নাই। রাক্ষসরাজ ঘোরতর পাপাচারী হইয়াও বিধাতার নিকট বলিতেন,—

'কি পাপ দেখিয়া মোর রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই।"

যে অশুভক্ষণে তিনি জানকীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া তিনি আপনাকে ধিক্কার দান করিতেন, কিন্তু তথাপি নিজের দোষ স্বীকার করিতে তাঁহার সাহস হইত না। আত্মবঞ্চকের ন্যায় নিজের হৃদয়কে তিনি এই বলিয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতেন যে, তাঁহার নিজের কোন অপরাধ নাই, তাঁহার অভাগিনী ভগিনী শূর্পনখার দুঃখে দুঃখিত হওয়াতেই তাঁহার সেই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। তিনি বলিতেন,—

কি কুক্ষণে দেখেছিলি তুইরে অভাগি
কাল পঞ্চবটী বনে কালকূটে ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে তোর দুখে দুখী,
পাবক শিখা রূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম গেহে?"

কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার এই ভ্রম বুঝাইয়া দিবার জন্য একজনের আবশ্যক ছিল। সেই জন্যই চিত্রাঙ্গদার প্রয়োজন। রাক্ষসরাজ পুত্রশোকবিধুরা পত্নীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, দেবি, তোমার বীর পুত্র দেশবৈরীদিগকে বিনাশ করিয়া স্বর্গ-গমন করিয়াছে, বীরমাতা হইয়া তোমার পক্ষে এরূপ ক্রন্দন কি কর্ত্তব্য? কিন্তু দণ্ডদাতা বিধাতা তাঁহাকে তাহার উপযুক্ত শাস্তি দান করিলেন। যে ফণিনীর মণি তিনি অপহরণ করিয়াছিলেন, আজ সে তাঁহাকে যেন দংশন করিয়াই বলিল,—"দেশবৈরী? রাক্ষসরাজ কাহাকে দেশবৈরী বলিতে চান? ক্ষুদ্র নর রামচন্দ্র কি লঙ্কার স্বর্ণ সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ করিতেছেন? তবে দেশবৈরী কথা কেন?" চিত্রাঙ্গদা দেবী রাক্ষসরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে কহ এ কাল অগ্নি জালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ নিজ কর্ম্মফলে
মজালে রাক্ষস কুল, মজিলা আপনি।"

পুত্রশোক-কাতর মনুষ্য, অনেক সময়ে সমদুঃখ-ভাগিনী পত্নীর সহিত রোদন করিয়া সান্ত্বনা লাভ করে; কিন্তু হতভাগ্য রাক্ষস-

রাজের পক্ষে সে আশাও ছিল না। শত পুত্র শোকে জর্জ্জরিত হইলেও পত্নীগণের নিকট তাঁহার সহানুভূতির আশা ছিল না। তাঁহার ন্যায় আত্মঘাতী ব্যক্তিকে সহানুভূতি করিবে কে? সহানুভূতির প্রার্থনা করিতে যাইলে তাঁহার ভাগ্যে কেবল তিরস্কারই মিলিত। আমরা সেইজন্য বলিয়াছি, চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের প্রবর্ত্তন করিয়া, মধুসূদন যন্ত্রণানিপীড়িত রাক্ষসরাজের চরিত্র সম্যক পরিস্ফুট করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

পুত্রশোককাতরা চিত্রাঙ্গদা দেবী অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলে রাক্ষসরাজ শোকে এবং অভিমানে রণসজ্জার আদেশ প্রদান করিলেন। বীরপুত্র ধাত্রী লঙ্কাপুরী বীরশূন্য হইয়াছিল, লঙ্কেশ্বর নিজেই যুদ্ধে গমন করিতে সংকল্প করিলেন। কবি এই স্থলে রাক্ষসবীরগণের যুদ্ধসজ্জার অতি সুন্দর বিবরণ প্রদান করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে এক অভিনব দৃশ্যের প্রবর্ত্তন করিয়া আপনার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। রাক্ষস-বীরগণের পদভরে লঙ্কাপুরী বিকম্পিত হওয়াতে অসহিষ্ণু জলনিধি গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং তাহার তরঙ্গাঘাতে জলাধিষ্ঠাত্রী বারুণী দেবীর মুক্তাময়ী গৃহচূড়া পুনঃপুনঃ বিকম্পিত হইয়া উঠিল। মেঘনাদবধের এই বারুণী চরিত্র হিন্দুপুরাণানুমোদিত নহে। হোমরের থেটিস (Thetis) হইতে মিল্টন তাঁহার কোমসের (Comus) স্যাব্রিনর (Sabrina) আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের বারুণী চরিত্র এই স্যাব্রিনা হইতে কল্পিত। সমুদ্রের সঙ্গে সমরপ্রিয় বায়ুদলের যুদ্ধ এবং বায়ুরাজ প্রভঞ্জনের বিষয় গ্রীক পুরাণের (Æolus) এবং (Winds) বায়ুগণ হইতে কল্পিত হইয়াছে। বারুণী দেবী লঙ্কা যুদ্ধের বৃত্তান্ত অবগত হইবার জন্য আপনার সখী মুরলাকে লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী দেবীর নিকট প্রেরণ করিলেন। মুরলা নাম কবি উত্তররামচরিত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। লঙ্কাপুরীর ঐশ্বর্য্য এবং যুদ্ধগামী রক্ষসৈনিকগণের রণসজ্জা মুরলা এবং রাজলক্ষ্মীর কথোপকথন করি, অতি সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। মুরলা রণসজ্জায় সজ্জিত রক্ষবীরগণের মধ্যে মেঘনাদকে দেখিতে না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

——"কহ দেবীশ্বরি
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রথী
ইন্দ্রজিতে, রক্ষকুল হর্য্যক্ষ বিগ্রহে
হত কি সে বলী, সতি, এ কাল সমরে?"

রাজলক্ষ্মী বলিলেন,—

"প্রমোদ উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে
যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে
বীরবাহু, যাও তুমি, * * *
* * * * যাই আমি যথা
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ লঙ্কা ধামে,
প্রাক্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।"

কমলা মেঘনাদের ধাত্রীর বেশ ধারণ করিয়া লঙ্কার বহির্দেশ-স্থিত মেঘনাদের প্রমোদ উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। মেঘনাদ ধাত্রীর চরণে প্রণাম করিয়া লঙ্কার কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, কমলা বীরবাহুর মৃত্যু ও রাক্ষসরাজের যুদ্ধসজ্জার সংবাদ প্রদান করিলেন। বিস্মিত মেঘনাদ ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"——————কে বধিল কবে
প্রিয়ানুজে? নিশারণে সংহারিনু আমি
রঘুবরে, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিনু
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরী দলে, তবে
এ বারতা—এ অদ্ভুত বারতা, জননি,
কোথায় পাইলে তুমি? * *"

কমলা বলিলেন;—

"* * হায় পুত্র মায়াবী মানব
সীতাপতি, তব শরে মরিয়া বাঁচিল
যাও তুমি ত্বরা করি, রক্ষ রক্ষকুল-
মান, এ কাল সমরে, রক্ষচূড়ামণি।"

তেজস্বী বীর শুনিবা মাত্র কণ্ঠের কুসুম দাম ছিন্ন করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন, এবং আপনাকে ধিক্কার প্রদান করিয় বলিলেন,—

'* * ধিক মোরে
* * বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে
এই কি সাজে আমারে? দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ? আন রথ ত্বরা করি
ঘুচাব এ অপবাদ বধি রিপু দলে।"

মেঘনাদ বীরদর্পে রথারোহণ করিতে যান, এমন সময় তাঁহার সাধ্বী পত্নী প্রমীলা আসিয়া তাঁহার করযুগল ধারণ করিলেন। যে ভাবী অমঙ্গলরূপ মেঘ মেঘনাদের জীবনাকাশে সঞ্চার হইতেছিল, সাধ্বীর কোমল হৃদয়ে বুঝি তাহার ছায়াপাত হইয়াছিল, তাই প্রমীলা বীরপত্নী এবং বীরাঙ্গনা হইয়াও সামান্যা রমণীর ন্যায় কাতরভাবে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"————কোথা প্রাণসখে
রাখি এ দাসীরে কহ চলিলা আপনি
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী?"

বীরাঙ্গনা প্রমীলার পক্ষে এরূপ রোদন স্বাভাবিক কি না, পাঠকের মনে স্বভাবতঃই সন্দেহ হইতে পারে। বীরপত্নী কোথায়, স্বহস্তে স্বামীকে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া সহাস্য বদনে বিদায় দান করিবেন, না রোদন? ইন্দ্রজিৎ-পত্নীর কি এই ব্যবহার? পাঠক প্রমীলার হৃদয়ের ভাব বুঝিবার জন্য লঙ্কার সেই সর্ব্বগ্রাসী সমরের বিষয় চিন্তা করুন, যে যুদ্ধে প্রমীলার সহস্র সহস্র আত্মীয়গণ নিহত হইয়াছিলেন, প্রমীলার জীবিতসর্ব্বস্ব সেই কালসমরে গমন করিতেছিলেন, সাধ্বীর প্রাণ প্রবোধ মানিবে কেন? স্বামীর ভাবী বিপদের সম্ভাবনায় সাধ্বীর প্রাণ কিরূপ ব্যাকুলিত হয়, তাহা বুঝাইবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্ব- শ্রেষ্ঠ বীররসাত্মক কাব্যের কবি তাঁহার আদর্শ বীর পত্নীকে এইরূপ অশ্রুসিক্ত করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। যে অবস্থায় সাধ্বী প্রমীলা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

"————কোথা প্রাণসখে
রাখি এ দাসীরে কহ চলিলা আপনি?"

ঠিক্ সেই অবস্থাতেই সাধ্বী এণ্ড্রোম্যাকি (Andromache) হেক্টরকে বলিয়াছিলেন,—

"Too daring prince, o whither dost thou run?
Ah! too forgetful of thy wife and son
And think'st thou not how wretched we shall be
A widow I, a helpless orphan he."

বীরত্ব-দৃপ্ত মেঘনাদ সাধ্বী পত্নীর অশ্রুজলে দৃক্‌পাত করিলেন না। যিনি যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রকেও পরাজয় করিয়াছিলেন, তুচ্ছ মানব-শত্রু রামের সহিত সংগ্রাম তাঁহার নিকট শিশুর ক্রীড়া মাত্র। তিনি অশ্রুসিক্তা পত্নীকে সহাস্য মুখে বলিলেন,—

"————ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া
কল্যাণি, সমরে নাশি তোমার কল্যাণে
রাঘবে, বিদায় এবে দেহ বিধুমুখি।"

দেখিতে দেখিতে মেঘনাদের ব্যোমযান আকাশমার্গে উত্থিত হইল। ধনুষ্টঙ্কার শব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত এবং লঙ্কাবাসীদিগকে আশ্বস্ত করিয়া, মেঘনাদ যেখানে রাক্ষসরাজ সমর সজ্জা করিতেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র রাক্ষস সৈনিকগণ আনন্দে সিংহনাদ করিয়া উঠিল।

মেঘনাদ পিতার চরণে প্রণাম করিয়া কর-যোড়ে বলিলেন ,—

"হে রক্ষকুলপতি
শুনেছি, মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব ? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি ,
কিন্তু অনুমতি দেহ সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি। ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু অস্ত্রে উড়াইব তারে,
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

পুত্রের এই বীরোচিত প্রার্থনায়, সহসা সম্মতি দান করিতে রাক্ষসরাজের সামর্থ্য ছিল না। অবস্থার বিভিন্নতায় মনুষ্য প্রকৃতিও বিভিন্ন হইয়া থাকে। নবীন আশা এবং উৎসাহে অনুপ্রাণিত মেঘনাদ এবং শোকজর্জ্জরিত, নিরাশ্বাসগ্রস্ত রাক্ষসরাজ উভয়ের ব্যবহারে কতই বিভিন্নতা। একদিকে যৌবনের বল এবং উৎসাহ মেঘনাদকে অনির্ম্মুক্তবিব ভুজঙ্গের ন্যায় বিশ্বগ্রাসে প্রবৃত্ত করিতেছিল, অপর দিকে শোকগ্রস্ত, মর্ম্মপীড়িত রাক্ষসরাজ মন্ত্রমুগ্ধ বিষধরের ন্যায় ফণামণ্ডল সঙ্কুচিত করিয়া যেন পৃথিবীর সঙ্গে বিলীন হইয়া যাইতেছিলেন। পুত্র রুদ্রপীড়কে যুদ্ধকাম দেখিয়া সৌভাগ্যগর্ব্বিত বৃত্র উৎসাহে বলিয়াছিলেন ;—

"রুদ্রপীড় তব চিত্তে যশো অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বাঁধিয়া কিরীটে,
বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশোঃপ্রভা পুত্র যশোধর—
ত্রিলোকে হয়েছ ধন্য আরও ধন্য হও,
দৈত্যকুল উজ্জ্বলিয়া দানব তিলক।"

মর্ম্মপীড়িত রাক্ষসরাজ পুত্রকে বলিলেন ,—

"এ কাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা
বারম্বার। হায়! বিধি বাম মম প্রতি!
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুন বাঁচে?"

বৃত্র এবং রাক্ষসরাজ উভয়েই ত্রিভুবন বিজয়ী, উভয়েরই বাহুবলে দেবগণ পরাজিত। কিন্তু অবস্থার পার্থক্যে উভয়ের প্রকৃতি কিরূপ স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বৃত্র সৌভাগ্য লক্ষ্মীর-ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিলেন। শোক অথবা নিরাশ্বাস কাহাকে বলে, সে অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল না; যে উৎসাহে তিনি পুত্রকে যুদ্ধগমনে আদেশ দান করিলেন, নিরাশা-পীড়িত রাক্ষসরাজের হৃদয়ে সে উৎসাহ ছিল না। তাই তিনি সামান্য জনের ন্যায় পুত্রকে যুদ্ধ-গমনে সম্মতি দান করিতে ভীত হইলেন। কিন্তু মেঘনাদের হৃদয়ের ভাব স্বতন্ত্র। বাহুবল-দৃপ্ত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, তিনি বীরদর্পে পিতাকে বলিলেন ,—

"কি ছার সে নর তারে ডরাও আপনি
রাজেন্দ্র। থাকিতে দাস যদি যাও রণে
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে,
হাসিবে মেঘবাহন, রুষিবেন দেব
অগ্নি। দুইবার আমি হারানু রাঘবে
আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে,
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ঔষধে।"

যে বলে পর্ব্বতচারী মাতঙ্গ বিশালকায় গিরিশৃঙ্গকে শুণ্ডদ্বারা আকর্ষণ করে, মেঘনাদের এই হৃদয়ের উৎসাহ সেই পাশববলপ্রসূত। কিন্তু রাক্ষসরাজ বুঝিতেছিলেন যে, তিনি যে অবস্থায় নিপতিত হইয়াছিলেন, তাহাতে পাশববলে জয়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। পাশববলে জয়ী হইবার আশা থাকিলে অনেক দিন পূর্ব্বেই তিনি জয়লাভ করিতে পারিতেন , তাহা হইলে কুম্ভকর্ণের ন্যায় বীর একজন তুচ্ছ মানবের সঙ্গে যুদ্ধে নিপতিত হইত না। তিনি বলিলেন ;—

"কুম্ভকর্ণ বলী—
ভাই মম, তায় আমি জাগানু অকালে

ভয়ে, হায় দেহ তার, দেখ সিন্ধুতীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে।'

এ অবস্থায় পাশববলে জয়লাভ করিবার আশা কোথায়? তিনি বুঝিতেছিলেন, তাঁহাব পাপাচারে ক্রুদ্ধ হইয়া, স্বয়ং বিধাতা তাঁহার লঙ্কাপুরী ধ্বংস করিবাব জন্য বাহু প্রসারণ করিতেছেন। দেবানুগ্রহ ভিন্ন এ বিপদে রক্ষার আব উপায় নাই। তিনি পুত্রকে বলিলেন,—

"তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে,
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর বীরমণি।
সেনাপতি পদে আমি বরিনু তোমারে।
দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে,
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।"

রাক্ষসরাজ গঙ্গোদক গ্রহণ করিয়া পুত্রকে যথাবিধি অভিষিক্ত করিলেন। বন্দীগণের আনন্দ-সঙ্গীতে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ হইল। বন্দীগণের এই সঙ্গীত অতি মনোহর, মেঘনাদের অভিষেকের সঙ্গে প্রথম সর্গ পরিসমাপ্ত হইয়াছে।

মেঘনাদ-বধের এই প্রথমসর্গ সম্বন্ধে আমরা একটী অবান্তর কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এ সম্বন্ধে সমালোচকগণের মধ্যে বিষম মতভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত, রাজনারায়ণ বসু এবং পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতী-সমালোচক অতি কঠোর সমালোচনা দ্বারা ইহাকে নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় এবং অসমীচিন বলিয়া প্রমাণিত করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। মেঘনাদবধের এপর্য্যন্ত যত প্রতিপক্ষ সমালোচন বহির্গত হইয়াছে, ভারতী-সমালোচনই তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য। মেঘনাদবধের দোষ তাহাতে যেরূপ তন্ন তন্ন রূপে সমালোচিত হইয়াছে, অন্য কোথাও সেরূপ হয় নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমালোচক অনেক স্থলেই একদেশদর্শিতা বশতঃ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ভারতী-সমালোচনার আদ্যোপান্ত প্রতিবাদ করা আমাদিগের অভিপ্রেত নয়, আমরা কেবল তাঁহার দুই একটী ভ্রম নির্দ্দেশ করিব, তাহা হইলেই তাঁহার দোষারোপ কতদূর যুক্তিমূলক, পাঠক বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিবেন।

ভারতী-সমালোচকের মতে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান দোষ এই যে, ইহার সর্ব্ব প্রধান চিত্র রাবণের চরিত্র কর্ত্তব্যানুরূপ গম্ভীরভাবে চিত্রিত হয়নাই। তিনি বলেন, রাবণের কথা বলিবামাত্র আমাদিগের মনে হয়, "কি একটী ভীষণ চিত্রই পাইব। গগনস্পর্শী বিশাল দশানন অন্ধকারময় মূর্ত্তিতে উচ্চ প্রকাণ্ড সভামণ্ডপে আসীন, কিন্তু তাহা খুজিয়া পাই না।" মেঘনাদবধের রাবণে তেজ নাই, গাম্ভীর্য্য নাই, পুত্রের মৃত্যু সংবাদে তিনি রমণীর ন্যায় রোদনপরায়ণ। তাঁহার সভাও গম্ভীরভাব উদ্দীপক নহে। তাহা যেন নাট্যশালার বর্ণনা। মেঘনাদবধের রাবণকে প্রাপ্ত হইয়া আমরা বাল্মীকির রাবণকে হারাইয়া ফেলি। পাছে অপর কেহ মেঘনাদবধের রাবণের চরিত্র সম্বন্ধে এইরূপ ভ্রমে পতিত হন, সেই জন্য আমরা মেঘনাদবধ সমালোচনের প্রারম্ভেই বলিয়াছি যে, মহর্ষিবর্ণিত বীভৎস রসের আধারস্বরূপ রাক্ষস বীরগণকে বিস্মৃত হইতে না পারিলে, মেঘনাদ-বধের নূতনত্ব অনুভব করিবার সম্ভাবনা নাই। মহর্ষি রাক্ষসরাজকে যেরূপ আদর্শে গঠিত করিয়াছিলেন,

তাহার আনুষঙ্গিক বিষয়গুলিও তাহারই উপযুক্ত করিয়া সমাবেশ করিয়াছিলেন। যে রাবণ সীতাদেবীকে প্রাতরাশরূপে ভক্ষণ করিবে বলিয়া পুনঃ পুনঃ ভীতি প্রদর্শন করিত, এবং যে বলিত যে "দুই মাসের মধ্যে তুমি আমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে অস্বীকৃতা হইলে আমি তোমার শোণিত পান করিব," সে যে "ভীষণ অন্ধকারময় মূর্ত্তিতে" সভামণ্ডপ তিমিরাবৃত করিয়া উপবিষ্ট থাকিবে, তাহা বিচিত্র নয় এবং তাহার সভাও যে "তরঙ্গসঙ্কুল নক্র কুম্ভীর ভীষণ সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর" হইবে, তাহাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু মেঘনাদবধের রাবণ সেই নরমাংসপ্রিয় পিশাচাচারী রাবণ নহেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর এবং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত সম্রাট, কিন্তু তিনি মনুষ্য—আমাদিগেরই ন্যায় মনুষ্য। সুতরাং মধুসূদন তাঁহাকে মনুষ্যোচিত ভাবেই চিত্রিত করিয়াছেন। ত্রিভুবন যাঁহার পদানত এবং ঐশ্বর্য্য-লক্ষ্মী মূর্ত্তিমতীরূপে যাঁহার গৃহে প্রতিষ্ঠিতা, সেই ভোগৈশ্বর্য্য প্রিয় রাজার আকৃতি, সভা, রাজধানী, এবং সুখসাধনের প্রত্যেক সামগ্রী যে তাঁহার বিলাস সুখপ্রিয়তার উপযোগী হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তাহাতে যে ভীষণত্বের সমাবেশ করিতে হইবে, মধুসূদন তাহা একবারও কল্পনা করেন নাই। মহর্ষি এবং তাঁহার পদানুবর্ত্তী মধুসূদন, উভয়েই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আদর্শে তাঁহাদিগের রাবণের চরিত্র কল্পনা করিয়াছিলেন। সুতরাং একজনে অপরের ভাব প্রত্যাশা করিলে নিশ্চয়ই নিরাশ হইতে হইবে। ভারতী-সমালোচক মেঘনাদবধের রাবণে মহর্ষি-কল্পিত রাবণকে দেখিতে প্রত্যাশা করিয়াই এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মহর্ষির কাব্যেও রাবণের চরিত্র এবং সভাসম্বন্ধে সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। মহর্ষি রাবণকে কোথাওবা তেজঃপুঞ্জ কলেবর সুন্দরবপু মহাপুরুষ রূপে, আবার কোথাওবা অতি বিকট মূর্ত্তি ভীষণকায় রাক্ষস রূপে বর্ণন করিয়াছেন। রাবণের সভাও তিনি একস্থলে নক্রচক্র ভীষণ মহা সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া, আবার অন্যত্র "সুবর্ণ রজতাস্তীর্ণা বিশুদ্ধ স্ফটিকান্তরা" ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা তাহার ভীষণ ভাব অপহিত করিয়াছেন। কৌতুহলী পাঠককে আমরা মূল রামায়ণ হইতে এই সকল পরস্পর-বিরোধীস্থল পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ভারতী-সমালোচকের মতে মেঘনাদবধের প্রথম সর্গের দ্বিতীয় দোষ এই যে, রাক্ষসরাজাকে বীরবাহুর শোকে রোদনপরায়ণ করিয়া মধুসূদন অত্যন্ত অসঙ্গত কার্য্য করিয়াছেন। স্বীকার করি, পৃথিবীতে এমন দুই একজন মহাপুরুষ থাকিতে পারেন যে, পুত্রশোকই হউক, আর রাজ্য নাশই হউক, কিছুতেই তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না, ইঁহারা সংযমী বীর, এবং নরাকারে দেবতা। কিন্তু রাক্ষসরাজ রাবণ বহুবলশালী বীর হইলেও সংযমী বীর ছিলেন না। যিনি আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়া কাপুরুষের ন্যায় ছদ্মবেশে পতিপ্রাণা সীতাদেবীকে অপহরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, এবং যিনি ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া সেই নিরপরাধা সাধ্বীকে ছেদন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; যিনি পুত্রহন্তাকে বধ করিবার জন্য অসি গ্রহণ না করিয়া একটী নিরপরাধা রমণীকে হত্যা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন এবং দারুণ শোকের সময়ও সীতা তাঁহার বশী-

ভূতা হইতে পারেন, এই আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি পুত্রশোকে অবিচলিত এবং সংযমী ঋষির ন্যায় প্রশান্ত-চিত্ত, এরূপ বর্ণন করিলে কি তাহা নিতান্ত হাস্যোদ্দীপক এবং অস্বাভাবিক হইত না? ভগবান মহর্ষি তাঁহাকে সেই জন্য সেরূপ অস্বাভাবিকভাবে চিত্রিত করেন নাই। তিনি রাবণকে বাহুবল-দৃপ্ত কিন্তু তরল-হৃদয় বীররূপে বর্ণন করিয়াছেন। আর্ষ রামায়ণের রাবণ মহা সমুদ্রের ন্যায় কখনওবা ধীর প্রশান্ত, আবার কখনওবা চঞ্চল তরঙ্গায়িত। বিপৎপাতের সংবাদে তিনি কখনওবা ধীরভাবে প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতেছেন, আবার কখনওবা মূর্চ্ছিত হইয়া সিংহাসন হইতে ভূমিতে পতিত হইতেছেন এবং স্বহস্তে আপনার কেশজাল উৎপাটিত করিতেছেন। ভারতী-সমালোচক তাঁহার প্রকৃতির একাংশমাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, অপর অংশ প্রদর্শন করেন নাই। পাঠক স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, মধুসূদন যখন মহর্ষি-কল্পিত রাবণকে গ্রহণ না করিয়া স্বতন্ত্র আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে সংযমী বীররূপে বর্ণন করিলেইত তাঁহার কাব্যের সৌন্দর্য্য রক্ষিত হইত; কিন্তু তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মধুসূদন সহস্র চেষ্টা করিলেও স্বামী এবং দেবরের অসাক্ষাতে ছদ্মবেশে নারী-চোর ব্যক্তিকে আদর্শ পুরুষরূপে সংস্থাপিত করিতে পারিতেন না। রাবণকে গ্রন্থের নায়করূপে গ্রহণ না করিয়া, অন্য কাহাকেও নায়করূপে গ্রহণ করিতে পারিলে, তাহা সম্ভব হইত, কিন্তু সীতাপহারক লঙ্কেশ্বরকে নায়ক রূপে গ্রহণ করিয়া, সেরূপ আদর্শ সংস্থাপিত করা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। মহর্ষি-বর্ণিত রাবণে যতদূর মনুষ্যোচিত ভাব সংস্থাপন করা সম্ভব, তিনি তাহাই করিয়াছেন; তাঁহাকে আদর্শ মনুষ্য রূপে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করেন নাই।

ভারতী-সমালোচনা সম্বন্ধে আমাদিগের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহাতে উল্লিখিত আদর্শ পৃথিবীর কোন মাহাকাব্যের আদর্শ নয়। স্পার্টান বীরগণের আদর্শ হইতেই ভারতী-সমালোচক তাহা কল্পনা করিয়াছিলেন। আমরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে কয়েকখানি মহাকাব্যের আদর্শ স্থাপিত করিতেছি। মহাভারতের মধ্যে ভীষ্মকে পরিত্যাগ করিলে, দ্রোণ এবং অর্জ্জুনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর। বীর ব্রতের সঙ্গে ঋষিজনোচিত সংযম ইহাদিগের চরিত্রে যেরূপ ছিল, সেরূপ আর কাহারও ছিলনা। এই দুই জনের মধ্যে দ্রোণাচার্য্য পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া শত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন অভিমন্যুর শোকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, বীরবাহুর শোকে রাবণ তদপেক্ষা অধিক দুর্ব্বলের ন্যায় রোদন করেন নাই। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "আমার সতত লালিত পালিত সেই সুভদ্রাপ্রিয়শুর পুত্রকে যদি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব। * * * * স্বজনগণের প্রিয় ও হিতকার্য্যে নিরত মৎপুত্র সেই অভিমন্যুকে যদি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমি প্রাণত্যাগ করিব। যে রথিগণ মধ্যে মহারথ বলিয়া গণিত * * সেই তরুণ পুত্রকে

যদি আমি দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমি যমালয়ে গমন করিব। তাহার সেই সুন্দর নাসিকা,ললাট,চক্ষু, ভ্রূ ও ওষ্ঠ শোভিত বদন দেখিতে না পাইলে আমার অন্তঃকরণের শান্তি কোথায়? *** আমার হৃদয় পাষাণময় অতি কঠিন যে, সেই দীর্ঘবাহু, লোহিত-লোচন পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া এখনও বিদীর্ণ হইতেছে না। আমি সুভদ্রার নিমিত্ত শোক করিতেছি, তিনি রণে অপরাঙ্মুখ পুত্রকে নিহত শ্রবণ করিয়া শোকার্ত্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন,সন্দেহ নাই। সুভদ্রা এবং দ্রৌপদী অভিমন্যুকে দেখিতে না পাইয়া আমাকে কি বলিবেন? আমিই বা সেই দুঃখার্ত্তাদিগকে কি বলিব, পুত্রবধূকেই বা কি বলিয়া বুঝাইব? আমার হৃদয় নিতান্তই পাষাণময়, কেননা শোক-কর্ষিতা পুত্র-বধূকে রোদন করিতে দেখিয়া আমার হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইয়া যাইবে না।" পাঠক পুত্র-শোক-কাতর অর্জ্জুনের বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিলেন, এইবার মধুসূদনের অবলম্বনীয় রামায়ণের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। বীরবাহুর বৃত্তান্ত মূল রামায়ণে নাই, সুতরাং বীরবাহুর মৃত্যুতে রাক্ষসরাজ কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, মূল রামায়ণ হইতে তাহা অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই। লঙ্কার সর্ব্বধ্বংসী সংগ্রামে রাক্ষস রাজ দুইবার অতি মর্ম্মান্তিক শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রথম কনিষ্ঠ সহোদর বীরবর কুম্ভকর্ণের জন্য এবং দ্বিতীয়বার প্রিয়তম পুত্র ইন্দ্রজিতের জন্য। এই দুই বার, রাক্ষসরাজ কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়াই পাঠক রামায়ণ-বর্ণিত রাক্ষসরাজের চরিত্র অবগত হইতে পারিবেন। কুম্ভকর্ণের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাক্ষসরাজ "শোক-সন্তপ্ত হইয়া মুগ্ধ ও পতিত হইলেন। এবং বহু কষ্টে সংজ্ঞা লাভ করত কুম্ভকর্ণের নিধন বশতঃ বিকলেন্দ্রিয় হইয়া দীনভাবে বিলাপ করত কহিলেন, হা বীর, হা অবাতিদর্পনাশন, হা মহাবল, হা কুম্ভকর্ণ, দৈব বশতঃ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, যম-নিকেতনে গমন করিয়াছ। হা মহাবল * * তুমি আমার এবং বান্ধবগণের শল্য উদ্ধরণ না করিয়া কোথায় গমন করিতেছ? হা বীর, তুমি আমার দক্ষিণ বাহু স্বরূপ ছিলে বলিয়াই আমি সুর এবং অসুরগণকে ভয় করিতাম না, পরন্তু অদ্য আমার সেই ভুজ পতিত হওয়ায় আমিও লুপ্তপ্রায় হইলাম। * * * আমি ভ্রাতৃ-বিহীন হইয়া ক্ষণ মাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারিব না, অতএব যে স্থানে অনুজ কুম্ভকর্ণ গমন করিয়াছেন, আমি অদ্যই সেই স্থানে গমন করিব।" ইন্দ্রজিতের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াও রাক্ষসরাজ কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, পাঠক এই বার তাহা পাঠ করুন্। "রাক্ষস-পুঙ্গব রাজা দশানন পুত্র ইন্দ্রজিতের নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া এক কালে মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর বহু বিলম্বে সংজ্ঞা লাভ করত পুত্র শোকে আকুল ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া দীন ভাবে বিলাপ করত কহিলেন; হা বৎস, হা রাক্ষস সেনাপতে, হা মহাবল, তুমি দেবেন্দ্রকেও পরাজিত করত সম্প্রতি কি প্রকারে লক্ষ্মণের বশীভূত হইলে? * * হায় ইন্দ্রজিত না থাকায় অদ্য এই কানন-সমন্বিতা বসুমতী অথবা ত্রৈলোক্যকেও শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে। যেরূপ করেণুগণ গিরিগহ্বরে ক্রন্দন করে, তদ্রূপ অদ্য অন্তঃপুরে রাক্ষসরমণীগণের রোদন ধ্বনি শ্রবণ করিতে হইবে। হা শত্রুতাপন, তুমি যৌবরাজ্য লঙ্কা, রাক্ষসকুল পিতা, মাতা,

এবং ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করত কোথায় গমন করিয়াছ? হা বীর, কোথায় আমি পরলোকগত হইলে, তুমি আমার প্রেত-কার্য্য করিবে, না তাদৃশীপরীতে আমাকেই তোমার প্রেতকার্য্য করিতে হইল। হা পুত্র, সুগ্রীব, রাম এবং লক্ষ্মণ জীবিত থাকিতে তুমি আমার শল্য উদ্ধার না করিয়াই কোথায় গমন করিলে?" রাক্ষসরাজের শোক কেবল এইরূপ বিলাপ মাত্রে পরিসমাপ্ত হইল না, শোকাবেশে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান শূন্য হইয়া, তিনি কাপুরুষের ন্যায় নিরপরাধা সাধ্বী সীতা দেবীকে ছেদন করিতে গমন করিলেন। বন্ধু বান্ধবগণ অতি কষ্টে তাহাকে সেই পাপ কার্য্য হইতে নিবারণ করিলেন। রামায়ণ-বর্ণিত রাবণের প্রকৃতি কিরূপ, পাঠক এই ঘটনা হইতে বোধ হয় তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বীর ধর্ম্মাবলম্বীগণের প্রকৃতি সম্বন্ধে ভারতীয় মহাকবিদ্বয়ের আদর্শ কি, পাঠক তাহা অবগত হইলেন। পৃথিবীর আর একখানি অমর কাব্যের কবি শোকার্ত্ত বীর-প্রকৃতি কিরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাও দেখুন। দূত আসিয়া মহাবীর আকিলিস্‌কে (Achiles) সংবাদ দিল যে, তাহার প্রিয়তম সুহৃদ্ প্যাট্রোক্লস (Patroclus) যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। শুনিবা মাত্র, যে মহাবীর

> "A sudden horror shot through all the chief,
> And wrapped his senses in the cloud of grief,
> Cast on the ground, with furious hands he spread
> The scorching ashes o'er his graceful head;
> His purple garments, and his golden hairs,
> Those he deforms with dust and these he tears,
> On the hard soil his groaning breast he threw,
> And rolled and grovell'd, as to earth he grew."
>
> *Pope's Iliad, Book XVIII*

একিলিস (Achiles) বীরপ্রসবিনী গ্রীক ভূমিরও আদর্শ পুরুষ স্বরূপ ছিলেন, হোমর তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, পাঠক তাহা দেখিলেন। তমোগুণ প্রধান মনুষ্যবীরের পক্ষে ব্যাস, বাল্মীকি এবং হোমরের কল্পিত এই আদর্শই স্বাভাবিক, ভারতী-সমালোচকের আদর্শ কেবল কল্পনামাত্র। মহাবীর অভিমন্যু একাকী শত্রু-সৈন্য বিমর্দ্দিত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, অর্জ্জুন পুত্রের বীরত্ব সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্ব্বেই রোদন করিতে করিতে বলিলেন,—"মহার্হ শয্যায় শয়ন করিলে যাহাকে বরাঙ্গনাগণ উপসেবন করিত, এক্ষণে সে ক্ষতবিক্ষত শরীরে রণশায়ী হওয়াতে অশিব শিবাগণ তাহার উপসেবন করিতেছে। পূর্ব্বে নিদ্রিত হইলে, সূত, মাগধ ও বন্দীগণ স্তুতি পাঠাদি দ্বারা যাহাকে জাগরিত করিত, এক্ষণে শ্বাপদগণ বিকৃত স্বরে তাহাকে জাগরিত করিতেছে। যাহার মনোহর মুখমণ্ডল ছত্রচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইবার উপযুক্ত, এক্ষণে সেই বদন রণ রেণুতে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই।" স্পার্টান আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে অর্জ্জুনের এই সকল কথা বিলাসপ্রিয়তা এবং কাপুরুষতারই পরিচায়ক। অভিমন্যু যে অবস্থায় রণক্ষেত্রে শয়ন করিয়াছিলেন, বীরের পক্ষে তাহাই ত প্রার্থনীয়। কিন্তু অর্জ্জুনের এই রোদন শ্রবণ করিয়া কি আমরা মনে করিব যে, অর্জ্জুন কাপুরুষ ও বিলাসী,—নারী জনোচিত দুর্ব্বলতা বশতঃ তিনি পুত্রকে সুখ শয্যায় শয়ান দেখিতে উৎসুক ছিলেন? না মনে করিব, ভগবান দ্বৈপায়ন মনুষ্য-চরিত্র পরিজ্ঞানে অক্ষমতা বশতঃই অর্জ্জুনের চরিত্র এরূপ অস্বাভাবিক ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন? ইহার কিছুই মনে করিব

না, কেবল এইমাত্র ভাবিব যে, মনুষ্য চরিত্র মহাসমুদ্রের ন্যায় দুরধিগম্য, তাহা কখনও প্রশান্ত, কখনও বা উদ্বেলিত, কখনও সংযত, কখনও বা উদ্দাম। যে মহাপুরুষ এক সময় পর্ব্বতের ন্যায় অটল ভাবে বিপদের ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করেন, তিনিই আবার অবস্থা বিশেষে ক্ষুদ্র তৃণ গুচ্ছের ন্যায় বিপৎপাতের সঙ্গে ধূল্যবলুণ্ঠিত হন। কাব্য এবং নাটক পরিত্যাগ করিলেও ইতিহাস একথার সাক্ষ্য দান করিবে। যে প্রতাপ সিংহ অর্ব্বুদ পর্ব্বতের অপেক্ষাও অটল-ভাবে বিপদের ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াছিলেন, তিনিই আবার ক্ষুধার্ত্ত পুত্রের হস্ত হইতে বন্য বিড়াল কর্ত্তৃক একখানি পিষ্টক অপহৃত দেখিয়া অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারেন নাই এবং সেই ঘটনাই তাঁহাকে আত্ম বিস্মৃত করিয়া আকবরের নিকট সন্ধি প্রার্থনায় বাধ্য করিয়াছিল। এইরূপ বিচিত্র তাতে মনুষ্য প্রকৃতি গঠিত। বিশেষতঃ প্রকৃতি সন্তান-বাৎসল্য সম্বন্ধে মনুষ্যের হৃদয় এরূপ ভাবে গঠিত করিয়াছেন যে, পুত্রকন্যার বিপদের কথা শুনিলে অতি-বীরহৃদয়ও বিগলিত হয়। সংসারের ঝঞ্ঝা-ঘাত আমি নিজেই বুক পাতিয়া সহ্য করি, কিন্তু আমার প্রাণাধিকগণের পদে যেন একটী কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ না হয়, পিতা মাতার প্রাণ ইহাই প্রার্থনা করে। এ অবস্থায় রাক্ষসরাজকে শোক-বিহ্বল বর্ণন করিয়া মধুসূদন কিঞ্চিন্মাত্র অসঙ্গত কার্য্য করেন নাই। রাবণকে আদর্শ পুরুষরূপে চিত্রিত করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ বা অস্বাভাবিক হয় নাই।

মেঘনাদবধের প্রথম এবং তৃতীয় সর্গই কাব্যগত চরিত্র সমূহের পরিস্ফুটনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল। ভারতী-সমালোচক এই উভয় স্থলেই মধুসূদনের প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। তৃতীয় সর্গ সম্বন্ধে তাঁহার সমালোচনা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি না, পাঠক উপযুক্ত স্থলে তাহা দেখিতে পাইবেন। আমরা ইহার পর মেঘনাদের দ্বিতীয় সর্গের অবলম্বনীয় বিষয় কি, তাহার উল্লেখে প্রবৃত্ত হইব। (ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম। (২৫)

চৈতন্যের প্রতি দামোদরের বাক্যদণ্ড।

পুরুষোত্তমে এক অল্পবয়স্কা পরমা সুন্দরী বিধবা বাস করিতেন। তাঁহার একটী সুকুমার বালক ছিল। বালকের নিরুপম সৌন্দর্য্যে শ্রীচৈতন্য মুগ্ধ হইয়া বালককে খুব ভালবাসিতেন। বালকের অমিয়া মাখা মধুর সৌন্দর্য্যে কা'র না মন গলিয়া যায়? শ্রীচৈতন্যের ন্যায় প্রেমিকের তো কথাই নাই। বালকের রীতি, যেখানে প্রেম পায়, সেইখানে থাকিতে ভালবাসে। চৈতন্যদেবের ভালবাসা পাইয়া সে আর তাঁহার কাছছাড়া হইতে চাহিত না। চৈতন্যপার্ষদের মধ্যে দামোদর পণ্ডিত বড় স্পষ্টবাদী। শ্রীচৈতন্যে তাঁহার প্রীতি প্রগাঢ়। যে কাজ বা কথা প্রভুর গৌরবের অত্যল্প মাত্রও অন্তরায়, তাহাতে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বিধবার পুত্রকে চৈতন্যদেব এত প্রেম করেন, ইহা পণ্ডিতের সহ্য হইল না।

কিন্তু কি বলিয়াই বা নিষেধ করেন, তাহাও ঠিক্‌ করিতে পারিলেন না। একদিন বালকটী শ্রীচৈতন্যের আদর যত্ন লাভ করিয়া চলিয়া গেলে দামোদর আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন—"অন্যকে উপদেশ দিবার বেলায় গোঁসাই ঠাকুর মহাপণ্ডিত, কিন্তু নিজের বেলায় গোঁসাই, কেমন গোঁসাই, তা এবার জানা যাবে।"

শ্রীচৈতন্য শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দামোদর কি বলছো?'

দামোদর উত্তর করিলেন 'তুমি স্বাধীন, নিজ ইচ্ছায় যা আচরণ কর, তাহার উপর কথা কয়, এমন ব্যক্তি কে আছে? কিন্তু পৃথিবীর মুখে তো আর হাত দিতে পারিবে না। তুমি মহা পণ্ডিত, বিচার ক'রে দেখ দেখি, বিধবা যুবতীর বালককে অত্যধিক ভালবাসা দেখাইলে লোকে কি বলিবে? বিধবা যদিও তপস্বিনী মহাসতী, কিন্তু তাঁর দোষ এই যে তিনি পরমা সুন্দরী ও যুবতী। তুমিও পরম সুন্দর যুবা পুরুষ। লোকে কি এ কথা লইয়া কাণাকাণি করিতে ছাড়িবে?

এই বলিয়া দামোদর মৌনভাব অবলম্বন করিলেন। শ্রীচৈতন্য মনে মনে তাঁহার অকৃত্রিম প্রেমের প্রশংসা করিলেন এবং ভাবিলেন, দামোদরের ন্যায় অন্তরঙ্গ বন্ধু অতি বিরল। সেদিন আর কিছু না বলিয়া চৈতন্যদেব সমুদ্র স্নানে চলিয়া গেলেন। অন্য সময়ে দামোদরকে নিভৃতে ডাকিয়া শ্রীচৈতন্য বলিলেন:—"বন্ধো, তুমি আমার যেমন আত্মীয়, এমন আর কেহই নাই। আমার ধর্ম্ম রক্ষার্থে নিরপেক্ষভাবে সেদিন আমাকে যে কথা বলিয়াছিলে, তাহাতে আমি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। নিরপেক্ষ হইয়া শিক্ষা না দিলে কি ধর্ম্ম রক্ষা হয়? আমার মনে ধারণা হইয়াছে যে তুমিই আমার জননীর উপযুক্ত রক্ষক। অতএব নবদ্বীপে যাও, মার নিকটে থাকিও এবং মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া আমারও সুখবর্দ্ধন করিও।" দামোদর সম্মত হইলে শ্রীচৈতন্য শচীদেবীকে যাহা যাহা বলিয়া আশ্বস্ত করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দিলেন এবং অনেক মহাপ্রসাদ আনাইয়া মাতাকে ও অদ্বৈতাদি ভক্তগণকে দিবার জন্য সঙ্গে দিলেন।

দামোদর যথাসময়ে নবদ্বীপে পৌঁছিয়া শচীদেবীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। অল্প সময়ে দামোদরের নিরপেক্ষতার কথা বৈষ্ণব মণ্ডলীতে রাষ্ট্র হইয়া গেল। তাঁহাকে দেখিয়া বৈষ্ণবগণ সঙ্কুচিত হইতেন। কেননা তিনি কাহাকেও মর্য্যাদালঙ্ঘন করিতে দেখিলে বাক্যদণ্ড করিয়া মর্য্যাদা স্থাপন করিতেন।

বৎসরান্তে দামোদর পণ্ডিত নীলাদ্রি প্রত্যাগমন করিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে দেখিয়া সুখী হইলেন এবং মাতা ও বন্ধুগণের কুশল সংবাদ লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ওহে বন্ধু, আমার মায়ের তো বিষ্ণু ভক্তি অক্ষুণ্ণ আছে? ভক্তি পথে তো তিনি অগ্রসর হইতেছেন?"

দামোদর এই প্রশ্নে অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রীচৈতন্যকে শুনাইয়া দিলেন 'কি? এমন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তোমার লজ্জা হয় না? শচী মাতার বিষ্ণুভক্তি নাই? আরে তুমি কোথা হইতে ভক্তি পাইলে? অমন মায়ের গর্ভে জন্মিয়াছিলে, তাই তো তোমার ভক্তি? আহা! মা যে আমার নিরন্তর ভক্তি সুধা-সিন্ধুতে ডুবিয়া রহিয়াছেন, তাও কি জান না?'

শ্রীচৈতন্য মহা লজ্জিত হইয়া দামোদরকে গভীর প্রেমালিঙ্গন করিলেন এবং ত্রুটি স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলেন।

কমলাকান্ত বিশ্বাস।

কমলাকান্ত বিশ্বাস নামে অদ্বৈতাচার্য্যের এক প্রিয় শিষ্য ছিল। এ ব্যক্তির পাগ্‌লাটে রকমের ভাব ছিল বলিয়া লোকে তাহাকে বাউলিয়া বিশ্বাস বলিয়া ডাকিত। অদ্বৈতাচার্য্যের অগোচরে এ ব্যক্তি কোন সময়ে নীলাচলে মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে এক পত্র লিখিয়াছিল। "অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, কিন্তু দৈবযোগে তাঁহার কিছু ঋণ হইয়াছে। তিনশত মুদ্রা হইলে এই ঋণ পরিশোধ হইতে পারে। অতএব মহারাজের নিকটে তিন শত টাকা বাঞ্ছা করিতেছি।" ঘটনাক্রমে এই পত্রী শ্রীচৈতন্যের হাতে পড়িলে, পত্র পাঠ করিয়া শ্রীচৈতন্য মনে মনে বড় দুঃখিত হইলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে হাসিয়া ভক্তগণের সমক্ষে বলিতে লাগিলেন; "অদ্বৈতাচার্য্যকে ঈশ্বর বলিয়া যে উল্লেখ করিয়াছে, তাহাতে আমি তত দোষ দিই না, কারণ আচার্য্য ঐশ্বর্য্যশালী মহাপূজনীয় ঈশ্বর সদৃশ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের ভাণ ও দৈন্য করিয়া যে অর্থ ভিক্ষা করিয়াছে, এ মহা অপরাধের কথা, এজন্য তাহাকে আমি সমুচিত শিক্ষা দিব।" এই বলিয়া চৈতন্যদেব গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন "কদাচ বাউলিয়া বিশ্বাসকে এখানে আসিতে দিবে না।"

কমলাকান্ত দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া মহাদুঃখিত হইলেন; কিন্তু অদ্বৈতাচার্য্য উহাতে সুখী হইলেন। যখন বিশ্বাস অদ্বৈতের নিকটে কাঁদিতে লাগিল, তখন আচার্য্য তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন:—"তোমার ভাগ্যের সীমা নাই, প্রভু যখন তোমাকে দণ্ড করিয়াছেন। এই দণ্ডপ্রসাদ পাইবার জন্য পূর্ব্বে আমি কি না করিয়াছিলাম, অবশেষে জ্ঞানপক্ষে বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিয়া প্রভুর ক্রোধোদ্দীপন করিয়া দণ্ডলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। যে দণ্ড ভাগ্যবান্ মুকুন্দ পাইয়াছিলেন, যে দণ্ড ভাগ্যবতী শচীদেবী লাভ করিয়াছিলেন, সে দণ্ড প্রসাদ কি যে সে লোক পায়? তাই বলি, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই।" এই বলিয়া আচার্য্য বিশ্বাসকে আশ্বস্ত করিয়া শ্রীচৈতন্যের নিকটে আসিলেন এবং সহাস্য জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু। তোমার লীলা বুঝা ভার। আমি কি অপরাধ করিয়াছি, যে আমা অপেক্ষা কমলাকান্ত তোমার প্রসাদপাত্র হইল। আমি যে কতদিন তোমার দণ্ডপ্রসাদ পাই নাই।"

শ্রীচৈতন্য হাসিয়া কমলাকান্ত বিশ্বাসকে ডাকাইলেন এবং ভক্তগণ সমক্ষে তাহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। অভিপ্রায় যে সকলে সে উপদেশানুসারে চরিত্র গঠন করে। শ্রীচৈতন্য বলিলেন "বিশ্বাস। এমন পত্র কেন লিখিতে গিয়াছিলে? ইহাতে যে আচার্য্যের লজ্জা ও ধর্ম্মের হানি হইয়াছে, জাননা কি? রাজার ধন প্রতিগ্রহ করিলে ও বিষয়ীর অন্ন খাইলে ভোগবিলাস লোলুপ হইয়া মন কলুষিত হয়, মন কলুষিত হইলে ভগবৎ স্মরণ হয় না। যে ভগবদ বিমুখ, তাহার জীবন বৃথা। অতএব এমন কর্ম্ম আর কখনও করিও না।"

আচার্য্যের অভিপ্রায় বুঝিয়া চৈতন্যদেব কমলাকান্তকে সেবারকারনত ক্ষমা করিলেন।

যিনি ছোট হরিদাসের সামান্য অপরাধে গুরুতর দণ্ড বিধান করিলেন, তিনি কমলা-

কান্ত বিশ্বাসের যেইরূপ বা ততোধিক গুরুতর অপরাধ উপদেশে সংশোধন করিয়া ক্ষমা করিলেন কেন? এ প্রশ্ন কে মীমাংসা করিবে? কবিরাজ-গোস্বামীও বোধ হয় এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই বলিয়াছেন "কমলাকান্তের প্রস্তাবে অনেক বলিবার কথা থাকিলেও গ্রন্থবাহুল্য ভয়ে বলিলাম না।"

ক্ষেপা চৈতন্যদাস।

গৌরসন্ন্যাসদিনে চাকন্দি গ্রামের গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য যেমন করিয়া ক্ষেপা চৈতন্যদাস নাম পাইয়াছিলেন, পাঠকের তাহা স্মরণ আছে। ইনি যাজিগ্রামের বলরাম পণ্ডিতের কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে পরিণয় করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত লক্ষ্মীপ্রিয়ার কোন সন্তান জন্মায় নাই। চৈতন্যচন্দ্রের সন্ন্যাসের দৃশ্য দেখিয়াবধি চৈতন্যদাস সংসার বিরাগী হইয়া সর্ব্বদা সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিতেন। যেমন স্বামী, তেমনি স্ত্রী। উভয়েই সকল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাসক্ত রূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কে জানে কি জন্য? অল্প দিনের মধ্যে চৈতন্যদাসের মনে হঠাৎ পুত্র কামনার উদয় হইল। তিনি পত্নীর নিকট ঐ কথা প্রকাশ করিলে উভয়ে যুক্তি করিয়া শ্রীচৈতন্যকে দর্শন করিবার অভিপ্রায়ে নীলাচলে যাত্রা করিলেন। চৈতন্যদেব সবান্ধবে জগন্নাথ দর্শন করিয়া একদিন বাসায় আসিতেছেন, এমন সময়ে সপত্নীক চৈতন্যদাস তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন। শ্রীচৈতন্য চিনিতে পারিয়া চৈতন্যদাসকে আলিঙ্গন করিলেন এবং গোবিন্দ দ্বারা তাঁহাদের থাকিবার বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া দর্শনাদি করাইলেন ও আপনি বহু কৃপা করিলেন। একদিন নির্জ্জনে চৈতন্যদাস সস্ত্রীক যাইয়া শ্রীচৈতন্যের পদবন্দনা করিয়া মনের সংকল্প প্রকাশ করিয়া বলিলেন। চৈতন্যদেব হাসিতে হাসিতে তাঁহাদের কামনা পূর্ণ হইবে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনতিকাল পরে চৈতন্যদাস স্ত্রীর সহিত দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কিছুকাল পরে লক্ষ্মীদেবী গর্ভবতী হইয়া যথাসময়ে সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। শ্রীচৈতন্যের শক্তিধর শ্রীনিবাস আচার্য্যের এইরূপে জন্ম হইল।

ভিক্ষাসঙ্কোচ।

রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্র পুরীর জনৈক শিষ্য। শ্রীচৈতন্যের ইষ্টদেব ঈশ্বরপুরীর ন্যায় কিন্তু রামচন্দ্র মাধবেন্দ্রের প্রীতি আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। মাধবেন্দ্রের রোগ শয্যায় ঈশ্বরপুরী সাবহিতে গুরুর পদ সেবা করিতেন, স্বহস্তে মলমূত্রাদি মার্জ্জন করিতেন এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম শ্রবণ করাইতেন। গুরু সন্তুষ্ট হইয়া ঈশ্বরপুরীকে বর দিলেন 'তোমার কৃষ্ণপ্রেম লাভ হউক।' এই গুরু কৃপাই তাঁহার প্রেমভক্তি লাভের কারণ ছিল। মাধবেন্দ্র শেষ অবস্থায় ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতেন, "হে দীন দয়াল, কবে আমি মথুরাধামে যাইব? তোমাকে না দেখিয়া আমার হৃদয় বড় কাতর হইয়াছে, হে প্রিয়, কবে তোমাকে দেখিয়া সুস্থির হইব?"

রামচন্দ্রপুরী এ সময়ে গুরুকে সান্ত্বনা করা দূরে থাকুক, মহা বিজ্ঞের ন্যায় উপদেশ করিলেন। "ব্রহ্মবিৎ হ'য়ে তুমি কাঁদ্‌ছো কেন? পূর্ণব্রহ্মানন্দ স্মরণ কর।"

মাধবেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলেন, "দূর হ মূর্খ, আমি কৃষ্ণ না পেয়ে, মথুরা, না পেয়ে আপন মনোদুঃখে মর্‌ছি, তুই আবার

জ্বালাতে এলি কেন? তোর মুখ দেখিতে চাই না; তুই যেখানে ইচ্ছা চলে যা। আমাকে আর ব্রহ্ম উপদেশ দিতে হবে না।"

কথিত আছে, গুরুর অভিশাপে রামচন্দ্রের হৃদয় শুকাইয়া গেল; উহাতে আর প্রেমভক্তি স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারিল না। রামচন্দ্রের পরনিন্দারূপ আর একটী মহৎ দোষ জন্মিল। তিনি নাকি স্থানে স্থানে সাধু মহাজনদিগের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেন। এই রামচন্দ্রপুরী দেশপর্য্যটন করিতে করিতে নীলাচলে আসিয়া উপনীত হইলেন। এবং স্বীয় গুরু ভাই পরমানন্দপুরী ও ভ্রাতৃ শিষ্য শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলিত হইয়া দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন। পরমানন্দ বড় ভায়ের চরণ বন্দনা, চৈতন্যদেব জ্যেষ্ঠতাতকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, পরস্পব প্রীতি আলাপ হইতে লাগিল। চৈতন্যদেব রামচন্দ্রেব স্বভাব জানিয়াও বহু সমাদব ও ভক্তিব সহিত তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন এবং প্রিয় সুহৃদ্ জগদানন্দ পণ্ডিতেব বাসায় পুরীব আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। জগদানন্দ পাকবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, নানাবিধ উপকরণে পুরীকে পরিতোষ ভোজন করাইলেন। পুরীও আহারান্তে জগদানন্দকে আগ্রহ করিয়া 'এটী খাও, উটী খাও' করিয়া বসিয়া বসিয়া খুব খাওয়াইলেন। কিন্তু জগদানন্দের আচমন শেষ হইলে বলিতে লাগিলেন, "শুনিয়াছিলাম, চৈতন্যগণ অপরিমিত আহার করে, আজ তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। বাপ্‌রে! এত খাওইয়া সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস ধর্ম্মের দফারফা করিয়া দেয় ও নিজেও আকণ্ঠ পুরিয়া কতকগুলা খাইয়া বৈরাগ্য হানি করে। এমন স্থানে কি আসিতে আছে?"

জগদানন্দ এ কথা মহাপ্রভুকে জানালেন। রামচন্দ্র নীলাচলে এইরূপে কিছুদিন কাটাইতে লাগিলেন। নিজে মহাবিরক্ত, যেখানে সেখানে অনিমন্ত্রিত ভিক্ষা করিয়া বেড়ান এবং কোন্ বৈরাগী কত খায়,তাহারও সন্ধান লইয়া থাকেন। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যের স্থিতি, রীতি, ভিক্ষা, শয়ন, আচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন ছিদ্র পাইলেন না। শ্রীচৈতন্যের ভিক্ষার জন্য চারিপোণ কড়ির মহাপ্রসাদ আসিত, তাহাতে গোবিন্দ,কাশীশ্বর ও তিনি, এই তিনজন খাইতেন। রামচন্দ্র তাহাতেও কিছু বলিবার না পাইয়া এক অদ্ভুত নিন্দা তুলিয়া দিলেন যে সন্ন্যাসী হইয়া মিষ্টান্ন ভোজন করা নিষিদ্ধ, তাহাতে জিহ্বাব লাম্পট্য জন্মে এবং ইন্দ্রিয় দমন হয না। শ্রীচৈতন্য মিষ্টান্ন খাইয়া থাকেন। চৈতন্যদেব পরস্পব একথাও শুনিলেন। বামচন্দ্র প্রতিদিন প্রাতে তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। শ্রীচৈতন্য উপেক্ষা করা দূবে থাকুক, গুরু বুদ্ধিতে রামচন্দ্রকে মহাভক্তি করিতেন ও আদর সম্ভ্রম দেখাইতেন।

একদিন প্রাতে পুরী চৈতন্যের বাসায় বসিয়া পিঁড়ার উপরে কতকগুলি পিঁপড়া দেখিতে পাইয়া সংস্কৃত ভাসায় বলিয়া উঠিলেন "রাত্রাবত্র ঐক্ষবমাসীৎ; তেন পিপীলিকাঃ সঞ্চরন্তি। অহো বিরক্তানাং সন্ন্যাসিনামিয়মিন্দ্রিয়লালসা।"* এবং কাহাকেও আর কিছু না বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

এই নিন্দাবাক্যে চৈতন্যদেব বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, মনে মনে একবার আত্ম-

* রাত্রিতে এখানে মিষ্টান্ন আসিয়াছিল, তাহাতে এত পিঁপাড়া বেড়াইতেছে। হায়, বিরক্ত সন্ন্যাসীর একি ইন্দ্রিয় লালসা।

লোচনা করিয়া গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, 'আজ হইতে আমার পিণ্ডাভোগের এক চৌঠী ভাত ও পাঁচ গোণ্ডার ব্যঞ্জন আনিবে, অধিক আনিলে আর আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না। আর তুমি ও কাশীশ্বর ভিক্ষা করিয়া উদর পূর্ণ করিবে।' গোবিন্দ তাহাই করিলেন এবং এই কথা ভক্তমণ্ডলী মধ্যে রাষ্ট্র করিয়া দিলেন। শুনিয়া ভক্তগণের মাথায় যেন বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকলেই একবাক্যে রামচন্দ্র পুরীকে অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন। একচৌঠী ভাত ও পাঁচ গোণ্ডার ব্যঞ্জন যাহা আসিতে লাগিল, শ্রীচৈতন্য তাহার অর্দ্ধেক খাইয়া অবশিষ্ট গোবিন্দের জন্য রাখিয়া দিতেন। গোবিন্দ সেই অবশেষ খাইয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন ও কাশীশ্বর ভিক্ষা করিয়া খাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্দ্ধাশনে শ্রীচৈতন্য দিন দিন শুকাইয়া যাইতে লাগিলেন, তাঁহার মুখশ্রী মলিন হইয়া পড়িল। তাহাতে গৌরগতপ্রাণ ভক্তগণের প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহারা প্রভুর অর্দ্ধাশনে অর্দ্ধাশন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রপুরী এসব কথা শুনিতে পাইয়া একদিন শ্রীচৈতন্যের নিকট আসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিলেন "অতিশয় পান ভোজনে ইন্দ্রিয় তর্পণ করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নয়, সে জন্য সেদিন আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম। দেখিতেছি, তুমি দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে; শুনিলাম নাকি অর্দ্ধ ভোজন করিয়া থাক। সেও কিন্তু বৈরাগ্যের বিরোধী। এরূপ শুষ্ক বৈরাগ্যও পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।' এই বলিয়া রামচন্দ্রপুরী ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৬।১৭ শ্লোক উদ্ধার করিয়া বলিলেন, অতি ভোজনশীল, একান্ত অনশনশীল, অতিনিদ্রালু এবং নিতান্ত জাগরণশীল ব্যক্তির যোগ হইতে পারে না। কিন্তু যাঁহার আহার, বিহার (গতি), কর্ম্মচেষ্টা, নিদ্রা ও জাগরণ, নিয়মিত, তিনিই যোগসাধনে সমর্থ। তুমি বিষয় ভোগ না করিয়া এইরূপ যুক্তাহার অবলম্বন কর, এই আমার ইচ্ছা।" শ্রীচৈতন্য বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, "আমি আপনার অজ্ঞবালক শিষ্য, আমাকে যে আপনি শিক্ষা দিলেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য।"

রামচন্দ্রপুরী উঠিয়া গেলে ভক্তগণ পরমানন্দপুরীকে মুখপাত্র করিয়া চৈতন্য সমীপে বলিতে লাগিলেন:—"রামচন্দ্রপুরী নিন্দুক স্বভাবের লোক, তাঁর কথায় অন্ন ছাড়া কি কর্ত্তব্য? উনি মানুষকে যত্ন করিয়া খাওইয়া ও নিজেও যথেষ্ট খাইয়া পরে নিন্দা করিয়া থাকেন। অপরের আহার, ব্যবহার, অশন, বসন, সম্বন্ধে ছিদ্রানুসন্ধান করাই উঁহার কাজ। শাস্ত্রে পর নিন্দার যে এত নিষেধ আছে, তাহাই উঁহার অবলম্বন। অতএব তাঁর কথায় অন্ন ছাড়িও না। আমাদের কথা রাখ, উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিয়া আমাদের প্রাণ বাঁচাও।"

শ্রীচৈতন্য উত্তর করিলেন "পুরীর নিন্দা কেন করিতেছেন? উনি'তো সহজ ধর্ম্মই শিক্ষা দিয়াছেন। বাস্তবিক জিহ্বার লাম্পট্যে যতিধর্ম্ম কি বজায় রাখা যায়?"

ভক্তগণের অনেক অনুনয়ে শ্রীচৈতন্য চারি পণের অর্দ্ধেক দুই পণ কড়ির প্রসাদ আনাইতে সম্মত হইলেন। উহাতে কখন দুইজন, কখন তিনজনের ভোজন হইতে লাগিল। আর জগদানন্দ, ভগবান্ আচার্য্য ও

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, যাঁহাদের গৃহে নিমন্ত্রণ ভোজন করিতেন, তাঁহারা যেমন দিতেন, তেমনি খাইতেন।

কতকদিন পরে রামচন্দ্রপুরী চলিয়া গেলে ভক্তগণের মাথা হইতে যেন পাথর নামিল। তখন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যকে যথেচ্ছ নিমন্ত্রণ করিয়া পান ভোজন করাইতে লাগিলেন ও নৃত্য কীর্ত্তন হইতে লাগিল।

প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কৃষ্ণকথা শ্রবণ।

নৃসিংহোপাসক প্রদ্যুম্ন মিশ্রের কথা পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে। ইনি কৃষ্ণচৈতন্যের একজন গৃহস্থ অনুচর। চৈতন্যদেব আদর করিয়া ইঁহাকে নৃসিংহানন্দ বলিয়া ডাকিতেন। যখন শ্রীচৈতন্য বঙ্গদেশ হইয়া বৃন্দাবনে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিয়াছিলেন, ইনি শ্রীচৈতন্যের দুর্গম পথ ভ্রমণে ক্লেশ না হয়, এই উদ্দেশ্যে মনে মনে কানায়ের নাটশাল পর্য্যন্ত পথ বাঁধাইয়া, দুই পাশে বৃক্ষ রোপণ ও জলাশয় খনন করিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ইনি একদিন চৈতন্যের নিকট যাইয়া কৃষ্ণকথা শুনিবার আগ্রহ জানাইলেন। শ্রীচৈতন্য সন্তুষ্ট হইয়া উত্তর করিলেন 'তুমি বড ভাগ্যবান্ যে কৃষ্ণকথায় তোমার রুচি জন্মিয়াছে। কিন্তু আমি তো কৃষ্ণকথা জানি না, তুমি রামানন্দ রায়ের নিকট যাও, তিনি কৃষ্ণকথা বলিয়া তোমাকে সুখী করিবেন। পূর্ব্বে আমাকে কৃপা করিয়া তিনি অনেক তত্ত্ব বলিয়াছিলেন।'

মিশ্র রামানন্দ ভবনে আসিলেন। ভৃত্য তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিল। মিশ্র কহিলেন, 'রায় কি করিতেছেন ?' ভৃত্য উত্তর করিল, "মহারাজ সম্প্রতি যে নাটক রচনা করিয়াছেন, পরমা সুন্দরী ও নৃত্য গীতে নিপুণা যুবতী দেবদাসীদ্বয়কে তাহার অভিনয় শিক্ষা দিতেছেন। আপনি বসুন, তিনি এখনই আসিবেন।"

যে বাড়ীতে রামানন্দ রায় তৎকালে বাস করিতেছিলেন, তাহা একটী সুশোভন উদ্যান-বাটিকা। আবার মিশ্র যে স্থানে বসিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেখান হইতে রায় যেস্থানে রমণীদ্বয়কে শিক্ষা দিতেছিলেন তাহা দেখা যায়। মিশ্র দেখিতে লাগিলেন, রামরায় প্রথমতঃ স্বহস্তে দেবদাসী দুইটীর অভ্যঙ্গাদি মর্দ্দন, গাত্রমার্জ্জন ও স্নান করাইয়া পরে গন্ধবিলেপন, মাল্য এবং সুশোভন বস্ত্র অলঙ্কার পরাইলেন, পরে স্বরচিত গীতগুলি অভ্যাস করাইয়া তাহার প্রকৃত অভিনয় শিখাইতে লাগিলেন। যেখানে যেখানে যেমন করিয়া নাচিতে হইবে, সাত্ত্বিকী, সঞ্চারী বা স্থায়ীভাবের অভিনয় দেখাইতে হইবে, নিজে নাচিয়া, গাইয়া, নানা ভাবাভিনয় করিয়া ও হাতে ধরিয়া তালে তালে নাচাইয়া যুবতীদ্বয়কে দেখাইয়া দিলেন। অবশেষে তাহাদের নানাপ্রকার সুখাদ্য খাওয়াইয়া নিভৃতে গৃহে পাঠাইয়া দিয়া বাহিরে আসিলেন এবং প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে অত বেলা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অতি বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া বলিলেন 'আপনি যে আসিয়া বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাহা আমাকে কেহ বলে নাই, আপনার চরণে আমার বড় অপরাধ হইয়াছে, আজ্ঞা করুন্ কি উদ্দেশ্যে পদধূলি দিয়া আমার গৃহ পবিত্র করিলেন।' মিশ্র থতমত খাইয়া উত্তর করিলেন 'আপনার দর্শনে পবিত্র হইব বলিয়া, আসিয়াছিলাম ; তা বেলা অধিক

হইয়াছে, অনুমতি করুন্, এখন বিদায় হই।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সায়ংকালে গৌরাঙ্গ সভায় আসিলে শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে মিশ্র, রামরায়েব কাছে কেমন কৃষ্ণকথা শুনিলেন?"

মিশ্র একটু দুঃখিতভাবে উত্তর করিলেন "আজ্ঞে সে সৌভাগ্য ঘটনা হয় নাই।" শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসিলেন, কেন? মিশ্র আনুপূর্ব্বিক ঘটনা বিবৃত করিলে, চৈতন্যদেব বলিলেন "ইহাতে কি তোমার বামানন্দেব প্রতি অশ্রদ্ধা হইয়াছে? যদি হইয়া থাকে তবে তুমি মহা অপবাধী। রামরায়ের ন্যায় নির্ব্বিকার ভক্ত আব কে আছে? তরুণী স্পর্শে কে স্থির থাকিতে পারে? আমাকে তো তোমরা সন্ন্যাসী দেখিতেছ? স্পর্শ দূরে থাকুক্, যুবতী দর্শনেও আমাব মনে বিকার সমুপস্থিত হয়। কিন্তু রামবায় অতি আশ্চর্য্য লোক। তাঁহাব দেহ মন যেন কাষ্ট পাষাণে নির্ম্মিত। দেবদাসীর তো কথাই নাই, দিব্যঙ্গনা অপ্সরীরাও তাঁহার মন টলাইতে পারে,এমন সাধ্য নাই। তুমি যে যুবতীদের সেবা করিতে দেখিয়াছ, তাহার নিগূঢ় কথা শুনিবে? রামানন্দ আপনাকে সেবক ও তাহাদের সেব্য ভাবিয়া কৃষ্ণসেবাব ন্যায় সেবা করিয়া থাকেন। এই যে অত্যুচ্চ অধিকার, তাহা কেবল তাঁহারই আছে। তাইতে বলি,তাঁহার দেহ মন অপ্রাকৃত। শ্রীমদ্ভাগবতে শুনিয়াছ, ভগবান্ অচ্যুতের ব্রজবধূগণ সহক্রীড়া যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শ্রবণ করেন, তিনি অচিরে হৃদয়ের রোগ রূপ কামকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। আমার মনে হয়, রামানন্দই যথার্থ এ কথার উদাহবণ স্থল। তোমরা জান না, রায়ের ভজনরাগানুগা মার্গে; তাঁহার দেহ ও মন সিদ্ধি লাভ করিয়াছে।"

শ্রীচৈতন্য ভক্তগুণ ব্যাখ্যা করিয়া ক্ষণ কাল নীরব হইলে সভাসদ্ ভক্ত বৃন্দ আশ্চর্য্য হইলেন এবং প্রদ্যুম্ন মিশ্র স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিয়া তাহা মোচনের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে চৈতন্যদেব উত্তর করিলেন "তুমি শীঘ্র রামরায়ের নিকট পুনরায় যাও, নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং আমার নাম করিয়া বলিও যে আমি তোমাকে তাঁহার নিকট কৃষ্ণকথা শুনিতে পাঠাইয়াছি।"

পর দিন প্রাতে প্রদ্যুম্ন মিশ্র রামানন্দের বাটীতে যাইয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে রামরায় হাসিয়া উত্তর করিলেন, "শ্রীচৈতন্যেব চতুরালি আপনি কি বুঝিতে পারেন নাই, আমি কৃষ্ণকথার কি জানি, তিনি হৃদয়ে বসিয়া যে প্রেরণা দেন, তাহাই বলিয়া থাকি মাত্র। যাহাহউক, আজ্ঞা করুন্, এখন্ কি কথা বলিব।"

মিশ্র উত্তর করিলেন "পূর্ব্বে বিদ্যানগরে মহাপ্রভুব নিকট যে সব কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলুন। আমি মূর্খ, প্রশ্ন করিতে জানি না। আপনিই প্রশ্ন উঠাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়া শুনান্। তখন রামানন্দরায় ইষ্টদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, ভাব, মহাভাব, প্রেমতত্ত্ব ও নিবর্ত্তবিলাস প্রভৃতি নানা কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতে বলিতে তিনি ভাবাবেশে উন্মত্তপ্রায় হইলেন, বাহ্যস্মৃতি লোপ হইল। তাঁহার স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া প্রদ্যুম্ন মিশ্র অবাক্ হইয়া গেলেন ও স্বীয় অপরাধের জন্য কতই অনুতাপ করিতে লাগিলেন। বেলা তৃতীয় প্রহর হইল, তথাচ বক্তা ও

শ্রোতা আত্মহারা হইয়া কৃষ্ণ-কথা-সুধা-সাগরে ডুবিয়া আছেন। ভৃত্য আসিয়া উত্তরকে না জানাইলে হয় তো সেরাত্রিও কাটিয়া যাইত। যাহা হউক, দিন শেষে প্রদ্যুম্ন মিশ্র বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন, এবং সন্ধ্যার পর গৌরাঙ্গ সভায় যাইয়া সকল কথা জানাইলেন।

গৌর বলিলেন, "তবে কৃষ্ণ কথা শুনিয়া খুব সুখী হইয়াছ, কেমন ?" মিশ্র উত্তর করিলেন, আমি কৃতার্থ হইয়াছি। তোমার কৃপায় কৃষ্ণকথামৃত সাগরে ডুবিয়া গিয়াছিলাম। রামানন্দ রায় মানুষ নহেন, মনুষ্য দেহে সাক্ষাৎ কৃষ্ণভক্তিবসময়। রায় আব এক কথা আমাকে বলিয়াছেন যে, তুমি না বলাইলে তিনি বলিতে পারেন না, এ কি সত্য কথা ?'

গৌব হাসিযা উত্তর করিলেন, 'বামানন্দের বিনয় তুমি বুঝিতে পাব নাই। তিনি নাকি অতি বিনীত ব্যক্তি, তাই নিজেব কথা পরের মাথায় চাপাইয়াছেন। মহানুভব ব্যক্তিগণ নিজের গুণ কখনই স্বীকার করেন না।' মিশ্র বলিলেন, যাহা হউক, আমি কৃতার্থ হইলাম। তুমিই আমাকে এ হেন অমৃত পান করাইলে। আমি চিব দিনেব জন্য তোমার চরণে আত্ম বিক্রয় কবিলাম।'

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলিয়াছেন, এই রূপ ঘটনায় শ্রীচৈতন্যের নিগূঢ় মনের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তৎকালে সন্ন্যাসী ও পণ্ডিতগণ অতিশয় গর্ব্বিত ছিলেন। প্রাণান্তেও তাঁহারা নীচ ও শূদ্রজাতির নিকটে ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গের কথা প্রকাশ করিতেন না। তাঁহারা এই মত ভাব প্রকাশ করিতেন, যেন নীচ ও শূদ্র জাতীয়গণ অশেষ গুণান্বিত হইলেও ধর্ম্মের মধুর বসের অধিকারী নয়। এ সকল যে কেবল ধর্ম্মের ব্যবসায় চালাইবার নিমিত্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। চৈতন্যদেব তাহাদের এই গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য নীচ শূদ্র বংশোদ্ভব রামানন্দরায়কে ভক্তি তত্ত্বের আচার্য্য পদে বরণ করিয়া নিজে তাঁহার নিকট শিক্ষা করিলেন ও সুব্রাহ্মণ প্রদ্যুম্ন মিশ্রকে শুনিতে উপদেশ দিলেন, যবনকুলোদ্ভব হরিদাস দ্বাবা হরিনাম মাহাত্ম্য প্রচাব কবিলেন, এবং যবনভাবাপন্ন রূপ ও সনাতনের দ্বারা ব্রজপ্রেমলীলা ও ভক্তিসিদ্ধান্ত লেখাইয়া ব্যাখ্যা কবাইলেন। এ সব বৃত্তান্ত গৌর-চবিত্রের সামান্য গৌরবের বিষয় নহে।

শ্রীসনাতন সঙ্গোৎসব।

শ্রীরূপ গোস্বামী নীলাচল হইতে গৌড়-দেশে নিজবাসগ্রামে গমন করিলেন। সেখানে সঞ্চিত অর্থ কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ ও দেবালয়ে বিভাগ কবিয়া দিতে, গৌড়নগরে ভ্রাতৃদ্বয়ের যে বিষয় বৈভব ছিল, তাহা আনাইয়া বণ্টন কবিতে ও অন্যান্য বিষয় কর্ম্মের সুবন্দোবস্ত করিতে তাঁহার একবৎসর কাটিয়া গেল। এদিকে সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুর দর্শনাশয়ে মথুবা হইতে ঝারিখণ্ড পথ দিয়া নীলাচলে আসিলেন। ঝাবিখণ্ডের দূষিত জলে সনাতনেব অঙ্গে চর্ম্ম বোগ জন্মিল এবং ক্ষত হইয়া তাহা দিয়া অনবরত রসরক্ত পুঁজ পড়িতে লাগিল। দুর্গন্ধে মানুষ তাঁহার কাছে যাইতে পারে না। সনাতন শারীরিক যন্ত্রণায় অস্থিরমতি হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, মহাপ্রভুর চরণবন্দনা করিয়া ও চন্দ্রমুখ দেখিয়া এবং জগন্নাথের চাকায় দেহপাত করিয়া জীবনান্ত করিব। নীলাচলে আসিয়া অনুসন্ধানে তিনি হরিদাসের বাঁসায় উপনীত হইলেন এবং হরিদাসকে আত্ম পরিচয় দিয়া শ্রীচৈতন্যের আগমন প্রতীক্ষায় থাকিলেন।

ক্ষণকাল পরে চৈতন্যদেব উপল ভোগ দেখিয়া সপার্ষদে হরিদাসের বাসায় আসিলে হরিদাস ও সনাতন সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। চৈতন্যদেব সনাতনকে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন। সনাতন দূরে পলাইয়া গিয়া বলিলেন, আমাকে ছুঁইওনা, তোমার চরণে মিনতি করি। একে নীচ জাতি, তাহাতে আবার সর্ব্বাঙ্গে দুর্গন্ধময় রস পড়িতেছে। শ্রীচৈতন্য সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার অঙ্গে সনাতনের পুঁজরক্ত রস প্রচুর পরিমাণে লাগিল। সনাতন লজ্জিত হইয়া পিঁড়ার নীচে বসিলেন। গৌর উপস্থিত ভক্তগণের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করিয়া দিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। সনাতন উত্তর দিলেন, যখন শ্রীচরণ দেখিলাম, তখন সকলই মঙ্গল। গৌর মথুরাবাসী বৈষ্ণবদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "রূপ, এখানে দশমাস ছিলেন, আজ দশদিন মাত্র তিনি চলিয়া গিয়াছেন। অনুপমের গঙ্গা প্রাপ্তির সংবাদ কি শুনিয়াছ? তাঁহার রামচন্দ্রে সুদৃঢ় ভক্তি ছিল।"

সনাতন ভ্রাতৃবিয়োগের সংবাদে শোকার্ত্ত হইলেন এবং কনিষ্ঠের গুণ স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বল্লভ শিশুকাল হইতে রামোপাসক ছিলেন, নিরবধি রামনাম শ্রবণে কীর্ত্তনে ও রামচন্দ্র ধ্যানে সময় অতিবাহিত করিতেন। আমি ও রূপ কোন সময়ে তাঁহার মন পরীক্ষা জন্য শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে লওইয়া ছিলাম। আমাদের খাতিরে তিনি কৃষ্ণমন্ত্র লইয়াছিলেন। কিন্তু রঘুনাথের চরণ আমি কেমন করিয়া ছাড়িব? বলিয়া সমস্ত রজনী কাঁদিয়া প্রাতঃকালে আমাকে কহিলেন যে, "আপনাদের খাতিরে আমি কৃষ্ণভজন লইয়াছি বটে, কিন্তু রামচন্দ্রের চরণে যে আমার মাথা বিক্রীত হইয়া রহিয়াছে, তাহা কেমন করিয়া টানিয়া আনিব। রামচন্দ্রকে ছাড়িব মনে হইলেও যে প্রাণ ফাটিয়া যায়।" তখন আমরা তাঁহার ভক্তির প্রশংসা করিয়া স্বীয় সাধন পথে অবিচলিত থাকিতে উপদেশ দিলাম।"

গৌর বলিলেন, "আমিও মুরারিগুপ্তকে পূর্ব্বে এমনি করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলাম। সেইভক্তই ধন্য যে আপনার প্রভুকে না ছাড়ে, আর সেই প্রভুই প্রভু, যিনি স্বভক্ত অন্যস্থানে যাইলেও ফিরাইয়া আনিয়া চরণে স্থান দেন।"

তৎপরে শ্রীচৈতন্য সনাতনকে হরিদাসের সহিত কৃষ্ণনামাস্বাদনে ও কৃষ্ণভক্তি রসপান করিতে উপদেশ দিয়া উঠিয়া গেলেন এবং গোবিন্দ দ্বারা উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আর প্রত্যহ আসিয়া উভয়ের সঙ্গে কৃষ্ণকথালাপে অনেক সময় যাপন করিতে লাগিলেন। একদিন গৌরচন্দ্র আসিয়া হঠাৎ সনাতনকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "শুন সনাতন। দেহত্যাগে কখন কৃষ্ণধন লাভ হয় না। যদি হইত, তবে মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি কোটিবার দেহ ছাড়িতে পারিতাম। শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় একমাত্র ভক্তি। ভক্তিতে প্রেম জন্মে, তবে শ্রীকৃষ্ণ কি পদার্থ, জানা যায়। দেহত্যাগাদি তামসিক ধর্ম্ম। তামসিক ও রাজসিক ধর্ম্মে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন অসম্ভব। সত্য বটে গাঢ় অনুরাগী ভক্তের বিয়োগ ঘটিলে মরিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আমি বলি সেও তামসিক

ধর্ম্ম। অতএব কুবুদ্ধি ছাড়িয়া শ্রবণকীর্ত্তনে মনোনিবেশ কর, অচিরাৎ প্রেমধনলাভ হবে। নীচজাতি হইলেই যে শ্রীকৃষ্ণভজনে অযোগ্য ও সংকুল বিপ্র হইলেই যে যোগ্য, কদাচ তাহা মনে স্থান দিও না। সকল জাতি ছোট বড় তাঁহার ভজনে সমান অধিকারী। আর যে ভজে, সেই বড়, যে তাঁহাতে বিমুখ, সে উচ্চ ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব হইলেও অতি-নীচ। শুন নাই কি যে অকিঞ্চন দীন, তাহা-কেই তাঁহার বড় দয়া।

স্বীয় নিগূঢ় মানসিক সংকল্প কেমন করিয়া প্রভু জানিতে পারিলেন, মনে করিয়া সনাতন গোঁসাই অতীব বিস্মিত হইলেন এবং গৌবের চরণে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "বুঝিলাম, তুমি সর্ব্বজ্ঞ,নৈলে আমাব মনের কথা জানিলে কেমন কবিয়া? আব তুমি পবম কৃপালু, নৈলে আমার ন্যায় নির্ঘৃণ অন্ত্যজ পাপীর জীবন রক্ষার জন্য এত আগ্রহ করিতেছ কেন? তা বুঝিলাম, আমি কেবল কাষ্ঠ পুত্তলিকা, তুমি যেমন নাচাইবে, আমাকে তেমনি নাচিতে হইবে। তবে এক কথা জিজ্ঞাসা কবি, আমাকে বাঁচাইলে তোমার লাভ কি?

শ্রীচৈতন্য ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'মনে নাই, তুমি যে আমাকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছ, তোমার দেহ যে এখন আমাব সম্পত্তি। নিজ সম্পত্তি রক্ষার যত্ন কে না করে? আর তোমারই বা এ কোন্ ধর্ম্ম যে তুমি পরের দ্রব্য নষ্ট করিতে চাও? তোমার শরীরে আমি কি করিব? শুন, কি করিব? তোমার দেহ দ্বারা আমাকে বহু প্রয়োজন সাধিতে হইবে। ভক্তিতত্ব, ভক্ততত্ব, কৃষ্ণতত্ব, প্রেমতত্ব, বৈষ্ণবাচার, বৈষ্ণবকৃত্য, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার,বৈবাগ্য শিক্ষা, এতগুলি বিষয় তোমাব দেহ দ্বারা আমাকে প্রচার করিতে হইবে। মথুরা বৃন্দাবনে বসিয়া এ সব প্রচার না করিলে হইবে না। কিন্তু আমি মাতৃ আজ্ঞায় নীলাচলে বাস করি-তেছি, নিজে সেখানে থাকিয়া এ সব করিতে অক্ষম। তুমি না কবিলে এ সব কাজ কে করিবে? যে শরীরে আমি এত-গুলি কর্ম্ম সাধন করিব, সে শবীব তুমি ছাড়িতে চাও, একি সহ্য হয়?

সনাতন বলিলেন "তোমাব চবণে কোটি প্রণাম। কে তোমাব মনোভাব বুঝিতে পাবে? যাহাকে যেমন করিয়া নাচাও, সে তেমনি নাচে।"

হরিদাসের দিকে তাকাইয়া গৌব বলি-লেন,—"শুন হরিদাস। ইনি পরের স্থাপ্য ধন বিনাশ করিতে চাহেন, নিষেধ কবিও, যেন সেরূপ অন্যায় কাজ না করেন?"

হরিদাস সবলভাবে উত্তর করিলেন, "তুমি কাহার দ্বারা কোন্ কাজ কবাইবে, তুমি না জানাইলে কে জানিতে পারে? ইহাকে যে তুমি এতদূর অঙ্গীকাব করিয়াছ, একি ইহাব কম সৌভাগ্য?"

ইহার পব শ্রীচৈতন্য মধ্যাহ্ন করিতে চলিয়া গেলে, হরিদাস সনাতনকে বলিলেন, "তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই। কেন না তোমাব শরীরকে প্রভু নিজ সম্পত্তি বলিয়া-ছেন ও ঐ শবীর দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিবেন। হায়! আমার এ দেহ বৃথা ধরিয়া-ছিলাম, ভাবতভূমিতে ইহা কোন কাজেই লাগিল না।" সনাতন বলিলেন, "আপ-নাব তুল্য ভাগ্যবান্ ব্যক্তি আর কি দ্বিতীয় আছে? এ বিধানে হরিনাম প্রচারই সার ধর্ম্ম। চৈতন্য প্রভু সেই কার্য্য আপনাব দ্বাবা করিয়া লইতেছেন। আপনি প্রত্যহ

তিনলক্ষ হরিনাম কীর্ত্তন করেন ও সকলের সমক্ষে নাম মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া থাকেন। আপনার দ্বারা আচার ও প্রচার দুই কার্য্য হইতেছে। কেহ বা কোন ধর্ম্ম আচরণ করেন ও কেহ বা প্রচার করিয়া থাকেন। একাধারে আচার প্রচার অতি কম লোকেই করিয়া থাকে। আপনি তাহাই করিতেছেন।”

বৈশাখমাসে সনাতন নীলাদ্রিতে আসিয়াছিলেন। জ্যৈষ্ঠমাসে তাঁহার একটী পরীক্ষা হইয়াছিল। জ্যৈষ্ঠমাসে শ্রীচৈতন্য গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর আশ্রম যমেশ্বর টোটা নামক অদূরবর্ত্তী সমুদ্রতীরস্থ স্থানে যাইয়া একদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতের অনুরোধে তথায় ভোজন করিয়াছিলেন। পুরী হইতে যমেশ্বর টোটায় যাইবার দুইটী পথ। একটী শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বার দিয়া, অপরটী সমুদ্রতীরের বালুকাময় ভূমির উপর দিয়া। প্রথম পথটী খুব সোজা এবং বৃক্ষচ্ছায়ায় সুশীতল। দ্বিতীয়টী বাঁকা ও উত্তপ্ত বালুকারাশির উপরে ছায়াহীন স্থান দিয়া। শ্রীচৈতন্য মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় সনাতনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রভু ডাকিয়াছেন, শুনিবা মাত্র সনাতন গোস্বামী সমুদ্রতীরের বাঁকা পথে তপ্ত বালুকারাশির উপর দিয়া চলিলেন। একে জ্যৈষ্ঠমাসের প্রখর রবিকিরণে সনাতনের শরীর দগ্ধ হইতে লাগিল, তাহাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় তপ্ত বালুকাকণায় তাঁহার পায়ে ফোস্কা পড়িল, তথাচ তাহা তিনি গ্রাহ্য করিলেন না, প্রভু ডাকিয়াছেন, এই আনন্দে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিলেন। যখন তিনি আশ্রমে উপনীত হইলেন, তখন শ্রীচৈতন্য ভোজনান্তে বিশ্রাম করিতেছিলেন। গোবিন্দ-প্রদত্ত ভুক্ত শেষ প্রসাদান্ন খাইয়া সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। গৌর জিজ্ঞাসা করিলেন “কোন্ পথে আসিলে?”

সনাতন উত্তর করিলেন “সমুদ্রতীরের পথে।”

শ্রীচৈতন্য। উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্য দিয়া কেমন করে এলে? সিংহদ্বারের শীতল পথে এলে না কেন? আহা! তপ্ত বালুকাতে তোমার পায়ে যে ব্রণ হয়েছে।

সনাতন। বড় বেশি দুঃখ হয় নাই। পায়ে ফোস্কা পড়িয়াছে, বুঝিতে পারি নাই। সিংহদ্বারের পথে আমি কেমন করিয়া আসিব? আমি যে নীচজাতি, বিশেষতঃ গা দিয়া রস ও রক্ত পড়িতেছে। আমার তো সেখানে যাইবার অধিকার নাই। ঠাকুরের সেবকগণ সেখানে সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেছেন, কি জানি, কাহাকেও স্পর্শ হইলে আমার যে সর্ব্বনাশ হইত।

শ্রীচৈতন্য এই উত্তরে খুব সন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন “যদিও তুমি পরম পবিত্র, তোমার স্পর্শে দেবতা ও মুনিগণও পবিত্র হন্, কিন্তু মর্য্যাদা রক্ষা করা সাধুর স্বভাব। মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিলে লোকে উপহাস করে ও ইহপরলোকে প্রত্যবায় হইয়া থাকে। তোমার ন্যায় ব্যক্তি মর্য্যাদা না রাখিলে আর কে রাখিবে? আমি ইহাতে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি।” এই বলিয়া নিষেধ স্বত্বেও চৈতন্যদেব বার বার সনাতনকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। সনাতনের অঙ্গ-নিঃসৃত ক্লেদে তাঁহার শরীর পূর্ণ হইয়া গেল।

একদিন জগদানন্দ পণ্ডিত সনাতনের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণকথালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে সনাতন আপনার মনোদুঃখ পণ্ডিতের নিকট প্রকাশ

করিয়া বলিলেন, "এখানে আসিয়াছিলাম প্রভুর চরণ দর্শন করিয়া আপন মনোবাঞ্ছা সাধিব বলিয়া; প্রভু তাহা করিতে দিলেন না। আমার গায়ের ক্লেদরস নিত্যই গৌর অঙ্গে লাগিতেছে; নিষেধ করিলেও তিনি শুনেন না, বল প্রকাশে আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। ইহাতে যে আমাব অপরাধ হইতেছে, তাহা হইতে কেমন করিয়া নিস্তার পাইব? বিশেষতঃ জগন্নাথদর্শনে আসিলাম, তাহাও হইল না। আমি নীচ জাতি, শ্রীমন্দিবে যাইতে আমার অধিকার নাই। নিজের হিতেব জন্য এখানে আসিলাম, এখন দেখিতেছি, সব বিপরীত হইল। কি করিলে ভাল হয় কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

জগদানন্দ তাঁহাকে উপদেশ দিলেন, 'তুমি বথযাত্রায় জগন্নাথ দর্শন করিয়া বৃন্দাবনে যাও। সেই তোমার যোগ্য স্থান, কেন না প্রভু তোমাকে সেখানে থাকিয়া ভক্তি প্রচার কবিতে আজ্ঞা কবিযাছেন।'

সনাতন বলিলেন, 'বেশ বলিয়াছ, আমি তাহাই করিব।' জগদানন্দ উঠিয়া গেলে ক্ষণকাল পবে গৌব আসিয়া দর্শন দিলেন। হবিদাস প্রণাম বন্দনা কবিলেন, সনাতন দূরে থাকিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কবিলে শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে আলিঙ্গন কবিবার জন্য ধাবিত হইলেন। সনাতন পলাইতে লাগিলেন, গৌর বলে ধরিয়া তাঁহাকে কোল দিলে সনাতন নির্ব্বিন্ন হৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,'হিতের জন্য এসে দেখ্‌ছি, বিপরীত হইল, কোথায় তোমার সেবা করিব, না নিত্য নিত্য অপরাধ সঞ্চয় কবিতেছি। একে আমি নীচজাতি, তুচ্ছ পাপাশয়; কোন মতেই তোমার স্পর্শযোগ্য নই, তাতে আমার শরীর দিয়া দুর্গন্ধ রস ও পুঁজ পড়িতেছে। তুমি বল করিয়া আলিঙ্গন কব, সে সব তোমার অঙ্গে লাগে, আমাব যে তাহাতে কত অকল্যাণ হইতেছে, তাহার সীমা নাই। সে জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছি,রথ দেখিয়া বৃন্দাবনে যাইব। তুমি প্রসন্ন চিত্তে অনুমতি কর। জগদানন্দ পণ্ডিতকে আমি এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনিও আমাকে এই উপদেশ দিয়াছেন।'

শ্রীচৈতন্য এই কথা শুনিয়া জগদানন্দের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তিবস্কাব কবিতে লাগিলেন, 'কাল্‌কের পড়ো হয়ে জগা এমনি গর্ব্বিত হয়েছে যে, তোমাকে উপদেশ দিতে সাহসী হ'য়েছে। ব্যবহারে ও পরমার্থে তুমি তাহার কেন, আমারও গুরুতুল্য ও মান্য ব্যক্তি, সে ছোঁড়ার এত বড় সাহস যে তোমার সঙ্গে মুখতুলে কথা কয়?'

সনাতন এবাবে সুযোগ পাইয়া বিনীত ভাবে নিবেদন করিলেন, 'যা হো'ক, আজ জগদানন্দেব সৌভাগ্য ও আমাব দুর্ভাগ্য জানিতে পারিলাম। জগদানন্দের ন্যায় ভাগ্যবান্ আব কে আছে? তাহাকে তিরস্কাব কবিয়া আত্মীয়তা সুধাবস পান করাইলে ও আমাকে গৌরবস্তুতি ক'রে নিম নিষিন্দা তিক্ত বস দিলে। হায়! আজিও আমি তোমার আত্মীয় হইতে পারিলাম না।' গৌরচন্দ্র মনে মনে খুব লজ্জিত হইয়া প্রকাশ্যে বলিতে লাগিলেন, 'জগদানন্দ কিছু আমার তোমা হইতে প্রিয় নয়। তুমি মনে করিতেছ, তোমাকে বহিরঙ্গ জ্ঞানে আমি স্তুতি করিতেছি ও জগদানন্দকে অন্তরঙ্গ জ্ঞানে তিরস্কার করিলাম। বাস্ত-

বিক তাহা নহে'। আমি মর্য্যাদা লঙ্ঘন কথনই সহিতে পারি না। তুমি মহাবিজ্ঞ পণ্ডিত ও গুণশালী ব্যক্তি, আমিও তোমার নিকট কত শিখিয়াছি। জগা কালিকায় ছোঁড়া, সে তোমাকে বুঝায়, এমন তার কি শক্তি? বিশেষতঃ এক ব্যক্তি অনেক লোককে ভাল বাসিলে সর্ব্বত্রই যে তার প্রেমের ব্যবহার এক রকম হইবে,তাহা কে বলিল ?" প্রীতিব স্বভাবই বৈচিত্র্যময়। পাত্র বিশেষে নানা ভাবোদয় হওয়াই স্বাভাবিক। তোমাতে আমাব প্রেম যে ভাবে প্রকাশ হইবে, জগদানন্দে ঠিক্ সেরূপ না হইতে পারে।'

'সনাতন কিছু অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন, সে জন্য এত কুণ্ঠিত হইতেছ কেন?'

গৌর সে কথায় মনোযোগ না করিয়া বলিয়া চলিলেন, 'তুমি তোমাব শবীরকে বীভৎস মনে কবিতে পাব, কিন্তু আমাব নিকট উহা অমৃতময়। তোমার দেহ প্রাকৃত হইলেও আমার উপেক্ষার সামগ্রী হইত না; কিন্তু উহা যে চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দেহ। অপ্রাকৃতে তো ভদ্রাভদ্র ভাল মন্দ বিচাব সম্ভবে না। আর এক কথা, আমি সন্ন্যাসী, সর্ব্বত্র সম দর্শন কবাই আমাব ধর্ম্ম, চন্দন পঙ্ক আমাব নিকট সমজ্ঞান হওয়া উচিত, এ জন্যও আমি তোমার দেহে ঘৃণা করিতে পারি না। কেন না তাহা কবিলে আমাব ধর্ম্ম থাকে কই?'

হবিদাস বলিয়া উঠিলেন, 'তোমার এ বাহ্য প্রতাবণা আমি শুনিতে চাইনা। আমার ন্যায় অধমকে স্বীকার করাতেই তোমার দীন দয়ালু নাম প্রচার হইয়াছে।' শ্রীচৈতন্য উত্তর কবিলেন, 'শুন হরিদাস। সকলই শ্রীকৃষ্ণেব লীলা। সনাতনকে চর্ম্ম রোগ দিয়া আমার পরীক্ষার জন্য তিনিই পাঠাইয়া দিয়াছেন। ঘৃণা কি করিতে পারি? করিলে যে তাঁর ঠাঁই অপরাধী হইতাম।

হরিদাস উত্তর করিলেন, 'দয়াল! কে তোমার গভীর হৃদয় বুঝিবে? গলৎকুষ্ঠি, কীটদষ্ট বাসুদেবের শরীর আলিঙ্গন করিয়া তুমি কন্দর্পের ন্যায় কেন করিয়াছিলে?' এ কৃপা তোমার আমরা কি বুঝিতে পারি?

শ্রীচৈতন্য তখন ভাব প্রেমে বিভোর হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'শুন হরিদাস। শুন সনাতন! তোমাদেব ন্যায় আমার হৃদয় বন্ধুদিগের সম্বন্ধে আমার মনের ভাব কিরূপ। আমি আপনাকে অতি অমান্য হীন মনে করি। তোমরা আমার সেব্য, আমি তোমাদেব সেবক। তোমাদেব সেবা কবিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করি। শিশুর সেবা কালে জননীর গায়ে যদি বালকেব মল মূত্র লাগে, তা'তে কি মায়ের ঘৃণা হয়? বস্তুতঃ সনাতনের রস রক্ত আমার নিকট চন্দনের ন্যায়। প্রথম দিনেই আমি তাহাতে চতুঃসোমেব গন্ধ পাইয়াছিলাম।'

সনাতন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, 'এমন দয়াল প্রভু আর কোথায় পাইব?'

শ্রীচৈতন্য বলিলেন, "রথ যাত্রার পর তোমাব যাওয়া হইবে না। এ বৎসর তুমি আমার নিকট থাকিবে, আগামী বর্ষে তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাইব।" শ্রীচৈতন্য প্রেমাবেগে আবার সনাতনকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! দেখিতে দেখিতে তাঁহার কণ্ডুরস কোথায় চলিয়া গেল? তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় অঙ্গ উজ্জ্বল ও সুঠাম হইল। দেখিয়া উভয়ে, চমৎকৃত

হইলেন। হরিদাস বিকৃতস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, 'বুঝিলাম, বুঝিলাম, এ সব তোমারই ভঙ্গী। তুমিই ঝারিখণ্ডের দূষিত জল খাওয়াইয়া ইহার পরীক্ষার জন্য চর্ম্মরোগ দিয়াছিলে, আবার পরীক্ষান্তে তুমিই তাহা ভাল করিয়া দিলে।'

'সকলই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা' বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য উঠিয়া মধ্যাহ্ন করিতে গেলেন।

এইরূপে শ্রীসনাতন নীলাচলে হরিদাসের কুটীরে বৎসরাবধি বাস করিতে লাগিলেন। রথযাত্রায় বঙ্গের ভক্তগণ আগমন করিলে শ্রীচৈতন্য সকলের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, বক্রেশ্বর, বাসুদেব, মুরারি, রাঘব, দামোদর, পুরী, ভারতী, স্বরূপ, সার্ব্বভৌম, রামানন্দ, গদাধর, জগদানন্দ, শঙ্কর, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে প্রীতি অনুগ্রহ করিলেন।

বর্ষার চারিমাস পরে বঙ্গের ভক্তগণ চলিয়া গেলেন। সনাতন দোলযাত্রা দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জন্য বিদায় প্রার্থনা করিলে, চৈতন্যদেব তাঁহাকে বিদায় দিলেন। সনাতন গোঁসাই একে একে সকল ভক্তের পাদবন্দনা করিয়া ও হরিদাসের নিকট বিদায় লইয়া যাত্রা করিলেন। তৎকালে শ্রীচৈতন্য সনাতনের বিচ্ছেদে আকুল হইয়া পড়িলেন। যাইবার পূর্ব্বে গোস্বামী ভগবান্ আচার্য্যের নিকটে ঝারিখণ্ডপথে শ্রীচৈতন্য যে যে স্থানে লীলাবিলাস করিয়াছিলেন, তাহা লিখিয়া লইলেন এবং পথে যাইতে যাইতে সেই সব গ্রাম, নগর, বন, উপবন, নদী, বৃক্ষ, দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া বৃন্দাবনোদ্দেশে যাইতে লাগিলেন।

সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে আসিবার কিছুদিন পরে রূপ গোঁসাই বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া মিলিত হইলেন। তখন দুই ভ্রাতা শ্রীচৈতন্যের আদেশমত কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইহার পর বল্লভের পুত্র ও তাঁহাদের ভ্রাতষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামীও নিত্যানন্দাদেশে তাঁহাদের সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন এবং পিতৃব্য-ভ্রাতষ্পুত্র তিনজনে নানাগ্রন্থ প্রণয়ন, ভক্তি ও প্রেম প্রচার দ্বারা শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বিধান পূর্ণ করিতে লাগিলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

সহবাস-সম্মতি ও সমাজ।

ধর্ম্ম-পরিণীতা পত্নী ঘটনা বিশেষের পর স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। হিন্দুশাস্ত্রানুসারে তাহার নাম গর্ভাধান-সংস্কার অথবা পুনর্ব্বিবাহ। প্রথম পুষ্পোদগমের পর ঐই সংস্কার সম্পন্ন হওয়াই প্রচলিত সামাজিক পদ্ধতি। দণ্ডবিধি আইনানুসারে দশবৎসরের ন্যূন বয়স্কা পত্নীর সহিত তাহার সম্মতি সত্ত্বেও স্বামী যথেচ্ছ ব্যবহার করিলে দণ্ডনীয় হন। কিন্তু পত্নীর বয়স দশবৎসর উত্তীর্ণ হইলে তাহার আত্মসমর্পণে অধিকার জন্মে। ইহাকেই সম্মতি দানের বয়স বলে। এ সম্বন্ধে বঙ্গদেশে যেরূপ আন্দোলনের তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল, এরূপ দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন সহসা কাহারও নয়নগোচর হয় নাই। বস্তুতঃ এ আন্দোলন কেবল শিক্ষিত সমাজেই সীমাবদ্ধ নহে।

দেশ কাল-পাত্রানভিজ্ঞ,কুসংস্কারপ্রিয় ও দেশাচারের অন্ধ পক্ষপাতী সম্প্রদায় বিশেষও ইহাতে উত্তেজিত হইয়াছিলেন। সমুদ্র মন্থনে যেরূপ অমৃত ও হলাহল উভয়ই উদ্গীর্ণ হয়, প্রস্তাবিত আন্দোলনেও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছিল। শিক্ষিত সমাজের অগ্রণী অথবা উদার নৈতিক মহাত্মাগণের গভীর দেশহিতৈষিতা যেমন সমাজ কলঙ্ক অপসারণে যত্ন পাইয়াছে, কুসংস্কারান্ধ স্থিতিশীল সম্প্রদায় তেমনি ধর্ম্মের ধূয়া ধরিয়া তোতা পাখীর মত 'ধর্ম্ম গেল' 'ধর্ম্ম গেল' চীৎকারে সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের নামে কলঙ্কারোপণ করিয়াছে। স্মরণাতীত কালের কল্পনা-রঞ্জিত চিত্র লক্ষ্য করিয়া ইহাঁরা সময়-স্রোতের প্রতিকূল প্রবাহে দণ্ডায়মান। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ সম্বন্ধে তাঁহাদের দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে অন্ধ। সহবাস-সম্মতির বয়োনিয়ম দ্বাদশবর্ষ নিরূপিত হইলে অনেক স্থলেই গর্ভাধান সংস্কারে বাধা পড়িবে, এই তাঁহাদের মূল আপত্তি। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন জন্য হিন্দুশাস্ত্র হইতে অনুকূল বচন প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া অনেকেই আত্মপক্ষ সমর্থনে যত্ন পাইয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র অগাধ সমুদ্র বিশেষ, তাহা হইতে কোন বিষয়ের অনুকূল ও প্রতিকূল উভয়বিধ মত সংগৃহীত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। যে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা হিন্দুধর্ম্মের গৌরবস্থল, তাহাতেই আবার পশুপূজা ও বৃক্ষপূজা প্রভৃতি জড়োপাসনা সম্বন্ধেও বহুবিধ মত পরিদৃষ্ট হয়। এরূপ ঘোরতর বিসদৃশ মতগুলিও যে একইরূপ ধর্ম্মবৃক্ষের ফল, তাহা হইতে গর্ভাধানের অনুকূল দুই একটি বচন সংগ্রহ করা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এ সম্বন্ধে প্রতিকূল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের অভিপ্রেত নহে। অনুকূল প্রমাণগুলি কতদূর যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়ের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, আমরা এ স্থলে তাহাই আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইব।

হিন্দুশাস্ত্রে এরূপ স্পষ্টতঃ বিধান রহিয়াছে † যে, শাস্ত্রের প্রতি অন্ধনির্ভর না করিয়া যুক্তির সহায়তা অবলম্বনপূর্ব্বক সত্য নির্ণয় করিবে। কারণ যুক্তিহীনবিচারে ধর্ম্ম হানি হয়, অর্থাৎ প্রকৃত সত্য নির্ণীত হইতে পারে না। সুতরাং শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তির প্রাধান্য যে সর্ব্বতোভাবে বলবৎ, এ সম্বন্ধে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। যাঁহারা গর্ভাধানে শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদন জন্য বিচার-মল্লতা প্রদর্শন করেন, তাঁহারা পদে পদে ধর্ম্মের দোহাই দিয়াও ধর্ম্মশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট অমোঘ আজ্ঞা স্পষ্টতঃ লঙ্ঘন করিয়াছেন। সুতরাং সত্য নির্ণয় অপেক্ষা আত্মপক্ষসমর্থনই যে বিতণ্ডাকারীদিগের প্রধানতম উদ্দেশ্য, ইহা বোধ হয় বলা বাহুল্য। আদ্য ঋতুতে গর্ভাধান সম্বন্ধে অনুকূল বচন তাঁহাদের মুখে দুই একটী শুনিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এ স্থলে যাহা ‡ উদ্ধৃত হইল, তাহার মর্ম্মার্থ এই,—"ঋতুস্নাতা যে নারী পতিতে উপসর্পণ না করে, সে মরণান্তর নরক গমন করে, এবং জন্ম জন্ম বিধবা হয়। আর যে (পতি) পুষ্পবতী ভার্য্যার সন্নিধানে গমন না করে, সে পাপাত্মা জীবনে এবং জীবনান্তে ভ্রূণহত্যা পাপে নিমগ্ন হয়।"

---

† "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন বিচারেতু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

‡ "ঋতুস্নাতা তু যা নারী ভর্ত্তারং নোপসর্পতি।
সা মৃতা নরকং যাতি বিধবা চ পুনঃ পুনঃ॥
ঋতুস্নাতান্ত যোভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপগচ্ছতি।
অবাপ্নোতি স মন্দাত্মা ভ্রূণহত্যা মৃতাহৃতৌ॥"

এ সম্বন্ধে আমাদের প্রথমতঃ জিজ্ঞাস্য এই যে, ঋতুমতী পত্নী স্বামীতে উপগত হইবে এবং স্বামীও ভার্য্যা সম্ভোগ করিবে। অন্যথা একদিকে বৈধব্য ও অন্যপক্ষে ভ্রূণ-হত্যার পাতক জন্মে, ইহাই শাস্ত্রীয় বিধি। কিন্তু দশমবর্ষীয়া বালিকা পত্নীর সর্ব্বনাশ না করিলে যে হিন্দুধর্ম্ম একবারে রসাতলে যায়, এরূপ অনুকূল প্রমাণটী কোথায়? আর দশম বর্ষের সঙ্গেই বা প্রথম পুষ্পোদগমের নিত্য সম্বন্ধ কিসে? তবে বচনান্তরে † দশম বর্ষ রজোসম্ভব কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিলেও তাহাতে পশু প্রবৃত্তি চরিতার্থতা সম্বন্ধে কোন রূপ বিধান নাই। সুতরাং দ্বাদশ বর্ষ সম্মতি দানের বয়স নিরূপিত হইলে যে হিন্দুধর্ম্মে আঘাত পড়ে, এই অভ্রান্ত সত্যটী উল্লিখিত বচনে কিসে প্রতিপন্ন হইল? তবে যে আজ কাল অনেক বালিকাকে নবম অথবা দশম বর্ষে পুষ্পিতা হইতে দেখা যায়, তাহার কারণও নিতান্ত অননুমেয় নহে। পূর্ব্বকালে শাস্ত্রের অনুশাসন বাক্যে সমাজ শাসিত হইত। অনাগতার্ত্তবা স্ত্রীগমন শাস্ত্রীয় বিধিলঙ্ঘনরূপ মহাপাপ বলিয়া প্রাণান্তেও কেহ তাহাতে লিপ্ত হইত না। আর সামাজিক প্রথাও তৎকালে এই সমস্ত নিয়মের সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। অপুষ্পবতী রমণীগণ কদাপি স্বামী গৃহগমনে অনুজ্ঞাত না। সুতরাং বাল্যবিবাহের বিষময় ফল সেকালে সমাজবৃক্ষে ফলিত না। ফলকথা প্রথম রজোদর্শনের পর গর্ভাধান সংস্কারের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ১৪।১৫ বৎসর বয়সে এই সংস্কার সম্পন্ন হইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার প্রতি লোকের তেমন আস্থা নাই, এবং সমাজের শাসন গ্রন্থিও শিথিল। সুতরাং অনাগতার্ত্তবা পত্নী ও স্বামীর পাশব ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া অস্বাভাবিকরূপে ঋতুমতী হইতেছে। সামাজিক অধঃপতন ও নৈতিক অবনতিই এই সমস্ত সর্ব্বনাশের মূল বলিতে হইবে। নীতিহীন আচার ধর্ম্মের নামে কত যে বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় করিতেছে, উল্লিখিত ঘটনাই তাহার উৎকৃষ্টতর প্রমাণ।

এস্থলে অনেকে এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, পূর্ব্বকালে মনুষ্যের পরমায়ু সংখ্যা বিংশত্যধিক শতবর্ষ পরিমিত ছিল। সে কালে ১৫।১৬ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের ঋতুদগম হইত। এখন মানবের আয়ুষ্কাল ঊর্দ্ধতন ৬০ বৎসর। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে দশবৎসর বয়সেই স্ত্রীলোক পুষ্পবতী হইয়া থাকে। এ সিদ্ধান্তটী নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ সন্দেহ নাই। কারণ মানব জাতির পরমায়ু হ্রাস হওয়া সত্ত্বে যদি স্ত্রীলোকের ঋতুকাল অগ্রবর্ত্তী হওয়া সম্ভবপর হয়, তবে সন্তান প্রসব যোগ্য কাল যে দশম মাস নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, এই অনুপাত অনুসারে তাহা পঞ্চম মাসে সম্পন্ন না হয় কেন? আর পূর্ণ যৌবনে উপনীত না হইলে যে পশ্চিমাঞ্চলবাসিনীগণের রজঃ প্রবৃত্তি হইতে দেখা যায় না, তাহারই বা মূল কারণ কি? তবে যদি জল বায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থা ইহার মূল কারণরূপে নির্দ্দেশিত হয়; এবং গ্রীষ্ম প্রধান স্থান বলিয়া এদেশীয়া বালিকাগণ অল্প বয়সেই ঋতুমতী হয়, এরূপ [illegible] করা যায়, তাহা [illegible] আপত্তি সমাধ[illegible] [illegible]। কারণ ভারতবর্ষের পশ্চিম-প্রান্তবর্ত্তী ও উষ্ণমণ্ডলস্থিত প্রদেশ সমূহ অধিকতর গ্রীষ্ম প্রধান। বঙ্গদেশ অপেক্ষা উত্তাপের আতি-

† "অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥"

শন্য তত্তৎ প্রদেশে অত্যন্ত প্রবল। তবে সেখানে এরূপ অস্বাভাবিক ঘটনা না হওয়ার কারণ কি? যে উত্তাপাধিক্য বশতঃ বঙ্গদেশীয়া বালিকাগণ অকালে পুষ্পবতী হয়, তাহাই কি ভিন্নদেশীয়া যোষিদ্বর্গের যৌবনোদ্গমের প্রধান অন্তরায়? নৈসর্গিক নিয়মের এরূপ ব্যভিচার কল্পনা কতদূর অপসিদ্ধান্ত, চিন্তাশীল পাঠকগণ তাহার মীমাংসা করিবেন।

বাল্য বিবাহ প্রথা হিন্দু সমাজের প্রাচীন রীতি নহে। যবনের অত্যাচার অথবা অনুকরণে বোধ হয় এই কুৎসিত প্রণালী সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। হিন্দুজাতির আদর্শ মহিলা সাবিত্রী, শকুন্তলা, দময়ন্তী ও লীলাবতী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীগণ সকলেই যৌবন কালে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। স্বয়ম্বর প্রথাও ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থল। বস্তুতঃ বিবাহের ন্যায় গুরুতর আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম হওয়ার পূর্ব্বে তৎকালে কেহই অযথা বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইত না। সুতরাং বাল্যবিবাহ রূপ মহাপাপ সেকালে সমাজকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। অদ্যাপি পশ্চিমাঞ্চলে সাধারণতঃ ১৮।২০ বৎসর বয়সে স্ত্রীলোক বিবাহিতা হয়। সেখানে ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে প্রায়শঃ কাহাকে পুষ্পবতী হইতে দেখা যায় না। এ দেশেও বিবাহিতা ও অবিবাহিতা বালিকাদিগের মধ্যে এবিষয়ের গুরুতর পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিবাহিতা বালিকা অদ্ভুত সামাজিক নিয়মে বিবাহ-বাসর হইতে স্বামী শয্যায় গমন করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং প্রবৃত্তির উত্তেজনা বশতঃ অসময়েই তাহাদের যৌবনের চিহ্ন সকল বিকসিত হইয়া পড়ে। চলিত কথায় ইহাকেই 'বিবাহের বাড়' বলে। কিন্তু অনূঢ়া কুমারীর পক্ষে এ সমস্ত কারণের অভাব সত্বে অকালে যৌবনোদয় হইতে দেখা যায় না। বস্তুতঃ বালাস্ত্রী সহবাসরূপ পৈশাচিক ব্যবহার সমাজ হইতে উঠিয়া গেলে স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থায় বালিকাগণ কখনই অকালে রজোদৃষ্টা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবেনা। সুতরাং সামাজিক বিধি শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার প্রতিকূল না হইয়া বরং অনুকূল হইবে এবং সে বাঞ্ছনীয় মিলনে অবশ্য শুভ ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা।

মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে অষ্ট প্রকার বিবাহ পদ্ধতি নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ ও গান্ধর্ব্ব বিবাহ শ্রেষ্ঠতর। বীরপ্রধান ক্ষত্রিয় সমাজে বীর নীতিরূপ রাক্ষস বিবাহের সমধিক প্রচলন দৃষ্ট হয়। বল পূর্ব্বক কন্যা অপহরণ রাক্ষস বিবাহের প্রধানতম উদ্দেশ্য। বীরত্বের নিদর্শন রূপ কন্যাহরণ প্রথা তত্তৎ সমাজে এরূপ প্রচলিত ছিল যে, যিনি এইরূপ বীরত্ব প্রদর্শনে সমধিক কৃতকার্য্য, তিনিই সমাজে বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। বস্তুতঃ ইহা দস্যুতার রূপান্তর হইলেও তৎকালীন ক্ষত্রিয় সমাজে বীর-নীতি বলিয়াই সর্ব্বত্র প্রশংসিত হইত। এইরূপ আসুর, পৈশাচ ও গান্ধর্ব্ব প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত অষ্টবিধ বিবাহ প্রথাই যে তৎকালীন সমাজে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল, উল্লিখিত বিধি গুলিই তাহার উৎকৃষ্টতর প্রমাণ। নিদ্রিতাবস্থায় অনূঢ়া কুমারীকে বলপূর্ব্বক অভিগমনের নাম পৈশাচিক বিবাহ। কার্য্যটী নামের অনুরূপ সন্দেহ নাই। মনুষ্য সমাজে দূরে থাকুক, পশু সমাজেও এরূপ ঘৃণিত দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যাঁহারা অগ্র পশ্চাৎ

জ্ঞান শূন্য হইয়া সকল কাজেই ধর্ম্ম শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকেন; রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহাদের কি মত? প্রাচীন সমাজে অনুষ্ঠিত ও শাস্ত্রোক্ত বিধি সমাজে প্রচলন সম্বন্ধে কোনরূপ আপত্তির কারণ আছে কি? তবে দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনায় পৈশাচিক বিবাহাদি বর্ত্তমান সময়ের অনুপযোগী; বিবেক, মনুষ্যত্ব ও নীতির অনুরোধে যদি একথা স্বীকার করিতে হয়, তবে অন্ধভাবে পদে পদে ধর্ম্মের দোহাই দেওয়া কি অজ্ঞতার পরিচয় নহে?

হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বিবাহ-সংস্কার একটী গুরুতর আধ্যাত্মিক ব্যাপার। প্রবৃত্তি বিশেষের চরিতার্থতা তাহার উদ্দেশ্য নহে। গার্হস্থ্য জীবনে ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্যই দার পরিগ্রহের মুখ্য প্রয়োজন। কারণ ধর্ম্মাচরণে প্রধান সঙ্গিনী বলিয়াই পত্নীর নাম সহধর্ম্মিনী হইয়াছে এবং প্রাচীন কালে যে যথার্থ ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্যই দার পরিগ্রহ করা হইত, তাহাতেও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। স্ত্রীজাতি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী রূপিণী, এবং পুরুষের পক্ষেও সম্পূজনীয়া। যেখানে তাঁহারা পদার্পণ করেন, সে স্থান পবিত্র হয়। স্ত্রীজাতি সন্তুষ্ট হইলে দেবতাও সন্তুষ্ট হন। এইরূপ কত মহদুক্তি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু গ্রন্থাদির লিখিত মত আজ কাল গ্রন্থপত্রেই সীমাবদ্ধ; সমাজে তাহার প্রতিকৃতি কোথাও দৃষ্ট হয় না। সুতরাং পত্নী আর ইদানীং সহধর্ম্মিণী নামের যোগ্যা নহেন। আজ তিনি প্রণয়িনী, প্রাণকান্তা, প্রাণেশ্বরী বা জীবিতেশ্বরী। আবার অনেক স্থলে যে কেবল মাত্র শয্যা-সহচরী, ইহাও বোধ হয় চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। শাস্ত্রে আছে যে, ঋতু ভিন্ন স্ত্রীগমন মহা পাপ। কদাচিৎ পত্নী অভিলাষবতী হইলে তাহার কামনা পূরণ ভিন্ন স্বয়মেচ্ছুভাবে কখনও স্ত্রী-সম্ভোগ করিবে না, ও পুত্র জন্মিলে ভার্য্যা সম্ভোগ সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য এবং অপুষ্পবতী নারীগমন গুরুপত্নী লঙ্ঘনের তুল্য মহা পাতক। জিজ্ঞাসা করি, এই সমস্ত কঠোর নিয়ম যথাযথরূপে প্রতিপালন করেন, এরূপ সংযতেন্দ্রিয় ও নিষ্ঠাবান হিন্দু আজ কাল কয়টী দেখা যায়? প্রবৃত্তি সংযম সম্বন্ধে যাঁহারা শাস্ত্রের আদেশ ভ্রমেও একবার স্মরণ করেন না, ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থের সময় তাঁহারাই আবার ধর্ম্মের দোহাই দিতে আরম্ভ করেন। ইহা অপেক্ষা হাস্যজনক ঘটনা আর কি সম্ভব হইতে পারে? বস্তুতঃ ইহা ধার্ম্মিকতা না কপটতার চিহ্ন? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই শ্রেণীর লোকের অত্যাচারে সমাজ আজও মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন। কপটতা ও নীতিহীনতায় জাতীয় চরিত্র ও ধর্ম্মের মূল কতদূর শিথিল হয়, বিগত সামাজিক আন্দোলন তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল।

প্রস্তাবিত আন্দোলন ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া যাঁহারা বিরুদ্ধমত সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁহারা অধিকাংশই স্থিতিশীল সম্প্রদায়ের লোক। তাঁহাদের চিন্তা, কল্পনা ও সমাজতত্ত্ব-জ্ঞান কূপ-মণ্ডূকের ন্যায় সমস্তই দেশাচার ও কুসংস্কারের সংকীর্ণ সীমায় নিবদ্ধ। আদ্য ঋতু দর্শনের পর গর্ভাধান সংস্কার না হইলে যদি তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম লোপের আশঙ্কা করেন, তবে কৌলিন্য বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত কিরূপ? কুলীন কন্যাগণ যৌবন অথবা প্রৌঢ় বয়সে দূরে থাকুক, অনেকে আজন্ম অনূঢ়া অবস্থায় পিতৃগৃহে থাকিয়া 'যমবরা' হইতেও দেখা যায়। কেহ কেহবা কুমারী নাম ঘুচাইবার জন্য

অন্তিম শয্যায় অথবা অন্তর্জলে পাত্রস্থা হইয়া পৈত্রিককুল উদ্ধার করেন। আবার যাহার ভাগ্যে কুলদেবতার অনুগ্রহে যৌবনকালেই পরিণয় ক্রিয়া সমাধা হয়, তিনিও কালে ভদ্রে ২।৪ বৎসর অন্তর একবার স্বামী সন্দর্শন প্রাপ্ত হন কি না, সন্দেহ। কৌলিন্য-প্রথা অবশ্য হিন্দুশাস্ত্র-সম্মত ব্যবস্থা নয়। কোন্ বিধি বলে শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিয়া কুলীনকুমারীকে আজন্ম অবিবাহিত অবস্থায় জ্বলন্ত তুষানলে দগ্ধ করা হয়? আর্য্য-সভ্যতার শিরোভূষণ ব্রাহ্মণ জাতির সম্প্রদায় বিশেষে ঈদৃশ ঘৃণাকর প্রথা দৃষ্টে বস্তুতঃই মর্ম্মান্তিক দুঃখে অধীর হইতে হয়। কিন্তু মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট সমাজ সে দিকে ভ্রমেও একবার তাকাইয়া দেখে না। গর্ভাধানের ধূয়ায় যাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম লোপ হইল বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়াছিলেন, এবং বাল্যসহবাস-রূপ পৈশাচিক ধর্ম্ম (!) রক্ষার্থ আপনাদের পাশব প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদানেও লজ্জাবোধ করেন নাই, কৌলিন্যপ্রথা তাদৃশ সমাজের মুখোজ্জ্বলকারী সন্দেহ নাই। নচেৎ বয়োবৃদ্ধা কুলীন কুমারীকে গৃহে রাখিয়াও যাঁহারা গর্ভাধান সংস্কারের জন্য চীৎকার করেন, তাহারা কতদুর ধর্ম্মান্ধ, এবং যে সমাজে এই শ্রেণীর লোকের সর্ব্বময় প্রভুত্ব, সে সমাজ ধর্ম্মের রাজ্যে কতদুর অধঃপতিত, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইতে পারে।

গর্ভাধান-সংস্কার নিয়ম বিধি নহে। অর্থাৎ যাহার অনুষ্ঠান না করিলে হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে পাতক গ্রস্ত হইতে হয়, এরূপ অবশ্য প্রতিপাল্য ধর্ম্ম নহে। দ্রাবিড়, মৈথিল ও বারাণসী প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী-পরিবৃত হিন্দুস্থানে গর্ভাধান প্রথা দূরে থাকুক, ইহার নাম গন্ধও কস্মিন্‌কালে কেহ অবগত নহে। এই বীভৎস প্রথা শুধু বঙ্গদেশেই প্রচলিত। কিন্তু তাহাও সর্ব্বত্র যথাযথরূপে প্রতিপালিত হয় কি না, সন্দেহ। স্বামী বিদেশগামী, কারারুদ্ধ, রুগ্ন অথবা বিকলাঙ্গ হইলে কি পুনর্ব্বিবাহ-সংস্কার বহুকাল পর্য্যন্ত অসম্পন্ন থাকে না? কিন্তু তজ্জন্য কাহাকেও সমাজ-চ্যুত অথবা প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে দেখা যায় না। প্রথম পুষ্পবতী হওয়ার পর গর্ভাধান ব্যাপার সম্পন্ন না করা মহা পাপ, এই সংস্কার বলবত্তর হইলে বিদেশগামী পতি প্রভৃতি স্থলে যে কিরূপ বীভৎস কাণ্ডের অভিনয় করিতে হয়, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিতে হইবে না। বস্তুতঃ উল্লিখিত সামান্য কারণ সত্ত্বে গর্ভাধান সংস্কার দীর্ঘ-কাল পর্য্যন্ত অসম্পন্ন রাখাও যদি পাপজনক না হয়, তবে বালিকা পত্নীর স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ঈদৃশ গুরুতর কর্ত্তব্যের অনুরোধে কিছুকালের জন্য অপেক্ষা করিলে কি একটা ঘোরতর মহাপাতক হইবে?

ক্রমশঃ। শ্রীমহেশচন্দ্র সেন।

সাধক।

"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি,
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি॥" ভবভূতি।

১

চিনি চিনি চিনি তোরা নিঠুর পাষাণ,
ছোঁব না ছোঁব না আমি তোদের পরাণ;
শু'নে শু'নে কথা কবি,
আপনা ঢাকিয়া র'বি
বাড়া'বি গরব নিজ, করি শীত ধ্যান!

"গরীবের হৃদি" ব'লে,
শেষে দিবি পা'য় দ'লে!—
আমার সবে না কভু অত অপমান।
নেব না নেব না আমি তোদের পরাণ।

২

আমি চাই, মহতের মহত পরাণ,
মুকুতা মাণিক নিধি,
আমারে দিওনা, বিধি!
চাইনে এ মরতের রাজত্ব সম্মান,
বাঞ্ছিত পরাণ পেলে,
প্রাণটুকু দিয়া ঢেলে,
মেগে নেব, মনুষ্যত্ব—শ্রেষ্ঠ উপাদান,
প্রাণের সাধক আমি, সাধনীয় প্রাণ।

৩

আমি চাই, শিশু হেন উলঙ্গ পরাণ
বুকে মাখা সরলতা
কয় না সাজানো কথা,
জানে না যোগা'তে মন করি নানা ভাণ,
প্রাণ খোলা মন খোলা,
আপনি আপনা ভোলা,
তার স্নেহ প্রীতি সবি হৃদয়ের টান।
আমি চাই স্বরগের উলঙ্গ পরাণ।

৪

আমি চাই, মনোহর সুন্দর পরাণ,
পবিত্র—উষার রবি,
কোমল—ফুলের ছবি,
মধুর—বাসন্ত বায় পাপিয়ার গান।
আনন্দে—শারদ ইন্দু,
গাম্ভীর্য্যে—অতল সিন্ধু,
পূর্ণ—বরষার বিল, ভরা কাণেকাণ।
আমি চাই মনোহর সুন্দর পরাণ।

৫

আমি চাই, বীরত্বের তেজস্বী পরাণ,
পায়ে ঠেলে, তোষামোদ
নীচতার অনুরোধ!
তার ব্রত, সত্য রক্ষা, সত্যানুসন্ধান;
চাহে না নিজের ইষ্ট
অতুল কর্ত্তব্যনিষ্ঠ,
ধরা প্রতিকূল হ'লে নহে কম্পবান,
জীবন সংগ্রামে নিত্য,
বিজয়ী তাহার চিত্ত,
অনন্তে উড়িছে তার বিজয়-নিশান।
আমি চাই বীরত্বের তেজস্বী পরাণ।

৬

আমি চাই, জিতেন্দ্রিয় বিশ্বাসী পরাণ,
ছিঁড়িয়াছে মোহ-পাশ,
ছয় রিপু চির দাস,
নর নারী ভাই বোন, অন্য নাহি জ্ঞান।
চাহিতে মুখের পানে,
সঙ্কোচ আসে না প্রাণে,
কি যেন দেবত্ব মাখা সে পূত বয়ান।
আমি চাই জিতেন্দ্রিয় বিশ্বাসী পরাণ।

৭

আমি চাই, প্রেমিকের প্রেমিক পরাণ,
পরে সদা ভালবাসে,
পরের সুখের আশে,
চির আত্ম বিসর্জ্জন চির আত্ম দান।
ব্যথিতে পড়িলে মনে,
ধারা ব'য় দুনয়নে,
হৃদি-তলে সদা চলে প্রেমের তুফান।
সে নয় স্বতন্ত্র কেহ,
বিশ্বই তাহার গেহ,
সে সাধে আপনা দিয়ে ভবের কল্যাণ।
আমি চাই প্রেমিকের প্রেমিক পরাণ।

৮

আমি চাই, বিশ্বোদর উদার পরাণ,
অভেদ খ্রীষ্টান হিন্দু,
দ্বেষ নাই এক বিন্দু,
নিরখে জগতে ভরা এক ভগবান।
জ্ঞান, সত্য, নীতি পুজে,
"দলা দলি" নাহি বুঝে,

সে জানে সকলে এক মায়েরি সন্তান।
মরমে মহত্ত্ব পূর্ণ,
হীনতা করেছে চূর্ণ,
হৃদয়ের বৃত্তি সব উদার মহান্।
ন্যায় তরে প্রিয়ত্যাগী,
প্রীতিতে পরানুরাগী,
সমাদরে রাখে জ্ঞানী গুণীর সম্মান,
অনুতপ্ত অশ্রুধার
কথন সহে না তার,
অনুতাপী পাপী পেলে পুণ্য করে দান।
বিশ্বের উন্নতি আশা,
বিশ্বময় ভালবাসা।
বিশ্বের মঙ্গল সাধে করি আত্মদান!
মরতে সে দেবোপম,
উপাস্য মমসা মম।
বসুধা কৃতার্থা তারে কোলে দিয়ে স্থান।
আমি সাধি সাধনা সে দেবতার প্রাণ।

শ্রীপ্রিয়-প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি।

হান্টার, কনিংহাম, নেসফিল্ড প্রভৃতি সাহেবদিগের মতে ভারতবর্ষে অমিশ্র আর্য্য-জাতি নাই। কি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয়, সকলের রক্ত অনার্য্য-সংস্রব-কলুষিত। রাজপুতানায় দুই একটী অমিশ্র আর্য্যবংশ থাকিলেও থাকিতে পারে, আর কোথায়ও নাই।

আকৃতি দেখিয়া বোধ হয় ভারতবাসী সকলেই অনার্য্য বা শঙ্করজাতি। কাশী সংস্কৃত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছাত্রদিগের ও রাজপথ-চারী মেথরদিগের আকৃতিগত কোন পার্থক্য নাই।

ভারতবাসী সকলেই অনার্য্য। ব্যবসায় ভেদে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, কুমার প্রভৃতি জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। বর্ণগত কোন বিভি-ন্নতা নাই। সকলেই অনার্য্য।

নেসফিল্ড সাহেব এই সব কথা লিখেন, হান্টার প্রভৃতি অনেকে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক। সম্প্রতি রিজলী সাহেব গবর্ণমেণ্টের আদেশে বাঙ্গালার জাতিগত সামাজিক ব্যবহার সকল লিপিবদ্ধ করিয়া দুইখণ্ড বৃহদাকার পুস্তক লিখিয়াছেন, রিজলি সাহেব যাহা লিখিয়াছেন, সংক্ষিপ্ত সার করিয়া আমরা পাঠকগণকে উপহার দিলাম।

জনপ্রবাদ ও শাস্ত্রানুসারে জাতিভেদ বর্ণগত। এজন্য জাতির নামান্তর বর্ণ। আর্য্য জাতি ইয়ুরোপের আদিমবাসীগণের বর্ণগত পার্থক্য অনুভব করিতে পারেন নাই, সেখানে শীতহেতু সকলেরই গৌরবর্ণ, এজন্য ইউরোপে জাতিভেদ ঘটে নাই। গৌরবর্ণ আর্য্য সন্তান ভারতের কৃষ্ণকায় আদিমবাসীগণের বিভৎস আকার দেখিয়া আর্য্যবর্ণের স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। এ জন্য জাতি-ভেদ উৎপন্ন হয়। বর্ণ অনুসারে ভারতবর্ষে তিন প্রকার লোক বাস করে। গৌরবর্ণ আর্য্যজাতি, কৃষ্ণবর্ণ দ্রাবিড়ীয় জাতি এবং পীতবর্ণ মঙ্গলীয় জাতি।

দেহের পরিমাণ অনুসারে জাতি নির্ণয় করিবার একটী উপায় উদ্ভূত হইয়াছে। ইউরোপে বর্ণশঙ্কর এত অধিক যে, সেখানে এই উপায়ে জাতি নির্ণয় করা কঠিন হই-য়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে জাতিভেদ থাকাতে এই উপায় বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে।

বাঙ্গালা, উত্তর পশ্চিম ও পঞ্জাবে বিভিন্ন-জাতীয় ছয় সহস্র লোকের মস্তক, নাসিকা, চিবুক ও সমগ্র দেহের পরিমাণ পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, শাস্ত্রে যে জাতিভেদের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা সত্য। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ক্ষত্রিয়, ছাত্র, বাভন প্রভৃতি উচ্চ জাতীয়েরা আর্য্যবংশ সম্ভুত।

হিন্দুসমাজের অনাচরণীয় নিম্ন জাতিরা অনার্য্য-বংশসম্ভূত। তাহারা হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া হিন্দু আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিয়াছে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতির জাতিভেদ ব্যবসায়গত। নূতন জাতি সৃষ্টির এখনও শেষ হয় নই। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের উড়িষ্যা-দুর্ভিক্ষে যাহারা অন্নছত্রে আহার করিয়াছিল, তাহারা সমাজচ্যুত হইয়া একটী স্বতন্ত্র জাতি সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদিগকে "ছতরখেওয়া" বলে। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ হইতে নিম্ন শ্রেণীর নানা জাতি আছে, ইহারাও ঊর্দ্ধ ও অধঃ দুই জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। উচ্চ শ্রেণী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ছতরখেওয়ার মধ্যে আদান প্রদান চলে। নিম্নশ্রেণীতেও এইরূপ হয়। কিন্তু ঊর্দ্ধ ও অধঃ শ্রেণীর আদান প্রদান, পান ভোজন নিষিদ্ধ।

"সাগর পেশা" নামে আর একটী বর্ণ-শঙ্কর জাতি উড়িষ্যায় সৃষ্ট হইয়াছে। ইহারা আচরণীয় শূদ্র।

বাঙ্গালা দেশের নবশাখ এখন ত্রয়োদশ শাখায় পরিণত হইয়াছে।

পঞ্জাব হইতে যতই পূর্ব্বমুখে যাওয়া যায়, আকার ও বর্ণগত পার্থক্য ততই অনুভূত হয়। যেন অনার্য্যজাতি যতই পিছাইয়া পড়িয়াছে, ততই হিন্দুসমাজের অধীন হইয়া নিম্নস্তর গঠন করিয়াছে। স্তরে স্তরে হিন্দু-সমাজ গঠিত। মুসলমানধর্ম্ম আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ স্তর-বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে। জাতীয় পার্থক্য ও সমাজগত আচার ব্যবহারের উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটাইয়াছে। কিন্তু দেহ পরিমাণের উপায়ে ভারতীয় মুসলমানদিগের মৌলিক বর্ণ নির্ণয় করা যাইতে পারে।

হিন্দুধর্ম্ম আততায়ী ধর্ম্ম না হইলেও, হিন্দুসমাজ বর্ণাশ্রম সমাজ হইলেও, অতি প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অনার্য্য-জাতি সকল ক্রমে ক্রমে হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে। খাবওয়ার, মহুলী, ভুঁইয়া প্রভৃতি জাতি আজকাল প্রবেশ করিতেছে, এখন সম্পূর্ণ হিন্দু হয় নাই, অনার্য্য আচার সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নাই। হাড়ী, বাগ্‌দী, ডোম, জেলে, কৈবর্ত্ত, কোচ, রাজবংশী, কোড়া, গেঁড়েরি প্রভৃতি জাতি প্রায় হিন্দু হইয়াছে। ইহারা তাই এখনও অনাচরণীয়। আচরণীয় শূদ্রেরা সম্পূর্ণ হিন্দুত্ব লাভ করিয়াছে। বাল্যবিবাহ প্রবর্ত্তন ও বিধবা বিবাহ নিষেধ, এই দুইটী হিন্দু সমাজের বিশেষ লক্ষণ। যাহারা যে পরিমাণে এই দুইটী নিয়ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা সেই পরিমাণে হিন্দু হইয়াছে। অনার্য্য-সমাজে বাল্যবিবাহ নাই এবং বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ নহে।

নিম্নলিখিত উপায়ে অনার্য্য জাতি হিন্দু-সমাজে প্রবেশ করে।

১। অনার্য্য কোনও জাতির কেহ সঙ্গতি সম্পন্ন হইলে সে আপনাকে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। সাধারণতঃ রাজ-পুত বলিয়া পরিচয় দেয়। পতিত ব্রাহ্মণের কাহাকে পুরোহিত নিযুক্ত করে। পুরোহিত তাহার একটী বংশলিপি প্রস্তুত করিয়া রাজ-পুত বংশের অজ্ঞাত কোন শাখা হইতে সেই

বংশেব উৎপত্তি অনুসবণ করে। বিশেষ চেষ্টা করিয়া এইরূপে উৎপন্ন প্রাচীনতর কোন বংশের সহিত আদান প্রদান সম্পাদন করিয়া বংশ মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া লয়। রিজলী সাহেব ছোটনাগপুবে ইহাব অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলেন। তিনি জানেন না যে, কলিকাতা সহবে দুই সহোদব ভ্রাতাব একজন কায়স্থ ও একজন জেলে কৈবর্ত্ত হইয়াছে। এবং অদ্যাপি নীচ বংশীয় লোক দাস হইতে সবকার এবং সরকাব হইতে দে উপাধি লইয়া আপনা আপনি কায়স্থ হইয়া যাইতেছে।

২। অনার্য্য জাতীয় কতকগুলি লোক বৈষ্ণব হইয়া বামাযত প্রভৃতি কোন শাখাব অন্তর্ভূত হইয়া যাইতেছে এবং ক্রমে হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিতেছে। সাফা বা থারওযাব সাঁওতালেবা এইরূপে হিন্দু হইতেছে।

৩। একটী সমগ্র জাতি হিন্দু হইয়া হিন্দু সমাজেব একটী জাতিতে পবিণত হইতেছে। এবং হিন্দু সমাজে প্রচাবিত কোন ঋষির সন্তান বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিতেছে। কশ্যপেব নাম প্রাযই এই রূপে ব্যবহৃত হয়। রিজলী সাহেব এইরূপ অনুমান করেন, কোন কোন অনার্য্য জাতিব গোত্রনাম কচ্ছপ ছিল, কচ্ছপ কশ্যপে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে সমগ্র জাতি হিন্দু হইয়া আপনাদিগকে বাজ বংশায় বা ভঙ্গ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছে। ইহাবা আপনাদিগকে পরশুবামেব ভয়-তাড়িত দশরথের সন্তান বলে।

৪। অন্য জাতিরা এইরূপেই হিন্দু হইয়াছে, কিন্তু আপনাদিগেব বংশনাম ছাড়ে নাই। ভুমীজ বা ভুঁইয়া জাতি এইরূপে হিন্দু হইয়া হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে, কিন্তু প্রাচীন দেবতাদিগকে বিদায় করে নাই। প্রাচীন দেবতা আপাততঃ একটু পশ্চাৎভাগে অপসৃত হইয়াছে মাত্র। সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরাই তাহাদিগকে পূজা করে। কোথায় কোথায়ও হিন্দু দেবদেবী পূজা ব্রাহ্মণ দ্বাবা হয়, কিন্তু এ সকল দেবতার পূজা নিম্নশ্রেণীব কোন হিন্দু বা অনার্য্য কোন পুরোহিত সম্পাদন করে।

রেলওয়ে হওযাতে হিন্দুধর্ম্মের প্রচার ও একতা বৃদ্ধি হইতেছে। ব্রাহ্মেরা কালক্রমে হিন্দুসমাজের একটী নূতন জাতিতে পরিণত হইবে।

হিন্দুসমাজে স্বগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ, রিজলী সাহেব বলেন, গোত্রভেদ পাঁচ প্রকারে হইয়াছে।

১। অনার্য্য জাতিব মধ্যে (totem) বা বীজক অনুসাবে গোত্রভেদ হইয়াছে। হাঁসদা সাঁওতালেব বীজক হংস। হংসের সন্তান হংসেব সন্তানকে বিবাহ করিতে পারে না। সে নীল গাইয়ের (মুরমু) বংশে বিবাহ করিতে পারে।

২। কোন ঋষিব সন্তান বলিয়া গোত্রভেদ হইয়াছে। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বংশে ইহা দেখা যায়।

৩। স্থানভেদেও গোত্রভেদ হয়,—রাজপুত ও বৈশ্যদের মধ্যে ইহা দেখা যায়,—যেমন আগবওয়ালা, শিশোদীয় ইত্যাদি।

৪। গ্রাম্য বা পারিবারিক—যেমন বড়িশার মিত্র, আমেটের গাঙ্গুলী। থর, মুল, কুল, ডিহিভেদে গোয়ালা প্রভৃতি জাতিতে বিবাহ নিষিদ্ধ।

৫। উপাধিক—পূর্ব্ব-পুরুষের দোষগুণ হইতে বংশের কোন উপাধি জন্মে। লেপচা, চকমা প্রভৃতি জাতিতে ইহা দেখা যায়।

স্বগোত্রে বিবাহ নিষেধের কারণ কি? এবং যেখানে স্বগোত্র বিবাহ নিষেধ দেখা যায়, সেখানেই কন্যাবধ এবং কন্যাপণ দেখা যায়। ইহারই বা কারণ কি? হংসহংসীকেই বিবাহ করে, গাভীকে বিবাহ করেনা, তবে ভিন্ন গোত্র-বিবাহ কেন হইল? ইহার উত্তরে রিজলী সাহেব বলেন, ভিন্নগোত্রে বিবাহ হইলে সন্তান বলিষ্ঠ হয়, জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করে, ইহা দেখিয়া ভিন্নগোত্র-বিবাহ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। ভিন্নগোত্র বিবাহ হইলে বলপূর্ব্বক অন্য গোত্রের কন্যা অপহরণ করিতে হয়। এজন্য কন্যা লইয়া যুদ্ধ বাধে বলিয়া লোকে কন্যাবধ করিত। রাজপুত প্রভৃতি জাতিতে কন্যাপণে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত বলিয়া কন্যাবধ প্রচলিত হইয়াছিল। অন্যান্য সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন, কন্যার শারীরিক অপকৃষ্টতা হেতু কন্যাপণের উদয়, কন্যাপণ হইতে ভিন্নগোত্র-বিবাহ। *

হিন্দুসমাজে বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ কেন? ও বাল্য-বিবাহ প্রচলিত কেন? ইহার উত্তরে রিজলী সাহেব বলেন, হিন্দু-সমাজে কন্যাগত কুল (Hypergamy) প্রচলিত আছে। পুত্রের নিম্নবংশে বিবাহ হইলে, দোষ হয় না। কিন্তু কুল মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য কন্যাকে উচ্চতর কুলে বিবাহ দিতে হয়। উচ্চতর বংশের সন্তান দুর্লভ বলিয়া যত শীঘ্র জামাতা সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তত শীঘ্র কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়। এজন্য বাল্যবিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। কন্যা সম্প্রদানের অধিকারী পিতা। এজন্য পিতা জীবিত থাকিতে কন্যাকে সৎকুলে সমর্পণ করিতে অভিলাষী হন। সে জন্যও বাল্য বিবাহ প্রচলিত হইয়া থাকিবে। কন্যার সম্প্রদান হইলে সে জামাতার সম্পত্তি। পিতা ভিন্ন কেহ কন্যা সম্প্রদান করিতে পারে না। এবং যাহা একবার দান করা হইয়াছে, দ্বিতীয়বার তাহা দান করিতে পিতার অধিকার নাই, এ জন্য হিন্দু শাস্ত্র মতে বিধবা বিবাহ হইতে পারে না।

নিম্ন শ্রেণীতে সাগা, সাঙ্গা বা সঙ্গ নামে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু তাহাও দিন দিন কমিয়া আসিতেছে। যাহারা একরূপ বিবাহ দেয়, তাহারা আপনাদিগকে নীচ বলিয়া মনে করে এবং এরূপ বিবাহ তাহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করে। এ বিবাহে অগ্নি চয়ন হয় না। সুতরাং ইহা যে পশু সঙ্গ বা সংসর্গ, তাহা তাহারা জানে।

বিধবা ও যুবতী বিবাহ কেবল অনার্য্যদিগের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু হিন্দুসমাজের অনুকরণে যুবতী বিবাহ কমিয়া আসিতেছে। নিম্ন শ্রেণীতে অবরোধ প্রথা নাই বলিয়া বিধবা বিবাহ এখনও কমাইবার সুবিধা হয় নাই, কিন্তু কালক্রমে এ দুটী প্রথাই উঠিয়া যাইবে বলিয়া বোধ হয়।

রিজলী সাহেব সাঁওতালদের সম্বন্ধে দুটী ভুল করিয়াছেন। সাঁওতালদের মধ্যে মনোনয়ন (Courtship) প্রচলিত নাই। এবং বিধবা বিবাহ তাহারা ভাল বলে না। কেবল স্ত্রীশূন্য পুরুষে স্বামী-শূন্য স্ত্রী বিবাহ করিতে পারে। বিধবা বিবাহ সাঁওতালেরা ঘৃণা করে। বোধ হয় হাণ্টার সাহেবের গ্রন্থ পড়িয়া রিজলি সাহেবের এই দুটী ভ্রম হইয়াছে।

শ্রীক্ষীরোদ চন্দ্র রায়চৌধুরী।

* See Westermork's History Human marriage

ভক্তিসংগ্রহ।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি নানাবিধ ভক্তিশাস্ত্র হইতে ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক শ্লোক সংগ্রহ করিয়া আমরা প্রকাশ করিতে থাকিব এবং প্রতি শ্লোকের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্যার্থ যথাজ্ঞান সন্নিবেশিত করিব। ভক্তিরাজ্যে ভক্তবৎসল নানা নামে ও নানা রূপে প্রকাশিত। নামরূপের অতীত বস্তুকে ভক্ত আপনার ভক্তিভাবানুসারে যে কোন নামে ডাকিতে বা যে কোন রূপে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমরাও ভক্তপথানুগামী হইতে কুণ্ঠিত হইব না। প্রেমভক্তি স্বর্গীয় পদার্থ। এই মরধামে থাকিয়া যিনি ইহার কিঞ্চিদাভাসও লাভ করিতে পারেন, তিনিই ধন্য। তিনি যে কোন সম্প্রদায়ের লোক হউন না কেন, আমরা তাঁহার উপানৎ বহন করা শ্লাঘার বিষয় মনে করি। এই প্রবন্ধে প্রেম ভক্তিময় শ্লোকে ভগবানের যে কোন নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকুক বা যে কোনরূপ নির্দ্দেশ হইয়া থাকুক, আমরা তাহা যথাযথরূপে প্রকাশ করিব, কোন সম্প্রদায়ের মুখাপেক্ষা করিব না। ভক্তিরাজ্যে সাম্প্রদায়িকতা নাই। যিনিই ভক্তিলাভে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই ভক্ত। আশা করি, ভক্তিপিপাসু পাঠক উদ্ধৃত শ্লোক পাঠ করিয়া সুখী হইবেন। সংগ্রহ বিষয়ে কোন বিশেষ শৃঙ্খলা অবলম্বিত হইবে না, মাধুকরী ব্রত অবলম্বন করিয়া যখন যেমন সংগ্রহ করিতে পারিব, তখন সেইরূপই প্রকাশ করিব।

"দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া
ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয়
স্ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ।"
ভাগবত ১০স্ক। ৮৭ অ। ৩৭ শ্লোক।

হে ভগবন্। আপনি অনন্ত; দেবগণও আপনার অন্ত পায় নাই। আকাশ মার্গে পরমাণু ভ্রমণের ন্যায় সাবরণ ব্রহ্মাণ্ডসকল কালচক্রের সহিত আপনার অন্তরে যুগপৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আর শ্রুতি সকল তন্ন তন্ন করিয়া আপনার কথা বলিতে না পারিয়া অবশেষে 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ আপনিই তাই, বলিয়া নিরস্ত হইয়াছে। ১।

'জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো
মনসো, বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ।' ২।
ভা ১০।১৪।৩৮।

হে প্রভো। অনেক কথায় কাজ কি? যাঁহারা তোমার মহিমা জানিয়াছি বলেন, তাঁহারা জানুন; কিন্তু আমার তাহা কি বাক্য, কি মন, এবং কি শরীর, কিছুরই আয়ত্ত নহে। ২।

'কো বেত্তি ভূমন্। ভগবন্। পরাত্মন্।
যোগেশ্বরোতী র্ভবত স্ত্রিলোক্যাং।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্।' ভা ১০।১৪।২১।

হে ভূমন্। ভগবন্। পরাত্মন্! তুমি যোগেশ্বর, যোগমায়া বিস্তার করিয়া নিয়তই ক্রীড়া করিতেছ। ত্রৈলোক্যের মধ্যে কোথায়, কবে, কিরূপে কত লীলা করিতেছ, তাহা কে জানিতে পারে? । ৩।

অনিমা, লঘিমাদি ঐশ্বর্য্য, মহত্তত্ত্বাদি সূক্ষ্ম পদার্থ, শব্দস্পর্শাদি স্থূল তন্মাত্র এবং দিগ্দেশ কাল আকাশাদি লইয়া মহাপ্রকৃতি। ইহাই লীলার সহায় যোগমায়া এবং তাহাতে যুক্ত লীলাময় পুরুষই যোগেশ্বর। ভক্ত ভগবানের অনন্তরূপে ডুবিয়া থাই না পাইয়া এইরূপে স্তুতি করিলেন।

'উল্লংঘিতত্রিবিধসীমসমাতিশায়ি
সম্ভাবনং তব পরিব্রঢ়িম স্বভাবং।
মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহ্যমানং
পশ্যন্তি কেচিদনিশং ত্বদনন্যভাবাঃ।' ৪।

অলকমন্দার স্তোত্র।

হে ভগবন্! আপনার গোপনীয় চরিত্র ত্রিবিধ সীমার (ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিবিধ কালের বা সত্ত্ব রজ তম ত্রিবিধ গুণের) পরাকাষ্ঠা অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে। আপনিও মায়া বলে উহা গোপন করিয়া রাখিয়াছেন, কেবল আপনাতে অনন্যভাব কোন কোন ভক্তেরাই সে চরিত্র দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। ৪।

'যস্য প্রভাপ্রভবতো জগদণ্ড কোটি
কোটিষশেষবসুধাদি বিভূতি ভিন্নং
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কল মনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।' ৫।

ব্রহ্ম সংহিতা। ৫ অধ্যায়।

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডস্থিত অসংখ্য বিশ্ব রচনায় যে তেজ প্রকটিত হইয়া রহিয়াছে, যে তেজ অখণ্ড, অনন্ত, এবং অশেষ প্রাণিগণের উৎপত্তির নিয়ামক, যাঁহার প্রভাবে সেই রূপ ব্রহ্মতেজ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। ৫।

'নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্ব শক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈব মীদৃশ মিহা জনিনানুরাগঃ।' ৬।

চৈতন্যোক্তিঃ।

হে ভগবন্! তোমার এতাদৃশ কৃপা যে তোমার নানা নামে তুমি বহুপ্রকারে নিজ শক্তি অর্পণ করিয়া রাখিয়াছ, আর ঐ নাম গ্রহণের জন্য যথেষ্ট অবকাশ দিয়াছ, কালাকাল বিচার কর নাই, কিন্তু প্রভোঃ আমার এমনি দুর্ভাগ্য, যে এমন নামে আমার অনুরাগ জন্মিল না। ৬।

'নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্ গদরুদ্ধয়া গিরা
পুলকৈ র্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।' ৭।

চৈতন্যোক্তিঃ।

হে প্রভো! তোমার নাম লইতে কবে আমার নয়ন দিয়া অশ্রু ধারা গলিয়া পড়িবে? কণ্ঠরোধ হইয়া মুখে গদ্ গদ্ বাক্য বলিব? এবং পুলকে সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইবে? ।৭।

'যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দবিরহেণ মে।' ৮।

চৈতন্যোক্তিঃ।

গোবিন্দ বিরহে আমার নিমিষ কাল যুগযুগান্তের ন্যায় বোধ হয়, বর্ষাকালের ধারার ন্যায় নয়ন দিয়া ধারা বহিয়া যায় এবং জগৎ শূন্য লাগে। ৮।

'ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুং।
বংশীবিলাস্যাননলোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎপ্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা।' ।৯।

চৈতন্যোক্তিঃ।

হরিতে আমার প্রেমগন্ধ মাত্র নাই, 'আমি সৌভাগ্যবান্ প্রেমিক', ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য ক্রন্দন করিয়া থাকি। হায়! বংশী-বিলাসীর মুখদর্শন বিনা আমার প্রাণ ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। ৯।

'অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি
হরে ত্বদালোকন মন্তরেণ।
অনাথবন্ধো। করুণৈকসিন্ধো।
হা হন্ত। হা হন্ত। কথং নয়ামি। ১০।

কর্ণামৃত। ৪১।

হরি হে! তোমার দর্শন বিনা আমার দিন রাত্রি বৃথা যাইতেছে। হে অনাথবন্ধো! করুণাসিন্ধো! কেমন করিয়াই বা এরূপ অধন্য দিন ক্ষেপণ করিব? হা ধিক্! আমার কি কষ্ট! ।১০।

'আরাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং।

অন্তর্বহি র্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহি র্যদি হরি স্তপসা ততঃ কিম্।' ১১।

নারদপঞ্চরাত্র।

হরিকে যিনি আরাধনা করিয়াছেন, তাঁহার তপস্যার প্রয়োজন কি? যিনি হরি আরাধনা করেন নাই, তাঁহারই বা তপস্যার প্রয়োজন কি? যাঁহার অন্তরে বাহিরে হরি বিরাজমান, তাঁহার তপস্যার প্রয়োজন কি? আর যাঁহার অন্তরে বাহিরে হরি বিরাজমান নাই, তাঁহারই বা তপস্যার প্রয়োজন কি? । ১১। *

'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী।
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি র্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।' ১২।

ভগবদ্গীতা।১২।১৩।১৪।

যিনি সর্ব্বভূতে দ্বেষ রহিত, মৈত্র, কৃপালু, নির্ম্মম, অহঙ্কার শূন্য, সুখদুঃখে সমভাব ও ক্ষমাশীল, যিনি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, অপ্রমত্ত, সংযতস্বভাব, দৃঢ় নিশ্চয়; এবং যাঁহার মন ও বুদ্ধি আমাতে (ভগবানে) অর্পিত হইয়াছে, এরূপ ভক্তই আমার (ভগবানের) প্রিয়। ১২।

'যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈ র্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ।' ১৩।

ভগবদ্গীতা। ১২। ১৫।

যাঁহা হইতে লোকেরা উদ্বেগ পায় না, বা যিনি লোকদিগকে উদ্বেগ দেন না, যিনি নিজ ইষ্ট লাভে হৃষ্ট ও অন্যের লাভে অসহিষ্ণু হন্ না ও যিনি ভয়োদ্বেগ রহিত, তিনি আমার (ভগবানের) প্রিয়। ১২।

'যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভ পরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ।' ১৩।

গীতা। ১২। ১৬।

স্বয়মাগত অর্থে যিনি নিস্পৃহ, যিনি শৌচ সম্পন্ন, নিরলস, নিরপেক্ষ, নির্ভয় এবং কামনা পরিত্যাগী, সেই ভক্তই আমার (ভগবানের) প্রিয়। ১৩।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা। (৩)

মূর্ত্তিপূজা ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান কি না?

সাকারবাদ সমর্থন করিতে গিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, উহা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় বা সোপান। পৌত্তলিকতারূপ সোপান অবলম্বন করিয়া, উপাসক ক্রমে পরব্রহ্মে উপনীত হন। প্রথমে সাকারপূজা না করিলে, —মূর্ত্তিপূজারূপ উপায় অবলম্বন না করিলে —নিরাকার ব্রহ্মপূজার সামর্থ্য জন্মে না।

একথা স্বীকার করিতে পারি না। সাকার ও নিরাকার পরস্পর বিপরীত। সুতরাং সাকার উপাসনা অভ্যাস করিলে নিরাকার উপাসনার সামর্থ্য জন্মে, ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ, মানসিক নিয়মবিরুদ্ধ। অন্ধকারে বসিয়া থাকিলে কি আলোক দেখিবার শক্তি জন্মে? যত অধিক কাল অন্ধকারে বসিয়া থাকিবে, তোমার চক্ষু ততই আলোক দেখিবার অযোগ্য হইবে। যে সকল বিষয় পরস্পর বিপরীত, তাহার একটীর অভ্যাস দ্বারা অপরটী সম্পন্ন করিবার শক্তি বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া যায়। সাকার ও নিরাকার পরস্পর বিপরীত। একের অভ্যাসে অন্য বিষয়ের

* আরাধনার তাৎপর্য্য দর্শন, শ্রবণ ও আত্মসমর্পণ।

সাধন-শক্তি বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া যায়।

প্রচলিত পৌত্তলিকতা কি অনন্ত ব্রহ্মের পূজা ?

সাকারপূজা সমর্থন করিতে গিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে, প্রচলিত প্রতিমাপূজা ব্রহ্মপূজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। লোকে প্রতিমাতে পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান মনে করিয়া তাহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। একথা একভাবে সত্য। সাকারবাদী বা নিরাকারবাদী সকলেরই লক্ষ্য সেই পরাৎপর পরমপুরুষ। কিন্তু যে ভাবে, যেরূপ বিশ্বাসে, প্রতিমাপূজা, দেবদেবীরপূজা, এদেশে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে উহাকে সত্যস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মের উপাসনা বলিতে পারি না। প্রচলিত সাকার উপাসনা,—দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজা, কথনই পূর্ণব্রহ্মের উপাসনা বলিয়া উক্ত হইতে পারে না।

কাশীর বিশ্বেশ্বর একখানি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড। ঐ প্রস্তরখণ্ডের সহিত পূর্ণব্রহ্মের সম্বন্ধ কি ? ঐ প্রস্তরখণ্ডে অবশ্য পরব্রহ্ম অধিষ্ঠিত,—উহা ব্রহ্মশক্তির প্রকাশ। সেইজন্যই কি উহা পূজনীয় ? তাহাই যদি হয়, তবে রাস্তায় যে সকল প্রস্তরখণ্ড পতিত রহিয়াছে, তাহা পূজনীয় হয় না কেন ? রাস্তার পাথরে কি পূর্ণব্রহ্মের অধিষ্ঠান নাই ? উহা কি ব্রহ্মশক্তির বিকাশ নহে ? তবে বিশ্বেশ্বর যেমন পূজনীয়, রাস্তার প্রস্তর তেমনি পূজনীয় হয় না কেন ? ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান আছে বলিয়া প্রস্তরাদিনির্ম্মিত মূর্ত্তি পূজিত হয়, এরূপ নহে। অন্য কোনরূপ বিশ্বাস উহার মূলে আছে।

সাকারবাদীগণ যে দেবমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন, উহা তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে আহার করে, নিদ্রা যায়, শয্যায় শয়ন করে ; এমন কি, মশক দংশনের কষ্ট নিবারণের জন্য উহার মশারি প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। কোন কোন স্থলে মনুষ্যের ন্যায় ঠাকুরের জ্বর ও শিরঃপীড়া হইয়া থাকে। এতদূর জানা আছে যে, কোন স্থানের দেবতা মলত্যাগ করিতেন, বিশ্বাসী ভক্তগণ উহাকে হগ্‌গাপ্রসাদ বলিয়া ভক্তিপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেন। ইহাই কি পূর্ণ পরাৎপর পরব্রহ্মের উপাসনা ?*

প্রচলিত পৌত্তলিকতাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য এ সকল কথা বলিলাম না। যাঁহারা বলেন যে, প্রচলিত পৌত্তলিকতা পরমেশ্বরের প্রকৃত উপাসনা,—উহা ব্রহ্মোপাসনার আকারভেদ বা নামভেদ মাত্র, তাঁহাদের কথার অযৌক্তিকতা ও অসারত্ব প্রদর্শন করিবার জন্যই পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে ঐ দৃষ্টান্তগুলির উল্লেখ করা হইল। উহা বিদ্রূপ নহে, যুক্তি। যাঁহারা বলেন, প্রচলিত মূর্ত্তিপূজা পরমেশ্বরেরই উপাসনা, মূর্ত্তি কেবল অবলম্বনমাত্র, তাঁহাদের মত খণ্ডন করিবার জন্যই উহা বলা হইয়াছে। উক্ত প্রকার শত শত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতে পারে। তারকেশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ শিবের পূজা, যে ভাবে ও যেরূপ বিশ্বাসে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে উহাকে পরমেশ্বরের প্রকৃত উপাসনা বলা কি সঙ্গত হয় ? শিবমূর্ত্তিতে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের শক্তি অনুভব করিয়া লোকে উহার পূজা করে, ইহাই কি প্রকৃত কথা ?

তারকেশ্বরের শিবের সন্তোষের জন্য

* ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ১ম ভাগ ১২০ পৃষ্ঠা দেখ।

আলবোলায় গাঁজা সাজিয়া দেওয়া হয়। গাঁজার কলিকায় তালবৃক্ষেব জটা দেওয়া হয়। অগ্নিসংযোগে যখন তালেব জটায় পট্ পট্ শব্দ হইতে থাকে, তখন ভক্তেরা বলেন, ঐ বাবা গঞ্জিকা সেবন কবিতেছেন। ইহাই কি মূর্ত্তিব অবলম্বন পরমেশ্ববেব প্রকৃত উপাসনা? *

প্রচলিত সাকারবাদ যে পরিমিত কল্পিত দেবদেবীর পূজা, সত্যস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা নহে, ইহা সহজেই প্রতীত হয়। বাঙ্গালীজাতির সর্ব্বপ্রধান উৎসব, দুর্গোৎসবেব বিষয় আলোচনা কর। দুর্গোৎসব সম্বন্ধে সর্ব্বসাধাবণ বঙ্গবাসীব বিশ্বাস কিরূপ? মা ভগবতী সম্বৎসরকাল পতিপুত্র লইয়া কৈলাসে বাস করেন। বৎসবান্তে তিন দিনেব জন্য বাঙ্গালী ভক্তেব গৃহে আসিযা থাকেন। সে জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা উপযুক্ত মন্ত্রোচ্চাবণাদি পূর্ব্বক তাঁহাকে সপরিবারে আহ্বান কবিতে হয়। পূজা শেব হইলে আবাব তিনি এক বৎসবের জন্য চলিয়া যান। তখন বিসর্জ্জন কবিতে হয়। ইহাই কি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, সৎস্বরূপ, পূর্ণব্রহ্মের উপাসনা? ইহাই কি সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরেব সত্তা প্রতিমায় অনুভব করিয়া তাঁহাব পূজায় প্রবৃত্ত হওয়া? বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পুরোহিত প্রতিমায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলে সাকাববাদী বিশ্বাস করেন যে, উহাতে দেবতার অধিষ্ঠান হইয়াছে। আবার বিসর্জ্জনের পর মনে করেন যে, দেবতা স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে দেবতা প্রতিমায় ছিলেন না, বিসর্জ্জনের পরে প্রতিমায় থাকেন না। উহাই সর্ব্বসাধারণেব বিশ্বাস। ইহাই কি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, বিশ্বের প্রাণ, "প্রাণস্য প্রাণম্" অন্তবাত্মা পরমাত্মার উপাসনা? *

এদেশের প্রচলিত পৌত্তলিকতা কেবল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা নহে। আশ্চর্য্য, সুন্দব, ভয়ঙ্কর, স্বাভাবিক, পদার্থ সকলের পূজাও তাহার অন্তর্গত। চন্দ্রসূর্য্য, নদী পর্ব্বত, বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী সকলই এই পূজার অন্তর্গত। তেজঃপুঞ্জ দিবাকর, সাকারবাদীব পূজনীয়। "জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং"। জবাকুসুমেব ন্যায় বর্ণ, কশ্যপেব পুত্র, মহাজ্যোতিবিশিষ্ট, অন্ধকার বিনাশক, সকল পাপ বিনাশকাবী দিবাকবকে প্রণাম কবি। সূর্য্যেব প্রণামমন্ত্র উচ্চাবণ কবিয়া সাকাববাদী কেমন ভক্তিব সহিত তাঁহার পূজা কবেন। ইহাই কি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, পরব্রহ্মের উপাসনা। সূর্য্যের ন্যায় চন্দ্রও একটী বিশেষ দেবতা। সাধারণ বিশ্বাসানুসারে তাঁহার রোহিণী প্রভৃতি অনেকগুলি স্ত্রী আছে। ইহাব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকিলেও তাহাব সহিত প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসের কোনও সম্বন্ধ নাই।

প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসকে বিজ্ঞান বিনাশ করিতেছে। বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে গিয়া ছাত্র উপযুক্ত পবিমাণ হাইড্রোজিন ও অক্সিজিন একত্র কবিলেন, অমনি জল উৎপন্ন হইল। এই প্রত্যক্ষ পবীক্ষায় ছাত্র বুঝিতে পারিলেন যে, জল মূল ভূত নহে। কেবল তাহাই নহে, সেই সঙ্গে সঙ্গে জলাধিষ্ঠাত্রী বরুণ দেবতাও চিরকালের জন্য চলিয়া গেলেন। যে ব্যক্তি নিজে জল সৃষ্টি করিতে পারে, তাহাব কি আর জলের কর্ত্তা বরুণ

* ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ১ম ভাগ ১১৯ পৃষ্ঠা দেখ।

* ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ১ম ভাগ দেখ।

দেবতায় বিশ্বাস থাকা সম্ভব? বিশেষ পরিমাণ নাইট্রোজিন ও বিশেষ পরিমাণ অক্সিজিন একত্রিত করিলে বায়ুর উৎপত্তি হইল। অমনি পবনদেব চিরকালের জন্ম চলিয়া গেলেন। সূর্য্য যে জড়পিণ্ড মাত্র, বিশেষ কোন দেবতা নহে, বিজ্ঞান ইহা প্রকাশ করিতেছে। সূর্য্য কি কি পদার্থে নির্ম্মিত (Composition of the sun), পণ্ডিতেরা তাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে নির্দ্ধারণ করিতেছেন।

অজ্ঞান ও মূর্খতা হইতেই সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারেব উৎপত্তি। শিশু ঘড়ি দেখিলে উহাকে জীবিত পদার্থ বলিয়া মনে করে। ঘড়ি যে একটী কল, প্রাকৃতিক শক্তিতে চলিতেছে, ইহা সে বুঝিতে পাবে না। সে উহাতে জীবন ও জ্ঞান দেখিতে পায়। উহাকে যন্ত্রমাত্র বলিয়া মনে কবিতে পাবে না। এদেশে যখন প্রথম (East Indian) ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলেব গাড়ি চলিয়াছিল, তখন মাঠের চাষারা দেবতা জ্ঞানে উহাকে প্রণাম কবিয়াছিল। পূর্ব্ব বাঙ্গলা বেলওয়ে খোলা হইলে পবেও তদনুরূপ ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়। কৃষ্ণনগবেব নিকট দোগেছে গ্রামে একটী অদ্ভুত, বিশেষ প্রকাব আকৃতি বিশিষ্ট শাম্মলীবৃক্ষ আছে। চতুঃপার্শ্বস্থ অবোধ গ্রামবাসীগণ উহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে।

যে কারণে শিশু ঘড়িকে প্রাণ ও জ্ঞানবিশিষ্ট বলিয়া মনে করে, যে কারণে রেলের গাড়ি দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়াছিল, যে কারণে দোগেছের শিমুলগাছ দেবতা হইয়া পূজা গ্রহণ করিতেছে, সেই কারণেই প্রকৃতি রাজ্যে বহুপ্রকার আশ্চর্য্য, ভয়ঙ্কর, সুন্দরী ও উপকারী পদার্থও দেবতা বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। ঐ সকল যে প্রাকৃতিক পদার্থ, প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা চলিতেছে, ইহা অজ্ঞান অবোধ লোক বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারা সহজ নহে। উহা বহুকালের জ্ঞানোন্নতির ফল। অকূল ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র যে জলরাশি মাত্র, অভ্রভেদী হিমাচল যে জড়পিণ্ড মাত্র, সাগরগামিনী পরমহিতকারিণী নয়নানন্দদায়িনী ভাগিরথী যে জলস্রোত মাত্র, গগনবিহারিণী বিশ্ব উজ্জলকারিণী মহাশক্তিশালিনী সৌদামিনী যে জড়শক্তি মাত্র, ইহা বুঝিতে পাবা বহুযুগ ও বহু বংশব্যাপী জ্ঞানোন্নতি সাপেক্ষ। এই সকলকে জড় ও জড়ীয় শক্তি বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করা যুগ যুগান্তরের জ্ঞান চর্চ্চার ফল। এখন শিক্ষিত লোকের নিকটে যাহা সহজ বোধ্য, আদিম মনুষ্যের নিকটে তাহা কখনই সেরূপ ছিল না। বর্ত্তমান সময়েও পৃথিবীর অজ্ঞান মূর্খলোকেব অবস্থা কতক পবিমাণে আদিম মনুষ্যের সদৃশ।

আমাদেব দেশেব অনেক লোক মনে কবেন যে, সামান্য মূখ লোক ধর্ম্মহীন হইয়া থাকিবে বলিয়া প্রাচীন মহর্ষিগণ পৌত্তলিকতার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাদের কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। প্রশান্ত মহাসাগরেব দ্বীপসকলে যে সকল অসভ্য জাতি বাস করিতেছে, তাহাদেরও ধর্ম্ম আছে, তাহারাও দেব দেবীর পূজা করে। ঋষিবা কি তাহাদিগকেও পৌত্তলিকতা শিখাইতে গিয়াছিলেন? মূর্খ লোকে দোগেছের শাম্মলী বৃক্ষ পূজা করিতেছে। ঋষিরা কি উহা শিখাইতে আসিয়াছিলেন?

এই প্রকার পৌত্তলিকতা ভিন্ন অন্যরূপ পৌত্তলিকতা আছে; তান্ত্রিক মূর্ত্তিপূজা।

ঐ সকল নিশ্চয়ই রূপক। কালীমূর্ত্তি, দশ-ভূজা মূর্ত্তি, রূপক বলিয়াই সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। দশ হস্ত,—আদ্যাশক্তি দশদিক্ রক্ষা করিতেছেন। ত্রিনেত্রা,—তিন কাল দেখিতেছেন। সিংহবাহিনী, অসুর নাশিনী,—মহা পরাক্রমে জগতের অমঙ্গল বিনাশ করিতেছেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক ও গণপতি সঙ্গে, অর্থাৎ আদ্যাশক্তি ধন, বিদ্যা, জয় ও সিদ্ধিদায়িনী। এইরূপ তান্ত্রিক মূর্ত্তিপূজার অনেক প্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু লোক তাহা বুঝে না। লোকে সে ভাবে ঐ সকলের অর্চ্চনা করে না। লোকের নিকটে ঐ সকল, বিশেষ বিশেষ শক্তিবিশিষ্ট বিশেষ বিশেষ দেবতা।

কোন্ দেবতা আদি কারণ ?

কেবল তাহাই নহে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক আপনার দেবতাকেই সকলের আদি ও সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানেন। বৈষ্ণব জানেন, বিষ্ণু সকলেব আদি। তাঁহা হইতে শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি সকল দেবতা উৎপন্ন হইয়াছে। শিব ব্রহ্মা প্রভৃতি সকল দেবতা বিষ্ণুর অধীন ও আজ্ঞাকারী। শৈব বিশ্বাস করেন যে, শিব সকলের আদি। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতা তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে,—ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতা শিবেব অধীন ও আজ্ঞাকারী। শাক্ত মনে করেন, শক্তি সকলের মূল। বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মাদি, সকল দেবতাই শক্তি হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, প্রভৃতি সকল দেবতাই শক্তির অধীন ও আজ্ঞাকারী।

হিন্দু সম্প্রদায় সকলের মধ্যে এই গুরুতর মত বিরোধ বর্ত্তমান। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতে যে বিরোধ দেখিতেছি, শাস্ত্রেও সেই বিরোধ। বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিষ্ণুই প্রধান, অন্য সকল দেবতা তাঁহা হইতে উৎপন্ন ও তাঁহার অধীন। শৈবশাস্ত্রে শিবই প্রধান, অন্য সকল দেবতা তাঁহা হইতে উৎপন্ন ও তাঁহার অধীন। শাক্ত শাস্ত্রে শক্তিই প্রধান; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশাদি সকল দেবতা তাঁহা হইতে উৎপন্ন ও তাঁহার অধীন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রভৃতি বৈষ্ণব পুরাণে বিষ্ণু সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহা হইতে ব্রহ্মা শিব ও অন্যান্য দেবতার উৎপত্তি হইয়াছে; আবার এই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে অন্য কোন খণ্ডে দুর্গা ও গণেশ পরমেশ্বররূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে ব্রহ্মা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শিবপুরাণে মহাদেব সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে দুর্গা পরমেশ্বররূপে বর্ণিত। পুরাণ সকলের মধ্যে এইরূপ অনৈক্য।

> ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ সর্ব্বেষামীশ্বরশ্চৈক এব সঃ।
> সর্ব্বেষাং পরমাত্মা চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
> ব্রহ্মাদয়শ্চ তস্যাংশা তস্যাংশশ্চ মহাবিরাট্।
> তস্যাংশশ্চ বিরাট্ ক্ষুদ্রস্তস্যাংশা প্রকৃতিঃ স্মৃতা॥
> পদ্মনাভে র্নাভিপদ্মান্নিঃসসার পুমান্ মুনে।
> কমণ্ডলুধরঃ শ্রীমান্ তপস্বী জ্ঞানিনাম্বরঃ।
> চতুর্ম্মুখ স্তং তুষ্টাব প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা॥
> এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো দ্বিধারূপো বভূব হ।
> বামার্দ্ধাঙ্গে মহাদেবো দক্ষিণে গোপিকা পতিঃ॥
> শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ শতকোটিরবিপ্রভঃ।
> ত্রিশূলপট্টিশধরো ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরো হরঃ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে, প্রকৃতি খণ্ডে, নারায়ণ নারদ সংবাদে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে, মহর্ষি নারদ সৃষ্টি প্রকরণ বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়া নারায়ণের নিকটে প্রশ্ন করিলেন। নারায়ণ তাঁহাকে বলিতেছেন।

হে মুনে! শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। তিনিই সকলের পরমাত্মা এবং তিনি সমস্ত

ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর। ব্রহ্মাদি দেবগণ,মহাবিরাট্ ও ক্ষুদ্র বিরাট্ সকলেই তাঁহার অংশসম্ভূত এবং প্রকৃতিও তাঁহার অংশমধ্যে পরিগণিতা। পদ্মনাভ নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে কমণ্ডলুধারী,তপস্বী, জ্ঞানীগণের শ্রেষ্ঠ চতুর্মুখ ওষ্ঠ্যবান্ এক পুরুষ নিঃসৃত হইয়াছিলেন। সেই পুরুষ উক্তরূপে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্মতেজে দ্বারা প্রকাশমান থাকিয়া সেই আদি কারণ শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিতেছেন। ইত্যবসরে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় শরীরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। বামভাগের অর্দ্ধ অঙ্গে মহাদেব এবং দক্ষিণ ভাগে গোপিকাপতি মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। বামভাগে যিনি উৎপন্ন হইলেন, তাঁহার মূর্ত্তি বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় নির্ম্মল, তাঁহার প্রভা শতকোটি সূর্য্যসঙ্কাশ, তাঁহার হস্তে ত্রিশূল ও পট্টিশ, তাঁহার পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং তাঁহার নাম হর।

সৃষ্টিপালনসংহারশক্তয় স্ত্রিবিধাশ্চ যাঃ।
ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশানাং সা ত্বমেব নমোহস্তু তে॥
যদাজ্ঞয়া বাতি বাতঃ সূর্য্য স্তপতি সন্ততং।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নি স্তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং॥
যদাজ্ঞয়া চ কালশ্চ শশ্বৎ ভ্রমতি বেগতঃ।
মৃত্যুশ্চরতি জন্তোঘে তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং॥
স্রষ্টা সৃজতি সৃষ্টিঞ্চ পাতি পাতা যদাজ্ঞয়া।
সংহর্ত্তা সংহরেৎ কালে তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহং॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে গণপতিখণ্ডে ৪৬ অধ্যায়।

পরশুরাম গণেশের দন্তভগ্ন করাতে তাঁহার প্রতি ভগবতী ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। আপনাকে বিপন্ন দেখিয়া নারায়ণের পরামর্শে তিনি এইরূপে দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। হে দেবি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই তিন জন যে সৃষ্টি স্থিতি সংহার, এই ত্রিবিধশক্তি ধারণ করেন, তুমি সেই শক্তিস্বরূপা; অতএব হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। যাঁহার আজ্ঞানুসারে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ এবং অগ্নি দহন করিতেছে, আমি সেই দুর্গাকে প্রণাম করি। যাঁহার আজ্ঞাক্রমে কাল নিরত বেগে ভ্রমণ করিতেছে এবং মৃত্যু জীবগণের উপরি নিরন্তর বিচরণ করিতেছে, আমি সেই দুর্গাকে প্রণাম করি। যাঁহার আজ্ঞার অনুগত হইয়া ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণু জগৎ পালন করিতেছেন এবং মহাদেব যথাকালে বিশ্বসংহার করিতেছেন, আমি সেই দুর্গাকে প্রণাম করি।

সর্ব্বশক্তিস্বরূপের মনয়া শক্তিমজ্জগৎ।
অনয়া শক্তিমান্ কৃষ্ণো,নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
সৃষ্টিং কর্ত্তুং শক্তশ্চ বিনা শক্ত্যানয়া বিনা।
বয়মস্যাঃ প্রসূতাশ্চ ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥
সুরসংঘেঽসুরগ্রস্তে কালে ঘোরতরে দ্বিজ।
তেজঃসু সর্ব্বদেবানামাবির্ভূতা পুরা সতী॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে গণপতিখণ্ডে ষট্চত্বারিংশৎ।
অধ্যায়ে পরশুরামের প্রতি বিষ্ণু বাক্য।

হে দ্বিজ। এই দেবী সর্ব্বশক্তি স্বরূপা। ইহার দ্বারা সমস্ত জগৎ শক্তিযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ-নির্গুণ। কৃষ্ণ ইহাদ্বারা শক্তিমান্। সুতরাং এই শক্তি ব্যতিরেকে তিনি সৃষ্টি কার্য্যে সমর্থ নহেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, আমরা ইহা হইতেই প্রসূত হইয়াছি। পূর্ব্বে কোন ঘোরতর সময়ে দেবগণ অসুরদিগের দ্বারা বিপদ্গ্রস্ত হইলে সমস্ত দেবতার তেজোরাশিতে এই সতী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণে প্রথম অংশে সপ্তম অধ্যায় লিখিত আছে, যে একদা ব্রহ্মার ক্রোধ হইলে, তাঁহার ললাটদেশ হইতে রুদ্রদেব উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে সাবর্ণিকে মন্বন্তরে দেবীমাহাত্ম্যে মধুকৈটভ

বধপ্রস্তাবে ব্রহ্মা ভগবতীতে এইরূপে স্তব করিতেছেন,—"সংসার পালনে বিষ্ণু, সৃষ্টি-কার্য্যে আমি, সৃষ্টি-সংহারে মহাদেব, আমরা এই তিনজন এই তিন কার্য্যের নিমিত্ত তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি" ইত্যাদি। আবাব শিবপুরাণে আছে, যে মহাদেব, ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুব সৃষ্টিকর্ত্তা। "অথাস্য দক্ষাংশত ঈশ্বরস্য যজ্ঞে জগৎসৃষ্টিকবোঽজজন্মা। বামাঙ্গতো বিষ্ণুবভূদ্ধিদাত্মা। নীলোঽপি রুদ্রো হৃদয়াৎ তু হর্ত্তা॥ শিবপুবাণ, দ্বিতীয় অধ্যায়।

মহেশ্বর সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার দক্ষিণ অংশ হইতে জগৎ সৃষ্টিকর্ত্তা পদ্মযোনি ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করিলেন এবং বামাঙ্গ হইতে বিশ্বসংসারের হিতকারক বিষ্ণু প্রাদুর্ভূত হই-লেন, অনন্তব রুদ্রদেব নিজ হৃদয় হইতে স্বস্বরূপে নীললোহিত নামে সংহাবকর্ত্তৃত্বে প্রকাশিত হইলেন। শিবপুবাণে আছে যে, মহাদেব স্তবে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকার্য্যে ও বিষ্ণুকে পালনকার্য্যে ভাব দিয়াছিলেন।

যথা।

ভো। রক্তাঙ্গ। ব্রহ্মরূপী ভবাণ্ড, জগৎসর্ব্বং রজসা ত্বং সৃজস্ব। অসৌ কৃষ্ণঃ পাতু এতত্ সর্ব্বং, ত্রিভিগুণে শ্চাচ্ছাদিতোঽহং স্বশক্ত্যা॥

হে রক্তাঙ্গ! তুমি অচিবাৎ ব্রহ্মরূপ ধারণ পূর্ব্বক বজোগুণদ্বারা সমস্ত জগৎ সৃজন কব, এবং এই কৃষ্ণ সমুদয় বিশ্বমণ্ডল রক্ষা করুন। আর আমি নিজ শক্তি বলে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়দ্বারা আচ্ছাদিত রহিলাম।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু, শিবের আজ্ঞালাভ করিয়া তাঁহাকে পূজা কবিলেন, এবং নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

'সংপূজ্যৈনং সর্ব্বভূতান্তরস্থং
ব্রহ্মাচ্যুতৌ কৃতকৃত্যৌ তু ভূত্বা।
পৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণং বিষ্ণুরেষঃ
তত্তদ্বাক্যং পালয়ামাস সর্ব্বং।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ এই মহাদেবকে পূজা করিয়া কৃতকৃত্য হইলেন। পরে বিষ্ণু ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক মহে-শ্বরের সেই সমস্ত বাক্য যথানিয়মে পালন করিয়াছিলেন।

যাঁহারা বলেন, যে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদি পবমেশ্বরেব বিভিন্ন নামরূপমাত্র,—সকল দেবতাই এক; তিনি বিষ্ণু, তিনিই শিব ইত্যাদি, পুরাণ পাঠ করিলে তাঁহাদেব কথা অশাস্ত্রীয় ও অমূলক বলিয়া সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কোন পুরাণে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবের সৃষ্টিকর্ত্তা, ব্রহ্মা ও শিব বিষ্ণুব অধীন; আবার কোন পুরাণে শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মার সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু ও ব্রহ্মা শিবের অধীন। এরূপস্থলে কেমন করিয়া বলিব যে সকলই এক, কেবল পবমেশ্বরের নাম রূপের প্রভেদমাত্র? শাস্ত্রের কোন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বব মহাশক্তি ভগবতী হইতে প্রসূত হইলেন। আবাব কোথাও বা বর্ণিত হইতেছে যে, সমুদয় দেবতার তেজোরাশিতে ভগবতীর উৎপত্তি।

সুরসংঘেঽসুরগ্রস্তে কালে ঘোরতরে দ্বিজ।
তেজঃসু সর্ব্বদেবানামাবির্ভূতা পুরা সতী॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে গণপতিখণ্ডে ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ে পরশুরামের প্রতি বিষ্ণুবাক্য।

সমুদয় শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে, অল্প-বুদ্ধি মূর্খ লোকের চিত্তের স্থৈর্য্যের জন্য বিবিধ দেবমূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে।

নির্ব্বিশেষং পরংব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্ত্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দা স্তেঽনুকম্প্যন্তে সবিশেষ নিরূপণৈঃ॥

যে সকল মন্দবুদ্ধি মানব নির্গুণ পর-মাত্মার সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ নহে, সবিশেষ কল্পনাদ্বারা সেই সমস্ত মূঢ়গণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ হইয়াছে।

ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা জন্ম মৃত্যুর অধীন।

কেবল ইহাই নহে। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশাদি দেবগণ জন্ম মৃত্যুর অধীন, ইহাও শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশাদি দেবতা ভূতজাতয়ঃ।
নাশমেবানুধাবন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥
কুলার্ণব ১ম উল্লাস।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ প্রভৃতি দেবগণ এবং সমস্ত জীব কেবল বিনাশের পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে, অতএব সকলেই শ্রেয়ঃ আচরণ করিবে।

ব্রহ্মাবিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বা বা ভূতজাতয়ঃ।
নাশমেবানুধাবন্তি সলিলানীব বাড়বং ॥
যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

সলিল সকল যেমন বাড়বানলের পশ্চাৎ ধাবমান হয়, সেইরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং অন্যান্য প্রাণিগণ বিনাশেরই অনুধাবন করিতেছে।

অগ্নৌ তিষ্ঠতি বিপ্রাণাং হৃদি দেবো মনীষিণাং।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্র বিদিতাত্মনাং ॥
কুলার্ণব ৯ম উল্লাস।

ব্রাহ্মণগণের দেবতা অগ্নিতে, মনস্বীগণের দেবতা হৃদয়ে, অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণের দেবতা প্রতিমাতে, আর যাঁহারা আত্মজ্ঞ, তাঁহাদিগের দেবতা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছেন।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

বুদ্ধঘোষ।

ধর্ম্মজগতে বুদ্ধঘোষ ভারতের একটী উজ্জ্বল রত্ন। তৎপ্রণীত বিশুদ্ধিমার্গ সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্রের সার স্বরূপ। ইহা পাঠ করিলে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্যকরূপে জানিতে পারা যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম যে কি, তাহা এক্ষণে ভারতবাসীগণ কিছুই জানেন না। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিকৃত ব্যাখ্যা পাঠ করিয়া আমরা বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত মতের অনুসরণ করিয়া থাকি। বিশুদ্ধিমার্গ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম হইতে বিভিন্ন ধর্ম্ম নহে, ইহা হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানমার্গাবলম্বীগণের একটী শাখাভেদ মাত্র। বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্ম না বলিয়া বৌদ্ধমার্গ বা বৌদ্ধপন্থা বলা উচিত। বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের প্রধান প্রধান বিষয়ে যে সকল সামঞ্জস্য আছে, তাহা অন্য কোনও ধর্ম্মের সহিত নাই। প্রথমতঃ গৃহস্থাশ্রমী হিন্দু ও বৌদ্ধ, ইহাদের ধর্ম্মগত কোন প্রভেদ ছিলনা এবং পরস্পর বিরোধ বা বাক্‌বিতণ্ডা হইত না। হিন্দুগণ নাস্তিককে যেরূপ ঘৃণা করিয়া থাকেন, বৌদ্ধগণ তাহাদিগকে তদপেক্ষা আরও অধিক ঘৃণা করিতেন। হিন্দুরা ব্রাহ্মণকে যেরূপ যথেষ্ট মান্য করেন, বৌদ্ধরাও সেইরূপ করিতেন। কোনও বৌদ্ধগৃহস্থের বাটীতে কার্য্য উপস্থিত হইলে তিনি বৌদ্ধভিক্ষু ও ব্রাহ্মণগণকে তুল্য সম্মান করিয়া নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক সমাদরে ভোজন করাইতেন। তবে পল্লীতে পল্লীতে অর্থাৎ হিন্দু সন্ন্যাসীগণের সহিত বৌদ্ধভিক্ষুগণের শাস্ত্র সম্বন্ধে মুক্তিমার্গ লইয়া তর্ক বিতর্ক হইত। কিন্তু এরূপ কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, বৌদ্ধ বা হিন্দুগণ পরস্পর অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেন। হিন্দুরাজগণ কর্ত্তৃক যে বৌদ্ধগণ বিনষ্ট হইয়াছেন বা বৌদ্ধধর্ম্মের লোপ পাইয়াছে, এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক; বাস্তবিক মুসলমানগণই বৌদ্ধগণের উচ্ছেদ সাধন

করিয়াছেন। দেখিতে পাওয়া যায়, ভারতের তৎকালীন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণই বৌদ্ধগণের নেতা ছিলেন। তাঁহারা উক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিতেন বা প্রচার করিতেন, তাহাই সর্ব্ববাদীসম্মত হইত। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ সকল লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কেবল গ্রন্থগুলি কেন, উক্ত মহাত্মাগণের নাম পর্য্যন্ত ভারতবাসীগণ বিস্মৃত হইয়াছেন। মগধবাসী যে বুদ্ধঘোষ এ সময়ে সিংহলযাত্রা করিয়া বিশুদ্ধিমার্গ রচনা পূর্ব্বক ধর্ম্ম জগতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, যে দীপঙ্কর এক সময়ে তিব্বত দেশে গমন পূর্ব্বক তথায় ধর্ম্মপ্রচার করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, আজ ভারতবাসীগণ তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছেন। ঐ সকল মহাত্মাগণের পূর্ব্বকীর্ত্তি ভারতে পুনর্ব্বার প্রখ্যাত করিবার জন্য ও বৌদ্ধধর্ম্ম যে প্রকৃত কি, তাহা সাধারণকে বুঝাইবার জন্য আমরা প্রথমে পূর্ব্বোক্ত মহাত্মাগণরচিত পুস্তক প্রকাশিত করিবার ইচ্ছায় বৌদ্ধধর্ম্ম-গ্রন্থ-প্রচারিণী নামক একটী সভা সংস্থাপিত করিয়াছি। যদি ঐ সভা দ্বারা প্রাচীন গ্রন্থ সকল প্রচারিত হয়, তাহা হইলে সেই সকল গ্রন্থের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রভৃতি দ্বারা আমরা দেখাইব যে, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রকৃত কি এবং কত শত সাধু মহাত্মাগণ, যাঁহাদের নাম করিলেও মনে অপরিসীম আনন্দের উদয় হয়, উক্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষ ভাবে গ্রন্থাদি রচনা করিয়া জগতের উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। আর যদি এই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে ভারতের যে পূর্ব্ব-ইতিহাস উদ্ধার করা হইবে, এ কথা আর কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করার পক্ষে বৌদ্ধসাহিত্য শাস্ত্র যে প্রধান উপায়, তাহা কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় পণ্ডিতগণ, সকলেই একমুখে স্বীকার করিয়া থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এই স্থলে সদ্ধর্ম্মসংগ্রহ নামক পালি গ্রন্থ হইতে বুদ্ধঘোষের একটী সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম।

ত্রিপিটক লিখিত হইবার ৫১৬ বৎসর পরে লঙ্কাদ্বীপে মহানামা নামে এক রাজা ছিলেন। সেই সময়ে ভারতভূমির মধ্যদেশান্তর্গত বুদ্ধগয়ার নিকটস্থ কোন স্থানে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বুদ্ধঘোষ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদে সম্যক্‌রূপে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন ও সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ঐ সময়ের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। ভারতের নানা গ্রাম, জনপদ ও রাজধানী পর্য্যটন করিয়া পণ্ডিত ও শ্রমণ ব্রাহ্মণগণের সহিত তিনি সর্ব্বদা শাস্ত্রতর্ক করিতেন, তর্কে কেহই তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারিত না। তিনি সকলকেই স্বীয় অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও বুদ্ধিবলে পরাস্ত করিয়া একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় আর কোনও পণ্ডিতই তাঁহার সহিত শাস্ত্রতর্কে অগ্রসর হইতে সাহসী হইতেন না। সমস্ত ভারতভূমি পরিভ্রমণ করিতে করিতে ঘটনাক্রমে একদিন তিনি কোন একটী বৌদ্ধ বিহারে উপস্থিত হইলেন। তথায় শত শত বৌদ্ধভিক্ষু বাস করিতেছিলেন। আয়ুষ্মান রেবত নামক একজন প্রসিদ্ধ স্থবির ঐ ভিক্ষু সংঘের অধিনায়ক ছিলেন। উক্ত স্থবির মহাশয় পার্থিব পদার্থের ভোগাভিলাষ বা তৃষ্ণার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। কিসে

পরের মঙ্গল হইবে, এই চিন্তাতে সর্ব্বদা রত থাকিতেন। ব্রাহ্মণ-তনয় বুদ্ধঘোষ উক্ত স্থবির রেবতের বিহারে যাইয়া রাত্রিদিন তারস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তখন স্থবির মহাশয় ব্রাহ্মণ-তনয়ের স্বাধ্যায় উচ্চারণ প্রণালী শ্রবণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এই ব্রাহ্মণ-তনয় নিশ্চয়ই মহা প্রজ্ঞাশালী, ইহাকে বৌদ্ধমার্গ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য"। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওহে ব্রাহ্মণ। গর্দ্দভের ন্যায় বৃথা চীৎকার করিতেছ কেন ?" প্রত্যুত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ওহে প্রব্রজ্যা শ্রমাবলম্বিন্! তুমি কি এই গর্দ্দভ চীৎকারের কি অর্থ, তা জান ?" স্থবির বলিলেন, "হাঁ আমি জানি!" তখন ব্রাহ্মণ বেদত্রয় ও ইতিহাসাদির যে সকল দুরূহস্থল মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণেরও বোধগম্য নহে, সেই সেই স্থল ব্যাখ্যা করিবার জন্য স্থবির মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন। স্থবির মহাশয় বৌদ্ধমার্গ অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে ঐ সকল দুরূহ শাস্ত্র তন্ন তন্ন করিয়া মীমাংসা করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁহার কিছুই কষ্ট বোধ হইল না। প্রত্যুত: ঐ সকল শাস্ত্রের ভূরি ভূরি বিরোধ প্রদর্শন করিয়া, অসারতা প্রমাণ করিয়া দিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আমি ত আপনার শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিলাম ; এক্ষণে আমি আপনাকে বৌদ্ধমার্গের বিষয় কিছু প্রশ্ন করিব, তাহা আপনাকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।" এই বলিয়া অভিধর্ম্ম বা বৌদ্ধদর্শনশাস্ত্র হইতে কয়েকটী পালি বা বুদ্ধবচন উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণ উহার অর্থ করিতে অক্ষম হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মন্ত্র কাহার ?" স্থবির মহাশয় বলিলেন, "ইহার নাম বুদ্ধমন্ত্র।" তখন ব্রাহ্মণ উক্ত মন্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলে পর রেবত তাঁহাকে প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়া উক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে বলিলেন। মন্ত্রলাভে একান্ত উৎসুক ব্রাহ্মণ-তনয় তৎক্ষণাৎ উক্ত আশ্রম গ্রহণ করিলেন ও রেবতকের নিকট পিটকত্রয়াত্মক বুদ্ধবচন সম্যকরূপে অধ্যয়ন করিয়া সূর্য্য বা চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ভগবান বুদ্ধের ন্যায় তাঁহার গুরুগম্ভীর স্বর হইল। এই নিমিত্ত তিনি মহীতলে বুদ্ধঘোষ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। বুদ্ধঘোষ জ্ঞানোদয় নামে একখানি প্রকরণ ও ধর্ম্মসঙ্গিনী নামক পুস্তকের অর্থশালিনী নামক টীকা রচনা করেন। রেবত তাঁহার গ্রন্থ লিখিবার অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া বলিলেন, "বুদ্ধঘোষ, ভারতের ত্রিপিটক গ্রন্থের অর্থকথা বা টীকা নাই। আচারীয়বাদ বা স্থবিরবাদ সম্বন্ধে কেহই ব্যাখ্যা পুস্তক লিখেন নাই, মহামতি মহীন্দ্র এই সকল শাস্ত্র-গ্রন্থের সিংহল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ঐ সকল ব্যাখ্যা পুস্তক এক্ষণে উক্ত দ্বীপে প্রচলিত আছে। তুমি সিংহলে গমন করিয়া ঐ সকল ব্যাখ্যা পুস্তক পুনর্ব্বার মাগধী ভাষায় অনুবাদ কর। তৎকৃত গ্রন্থ সর্ব্বলোকে হিতকর হইবে।" বুদ্ধঘোষ উপাধ্যায় কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহাকে ও ভিক্ষুসংঘকে বন্দনাপূর্ব্বক সিংহলগমনে তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করিলেন ও নাগাপট্টন পর্য্যন্ত পদব্রজে গমন করিলেন। সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া লিখিবার জন্য তাঁহাকে হরিতকী ফল এবং লেখনী প্রদান করিলেন। নাগাপট্টন হইতে তিনি জলপথে

সিংহলদ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন। পথে স্থবির বুদ্ধদত্তের সহিত তাঁহার দেখা হইল এবং উভয়ে নানাবিধ কথোপকথনে সময়াতিবাহিত করিতে লাগিলেন। সুতরাং গমন জন্য কোনও ক্লেশই অনুভব হইল না। তিনি যে সময়ে লঙ্কাপত্তনে উপস্থিত হইলেন, তখন পূর্ব্বোক্ত মহানামা রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। অনুরাধপুরের মহাবিহারে তিনি সিংহল ভাষায় লিখিত অর্থকথা ও সমগ্র স্থবিরবাদ পাঠ করিতে লাগিলেন। সংঘপাল নামক একজন স্থবির উক্ত বিহারের অধিনায়ক ছিলেন। অর্থকথা পাঠে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, তাহাতে যেরূপ ব্যাখ্যা আছে, ধর্ম্মস্বামী বুদ্ধদেবের তাহা যথার্থই অভিপ্রেত। অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে, তিনি তথায় ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "হে স্থবিরগণ। আমি অর্থকথা মাগধী ভাষায় অনুবাদ করিতে ইচ্ছা করি, আপনাদের নিকট উক্ত পুস্তকের যে ভিন্ন ভিন্ন পুথি আছে, তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমায় প্রদান করুন।" তখন ভিক্ষুগণ, তিনি ঐ কার্য্যে সম্পূর্ণ সক্ষম কি না, তাহা জানিবার জন্য, তাঁহাকে দুইটী গাথা অনুবাদ করিতে দিলেন। তিনি উহা সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়া স্ব স্ব পুস্তক প্রদান করিলেন। আয়ুষ্মান বুদ্ধঘোষ পালিভাষায় লিখিত পিটকত্রয় ও সিংহল ভাষায় লিখিত অর্থকথা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া ঐ সকল পুস্তকের সারস্বরূপ বিশুদ্ধিমার্গ নামে একখানি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করিলেন। তখন দেবতাগণ তাঁহার পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার রচিত পুস্তকখানি অন্তর্হিত করিয়া লইয়া গেলেন। পুস্তক চুরী যাওয়াতে কাজে কাজেই তাঁহাকে পুনর্ব্বার পুস্তক রচনা করিতে হইল। তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ পুস্তকখানিও আবার অদৃশ্য হইল। সুতরাং অসাধারণ অধ্যবসায়ী বুদ্ধঘোষ তৃতীয় বার পুস্তক রচনা করিলেন। এইবার দেবতাগণ তাঁহার পূর্ব্বকৃত পুস্তকদ্বয়, সন্তুষ্ট হইয়া, প্রত্যর্পণ করিলেন। অনন্তর বুদ্ধঘোষ ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করিয়া ঐ তিনখানি পুস্তক দেখাইলেন। তাঁহারা পুস্তকত্রয় মিলাইয়া দেখিলেন, তিনখানি গ্রন্থেই কোনও রূপ বিভিন্নতা নাই। কি গ্রন্থ সংখ্যা, কি অক্ষর সংখ্যা, কি ব্যঞ্জনাসংখ্যা, কি পূর্ব্বাপরপারম্পর্য্য, কি স্থবিরবাদ, কি রচনাপ্রণালী, কোনও বিষয়েই পুস্তকত্রয়ের পার্থক্য নাই। দেবতাগণ আকাশমার্গে অকালে বিদ্যুল্লতা প্রকাশ করিয়া বুদ্ধঘোষকে সাধুবাদ প্রদান করিলেন। এবং ঐ বিহারে সহস্র সহস্র ভিক্ষুক একত্র সমবেত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিতে লাগিলেন যে, ইনি নিশ্চয়ই মৈত্রেয় নামক বোধিসত্ব, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য এই দ্বীপে আবির্ভূত হইয়াছেন। সিংহলরাজ এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া উক্ত মহাবিহারে আগমনপূর্ব্বক আয়ুষ্মান বুদ্ধঘোষকে বন্দনা করিয়া নিজগৃহে পদার্পণ করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। এইরূপে বুদ্ধঘোষ সিংহলে সকলের নিকট সম্মান ও প্রতিপত্তিলাভ করিলেন এবং ভিক্ষুগণ উক্ত মহাবিহারের দক্ষিণ ভাগে স্থিত প্রধানাগার নামক একটী স্থান তাঁহার বাসের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। তিনি তথায় অবস্থানপূর্ব্বক নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ ও সমন্ত প্রসাদিকা-নামে বিনয়পিটকের অর্থকথা ও অন্যান্য অনেক পুস্তক রচনা করিলেন।

এইরূপে সিংহলে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া ও সিদ্ধমনোরথ হইয়া মহাবোধি-বন্দনা করিবার জন্য বুদ্ধঘোষ পুনর্ব্বার ভারতভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র দাস।

অদ্ভুত পাগ্‌লীর গান।

(ভ্রাতা মহাশয় ঘোর liberal, বিধবা ভগ্নীকে পুনর্ব্বিবাহ করিতে সনির্ব্বন্ধে অনুরোধ করিলেন। ত্রিকুলে ঐ পিসতুতো ভাই ছাড়া হতভাগিনীর আর কেহ ছিল না, কিন্তু পতিপরায়ণা সাধ্বী ভ্রাতার বাক্যে কর্ণপাত করিল না। তাহার পর উৎপীড়ন, ঘোর উৎপীড়ন। তাহার পর মস্তিষ্করোগ ও অন্তিমে বাতুলতা। অভাগিনী তাহার অর্দ্ধ সজ্ঞান অবস্থায় (lucid intervals) এই প্রকার একটা গান গাইত।)

হো হো হো *; সধবা করিতে চায়।
(এরা) চির বিরহের, কত যে আমোদ,
কিছুই বোঝে না হায়।
হো হো হো, সধবা করিতে চায়।
(তার) করে কর রাখি, চরণে চরণ,
(তার) অধরে অধর, আননে আনন,
(আমি) বিভলা রঙ্গিণী, বিবশা মোহিনী,
পীরিতি-অমিয়া, পিই অনুক্ষণ।
যেন রে চাঁদনি মধুযামিনীতে।
যেন রে শেফালি শারদী নিশীথে।
কুসুমের বাস, সঙ্গীতের সুর,
কতই সুখেতে প্রাণ ভরপুর।
বোঝান' এদের দায়।
হো হো হো, সধবা করিতে চায়।
(এবে) সুখের তিয়াসা, রূপের পিয়াসা,
আশা প্রাণ-নাশা, ভোগের লালসা,
প্রাণের মাঝারে, ছাড়ি নিজ বাসা,
চলিয়ে গেছে কোথায়।

(এবে) শুধু ভালবাসা, শুধু ভালবাসা,
প্রাণের মাঝারে ভায়।
সুধাংশু মণ্ডলে, যেন রে রোহিণী।
অম্বুনিধি মাঝে, যেন রে তটিনী।
আপনা বিলায়ে, আপনা বিকায়ে,
আপনা ডুবায়ে, আপনা হারায়ে,
আমি যে আছি গো বসি।
তাহা বোঝান' এদের দায়।
হো হো হো, বর খুঁজিতে চায়।
(ছিল) একটি আমার স্বামী——
(এখন্) নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
শিশুর নধর অধর ভিতরে,
যুবার শোভার কহ্লার সায়রে,
যুবতীর স্থির আঁখির মাঝারে,
(মোর) শত শত স্বামী ভায়।
শিবের চকিত ত্রিনেত্র ভিতরি,
বিশ্ব যুড়ি যেন রাজরাজেশ্বরী।
অর্জ্জুনে বুঝাতে বিশ্বের আভাস,
মদনমোহন মূরতি প্রকাশ।
(এরা) দেখেও দেখে না হায়।
হো হো হো, সধবা করিতে চায়!
(আগে) সিন্দূরে দিতাম ফোঁটা—
(এবে) মদন-সায়ক, তরুণ অশোকে,
উষা-মনোলোভা তরুণ আলোকে,
আঙুল ডুবায়ে—বুক পূরে সুখে,
(আমি) পরি গো নবীন ফোঁটা।
উষার ললাটে যেন শুকতারা।
হরের উরসে অলক্তক ধারা!

* হো হো হো এই তিন শব্দ এক নিশ্বাসে পাঠ করিতে হইবে।

অতনু মোহিনী, সুধীরে চুমিয়া,
পতিভালে যেন দিয়াছে বজ্রিয়া।
এমনি মোহন ফোঁটা।
(এরা তা) দেখেও দেখে না হায়।
(আবার) বরটি খুঁজিতে যায়।
(আগে) একটি চুম্বন পেলে,
শিথিল হইত তনু—
খোঁপাটি খসিত, চাঁপাটি ঝরিত,
কটির কিঙ্কিণী বাজিয়া উঠিত,
সরমে ভরমে, নুপুর কাঁদিত,
পদতলে রুণু রুণু।
(এবে) নিশি নিশি হয় কত জাগরণ।
(কভু) জানি না শীৎকার, রোম শিহরণ,
(কভু) ফোটেনা নয়নে একটি বচন।
অটুট চারিটি বাহুর বাঁধন।
ঘোচে না প্রেমের নেশা।
(আমি) কায়া পাছে ছায়া আছিরে লাগিয়া,
সৌরভ যেন রে কুসুমে বেড়িয়া,
শ্যামলতা যথা পল্লবের মাঝে,
কোমলতা যথা কুসুমে বিরাজে,
তেমতি অভেদ তনু।
(এরা) বুঝেও বুঝেনা হায়—
হো হো হো, বিয়ে দিতে গো চায়!
(এবে) উরস-কলসে কাঁচলি বাঁধিয়া,
গোলাপি কুসুমি রঙে ছোপাইয়া,
কত শত বাসে কটিটি আঁটিয়া,
ঢাকি এ মোহন তনু,
বসন্তে যেন রে পুরুষে লোভাতে,
সে মহা কবির প্রাণটি ভোলাতে,
বিশ্বরঙ্গভূমে মোহিনী অপ্সরা,
চির হাস্যময়ী, মাধুরীতে ভরা,
আপনার রূপে আপনি মগনা,
মোহিনী প্রকৃতি, অনন্ত যৌবনা।
উরসে তাহার, শুয়ে শুয়ে হাসে,
মুচকি কুসুম-ধনু!
(বাজে) মধুর মধুর, চরণ নুপুর
রাধার পায়ের, কনক ঘুঁঘুর
যমুনা পুলিনে জনু।
(এসব) বোঝান এদের দায়।
হো হো হো, সধবা করিতে চায়।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সেন।

পুলিস ও লোকরক্ষা। (২)

মুসলমানদিগের রাজত্বের শেষ ভাগে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে দস্যুতার সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছিল। ব্রিটিস অধিকারের প্রারম্ভে দস্যুদল একান্ত প্রবল হইয়া সর্ব্বত্র ধনপ্রাণের উপরে অত্যাচার করিতে লাগিল। এই সময়ে উত্তরে হিমালয়ের কোটিদেশ হইতে দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ এবং পশ্চিমে কচ্ছদেশ হইতে, পূর্ব্বে আসাম পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ ঠগীর প্রাদুর্ভাবে সশঙ্কিত ও প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশের সহস্র সহস্র পথিক লোক দেশান্তরে কার্য্যোপলক্ষে অথবা তীর্থ যাত্রার উদ্দেশে বহির্গত হইয়া আর গৃহে প্রত্যাগত হইত না। একাকী বা দলবদ্ধ হইয়া যাউক না কেন; পদব্রজে, ঘোটকে বা যানে যাত্রা করুক না কেন, অরণ্যে, প্রান্তরে, পান্থশালায়, বা গ্রামের অভ্যন্তরে অবস্থান করুক না কেন; লোক সকল দলে দলে কোথায় কিরূপে যে অকস্মাৎ অমুদ্দেশ হইত, তাহার ঠিকানা থাকিত না। বণিক, পথিক,

সৈনিক প্রভৃতি সকলেরই সমান অবস্থা। কাহারও নিস্তার ছিল না। জমিদার, মুস্তাজর, সহর কোতওয়াল, পাটেল, সীমানাদার, ফাড়িদার, চৌকীদার, গৃহস্থ প্রভৃতি ঠগদিগের সহায় এবং অপহৃত দ্রব্যের অংশ বা উপস্বত্বভোগী। এক এক প্রদেশের গ্রামকে গ্রাম ফাঁসুড়ে মানুষমারা ঠগ। দোহাই দিবে কার? শুনেই বা কে? ঠগের কার্য্য বোধ হয় অনেকে অবগত নহেন। এই কার্য্য প্রায় আড়ম্বর শূন্য। ইহাতে গোলমাল হয় না। ঠগেরা পার্য্যমানে অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করে না। এক খানি রুমাল বা কোমরবন্ধনী অথবা খানিকটা দড়ি দ্বারা অনায়াসে অল্প সময় মধ্যে কার্য্য সম্পাদন করে। ঠগীকার্য্যে ব্রতী হইলে কিছুদিন রুমাল বা দড়ি ঘুরাইয়া ফাঁস দেওয়া শিখিতে হয়। ইহাতে সম্পূর্ণরূপে পরিপক্কতা লাভ না করিলে হত্যাকার্য্যের ভার গ্রহণে অধিকারী হয় না। ভারতবাসীদের সকল কার্য্যই ধর্ম্মমূলক। হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি সর্ব্বজাতীয় ঠগেরা ভবানীদেবীর উপাসক। এই দেবতার প্রসাদে হত্যাকার্য্যে সফলতা লাভ করিয়া থাকে বলিয়া ঠগদিগের বিশ্বাস। এই দেবতার প্রীতি কামনায় ঠগেরা অক্ষুব্ধ চিত্তে স্ত্রী বালক বৃদ্ধ সকলেরই প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ঠগেরা দলে দলে নানা বেশে দেশে দেশে নিয়ত পরিভ্রমণ করিত। স্থানে স্থানে পথিকদের সঙ্গে মিলিত হইয়া বহুদিনের পথ পর্য্যন্ত যাইত ও বন্ধুভাব ভাণ করিত। পথিমধ্যে নদী, বন, পর্ব্বত আদি সুবিধা মত স্থান পাইলে, স্নান, আহার বা বিশ্রাম করিবার সময়ে এক এক জন পথিকের নিকটে এক একজন ঠগ দাঁড়াইত বা বসিত এবং দলপতির মুখ হইতে ঝিরনী অর্থাৎ সঙ্কেতসূচকবাক্য নির্গত হইবা মাত্র রুমাল বা দড়ি অতর্কিতরূপে গলায় দিয়া এরূপ হেচ্‌কা টান মারিত যে, আক্রান্ত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বিবশ ও বিগতপ্রাণ হইত। পরে দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া মৃত দেহ সকল অল্প সময় মধ্যে গাড়িয়া ফেলিত, অথবা নদী, বন বা গিরিগহ্বর মধ্যে নিক্ষেপ করিত। পথিমধ্যে ঠগে ঠগে সাক্ষাত হইলে সঙ্কেতসূচক বাক্য প্রয়োগের পর সমানধর্ম্মা জানিয়া পরস্পর পরিচিত এবং মিলিত হইত।

উপরিকথিত শ্রেণীর ঠগদিগকে ফাঁসুড়ে ঠগ বলে। ইহারা ব্যতীত ধুতুরিয়া, মেঘপুন্যা, মরীয়া, খেকারী, কাকুই, ঠগভাট প্রভৃতি বিবিধ নামধারী ঠগ আছে। ধুতুরিয়া ঠগেরা ধুতুরা ও কুচ্‌লিয়ার বীজ প্রভৃতি বিষাক্ত দ্রব্য-চূর্ণ নিকটে রাখে। পথিকদিগের সঙ্গে বহু দিনের পথ পর্য্যন্ত যাইতে যাইতে সুযোগ বুঝিয়া খাদ্য সামগ্রীতে এই চূর্ণ মিশাইয়া দেয়। কখন কখন পথশ্রান্তি দূর হইবে বলিয়া আপনারা সরবৎ সঙ্গে এক প্রকার চূর্ণ দিয়া তাহা পান করে এবং পথিকদিগের সরবতে বিষাক্ত চূর্ণ মিলাইয়া দেয়। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে পথিকেরা মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায় এবং অচেতন হয়। এই অবকাশে ঠগেরা লুটতরাজ করিয়া চলিয়া যায়। যদি কোন পথিক সংজ্ঞালাভ করিয়া পুনর্জীবিত হয়, তবে তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি জন্মের মত বিলুপ্ত বা বিকৃত হইয়া যায়।

অন্যান্য নামধারী ঠগেরাও কখন কখন রুমাল আদি, কখন বা বিষাক্ত দ্রব্য দিয়া

লোকজনকে মারিয়া ফেলে। মেঘপুঞ্জা ঠগের দলভুক্ত সুদুরিয়া ও ধনোজী ব্রাহ্মণেরা যোগী বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া বিচরণ করে। ইহারা পথিকদলের মধ্যে পিতা মাতা প্রভৃতি বড় বড় লোকদিগকে মারিয়া ছোট ছোট সন্তান সন্ততিগুলিকে লইয়া বিক্রয় করে। বালক অপেক্ষা বালিকাদিগকে অধিক মূল্যে নটজাতীয় ও অন্যান্য ঠগদিগের নিকটে বিক্রয় করা ইহাদের একটি বিশেষ কাজ। অদ্যাপি অনেক ঠগ ছদ্মবেশে স্ত্রী বিক্রয় কার্য্য অবলম্বন করিয়াছে।

ঠগভাটেরা ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রে বিচরণ করিয়া থাকে। সিন্ধু নদের অপর পারে, পদ্মা ও মেঘনার ধারে, সমুদ্র তীরে, রাজপুতানার প্রান্তরে, দ্বীপ ও উপদ্বীপে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা তত মারাত্মক নহে। কিন্তু চুরি করাই ইহাদের কার্য্য। ইহারা দিবাভাগে লোকের চক্ষের উপরেও চুরি করিতে সমর্থ। ইহাদের বালকেরা বড় চতুর এবং চৌর্য্য কার্য্যে সুশিক্ষিত। বাজার, হাট, মেলা ও পথিকদিগের বিশ্রাম স্থানে বালকেরা ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। ইহাদের সঙ্গী বড় বড় স্ত্রী পুরুষেরা কিয়দ্দূরে স্থানে স্থানে দাঁড়াইয়া থাকে এবং মাথা, নাক, কাণ আদিতে হাত দিয়া সঙ্কেত করে। বালকেরা বেড়াইতে বেড়াইতে এরূপ চালাকি সহকারে জিনিষ পত্র তফায়ত করে যে, অনেকে তাহা তখন বুঝিতে পারে না। বুঝিতে পারিলেও বালকদিগকে অথবা সঙ্গী বড় লোকদিগকেও ধরিয়া কোন ফল হয় না। ইহারা অল্পক্ষণ মধ্যে অতি চতুরতা সহকারে হাতে হাতে অপহৃত জিনিষ বহুদূরে চালান করিয়া দেয়।

কখন কখন ঠগেরা পথিকদিগকে আকর্ষণ করিবার উদ্দেশে রূপবতী যুবতীদিগকে পথিমধ্যে স্থানে স্থানে বিচরণ করিতে দেয়, এবং আপনারা অনতিদূরে অন্তরালে থাকে। যুবতীরা তেমন তেমন পথিক দেখিলে আলুলায়িত কেশে ও সজল নয়নে পথপ্রান্তে বসিয়া কাঁদিতে অথবা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতে থাকে, এবং কোন কাল্পনিক বিপদ ঘটনার কথা প্রকাশিয়া আপনার সহায়হীনতা ব্যক্ত করে। কোন পথিক দয়ার্দ্রচিত্ত অথবা যুবতীর রূপলাবণ্যে প্রলোভিত হইয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলে, স্ত্রী লোকটি পথিকের গলায় ফাঁস দেয় এবং ঠগেরা অন্তরাল হইতে অকস্মাৎ বহির্গত হইয়া অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করে। কখন কখন কোন অশ্বারোহী পথিক এইরূপ যুবতীকে অসহায়া বোধে নিজ অশ্বপৃষ্ঠে চাপাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে বিপন্ন হইয়াছে।

বলশালী ও অস্ত্রধারী মোসলমান পথিক লোকালয় না পাইলে পথিমধ্যে অশ্ব হইতে প্রায় অবতরণ করেনা। ঠগেরা বন্ধুভাবে বহুদূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে যাইয়াও তাহাকে আয়ত্ত করিতে কৃতকার্য্য হয় না। এই নিমিত্ত দুই তিন জন রোগা ঠগ অগ্রে চলিয়া যায়। তন্মধ্যে একজন সুবিধা মত স্থান দেখিয়া নিঃশ্বাস বায়ু স্তম্ভন পূর্ব্বক মৃতকল্প হইয়া পথপ্রান্তে শুইয়া পড়ে। অপর ব্যক্তি তাহার উপরে একখান কাপড় ঢাকা দিয়া রাখে এবং মোসলমান পথিক নিকটবর্ত্তী হইলে অকস্মাৎ মৃত আত্মীয় ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টি কার্য্য করিতে অসমর্থ হইয়া সাহায্য প্রতীক্ষা করিতেছে বলিয়া ছলনা করে। এমত সময়ে সহায়তা না

করিয়া চলিয়া গেলে ধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্য করা হয় বলিয়া ধার্ম্মিক মোসলমান পথিক অশ্ব হইতে যেমন অবতরণ করে, অমনি ঠগের ফাঁসে জড়িত ও বিনষ্ট হয়। ফলতঃ ঠগদিগের ফন্দী ও চাতুরীর ইয়ত্তা নাই। সময়ে সময়ে অবস্থা বিশেষে ইহারা লোকের ধন প্রাণ হরণ করিবার উদ্দেশে যে কত প্রকার ছল ও কৌশল অবলম্বন করে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না এবং এই কার্য্যে ইহাদের যে কি পরিমাণ দক্ষতা ও সাহসিকতা, তাহা শুনিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

ব্রিটিস অধিকারের পর ক্রমে দশ, বিংশতি, অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক কাল অতীত হইয়া গেল, ঠগী-অত্যাচার নিবারণের কোন বিশেষ উপায় অবলম্বন করা হইল না। কোম্পানি বাহাদুরের নিযুক্ত ইংরাজগণ কেবল এদেশের যাবতীয় বিষয়ের উপরি ভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সামাজিক ও লৌকিক অবস্থার অভ্যন্তর দর্শন ও অগাধ পাপাচার প্রথার ভিতরে অবগাহন করিতে সহসা সমর্থ হইলেন না। এই নিমিত্ত সাহেবদিগের প্রতি তত দোষা-রোপ করিবার বিশিষ্ট কারণ নাই। বিলাতে সুশিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই তিন শ্রেণীর লোক আছে, সাহেবেরা সকলে অবগত। এদেশেও সেই রূপ ব্যবস্থা হইবে, সকলের ধারণা ছিল। কিন্তু এই দেশে ঠগী,ডাকাইতি, চুরি আদি যে পুরুষ-পরম্পরা-গত ও ধর্ম্মানুমোদিত ব্যবসায়; ঠগ, ডাকা-ইত, চোর আদি যে দিন দিন জন্ম গ্রহণ করিয়া পরিবর্দ্ধিত ও প্রতিপালিত হইতেছে, অরণ্যবাসী হিংস্র জন্তুর ন্যায় ভারতবাসী মানবজাতি স্বজাতির প্রতি যে নিয়ত নিষ্ঠুরা-চরণ করিয়া থাকে, এই সমস্ত অবস্থা অবগত হওয়া সভ্য বৈদেশিকদিগের পক্ষে নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।

কালক্রমে ঠগদিগের পাপাচারের প্রবাহ ভারতভূমি ছাপাইয়া উঠিল। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে লেপটেনেণ্ট মন্‌সেল্ সাহেব ঠগের হাতে পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন। ইতি পূর্ব্বে বিভিন্ন সৈন্যদলের কতকগুলি সেপাহি অবকাশ লইয়া বাটী যাইবার সময়ে, কেহ কেহ বা বাটী হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে ঠগদিগের হাতে মারা পড়িয়াছিল, প্রকাশ হইতে লাগিল। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাক্তার সেরউডসাহেব মহোদয় সর্ব্ব প্রথমে ঠগদিগের ভীষণ অত্যাচারের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া মান্দ্রাজ লিটেরবী জর্নেল নামক সংবাদপত্রে প্রচারিত করিলেন। এই বিস্ময়া-বহ বৃত্তান্ত ভারতবর্ষবাসী ও বিলাতের সাহেবগণ প্রথমতঃ বিশ্বাস করিতে পারি-লেন না। এইরূপ একান্ত অলৌকিক ও রোমহর্ষণ বৃত্তান্ত সহসা বিশ্বাস করিবার কথাও ছিল না। যাহা হউক, এই সময় হইতে অনেকেরই চিত্ত এই বিষয়ে আকৃষ্ট হইল। চতুর্দ্দিকে এই বিষয়ের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। এই ভীষণ অত্যাচার সম্যকরূপে নিবারণ করিবার নিমিত্ত তৎ-কালের গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদনুসারে উচ্চপদস্থ সাহেব-গণ অনুসন্ধানের কার্য্যভার নিজ নিজ হস্তে লইলেন। কর্ণেল স্লীমান, মেজর বার্থউইক, কাপ্তেন রেনোল্ডস্, হেন্‌লী সাহেব মহোদয়দিগের যত্ন ও পরিশ্রমে শত শত ঠগ ধৃত ও দণ্ডিত হইতে লাগিল। কতকগুলি ঠগকে গোয়েন্দা করা হইল।

গোয়েন্দারা হত্যাবিষয়ে অদ্ভুত বৃত্তান্ত বলিতে বলিতে বিভিন্ন স্থান হইতে শত শত নিহত ব্যক্তির শুষ্ক, গলিত ও অভিনব লাশ সকল বাহির করিয়া দেখাইতে লাগিল। মাজিষ্ট্রেটের তাম্বুর নিকটে, ফকীরের আস্তানায়, সন্ন্যাসীর আশ্রমে, দেবালয় ও পান্থশালার পার্শ্বে, নদীতীরে, বৃক্ষমূলে, যেখানে সেখানে মৃতদেহ সকল বাহির হইতে লাগিল। এই বীভৎস ব্যাপার সন্দর্শনে সাহেবদিগের ঘৃণা ও অরুচি জন্মিল। সন্দিগ্ধচিত্ত মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি যে যে সাহেবেরা ঠগদিগের অদ্ভুত কার্য্য বিশ্বাস করিতেন না, তাঁহাদের চক্ষু স্থির হইল। এইরূপ বিস্ময়াবহ ব্যাপার জানিয়া শুনিয়াও নেজামত আদালতের জজেরা প্রমাণের পারিপাট্য খুঁজিতে গিয়া কতকগুলি প্রকৃত ঠগকে ছাড়িয়া দিলেন। ইহাতে ঠগেরা আবার উৎসাহিত হইয়া অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। বিচার বিষয়ে বিলাতী বিচিত্র সূক্ষ্মতার বিষময় ফল ফলিতে লাগিল। ইহার প্রতিবিধান নিমিত্ত ১৮৩৬ অব্দের ৩০ আইন এবং ১৮৩৭ অব্দের ১৮ আইন জারী করা হইল। স্থানে স্থানে ঠগ বলিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইতে লাগিল ও মৌলবীর নিকট ফতোয়া লওয়ার প্রথা রহিত হইল। স্থানে স্থানে পৃথক পুলিস এলেখা সকল সংস্থাপিত হইল। কোম্পানি বাহাদুরের সে সকল ফৌজদারী আদালতে উল্লিখিত মহাত্মা কর্ণেল স্লীমান প্রভৃতির প্রযত্নে ঠগেরা আবার দলে দলে ধৃত ও দণ্ডিত হইতে লাগিল। শত শত ঠগের প্রাণদণ্ড ও সহস্র সহস্র ঠগের দ্বীপান্তর, নির্ব্বাসন ও দীর্ঘ কারাবাস দণ্ড হইল। তৎকালের নূতন গবর্ণর জেনারেল লর্ড অকলাণ্ড বাহাদুরের আমলে ঠগদিগের বাসায় বাসায় আগুন লাগান হইল। মাছের তেলে মাছভাজা যে উত্তম কল্প, ইহা সাহেবেরা বুঝিয়া লইলেন। গোয়েন্দা ঠগদিগের নিকটে অনেক নূতন নূতন বিষয় জানিয়া যে যে করদ রাজ্যের যে সকল স্থানে ঠগেরা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তথায় তাহাদিগকে আক্রমণ করা হইল। সৌভাগ্যক্রমে মিত্ররাজগণ ঠগদিগের গ্রেপ্তার বিষয়ে সম্যকরূপে সহায়তা করিতে লাগিলেন। ঠগদিগের পূর্ব্ব আশ্রয়দাতা জমিদার ও মস্তাজর প্রভৃতি ভীত ও সশঙ্কিত হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকেই তাড়িত ও উপদ্রুত হইয়া ঠগের দল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। সর্ব্বপ্রকার ঠগী অত্যাচার একবারে উন্মূলিত না হউক, ইহার মূলদেশে কঠিন কুঠারাঘাত পড়িল। ফাঁসুড়িয়া ঠগের বংশ বিলুপ্তপ্রায় হইল। হাইদ্রাবাদ, রাজপুতানা, বুন্দেলখণ্ড, দুয়াব প্রভৃতি ভয়াবহ স্থান সকল নিরুপদ্রব হইল এবং দেশে পুনর্ব্বার শান্তি সংস্থাপিত হইল।

ধন্য ব্রিটিস পুরুষকার। ধন্য কোম্পানী বাহাদুরের বিক্রম বিস্তার! ঝালনের রাজা দুইজন প্রসিদ্ধ ঠগকে হস্তীপদদ্বারা নিহত করাইয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়াছিল, সিন্ধিয়া রাজ মাধোজী ৭০ জন ঠগের প্রাণদণ্ড করিয়া রক্তবমন করিতে করিতে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, অন্যান্য রাজা দেবানুগৃহীত ঠগদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া নির্ব্বংশ হইয়াছিল বলিয়া দেশে দেশে মিথ্যা রটনা করিয়া ঠগেরা ভারতবাসীদিগকে ভয়বিহ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু কোম্পানী বাহাদুরের হেক্‌মতের অগ্রে এইরূপ ছলনা ঠগদিগের কেবল বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইল।

সিন্ধু, পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশে জয়পতাকা সমুত্থিত করিয়া ব্রিটিস-রাজ্যের যত না গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে, মহাশৈল্য-স্বরূপ ঠগী-উৎপাত উদ্ধার পূর্ব্বক ভারতের বক্ষঃস্থল সুশীতল করিয়া ততোধিক যশোলাভ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। অন্য কোন মঙ্গলসাধন না করিয়া ব্রিটিস রাজপুরুষেরা যদি জন্মের মত এখান হইতে স্বদেশে যাত্রা করেন, তথাপি ভারতবর্ষ এই মহোপকারের নিমিত্ত চিরদিন তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতে থাকিবে, সন্দেহ নাই।

কর্ণেল স্লীমান্ প্রভৃতি সদাশয় সাহেবেরা যে সময়ে ঠগী অত্যাচার নিবারণ নিমিত্ত ব্যস্ত ছিলেন, এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম ও বঙ্গদেশ মধ্যে আর এক ভীষণ দস্যুদলের প্রাদুর্ভাব হইল। এই দস্যুদল "ডাকাইত" নামে পরিচিত। ডাকাইতেরা ঠগদিগের ন্যায় কালীঠাকুরাণীর অনুচর ও ভক্ত। ডাকাইতি করিবার পূর্ব্বে কালীর পূজা করিয়া যাত্রা করে। পাঁচ কিম্বা ততোধিক মহাসাহসিক লোক একত্রে মিলিত হইয়া অকস্মাৎ বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক পরধন অপহরণ করিলে ডাকাইতি করা হয়। এই ডাকাইতি পথে, ঘাটে, মাঠে, লোকালয়ে, দিনে ও রাত্রিতে হইয়া থাকে। রাত্রিকালে পরগৃহ আক্রমণ করিলে মশাল জ্বালিয়া থাকে। অবস্থা বিশেষে এই অপরাধের তারতম্য হয়। দেশে অভাব বা দুর্ভিক্ষবশতঃ কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইয়া বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক শস্য বা অন্য খাদ্যদ্রব্য অপহরণ করিলে, বৈরনির্য্যাতন অথবা অত্যাচারকারীকে জব্দ করিবার উদ্দেশে উক্তরূপে অপহরণ করিলে ডাকাইতি করা হয়, কিন্তু এইরূপ ডাকাইতি অপেক্ষা পেশাদার দস্যুরা আপনাদের কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বলপূর্ব্বক পরস্বাপহরণ কার্য্যে যে লিপ্ত হয়, তাহাই অতি-দূষণীয়। রাত্রিকালে সকলে নিদ্রা যাইতেছে, এমত সময়ে অস্ত্রশস্ত্র ও জ্বলন্ত মশাল আদি লইয়া দস্যুরা অকস্মাৎ গৃহস্থের বাটী আক্রমণ করে। উহাদের দাড়ি, গলা ও মাথা কাপড়ে ঢাকা, অথবা কালীমাখা। ভীষণ চীৎকার ধ্বনি ও কপাট সিন্দুক পেটারা আদি ভাঙ্গার শব্দে গৃহস্থ তটস্থ ও ব্যতিব্যস্ত। পলায়নের উপায় থাকে না। দস্যুরা বাটী ঘেরিয়া ফেলে। অর্থ সম্পত্তির নিমিত্ত বাটীর কর্ত্তা ও পরিজনদিগকে ধরিয়া অত্যাচার করে, জ্বলন্ত মশাল ও অস্ত্র দিয়া যাতনা দেয় এবং কখন কখন প্রাণ বধ করে। পরিশেষে টাকা অলঙ্কার ও মূল্যবান জিনিষপত্র লইয়া চলিয়া যায়। ডাকাইতেরা কেবল স্থলেই এইরূপ লুটতরাজ করে, এমত নহে। জলেও ইহাদের বল ও কৌশলের পরিসীমা থাকে না। রাত্রিকালে নৌকাযোগে বড় বড় কিস্তির উপরে চড়াও করিয়া মারিয়া লয়। মাজীরা রাত্রিকালে বহর অর্থাৎ অন্যান্য বহুতর কিস্তি একত্রিত দেখিলে তথায় আপনাদের নৌকা লাগাইয়া বিশ্রাম করে। ইহাতে ডাকাইতেরা আপনাদের লক্ষিত কিস্তির উপরে সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। এমত স্থলে ডাকাইতদলের দুই একজন গভীর রাত্রিতে কাল কাল ভাতের হাঁড়ির গায়ে ছিদ্র করিয়া ও তাহা মাথায় দিয়া জলে ভাসিয়া যাইতে যাইতে যে নৌকায় আক্রমণ করিবে বলিয়া লক্ষ্য করিয়াছে, তাহার কাছি কাটিয়া দেয় এবং নৌকা খানি ধীরে ধীরে ভাসাইয়া লইয়া যায়। বহর হইতে কিছু দূরবর্ত্তী হইলে ডাকাইতেরা ঐ নৌকার উপরে চড়াও করে,

লুটতরাজ করে এবং অনেক সময়ে আরোহী-দিগকে হত বা আহত করে।

পূর্ব্ব উল্লিখিত ঠগী অত্যাচার অপেক্ষা এই ডাকাইতি উৎপাত কম ভীষণ নহে। পথ ঘাটের কথা যাই হউক, লোকালয়েও নিস্তার নাই। আপন ভবন মনুষ্যের সুদৃঢ় শান্তিনিকেতন। পরিশ্রমের পর দিনান্তে লোক নিজগৃহে নিরাতঙ্কচিত্তে পরিবার-বর্গসহ নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে, এমত সময়ে করালমূর্ত্তি দস্যুদল আততায়ী ভাবে অকস্মাৎ সমাগত। তাহাদের সহিত যথোচিতরূপে সাক্ষাৎ করিতে গৃহস্থ অপ্রস্তুত। প্রস্তুত হউক বা না হউক, গৃহস্থ সম্যক্‌রূপে উপদ্রুত, ক্ষতবিক্ষত অথবা নিহত। ঘোর অত্যাচার। স্মরণ করিলে অন্তর গুরগুর করিয়া উঠে, লিখিতে হাত কাঁপিয়া যায়। গৃহস্থের দোষ নাই। রাজার অনবধানতা ও রাজ-শাসন প্রণালীর দোষ, এই কথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিবে। ব্রিটিস অধিকারের সময় হইতে সর্ব্বত্র ডাকাইতির বেশী প্রাদুর্ভাব হয়। এই উৎপাত নিবারণ নিমিত্ত যে কিছু নিয়ম হইতে থাকিল, তাহাতেই ইহার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে বিন্দুর, বুন্দার, বাগুরী, বিন্ধ্য, মঘীয়া, দোশাদ, চামার, কোন, কীচক, বাউরি, বাগ্দী, বেদে, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, গোয়ালা, পান, কান্ড্‌রা প্রভৃতি জাতি হইতে ডাকাইত দলের সৃষ্টি, সেই সেই নীচ জাতীয় লোকেরাই আবার গ্রামরক্ষক চৌকীদার হইয়া অনর্থ বাধাইতে লাগিল। অনেক থানাদার ডাকাইতদিগের পানাদার এবং অনেক জমিদার ও ইজারা-দার থাঙ্গীদার হইয়া দাঁড়াইল। প্রচলিত আইন কানুন ও সংস্থাপিত ম্যাজিষ্টরী ও সেসন আদালত হইতে ডাকাইতি অত্যাচারের দমন হইল না। পাশ্চাত্য জজ,ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়েরা এখানকার ষড়যন্ত্রের ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। (ক্রমশঃ।)

শ্রীবামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়।

সাধক ভেদে ঈশ্বরের নাম ভেদ।

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা।

(১)

কিনামে ডাকিব নাথ। বল গো তোমারে হরি,
সাধকজনে গো ডাকে সদা নানা নাম ধরি,
নানা দেশে নানা নাম আছে গো নাথ তোমারি
ব'লে দেও কোন্ নামে দ্রুত পাপ হ'তে তরি।

(২)

আল্লা ব'লে ডাকে কেহ, কেহ ডাকে প্রাণ হরি,
খ্রীষ্টগণ গড্ (God)বলে,পাপী বলে পাপহারী;
তাপী বলে তাপহারী, ব্রহ্ম বলে ব্রহ্মচারী;
শৈবগণ বলে তুমি, শঙ্কর প্রলয়কারী।

(৩)

বৈষ্ণব ডাকে গো তব "হরেকৃষ্ণ" নাম ধরি;
গাণপত্য বলে নাম শুদ্ধ গণেশ তোমারি,
কর্ম্মকারগণ ডাকে তব ব্রহ্মা নাম ধরি;
রামায়তগণ বলে তুমি রামনামধারী।

(৪)

শাক্তগণ বলে তুমি হও শিবের শঙ্করী;
দুর্গাকালী জগদ্ধাত্রী নামত্রয় হে,তোমারি;
কেহবা ডাকে গো তব ব্রহ্মময়ী নাম ধরি,
ব্রাহ্মগণ ডাকে ব্রহ্মসনাতন নাম করি।

(৫)

যে নামে হইব সিদ্ধ, বল সে নাম তোমারি,
অজ্ঞান পুত্রেরে বল তব কোন নাম ধরি
ডাকিলে তরিতে পারি ? বিলম্ব সহেনা হরি,
বল বল দয়া করি।সত্য নাম হে তোমারি।

(৬)

তুমি বিনা গতি নাই, ওহে ভবের কাণ্ডারী।
অনুপায় দেখে আমি চরণে ধরেছি হরি;
হরি নাম মিষ্ট লাগে তাই হরি নাম ধরি,
ডাকি হে তোমায় নাথ ওহে পাপি-তাপহারী।

(৭)

কখন তোমাকে ডাকি প্রাণনাথ ব'লে হবি;
যখন যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে নাম করি।
বিচিত্র ভাবের সহ বিচিত্র নাম তোমারি,
সতত করিযা থাকি হে প্রাণ শীতলকারী।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

বাঙ্গালার ইতিহাসের একটী অধ্যায়।

ইংরেজ যখন বাঙ্গালায় আপনাদেব আধিপত্য স্থাপনে উদ্যত হয়েন, তখন ঘটনাব পর ঘটনার তরঙ্গে সমগ্র বঙ্গ আন্দোলিত হইয়া উঠে। বিপক্ষেব চক্রান্তে হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার অধঃপতন হয়। মীরজাফর নবাবেব পদ গ্রহণ কবেন। শেযে মীরজাফবেব অধোগতি হয়। মীরকাসেম বঙ্গেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন। অল্প্যায় সময়ে মীরকাসেমের অদৃষ্টচক্র নিম্নগামী হয়। বৃদ্ধ মীবজাফব আবার বাঙ্গালাব সিংহাসনে আবোহণ করেন। কিছু দিন পবে তাঁহাব লোকান্তব প্রাপ্তি হয়। এই সময়ে লর্ড ক্লাইব বাঙ্গালাব শাসন কার্য্য সুব্যবস্থিত কবিবার জন্ম বিলাত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগত হয়েন।

ক্লাইবের প্রত্যাবর্ত্তনেব চারি মাস পূর্ব্বে জবাজীর্ণ মীরজাফব, সংসারের নানা কষ্ট ভোগ কবিয়া, নানা অবমাননা সহিয়া, অবশেষে শান্তিময় মৃত্যুর ক্রোড়ে শান্তি লাভ করেন। তিনি যে আশায় সিরাজউদ্দৌলার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন, যে আশায় ইংরেজের সহযোগী হইয়া পলাশীর যুদ্ধে আশ্রয়দাতার সমক্ষে উদাসীনভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহাব সে আশা ফলবতী হয় নাই। ইংরেজের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়াতে তিনি সংসারে কিছুতেই সুখী হইতে পারেন নাই। ঐ সম্বন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাকে অধিকতব নিপীড়িত, অধিকতর নিগৃহীত ও অধিকতব অবমানিত করিয়া তুলে। ইংবেজের সহযোগী হইয়া তিনি গভীব মনঃক্ষোভ, অপরিসীম লজ্জা ও অনন্ত বিরক্তি ব্যতীত আব কিছুই লাভ কবিতে পারেন নাই। ইংবেজেব সহিত ঐ ঘৃণিত সম্বন্ধে তাঁহার জীবন শোচনীয়, তাঁহাব রাজ্য বিশৃঙ্খল ও তাঁহাব কোষাগাব শূন্য হয়। ঐ সম্বন্ধেব জন্মই তিনি একবাব বন্দী হইয়া আপনাব জামাতাকে নিজেব সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখেন। যদি তিনি জানিতেন যে, ইংবেজ তাঁহাকে পরিশেষে এইরূপ শোচনীয় দশায় পাতিত করিবেন, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি পলাশী যুদ্ধেব প্রাক্কালে তাঁহাদের সহায় হইতেন না। বিদেশীদিগেব সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের পূর্ব্বে, বাঙ্গালা, বিহাব ও উড়িষ্যাব সুবাদাব মোগলসাম্রাজ্যের প্রভূত ক্ষমতাপন্ন রক্ষক স্বরূপ ছিলেন। তাঁহাব প্রভূত সমৃদ্ধি ছিল। কিন্তু ইংরেজদিগেব সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার সাত বৎসর মধ্যে, তাঁহাদেব সে ক্ষমতা ও তাঁহাদের সে সমৃদ্ধি অনন্তকালসাগরে বিলীন হয়, তাঁহাদের পূর্ব্বতন আধিপত্য ইংরেজের প্রাধান্যপ্রিয়তায় সঙ্কুচিত হয়। ইংবেজেব

সহিত সম্বন্ধে তাঁহারা অবমানিত ও শেষে অস্তিত্বমাত্রে পর্য্যবসিত হন। স্ক্রাফ্টন সাহেব যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালার নবাব কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের মহাজনস্বরূপ, উক্ত কর্ম্মচারীরা আপনাদের ইচ্ছানুসারে, যখন তখন, যত ইচ্ছা টাকা লইতে পারেন।

মীরজাফর লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার উত্তরাধিকারিনির্ব্বাচন রাজনীতির অংশে প্রয়োজনীয় হইল বটে, কিন্তু কোম্পানির অর্থগৃধ্নু ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের অর্থলাভের অংশে উহা অধিকতর আবশ্যক হইয়া উঠিল। তাঁহারা এই সুযোগে আপনাদের মহাজনের কোষাগারে আবার হস্ত প্রসারণ করিলেন। উপস্থিত সময়ে বাঙ্গালার সিংহাসনের দুইজন প্রার্থী ছিল। একজন মিরনের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র, আর একজন মীরজাফরের দ্বিতীয় পুত্র নজম্‌উদ্দৌলা।

নির্ব্বাচনভার কলিকাতাকৌন্সিলের * উপর ছিল। কৌন্সিলের সভাপতি ও সদস্যেরা এই সময়ে কেবল অর্থলাভের দিকে দৃষ্টি রাখিলেন। তাঁহাদের পদের পূর্ব্বতন অধিকারীরা সিরাজউদ্দৌলার স্থলে মীরজাফরকে, মীরজাফরের স্থলে মীরকাসেমকে এবং পুনর্ব্বার মীরকাসেমের স্থলে মীরজাফরকে বসাইতে অনেক অর্থ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এখন মীরজাফরের উত্তরাধিকারিনির্ব্বাচনে তুল্যরূপ লাভবান হইতে ইচ্ছা করিলেন।

উক্ত দুইজন প্রার্থীর মধ্যে মীরজাফরের পৌত্রের বয়স ছয় বৎসর এবং পুত্রের বয়স আঠার বৎসর ছিল। ঐতিহাসিক মিল সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়াতে মীরজাফরের পুত্র নজমউদ্দৌলা ইংরাজদিগকে আশানুরূপ অর্থ দিতে সমর্থ ছিলেন, কিন্তু অপর জন অপ্রাপ্তবয়স্ক, সুতরাং রাজকীয় কার্য্যে তাঁহার নামে অর্থ গ্রহণ করিলে পরিশেষে সেই টাকার হিসাব দিতে হইত। কলিকাতাকৌন্সিল অপ্রাপ্তবয়স্কের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। প্রাপ্তবয়স্কের সহিত অর্থগ্রহণসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা স্থির করিতে উদ্যত হইলেন।

১৭৫৭ অব্দে মীরজাফরের সহিত টাকাকড়ির যেরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছিল, উপস্থিত সময়েও সেইরূপ বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। এই নীচ কার্য্য সাধনের জন্য কৌন্সিলের অন্যতম সদস্য জনষ্টোন সাহেবের ভ্রাতা (ইহার নাম গিডিয়ন জনষ্টোন) ইংরাজপক্ষের প্রতিনিধি হইলেন। অন্য পক্ষে মহম্মদ রেজা খাঁ প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিলেন। এই দুইজন চতুর লোক পরস্পর পরামর্শ করিয়া অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ২০,০০,০০০ টাকার বিনিময়ে, নজমউদ্দৌলা সুবাদার উপাধি প্রাপ্ত হইবেন *। কিন্তু নজম

---

* উপস্থিত সময়ে স্পেন্সর সাহেব কলিকাতা কৌন্সিলের অধ্যক্ষ, এবং জনষ্টোন, সিনিয়র, মিডল্টন, লেসেষ্টর প্লেডেল বার্ডেট এবং গ্রে সাহেব সদস্য ছিলেন।

* নিম্নলিখিত রূপে ঐ টাকার ভাগ হয়:—

স্পেন্সর	২,০০,০০০	টাকা।
জনষ্টোন .	২,৩৭,০০০	"
প্লেডেল, বার্ডেট এবং গ্রে, প্রত্যেকে	১,০০০০০	"
সিনিয়র	১,৭২,৫০০	"
মিডল্টন .	১,২২,৫০০	"
লেসেষ্টর . ..	১,১২,৫০০	"
গিডিয়ন জনষ্টোন ...	৫০,০০০	"

অবশিষ্ট টাকা অতি গোপনীয়ভাবে ভাগ করিবার

উদ্দৌলা সুবাদার হইলেও সমস্ত রাজকীয় কার্য্য মহম্মদ রেজা খাঁর হস্তে সমর্পিত থাকিবে। রেজা খাঁ নায়েব সুবা হইয়া আপনার ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি (১৭৬৫) এই চুক্তি স্থির হয়। নজমউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

মীরজাফরের মৃত্যুর ১৩ দিন পূর্ব্বে বিলাতের ডিরেক্টরদিগের নিকট হইতে একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র কলিকাতায় উপস্থিত হয়। ঐ পত্রে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে, কোম্পানির কর্ম্মচারীরা অতঃপর ভারতবাসীদিগের নিকট হইতে উপহারস্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কোম্পানির কর্ম্মচারিগণ ঐ পত্রে স্বাক্ষর করিতে আদিষ্ট হন *। কিন্তু কলিকাতা কৌন্সিল নজমউদ্দৌলাকে শূন্য উপাধি দিয়া সন্তুষ্ট করিবার সময়ে, উক্ত প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাঁহারা উহা প্রথমে অবজ্ঞার চক্ষে চাহিয়া দেখিতেছিলেন, উহার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া, নজমউদ্দৌলার নিকট হইতে আশানুরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় নাই। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, আপনাদের মতের প্রবলতা হেতু, তাঁহারা যেমন বান্সিটার্টকে পরাজিত করিয়াছেন, সেইরূপে ক্লাইবের ক্ষমতাও বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন।

ক্লাইব কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াই কৌন্সিলের সদস্যদিগকে সমবেত হইতে আহ্বান করিলেন। কৌন্সিলের অধিবেশন হইল। সদস্যেরা আপনাদের প্রাধান্য রক্ষার জন্য নানা চাতুরী অবলম্বন করিলেন। কিন্তু ক্লাইব বান্সিটার্টের ন্যায় দুর্ব্বলহৃদয় ছিলেন না। তিনি অটল গিরিবরের ন্যায় অবিচলিত ভাবে থাকিয়া, আপনার প্রাধান্য রক্ষায় উদ্যত হইলেন। তাঁহার একাগ্রতা ও উদাম কিছুতেই পর্য্যুদস্ত হইল না। অবিলম্বে শাসনসমিতি সংগঠিত হইল। ক্লাইব শাসনসংক্রান্ত ও সৈন্যসংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা আপনার হস্তে লইয়া, সেই ক্ষমতার পরিচালনে উদ্যত হইলেন।

প্রথমে নজমউদ্দৌলার বিষয় সমিতিতে উপস্থিত হইল। কৌন্সিল নজমউদ্দৌলার নিকটে অর্থ গ্রহণ করাতে ক্লাইব যারপরনাই অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এদিকে কৌন্সিলের সদস্যেরা সাহস সহকারে কহিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা এ বিষয়ে ক্লাইবের প্রবর্ত্তিত দৃষ্টান্তেরই অনুসরণ করিয়াছেন। মীরজাফরের সম্বন্ধে ক্লাইব ও তাঁহার সহযোগিগণ যাহা করিয়াছেন, তাঁহারাও নজমউদ্দৌলার সম্বন্ধে তাহাই করিয়াছেন। কিন্তু ক্লাইব নিরস্ত থাকিলেন না। তিনি আপনার পক্ষ সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়া সদস্যদিগকে এই বলিয়া দোষী করিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা বাঙ্গালার সুবাদারী, ক্রয়বিক্রয়ের দ্রব্য স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছেন।

বন্দোবস্ত হয়। নির্লজ্জভাবে যখন এইরূপ টাকা গ্রহণের চুক্তি হয়, তখন কোম্পানির কোষাগার শূন্য ছিল। কোম্পানির কর্ম্মচারীরাই শতকরা ৮ টাকা হার সুদে আপনাদের প্রভুদিগকে টাকা ধার দেন।

* ১৭৬০ অব্দে মে মাসে এই প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত হয়। উহাতে উল্লেখ থাকে যে, কোম্পানির দেওয়ানী ও সৈনিক কর্ম্মচারীরা ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট হইতে যে টাকা লইয়াছেন, তাহা যদি চারি হাজারের বেশী হয়, তাহা হইলে কোম্পানিকে দিতে হইবে এবং তাঁহারা কখনও কোন স্থলে ১০০০ টাকা বা তাহার বেশী উপহার লইতে পারিবেন না। এই প্রতিজ্ঞাপত্র ১৭৬৫ অব্দের প্রথমে কলিকাতায় পঁহুছে। সে সময়ে কোম্পানির কর্ম্মচারীরা উহাতে স্বাক্ষর করেন নাই।

উক্ত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাঁহারা আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। অধিকন্তু তিনি (ক্লাইব) কলিকাতায় উপস্থিত হইলে, পাছে তাঁহাদের সঙ্কল্পসিদ্ধিব বিঘ্ন হয়, এজন্য তাঁহারা তাঁহাব উপস্থিতিব পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি আপনাদেব কার্য্য সম্পন্ন কবিয়াছেন। উৎকোচগ্রাহী সদস্যেরা এই সকল অপবাধ অস্বীকার কবিতে পারিলেন না। তাঁহাবা ক্লাইবকে আপনাদেব ক্ষমতার আয়ত্ত করিতে অনেক চেষ্টা কবিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইল না। ক্লাইবেব নিকটে তাঁহারা অবনত মস্তক হইলেন। তাঁহাদেব প্রাধান্য অন্তর্হিত হইল, ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইল, লাভের পথ নিরুদ্ধ হইয়া গেল। তাঁহাবা অবশেষে কৌন্সিল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে যাইয়া, ক্লাইবের ঘোরতব বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন।

বিলাত হইতে যে প্রতিজ্ঞাপত্র আসিযাছিল, ক্লাইব তাহাতে কোম্পানির কর্ম্মচাবীদিগকে স্বাক্ষব কবিতে আদেশ দিলেন। অসন্তোষেব সহিত এই আদেশ প্রতিপালিত হইল। ক্লাইব এইরূপে কোম্পানিব কর্ম্মচাবীদিগেব উৎকোচগ্রহণের পথ অবরুদ্ধ কবিয়া তাঁহাদেব বাণিজ্যঘটিত বিষয়েব শৃঙ্খলাসাধনে উদ্যত হইলেন। কোম্পানির কর্ম্মচারীরা যেরূপ অবৈধ উপায়ে ব্যবসায় চালাইয়া, রাজ্যের অর্থাপহরণ করিতে ছিলেন, যেরূপ অবৈধ উপায়ে রাজকীয় বিধিব অবমাননা কবিয়া অত্যাচার ও অবিচারের একশেষ দেখাইতেছিলেন, তাহা ক্লাইবেব অবিদিত ছিল না। এই সকল সর্ব্বস্ববিলুণ্ঠনকারী ব্যবসায়ীর দোষে, এতদ্দেশীয় ব্যবসায়ীরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, অত্যাচারের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল এবং পরিশেষে তেজস্বী মীরকাসেম অস্ত্র পরিগ্রহ পূর্ব্বক ইংরেজের শোণিতে আপনার ক্রোধের পরিতর্পণ করিয়াছিলেন। ক্লাইব এই বিলুণ্ঠনের স্রোত সঙ্কুচিত কবিলেন। মীরকাসেম ও বান্সিটার্ট যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, ক্লাইবের চেষ্টায় তাহা অপেক্ষা অধিক হইল। ক্লাইব অভ্যস্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত, অন্তর্বাণিজ্যসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় আপনার আয়ত্ত কবিয়া, তাহা অনেকাংশে সুশৃঙ্খল ও সুব্যবস্থিত করিয়া তুলিলেন।

অর্থলোভী ইংরেজের অর্থলালসাব গতিরোধ হইল। বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয় সুনিয়মিত হইয়া উঠিল। কোম্পানির আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্য অপেক্ষাকৃত শৃঙ্খলার সহিত চলিতে লাগিল। ক্লাইব এক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলেন। এখন উহা অপেক্ষা গুরুতব সাধনা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। যখন ক্লাইব মান্দ্রাজে উপস্থিত হইয়া মীরজাফরের মৃত্যু ও মীরকাসেমের পরাজয়সংবাদ অবগত হন, তখন তিনি বঙ্গে ইংরেজাধিকারেব দৃঢ়তাসাধনার্থ, মনে মনে কতকগুলি বিষয় কল্পনা কবিয়াছিলেন। তাঁহাব কল্পনা ছিল যে, মিরণের ষড়বর্ষীয় পুত্রকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসাইতে হইবে। তাঁহাকে কেবল "সুবাদার" এই শূন্য উপাধি মাত্র দিয়া পরিতুষ্ট রাখিতে হইবে। তাঁহার অমাত্যগণ শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন; কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ইংরেজদিগের হস্তে থাকিবে। ইংরেজেরা রাজস্ব গ্রহণ করিয়া বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রু হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা রক্ষার বন্দোবস্ত করিবেন। তাঁহারাই কেবল যুদ্ধ উপস্থিত করিতে পারিবেন

এবং সন্ধিস্থাপনেও সমর্থ হইবেন। অবশ্য তাঁহাদিগকে নবাবের নামে ও সম্রাটের নিয়োগানুসারে সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে। ক্লাইব এই সকল গুরুতর বিষয় কার্য্যে পরিণত করিবার ইচ্ছা করিয়া, কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, কলিকাতা-কৌন্সিল নজমউদ্দৌলাকে মীরজাফরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ক্লাইব তাঁহাকে নবাব বলিয়া স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু আপনার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি এখন আপনার গুরুতর সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য, হিন্দুস্থানের নামমাত্র সম্রাট শাহ আলমের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলেন।

এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট, এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। শাহ আলমের আধিপত্য ছিল না। তাঁহার রাজধানী আফ্‌গানদিগের হস্তগত হইয়াছিল। এদিকে ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতে অযোধ্যার নবাবেরও পূর্ব্বতন প্রাধান্য অনেকাংশে খর্ব্ব হইয়াছিল। ইঁহারা উভয়েই ক্লাইবের সহিত সন্ধিবন্ধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সুতরাং ক্লাইবের সঙ্কল্পসিদ্ধির পথ কণ্টকিত হইল না। ক্লাইব ২৫এ জুন কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে উপনীত হইলেন। অভিনব নবাব ও তদীয় অমাত্যগণের সহিত তাঁহার কয়েকবার সাক্ষাৎ হইল। কলিকাতা কৌন্সিল তাঁহার আগমনের পূর্ব্বেই যেরূপ তাড়াতাড়ি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছু করিতে না পারিয়া কৌশলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। সম্রাট্ আওরঙ্গজেব যখন দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তখন বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার জন্য একজন নবাব নাজিম নিযুক্ত হইতেন। নবাব নাজিম অন্তঃশত্রু ও বহিঃশত্রু হইতে দেশরক্ষা ও শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য দায়ী ছিলেন। কিন্তু রাজস্বসংগ্রহের জন্য সম্রাট স্বয়ং একজন দেওয়ান নিযুক্ত করিতেন। এই দেওয়ান রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, উহা যথা নিয়মে ব্যয় করিতেন এবং উদ্বৃত্ত অর্থ সম্রাটের কোষাগারে পাঠাইয়া দিতেন। মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশায় বাঙ্গালার সুবাদারগণ স্বপ্রধান হওয়াতে তাঁহারাই রাজ্যরক্ষা, রাজ্যশাসন ও রাজস্বসংগ্রহ করিতে থাকেন। ক্লাইব এখন আওরঙ্গজেবের ঐ প্রণালী, আপনাদের সুবিধার জন্য, কিয়দংশে পরিবর্তিত করিয়া, চালাইতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, প্রথমে তিনি নজমউদ্দৌলাকে নবাব নাজিম করিয়া কোম্পানিকে দেওয়ান করিবেন; পরে, সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যদি সুবিধা বোধ হয়, তাহা হইলে, রাজ্যরক্ষা, রাজ্যশাসন ও বিধিব্যবস্থা পরিচালনের ভার নবাব নাজিমের হস্ত হইতে কোম্পানির হস্তে আনিবেন। সংক্ষেপে কোম্পানিকে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন করিতে হইবে, এবং নবাব নাজিমকে অস্তিত্বমাত্রে পর্য্যবসিত করিয়া তুলিতে হইবে।

ক্লাইব জুলাই মাসে নবাবের সহিত কথাবার্ত্তা স্থির করিলেন। হতভাগ্য যুবক আর কোন উপায় না দেখিয়া বার্ষিক ৫৩,০০,০০০ টাকা লইয়া কোম্পানির হস্তে সমস্ত ক্ষমতা সমর্পণ করিতে সম্মত হইলেন। ক্লাইব ইহার পরে প্রথমে বারাণসীতে উপনীত হন। এই স্থানে অযোধ্যার নবাবের

সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এ সময়ে সম্রাট শাহ আলম এলাহাবাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সুতরাং ক্লাইব ও সুজাউদ্দৌলা, উভয়েই এলাহাবাদে উপনীত হইলেন। ১৭৬৫ অব্দের ১২ই আগষ্ট,ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির ইতিহাসে একটি প্রধান স্মরণীয় দিন। ক্লাইব এই দিনে দিল্লীর মোগল সম্রাটের নিকট হইতে আপনার অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হন। এই দিনে শাহ আলম ইংরেজ কোম্পানিকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সর্ব্বময় কর্ত্তা করিয়া তুলেন। কোম্পানি, এই দিনে, এই সুসমৃদ্ধ,সুবিস্তৃত রাজ্যে সৈন্যপরিচালন, দণ্ডপ্রণয়ন ও লোকশাসনের ভার গ্রহণ করেন। ১২ই আগষ্ট সম্রাট্, ক্লাইবের প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রের অনুমোদন করিলেন। এই গুরুতর ঘটনা বিনা গোলযোগে, বিনা আড়ম্বরে সম্পন্ন হইল। সিংহাসনের অভাবে ইংরেজের খানা খাইবার দুইখানি টেবিল একত্র করিয়া তাহার উপর একখানি চেয়ার স্থাপিত হইল। চেয়ারখানি কারুকার্য্যখচিত বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল। সম্রাট ঐ অপূর্ব্ব সিংহাসনে উপবেশন করিয়া কোম্পানির নামে ক্লাইবের হস্তে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ সমগ্র রাজস্বের ভার সমর্পণ করিলেন *। এতদ্ব্যতীত ঐ তিন প্রদেশ রক্ষার জন্য, সৈনিক ব্যয় নির্ব্বাহের ভার কোম্পানির হস্তে সমর্পিত হইল। কার্য্যতঃ কোম্পানি দেশরক্ষার জন্য সৈন্য রাখিবার অধিকার পাইলেন। ক্লাইবের সাধনা সর্ব্বাংশে সিদ্ধ হইল। তিনি কোম্পানির নামে যে যে অধিকার চাহিলেন, সম্রাট তাঁহাকে তৎসমুদয়ই দিলেন। দেওয়ানীর সহিত সৈন্যসংক্রান্ত সমস্ত অধিকারই এখন কোম্পানির হস্তে আসিল। এইরূপে বিনা গোলযোগে একটি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ গুরুতর রাজনৈতিক ব্যাপার সম্পন্ন হইল। বিষয়ের গুরুতা ও তদনুরূপ কার্য্যপ্রণালীর অভাব দেখিয়া একজন তাৎকালিক মুসলমান ঐতিহাসিক বিরাগের সহিত উল্লেখ করিয়াছিলেন, "এরূপ গুরুতর কার্য্যে এক সময়ে সুবিজ্ঞ মন্ত্রী ও সুদক্ষ দূত পাঠাইবার প্রয়োজন হইত, একটি গাধা বিক্রয় করিতে যত সময় লাগে, তাহা অপেক্ষা অল্প সময়ে সেই বিষয় সম্পন্ন হইয়া গেল।"

ক্লাইব সৈন্যসংক্রান্ত বিষয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য এলাহাবাদ হইতে বারাণসীতে যাত্রা করিলেন, বারাণসী হইতে আবার কলিকাতায় যাইয়া বিচারবিভাগের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন, অনন্তর কলিকাতা হইতে বাৎসরিক রাজস্বের বন্দোবস্ত জন্য ১৭৬৬ অব্দের এপ্রেল মাসে মুর্শিদাবাদে গমন করিলেন। বৎসরের শেষে জমিদারদিগকে মুর্শিদাবাদে উপনীত হইয়া আগামী বর্ষের রাজস্বের বন্দোবস্ত করিতে হইত। এই পুণ্যাহের সভায় নবাব নাজিম, বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার অধিপতিস্বরূপ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ইংরেজ গবর্ণর, সম্রাটের দেওয়ান ও

* এই রাজস্ব হইতে সম্রাটকে বার্ষিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দিতে হয়। আওরঙ্গজেব ও তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারিগণের সময়ে বাঙ্গালার রাজস্ব হইতে বার্ষিক এক কোটি টাকা সম্রাটের কোষাগারে প্রেরিত হইত। ক্লাইবের সময়ে সম্রাট কেবল ছাব্বিশ লক্ষ টাকা লইয়াই পরিতৃপ্ত হন। বলা বাহুল্য, এই রাজস্ব হইতে বাঙ্গালার নবাবকে ত্রিপান্ন লক্ষ টাকা দিতে হইত। এই সময়ে বাঙ্গালার রাজস্ব ৩।৪ কোটি টাকা ছিল। সুতরাং নিয়মিত বৃত্তি দিয়াও কোম্পানি অনেক টাকা প্রাপ্ত হন।

Wheeler, Early Records, p. 334, note

কোম্পানির প্রতিনিধিস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিলেন। যথানিয়মে পুণ্যাহের কার্য্য শেষ হইল। কিন্তু নবাব নাজিম নজমউদ্দৌলা দীর্ঘকাল আপনার শূন্য উপাধি লইয়া মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিলেন না। অমিতাচারে তাঁহার রোগ জন্মিল। তিনি উহাতে ১৮ই মে লোকান্তরিত হইলেন। বাঙ্গালার অভিনব নবাবের নিয়োগসময়ে, ইংরেজেরা মীরজাফর, মীরকাসেম প্রভৃতির সময় হইতে যাহা করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা এখন অতীতের গর্ভে নিহিত হইয়াছিল। ক্লাইব নজমউদ্দৌলাকে অস্তিত্বমাত্রে পর্য্যবসিত করিয়াছিলেন। ইংরেজকে উৎকোচ দিবার জন্য তাঁহার আর অর্থ ছিল না; দান করিবার জন্য তাঁহার আর ভূসম্পত্তি ছিল না। এখন আর মীরজাফর, মীরকাসেম প্রভৃতির সময়ের ঘটনার পুনরাভিনয় হইল না। নজমউদ্দৌলার ভ্রাতা সৈফুউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। অভিনব নবাব নাজিমের বার্ষিক বৃত্তি তিপ্পান্ন লক্ষের পরিবর্ত্তে একচল্লিশ লক্ষ হইল।*

সৈফুউদ্দৌলার সিংহাসনারোহণের সহিত মুর্শিদাবাদের সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গৌরব ও প্রাধান্য অন্তর্হিত হইল। এইরূপে ইংরেজ পলাশীর যুদ্ধের ফললাভ করিলেন; এইরূপে মীরজাফরের উত্তরাধিকারীরা উহার প্রতিফল পাইলেন। পলাশী যুদ্ধের আট বৎসর পরে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারের অদৃষ্টচক্র এইরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। মীরজাফর স্বীয় প্রতিপালকের সহিত ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আপনার জন্য যে বিস্তৃত রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, পলাশীর যুদ্ধের আট বৎসর পরে এইরূপে তাহা পরহস্তগত হইল। ঘোরতর বিশ্বাসঘাতকতার চরম ফল ফলিল। মীরজাফরের উত্তরাধিকারীরা আপনাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্যে জলাঞ্জলি দিয়া ইংরেজের বৃত্তিভোগী হইয়া রহিলেন। ইংরেজ প্রথমে বাণিজ্যের জন্য বাঙ্গালায় কুঠী স্থাপন করিয়া শেষে এইরূপে ধীরে ধীরে আপনাদের অধিকার বদ্ধমূল করেন। ইহা দেখিয়াই অযোধ্যার নবাব ইংরেজদিগকে আপনার রাজ্যে কুঠী স্থাপন করিতে দেন নাই। এলাহাবাদে যখন ক্লাইবের সহিত তাঁহার সন্ধি স্থাপিত হয়, তখন নবাব সন্ধির প্রায় সকল নিয়মেই সম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি চুণার দুর্গ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কোরা ও এলাহাবাদের অধিকার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইংরেজদিগকে আপনার রাজ্যে কুঠী স্থাপনের অধিকার দিতে সম্মত হন নাই। তাঁহার এই অসম্মতির গুরুতর কারণ ছিল। তিনি ঐ কারণ গোপনে রাখেন নাই। বাঙ্গালা প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া তিনি সেই সময়ে ক্লাইবকে স্পষ্ট ভাবে কহিয়াছিলেন, "আপনারা ঐ প্রদেশে বাণিজ্যের জন্য আসিয়াছিলেন, কেবল বাণিজ্য ভিন্ন আপনাদের আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ক্রমে আপনারা ঐ ভূ-খণ্ডের মধ্যে কুঠী স্থাপন করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন, কিছুদিন বিনা গোলযোগে অতিবাহিত হয়, শেষে ক্রমে ক্রমে

* এই দৃষ্টান্ত পরে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ১৭৭০ অব্দে ৪১,০০০০০ টাকার স্থলে ৩১,০০০০০ টাকা হয়। ১৭৯৩ অব্দে ৩১,০০০০০ টাকা আবার ১৬,০০০০০ টাকায় পরিণত হইয়া উঠে।

বিরোধের সূত্রপাত হয়। আপনারা এবং ঐ প্রদেশের ভূপতি ঐ গোলযোগে জড়িত হইয়া পড়েন। এখন সেই ভূপতিই বা কোথায় এবং আপনারাই বা কোথায়? আমি আমার রাজ্য ঐরূপ দশায় পাতিত করিতে অসম্মত হইতেছি। কুঠী স্থাপিত হইলেই, আমার দোষেই হউক, বা আমার উত্তরাধিকারীদিগের দোষেই হউক, নিশ্চিতই গোলযোগ ঘটিবে। তখন—" ক্লাইব ইহার কোন উত্তর দিতে পারেন নাই। কেহই ইহার কোন উত্তর দিতে পারিবেন না। ইংরাজ বাঙ্গালায় কুঠী স্থাপন করিয়াই, বাঙ্গালায় আপনাদের প্রভুত্ব বদ্ধমূল করিয়াছেন।

সিরাজউদ্দৌলার পতনে ইংরাজেরা বাঙ্গলায় যে আধিপত্য লাভ করেন, মীরকাসেমের পতনে সেই আধিপত্য সম্প্রসারিত ও বদ্ধমূল হয়। সিরাজউদ্দৌলা অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণমতি বালক। শিক্ষা তাঁহার হৃদয় পরিমার্জ্জিত করে নাই, বিবেকবুদ্ধি তাঁহাকে সুপথ দেখাইয়া দেয় নাই, বহুদর্শিতা তাঁহার প্রকৃতি উন্নত করিয়া তুলে নাই। তিনি অস্থিরপ্রকৃতি, অদূরদর্শী ও অবিমৃশ্যকারী ছিলেন। তরুণবয়সে ও অশিক্ষিত অবস্থায় একটি সমৃদ্ধ রাজ্যে আধিপত্য লাভ করাতে তাঁহার প্রকৃতি অধিকতর গর্ব্বিত ও অধিকতর উদ্ধত হয়। তাঁহার মাতামহের সময়ে দরবারের যে সকল রাজপুরুষ সম্মানিত হইতেন, সিরাজউদ্দৌলা তাঁহাদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই জন্য সিরাজের অধঃপতন ঘটে। জগৎশেঠ, মীরজাফর, রাজা দুর্লভরাম প্রভৃতি সিরাজের অত্যাচারে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার অধঃপতনের চক্রান্ত করিতে থাকেন। একবার পূর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা সকৎজঙ্গকে সিরাজউদ্দৌলার স্থলে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব হয় *। শেষে ইংরাজদিগের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়া উঠে। ইংরাজ, মীরজাফর, জগৎশেঠ প্রভৃতির সহায়তায় বঙ্গে আপনাদের প্রাধান্য স্থাপন করেন। সিরাজ উদ্ধতপ্রকৃতি ও অবিমৃশ্যকারী ছিলেন বটে, কিন্তু ন্যায়ের অনুরোধে অবশ্য বলিতে হইবে যে, তিনি ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইবার পরে, কখনও ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। তথাপি ইংরাজ মুর্শিদাবাদের চক্রান্তকারীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ করেন। সিরাজউদ্দৌলা আপনার রাজধানীতে হল্‌ওয়েল সাহেবকে বিমুক্ত করিবার সময়ে যাহা কহিয়াছিলেন, এবং

* এই প্রস্তাবের সম্বন্ধে সৈর মুতাক্ষরীণ-লেখক গোলাম হোসেন সকৎজঙ্গকে নিম্নলিখিত ভাবে উপদেশ দিয়াছিলেন,—"সৈন্যগণের অধ্যক্ষ ও রাজ্যের অমাত্যগণ দীর্ঘকাল আলিবর্দ্দী খাঁর অনুগ্রহভাজন ছিলেন। এজন্য তাঁহারা ন্যায়তঃ সিরাজউদ্দৌলার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিলেও কেন সিরাজউদ্দৌলার বিপক্ষ হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন, তাহার কারণ প্রথমে আমাদের দেখা উচিত। এই কারণ দেখিলে বোধ হইবে যে, তাঁহারা আপনাদের জীবন, সম্মান ও সম্পত্তি নিরাপদ ভাবিতেছেন না। সকলেই অত্যাচারিত ও নিপীড়িত হইয়াছেন। তাঁহারা মনে করিতেছেন যে, আপনি এইরূপ নির্বুদ্ধিতামূলক ব্যবহার করিবেন না। কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিবেন যে, আপনি আপনার পিতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্মচারীদিগকে অপসারিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছেন, এবং আপনি স্বয়ং 'সিরাজউদ্দৌলা অপেক্ষা কিছুতেই ভাল নহেন, নিশ্চিত জানিবেন যে, তখন তাঁহারা আপনার প্রতিও বিরক্ত হইবেন এবং পুনরায় সিরাজউদ্দৌলার পক্ষ অবলম্বন করিবেন,"—Seir mutakherin, P. 730.

পলাশীর ক্ষেত্রে মীরজাফরের সমক্ষে যে কাতরোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পাগল বা দুর্ব্বৃত্ত লোকের কথা নহে *। সিরাজউদ্দৌলা অশিক্ষিত ও তরুণবয়স্ক ছিলেন বলিয়াই সময়ে সময়ে অসৎ পথে ধাবিত হইতেন। যে বয়সে লোকে শিক্ষকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করে, তিনি সেই বয়সেই একটি বহুবিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি হন। চক্রান্তকারিগণ আপনাদের সম্পত্তি, সম্মান ও প্রাধান্যরক্ষার মানসে ইংরাজের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে, তাঁহাদের বাসনা ফলবতী হয় নাই, সিরাজউদ্দৌলার অধঃপতনের পর আট বৎসরের মধ্যে, তাঁহাদের সমস্ত প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়। তাঁহারা যদি হতভাগ্য সিরাজের সর্ব্বনাশ না ঘটাইয়া, তাহাকে সৎপরামর্শ দিয়া সুপথে আনিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, শেষে তাঁহাদের এত দুর্গতি হইত না। পক্ষান্তরে মীরকাসেম, সিরাজের ন্যায় তরুণবয়স্ক বা অবিবেচক ছিলেন না। বয়সে তিনি প্রবীণ, শিক্ষায় তিনি ধীরপ্রকৃতি এবং সদ্বিবেচনায় তিনি সূক্ষ্মদর্শী ছিলেন। প্রকৃতিবর্গের মঙ্গলবিধানে তাঁহার যত্ন ছিল। ক্রোধের উদ্দীপনায় তিনি দুই এক সময়ে অবিবেচনার পরিচয় দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অনেক সময়ে তিনি ক্রোধসংযমে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রভূত সাহস ও বীরত্ব না থাকিলেও আপনার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে তেজস্বিতা ছিল। এই দূরদর্শী, প্রবীণপুরুষও কখন ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। তথাপি ইংরাজ, ইহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিলেন। ব্যবসায়ী ইংরাজ কোম্পানি প্রথমে যে অত্যাচার ও অবিচারের পরিচয় দেন, শেষেও সেই অত্যাচার ও অবিচারের পূর্ণভাব দেখাইয়া সভ্য জগতকে স্তম্ভিত করিয়া তুলেন। এই পরনিপীড়ন, পরস্বাপহরণের ঘোর অন্ধকারময় সময়ে ওয়াট্‌সন্ ও ফুলর্টন প্রভৃতির সাহস ও সাধুতার কাহিনী পাঠকের হৃদয় পরিতৃপ্ত করে বটে, কিন্তু সিরাজউদ্দৌলা হইতে মীরকাসেম পর্য্যন্ত, ইংরাজের স্বার্থসাধনী প্রবৃত্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজ এ সময়ে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, উদ্যম ও একাগ্রতার একশেষ দেখাইয়াছেন, কিন্তু সাধুতা, উদারতা ও সমদর্শিতা দেখাইয়া হৃদয়বলের পরিচয় দিতে পারেন নাই *।

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

আমি চাই তোমারে।

(১)

ধ্বনি চায় প্রতিধ্বনি, আমি চাই তোমারে,
পতঙ্গ আগুন খোঁজে, আমি খুঁজি তোমারে।
ধ্বনি প্রতিধ্বনি অঙ্গে মিশাইয়া যায়।
পতঙ্গ আগুন গর্ভে ছার প্রাণ দেয়॥

(২)

জীবন মরণ খোঁজে, আমি খুঁজি তোমারে।
মরণের মোহমন্ত্রে টান তুমি আমারে॥
চিরকাল তুমি দেখ, চিরকাল আমি দেখি।
কোন কালে(ও) হ'লো নাক দেহে দেহে মাখামাখি॥

* Seir mutakherin, P. 730.

* লেখকের প্রণীত ভারত প্রসঙ্গে বঙ্গে ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠার বিষয় সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে।

(৩)

হয় বুঝি মাঝে মাঝে, আমি বুঝি ভুলে যাই।
আগুনে ঝাঁপাই ঝুড়ি, জাগিয়া দেখিতে পাই।
স্মৃতি ডোবে বিস্মৃতিতে ঘেরে ঘোর অন্ধকারে
সে মহা প্রলয়ে বুঝি তুলে লও বুকে করে॥

(৪)

শবদেহে দেহ থাপি কর কত কোলাকুলি।
ভূতলে আগুন ছোটে অযুত তরঙ্গ তুলি।
লাখ লাখ শিখা ওঠে,
লাখ সে বরণ ফোটে,
একটি আগুনশিখা মহা ব্যোমে ছুটে যায়।
বাহুপাশ হতে তব দেহটি ছিনাযে লয়॥

(৫)

আগুনে ঝাঁপাই ঝুড়ি, তুমি হাস উপবে।
সুকোমল তনুখানি দোলে নীল অম্বরে॥
যত কাঁদি তত হাস,
তত তুমি ভালবাস,
নাগিনি। বিজলীগতি, কোথা তুমি যাও উড়ে,
উড়ায়ে কেশের বাশ দুহাতে ডাকিছ মোরে।

(৬)

কোথা যাও, কোথা যাও, সাথে করে লয়ে যাও,
জীবন্তে পরশসুখ একবার দাও দাও।

শ্রীবিপিনবিহারী সেন।

মেঘ।

সুনীল আকাশ দেখে, এসেছি সাগর থেকে,
খুঁজিবারে স্বর্গের সোপান,
নিরালম্ব শুভ্র কায়া, চির সঙ্গী শান্তি ছায়া,
ভবমিছি অনন্ত বিমান।
রবির কিরণ ধরি, ইন্দ্রধনু গলে পরি
স্তরে স্তরে মাধুরী হিল্লোল,
গগন পরিধি থেকে, প্রভাত তপন ঢেকে,
গড়ি উষা বদন কমল।
যথা খর রবি করে, কম কিশলয় ঝরে,
ম্লান নব কিশোর মঞ্জরী,
যথা শ্যাম তৃণ দল, তাপক্লিষ্ট অবিরল,
ঝরে ফুলে নবীন পাপরি।
মোর মধু ছায়া নিয়া, যাই তার পার দিয়া,
ববষি শীতল বারিধারা,
ধোয়ায়ে পাতার ধূলি, ফুটাই মুকুলগুলি,
সাজাই শ্যামল বসুন্ধরা!
চপলা আলোকময়ী, আমার পরাণ সই,
হাসি তার ভুবন উজরি,
সে আসিলে মোর কাছে, ত্রিদিব দুন্দুভি বাজে,
নাচি দোহে গলাগলি ধরি।
বিমল চাঁদনি রেতে, সুনীল বিমান পথে,
সাজাই চাঁদের রাজসভা,
কখন চাঁদেরে ঘেরি, খেলা করি লুকোচুরী,
আবরি রজত ফুল্ল আভা।
মোর বারি ধারা লাগি, অধীর চাতক পাখী,
সারা নিশি ডাকিয়া পোহায়,
ময়ূরী, আমায় হেরি, উল্লাসে পেখম ধরি,
প্রেমানন্দে নাচিয়া বেড়ায়।
মুখে মোর সদা হাসি, সকলেরে ভালবাসি,
বাসা মোর ভূধর শেখরে,
সুনীল আকাশ দেখে, এসেছি সাগর থেকে,
স্বর্গের সোপান খুঁজিবারে।

শ্রীরেবতীমোহন রায় মৌলিক।

ব্রজধামে।

(মথুরা ও বৃন্দাবন, ১১ই ফাল্গুন, ১২৯৮ সন)

দেখিতে এসেছি আজ কোথা আছে, শ্যামরায়,
কোথায় কুবুজা রাণী?
পরশে পরশমণি—
নীলমণি সহ শোভে রাজাসনে মথুরায়,
কালীন্দির কাল জলে,
কেলি কদম্বের মূলে,
নিধুবনে বিধুমুখী নাচে কি লইয়ে তায়,
দেখাও মথুরাবাসি! কোথা আছে শ্যামরায়?

বলে দাও ব্রজবাসি,
কোথা সেই রাকা শশী,
বাঁকায়ে বাঁশরী করে ডাকে প্রাণ-রাধিকায়।
প্রাণ যে আকুল হ'ল
ব্রজবাসি। লয়ে চল,
বিপিনে বিলাস-কুঞ্জে বিকাইব রাঙ্গা পায়,
বলে দে মথুরাবাসি কোথা আছে শ্যামরায়?
অই ত যমুনা তীরে,
অগণ্য গোধন চরে,
শ্যামলী ধবলী দুটী চরিতে কি দেখা যায়?
গোধুলী আইলে পরে,
"হাম্বা হাম্বা" রব ক'রে,
কানুর বেণুর রবে এখনো কি গোঠে ধায়?
কোথায় সুদাম দাম,
হলধর বলরাম?
এখনো রাখাল সাজে সেজে কি খেলাতে যায়?
চলরে যমুনা তটে,
সেই বিশ্রামের ঘাটে,
কংসারি শ্রীহরি কিরে বিশ্রাম করিছে তায়?
সুরভি কুসুম তুলি,
সাজায়ে বাসন্তী ডালি,
ঋতুরাজ ব্রজরাজে উপহার দিতে চায়,
"বনমালি। বনমালি।"
শুন পুষ্প-করতালি,
যতনের বনমালা বুঝিরে শুকায়ে যায়,
বলে দে মথুরাবাসি কোথা সেই শ্যামরায়?
এই ত সে বৃন্দাবন,
কোথা ব্রজ বধূগণ?
কনক কলসী কক্ষে দেখাও সে রাধিকায়,
মুছিতে কলঙ্ক কালি,
ছিদ্র-কুম্ভে জল তুলি,
বল বল রাধারাণী কোন্ পথ দিয়ে যায়?
আজিকে নিকুঞ্জ-বনে
হেরিব সে শ্যাম ধনে,
কেমনে রয়েছে হরি রাধাপদ সাধনায়।
অধরে অধর রাখি,
মুখে মুখ আঁখে আঁখি,
হৃদয়ের মাখামাখি জলধর চপলায়।
"যমুনা-পুলিন" অই,
পুলিন-বিহারী কই?
"ধীর-সমীরে" শ্যাম কোথা বল নাচে গায়?
চম্পক চম্পকলতা,
ললিতা বিশাখা কোথা,
কোথা সেই বৃন্দা দূতী ধন্য ধন্য বসুধায়?
হাতে হাতে ধরি'ধরি',
নাচে কি মাধবে ঘিরি,
ময়ূর পেখম ধরে, কুহু ডাকে কোকিলায়?
এখনো কদম্বোপরে,
বসন হরণ ক'রে,
মন-চোরা ব'সে ব'সে হাসে আর গান গায়?
ব্রজ যুবতীর দল,
ফুল্ল স্বর্ণ-শতদল,
আবক্ষ ডুবিয়ে জলে ফুটে থাকে যমুনায়?
আকুল রমণীকুল,
ডাকে "হরি। রাখ কুল,"
উরসে মুকুল গুলি ডোবে ভাসে যমুনায়?
এখনো বাঁশীর সুরে,
যমুনা উজানে ফিরে?
আত্মহারা-কুল বালা কুল মাখে কালিমায়?
দেখিতে এসেছি আজ
কোথা সেই ব্রজরাজ,
পূরাও বাসনা মোর ব্রজবাসি ধরি পায়।

শ্রীমনোমোহন সেন।

মায়ার বন্ধন।

বিষম জীবন-ভার, সহেনা সহেনা আর,
একি হায়, দারুণ বন্ধন।
মর্ম্ম-গ্রন্থি ছিঁড়ে গেল, হৃদি পুড়ে খাক্ হ'ল,
এ সময় কোথা নারায়ণ!

দেখা দাও দেখা দাও, শ্রীমুখে হে কথা কও,
দাঁড়াও ত্রিভঙ্গ রূপে হরি।
প্রাণ খুলে কই কথা, জুড়াই মরম-ব্যথা,
'রাবণের চিতা দূর করি'।
মুখ পানে চাই যা'র, অন্ধকার—অন্ধকার
ঘোর হ'তে ঘোরতম হেরি,
লক্ষ্য-ভ্রষ্ট দিশে হারা, যেন রে পাগলপারা,
সে বিষাদে আপনা পাসরি।
'সামাল সামাল' সবে, কা'র মুখ কেবা চা'বে,
'এক ভস্ম আর ছাই' হায়।
মিটেছে সংসার-সাধ, টুটেছে বালির বাঁধ,
সমাধি-জীবন লাভ পায়।
অন্তর্য্যামী তুমি হরি, পরীক্ষা না দিতে পারি,
নিজ-গুণে হে কাণ্ডারি, তার।
গোপিনী-বল্লভ শ্যাম, হ'ওনা—হ'ওনা বাম,
দীননাথ, দীনে দয়া কর।
অগতির তুমি গতি, কূল দাও হে শ্রীপতি,
পলে পলে আত্ম হত্যা হ'তে,
ইহ-পর উভলোক, যদি যায় দুই লোক,
কেন তবে পাঠালে জগতে?
কেন এ মানব-জন্ম, কোটি-কল্প যুগ-ধর্ম্ম—
কর্ম্মক্ষেত্রে অধমে পাঠা'লে।
কেন হৃদে প্রেম প্রীতি, কণাংশ এ ভক্তিস্মৃতি,
প্রাণনাশা ভালবাসা দিলে।।
সংযম বিহনে হরি, ভেসে যায় মন তরী,
ভয়-বাধা কিছু নাহি মানে,
একি মোহ, একি তৃষা, প্রাণঘাতী কি দুরাশা,
হৃষীকেশ, রাখ এ তুফানে!
না চাহি প্রেমের হাসি, প্রিয়জন প্রেমভাষী,
স্বর্গভ্রষ্ট-চাঁদমুখ আর;
বন্ধন ঘুচা'য়ে হরি, লও মোরে কৃপা করি,
জীবন-সর্ব্বস্ব উপহার!!

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

পথিক।

মনে হয় এ জীবন যেন রে স্বপন!
কোথা দিয়ে কোথা এসে,
কোথাকার কোন্‌ দেশে,
হারায়ে ফেলেছি আমি সর্ব্বস্ব আপন।
যেন কি আশার ছলে,
আসিয়াছি পথ ভুলে,
ধরামাঝে অন্ধকারে নক্ষত্র পতন।
মনে হয় এ জীবন যেন রে স্বপন!
পবনের দীর্ঘশ্বাসে,
কি যেন কি মনে আসে,
কাঁদে প্রাণ, ঝরে আঁখি সরে না বচন।
জানি না কি সুখ তরে,
আসিলাম এ প্রান্তরে,
বিদেশী প্রবাসী মত করিতে রোদন।
মনে হয় এ জীবন যেন রে স্বপন।
সুখ দুঃখ কত খেলা,
প্রেম হাসি অশ্রু-ঢালা,
কত কি যে হ'য়ে গেল না জানি কখন,
কেবা আমি কোথা যাই,
যেন কিছু মনে নাই,
বিষম মদিরা পানে প্রাণ অচেতন।
মনে হয় এ জীবন যেন রে স্বপন।
আপন বলিতে হায়,
কেহ নাহি এ ধরায়,
শুধাতে প্রাণের কথা মুছাতে নয়ন।
কি ভাবে জীবন যায়,
প্রাণ মন দিনু কা'য়,
কার তরে আঁখি ঝরে কে করে যতন।
মনে হয় এ জীবন যেন রে স্বপন!
কি খেলা খেলিতে এসে,
কি খেলা খেলিনু শেষে;
আঁধারে নিবিল দীপ বিফল জনম!

নীরবে চ'লেছি তাই,
মুখে আর কথা নাই,
আঁধার প্রবাস পথে পথিক মতন।
মনে হয় এ জীবন যেন রে স্বপন।

শ্রীচুণীলাল গুপ্ত।

বাহুপাশে সখা-সখী।

উঁকি ঝুঁকি দে'য়া দু'টী নলিন নয়ন,
প্রণয়-নিঝর-ঝর চাহনি বিলোল,
বাহু-লতিকায় বাঁধা, নাথের বয়ন
হেরিছে বঙ্কিম গ্রীমে, মধুর হিলোল
প্রবাল অধর বহি হতেছে নিকাশ;
আধ হাসি মৃদু ভাষা পূর্ণ অনুরাগ,
পুলকে পূরিত দোঁহা তনুতে বিকাশ,
দুটী নিমিষের তরে অধরের যাগ।
অঙ্গের পরশ পেয়ে প্রফুল্ল হৃদয়,
একের সুখের তরে সর্ব্বত্যাগী আন,
ও দুটী কি প্রকৃতই সুখের নিলয়,
যুগল দেহের মাঝে অনন্য পরাণ?
আসক্তির কারা মাঝে রাখ নাটুযায়
জড়িত যুগল রূপে নয়ন যুড়ায়।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

আলোকের শিশু।

আলোকের শিশু ওরা আলোকেতে করে বাস,
কত হাসে, কত গায়, সুখী ওরা বারমাস॥
নাহি আছে উহাদের জরা, মৃত্যু, দুঃখ, ভয়।
সংসারের মোহ জালে জড়ীভূত ওরা নয়॥
সদা এক সুগভীর মহাভাবে মাতোয়ারা।
প্রাণে প্রাণে উহাদের বহে যেন প্রেম-ধারা॥
সরলতা, কোমলতা, সাধুতার প্রতি ছবি।
ভাবময়,যেন ওরা কাব্য-জগতের কবি॥
রূপে, গুণে সমতুল নর নারী এক প্রাণ।
সৌন্দর্য্যের, কবিত্বের যেন ওরা যোগ-স্থান॥
ভালবাসা উহাদের হৃদে হৃদে প্রবাহিত।
লক্ষ হৃদি এক হৃদে আছে যেন সমাহিত॥
প্রকৃতির শিশু ওরা নাহি জানে আত্মপর।
জানে শুধু নর নারী অভেদাত্মা পরস্পর॥
প্রকৃতি সবার মাতা, এক পিতা সবাকার।
জগতের মাঝে সব দেখে যেন আপনার॥
হিংসা, দ্বেষ, কপটতা উহাদের কাছে নাই।
শুধু প্রেম, ভালবাসা আছে উহাদের ঠাঁই॥
বিষাদের ছায়া নাই উহাদের শান্ত মুখে।
আলোকের রাজ্যেকেহ নাহি কাঁদেশোকে,দুখে॥
আলোকের রাজ্য আহা। মরি কি সুন্দর দেশ।
আলোকের শিশুগুলি মরি কি মোহন বেশ॥
বুক ভরা শান্তি আর, মুখ-ভরা হাসি লয়ে।
আলোকের শিশুগুলি খেলে কত সুখী হয়ে॥
আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ আলোকে যাইতে চায়।
আলোকের দেশে গিয়া ইচ্ছা করে সুখে গায়॥
কিন্তু এ পরাণ-পাখী বড়ই দুর্ব্বল মোর।
আলোকে যাইতে না'রে,ভেদিয়া আঁধার ঘোর॥
জগদীশ। দয়াময়, এ হৃদয়ে বল দাও।
আঁধার ভেদিয়া মোরে,আলোকে লইয়া যাও॥
অন্ধকার কারাগারে চাহিনা থাকিতে আর।
পারিনা সহিতে আর মশকের অত্যাচার॥

শ্রীশ্রীশগোবিন্দ সেন।

মরণ।

কে বলে তোমারে মন্দ?
তুমি যে ফুলের গন্ধ,
তুমি এরে জীবনের আশা।
তুমি যে স্বরগে সিঁড়ি,
ভবসিন্ধু দিব পাড়ি,
তুমি সেতু, তুমি চিরবাসা।
শীতল তোমার-বুকে
ঘুমা'ব অনন্ত সুখে,
ভু'লে যাব পরাণের জ্বালা।

নিবিবে ভোগের তৃষ্ণা,
স্বপ্নময় মিছে আশা,
ধু'য়ে যাবে হৃদয়ের মলা।
নিবৃত্তি নির্ব্বাণ তুমি,
অনন্ত শান্তির ভূমি,
পথ-শ্রান্ত তাপিতের ছায়া।
মিলন বিরহ মাখা,
আনন্দে বিষাদ ঢাকা,
বিষদগ্ধ ভালবাসা দয়া,
শুধু স্বপ্ন মিছে মায়া,
তুমি কায়া, তারা ছায়া,
তুমি তৃপ্তি, তারা জ্বালাতন,
দুখের শ্মশান-ভূমি,
সুখের সমাধি তুমি,
তুমি ধ্যান, তারা বিক্ষেপণ।
তোমার সন্ন্যাসি-বেশ,
মহাধর্ম্ম-উপদেশ,
ডেকে দেয় ঘুম ভেঙ্গে মোর।
মহাসুপ্তি এ জীবন,
তুমি নিত্য জাগরণ,
পরশে ঘুচাও মোহ-ঘোর।
মরণ এস গো কাছে,
দীন-বন্ধু কেবা আছে?
পাখা দিয়ে ঢাক মর্ম্ম-ব্যথা।
বাহু বেড়ি গলদেশে,
আঁখি-জলে ভেসে ভেসে
গাইব মনের দুখ-গাঁথা।
তোবিবুকে মহাবেদ—অনন্ত আশার কথা।

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

কোকিল।

১

কেন রে কোকিল তুই এত মাতোয়ারা?
বসিয়া কদম্বডালে, এ হেন বসন্ত কালে,
নিশি-ভোর ডেকে ডেকে হইলিরে সারা,
নিদ্রা নাই পাখী তোর, এ কেমন ধারা?

২

শীতল বাতাস লাগে কুহেলীর জল,
তথাপি বিহঙ্গ তোর, ভাঙ্গেনা ভাবের ঘোর,
"কুহু-কুহু" "কুহু-কুহু" বিষম গরল,
ভাঙ্গিয়াছে গলা তবু "কুহুই" কেবল।

৩

চূত মুকুলের গন্ধে আমোদিত বন,
তাহাতে মাতিয়া পাখী, বার বার থাকি থাকি,
উন্মত্ত হইয়া কত কবিবি কূজন?
উদাস স্বরেতে তোর প্রবাসীর মন।

৪

পূর্ণ-শশী ঢালিতেছে অমল জ্যোছনা,
প্রকৃতি মাখিয়ে তায়, সেজেছে কেমন হায়!
তোর কেন মিছামিছি এত বিড়ম্বনা?
ঝালা পালা কাণ, পাখী এ কিরে লাঞ্ছনা।

৫

গাস্ তুই "কুহু কুহু" উচ্ছ্বসিত প্রাণে,
প্রতিধ্বনি কিন্তু হায়, তখনি উতর গায়,
শোক-ভরা "উহু-উহু" বিরহীর কাণে,
সুনিদ্রা কেমন সে ত কখনো না জানে।

৬

স্বভাবের শোভা দেখে মুগ্ধ যদি মন,
যদি পূর্ণিমার চাঁদ, নেহারিতে এত সাধ,
নিঃশব্দে তাহার দিকে মেলিয়া নয়ন,
না করিস্ কেন পাখী সদা বিলোকন?

৭

গৃহস্থের গৃহ ঘেঁসে বাতায়ন যথা,
বসিয়া তাহার পাশে, কেনরে কর্কশভাষে,
প্রকাশ করিস্ ক্ষুদ্র অন্তরের ব্যথা?
কি বলিবি বল পাখী কিবা তোর কথা?

৮

সংজ্ঞাহীন নিদ্রা যায় কুলের কামিনী,
মুদিত নয়ন তার, স্খলিত কবরী ভার,
এলো থেলো কেশরাশি যেন পাগলিনী,
ভাঙ্গাবি কি ঘুম তার থাকিতে যামিনী?

৯

এখনো বিহঙ্গ দেখ হয় নাই ভোর,
ওঠেনি ক শুকতারা, সকলে চৈতন্যহারা,
রয়েছে নিদ্রার বশে হইয়া বিঘোর,
জাগিবে যুবতী শুনি "কুহু কুহু" তোর।

১০

লজ্জাবতী সতী এবে কোথা লজ্জা ভয়?
অনাবৃত মুখশশী, বসন ভূষণ খসি,
পড়িয়াছে, তবু সে ত সচকিত নয়,
উড়িয়া পলায়ে পাখী, যথা ইচ্ছা হয়।

শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী।

ধিক্কার।

(১)

আবার ধিক্কার কেন আমারে কাঁদায়,
একে ত আপন দুখে,
মরে আছি মর্ম্মশোকে,
এ তীব্র অনল সূচি কেন বিঁধে তায়,
লোকের গঞ্জনা ভার
সহি বল কত আর,
তারা ত বুঝেনা প্রাণ কত ব্যথা পায়,
ব্যাধের অধিক ধিক্ নিরদয় হায়!

(২)

আবার ধিক্কার কেন আমারে কাঁদায়,
একে ত জীবননদী,
তুফানিছে নিরবধি,
তরঙ্গে তরঙ্গে প্রাণ আধা সারা হায়,
তাহাতে আবার কেন
কলা বনে বন্যা হেন,
পরাণ-শোয়ান-বাণী বুকে মাতঙ্গায়
দলিয়া দমিয়া মৃতে কিবা সুখ পায়!

(৩)

এ পোড়া পতঙ্গ প্রাণে কত সহা যায়,
অদৃষ্ট নিদেশ বশে,
অশ্রুধারা কত খসে,
জীবন্ত গাঁথনি সব মূল ধসে যায়,
এমন অভাগা জনে,
কোথাকার কোন্ জ্ঞানে,
এত তীব্র মর্ম্মস্পৃক বচন শুনায়,
বিদ্যুৎ স্তম্ভিত বুকে উল্কাপাত হায়।

(৪)

নিদারুণ সাজা এত কেন অভাগায়,
কোথা দুবে আছি পড়ে,
সংসার ঘৃণার ধারে,
তোমাদের সুখে সাধে লয়েছি বিদায়,
আপনি আপনা থাকি,
দুখ চিতা ভস্মে ঢাকি,
নিষ্ঠুর ধিক্কার কেন তাহারে উস্কায়?
ক্ষত প্রাণে নুন দিতে এত সুখ পায়।

(৫)

অসম্পূর্ণ বিশ্ব এযে পূর্ণ মেলা দায়,
বিমল কে কোথা কবে,
ভাল মন্দে মাখা সবে,
এমন চাঁদের কোলে কলঙ্ক লুকায়.
কীট কাঁটা ফল ফুলে,
ভুজঙ্গ চন্দন মূলে,
দুয়ে দুয়ে মিশে আছে—পুরুষ মায়ায়,
সংসারের সংসারত্ব আঁধার আলায়।

(৬)

কর্ম্মশীল জীবন এ উঠে পড়ে যায়,
তরঙ্গ উথলে কত,
মিশায় বা কত শত,
তবে ত প্রবাহ তার বারিধিরে পায়,
শ্রান্তি গেলে আসে ভ্রান্তি,
নিস্ফলে কোথায় ক্ষতি,
কোথায় কে একেবারে লক্ষ্যে পঁহুছায়,
কেন বা ধিক্কার তবে আমারে কাঁদায়!

শ্রীমোহনবিহারী আঢ্য, বি, এ,

আর একখানি পত্র।

জিব্রল্টার হইতে পত্র দিয়া মার্কিন জাহাজে আরোহণ করি। জাহাজে উঠিয়া দেখিলাম, আমরা চারিজন মাত্র প্রথম শ্রেণীর যাত্রী, বাকী প্রায় ৮০০ ইটালিয়ান ও সিসিলিয়ান স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা নিম্ন শ্রেণীতে যাইতেছেন। কতক উপনিবেশের জন্য, কতক কেবল মাত্র অর্থোপার্জ্জনের জন্য, আমেরিকাভিমুখী। আমাদের সকলেরই গম্য স্থান নিউইয়র্ক, কারণ আটলাণ্টিকের মধ্যে আর কোথাও জাহাজ লাগিবার স্থান নাই। কাপ্তেন প্রভৃতি আপিসরগণ বলিলেন, ১২।১৩ দিন, নিতান্ত পক্ষে ১৪ দিনে অবশ্য পঁহুছিবার কথা।

সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাড়িল। জিব্রল্টার প্রণালীর ভিতর দিয়া ক্রমে আটলাণ্টিকে পড়িলাম। প্রথম দুই তিন দিন এক প্রকার চলিয়া গেল। তার পর ধীরে ধীরে ঝড়বাতাস দেখা দিতে লাগিল। সম্মুখ বাতাসের দরুণ জাহাজের গতির পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিল। সকলের আশঙ্কা উপস্থিত হইল, নিরূপিত সময়ে পঁহুছান কঠিন। মার্চ্চ ও সেপ্টেম্বর মাস আটলাণ্টিকে বিশেষ উপদ্রবের মাস, আপিসরগণ এইরূপ বলিলেন।

অবশেষে ২০ ও ২১ মার্চ্চ বিরুদ্ধ গাল্‌ফ ষ্ট্রীমে আটলাণ্টিকের মাঝামাঝি তুমুল তুফান। আর তিন জন মার্কিন যাত্রী স্থায়ীভাবে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কাপ্তেন, আপিসর ও নাবিকগণ দিবারাত্রি শশব্যস্ত, আমাকে একাকী দুই দিন নিঃশব্দভাবে কাটাইতে হইল। দিনের বেলা মধ্যে মধ্যে উপরে উঠিয়া ভিতরের দিকে দরজা আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া দুরন্ত সমুদ্ররূপী ভগবানের রঙ্গ দেখিতাম। চারিদিকে আর কিছুই দেখা যায় না, কেবল শ্বেতবরফে শৃঙ্গঢাকা পাহাড়ের ন্যায় ফেণশির উত্তাল তরঙ্গগুলির লীলা। যেন সারি সারি পর্ব্বতশ্রেণী ও তন্মধ্যস্থ গভীর উপত্যকারাজি অনবরত পরস্পর স্থান ও মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করিতেছে। এদিকে ডেকের উপর দিয়া ক্রীড়াশীল ঊর্ম্মি সকল সদর্পে নৃত্য করিয়া চলিয়া যাইতেছে। জাহাজ খানি প্রায় খাড়া ভাবে একবার একাইত একবার ওকাইত হইয়া মৃদুমন্দ গতিতে গন্তব্য পথে অতি কষ্টে চলিতেছে। এ দৃশ্য জীবনে অন্ততঃ একবার দেখা উচিত। অতি সুন্দর, অতি মনোহর, দারুণ ভীষণতার মধ্যে এক অপূর্ব্ব মনোমোহন রূপ, তুমুল তুফানে আটলাণ্টিক একটী দেখিবার জিনিস।

ঝড় শান্ত হইলে নিম্নশ্রেণীস্থ ইটালিয়ান স্ত্রীলোক ও বালিকাগণ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বৈকালে এমন সুন্দর ভাবে সকলে সমস্বরে গান ধরিলেন যে, তাহাতে বাস্তবিক, ভাষা না বুঝিতে পারা সত্বেও, শ্রোতার মন বিগলিত হয়। ইহার পরেও অল্পবিস্তর প্রতিকূল বায়ুর মধ্য দিয়া ১০।১২ দিনের স্থলে ১৮ দিনে নিউইয়র্ক (New York) পঁহুছিলাম। সেখান হইতে নাএগেরা (Niagara), শিকগো (Chicago) দেখিয়া সান ফ্রান্সিস্কোতে (SanFrancisco) আসিয়া পাসিফিক মেল জাহাজ ধরিলাম।

আমেরিকার যাহা কিছু স্বল্প সময় মধ্যে দেখিলাম, তাহা বিস্তারিতরূপে লিখিতে গেলে এ পত্রে স্থান হয় না; সুতরাং ভূপ্র-

দক্ষিণের বৃত্তান্তের সঙ্গে স্থানান্তরে সে সকল প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

পাসিফিক মেল জাহাজ City of Rio-de Janiero একখানি অতি উৎকৃষ্ট জাহাজ। সকল প্রকার বন্দোবস্ত অতি উচ্চ দরের। যাত্রী ৩৫ জন প্রায় সমস্তই আমেরিকান *। খুব আরামে ও আমোদ আহ্লাদে ১৮ দিনে এ পারে জাপানে পঁহুছি। এ পারের সঙ্গে তারিখ ঠিক রাখিবার জন্য ১৮০ মেরিডিয়নে ১৪ এপ্রেল বৃহস্পতিবার লোপ করা হইল, ১৩ই তারিখের পর দিন একেবারে ১৫ই এপ্রেল গণনা করা গেল। ফিরিয়া যাইবার সময় ওপারের সঙ্গে ঠিক রাখিবার জন্য ঐ স্থানে এক তারিখ দুই দিন গণিতে হয়। পাসিফিক বাস্তবিকই প্রশান্ত সাগর। যদিও শীতকালে কখন কখন ঝড় তুফান হয়, কিন্তু আমাদের ভাগ্যে বরাবর অতি স্থির ভাবই ছিল। এ সমুদ্রে খুব ঝড় হইলেও আটলাণ্টিকের মত কখনই হয় না, আপিসরেরা বলিলেন ও কেবিনাদির বন্দোবস্তে বেশ বুঝা গেল।

জাপানের ইওকোহামা (Yokohama) ও রাজধানী টোকিও (Tokio) দেখিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া ৬ দিনে হংকং (Hongkong) পঁহুছিলাম। তথায় কয় দিন অপেক্ষা করিয়া কলিকাতার জাহাজ পাইলাম। জাহাজ সিঙ্গাপুর (Singapore) ও পিনাংএ (Pennang) দুই দিন করিয়া থাকিয়া ১৮ দিনে কলিকাতায় পঁহুছিল। এখন ভারতসাগরে ভাসিতেছি, কোন্ কূলে পঁহুছিব, বিধাতাই জানেন। আটলাণ্টিক পাসিফিকের ভাসান একরূপ ছিল, এ ভাসান সম্পূর্ণ অন্যরূপ। জড় জগতের ভাসান, এ ভাসানের কাছে কিছুই নয়। *

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

* তন্মধ্যে দুইজন এখান পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, তাঁহারা ভূ প্রদক্ষিণে বাহির হইয়াছেন।

* পরম সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু বারিষ্টার হইয়া সুস্থশরীরে ভারতে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এরূপ সহৃদয় প্রতিভাশালী লোকের দ্বারা মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার যে প্রভূত উপকার হইবে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

জীবলীলার আবর্ত্তন।

মানুষ মরিয়া কোথায় যায়, এ কথাটির নানা শাস্ত্রে নানা উত্তর পাওয়া যায়। সকল শাস্ত্র এই এক স্থানে একমত যে, মৃত্যুতেই মানুষের শেষ হয় না, মৃত্যুর পরও মানুষ থাকে। চির উন্নতিশীল আত্মা, আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার উত্তেজনায় যে সদা বিজড়িত, মৃত্যুই তাহার শেষ পরিসমাপ্তি হইতে পারে না। "এই আত্মা-দীপটী জ্বলিতেছিল,—এই একেবারে চিরতরে নিবিয়া গেল," এ বিশ্বাস মানুষের প্রাণে স্থান পায় না। সকল শাস্ত্র একবাক্যে বলে, আত্মা অমর। এই বিশ্বাসেই মানুষ সংসারে পাতে, পাপকে ভয় করে, পুণ্যকে আদর করে। মরিয়াই জীবনকে শেষ করা যায়, এ বিশ্বাস থাকিলে ধর্ম্মকর্ম্ম সকল লোপ পাইত। আবহমান কাল এই যে দৃঢ় বিশ্বাস মানুষের মনে বিদ্যমান, মানুষ মৃত্যুর পরেও থাকিবে, এই বিশ্বাসই উজ্জ্বল প্রমাণ যে, আত্মা অমর। এ বিশ্বাস কোথা হইতে

উদ্ভূত?—এক অবিনশ্বী মূল শক্তিকারণ হইতে। মানুষ যে মৃত্যুর পরেও থাকিবে, সকল মানবমণ্ডলীর বিশ্বাসের একতাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে অন্যান্য যে সকল যুক্তি আছে, এই প্রমাণের নিকট সে সব তুচ্ছ। মানিলাম, মৃত্যুর পরেও মানুষ থাকিবে, কিন্তু কোথায় থাকিবে? আকাশে,—শূন্যে, নক্ষত্র লোকে, না এই পৃথিবীতে? এ প্রশ্নের উত্তর নানা শাস্ত্র নানারূপে দিয়াছে। কেহ বলে, মানুষ কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করে, নানা যোনি ভ্রমণ করে—মরিয়া কেহ বা ভূত হয়, কেহ বা দেবতা হয়, কেহ বা স্বর্গে যায়, কেহ বলে, গ্রহান্তরে বাস করে, কেহ বলে, আবার ফিরিয়া এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, ইত্যাদি। এ স্থলে বিশ্বাসের সমতা নাই। সুতরাং এ বিষয়ে কেবল যুক্তিতর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া কঠিন। আমাদের বিশ্বাস, সহজাত বা সানুপ্রাণিত বিশ্বাস ভিন্ন কেবল যুক্তিতর্কে ধর্ম্মজগতের কোন তত্ত্বেরই স্থির মীমাংসা হয় না। এ বিষয়ে সকল জাতির সহজাত বিশ্বাসের ঐক্য নাই, সুতরাং স্থির মীমাংসা করা কঠিন। এ বিষয়ে একটু আলোচনায় আমাদের ধারণাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই।

আমরা প্রকৃতির মূলে একটী জীবন্ত সত্য দেখিতে পাই—সৃষ্ট সকল জিনিসই অবিনশ্বর। উন্নতির ষোলকলা পূর্ণ হইলে, অথবা যে যে ভাব দেখাইতে সৃষ্ট, সেই ভাব দেখান হইলেই পরিবর্ত্তন ঘটে, কিন্তু পরিবর্ত্তনে বস্তু অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে যায়, ধ্বংস হয় না। বিজ্ঞান বলে, কোন সৃষ্ট বস্তুই ধ্বংস হয় না। মানুষের দেহ, মৃত্যুর পর শ্মশানে ভস্ম হইল। ইহার অর্থ এই, মানুষের দেহ পঞ্চভূতে মিশিল। দেহ পরিবর্ত্তিত হইল, কিন্তু দেহের অবশেষ পঞ্চভূতাকারে রহিল। এই পঞ্চভূতের সাহায্যে আবার কত কত সৃষ্টির প্রক্রিয়া সাধিত হইতেছে। পশুর হাড় মৃত্তিকার উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করিতেছে, মৃত্তিকার উৎপন্ন শাক সবজি খাইয়া পশু পক্ষী ও মনুষ্য দেহ ধারণ করিতেছে। মানুষের দেহের পরিণাম যে পঞ্চভূত, তাহাও এইরূপে কোন না কোন জগতের কাজ সাধন করিতেছে। জল, বায়ু, মৃত্তিকা ভিন্ন কোন বস্তুই জন্মে না। দেহাবশেষ, জল, বায়ু ও মৃত্তিকায়ই বিমিশ্রিত। সুতরাং মানবদেহাবশেষ যে জল বায়ু মৃত্তিকা, তাহাতেও সৃষ্টির কাজ হইতেছে। পরিবর্ত্তন-চক্র ঘুরিতেছে, অবস্থার পর অবস্থা, অবস্থার পর অবস্থা—সৃষ্টিতে কেবল এইরূপই ঘটিতেছে। ধ্বংস কিছুই হইতেছে না। জড়ের পরিবর্ত্তনে জীব, জীবদেহের পরিবর্ত্তনে জড়, আবার জড় হইতে জীব—এইরূপ সদা অবিরাম পরিবর্ত্তন-চক্র ঘুরিতেছে। মৃত্যুকে যে ধ্বংসের কারণ বলে, সে প্রকৃতি-তত্ত্ব বা সৃষ্টিতত্ত্ব কিছুই বুঝে না। জীবাহারে জীবদেহ ধারণ অন্যায় বলিয়া যাঁহারা অভিমত জ্ঞাপন করেন, যুক্তিতে দেখি, তাঁহারা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় ঘোরতর অবিশ্বাসী। মাতার শরীর সন্তানের জন্য ক্রমে ক্রমে বিলয় পাইতেছে, অথবা এক পশু অন্য পশুর মাংসে জীবন ধারণ করিতেছে, ইহাতে তাঁহারা কাতর হন না কেন, জানি না। একের জন্য অপরের দেহ ধারণ, অথবা এক অবস্থা আর এক অবস্থার কারণ, অথবা এক জিনিসের পরিণতিতে আর এক জিনিসের অভ্যুদয়, অথবা এক মূল শক্তিরই বিকাশ এই অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রকৃতি, এ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলে

আর পরিবর্ত্তন দর্শনে মন ভাঙ্গে না, মানুষকে মানুষ ঘৃণা করিতে পারে না, ধর্ম্ম, আহারে বা পানভোজনে হ্রাস বৃদ্ধি হয়, এ বিশ্বাস থাকে না। ধর্ম্ম, অন্তরের জিনিষ, বাহিরের নয়। বৈরাগ্য প্রভৃতি সকলই মনে। মূল বিশ্ব-শক্তিতে যে না পৌছিতে পারিয়াছে, সে বৃথা হই-চই করিয়া মরিতেছে।

এই অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্ব প্রকৃতি এক অবিনাশী বিশ্বমূলশক্তির আভাস। সেই শক্তিই পাহাড় পর্ব্বতে, সাগরে ও জীব জন্তু উদ্ভিদে। যাহা কিছু আছে, সেই শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই আছে। সেই শক্তির অবিনাশিত্ব হইতেই এই সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা পৃথিবী অবিনাশিত্ব পাইয়াছে। পরিবর্ত্তন নিয়তই দেখিতেছি, কিন্তু কিছুই বিনষ্ট হইতেছে না। মহেশ্বরের এ এক অপূর্ব্ব লীলাতত্ত্ব।

মহাত্মা ডারবিন প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বন্য পশুর ব্যাবৃত্তিতে বা বিকাশে মানবের উৎপত্তি হইয়াছে। এই মানবের ব্যাবৃতি ও বিকাশে কিসের উন্নতি হইতেছে, কে জানে? মানুষ আসিতেছে, মানুষ যাইতেছে, কত সহস্র যুগে কত মানুষ এই ধরাবক্ষ যে কত ভস্ম-স্তূপে পরিপূর্ণ করিয়াছে, কে জানে? সেই মানব-ভস্ম-স্তূপ হইতে এ জগতের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি বিকাশ পাইতেছে॥ আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব অনুধাবনে যত প্রবৃত্ত হই, ততই বিস্ময়ে নিমগ্ন হইয়া যাই।

জড়দেহ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলাম, আত্মিক জগতে একথা কি খাটে না? কেন যে খাটিবে না, এ সম্বন্ধে কে উজ্জ্বল প্রমাণ দেখাইতে পারেন? আমাদের বিশ্বাস, জড়দেহ দ্বারা যেমন জগতের সৃষ্টি হইতেছে, আত্মার দ্বারাও তেমনিই জগতের সৃষ্টিকার্য্য চলিতেছে। যে জন্মিয়াছে, সে অবিনশ্বর,—অবস্থার নানা পাকে ঘুরিয়া ফিরিয়া সে একবার যাইতেছে, কিন্তু আবার সে যে ফিরিয়া আসিয়া ঘুরিতেছে না, কেমনে বুঝিব? তুমি বলিবে, যদি তাই হবে, তবে পূর্ব্ব জন্মের সংবাদ সে রাখে না কেন? এ কথার উত্তরে আমি বলি, তুমি মাতৃগর্ভে ছিলে, একথা ত ঠিক, তুমি বাল্য অতিক্রম করিয়াই এত বড় হইয়াছ, একথাও ত ঠিক্, বল ত তুমি মাতৃগর্ভের কথা বা বাল্যকালের কথা বা বাল্যকালের কথা বলিতে বা স্মরণ করিতে পার না কেন? তুমি বলিবে, মাতৃগর্ভের কথা বা বাল্যাবস্থার কথা তুমি বলিতে পার না, কেন না, সে সময় তোমার মস্তিষ্ক পরিস্ফুট হয় নাই। ঠিক এই যুক্তি ধরিয়া আমি বলি, তোমার পূর্ব্ব জন্মের বা পূর্ব্বাবস্থার মস্তিষ্ক নাই বলিয়া তুমি সে সময়ের কথা স্মরণ করিতে পার না। স্মৃতি, জড়দেহের গুণ। স্মৃতি থাকুক, আর না থাকুক, তাহাতে মানুষের কিছু আসিয়া যায় না, মানুষের উপার্জ্জিত বা সঞ্চিত প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান, পুণ্যের হ্রাস হয় না। কঠিন পীড়ার সময় বা উন্মাদ অবস্থার সময় লোকের স্মৃতি-শক্তি বা মস্তিষ্ক-শক্তি লোপ পায় বলিয়া তাহার প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান পুণ্যের ফল বা মনুষ্যত্ব লোপ পাইল, কেহই এরূপ মনে করেন না। আত্মিক জগতে প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান কর্ম্মের যে যোগ, সেই যোগই অবিনশ্বর, স্মৃতি থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে এ সকল লোপ পায় না। আবার দেখ, কেহ শৈশবেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি লইয়া উপস্থিত, কেহ বাল্যেই মহা প্রতিভাশালী। মিল সাহেব অল্প বয়সে কত পাণ্ডিত্যের বিকাশ দেখাইয়া

গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যে পূর্ব্ব জন্মের অর্জ্জিত মনুষ্যত্ব নাই, কে বলিতে পারে? মানুষ যে প্রথম জন্মেই বড় হয়, একথাই বা কে বলিল? বানরটা এক জন্মেই যে ধা করিয়া মানুষ হইয়া গেল, ডারবিনও তাহা বলেন না। কত জন্মের পরিণতি, ব্যাবৃতি বা বিকাশে যে আজ এই সমুন্নত বা সমুজ্জ্বল মানব জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে, আত্মিক জগতের ডারবিন যখন আসিবেন, তখন তাহা নির্ব্বাচন করিবেন। জীব-দেহ-জগতে, বহু জন্মের পর বানর মনুষ্য হইয়াছে, আত্মিক জগতে মনুষ্য দিন দিন দেবত্বে চলিয়াছে। অতীত কালের প্রেম ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মের ফলে আজ পৃথিবী কত সমুন্নত হইয়াছে। আত্মিক জগতের উন্নতির ফলভোগী এই জগত যদি না হইত, এই পৃথিবীর ধারাবাহিক এত উন্নতি হইত কি না, কে বলিতে পারে? আমাদের বিশ্বাস, যে অপূর্ণ অবস্থায় যাইতেছে, সে আবার রূপান্তরিত অবস্থায় আসিতেছে। পশু জন্ম হইতে মানব জন্ম, মানব জন্ম হইতে আরো উন্নত মানব জন্ম, উন্নত মানব জন্ম হইতে দেবতার জন্ম, এইরূপ হইতেছে। আমাদের এ সিদ্ধান্ত অমূলক বলিয়া কেহ কি প্রতিপন্ন করিতে পারেন? আর একটী কথা— এই পৃথিবী মানবের শিক্ষালয়। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষ শিক্ষা করিতেছে, জ্ঞান পুণ্য উপার্জ্জন করিতেছে। মানব জন্মের একটী অবিসম্বাদিত উদ্দেশ্য আছে, সকলেই স্বীকার করেন। আমি ও তুমি, বিধাতার কোন একটী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আসিয়াছি। আমাদের জীবনের কি উদ্দেশ্য, তাহা হয় ত আমরা জানি না, কিন্তু একটী উদ্দেশ্য না থাকিলে কখনও আমাদের সৃষ্টি হইত না। যাহাকে নরকের কীট বলিয়া ভাবিতেছ, তাহারও জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে এবং সে যতই স্বাধীনতার বলে বিপথে গমন করুক না, আমাদের বিশ্বাস, বিধাতার উদ্দেশ্য তাহার জীবনেও তিনি সম্পূরণ করিয়া লইবেনই লইবেন। চণ্ডাল ও মুচির ভিতরেও অবিরত তাঁহারই মহান্ ইচ্ছা সম্পূর্ণ হইতেছে। মানুষ তাঁহার যে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছে, দেখিতেছি, জলবায়ু বা পিতামাতার দোষে সকলে সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিতেছে না। দেহ ধারণ করিয়া কেহ এক দিন, কেহ এক বৎসর, কেহ বা দশ বৎসর পরেই জীবলীলা সাঙ্গ করিয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে। শরীর এমনই অপটু যে, কিছুতেই তাহার থাকা হইল না। বিধাতার উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা সেই অল্প মুহূর্ত্তে সম্পূর্ণ হইল, ভাবিলে আর গোল থাকে না, কিন্তু তাহা সব সময়ে ভাবিতে পারা যায় না। অপূর্ণ পিপাসা, অপূর্ণ শরীর—সমস্ত অপূর্ণ থাকিতেই তাহাকে অন্তর্দ্ধান করিতে হইল। কেহ মহামারিতে মরিল, কেহ অস্ত্রের দ্বারা আহত হইয়া মরিল। যে হঠাৎ মরিল, অর্থাৎ জীবদেহের পরিণতির পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিল, সে আবার না ফিরিয়া আসিলে জীবলীলায় বিধাতার ইচ্ছা-মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ হয় কই? এই জন্য আমাদের মনে হয়, অসম্পূর্ণ অবস্থায় যে যায়, সে আবার রূপান্তরিত হইয়া ফিরিয়া আইসে ও আসিতে পারে। আসিয়া আবার যায়, আবার আইসে। জীবলীলার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া দেহাবসানে যখন যায়, তখন আর আইসে না। দেবাবশিষ্ট বস্তু হইতে যেমন পৃথিবীর সৃষ্টির প্রক্রিয়া সংসাধিত হইতেছে, কোন

কোন আত্মার দ্বারাও যে সেইরূপ হইতেছে না, কেমনে ভাবিব? অথবা অকাশে, স্বর্গে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে মানুষ মৃত্যুর পর ভ্রমণ করে, ইহা যেরূপ যুক্তিসিদ্ধ, এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসা কি তদ্ধিক যুক্তিসঙ্গত, নয়? "স্মৃতির" যুক্তিতে "হাইলে পানি গিলে না" বলিয়া বিধাতার মহা লীলা মাহাত্ম্য উড়াইয়া দেওয়া উচিত নয়।

আর একটী কথা, দেখ, যে যায়, সে আবহমান কালই জগতের কোন না কোন আত্মার উপর রাজত্ব করিতেছে। খ্রীষ্ট প্রায় দুই সহস্র বৎসর গিয়াছেন, কিন্তু আজও তিনি এ জগতে কার্য্য করিতেছেন। কল্পনায় নয়, সত্য সত্যই তিনি আজও জগতে জীবের ন্যায় কাজ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে উক্ত আছে—"অদ্যাবধি সেই লীলা করে গৌররায়, কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়।" একথা চৈতন্যের দেহ সম্বন্ধে কি আত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে পাঠকগণ বিচার করিবেন। আমাদের বিশ্বাস, দেহ ও আত্মা, উভয়েই তিনি এ জগতে থাকিতে পারেন। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বৃন্দাবনে চৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাৎলাভ করিয়াছেন, শুনিয়াছি। এ ঘটনার সত্য মিথ্যা, পাঠকগণ বিচার করুন। খ্রীষ্টের জ্বলন্ত বিশ্বাস, শ্রীচৈতন্যের প্রেম, মহম্মদের ধর্ম্মনিষ্ঠা, বুদ্ধের নির্ব্বাণ আজও আত্মিক জগতে কার্য্য করিতেছে, আরো কত বৎসর ধরিয়া এইরূপ কার্য্য করিবে, কে জানে? তাঁহাদের দেহের অবশিষ্ট আমাদের মধ্যে থাকা যেমন সম্ভব, আত্মার অবশিষ্ট থাকাও তেমনি সম্ভব। শক্তি এক ভিন্ন, দুই কি বহু নাই। অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যেমন এই সান্ত খণ্ড খণ্ড জড়ের উৎপত্তিতে, সেইরূপ অখণ্ড পরমাত্মা খণ্ডাকারে লইয়া মানবের সৃষ্টি। আবার এই মানবাত্মার খণ্ড খণ্ড লইয়া বহু আত্মার যে সৃষ্টি হইতেছে না, কে জানে? জীব সংখ্যা বৃদ্ধিই যে ইহার একটী কারণ নয়, তাহাই বা কে নিশ্চিত রূপে প্রমাণ করিতে পারে? বিধাতা মহাশক্তিশালী, আকাশে ও নক্ষত্র লোকে মৃত্যুর পর আত্মাকে পাঠান তাঁহার আয়ত্তাধীন হইলে, এখানে আবার পাঠানই বা কেন তাঁহার আয়ত্তাধীন হইবে না, বুঝি না। প্রাচীন আর্য্য জাতির মহাত্মা সকল এখন যে, নবোত্থিত ইংলণ্ড, জর্ম্মণি, ও আমেরিকার মহোন্নত জাতি সকলকে অলঙ্কৃত করিতেছেন না, কে বলিতে পারে? বিশ্বাসীদিগকে কৃতার্থ করিতে খ্রীষ্টের প্রেতাত্মা যে পৃথিবীতে আবার অভ্যুদিত হন নাই, আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। গৌরচন্দ্র যে ভক্তদেহ ধারণ করিয়া বিচরণ করিতেছেন না, তাহাই বা কে জানে? বিশ্বাস এবং প্রেমভক্তি প্রচার করা, এই উভয়ের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। পৃথিবী যখন এখনও বিশ্বাস ও প্রেম ভক্তিহীনতায় জর্জ্জরিত, তখন বিধাতার আদেশে ইহাদের পুনঃ দেহ ধারণ একেবারে অলৌকিক কথা নয়।

যুক্তিতর্কের কথা ছাড়িয়া এখন বিশ্বাসের কথা বলি। ভক্তের দাস ভগবান, আমি বলি, অভক্তের দাসও ভগবান। ভক্তই হউক, অভক্তই হউক, ব্যাকুল হৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিলে তিনি দেখা দেন। একাগ্রতা সহকারে, তন্ময় হইয়া ডাকিলেই যশোদার গোপাল যশোদার কোলে আসেন। শ্রীরাধিকা বৃন্দাবনে বসিয়া চিরদিনই শ্রীকৃষ্ণকে প্রাণে পান। অবিশ্বাসী ইহাতে কল্পনা কুয়াসা দেখে, কিন্তু বিশ্বাসী ইহাতে জীবন্ত সত্য দেখিয়া বিমোহিত হন। আমরা অভক্ত, কিন্তু ডাকিয়া দেখিয়াছি বিধাতা আমাদিগেরও মনোবাঞ্ছা কতবার পূর্ণ করিয়া তাঁহার জীবন্ত মাহাত্ম্য দেখাইয়াছেন।

অনেকের বিশ্বাস, আত্মিক জগতের প্রার্থনা বিধাতা যেরূপ পূর্ণ করেন, দেহ বা জড়জগতের প্রার্থনা তিনি সেরূপ পূর্ণ করেন না। আমরা জানি, অনেক লোকের মধ্যেই এ বিশ্বাস আছে। আমাদের ধারণা, ইহারা ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধরূপে ভাবেন বলিয়া এরূপ হয়। এরূপ ভাবিলে, ঈশ্বরকে যে খণ্ডাকারে দেখিতে হয়, তাঁহারা বুঝেন না। আমরা বলি, তিনি সব পারেন। তিনি কৃপা করিলে প্রেম পুণ্য দিতে পারেন, তিনি কৃপা করিলে সুখ ঐশ্বর্য্য

দিতে পারেন। তাঁহার দয়া ও কৃপা ভিন্ন কেহ কিছু পায় না। তিনি মাটীকে সোণা করিয়া, দরিদ্রকে চিরধনী করিয়া দিতে পারেন। যাহা দেন, তিনিই দেন। ক্ষুধায় আহার, পিপাসায় জল, তিনিই মুখে তুলিয়া দেন। আমার হাত আমার হাত নয়, তাঁহারই হাত, তাঁহার ইচ্ছায় এ হাত আহার অন্বেষণ করিবার পথ পায়, অথবা আহার পায়। তিনি মাটি-মুষ্টিকে স্বর্ণ-মুষ্টি করিয়া হাতে তুলিয়া দেন। রোগের ঔষধ তিনিই দেন, শোকের সান্ত্বনা তিনিই প্রদান করেন। তিনি জীবন্ত, তিনি জাগ্রত। এই প্রকৃতির মূলে সর্ব্বদা এক কম্পশীল মহাযোগী দেদীপ্যমান। আমি অভক্ত কিন্তু আমি ডাকিলেও তিনি কাছে আসেন, কথা বলেন, হাসেন, কত কি করেন। মানুষ যদি তাঁহাকে না দেখিত, কখনও মানুষ কি থাকিতে পারিত? তাঁহার দেখা না পাইলে, তাঁহার কথা না শুনিলে কেহ আর তাঁহার কথা বলিত না। ধর্ম্মের ইতিহাসে আদি সময় হইতে যে জীবন্ত বিশ্বাসের অঙ্কুর মানবজীবনে দেখা যাইতেছে, যাহা ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মহামতি স্পেন্সর সাহেবও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, এই বিশ্বাসের মূল তাহা হইলে ছিন্ন হইত। তিনি দেখা দিয়া জগৎকে সর্ব্বদা আশ্বাসিত করিতেছেন, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না পাইলে কি শোকে লোক সান্ত্বনা পাইত? বিপদে বাঁচিত? অভিমন্যুকে চন্দ্রলোকে যদি শ্রীকৃষ্ণ শাপমুক্ত অবস্থায় না দেখাইতেন, তবে অর্জ্জুন কি আর সংসারলীলা করিতে পারিতেন? মৃত্যুকে যিনি জগতে রাখিয়াছেন, মৃত্যুর পর সান্ত্বনাকেও তিনি জগতে প্রেরণ করিতেছেন। বিধাতার করুণার কথা ভাবিলে পাষাণ ফাটিয়াও প্রেমজল নির্গত হয়। সেই অদ্বিতীয় শক্তি,তাঁহার মহান ইচ্ছাও মানুষের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে, কাহাকে কাহাকে পুনঃ সংসারে পাঠাইবেন, বিচিত্র কি?

মানব, জীব-লীলায়, এই পৃথিবীতে বহুজন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে, অনেকে বিশ্বাস করেন, কিন্তু মৃত্যুর পর মানুষ আবার ফিরিয়া আইসে, ইহাতে অনেকের অবিশ্বাস, সন্দেহ আছে। আমরাও এই দলভুক্ত ছিলাম। কিন্তু বিশ্বাসের উদয়ে নাকি সকল মত কুয়াসা উড়িয়া যায়, আমাদেরও তাহাই হইয়াছে। পূর্ব্বে মতের দাস ছিলাম, এখন এ সম্বন্ধে বিশ্বাসের দাস হইয়াছি। প্রত্যক্ষের নিকট মত বলি দিতে হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ বিশ্বাস করি না যে, সকল লোকই মৃত্যুর পর আবার শরীর ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইবে। এ সকল সম্বন্ধে আমাদের মতের ধান্দা এখনও ঘুচে নাই, অথবা, আমরা নিশ্চয় কিছুই বলিতে পারি না। সেই মহাচক্রীই জানেন, আর সকল মানুষ মরণের পর কোথায় যায়। সানুপ্রাণিত বিশ্বাসের অভ্যুদয় না হইলে, কে এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারে?

অনাহারে মরণ।

একদিন বাচস্পতি মহাশয় আমাকে একটী শ্লোক বলিয়াছিলেন। তাহার অর্থ—সুখের জন্য আরোগ্য ও বৈরাগ্যের প্রয়োজন। এ কথাটী সকলে স্বীকার করুন আর না করুন, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, সুখের জন্য আহার ও আরোগ্য আবশ্যক। কেবল সুখের জন্য নহে, অস্তিত্বের জন্য আহার প্রয়োজন। তাই ভগবান্ পরাশর বলিয়াছেন,—

অন্নং প্রাণা বলং অন্নং অন্নং সর্ব্বার্থসাধকং।

"অন্ন লোকের প্রাণ, অন্ন লোকের বল, অন্ন লোকের সর্ব্বার্থসাধক।" এই প্রাণস্বরূপ ও বলস্বরূপ অন্নের অভাব, ভারতে দিন দিন বাড়িতেছে। বৎসর বৎসর কত লোক যে অন্নাভাবে মরিতেছে তাহার সংখ্যা নাই; আর যাহারা বাঁচিয়া আছে তাহাদিগের মধ্যে লাখ লাখ লোক আধপেটা খাইয়া আধমরা হইয়া আছে। গরিব কৃষকের ত কথাই নাই। দুবেলা অন্ন তাহাদের ত কখন জুটে না, চোখেরজল তাহাদিগের কখন শুকায় না, পেটের জ্বালায়

তাহারা নিয়ত জ্বলিতেছে। রাজপুরুষ হণ্টার সাহেব এ বিষয় মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দিয়াছেন।* গরিব চাষাদিগের কথা ছাড়িয়া দিন। ভদ্র লোকদিগের ও এখন দুর্দ্দশা দেখুন। অধিকাংশ ভদ্রলোকের আয় ৫০ পঞ্চাশ টাকার কম। গড়ে প্রত্যেক পরিবারে পাঁচ জন লোক ধরা যাইতে পারে। এই আয়ে তাহাদিগের খাওয়া পরা, বাসগৃহ নির্ম্মাণ ও মেরামত, জমীর খাজনা, মিউনিসিপাল ট্যাক্স, বিদেশে থাকিলে বাসাভাড়া, সন্তানদিগের শিক্ষা, রোগের চিকিৎসা, বিবাহাদি ক্রিয়া, লৌকিক চাকর চাকরাণির খোরাক পোষাক প্রভৃতি সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। ইহাতে ২০, বা ৩০, বা ৪০ বা ৫০, টাকা বেতন ভোগী ভদ্রলোকের এখন কিরূপ আহার হইয়া থাকে, তাহা বেশ বুঝা যাইতে পারে। যে দুধ ঘি আগে সামান্য লোকও খাইত, এখন তাহা এই সকল ভদ্রলোকের ভাগ্যে মাসে এক দিন ঘটে কি না সন্দেহ। মাংস বৎসরে এক দিন যদি হয়। মাছ খাওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহা নামমাত্র। তিন পয়সায় আর পোয়া মাছ বা কোন স্থানে একপোয়া মাছ পাওয়া যাইল। একপোয়াই ধরা যাউক। একপোয়া দুইবেলা। সুতরাং এক বেলাতে দুইছটাক। দুইছটাক মাছ কর্ত্তা গৃহিণী তিনটী সন্তান একটী চাকর বা চাকরাণী সমুদয় ছয় পাতে পড়িল, অর্থাৎ প্রতিপাতে আধ ছটাক মাছও পড়িল না। অথচ ইহার নাম হইল মৎস্যভক্ষণ। তার পর চাউলের দর দিন দিন যেরূপ চড়িতেছে, তাহাতে যে সকল ছেলেদের অন্ততপক্ষে তিন বেলা ভাত প্রয়োজন, তাহাদিগের দুইবেলা বই ভাত জুটে না। সুতরাং এক বেলা ভর পেট ভাতের পরিবর্ত্তে এক পয়সার সন্দেশ, দুই বা একখানি ফিন্‌ফিনে রুটী বা আধ পয়সার মুড়ি খাইয়া জঠরানল নিবৃত্তি করিতে হয়। বাল্যকাল হইতে যে জাতির এইরূপ আহার বা অনাহার হইতেছে, তাহাদিগের উন্নতি কেমন করিয়া হইবে?

উচ্চতর শিক্ষার জন্য যে সভা হইতেছে, তাহা খুব ভাল ও মহৎ। কিন্তু আমি যখন সুকুমার বালকদিগের নিত্য ন্যূনাহার বিষয় মনে করি, এই সভার সদনুষ্ঠানেও হৃদয়ে কেমন এক বিষাদের ভাব উদয় হয়। তখন মনে হয়, হয় ত এখন দেশে উচ্চতর শিক্ষার অপেক্ষা ভাল আহারের প্রয়োজন। যে ছাত্রগণ না খাইতে পাইয়া দুর্ব্বল, তাহারা কেমন করিয়া ব্যায়াম চর্চ্চা করিবে, আর চর্চ্চা করিলেই বা কি হইবে? যাহাদিগের বাহুবল নাই, শরীর আপনিই যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, তাহাদিগের কেমন করিয়া সাহস হইবে? যাহারা দুর্ব্বলতায় ভীরু ও সতত কম্পিত, তাহারা কেমন করিয়া সত্যবাদী বা উদ্যোগী বা সহৃৎসাহী হইবে? সুতরাং যদি কেহ ছাত্রদিগের উন্নতি সাধন করিতে চাহেন, তাহা হইলে তাহাদিগের জীবনের কেবল আগা দেখিলে হইবে না, আগাগোড়া দেখিতে হইবে। গোড়ায় তাহারা পেটে খাইতে পায় কি না, তাহা দেখা আবশ্যক।

আমাদিগের দেশের অন্ন কষ্ট বাড়িতেছে, তাহা জাজ্বল্যমান ও অনপলাপ্য সত্য। তথাপি সার রিচার্ড টেম্পল-প্রমুখ সাহেবগণ মিথ্যা কূটতর্কে প্রমাণ করিতে চাহেন, ভারতে অন্নকষ্ট নাই, কেন না ভারত হইতে প্রচুর শস্য ইংলণ্ডে রপ্তানি হয়। শস্য ভারতবাসী কৃষকের, সুতরাং কৃষকগণ নিজের শস্যের অভাব থাকিলে, নিজের আহারের সংস্থান না থাকিলে কখন তাহা বিক্রয় করিত না,—হঠাৎ এই যুক্তি প্রমাণ সঙ্গত যুক্তি বোধ হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা এ দেশের কৃষকদিগের প্রকৃত অবস্থা কিছুমাত্র অবগত আছেন, তাহারাই জানেন যে, কৃষকের শস্য হইলে প্রথমে তাহাদিগকে মহাজনের কর্জ্জ শোধ করিতে ও জমিদারের খাজনা দিতে হয়। প্রজার ঘরে খাবার থাকুক আর না থাকুক, জমিদার ফসল ক্রোক করিতে পারেন, জোত ও ঘর বিক্রয় করিয়া লইতে পারে এবং দুইটা চাষের গরু ছাড়া প্রায় যথাসর্ব্বস্ব লইয়া তাহাকে ফেরার করিতে পারেন। মহাজনেরও প্রভূত ক্ষমতা। তবেই কৃষকের ঘরে শস্য রাখিবার স্বাধীনতা কোথায়? শস্যের ত কথাই নাই; মহাজনের দেনা ও জমিদারের খাজনা জা

* রেহারাফল সম্বন্ধে, হণ্টার সাহেব এ কথা স্বীকার করেন।

দিতে পারিলে চাষার গায়ের মাংস লইয়া টানা টানি হয়। মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া, গায়ের রক্ত জল করিয়া, শস্য উৎপন্ন করিল কৃষক। শস্য বা তাহার মূল্য উঠিল মহাজন ও জমিদারের ঘরে। ইংরাজবণিকের ব্যাপারিগণ তাহা ক্রয় করিয়া বন্দরে লইয়া যাইল। ভারত-প্রাণ শস্য পরিপূরিত ইংরাজ অর্ণবযান ইংলণ্ডাভিমুখে ভাসমান হইল। এদিকে দেশের অন্নদাতা, প্রাণদাতা অন্ন স্রষ্টা কৃষক অন্নাভাবে হাহাকার করিতে লাগিল। তথাপি ধূর্ত্ত নির্ম্মম রাজনীতিকগণ নির্লজ্জ ভাবে সুখময় ভারত-কৃষক-বৈভব ঘোষণা করিবেন। যদি অন্নাভাব এত না হবে, তবে এত ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ কেন? গত শতাব্দীর দুর্ভিক্ষ ছাড়িয়া কেবল মাত্র বর্ত্তমান শতাব্দীর ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ধরুন। ১৮০২—০৪, ১৮০৭,১৮১২,১৮২৪,১৮৩৩ সালে দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ হয়। ১৮৩৮ সালের দুর্ভিক্ষে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অসংখ্য লোক মরিয়াছিল। ১৮৫৪ ও ১৮৬৬ সালে আবার দাক্ষিণাত্য দুর্ভিক্ষ হয়। ১৮৬০ ৬১ পুনর্ব্বার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের (১৮৬৫ ৬৬) সেই ভয়ানক কাণ্ড স্মরণ করুন্। উড়িষ্যার সিকি লোক অনাহারে এক বৎসরে মরিল। তৎপরে দশবৎসর না যাইতে আবার দুর্ভিক্ষ। এবার কেবল ভারতের একটী প্রদেশ নহে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, পাঞ্জাবে, রাজপুতনায়, মধ্য প্রদেশে, মান্দ্রাজে ভারতের সর্ব্বত্র অন্নবিনা হাহাকার, ভীষণ মৃত্যু—অনাহারে ও অনাহার সহচর বিসূচিকায়। এই বিশাল অন্নক্ষেত্র ভারতে কতলোক যে ১৮৭৬।৭৮ সালে অন্নবিনা দুঃসহ জঠরানল জ্বালায় দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া মরিল, তাহা কে গুনিতে পারে? সরকারি মন্তব্যে দেখ যায়, ৫০।০ লক্ষ মরিয়াছিল। জন্ম সংখ্যা ২০ লক্ষ কমিয়াছিল। এবং "মুখে অপত্যোৎপাদন হয়" Burke এর এই কিম্ভূত বাক্যের যাথার্থ্য নিঃসংশয়িত ভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

তার পর এই চৌদ্দ বৎসর অন্ন দিন দিন কেমন দুর্লভ হইতেছে, এবং দেশ কেমন নিত্য দুর্ভিক্ষময় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা পাঠক স্বচক্ষে দেখিতেছেন।

এখন এই অস্তিত্ব বিনাশক, এই দুর্ব্বলতা ভীরুতা প্রবর্ত্তক, এই নানাবিধ রোগোৎপাদক অনাহার মহানর্থের প্রতিকার কি? এই অন্নাভাবের কারণ কি? আমাদের দেশে একটা কথা আছে, রাজার পাপে দেশ নষ্ট। যদি ইহার কোন অর্থ থাকে, তাহা এই যে, শাসয়িতার শাসন প্রণালীর দোষে প্রজাগণ নষ্ট হয়। ভারতের অনশন মরণ হেতু, অনুসন্ধান করিলে, এই কথাটা অনেকটা প্রতিপন্ন হয়।

সংক্ষেপে, অন্নাভাবের কারণ, লোকবৃদ্ধি, ও শস্য রপ্তানি কৃষির অবনতি বা অনুন্নতি। লোক বৃদ্ধি স্বাভাবিক, শস্য রপ্তানি সম্ভবমত বন্ধ হইলে, এবং উপযুক্তভাবে কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইলে, ভারতের শস্য ভারতসন্তানগণকে স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করিতে পারে। এবং লোক বৃদ্ধি নিবারণ করাও সম্ভব নহে। সুতরাং ম্যাল্থসের মতের আলোচনা এখানে অপ্রয়োজন।

ভারতবর্ষ হইতে শস্যের রপ্তানি দুই কারণে হইতেছে। প্রথমতঃ ইংলণ্ডে গবর্ণমেণ্টের খরচের জন্য যে ন্যূনাধিক ২০ ক্রোড় টাকা home charges আখ্যাত হইয়া ভারতবর্ষ হইতে যায়, তন্নিমিত্ত বাস্তবিক ভারতবর্ষ হইতে ঐ পরিমাণের মুদ্রা যায় না। ঐ মূল্যের শস্য ভারতবর্ষ হইতে যায়*। যাহাতে এই ব্যয় (Home charge) কমে, তাহার বিশেষ চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কমা দূরে থাকুক, বাটার ক্ষতিতে, রূপার দর কম অর্থাৎ সোণার দর বাড়াতে, এই home charges ব্যয় দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। কারণ আমাদিগের দেশে রৌপ্য মুদ্রা, বিলাতে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত এবং Home charges স্বর্ণ মুদ্রায় গৃহীত।

শস্য রপ্তানির আর এক কারণ এখানে বিশেষ বিবেচ্য। ইংরাজ বণিকগণ আমাদিগকে তাহাদিগের ছুরি, কাঁচি, কাপড়, জুতা, ছাতা, দিয়েসলাই, কলম, ছুঁচ, সুতা প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য দিয়া আমাদিগের শস্য লইয়া

* "মামলায় মরণ" প্রবন্ধের টীকাতে ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে। গত বৈশাখের নব্যভারত ১৭ পৃঃ ঐ পৃষ্ঠার "বিনিময়" স্থানে "বিনা বিনিময়" পড়িতে হইবে।

যাইতেছেন। বিলাত-বাণিজ্য যতই বাড়িতেছে, ভারতের শস্য ততই অধিক বাহির হইয়া যাইতেছে, এবং ভারতবাসীদিগের ততই অন্নকষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে সকল কৃষকদিগের ঘরে এরূপ শস্য সঞ্চিত থাকিত যে, দুই এক সন অজন্মা হইলেও তাহারা খাইতে পাইত এবং অনাহারে মরিত না। এখন কৃষকদিগের ঘরে শস্য সঞ্চিত হইতে পাবে না *। তাই একবৎসর অজন্মা হইলেই হাহাকার ও মৃত্যু। উদার ও অভিজ্ঞ রাজপুরুষ হণ্টার সাহেব উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এ কথা প্রমাণ হয়। যদি অনাহার মৃত্যু হইতে আমরা আমাদিগকে রক্ষা করিতে চাহি, তাহা হইলে যাহাতে দেশে কল কারখানা খুলিয়া আমরা সাহেবদিগের মত কাপড় প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিলাতি দ্রব্যাদি ভারতে নিষ্প্রয়োজন করিয়া তুলিতে পারি, তাহা করা কর্ত্তব্য। ইংরাজ বণিক এই উন্নতি পথে বাধা দিবার জন্য দণ্ডায়মান। তাহাদিগের চাপে গভর্ণমেণ্ট বশীভূত হইয়া Indian Factory Act এর ন্যায় ভারতের নিতান্ত অমঙ্গলজনক ও অন্যায়মূলক ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন। আমাদিগের দেশে ইদানীন্তন যে কলকারখানার চেষ্টা দেখা যাইতেছে, তাহা আশাপ্রদ। যাঁহারা ইহাতে উদ্যোগী, তাঁহারা বাক্যসার বক্তাদিগের অপেক্ষা ভাল স্বদেশ প্রেমিক "better patriots"। শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এই বিষয় আরও সঙ্গত চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। "মূলধনের অভাব" বলিয়া আর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবার সময় নাই। অনেকে একযোগে কাজ করিতে পারিলে, প্রত্যেকে কিছু কিছু টাকা সংন্যস্ত করিলে এক একটা প্রকাণ্ড মূলধনের সংস্থান হইতে পারে। চলিত দান করা অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে কলকারখানা খোলার জন্য টাকা দেওয়া, এবং যাহাতে তাহা চলে, তাহার সম্যক চেষ্টা করা, অধিক পুণ্যের কাজ, অধিক বুদ্ধির কাজ। কেননা, ইহাতে নিরন্ন স্বদেশী অন্ন পাইবে, ও মুমূর্ষু ব্যক্তিগণের জীবন পাইবার স্থায়ী উপায় হইবে। এই মূলধন বৎসর বৎসর কতকাল দরিদ্রদিগকে অন্ন দিবে এবং অর্থনীতিক্রমে শস্য রপ্তানি কমাইয়া শস্য সুলভ করিবে।

কেবলমাত্র কলকারখানার দিকে শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি করিলে চলিবে না। আমাদিগের দেশে কৃষিকার্য্যের মোটেই উন্নতি হইতেছে না। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হওয়া দূরে যাউক, তাহা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। সম্রাট আকবরের সময় যে জমিতে বিঘাপ্রতি ৪৸০ মণ গম হইত, এখন সেই জমিতে বিঘাপ্রতি ৩।০ মণ মাত্র গম হয়। এখন ভারতে গড়ে বিঘাপ্রতি ৩ মণ শস্য হয়, বিলাতে গম গড়ে বিঘাপ্রতি ৭ মণ হয়। অনেকে বলিবেন, বিলাতে যেমন বিঘাপ্রতি ফসল অধিক হয়, তেমনি তাহাতে খরচাও অধিক পড়ে। সুতরাং খাটি মুনফা অধিক হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষ ভূতপূর্ব্বক কৃষিসচিব হিউম সাহেব যাহা বলিতেছেন, তাহা কি বিশ্বাস করিবেন? তিনি বলেন যে,—"উচিত মত সার দিলে ও উচিত মত চাষ করিলে এ দেশের প্রতি বিঘাতে, শত করা ৩০,৫০ বা ৭০ পরিমাণে, প্রত্যেক শস্যের অধিক ফলন হইতে পারে এবং সেই পরিমাণে পূর্ণ মাত্রায় খাটী মুনফা বাড়িতে পারে।" প্রথমতঃ কৃষির উন্নতির প্রধান উপাদান সার। অতি প্রাচীন কালেও পরাশর ঋষি তাঁহার কৃষি সংগ্রহে বলিয়াছেন।

"বিনা সারেণ ধান্যং বর্দ্ধতে ন ফলত্যপি।"

সার না দিলে ধান্য বর্দ্ধিত ও ফলিত হয় না। সার দিবার প্রণালীও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা,

মাঘে গোময় কূটন্তু সংপূজ্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
সায়ং শুভদিনং প্রাপ্য কুদ্দালৈস্তোলয়েৎ ততঃ।
রৌদ্রেসংশোষ্য তৎসর্ব্বং কৃত্বাগুণ্ডক রূপিনঃ
ফাল্গুনে প্রতি কেদারে গর্ত্তংকৃত্বা নিধাপয়েৎ।
ততো বপনকালেতু কুর্য্যাৎ সারবিমোচনং।
বিনা সারেণ ধান্যং বর্দ্ধন্তে ন ফলত্যপি।"

* এই সকল কথা অকপট অভিজ্ঞ ইংরাজগণ স্বীকার করেন "* * large exports have made the local reserve stocks of food much smaller than they used to be. It is a serious thought that a demand for Indian food grains in Europe may make the struggle for existence more severer to thousands of agricultural labourers in Behar, whose wages are less than 2d a day and who often support themselves on one daily meal". W C Macpherson of the Bengal civil service

"মাঘমাসে যত্নপূর্ব্বক গোময় স্তূপ সংগ্রহ করিয়া শুভদিনে সেই সার কোদাল দ্বারা তুলিয়া রৌদ্রে বিশুষ্ক করিবে। অনন্তর সেই সকল চূর্ণ করিয়া, ফাল্গুন মাসে প্রত্যেক ক্ষেত্রের একধারে গর্ত্ত করিয়া পুতিবে। পরে বীজ বপন কালে, সেই সার তুলিয়া ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিবে। এইরূপে সার না দিলে ধান্য বর্দ্ধিত ও ফলিত হয় না। সারের উপকারিতা ও অবশ্যদেয়তা বর্ত্তমান কৃষকগণও বেশ জানে। তবে এখন তাহারা সার প্রচুর পরিমাণে পায় না। কারণ এখন কাষ্ঠাভাবে দরিদ্র ব্যক্তিগণ ঘসি জ্বালায়। সুতরাং চাসারা সার দিবার জন্য প্রচুর গোময় পাইয়া উঠে না। যাহাতে প্রচুর সারের সংস্থান হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। সুইজরলণ্ডে একটী আইন আছে,—তাহার অন্ততঃ কতকগুলি জেলায় একপ্রকার জমিতে নিরূপিত সংখ্যা বৃক্ষ রাখিতে হয়,—এখানে কতকটা সেইরূপ একটী আইন করা যায় না কি? আমি কোন কোন বৃহৎ জমিদারীর অবস্থা নিজে যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে আমার ধারণা হইয়াছে যে, এমন অনেক পতিত জমি আছে যাহাতে ধান্যাদি হইতে পারে না, কিন্তু তাহাতে গাছ লাগাইবার সুবিধা আছে। গবর্ণমেণ্ট এখন রাস্তার ধারে ধারে যেখানে সুবিধা পান, সেই স্থানেই গাছ লাগাইতেছেন। তাহাতে ছায়া, শোভা, ফল ও কাষ্ঠ হইতেছে। জমিদারগণও অনেক স্থলে সেইরূপ করিতে পারেন। এ বিষয় কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসেরও সুন্দর কার্য্য রহিয়াছে। গাছ পালা অধিক হইলে বৃষ্টি অধিক হয় কি না, তাহা সন্দেহ স্থল। তবে গাছ অধিক হইলে উত্তাপের নিশ্চিত হ্রাস হয়। সে যাহাহউক, জ্বালানি কাষ্ঠের বড় টানাটানি হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহা এখন বুঝিতে পারিয়াছেন। ৩১ বৎসর পূর্ব্বাবধি গবর্ণমেণ্ট বনজঙ্গল, কৃষিকার্য্যের বিঘ্নস্বরূপ মনে করিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় অনেক বন নষ্ট করিয়াছেন এবং করিতে দিয়াছেন। ইদানীং গবর্ণমেণ্টের চৈতন্য হইয়াছে। ১৮৬৫ সালে প্রথম বন আইন জারি হয় এবং তাহার দুই বৎসর পরে এই বিভাগের কার্য্য প্রার্থীদিগকে ফরাসি ও জর্ম্মানির বিদ্যালয়ে রীতিমত শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ হয়। কিন্তু ডাক্তার ভীলকার ভারতের কৃষি অভাব সম্বন্ধে বিলাতে গত এপ্রিলে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান রক্ষিত বন ইন্ধন পক্ষে যথেষ্ট নহে। সুতরাং কাষ্ঠ বৃদ্ধি পক্ষে গবর্ণমেণ্ট জমীদার * প্রজা সকলেরই চেষ্টা করা আবশ্যক। তাহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইলে, চাষারা গোবর না পোড়াইয়া তাহা সারের জন্য রাখিতে পারে।

আর গোময় দুর্লভ হইবে না কেন? গোজাতি ভারতে দিন দিন ধ্বংস হইতেছে। যেমন ভারতশ্রমীর গৃহে পূর্ব্বকালের মত শিল্প ব্যবসার লক্ষ্মীশ্রী নাই, তেমনি ভারত কৃষকের ক্ষেত্রে গোও অন্তর্হিত হইতেছে। যে গোজাতি ভারতকৃষির প্রাণ, সুতরাং ভারতবাসীর প্রাণ, যে গোজাতির রক্ষা যুক্তি-সঙ্গত ভাবে আমাদিগের ধর্ম্মের অন্তর্গত, এবং যাহার নাশ আমাদিগের ধর্ম্মে মহাপাতক সেই গোজাতির ধ্বংসে আমরা উদাসীন—সুতরাং আমাদিগের নিজেরও ধ্বংস কেন না হইবে? দিন কতক শ্রীমান্ স্বামী নামক ব্যক্তির উৎসাহে ও প্রচারে গোভক্ষণ নিবারণ জন্য দেশে দেশে কত বক্তৃতা ও সভা হইল, কত আশাপ্রদ উদ্যোগের সূচনা হইল। কিন্তু দুদিন পরেই উৎসাহ অগ্নি নিবিয়া যাইল। গোভক্ষণে যে গোনাশ হইতেছে, এই স্বতঃসিদ্ধ কথা গোখাদক সাহেবজাতি বড় আমলে দিবেন না। মানুষদিগের যুক্তি ও তর্কলীলা স্বেচ্ছা ও স্বার্থানুসারিণী। তাই অধিকাংশ সাহেব, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট, নিজে যাহাতে সুবিধা বোধ করেন, তাহাতে আমাদিগের মরণান্তিক অসুবিধা হইলেও তাঁহারা তাহা সহজে বিশ্বাস বা স্বীকার করেন না। বরঞ্চ এরূপ

* সার চার্লস ইলিয়ট এ বৎসর প্রথম দিনাজপুর জেলার বনের তদ্বির করিতেছেন। শুনা যায় মৈমনসিংহ জেলায় গৌরীপুর জমিদারিতে প্রায় ৫০০ বর্গমাইলেরও অধিক বন আছে। তদ্বির করিলে এই সকল বন হইতে প্রভূত কাষ্ঠ সংগ্রহও লাভ হইতে পারে।

স্থলে এদেশের লোক মর্ম্মবেদনায় কাঁদিয়া উঠিলে, সাহেবেরা শ্রেষ্ঠতর বিদ্যা বুদ্ধি বলে, তাহাদিগের ছাত্রস্থানীয় বিজিত ভারতবাসী-দিগকে ভেড়া বুঝান। কিন্তু তাহাতে যাতনা কমে না, সে কথা যম শুনে না।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, গোভক্ষণ আমা-দিগের দেশের গোনাশের একমাত্র কারণ নহে। খাদ্যাভাবে অনেক গো নাশ হয়। গ্রীষ্মকালে প্রায় ১॥০ মাস যখন উত্তপ্ত বায়ু গর্জ্জিতে থাকে, সূর্য্য অগ্নি বর্ষণ করে, তখন তৃণ পত্রাদি প্রায় কিছুই থাকে না। এবং গরুর কষ্টের সীমা থাকে না। তার পর নব বর্ষাগমে রবিকর দগ্ধ ধরাতল এক সপ্তাহের মধ্যে শ্যামল রসাল দূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত হয়, তরুলতা কোমল কিশলয়শোভিত হয়। তখন অনাহারশীর্ণ ক্ষুধার্ত্ত গোগণ অত্যাহার করিতে আরম্ভ করে এবং ত্বরায় রোগগ্রস্ত হইয়া মরিয়া যায়। হিউম সাহেব বলেন যে, ভারতবর্ষে গড়ে প্রতি বৎসর ১ কোটি গরু নিবার্য্য রোগে মরে এবং তাহাতে প্রতি বৎসর ১০ কোটি টাকা ক্ষতি হয়। গবর্ণমেণ্ট এ বিষয় অনেক দিন দৃক্‌পাত করেন নাই। ইদানীং লর্ডরিপণ কৃষিবিভাগ স্থাপিত করিয়া গো চিকিৎসার উপায় করি-বার জন্য আয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, গতবৎসর পর্য্যন্ত সমগ্র বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে একটী মাত্র গোচিকিৎসালয় ছিল না। গত এপ্রিলে উদার হিতৈষী সার দিন্‌স মানিকজী পিতি-তের (Petit) দাতব্যে দমদমে বঙ্গ-গো চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৭১ সালে গবর্ণমেণ্ট যে গোরক্ষক সমিতি নিযুক্ত করেন, তাঁহার রিপোর্ট লিখিত হইয়াছিল যে, গোচিকিৎসা শিক্ষা এরূপ ভাবে দেওয়া উচিত যে, গরিব চাষা অতি সামান্য ব্যয়ে, প্রয়োজন মতে, সহজে, শিক্ষিত-গোচিকিৎ-সক পাইতে পারে। কিন্তু বোম্বাই নগরে সাতবৎসর হইল যে গোচিকিৎসালয় ও গোচিকিৎসাশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে ২টী প্রমাদ ঘটিয়াছে (১) তাহাতে গরুর চিকিৎসা প্রায়ই হয় না, ঘোড়ার চিকিৎসা হয়। (২) এই উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সহরে চিকিৎসা করেন। গ্রামে চিকিৎসা করেন না, গ্রাম্য জীবন তাঁহাদিগের পক্ষে নির্ব্বাসন। ১০।২০ টাকা মাসিক আয় এবং নির্ব্বাসন স্বীকার করা এই উচ্চ-শিক্ষিত লোকদিগের পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং গরিব চাষা তাঁহাদিগের নিকট কোন উপকার পায় না। বঙ্গদেশে দমদমে তিন মাস হইল যে গোচিকিৎসালয় প্রতি-ষ্ঠিত হইয়াছে, তথায় যাহাতে এই দুইটী বিভ্রাট না ঘটে, তৎপক্ষে চেষ্টা করা উচিত।

সুস্থ গবোৎপাদনের জন্য পূর্ব্বে যেরূপ বৃষভ ছিল, তাহাও ক্রমে লোপ পাই-তেছে। আগে ছিল তাহারা ধর্ম্মের ষাঁড়, এখন তাহারা মিউনিসিপালিটির ময়লা ফেলাগাড়ীর বাহক। পূর্ব্বে তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে আহার করিয়া, পরিবর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হওয়ায় সুস্থ ও সবল গবোৎ-পাদন করিত। এখন তাহারা ক্লিষ্ট অপুষ্ট শীর্ণ। সুতরাং তদুৎপাদিত গো দিন দিন অবনতি লাভ করিবে, তাহার বিচিত্র কি? ভাল জাতির জনক ভালজাতির জন-নীর সহিত মিশ্রণ করিয়া নূতন উৎকৃষ্ট জাতি উদ্ভব করিবা গোজাতির উন্নতিসাধন করা দূরে থাকুক, যে রক্ষণ বিষয় যে দুই একটী অনাথসপালা সুনিয়ম ছিল, তাহাও আমরা মূঢ়ের ন্যায় উল্লঙ্ঘন করিয়া গোজাতি উৎসন্ন করিতেছি।

কৃষি কার্য্যের উন্নতির জন্য স্থানে স্থানে জলসেচনের বিশেষ প্রয়োজন। প্রাচীন কালে জলসেচনের জন্য খাল কাটিয়া নদী লইয়া যাওয়া হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"শুক্র নীতিতে দেখা যায়, শাস্ত্রকারেরা দেশকে নদীমাতৃক * করিবার জন্য রাজা-দিগকে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়াছেন। মহাকবি ভারবি বিরচিত কিরাতার্জ্জুনীয় কাব্যে উল্লেখ আছে;—"রাজা দুর্য্যোধন দেবমাতৃক * দেশকে নদীমাতৃক * করিয়া-ছিলেন।" ইহাতে বোধ হয় গবর্ণমেণ্ট এখন যে (Irrigation) জলসেচন প্রণালী অব লম্বন করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন ভারতে

* নদীর জল দ্বারা উৎপন্ন শস্যে যে দেশ পালিত, তাহার নাম নদীমাতৃক দেশ। বৃষ্টির জল দ্বারা উৎ-পন্ন শস্যে যে দেশ পালিত, তাহার নাম দেবমাতৃক দেশ।

অজ্ঞাত ছিল না; এবং প্রাচীন কালে অন্ততঃ সমুদয় কুরু প্রদেশ নদীমাতৃক করা অর্থাৎ irrigated হইয়াছিল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দেশ নদীমাতৃক করিবার জন্ত বহুতর চেষ্টা করিতেছেন। উড়িষ্যা খাল, শোণ খাল, পঞ্জাবের পশ্চিম যমুনা খাল, সার্হিন্দ খাল, বারি দোয়াবখাল, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গঙ্গা-খাল, পূর্ব্ব যমুনাখাল, আগ্রাখাল;—প্রভৃতি অনেক খালে গবর্ণমেণ্ট অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ সমিতির ১৮৮০ সালে প্রকাশিত বিবরণে জানা যায়, ভারতবর্ষের কমবেশী ৬০ কোটি আবাদী জমীর মধ্যে ৯ কোটি জমী নদীমাতৃক বা irrigated হইয়াছে। অর্থাৎ আবাদীয় জমির শত করা ১৫ বিঘাজমি সিঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু সম্প্রতি পার্লিয়ামেণ্টে একজন সভ্য এবিষয় গবর্ণমেণ্টের দোষ ধরিয়াছেন। ভারতে বর্ত্তমান ছোট সেক্রেটারি কুর্জ্জন সাহেব তাহার উত্তর দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছেন। সে যাহা হউক, ভারত কৃষকও অনেক জমিতে জল সেচন করিয়া শস্তোৎপাদন করে। এ বিষয়ে সরকারি এবং বেসরকারি লোকের এখনও অনেক যাহের আছে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া উঠিল। ভারতকৃষি সম্বন্ধে আমি কোন নূতন কথা বলিলাম, তাহা মনে করি না। ভীলকার, ওয়ারেন প্রভৃতি ইউরোপের কৃষিতত্ত্বজ্ঞ মহাপণ্ডিতগণ ভারতবর্ষে আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া ও বিশেষ কিছু নূতন বলিতে পারেন নাই ভারতবর্ষে কৃষিকার্য্যে যে কিছু উন্নতি হইতে পারে, তাহা অনেকে স্বীকার করেন না। হিন্দুপেট্রিয়ট এক কথায় সব আপদ বালাই চুকাইয়া দিয়াছেন—"অবৈজ্ঞানিক কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে এদেশীয় কৃষকের নূতন কিছু শিখিবার নাই, এবং বৈজ্ঞানিক কৃষি তাঁহাদিগের অর্থ সামর্থ্যের অতীত।" এ কথাটী যে নিতান্ত অমূলক, তাহা বলি না। কিন্তু বহুব্যয়-সাধ্য বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ কৃষকের অসাধ্য হইলেও আমাদিগের দেশে ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইতে পারে। সৈদাপেটের আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের বৈজ্ঞানিক চেষ্টা বিশেষ কৃতকার্য্য হয় নাই বটে, তথাপি আমাদিগের দেশের শিক্ষিত জমিদারগণ কৃষকদিগকে লইয়া যদি অধ্যবসায়ের সহিত কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। অনাহার নিবারণ উপায় বিস্তৃত ভাবে একটী প্রবন্ধে লেখা হউক। এ বিষয় বারান্তরে লিখিবার ইচ্ছা থাকিল। এখন, দেশের চিন্তাশীল স্বদেশপ্রেমিক-মহাত্মাদিগের নিকট আমার ব্যাকুল ও সাগ্রহ নিবেদন যে, তাঁহারা তাঁহাদিগের সমুদয় বুদ্ধি, চিন্তা, যত্ন ও উদ্যোগ এই দিকে প্রয়োগ করুন— অহর্নিশ ক্ষুধার যন্ত্রণা, অর্দ্ধাহারের শীর্ণতা ও ক্রমিক অবনতি ও বিনাশ, এবং অনাহারে সদ্যমৃত্যু হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা অগ্রসর হউন।

এখন কেবল—কবিত্বকুঞ্জকুটীরে,
কোমলমলয় সমীরে,
কল্পনার মৃদু বিলাস বংশীধ্বনি শুনিবার সময় নহে—এখন কোমলকান্ত পদাবলী নাহি চাহে দেশ, এখন কেবল বক্ষস্তারবর্ষণে নাহি সুখলেশ, এখন দেশ চাহে অন্ন, চাহে আহার। "অন্নং প্রাণা অন্নং বলঞ্চ অন্নং সর্ব্বার্থ সাধকং।" দেহি অন্নং দেহি অন্নং" চাহে সর্ব্বজন—

জঠরানলে জলিছে দেহ,
এই আগুন নিবাও কেহ,
কে আছ স্বদেশ প্রেমী,
কে আছ ধীর,কে আছ বীর,সম্মুখে এস।
যুঝ দুর্ভিক্ষ রাক্ষস সনে,
অমৃতলোক বাঁচাও প্রাণে,
কে আছ আর্য্য কার্য্যকমি, সম্মুখে এস।

মহত্তর ভারতচন্দ্র, ভারতত্রাতা হয়ে, মহীয়ান্ কৃষ্ণচন্দ্র হরি নাম লয়ে, রচ নব্য অন্নদামঙ্গল মহাকাব্য, ভারতজন যাহে পাবে অন্ন নিরবধি।

এস মা অন্নদে! দেও অন্ন, হাহাকার করে পুত্র কন্যা তব, অন্ন বিনা আজি, তোমার অন্নপূর্ণ ভারতে। দেও সুমতি রাজার, দেও সুমতি প্রজার, যাহে উভে মিলে মিশে করে শান্তি—এঘোর বিপত্তির। বঙ্গ-হৃদয়ক্ষেত্রে চিন্তাবীজ, যত্ন উৎসাহবারি, বাহুযুগে দেও বল—সুখময় রামরাজ্য ভারতে বিতর আবার।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল রায়।

গোবিন্দদাস কবিরাজ

দাস শব্দে যেমন দৈন্য প্রকাশ হয়, এমন আর কোন শব্দে নহে। মৈত্র ও দৈবা, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান শিক্ষা, দৈন্য ও ভক্তি বৈষ্ণবের লক্ষণ। কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, এই দৈন্যভাব প্রকাশ করিতে গৌরাঙ্গভক্ত বৈষ্ণবমাত্র আপনাকে দাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কাহার দাস?—চৈতন্য-দাস। শেষে এমনি হইয়া পড়িয়াছে যে, জীবন-চরিত লিখিতে জাতি নির্ণয় করিবার সময়, বা কোন্ কীর্ত্তনটী কাহার রচিত ঠিক করিতে হইলে গোলযোগ বাঁধিয়া যায়। যে সকল মূল গ্রন্থ উপলক্ষ করিয়া বৈষ্ণব কাব্যের সংগ্রহ গ্রন্থ সকল রচিত হইয়াছে, দুর্ভাগ্য ক্রমে সে সকল মূলগ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই। সংগ্রহ গ্রন্থে কবিতা দেখিয়া, সে কবিতাটী কাহার রচিত,অনেক সময় নিশ্চয় বলা যায় না। অথচ বৈষ্ণব কবিগণ বাঙ্গালাভাষার সূত্রধর। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গুণরাজ খাঁন, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি বাঙ্গালা কাব্যের আদিপুরুষ। ইঁহাদের জীবন চরিত্র সংগ্রহ করা যেমন কর্ত্তব্য, তেমনি আনন্দজনক। কার্য্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না।

গোবিন্দ দাসের ভণিতাযুক্ত বিস্তর গান সংগ্রহ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ অনেকগুলি বৈষ্ণব প্রধানের নাম গোবিন্দ ছিল। তাহার মধ্যে কয়েকজনের উল্লেখ করা গেল।

১ম। মৈথিলী গোবিন্দ দাস। ইঁহার রচিত বিস্তর কাব্য মিথিলায় অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

২য়। গোবিন্দ দত্ত, চৈতন্যদেবের পার্ষদ কীর্ত্তনীয়া।

৩য়। গোবিন্দ ঘোষ, বাসু ঘোষের দাদা, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের প্রকাশক।

৪র্থ। গতি গোবিন্দ, শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র। কোন কোন লেখক ইঁহাকে গীতগোবিন্দ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

৫ম। গোবিন্দ দাস, রামচন্দ্র কবিরাজের কনিষ্ঠ, শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। ইঁহারই জীবন চরিত সংগ্রহ করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। চৈতন্যদেবের পরিকরের মধ্যে, চিরঞ্জীব সেন একজন।

> ভাগবতাচার্য্য, চিরঞ্জীব, রঘুনন্দন।
> মাধবাচার্য্য, কমলাকান্ত, শ্রীযদুনন্দন॥
>
> অন্যত্র
>
> মুকুন্দদাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
> খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন॥
>
> —চৈতন্যচরিতামৃত।

ইনি প্রতিবৎসর রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে পুরুষোত্তম শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া মহাপ্রভুকে দেখিয়া আসিতেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য, নিবাস কাঁটোয়ার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডের সন্নিকট ভাগীরথী তট-বর্ত্তী কুমার নগর। ইঁহার দুই পুত্র, রামচন্দ্র ও গোবিন্দ। ইঁহারা দুই জনেই কবিরাজ উপাধি পাইয়াছিলেন এবং দুই জনেই চৈতন্যচরিতামৃতে নিত্যানন্দের শাখার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন।

কংশারী সেন রামসেন রামচন্দ্র কবিরাজ।
গোবিন্দ শ্রীরঙ্গ কুমুদ তিন কবিরাজ।

ভক্তমালায় গোবিন্দকে রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ভক্তমাল দৃষ্টে কোন কোন লেখক রামচন্দ্রকে কনিষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ রামচন্দ্র চিরঞ্জীব সেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং গোবিন্দ কনিষ্ঠ।

ভক্তমালে লিখিত হইয়াছে,—বুধরী নিবাসী রামচন্দ্র কবিরাজ বিবাহ করিয়া লোকজন সঙ্গে বাটীতে ফিরিতেছেন। বাহকেরা এক বৃক্ষ ছায়ায় শিবিকা রাখিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, সেই সময় শ্রীনিবাস আচার্য্য কয়েকজন লোকের নিকট সংসারের অনিত্যতা ও কৃষ্ণ-ভক্তির উৎকর্ষতা বুঝাইতেছিলেন এবং প্রসঙ্গ ক্রমে রামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন,—

এই যে পুরুষ হেন সৌন্দর্য্য শোভায়।
কৃষ্ণ দাস হয় যদি তবে সুশোভয়।

রামচন্দ্র বিখ্যাত নৈয়ায়িক কবি, পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ। আচার্য্য প্রভুর কথায় তাঁহার চিত্তে বৈরাগ্যের উদয় হইল। দুই তিন দিন পরে তিনি আচার্য্যের নিকট গিয়া রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, ক্রমে রামচন্দ্রের এমন গুরুভক্তি জন্মিয়াছিল যে,

এক দিন প্রভু রাত্রে কৃষ্ণ কথা রঙ্গে।
আঙ্গিনায় ফিরিতেছেন রামচন্দ্র সঙ্গে।
এক যে খড়ের বড় আছে আঙ্গীনায়।
প্রভু কহে রামচন্দ্র সর্প বুঝি হয়।
খড় খড় বলি রামচন্দ্র তা না জানে।
প্রভু আজ্ঞায় তাহা সাপই দেখনে।
বটে বটে প্রভু ঐ বড় সর্প হয়।
পুনঃ প্রভু কহে নহে খড় বড় হয়।
সর্প ঘুচি পুনঃ রামচন্দ্র দেখে খড়।
অর্জ্জুন যেমন পক্ষী চক্ষে মারে শর।

একবার আচার্য্য প্রভু ভাব বশে মনে মনে গোপী ভাবে রাধিকার সঙ্গিনী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জলে কেলি করিতেছিলেন। সহসা শ্রীমতীর কর্ণের কুণ্ডল খসিয়া জলে পড়িল। আচার্য্য এক ধ্যানে সপ্তরাত্র সেই কুণ্ডল খুঁজিতে লাগিলেন।

খুঁজিতে খুঁজিতে হেথা সপ্ত রাত্র গেল।
বাহ্য নাহি একাসনে বসিয়া রহিল॥
শ্রীমতী গৌরাঙ্গ প্রিয়া ঠাকুরাণী আদি।
কাঁদিয়া আকুল চক্ষে বহে জল নদী॥
ভক্ত বৃন্দ শতেক বীর হাম্বীর রাজন।
ব্যস্ত সমস্ত সবে করয়ে ক্রন্দন॥
সাত দিন রাত্র ধ্যান ভঙ্গ নাহি হৈল।
সবে কহে প্রভু বুঝি লীলা সম্বরিল॥
কাঁদিয়া কহেন ঠাকুরাণী সখা স্থানে।
প্রভুর অন্তর রামচন্দ্র ভাল জানে॥
অতি প্রিয়তম রামচন্দ্র কবিরাজ।
শীঘ্র তাঁহাকে ডাক নাহি কর ব্যাজ॥

রামচন্দ্র উপস্থিত হইয়া সকল কথা শুনিয়া ধ্যানস্থ হইয়া গুরুর মনোভাব বুঝিতে পারিলেন। শ্যামের বাঁশী কি সঙ্কেত করে, তাহা শ্যাম সোহাগিনী ভিন্ন আর কেহ বুঝে না। এইরূপেই প্রণয়ীর মনের ইচ্ছা প্রণয়িনী বুঝিয়া লয়,—ভক্তের আকর্ষণে পার্ব্বতীর আসন টলে। বিদেশীর স্মরণে বিদেশিনীর মন চঞ্চল হয়—কম্বারল্যাণ্ড বাদসাহের মনোভাব বুঝিতে পারেন। কথাটী ভাবুকের, কিন্তু বৈজ্ঞানিক নিঃসংশয়ে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভাবুকের মত বৈজ্ঞানিক কে? যাহার ভাবুকতা নাই, তাহার বিজ্ঞান চর্চ্চা বিফল। রামচন্দ্রও কুণ্ডল খুঁজিতে লাগিলেন।

খুঁজিতে খুঁজিতে এক পদ্ম পত্র তলে।
পাইলেন সেই কৃষ্ণ প্রিয়ার কুণ্ডলে॥

কুণ্ডল পাইয়া দুই সখী আনন্দে কোলা-

কুলি করিয়া শ্রীমতীর গণ্ডচন্দ্রে পরাইয়া দিলেন।

প্রসন্ন হইয়া প্যারী তাম্বুল চর্ব্বিত।
দোঁহা হস্তে দিলেন হইয়া আনন্দিত॥

তাম্বুল পুরস্কার পাইয়া দুজনের বাহু হইল। না ডুবিলে কি ডোবা লোককে তোলা যায়।

ভক্তমালে গোবিন্দ কবিরাজ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে যে তিনি প্রথম বয়সে মহামায়া শক্তি শঙ্করীর উপাসক ছিলেন। একদিন একজন বৈষ্ণব তাঁহার বাটীতে অতিথি হইলে গোবিন্দদেবী গৃহে তাঁহাকে সন্ধ্যাপূজা করিতে কহিয়াছিলেন। সে গৃহে মুক্তকেশীর পূজার সামগ্রী ছিল, বৈষ্ণব সে সমুদায় শালগ্রামকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। তিনি পূজা সমাপনান্তে রন্ধন শালায় যাইলে নিয়মিত পূজারী আসিয়া না জানিয়া সেই প্রসাদী দ্রব্যে শঙ্করীর পূজা সমাপন করিল। বিষ্ণুর প্রসাদ অতি যত্নে শঙ্করী গ্রহণ করিলেন এবং সেই রাত্রে স্বপ্নযোগে গোবিন্দকে সকল কথা বলিলেন এবং বিষ্ণু যে সকলের উপাস্য, তাহাও উপদেশ করিলেন। ইহার কয়েক দিন পরে গ্রহিণী রোগে গোবিন্দ মৃতপ্রায় হইলে এক পত্র লিখিয়া রামচন্দ্রকে আপন অবস্থা জানাইলেন এবং তাঁহাকে লিখিলেন যে, বিশেষ অনুরোধ করিয়া আচার্য্য প্রভুকে আনাইয়া আমাকে মন্ত্র দেওয়াইয়া উদ্ধার করাইবে।

পত্রিপাঠ করি সাধু উল্লাস হইলা।
আচার্য্য প্রভুর পদ ধরিয়া পড়িলা॥
প্রভু তুমি মোদের কুলের দেবতা।
তোমা বিনা কেহ নাহি মোসবার ত্রাতা॥
মোর জ্যেষ্ঠ ভাই তব শরণ লইল।
কাতর হইয়া মোরে পত্রি পাঠাইল॥

সে কথা শুনিয়া আচার্য্য জাজপুর হইতে বুধরী যাইয়া গোবিন্দকে রাধা কৃষ্ণ মন্ত্র প্রদান করিলেন।

এইখানে ভক্তমালার আখ্যায়িকা সমাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং ভক্তমালা হইতে গোবিন্দের জীবন বৃত্তান্ত অল্পই জানা যায়। ভক্তিরত্নাকর বৈষ্ণব সমাজে একখানি সমাদৃত গ্রন্থ। ঘনশ্যাম নরহরি এই গ্রন্থের রচয়িতা। ঘনশ্যামের শ্রীনিবাসচরিত, নরোত্তমবিলাস ও ভক্তিরত্নাকর ঐতিহাসিক বিবরণে পরিপূর্ণ। ভক্তি-রত্নাকর ও নরোত্তমবিলাস হইতে আমরা গোবিন্দের ও প্রসঙ্গ ক্রমে রামচন্দ্রের জীবন চরিত সংগ্রহ করিব।

অনন্ত চৈতন্য ভক্তের তালিকায় নরহরি চিরঞ্জীব সেনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

জয় শ্রীহৃদয়ানন্দ আচার্য্য রতন।
জয় চিরঞ্জীব সেন শ্রীরঘুনন্দন।

শ্রীখণ্ডের দামোদর সেনের কন্যা সুনন্দাকে চিরঞ্জীব বিবাহ করেন। সুনন্দার গর্ভে রামচন্দ্র ও গোবিন্দের জন্ম হয়। বোধ হয়, গোবিন্দ মাতৃকুলে কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছিলেন। নরহরি দামোদর সেনকে বিখ্যাত কবি বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

রামচন্দ্র গোবিন্দ এ দুই সহোদর।
পিতা চিরঞ্জীব মাতামহ দামোদর॥
দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে।
যেহোঁ মহা কবিনাম বিদিত জগতে॥

গোবিন্দ আপনার সঙ্গীত মাধব নাটকেও মাতামহের কবিত্বশক্তির উল্লেখ করিয়াছেন,—

পাতালে বাসুকী বক্তা, স্বর্গে বক্তা বৃহস্পতি।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনোবক্তা খণ্ডে দামোদর কবি॥

কথিত আছে, এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত দামোদরের নিকট সহজে পরাস্ত হইয়া,

অপুত্রক হও, বলিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন।

দামোদর কবি মহা যুক্তি পরায়ণ।
কোন রূপে লজ্যিতে নারয়ে কোন জন ॥
এক দিগ্বিজয়ী অন্নে পরাভব হৈয়া।
অপুত্রক হও শাঁপ দিল দুঃখ পাঁয়া ॥
দামোদর প্রসন্ন করিল নানা মতে।
তেঁহো কহে হবে ধন্যা সে জগতে ॥
জন্মিবে তাঁহার গর্ভে পুত্র রত্ন দ্বয়।
সে দোঁহো প্রভাবে হবে অমঙ্গল ক্ষয় ॥
বিপ্র ঘরে সুনন্দা নামেতে হৈল কন্যা।
দিনে দিনে বাড়ে মহা রূপে গুণে ধন্যা ॥

* * *

দামোদর কবিরাজ মহাভাগ্যবান।
চিরঞ্জীব সেনে কৈল কন্যা সম্প্রদান ॥

বিবাহান্তে চিরঞ্জীবকুমার নগর পরিত্যাগ করিয়া শ্রীখণ্ডে বাস করেন।

ভাগীরথী তীরে গ্রাম কুমার নগর।
অনেক বৈষ্ণব তথা বসতি সুন্দর ॥
সেই গ্রামে চিরঞ্জীব সেনের বসতি।
বিবাহ করিয়া খণ্ডে করিলেন স্থিতি ॥

* * *

শ্রীচৈতন্য প্রভুর পার্ষদ বিজ্ঞবর।
নিরন্তর সংকীর্তনে উন্মত্ত অন্তর ॥
খণ্ড বাসে চিরঞ্জীব বিদিত সর্ব্বত্র।
দীন হীনে কৈল যেঁহো ভক্তি রস পাত্র ॥

চিরঞ্জীবের দুই পুত্রই পণ্ডিত ও যশস্বী। দুই জনেই কবিরাজ উপাধি পাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র বৃন্দাবনে উপাধি পান।

শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য প্রেম রাশি।
জীব গোস্বামী আদি বৃন্দাবনবাসী ॥
সবে তাঁর কৃত কাব্য শুনি তাঁর মুখে।
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিল মহা সুখে ॥
রামচন্দ্র কবিরাজ সর্ব্বগুণ ময়।
যাঁর অভিন্নাত্মা নরোত্তম মহাশয় ॥

গোবিন্দ কোথায় কবিরাজ উপাধি পান, সে সম্বন্ধে ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। বোধ হয়, শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহাকে প্রথমে কবিরাজ উপাধি দিয়াছিলেন। তাহার পর গোবিন্দ যখন নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবী দেবীর সঙ্গে বৃন্দাবন গমন করেন, তথায় জীবগোস্বামী প্রভৃতি বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণ তাঁহার কবিত্বের পরীক্ষা লইয়া কবিরাজ উপাধি স্বীকার করেন।

গোবিন্দ শ্রীরাম চন্দ্রানুজ ভক্তিময়।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিদ্যা কবি সবে প্রশংসয় ॥
শ্রীজীব শ্রীলোক নাথ আদি বৃন্দাবনে।
পরমানন্দিত যার গীতামৃত পানে ॥
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলেন তথায়।
কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজাঙ্গ গোসাঞে।

শ্রীনিবাস আচার্য্য ও রামচন্দ্রের কিরূপে পরিচয় হয়, ভক্তমালা হইতে পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। ভক্তি রত্নাকরে এই ঘটনা কিছু ভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে। রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে শ্রীনিবাস আচার্য্য স্বয়ং বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে রামচন্দ্রের বিবাহ শুনিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বিবাহের অকিঞ্চিৎকারিতা সম্বন্ধে আলাপ করিবেন, সম্ভব নয়। বোধ হয়, রামচন্দ্রের গৃহস্থাশ্রমে ঔদাসীন্য দেখিয়া ভবিষ্যৎকালে এইরূপ কোন প্রবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। ভক্তিরত্নাকরের বিবরণ অধিকতর সম্ভব।

এক দিন আচার্য্য ঠাকুর জাজী গ্রামে।
সরোবর তটে গেলা বাড়ীর পশ্চিমে ॥
গণসহ বৈসে তথা তেজে সূর্য্য প্রায়।
সকরুণ নয়নে পথের পানে চায় ॥
দেখি এক জন দিব্য দোলার উপর।
সুসজ্জে বিবাহ করি যায় নিজ ঘর ॥
কন্দর্প সমান শোভা ভূষণে ভূষিত।
অতি সুকোমল তনু জিনি নবনীত ॥

* * *

কি অপূর্ব্ব যৌবন দেবতা মনে লয়।
এদেহ সার্থক যদি কৃষ্ণেরে ভজয়॥
ঐছে বিচারিয়া কহে সঙ্গী লোক প্রতি।
কি নাম কি জাতি এ পাত্রের কোথা স্থিতি॥
কেহো প্রণমিয়া কহে এ মহা পণ্ডিত।
রামচন্দ্র নাম কবি নৃপতি বিদিত॥
দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক যশস্বী প্রবর।
বৈদ্য কুলোদ্ভব বাস কুমার নগর॥

এই দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক পরদিন ফিরিয়া আসিয়া আচার্য্যের পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া কিছুদিন পরে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ভবিষ্যতে তিনি চিকিৎসা ব্যবসায় চালাইয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। নরহরি লিখিয়াছেন—

এ সব প্রসঙ্গ কবিরাজ কর্ণপুর।
নিজকৃত গ্রন্থে বলিলেন সুমধুর॥

এ কোন্ গ্রন্থ, আমরা জানিতে পারি নাই। রামচন্দ্রের মন্ত্র গ্রহণের কিছুকাল পরে শুক্লাম্বর, গদাধর দাস প্রভৃতির সংগোপন কথা শুনিয়া সহসা বৈরাগ্য উদয় হওয়াতে শ্রীনিবাস আচার্য্য গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন চলিয়া যান। ইহার একমাস পরে শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনাথ ঠাকুরের আদেশ ক্রমে আচার্য্যকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য রামচন্দ্র বৃন্দাবন গিয়াছিলেন।

ঐছে শ্রীনিবাসাচার্য্য বৈসে বৃন্দাবনে।
গৌড়েতে ব্যাকুল সবে আচার্য্য বিহনে॥
একদিন শ্রীখণ্ডেতে শ্রীরঘুনন্দন।
রামচন্দ্র কহে অতি মধুর বচন॥
হইল সকল শূন্য কহিতে কি আর।
বৃন্দাবন যাও শীঘ্র এ কার্য্য তোমার॥

নরোত্তমের নিকট থাকিবার বাসনায় এবং কুমার নগরে উৎপাতের আশঙ্কা করিয়া বৃন্দাবন যাইবার সময় রামচন্দ্র শ্রীখণ্ড পরিত্যাগ করিয়া বুধরীতে উঠিয়া যাইবার জন্য ভ্রাতাকে পরামর্শ দিয়া যান।

নিজানুজ ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ বিদ্যাবান।
কাব্যেতে চাতুর্য্য চারু সর্ব্বাংশে প্রধান॥
অতি স্নেহাবেশে তারে কহয়ে নিভৃতে।
যাইব শ্রীবৃন্দাবন রজনী প্রভাতে॥
এবে হেথা বাসের সঙ্গতি ভাল নয়।
সদা মনে আশঙ্কা উপজে অতিশয়॥
আছয়ে কিঞ্চিৎ ভৌম বহু দিন হৈতে।
তাহে যে উৎপাত এবে দেখহ সাক্ষাতে।
শীঘ্র ইহা বাসাদিক পরিত্যাগ করি।
নির্ব্বিঘ্নে অন্যত্র বাস হয় সর্ব্বোপরি॥
তাহে এই গঙ্গা পদ্মাবতী মধ্য স্থান।
পুণ্য ক্ষেত্র তেলিয়া বুধরী নামে গ্রাম॥
অতি গণ্ড গ্রাম শিষ্ট লোকের বসতি।
যদি মনে হয় তবে উপযুক্ত স্থিতি॥
শ্রীমাতামহের পূর্ব্বে ছিল গতায়াত।
সকলে জানেন তেঁহো সর্ব্বত্র বিখ্যাত॥
তথা বাস কৈলে অনেকের সুখ হয়।
গোবিন্দ কহয়ে এই কর্ত্তব্য নিশ্চয়।

ভ্রাতার বৃন্দাবন যাইবার দুই চারি দিন পরে গোবিন্দ কুমার নগর পরিত্যাগ করিয়া তেলিয়া বুধরীতে উঠিয়া যান। সেখানকার লোকে তাঁহাকে অতি আনন্দের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিল। পাঠকগণ দেখিবেন যে, শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট লোকেরা রামচন্দ্রকে কুমার গ্রামবাসী চিকিৎসক বলিয়া পরিচয় দিয়াছে এবং এখানে বলা হইল যে, কুমার নগর হইতে গোবিন্দদাস বুধরী গিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, পিতার মৃত্যুর পর রামচন্দ্র ও গোবিন্দ মাতামহের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া পৈতৃক বাস কুমার নগরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। এবং কুমার নগরে থাকিতে না পারিয়া বুধরীতে গমন করেন।

মাতামহ দামোদর সেন ভগবতী ভক্ত ছিলেন। মাতামহের আশ্রয়ে লালিত পালিত হইয়া বাল্যাবধি গোবিন্দ শক্তির

পূজা করিতেন। কুমার নগরেও তাঁর শক্তি-পূজার হ্রাস হয় নাই। কিন্তু ভ্রাতার বৈষ্ণব ধর্ম্মগ্রহণের পরে ক্রমে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মে। ভক্তমালায় বৈষ্ণব গ্রন্থকার ইহাকেই ভগবতীর প্রত্যাদেশ-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরও লিখিয়াছেন,—

ভগবতী পাদ পদ্ম কৈলে আরাধন।
নহিবে কি এ ভববন্ধনাদি বিমোচন॥
হেনকালে অলক্ষ্যে কহয়ে ভগবতী।
কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে দুর্গতি॥
শুনি এই বাক্য মনে বহু খেদ হৈল।
ভজিব শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম দঢ়াইল॥

এই প্রত্যাদেশ কুমার গ্রামে হয়। ইহার পর গোবিন্দ মন্ত্র লইবার জন্য আচার্য্য প্রভুর নিকট জাজী গ্রামে যাইয়া শুনেন যে, তিনি বৃন্দাবন চলিয়া গিয়াছেন। তখন অনুতাপে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে। হয়ত দুই ভাই বৈষ্ণব হইলে কুমার নগরের শাক্তগণ অত্যাচার করিবে আশঙ্কা করিয়া গোবিন্দ বুধরীর পশ্চিম পাড়ায় আসিয়া বাস করেন। গোবিন্দ রামচন্দ্রের একান্ত অনুগত ছিলেন। আচার্য্য ও রামচন্দ্র তখন বৃন্দাবনে—কবে ইহাঁরা দেশে ফিরিবেন, প্রতীক্ষা করিয়া গোবিন্দ পথপানে চাহিয়া রহিলেন। ঐদিকে রামচন্দ্র রঘুনাথ ঠাকুরের আদেশ মত গয়া কাশী অযোধ্যা প্রয়াগ তীর্থ হইয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীজীব, রঘুনাথ দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি গোস্বামীগণ তাঁহার আর্ত্তি দেখিয়া মোহিত হইলেন, সকলেই তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিলেন এবং তাঁহার কবিত্ব শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে কবিরাজ উপাধি দিলেন। বৈশাখী পূর্ণিমায় গোস্বামীগণের নিকট বিদায় হইয়া রামচন্দ্র আচার্য্য প্রভুকে লইয়া বন বিষ্ণুপুর হইয়া জাজী গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার কিছু দিন পরে নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব দিনে শ্রীখণ্ডে মহোৎসব সমাপন করিয়া খেতরী যাইবার সময় রামচন্দ্র ও অন্যান্য শিষ্য সমভিব্যাহারে আচার্য্য প্রভু বুধরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যথা বিধানে আচার্য্যের সমাদর করিয়া গোবিন্দ ভ্রাতার নিকট মনোভাব প্রকাশ করিলেন। রামচন্দ্রের অনুরোধে শ্রীনিবাস আচার্য্য গোবিন্দকে মন্ত্র দান করিলেন।

এই সময়ে আচার্য্যকে দেখিবার জন্য নরোত্তম এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। এইখানে রামচন্দ্র ও নরোত্তমে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। পুরুষোত্তমে স্বপ্নাবেশে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নরোত্তমকে বলিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র চিরঞ্জীব সেনের তনয়।
তাসহ তোমার হৈবে অদ্ভুত প্রণয়॥ নরোত্তমবিলাস।

এই সেই রামচন্দ্র। রামচন্দ্র নরোত্তমকে দেখিয়া,

রামচন্দ্র নরোত্তম করি নিরীক্ষণ।
হইল অবেধ্য পূর্ব্ব হইতে স্মরণ॥
নহিল বিশেষ ব্যক্ত হইল কিঞ্চিৎ।
কেহ কেহ জানিয়া না কৈল বিদিত॥

উভয়ে উভয়ের প্রেমোচ্ছ্বাস তখন চাপিয়া গেলেন, কিন্তু সেই অবধি হৃদয়ে হৃদয়ে জড়াইয়া গেল। এই সময় নরোত্তম কয়েক দিন বুধরীতে বাস করিয়াছিলেন। সে কয়েক দিন নরোত্তমের নব আবিষ্কৃত গরাণহাটী সংকীর্ত্তনে বুধরী উথলিয়া উঠিয়াছিল। এই সময় বংশীদাস আচার্য্যের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। এখানেই খেতরীর মহা মহোৎসবের পরামর্শ ও নিমন্ত্রণ পত্র বিলি হয়। মহোৎসবের আয়োজন করিবার জন্য বুধরী হইতে খেতরী যাইবার

সময় নরোত্তম আচার্য্যের নিকট রামচন্দ্রকে চাহিয়া লইয়া যান।

একদিন আচার্য্যাদি অধৈর্য্য হৃদয়ে।
না জানি কি নির্জ্জনে কহিলা মহাশয়ে॥
প্রিয় রামচন্দ্রে নরোত্তমে সমর্পিলা।
নরোত্তম যেন সুখ সমুদ্রে ডুবিলা॥
কে বুঝিতে পারে এ আচার্য্যের রীতি।
সমর্পিয়া রামচন্দ্রে হৈলা হর্ষমতি॥

এই অবধি রামচন্দ্র নরোত্তমের নিকট বন্ধু, মন্ত্রী, সহায় ও সম্বল হইয়া চিরদিন বাস করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু গৃহবাসী হন নাই।

তনু মন প্রাণ নাম একই দোঁহার।
কবিরাজ নরোত্তম নাম এ প্রচার॥
নরোত্তম কবিরাজ কহে সর্ব্বজন।
কথান্তর মাত্র যৈছে নর নারায়ণ॥

গোবিন্দদাস আপনার একটী সঙ্গীতে এ কথার উল্লেখ করিয়াছেন।

জয়রে জয়রে জয় ঠাকুর নরোত্তম প্রেম ভকতি মহারাজ।
যা কর মন্ত্রী অভিন্ন কলেবর রামচন্দ্র কবিরাজ॥

নরোত্তম খেতরী চলিয়া যাইবার পরেও আচার্য্য কিছু দিন গোবিন্দের গৃহে বাস করিয়াছিলেন। তিনি গোবিন্দের অদ্ভুত কবিত্বশক্তি দেখিয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বিষয়ে গীতামৃত রচনা করিতে বলেন। প্রতিদিন সেই সঙ্গীত কীর্ত্তনে আচার্য্য আনন্দে অতিবাহিত করিতেন। গোবিন্দের গীতামৃত শুনিয়া আচার্য্য তাঁহাকে কবিরাজ উপাধি দেন।

মহাশয়ে বিদায় করিয়া শ্রীআচার্য্য।
রহেন বুধরীগ্রামে হইয়া অধৈর্য্য॥
রামচন্দ্রানুজ শ্রীগোবিন্দ ভক্তিরাশি।
আচার্য্যের সেবা রসে মগ্ন দিবানিশি॥
দেখি গোবিন্দের চেষ্টা আচার্য্য ঠাকুর।
কৈল অনুগ্রহ সীমা বচনের দূর॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য লীলা বর্ণিতে গোবিন্দে।
আজ্ঞা করিলেন মহা মনের আনন্দে॥
প্রভুর আজ্ঞায় বর্ণে গদ্য পদ্য গীত।
সে সব শুনিতে কার না দ্রবয়ে চিত॥
গোবিন্দের কাব্যে শ্রীআচার্য্য হর্ষ হৈলা।
গোবিন্দে প্রশংসি কবিরাজ খ্যাতি দিলা॥
শ্রীদাসাদি প্রিয়গণে গায়াইল গীত।
গীতামৃতে বৃষ্টি হৈল সর্ব্ব মনোহিত॥

খেতরীর মহোৎসবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবি ও কীর্ত্তনীয়া সকলেই উপস্থিত ছিলেন। বৃন্দাবন দাস, লোচনদাস, জ্ঞান দাস, গোবিন্দ দাস, যদুনন্দন, কর্ণপূর কবিরাজ ও বসন্তরায় তাঁহাদের প্রধান। এই বসন্তরায় নরোত্তমের শিষ্য। ইঁহাকে অনেকে প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। সে বসন্ত জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। কিন্তু এ বসন্তরায় জাতিতে ব্রাহ্মণ। সংগ্রহ গ্রন্থে ইঁহার পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে।

শ্রীনরোত্তমের শিষ্য নাম শ্রীবসন্ত।
বিপ্র কুলোদ্ভব মহাকবি বিদ্যাবন্ত॥

খেতরীর মহোৎসবে সূর্য্যদাসের কন্যা নিত্যানন্দের পত্নী জাহ্নবী ঈশ্বরী উপস্থিত ছিলেন। তিনি খেতরী হইতে বৃন্দাবন যান। তাঁহার সঙ্গে অন্যান্যের সহিত জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস বৃন্দাবন গিয়াছিলেন। জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভৃতি ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণ পরমেশ্বরীদাসের নিকট গোবিন্দের পরিচয় পান।

শ্রীপরমেশ্বরী আচার্য্যের শিষ্যগণে।
গোস্বামী সকলে মিলাইল হর্ষ মনে॥
অতি স্নেহে কহে নাম গোবিন্দ ইশান।
ভক্তিরস পাত্র সর্ব্ব বৈষ্ণবের প্রাণ॥
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেনের নন্দন।
প্রিয় রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হন॥
শুনি শ্রীগোপাল ভট্ট আদি হর্ষ হৈয়া।
কৈলা আলিঙ্গন অতি স্নেহ প্রকাশিয়া॥

* * * *

গোবিন্দের কাব্যামৃত করিতে শ্রবণ।
শ্রীপরমেশ্বরী দাস কৈল নিবেদন॥
শুনি গোবিন্দের কাব্য অতি মনোহর।
হইল সবার অতি উল্লাস অন্তর॥
সবে কহে কবিরাজ খ্যাতিযুক্ত হয়।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বলি প্রশংসয়॥

জাহ্নবী ঈশ্বরীর সঙ্গে গোবিন্দ বৃন্দাবনের চৌষট্টী বন পরিভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণব মহান্তগণের আশীর্ব্বাদ লইয়া ঈশ্বরীর সঙ্গে বুধরীতে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার আসিবার সময় আচার্য্যকে দিবার জন্য জীব গোস্বামী গোপাল বিরুদাবলী গ্রন্থ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন এবং তাঁহাকে অসম্পূর্ণ গীতামৃত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া পাঠাইতে ও ভবিষ্যতে যে সকল গ্রন্থ রচনা করিবেন, তাহা পাঠাইতে অনুরোধ করেন।

বর্ণিলা যে গীতামৃত তাহা পাঠাইবা।
পাঠাইয়া দিবা পুনঃ আর যে বর্ণিবা॥
এত কহি গোপাল বিরুদাবলী দিলা।
শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশে যে গ্রন্থ বর্ণিলা॥

গোবিন্দ বুধরীতে ফিরিয়া আসিলে জীব গোস্বামী তাঁহাকে পত্র লিখিয়া গীতামৃত পাঠাইবার কথা স্মরণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার রচনা ব্রজবাসী মহান্তগণের এতই মনোহর হইয়াছিল।

শ্রীজীব গোস্বামী পত্র দ্বারে ব্রজ হৈতে।
পুনঃ পুনঃ লেখে গীতামৃত পাঠাইতে॥
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ গীতামৃত পানে।
গোস্বামীর আদেশে পাঠান বৃন্দাবনে॥

তখনও সঙ্গীতমাধব রচিত হয় নাই। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া নরোত্তমের পিতৃব্যপুত্র রাজা সন্তোষ দত্তের অনুরোধে গোবিন্দ কবিরাজ সঙ্গীত মাধব রচনা করিয়াছিলেন।

ঐছে সন্তোষ দত্ত অনুমতি দিল।
সঙ্গীত মাধব নাম নাটক বর্ণিল॥

বৃন্দাবন হইতে খেতরী হইয়া জাহ্নবী ঈশ্বরী বুধরীতে গোবিন্দের গৃহে কয়েক দিন আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। গোবিন্দের সেবায় সকলেই তৃপ্ত হইয়াছিলেন। বুধরী হইতে জাহ্নবী শ্বশুরালয় এক চক্রা দেখিতে যান। নরোত্তম রামচন্দ্র ও গোবিন্দ তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। এক চক্রা হইতে তাঁহারা কাটোয়া বা কণ্টক নগরে উপস্থিত হইলে শ্রীনিবাস আচার্য্য জাজীগ্রাম হইতে আসিয়া তথায় তাঁহাদের সহিত মিলিত হন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া জাজীগ্রাম গমন করেন, তথা হইতে গোবিন্দ বুধরী ফিরিয়া আসেন। ইহার কিছুদিন পরে আচার্য্য নরোত্তম ও রামচন্দ্রকে লইয়া নবদ্বীপ পরিভ্রমণ করেন। বৈষ্ণবের চক্ষে নবদ্বীপ বৃন্দাবন সমতুল্য।

নবদ্বীপ হইতে আচার্য্য নরোত্তম ও রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া শ্রীখণ্ড হইয়া জাজীগ্রামে প্রত্যাগমন করেন। এইখানে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীরের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়, গোবিন্দও এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময়ে জাহ্নবী ঈশ্বরী নৌকাযোগে শ্রীরাধিকা মূর্ত্তি বৃন্দাবনে গোপীনাথের জন্য প্রেরণ করেন, মূর্ত্তি লইয়া নৌকা কণ্টক নগরে উপস্থিত হইলে সকলে কাটোয়া যাইয়া সংকীর্ত্তন করেন। তদনন্তর তাঁহারা জাজীগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া রাজা বীর হাম্বীরকে স্বদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। জাজীগ্রাম হইতে আচার্য্য কাঞ্চন গড়ীয়া হইয়া সকলকে লইয়া বুধরীতে গোবিন্দের আলয়ে উপস্থিত হন। সেখানে দুই দিন সংকীর্ত্তনে অতিবাহিত করিয়া খেতরী গমন করেন।

এইরূপে ভক্তগণ কখন জাজীগ্রাম, কখন

শ্রীখণ্ড, কখন বুধরী, কখন খেতরীতে সঙ্কীর্ত্তনানন্দে ভাগবত ব্যাখ্যা ও ধর্ম্ম প্রচারে দিনপাত করিতেন। রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর বড় মিষ্ট ছিল এজন্য ভাগবত ব্যাখ্যা তিনিই করিতেন। গোবিন্দ কীর্ত্তনের গান বাঁধিয়া দিতেন। একবার নিত্যানন্দের পুত্র বীরচন্দ্র খেতরী আসিয়া কীর্ত্তনীয়া গোকুল দাসের মুখে গোবিন্দের রচিত গীত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের দুটী কর ধরি।
কহে তুয়া কাব্যের বালাই লয়ে মরি॥

তাঁহারা পত্রের দ্বারা বৃন্দাবনের মোহন্তগণের সংবাদ পাইতেন। এইখানে গোবিন্দের নিকট জীব গোস্বামীর প্রেরিত দুই খানি পত্র আমরা ভক্তিরত্নাকর হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রো জয়তি।

স্বস্তি সমস্তবৈষ্ণবগণপ্রশস্ত শ্রীরামচন্দ্রকবিরাজ-শ্রীনরোত্তমদাস-শ্রীগোবিন্দদাসাখ্যমদ্বিধসুখাস্পদসম্পদ্রূপেষু। বৃন্দাবনাজ্জীবনমহমালিঙ্গনং নিবেদয়ামি। সমীহে বিশেষতস্তু ভবতাং কুশলং। স্নেহসূচকপত্রমুপলব্ধং তদেব মুহুর্বাঞ্ছামি তত্র যন্মৎস্নেহং বিধায় শ্রীমন্তি গীতানি প্রস্থাপিতানি তেন স্বদীয়মঙ্গলসঙ্গতোঽস্মি। কিং বহুনা নিরুপাধিস্নিগ্ধেষু। অথ যন্মুহুর্নিত্যস্মরণপ্রক্রিয়া মৃগ্যতে তত্তৎ শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ ব্যক্তমেবাস্তি সেবাসাধকরূপেণেত্যাদিনা তত্র সাধকরূপেণ বহির্দেহেন সিদ্ধরূপেণ নিজেষ্টসেবানুরূপচিন্তিতদেহেনেত্যর্থঃ। তত্রচ সিদ্ধরূপেণ রাগানুসারেণেবেতি • কালদেশলীলাভেদা বহুধেতি কিয়ত্‌ লেখ্যং সাধকরূপেণ সেবা তু ত্রিবিধপ্রক্রিয়য়া আগমাদ্যনুসারেণ জ্ঞেয়া। শ্রীমদাচার্য্যমহাশয়স্তত্র উপাদেক্ষ্যন্তি। এতে হ্যস্মাকং সর্ব্বস্বমেবেতি কিমধিকং। বৈশাখস্য চতুর্দশে অহনি।

(২)

বৃন্দাবনচন্দ্রো জয়তি।

স্বস্তি পরমপ্রেমাস্পদশ্রীগোবিন্দকবিরাজ-মহাভাগবতেষু। জীবস্য কৃষ্ণস্মরণং শ্রীমতাং ভবতাং শুভানুধ্যানেনাত্রত্যকুশলং তত্রত্যং তদীহেত মাং। তত্র ভবন্ত এবাস্মাকং মিত্রতয়া বিরাজন্তে তস্মাদ্ভবদীয়ং কুশলং শ্রোতুং সদা বাঞ্ছামস্তত্রাবধানং কর্ত্তব্যং। সংপ্রতি যৎ শ্রীকৃষ্ণবর্ণনাময়স্বীয়ানি গীতানি প্রস্থাপিতানি পূর্ব্বমপি চ যানি তৈরমৃতৈরিব তৃপ্তা বর্ত্তামহে। পুনরপি নূতনতত্তদাশয়া মুহুরপ্যতৃপ্তিঞ্চ লভামহে তস্মাত্তত্র চ দয়াবধানং কর্ত্তব্যং। পবঞ্চ পূর্ব্বং শ্যামদাসমার্দ্দঙ্গিকহস্তেন শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যগোস্বামিকৃতং বৃহৎ ভাগবতামৃতং প্রস্থাপিতমাসীৎ তৎ তত্র প্রবিষ্টং নবা ইতি বিলিখ্য বয়ং সন্দেহান্নিবর্ত্তনীয়াঃ। কিং বহুনা স্বতএব দয়ালুষু শ্রীমৎসু। লিখিতমিদং চৈত্রস্য শুক্লতৃতীয়ায়াং। ইতি নরোত্তমকবিরাজঃ।

শুভাশীর্ব্বাদনিবেদনং বেদমেব, ইহ শ্রীকৃষ্ণদাসস্য নমস্কারঃ।

এই কৃষ্ণদাস আমাদের কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য চরিতামৃত রচয়িতা।

পত্রীপাঠে শ্রীগোবিন্দ বিহ্বল হইয়া।
পাঠাইল গীতামৃত জেষ্ঠে জানাইয়া॥

রামচন্দ্রের শিষ্যগণের মধ্যে হরিরাম আচার্য্য বিখ্যাত। গোবিন্দ দাসের শিষ্যতালিকা পাওয়া যায় নাই।

গোবিন্দ কবিরাজের পুত্রের নাম দিব্য

সিংহ। তিনি পিতার ন্যায় ভক্ত হইয়াছিলেন।

দিব্য সিংহ কবিরাজ গোবিন্দ তনয়।
তাঁর ভক্তিরীতি দেখি হইলা বিস্ময়॥

নরোত্তমবিলাস।

নবোত্তম কায়স্থ হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে শিষ্য করিতেন। এজন্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্য নরসিংহ নামে এক রাজার আশ্রয় লন। নরসিংহ উত্তমোত্তম পণ্ডিত লইয়া নরোত্তমের সঙ্গে বিচার করিবার জন্য আগমন করেন। খেতরীর অনতিদূরে কুমারপুর গ্রামে তাঁহারা উপস্থিত হইলে রামচন্দ্র কবিরাজ ও নরোত্তমের শিষ্য গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী বারুই ও কুমার সাজিয়া কুমারপুরে পান হাঁড়ি বিক্রয় করিতে বসেন। কথায় কথায় পড়ুয়াদিগের সহিত তাঁহাদের বিচার হয়, পড়ুয়া হইতে পণ্ডিত, ক্রমে সকলে দোকানে উপস্থিত হইয়া ঘোর বিচারে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে ছদ্মবেশী কুমার ও বারুই জয়লাভ করেন। যে দেশের কুমার ও বারুই এত পণ্ডিত, সে দেশের নরোত্তমের সহিত বিচারে জয়লাভের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া পণ্ডিতেরা রণে ভঙ্গ দেন। রাজা নরসিংহ নরোত্তমের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

এথা অধ্যাপকগণে পরাজয় করি।
বারুই কুমার দোঁহে চলয়ে খেতরী॥
রামচন্দ্র কাঙ্গালে ডাকিয়া দিল পান।
গঙ্গানারায়ণ হাঁড়ী করিল প্রদান॥

এইখানে রামচন্দ্র সম্বন্ধে আর একটী গল্প উল্লেখ করিতেছি। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, রামচন্দ্র বিবাহ করিয়াও উদাসীন, খেতরীর একটী কুঠীরে দিনপাত করিতেন। তাঁহার সন্তান হয় নাই। তাঁহার স্ত্রী স্বামীকে দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন। রামচন্দ্র তাহার উত্তর দিতেন না। অবশেষে রামচন্দ্রের শ্বশুর ঠাকুর মহাশয়ের নিকট পত্র লেখেন। ঠাকুরমহাশয়ের আদেশে রামচন্দ্র শ্বশুরবাড়ী যান। কিন্তু সারারাত্রি স্ত্রীর কাছে কেবল কৃষ্ণ কথা বলিতে থাকেন, শেষে স্ত্রী ঘুমাইয়া পড়িলে খেতরীতে পলাইয়া আসেন।

তখন নিরুপায় হইয়া অভাগিনী স্বয়ং ঠাকুর মহাশয়কে এই পত্র লিখিলেন,—"আমি অতি দীনা, তাহে কুলবালা, যাইয়া তোমার চরণ দর্শন করি,সে অধিকার আমার নাই। আপনি যদি কৃপা করিয়া এই অধমার বাড়ীতে পদার্পণ করেন, তবে কৃতার্থ হই। আপনার কবিরাজকে সেইখানেই রাখিবেন। কিন্তু শুনিতে পাই, আপনাদের পরস্পর বড় প্রীতি, তিলার্দ্ধ কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। এই নিমিত্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া যদি না আসিতে পারেন, ভাবিয়া সঙ্গে করিয়া আনেন তবে আমি কিরূপে নিষেধ করিব?" পত্র পড়িয়া ঠাকুর মহাশয় হাসিতে হাসিতে রামচন্দ্রকে বলিলেন "আমার সতীন আমার উপর রাগ করিয়াছেন, রাগ করিবার কথা বটে, পত্রখানা পড়িয়া দেখ, আমার দিব্য লাগে, যদি তুমি বাড়ী না যাও।" রামচন্দ্রকে আদেশ পালন করিতে হইল।

প্রভাতে ঠাকুর মহাশয় উঠিয়া যখন ঠাকুর দর্শন করিতে আইসেন, তখন দেখেন কি যে রামচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়াছেন। আর কি করিতেছেন? না ঠাকুরবাড়ী ঝাড়ু দিতেছেন, ঠাকুর মহাশয়কে দেখিয়া রামচন্দ্র অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া আপনার পৃষ্ঠে সেই ঝাঁটা মারিতে লাগিলেন, আর আপনাকে বলিতে লাগিলেন "ধিক্! ধিক্

তোমাকে, তুমি কোথা কি সুখ করিতে গিয়াছিলে” ঠাকুর মহাশয় ব্যস্ত হইয়া রামচন্দ্রের হস্ত ধরিলেন, আর দুইজনে গলাগলি হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর মহাশয় মৃত্তিকাশয়ান রহিলেন, আর আমি কি রূপে স্ত্রীসঙ্গে উত্তম শয্যায় শয়ন করিলাম, এই রামচন্দ্রের মনে হইয়াছিল।

শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত নরোত্তম-চরিত।

জীব গোস্বামীর জীর্ণ দশার কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত বৃদ্ধ বয়সে শ্রীনিবাস আচার্য্য আর একবার সাক্ষাৎ করিবার জন্য রামচন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন প্রস্থান করেন। বৃন্দাবনে উভয়ের অদর্শন হয়। রামচন্দ্রের অভাবে গোবিন্দ নরোত্তমকে শান্ত রাখিতে যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেমিকের বিরহ নির্ব্বাণ কেবল চিতানলে।

আচার্য্য শ্রীশ্রীনিবাস আছিনু যাহার দাস
কথা শুনি যুড়াইত প্রাণ।
তেঁই মোরে ছাড়ি গেলা রামচন্দ্র না আইলা
দুঃখে জিউ করে আনচান॥

* * *

শ্রীঠাকুর মহাশয় স্থির হৈতে নারে।
নির্জ্জন বনেতে গিয়া কাঁদে উচ্চস্বরে॥
ও রামচন্দ্র মোরে গেলা কোথা ছাড়ি।
এত কহি কণ্ঠরুদ্ধ রহে ভূমে পড়ি॥

বিধি মোরে কি করিল শ্রীনিবাস কোথা গেল
হিয়া মাঝে দিয়া দারুণ ব্যথা।
গুণে রামচন্দ্র ছিলা সেই সঙ্গ ছাড়ি গেলা
শুনিতে না পাই মুখের কথা॥
পুনঃ কি এমন হব রামচন্দ্র সঙ্গ পাব
এই জন্ম মিছা বহি গেল।
যদি প্রাণ দেহে থাক রামচন্দ্র বলি ডাক
তবে যদি যাও সেই ভাল।

ননীর পুতলী মিত্র শোকের দাহে ইহার কয়েক মাস মধ্যে গলিয়া গিয়াছিল। নরোত্তমের তিরোভাবের কত দিন পরে গোবিন্দ দাসের তিরোভাব হয়, আমরা জানিতে পারি নাই।

একটী কথা বলিবার বাকী আছে। গোবিন্দদাসের কোন্ সময়ে আবির্ভাব হয়? আমরা দেখাইয়াছি, বৃন্দাবন দাস, কবিরাজ গোস্বামী, কর্ণপুর কবিরাজ ও গোবিন্দদাস সমসাময়িক, তবে বয়সে ছোট বড় ছিলেন। কবিরাজ গোস্বামী বৃদ্ধ বয়সে চৈতন্য-চরিতামৃত রচনা করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্য চৈতন্য-চরিতামৃত বৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশে আনয়ন করিয়াছিলেন। চৈতন্য-চরিতামৃত ১৫৩৭ শকাব্দে সম্পূর্ণ হয়।

আচার্য্যের এদেশে আসিবার তিন চারি বৎসর পরে গোবিন্দ তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। গোবিন্দ পূর্ণ বয়সে মন্ত্র লইয়াছিলেন, যদি তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর অনুমান করা যায়, এবং চরিতামৃত রচিত হইবার পাঁচ বৎসর মধ্যে আচার্য্য উহা এদেশে আনিয়া থাকেন, তবে বোধ হয়, ষোড়শ শকাব্দের প্রথমাংশে গোবিন্দদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ কথাটী আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারিতেছি না। কর্ণপুর কবিরাজের চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক ও বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত হইতে কবিরাজ গোস্বামী কতকগুলি পদ আপন গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহারা সমকালবর্ত্তী হইয়া চরিতামৃত রচিত হইবার পূর্ব্বে আপন আপন গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকিলে, এ কথায় কোন বিসম্বাদ ঘটে না। কিন্তু চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক ১৪৯৪ শকে সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া গ্রন্থ মধ্যে উল্লেখ আছে। প্রায় ৯৪ বৎসর বয়সে কর্ণপুর নাটকখানি সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহার পরেও তিনি ৪০।৫০ বৎসর

জীবিত ছিলেন, বোধ হয় না। হয় ত খেতরীর উৎসবে যে বৃন্দাবন দাস উপস্থিত ছিলেন, তিনি নারায়ণীর পুত্র চৈতন্য-ভাগবতকার নহেন, এবং সে কর্ণপুর কবিরাজ চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটককার নহেন।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী।

তায়কো ব্রাহির জীবন-চরিতের ভূমিকা।

তায়কো ব্রাহির জীবন-চরিতকে ইয়ুরোপে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের ইতিবৃত্ত বলা যাইতে পারে, কারণ তাঁহার আবির্ভাবের দুই শতাব্দী পূর্ব্বে ইয়ুরোপে জ্যোতিষের ভাব সঞ্চারিত হইলেও তিনিই প্রথমত ঐ ভাবকে বিজ্ঞানের পদবীতে অধিষ্ঠিত করেন। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে মিশর দেশের শেষ টলেমি সুবিখ্যাত "আলমাজেস্ত" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার বহুপূর্ব্বে গ্রীক-জাতির মধ্যে জ্যোতিষের বিলক্ষণ চর্চ্চা হইয়াছিল; কিন্তু তাহা ইয়ুরোপের দিকে বিস্তৃত না হইয়া ক্রমে মিশরের দিকে অপসরণ করে, পরিশেষে গ্রীকজাতির গৌরবের অবসানের সহিত তাহাদের জ্ঞানচর্চ্চারও অবসান হয় এবং জ্যোতিষ শাস্ত্র ক্রমে ইয়ুরোপ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। আলমাজেস্ত প্রণয়নের পর চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ইয়ুরোপে জ্যোতিষানুশীলনের কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। তৎপর ক্যাসতীল প্রদেশের অধিপতি দশম আলফন্সো প্রথম ভগীরথ সাজিয়া ইয়ুরোপে জ্যোতির্গঙ্গা আনয়ন করেন, তিনি স্বরাজ্যস্থ কয়েকজন বণিক প্রমুখাৎ আরবজাতির জ্যোতিষানুশীলনের সংবাদ পাইয়া তাহার তথ্যনিরাকরণ ও তদধ্যয়নার্থ কতিপয় কৃতবিদ্য লোককে আরবে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে কয়েকজন জ্যোতির্ব্বিদ গণক আনাইয়া নিজ ব্যয়ে ও স্বতত্ত্বাবধানে এক গ্রহ-তালিকা প্রস্তুত করাইতে আরম্ভ করেন। পরিশেষে রাজাদেশক্রমে তাহা "আলফোন্সাইন গ্রহ-তালিকা" (Tabulæ Al-phonsinæ) নামে প্রচারিত হয়। কিন্তু এই গ্রহ-তালিকা প্রচার ইয়ুরোপে কয়েকজন গণকের সৃষ্টি ভিন্ন জ্যোতিষানুশীলন-বিষয়ে অপর কোনরূপে লাভজনক প্রতিপন্ন হয় নাই। রাজা আলফন্সো সাতিশয় বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যার উৎকর্ষসাধন বিষয়ে আগ্রহাতিশয্য বশতঃ নিয়ত গণকদিগকে স্বীয় রাজসভায় আহ্বান করিয়া তাহাদের সহিত জ্যোতিষালোচনা করিতেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, একদা ঐরূপ আলোচনাকালে কোন গণক গ্রহদিগের গতিবিধিতে প্রভূত অসামঞ্জস্যের বিদ্যমানতা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহার গণন প্রণালী ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, রাজা তচ্ছ্রবণে অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, "হায়! সৃষ্টিকালে ঈশ্বর যখন গ্রহদিগের গতিবিন্যাস করিতেছিলেন, তখন যদি আমি তথায় উপস্থিত থাকিতাম, তবে এমত করিয়া গ্রহগতিবিন্যাসের মন্ত্রণা দিতে পারিতাম, যাহাতে বর্ত্তমান অসামঞ্জস্যতা সকল সংঘটন হইতে পারিত না।"

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে "পুড়বাক" নামক এক জর্ম্মেণ বালক ইতালিতে 'গণিত

শিক্ষার্থ গমন করেন, পাঠশেষ করিয়া গৃহাগমন কালে 'বিনীশ' নগরে একখণ্ড "আলফোন্সাইন গ্রহ-তালিকা" তাঁহার নেত্রপথে পতিত হওয়াতে তিনি তাহা সংগ্রহ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হন, এবং অচিরে 'বিয়েনা' বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া অবকাশ কালে ঐ তালিকা অধ্যয়ন করেন। "রেগিওমণ্ডেনস্" নামে তাঁহার এক অতিপ্রিয় শিষ্য ছিল, তাহার জ্যোতিষে অনুরাগ দৃষ্ট হওয়াতে পুড়বাক তাহাকে উক্ত গ্রহতালিকার গণনপ্রণালী শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং তাহার সাহায্যে কয়েকটী গ্রহের ফল গণনা করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, প্রত্যক্ষ গ্রহ-ফলের সহিত উক্ত গণিত গ্রহফলের ঐক্য হয় না। ইহাতে আলফোন্সাইন গ্রহ-তালিকার প্রতি তাঁহার অনাস্থার উদ্রেক হওয়াতে, তিনি রেগিওমণ্ডেনসের সাহায্যে এক গ্রহতালিকা প্রস্তুত করিতে সঙ্কল্প করিলেন এবং তাহার প্রণালী শিক্ষার্থ ইতালি গমন করিলেন। তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে বেশারিয়ন নামক একজন গ্রীকধর্ম্ম-যাজকের নিকট তিনি আলমাজেস্তের বিবরণ জ্ঞাত হইয়াছিলেন, অতএব ঐ গ্রন্থ সংগ্রহ এবং তাহার লাটিনানুবাদ প্রকাশ করাই তাঁহার ইতালি গমনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ পথে তাঁহার মৃত্যু হয়; তৎপর রেগিওমণ্ডেনস্ তাঁহার কার্য্য-ভার গ্রহণ করেন এবং বহু চেষ্টার পর আলমাজেস্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা লাটিনে অনুবাদ করেন। তাঁহার প্রযত্নে ঐ অনুবাদিত গ্রন্থ বিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ক্রমে জর্ম্মেণির বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হয়। ইয়ুরোপে পুড়-বাক প্রথম ত্রিকোণমিতির শিক্ষা প্রচার করেন; রেগিওমণ্ডেনস্ পুড়বাকের শিক্ষা-ধীন থাকিয়া ঐ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া-ছিলেন। অতএব তাহা প্রয়োগপূর্ব্বক আলমাজেস্তের জটিল ক্ষেত্রবিজ্ঞান প্রণালী সমূহকে সরল ও প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণের সহজ বোধগম্য করিয়া-ছিলেন।* পুড়বাকের সঙ্কল্পানুসারে তিনি ত্রিকোণমিতির এক নূতন সংস্করণ প্রচার ও তাহা ব্যবহার পূর্ব্বক এক নূতন গ্রহতালিকা প্রস্তুত করিলেন, এবং তৎসাহায্যে দিন-পঞ্জিকা প্রণয়ন করিয়া লোকহিতার্থ তাহা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ দিন-পঞ্জিকা নাবিক সমাজে অতি সমাদরে গৃহীত হইয়াছিল; তল্লিখিত নির্দ্দেশমতে জাহাজ পরিচালিত করিয়াই বাস্কোডিগামা ভারতে ও কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কারে গমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রেগিও-মণ্ডেনসের কীর্ত্তি ক্রমে সমস্ত ইয়ুরোপে ব্যাপৃত হইয়া পড়িল, এবং রোমের ধর্ম্মা-ধিকারী, প্রচলিত বর্ষগণন প্রণালীর উৎকর্ষসাধনার্থ মন্ত্রণা করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে রোমে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু রোম গমনের

* পুড়বাক ইতালিতে অধ্যয়ন কালে আরবীয় গণকদিগের নিকট ত্রিকোণমিতি শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং রেগিওমণ্ডেনস্ প্রথম তাহা জ্যোতিষগণনাতে ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে, হিন্দুগণ তাহার বহুশতাব্দী পূর্ব্বে জ্যোতিষ গণনাতে ত্রিকোণমিতির সূত্র সকল বিশেষ দক্ষতার সহিত ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, সূর্য্যসিদ্ধান্তের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার বিশেষ বিবরণ ও গণনাপ্রণালী দৃষ্ট হইবে। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, হিন্দু হইতে আরবে ও আরব হইতে ইয়ুরোপে ত্রিকোণমিতির শিক্ষা, প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

অব্যবহিত পরেই তিনি তথায় কালগ্রাসে পতিত হন; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তিনি জ্ঞানরাজ্যের পথ সুগম করিয়া জনসাধারণের চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দিতেছেন, অতএব তাহাতে রোমের ধর্ম্মরাজের প্রভুত্বাধিকার লোপ না হইলেও সংকীর্ণ হওয়া নিশ্চিত বিবেচনায় তাহারই নির্দ্দেশক্রমে বিষপ্রয়োগ-পূর্ব্বক রেগিওমণ্ডেনসের প্রাণবিনাশ করা হয়। ১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

রেগিওমণ্ডেনসের যত্নে আলমাজেস্ত গ্রন্থ ইয়ুরোপে প্রবেশাধিকার লাভ করিলে পর জর্ম্মণির বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে তাহা অতি সমাদরে গৃহীত এবং আগ্রহের সহিত পঠিত হইতে লাগিল; ক্রমে তাহার শিক্ষা এত অধিক বিস্তৃত হইয়া পড়িল যে, শত বৎসর না যাইতেই তাহা একরূপ জন-সাধারণের জ্ঞাতব্য ও আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হইল। আলমাজেস্ত এইরূপ নির্ব্বিবাদে ইয়ুরোপের বিজ্ঞানক্ষেত্রে রাজত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে পর নিকোলাস্ কোপর্ণিকস্ প্রথম তাহার প্রভুত্ব বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন। ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রুশিয়ার অন্তঃপাতী থর্ণ-নগরে কোপর্ণিকসের জন্ম হয়। ইনি বাল্যকালে গ্রীক্ অধ্যয়নে বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, একদা পিথাগোরাস্ প্রণীত এক গ্রন্থে দেখিতে পাইলেন যে, উক্ত দার্শনিক পৃথিবীকে সচল এবং সূর্য্যকে নিশ্চল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।* ঐ বাল শিক্ষা তাহার কোমল মনে এইরূপ বদ্ধমূল হয় যে, তিনি কিছুতেই তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না; কাল-ক্রমে বয়সের বৃদ্ধির সহিত তাঁহার মনে সেই ভাব উত্তরোত্তর প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ করিল, এবং পরিশেষে তিনি আলমাজেস্ত অধ্যয়ন করিয়াও বালসুলভ বিশ্বাসকে স্বীয় অন্তর হইতে তিরোহিত করিতে সক্ষম হইলেন না, বরং অধ্যয়নান্তে তৎপ্রদত্ত মত খণ্ডন পূর্ব্বক পিথাগোরাসের মত সপ্রমাণ করিতে সঙ্কল্প করিয়া তাহার গবেষণাতে প্রবৃত্ত হইলেন, ঐ গবেষণার ফলে তাৎকালিক জ্যোতিষের সর্ব্ববাদি-সম্মত মত † খণ্ডন করিয়া ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম "গগনবিহারী গোলকসমূহের আবর্ত্তন বৃত্তান্ত" (De Revolutionibus Orbium Celestium) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, হইতে কোপর্ণিকস্ সপ্রমাণ করেন যে— 'পৃথিবী ও চন্দ্র এই দুয়ের দ্বারা ভূমণ্ডল গঠিত, কারণ চন্দ্রই একমাত্র গোলক, যাহা পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া চলিতেছে। পৃথিবী

* আলমাজেস্ত মতে পৃথিবী নিশ্চলভাবে ভূমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিতি করিতেছে এবং সূর্য্য ও অপরাপর গ্রহগণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে।

† ইহার বহুপূর্ব্বে হিন্দুজ্যোতিষে পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তনের বিশিষ্টরূপ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহার কক্ষাবর্ত্তন বিষয়ে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। হিন্দু-দিগের গ্রহগতি গণন 'কেন্দ্রবৃত্ত' ও 'কেন্দ্রপরিধি' দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহার সহিত টলেমির 'কেন্দ্রবৃত্ত' প্রণালীর মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে, এই হেতু হিন্দু-গণনাতে গ্রহগতি ফল টলেমির গণনসাধিত ফল হইতে অধিকতর বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। তবে হিন্দুমতে গণনসাধিত ফলের সহিত প্রত্যক্ষ ফলের যে বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তাহা উক্ত কক্ষাবর্ত্তনে অজ্ঞতা হেতু ঘটিতেছে না, তাহার অপরাপর কারণ রহিয়াছে। গত চৈত্রের নব্যভারতে "পঞ্জিকা বিভ্রাট" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

স্বয়ং একটী গ্রহ, ইহা অপরাপর গ্রহবর্গের সহিত মিলিত হইয়া সূর্য্যকে বেষ্টন পূর্ব্বক চক্রাকার কক্ষপথে আবর্ত্তন করিতেছে, এই সকলের সমষ্টি এবং তাহাদের সকলের কক্ষকেন্দ্রস্থ সূর্য্যকে একত্রযোগে সৌরমণ্ডল বলা যায়।' কথিত আছে যে তাঁহার মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে উক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইয়া তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল এবং প্রাণবিনির্গমনকাল পর্য্যন্ত তিনি তাহা হস্তে ধারণ করিয়া রহিয়াছিলেন। গ্রন্থের ভূমিকাতে এইরূপ ব্যক্ত আছে যে, ৩৬ বৎসরের অবারিত চিন্তার ফলে ঐ গ্রন্থরত্নের উৎপত্তি হইয়াছে।

কোপর্নিকস্ গ্রহদিগের প্রকৃত গতি-বিধি আবিষ্কার করিয়া জগৎকে এক অতুলনীয় রত্নপ্রভায় আলোকিত করিতে সমর্থ হইলেও গণিত বিজ্ঞানের যথোচিত উৎকর্ষ সাধনাভাবে ঐ গতিপ্রণালী সাধারণের বোধগম্য করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। কাজে কাজেই তাঁহাকে আলমাজেস্ত প্রদত্ত গণিতসূত্র ও 'কেন্দ্রবৃত্ত' প্রণালীর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি গ্রহকক্ষ সমূহকে বৃত্তাকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত গ্রহকক্ষ বৃত্তাকার না হওয়াতে তাঁহার গণিতফলের সহিত প্রত্যক্ষ ফলের বিস্তর বৈষম্য লক্ষিত হইতে লাগিল। অধিকন্তু তাৎকালিক দিন-পঞ্জিকা সকল আলমাজেস্ত মতে গণিত হইত, এবং সাধারণ লোকেরা তাহাতে অধিক প্রত্যয়বান থাকাতে তিনি ঐ সকল পঞ্জিকা-প্রদত্ত-ফলের সহিত স্বীয় গণিত-ফলের বৈষম্য বিদূরণার্থ সচেষ্ট হইলেন; তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, আলমাজেস্তের সহিত তাঁহার গণনার প্রণালী ও ভাবগত প্রভেদ থাকিলেও ফলগত কোন প্রভেদ থাকা সম্ভবপর নহে, কারণ তিনি জানিতেন যে, গগন পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক ফল দৃষ্টে আলমাজেস্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করা হইয়াছিল। তিনি যে প্রণালী মতে গ্রহগতি গণনা করিয়াছিলেন, তাহা এই,—'গ্রহের বৃত্তাকার কক্ষাবর্ত্তনকে মধ্যগতি নির্দ্দেশ করিয়া কেন্দ্রপরিধির * অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মধ্যগতি পথে তাহার আবর্ত্তন কল্পনা করা হয়। ঐ কেন্দ্রপরিধির একবার কক্ষবৃত্ত আবর্ত্তন করিয়া আসিতে যে সময় লাগে, ঐ সময়ে গ্রহ স্বয়ং কেন্দ্র পরিধিতে একবার আবর্ত্তন করিয়া আসে, উভয় আবর্ত্তন একত্রে সংঘটিত হওয়াতে গ্রহ ভিন্ন ভিন্ন মুহূর্ত্তে যে যে স্থানে দৃষ্টিগোচর হয় তাহার সমষ্টিকে গ্রহের স্ফুটগতি বলা যায়। স্ফুটগতি এবং মধ্যগতি এতদুভয়ের অন্তরকে কেন্দ্রফল নামে অভিহিত করিয়া তাহা প্রয়োগ পূর্ব্বক গ্রহের স্থিতি নির্ব্বাচন করা হইয়া থাকে। কেন্দ্রফল সাধন করিতে কেবলমাত্র কেন্দ্রপরিধির ব্যাসার্দ্ধ এবং মধ্যগতি পথে তাহার অবস্থিতি জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, গ্রহের গণন সাধিত মধ্যগতি ও মধ্যগতিপথে, কেন্দ্রপরিধির অবস্থিতি

---

* এই কেন্দ্রপরিধির সহিত টলেমির কেন্দ্রবৃত্তের পরিমাণগত পার্থক্য রহিয়াছে, কিন্তু উভয়েরই প্রয়োগ প্রণালী একরূপ। সূর্য্য-সিদ্ধান্তে কেন্দ্রফল সাধনার্থ যে প্রণালী প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাতে গ্রহ-স্ফুটবৃত্তকে "কেন্দ্র পরিধি" বা "পরিধি" নামে অভিহিত করা হইয়াছে, টলেমির বৃত্তের সহিত "পরিধির" মূলগত প্রভেদ থাকাতে ঐ বৃত্তকে এস্থলে কেন্দ্রবৃত্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইল। কোপর্ণিকসের বৃত্ত প্রণালী টলেমি হইতে সূর্য্য-সিদ্ধান্তের অধিকতর অনুরূপ বলিয়া তাহাকেও "কেন্দ্রপরিধি" বলিয়া অভিহিত হইল। কেন্দ্রপরিধির সহিত কেন্দ্রবৃত্তের পার্থক্য এবং এতদুভয়ের সাধনপ্রণালী প্রবন্ধান্তরে বিবৃত হইবে।

একই কথা, এবং একবার কক্ষাবর্ত্তন কালে গ্রহকে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক মধ্যগতি ফল হইতে তাহার স্থিত্যন্তর সাধন করিলে তাহা হইতে ত্রিকোণমিতির সাহায্যে অনায়াসে কেন্দ্রপবিধির ব্যাসার্দ্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

কোপর্ণিকস্ উক্তরূপ কৃত্রিম উপায়ে গ্রহফল সাধন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, যদিও তাঁহার কেন্দ্র পবিধির প্রয়োগ প্রণালী টলেমির কেন্দ্রবৃত্ত-প্রয়োগ-প্রণালীর অনুরূপ কিন্তু তাঁহার স্বসাধিত ফল টলেমির ফল হইতে অধিকতর বিশুদ্ধ, এই ঘটনা তাঁহাকে স্বীয়মতে অধিকতর আস্থাবান করিল, এবং তিনি স্বীয় শিষ্য রাইণোল্‌ড্‌কে তাঁহার নিজ মতানুসারে গণনা করিয়া অবিলম্বে এক গ্রহতালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন, পরিশেষে এই গ্রহতালিকা "প্রুতনিক তালিকা" (Tabulæ prutenicæ) নামে অভিহিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন কোপর্ণিকস্ স্বীয় গ্রন্থে সপ্রমাণ করিয়াছিলেন যে 'পৃথিবীর মেরুদণ্ড সর্ব্বদা একভাবে দিগ্‌সংলগ্ন না থাকিয়া ভূকেন্দ্রে শীর্ষস্থাপন পূর্ব্বক কেন্দ্রের উভয় পার্শ্বে মঠের চূড়দেশের ন্যায় আবর্ত্তন করিয়া চলিতেছে, ইহা হইতে সহজে অনুমিত হয় যে, স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্ত্তন ও মেরুদণ্ডের উক্তরূপ আবর্ত্তন, এই উভয়ের একত্র সমাবেশ হেতু পৃথিবী একটা লাঠিমের মতন ঘুরিতেছে। উক্ত আবর্ত্তন বশে নিরক্ষবৃত্ত ক্রান্তিবৃত্তের সম্পাতসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া ক্রমে অল্প অল্প পশ্চাদপসরণ করিয়া থাকে, অতএব উহাদিগের সম্পাতবিন্দুদ্বয়কে অল্পে অল্পে পশ্চাদপসরণ করিতে দেখা যায়; ইহাকেই "ক্রান্তিপাতের বক্রগতি" বলা যায়।' এইরূপে পৃথিবীর সচলত্ব সপ্রমাণপূর্ব্বক একটী ভৌতিক প্রক্রিয়ার মূল কারণ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হওয়াতে কোপর্ণিকস্ আপন আবিষ্কৃত সত্যের প্রতি সম্পূর্ণ প্রত্যয়বান হইয়াছিলেন এবং অকুতোভয়ে তাহা প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তাঁহার আবিষ্কৃত সত্য সাধারণের মতবিরোধী এবং তাঁহার গণন প্রণালী টলেমির অনুরূপ হওয়াতে কেহই আলমাজেস্ত ছাড়িয়া তাঁহার গ্রন্থে আস্থা স্থাপন করিতে অগ্রসর হইল না, অতএব তাহা অচিরে বিস্মৃতি-সাগরে নিমজ্জিত হইলে পর কিছুকালের জন্য আলমাজেস্ত জ্যোতিষানুধ্যায়ীবর্গের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিল। আলমাজেস্ত যদি লঙ্কাধিপতি রাবণের ন্যায় সজীব ব্যক্তিবিশেষ হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করিত তবে দেখিতে পাইত যে, কোপর্ণিকসের মৃত্যু তাহাকে নিরুপদ্রব করিতে সক্ষম হইয়াছিল না, তাহার পর চারি বৎসর অতীত না হইতেই, রামের জন্মে রাবণের সিংহাসন বিচলনের ন্যায়, অপর এক মহাবল বিজ্ঞান বীরের জন্মোৎসব তাঁহার সিংহাসন বিচলিত করিয়া হৃৎকম্প উৎপাদন করিত।

কোপর্ণিকসের পর তায়কোব্রাহি প্রথম আলমাজেস্তকে স্থানচ্যুত করিতে প্রয়াস পান, এবং সেই পদচ্যুতির পর হইতে এ পর্য্যন্ত আর আলমাজেস্ত ইয়ুরোপে জ্যোতিষাধ্যয়নের শিরোভূষণ রূপে স্থান পায় নাই। তবে ইহা বলা অত্যুক্তি নহে যে, আলমাজেস্ত একান্ত অনাদরে কালযাপন করিতেছে না; পূর্ব্বতন স্মৃতি জ্যোতিষাঙ্কুরের জননক্ষেত্র, এবং বৈজ্ঞানিক, "আশ্চর্য্য

প্রদীপ” বলিয়া ইহার এখনও বিলক্ষণ সমাদর রহিয়াছে। তায়কোব্রাহি প্রকৃত গ্রহগতি প্রণালী জ্ঞাত ছিলেন না এবং কোপর্ণিকসের আবিষ্কৃতমতে সম্পূর্ণ অনাস্থা প্রদর্শন না করিলেও পৃথিবীর সচলত্ব বিষয়ে একান্ত অনাস্থার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মতে বুধ ও শুক্র গ্রহদ্বয় সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া উপগ্রহরূপে এবং সূর্য্য ও অপরাপর গ্রহগণ পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া গ্রহরূপে পরিভ্রমণ করিতেছে। এই সকলের সমষ্টিকে ভূমণ্ডল বলা যায়, সূর্য্য, বুধ ও শুক্রকে নিয়াই সৌরমণ্ডল গঠিত। (এ স্থলে ইহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে খ্রীষ্টধর্ম্মে অতি বিশ্বাস হেতু এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে কোন প্রমাণ না থাকাতে তিনি পৃথিবীর সচলত্বে বিশ্বাস করেন নাই, তদ্ভিন্ন তিনি তাহার অচলত্বের কোন প্রমাণ নির্দ্দেশ করিতে সক্ষম হন নাই।) * কিন্তু গণিত ও প্রত্যক্ষ ফলে সামঞ্জস্য সাধন জন্য সঙ্কল্প করিয়া তায়কোব্রাহিই ইয়ুরোপে প্রথম জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের অভ্যুদয় করিয়াছিলেন, এবং ঐ সঙ্কল্প সিদ্ধ করণার্থ যে প্রণালীর অবতারণা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সমগ্র ইয়ুরোপ সেই প্রণালীর অনুসরণ করিয়া কার্য্য করিতেছে, তায়কোব্রাহির রোপিত বীজের বৃক্ষ নিত্য নবতেজে বর্দ্ধিত হইয়া বিজ্ঞান জগৎকে মনোমুগ্ধকর ফল পুষ্পে সুশোভিত করিতেছে। আলমাজেস্ত-প্রদত্ত গ্রহ নক্ষত্রাদির ফলের সহিত যে প্রত্যক্ষ ফলের ঐক্য হয় না, তায়কোব্রাহিই প্রথম তাহা উপলব্ধি করেন এবং জগৎকে উপলব্ধি করাইতে প্রয়াস পান; কেবল তাহাই নহে, তিনি উক্ত ফলদ্বয়ের একতা সাধন জন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। তিনিই প্রথম এই সত্য প্রচার করেন যে—“গগনবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলী তাহাদের স্বীয় গতিবিধির পরিচয় জ্ঞাপনে উৎসুক এবং সাক্ষ্য প্রদানার্থ প্রস্তুত হইয়া গগনমার্গে উপস্থিত রহিয়াছে, ও উৎফুল্লনেত্রে আমাদিগকে সাক্ষ্য গ্রহণার্থ কটাক্ষ দ্বারা আহ্বান করিতেছে; তবে কেন আমরা প্রত্যক্ষসাক্ষী গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া কল্পনাকে সাক্ষী মান্য করতঃ তাহার সাক্ষ্যের উপর গ্রহগতির বিচারের ভারার্পণ করিতেছি?” * তিনি এই সত্য প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, পরন্তু গগনপর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর স্বীয় গতি ও স্থিতি বিষয়ে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য-সংগ্রহণে যত্নশীল হইয়া কার্য্যারম্ভ করিলেন। তদুদ্দেশ্যে তিনি যে সব উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং যেরূপে স্বীয় অভীষ্ট কার্য্যসাধন করিয়া জগৎকে তাহার ফলভোগার্থ উত্তরাধিকারী করিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এক কথায় বলিতে গেলে, তিনি যে উপায়ে ইয়ুরোপে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের অভ্যুদয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার জীবনের যে সকল ঘটনাবলী ঐ কার্য্যসাধনে সহায়তা করিয়াছিল, তাহার বিবরণ প্রবন্ধাকারে সংখ্যানুক্রমে প্রকাশিত হইবে। তায়কোব্রাহির জীবনের ঘটনাবলী এবং ইয়ুরোপে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের তাৎকালিক অবস্থা পাঠে

* প্রবন্ধান্তরে দৃষ্ট হইবে তিনি যে অস্ত্রে আলমাজেস্তের ভূমণ্ডলকে ছেদ করিয়াছিলেন, অবশেষে সেই অস্ত্র দ্বারাই তাঁহার স্বীয় ভূমণ্ডল ছিন্ন হইয়াছিল।

* সাধারণ পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থ এস্থলে বলা আবশ্যক যে, তায়কোব্রাহির লাটিনে কবিতা লিখার অভ্যাস ছিল।

যদি কাহারও মনে এই প্রতীতি জন্মে যে, ভারতে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থা তদনুরূপ হইয়া পড়িয়াছে এবং এদেশে জ্যোতিষানুশীলনের পুনরুদ্ধারার্থ একজন তায়কোব্রাহির প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে,' তবে লেখক তাহার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিবে।

এস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক,—বিজ্ঞান জগতে এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে, বহু আয়াসে সংগৃহীত এবং বহুযত্নে সঞ্চিত ধ্রুবফল অতিমাত্র সামান্য অনবধানতাবশতঃ পরিপক্ক হইবার অবসর পায় নাই, অকালে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। সেই হেতু একথা বলা যাইতেছে না যে, তাহার প্রতি জগতের শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু একমাত্র দৃষ্টিশোভা অথবা উক্তফলের ভৌতিক বা প্রাদেশিক তত্ত্বোদ্‌ঘাটন ভিন্ন অপর কোন বিষয়ে তাহা কার্য্যকর বা ফলপ্রদ হয় নাই ; জগৎ তাহা ভোগ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারে নাই। কোপর্ণিকস্-কৃত গ্রহগতির মূলবিধি বিষয়ক আবিষ্ক্রিয়া ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত, যদি তিনি স্বীয় মতে গণিত গ্রহফলকে আলমাজেস্তে গণিত গ্রহফলের সহিত ঐক্য করিতে প্রয়াস না পাইয়া গগনপর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক প্রকৃত গ্রহগতির সহিত তাহার সামঞ্জস্য সাধন করিতে প্রয়াস পাইতেন, তবে বর্ত্তমান সময়ে জগৎ ইয়ুরোপে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের অন্য প্রকার অভ্যুদয় প্রত্যক্ষ করিত, তাহা হইলে কোপর্ণিকসের পর বিজ্ঞানকে কেপলারের আবিষ্ক্রিয়ার জন্য প্রায় শত বৎসর অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত, এরূপ সম্ভব বোধ হয় না। কিন্তু বিধাতার নিয়তি কে খণ্ডন করিবে? কোপর্ণিকসের আহৃত কাল্পনিক রাজ্যের ফল ধ্রুব হইলেও তাহাকে অন্তরালে ফেলিয়া তায়কোব্রাহির প্রত্যক্ষফল জগতে প্রকটিত হইল এবং কেপলারের কার্য্যকলাপ তাহাকে আশ্রয় করিল। এইরূপে যে কেবল বিজ্ঞানের গতি একশত বৎসর পশ্চাদপসরণ করিল তাহা নহে, কোপর্ণিকসের আবিষ্ক্রিয়া নূতন বেশে জগতে পুনঃপ্রচারিত হইল, যাহা হইতে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের অভ্যুদয় হওয়া সম্ভবপর অনুমান করা যাইতেছিল বিধির বিধানে তাহাকে বিজ্ঞানাভ্যুদয়ের তৃতীয় অঙ্কে অধিষ্ঠিত হইতে হইল।

কোপর্ণিকস্‌কে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের অভ্যুদয়কারী না বলিয়া তায়কোব্রাহিকে কেন ঐ পদাভিষিক্ত করা হইতেছে, তদ্বিষয়ে কেহ কেহ তর্ক উত্থাপন করিতে পারেন, কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে বিজ্ঞান শব্দ দ্বারা কি বুঝিতে হইবে, তাহার বিচার করা বিশেষ প্রয়োজন, কারণ এস্থলে তায়কোব্রাহিকে জ্যোতিষানুশীলনের অভ্যুদয়কারী না বলিয়া জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের অভ্যুদয়কারী বলা হইতেছে। জ্ঞানগত ও প্রত্যক্ষগত এতদুভয়বিধ ফলের সমীকরণ প্রণালীই বিজ্ঞানের মূল সূত্র, যে পর্য্যন্ত দৃষ্টিবিষয়ে জ্ঞানচক্ষু ও চর্ম্মচক্ষুর একীকরণ সাধন না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ দৃষ্টিকে বিজ্ঞান বলিয়া অভিহিত করা যায় না। ইহা হইতে দৃষ্ট হইবে যে, প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলা যায়, অতএব কোন প্রাকৃতিকতত্ত্ববিষয়ে জ্ঞানগত ফলকে ব্যক্তি বিশেষের মত বা গণনার আশ্রয়ে বিন্যস্ত করিলে এবং তাহার প্রাকৃতিক সত্যতা নিজে উপলব্ধি না করিলে ঐ ফল বৈজ্ঞানিক প্রণালীর শ্রেণীনিবিষ্ট হয় না। এস্থলে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে

পারে যে, প্রত্যেকে প্রত্যেক সত্য নিজে আবিষ্কার করিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না, তাহাকে অপরের আবিষ্কৃত সত্য কিছু না কিছু মানিয়া নিতেই হইবে, তাহার উত্তরে এইবলা যায় যে, তাহা মানিতে হইলেও যে পর্য্যন্ত ঐ আবিষ্কৃত সত্য নিজে উপলব্ধি না করিয়া কেবল তাহার আবিষ্কর্ত্তা আবিষ্কার করিয়াছে বলিয়াই তাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাকে বিজ্ঞানানুশীলন বলা যায় না। কোপর্ণিকসের মত প্রত্যেক ব্যক্তিই পৃথিবীর সচলত্ব আবিষ্কারে সমর্থ না হইলেও ঐ আবিষ্ক্রিয়ার জ্ঞানগত উপলব্ধি সকলেরই সাধ্যায়ত্ত, ইহাতে যদি কেহ তাহা উপলব্ধি করিতে প্রয়াস না পাইয়া কেবল কোপর্ণিকস্ আবিষ্কার করিয়াছেন, অথবা অনেকে তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন, জ্ঞাত হইয়াই তাহার উপর নির্ভর করিয়া ঐ জ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছে অনুমান করে, তবে তাহাকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রাপ্ত না বলিয়া কুসংস্কারী বলা যায়। জগতে যাবতীয় কুসংস্কারেরই এইরূপে সৃষ্টি হইয়াছে। হিন্দুজাতি পর্য্যবেক্ষণ-সাধিত ফলে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক কেবল মাত্র জ্ঞানগত ফলে আস্থা স্থাপন বরতঃ জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানকে ব্যক্তি বা গ্রন্থ বিশেষের মত-সমাশ্রিত করাতে আজ ভারতে জ্যোতিষানুশীলন কুসংস্কারের অন্তর্ভূত হইয়াছে এবং হিন্দুদিগকে চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক ভ্রমদর্শাইয়া দিলেও তাহা বোধগম্য করিতে পরাঙ্মুখ হইতেছেন। ইহা যে তাঁহাদের বুদ্ধির অপ্রাচুর্য্যবশতঃ ঘটিতেছে, এমত বলা হইতেছে না, কিন্তু বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে সহজে অনুমিত হইবে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কারের বশবর্ত্তী হওয়াতেই এই অবস্থা ঘটিয়াছে। বিজ্ঞানবিষয়ে জ্ঞানচক্ষু ও চর্ম্মচক্ষুকে কতদূর উন্মীলিত করিয়া রাখিতে হয় এবং কত অবধানতার সহিত বিজ্ঞানক্ষেত্রে পাদ বিক্ষেপ করিতে হয়, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে কোপর্ণিকসের আবিষ্কৃত সত্যের পরিণামের প্রতি দৃষ্টি করিলেই যথেষ্ট হইবে। কোপর্ণিকসের আবিষ্ক্রিয়া বিজ্ঞানজগতে এক অশ্রুতপূর্ব্ব কীর্ত্তি ও অতি উপাদেয় সত্যের বীজ বলিয়া গণ্য হইলেও, এবং ঐ বীজে প্রভূত উৎপাদিকা শক্তি বিদ্যমান থাকা ও তাহার পুনরাবিষ্কারের পর জগতে ঐ শক্তির অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া স্বত্বেও, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান ইয়ুরোপ যে বিজ্ঞানতরুর ছায়াতে শান্তি উপভোগ করিয়া চরিতার্থ হইতেছে, তাহা কোপর্ণিকসের বীজ প্রসূত নহে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে বহুদূর যাইতে হইবে না, প্রত্যক্ষজ্ঞানে অনাদর এবং আলমাজেস্তের মত খণ্ডন করিতে গিয়া তাহারই পদানুসরণ করাতেই কোপর্ণিকসের আবিষ্ক্রিয়া ইয়ুরোপে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের অভ্যুদয় করিতে সক্ষম হয় নাই, যদি তাহা হইত তবে আমরা জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানের ইতিবৃত্ত অন্যরূপ করিয়া লিখিতে পারিতাম।

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ দত্ত।

মেঘদূত।

(উত্তর মেঘ।—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"এ মম সংবাদ, সাজায়ে বচনে,
শান্তনিতে তারে বলিও কথা,—
'সতি, তব পতি বেঁচে আছে প্রাণে,
রামগিরি নাম ভূধর যথা ;
বিরহ সহিয়ে আছ গো কেমন,
জিজ্ঞাসে কুশল আমার মুখে',—
নশ্বর পরাণ করিয়ে ধারণ,
সদা জাগে ভয় দেহীর বুকে। ৪০

"বলো তারে,—'সখি, দেখিনু তাহায়,
ক্ষীরণ শরীর তোমারি পারা,
তব সম জ্বলে প্রাণ যাতনায়,
তোমারি মতন, নয়নে ধারা,
তপ্ত দীর্ঘশ্বাস তোমারি মতন,
তোমারি মতন মথিত হৃদি,
দেহে, মনে, প্রাণে, সুদূরে মিলন,
যদিও নিবারে নিঠুর বিধি। ৪১

'সখি-বিদ্যমানে (বাড়াতে সোহাগ),
কাণে কাণে মৃদু যে কথাগুলি
ঢালিত, শবদে মাখি অনুরাগ,
গালে ছুঁয়ে গাল, আবেশে ঢুলি,
হায় রে এখন প'ড়ে দূর দেশে,—
শ্রবণ, নয়ন, চলে না তথা,—
দেছে মম মুখে তোমার উদ্দেশে
পাঠায়ে সে বাণী—বিরহ-গাথা। ৪২

'বলে সে,—
লতিকায় চারু দেহের গঠন,
শশধরে কম-কপোল-আভা,
চকিত-হরিণী- আঁখিতে নয়ন,
শিখি-পুচ্ছ-ভারে চিকুর-শোভা,
তটিনীর ছোট বঙ্কিম তরঙ্গে
দেখি সে ভুরুর মধুর খেলা,
কিন্তু হায়, প্রিয়ে বিনা তব অঙ্গে
না দেখিনু একে সবার মেলা। ৪৩

যুবতি তোমার ক্রুদ্ধ মানভরে,
গৈরিকে আঁকিয়ে শিলার গায়,
চাহিনু যখন, বিহ্বল অন্তরে,
লুটাতে সে চারু কোমল পায়,
সলিলের উৎস ছুটিয়া আঁখিতে
আঁধারে ঢাকিল সে প্রিয় লেখা,—
অহো, ক্রূর বিধি পারে না সহিতে
তোমাতে আমাতে এ হেন দেখা। ৪৪

এই যে ক্ষীরণ তনু জর জর,
বাস এই দূর গিরির তটে,
সে মুখ স্মরিলে, তবু ফুলশর
বাজে হৃদে, বেগে বাসনা ছোটে,
নিদাঘের শেষে ওই যে দেখ না
দিগন্ত আঁধারি জলদ-রাশি,
কেমনে কাটাই, সখিরে, বল না,
দিন—পর দিন ?—বিষাদে ভাসি! ৪৫

মিলন তোমার লভিয়ে স্বপনে,
শূন্যে ঘুমঘোরে তুলিনু কর,
বাঁধিতে তোমায় গাঢ় আলিঙ্গনে,—
বাঁধিনু বুকেতে বায়ুর থর!
হেরে মোর দশা, করুণায় গ'লে,'
বনদেবীগণ নীরবে কাঁদে,

তরু কিশলয়-নীহারের ছলে
ঝরে জল, স্থূল মুকুতা ছাঁদে ! ৪৬

হিমগিরি হতে দক্ষিণে বহিয়ে,
ওই যে খেলিছে শীতল বায়,
ভেদি দেবদারু, নির্যাস মাখিয়ে,
করেছে সুরভি আপন গায়,
ধরি আমি তারে ঘন আলিঙ্গনে,
ভাবি মনে মনে জুড়াবে ব্যথা,—
প্রিয়তমে, তব শরীর, আননে,
পরশিয়া সে ত এসেছে হেথা। ৪৭

দীর্ঘযামা নিশি কেমনে পোহাবে
ত্বরিতে ফুরায়ে ক্ষণেক প্রায়,
দিবসের আলো কেমনে মিশাবে
ত্বরিতে মলিন গোধূলি গায়,
এই চিন্তা চিতে; অসাধ্য কামনা,—
দিন রাত কালে ডুবিয়া যাক্,—
তোমার বিরহে কি ঘোর যাতনা,
কি দহনে হৃদি হতেছে খাক্ ! ৪৮

হৃদয়ের বলে হৃদয় বাঁধিয়ে,
কিন্তু, আশাভরে, সয়েছি সব,
তুমিও, কল্যাণি, অধীর হইয়ে
ঢালিও না শোকে পরাণ তব,
একান্ত হরষ, সন্তাপ বিষম,
নিয়তি-শাসনে কদিন তরে,
জীবন, ঘুর্ণিত চক্রনেমী সম,
কভু উচ্চ, কভু মাটির পরে। ৪৯

যবে বিষ্ণু ত্যজি অনন্ত-শয়ন
উঠিবেন, শাপ ফুরাবে তবে,
এ চারিটি মাস, বুজিয়ে নয়ন,
কোন্ মতে, সখি, কাটাতে হবে,
পক্কে যে সকল মনে অভিলাষ
দুজনে বিরহে গেঁথেছি গণি,

পুরাব সে সব গিয়া তব পাশ,
শরৎ-চাঁদিনী-নিশিতে, ধনি। ৫০

আরো সে বলেছে,—
একদিন, কণ্ঠ বাঁধা বাহুডোরে,
ঘুমঘোরে কেঁদে উঠিলে জাগি,
জিজ্ঞাসিনু তোমা চকিত অন্তরে,—
কেন কাঁদ, প্রিয়ে, কিসের লাগি ?
দেখিনু স্বপনে (বলিলে আমায়
অন্তরের হাসি চাপিয়া মুখে),
ভুলায়ে আমারে যেন শঠতায়
অন্য রমণীরে ধরেছে বুকে। ৫১
'এই অভিজ্ঞানে, সুনীল-নয়না,
শুভাকাঙ্ক্ষী মোরে জানিও তব,
অবিশ্বাস মম কথায় করো না,—
প্রবাদে যা রটে অলীক সব;
মিথ্যা কথা, স্নেহ বিরহে পালায়;
প্রিয়েব চিন্তায় করিয়ে ভর
বাড়ে নিতি নিতি, শেষে, হয়ে যায়
হৃদয় অনন্ত প্রেমের থর।' ৫২

'নব-বিরহিনী শাগুনি এমতে,—
(প্রথম বিচ্ছেদে বিষম ব্যথা),—
শিব বৃষ-খত সে শিখর হতে
ফিরিয়ে সত্বর আসিও হেথা,
শোকে জর জর আমারো ত প্রাণ,
প্রভাতে মলিন কুন্দেব প্রায়,
তায় শুভবার্ত্তা, সহ অভিজ্ঞান,
দিয়ে, জলধব, বাঁচায়ো তায়। ৫৩

"সাধিবে কি তুমি, হে সাধু বান্ধব,
বন্ধুর এ কাজ বল গো ভাই;
অস্বীকার হেতু তুমি যে নীরব,—
হেন কথা মনে না পায় ঠাঁই;
তুমি ত আসার বরষ নিঃস্বনে
যবে তৃষ্ণাতুর চাতক যাচে,—

সাধুর উত্তর, যাচক-প্রার্থনে,
কথায় নহেক, সুপ্রিয় কাজে। ৫৪

"এ বিধুর প্রাণে করুণা করিয়ে
কিম্বা, বন্ধুতায় (যে কোন ভাবে),
অনুচিত মম প্রার্থনা ক্ষমিয়ে,
এ প্রিয় কাজটি সাধিতে হবে;

পরে, ধরি নব শোভা বরষায়,
যাও যে বা দেশ মনেতে লয়,
যেন গো তোমাতে দামিনী-লতায়
এ হেন বিচ্ছেদ কভু না হয়।" ৫৫

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

সমাপ্ত।

স্ত্রীশিক্ষা বিবরণ। (১)

প্রস্তাবনা।

স্ত্রীদিগের স্বভাব এই যে, তাঁহারা শৈশব কাল হইতে আপনা অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির চরিত্র দেখিয়া এবং কনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি তদ্রূপ আচরণ করিয়া জ্ঞান,ধর্ম্ম ও কর্ম্ম শিক্ষা করেন। তাঁহাদের অধ্যয়নের প্রধান পুস্তক মনুষ্যের স্বভাব। স্বীয় পরিবার ও লোকমণ্ডলী তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। এই স্বাভাবিকী শক্তি হেতু দেখা যায়, অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীর লালনপালনে মাতার সহকারিণী হইতে পারে।

মনুষ্যের দেহলাভ হইতে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ গর্ভবাস হইতে মৃত্যুশয্যা পর্য্যন্ত সে স্ত্রীদিগের দ্বারা লালিত হয়। মনুষ্যের শরীরের ন্যায় তাহার পরিস্ফুট মনোবৃত্তিকেও স্ত্রীদিগের প্রসূত বলিতে পারা যায়। মনুষ্যের জন্ম, কর্ম্ম, ধর্ম্ম, সুখ, সম্পত্তি এবং তন্তাবৎ সমন্বিত বংশবিস্তার বহু পরিমাণে স্ত্রীদিগের আয়ত্ত।

নারীজীবনের এতদ্রূপ মহদধিকার সম্বন্ধীয় বিধি নিষেধ পালন পক্ষে স্ত্রীদিগের স্বেচ্ছামত শিক্ষা পর্য্যাপ্ত হইতে পারে না; এজন্য সুপণ্ডিত, অভিজ্ঞ ও গুরুজনের উপদেশ শ্রবণ করা এবং উন্নততর পুরুষ ও স্ত্রীদিগের চরিত্র অবগত হওয়া আবশ্যক। এই সকল উপদেশ ও চরিত্র-বিবরণ গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ থাকে। জ্ঞানান্বেষিণী স্ত্রীগণ আপনারা সেই লিপি পাঠে অসমর্থ হইলে অন্যদীয় সাহায্যে তাহা জানিয়া লয়েন। কিন্তু তজ্জন্য পাঠকের প্রতীক্ষায় না থাকিয়া ও পাঠকের জ্ঞানের উপর নির্ভর না করিয়া আপনারা যাহাতে সেই লিপি পাঠে সমর্থ হয়েন, তাহার চেষ্টা করা বিহিত। স্ত্রীদিগের এবম্বিধ লিখন ও পঠনের অভ্যাস থাকিলে নানা কার্য্যের সুবিধা হয়।

এইরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, স্ত্রীদিগের লেখা পড়া শিক্ষা তাহাদের উন্নততর জ্ঞানের সহজ পথ এবং তাহা লোকমণ্ডলীর পরম মঙ্গলকর।

এই বিবেচনায় গত ৭৫ বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার বহুল বিস্তার হইতেছে। ৭৫ বৎসর—খ্রীষ্টীয় ১৮১৮ অব্দ হইতে ১৮৯৩ অব্দ (খৃষ্টীয় সাল)।

এই ৭৫ বৎসর দীর্ঘকাল বলিতে হইবে। এতকাল ধরিয়া সকল সম্প্রদায়ের লোক স্বতঃপরতঃ স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যে যত্ন

ও পরিশ্রম করিলেন, তাহার প্রণালী ও তাহার কিসে কি ফল হইল, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। তদ্দ্বারা বুঝা যাইবে, ভবিষ্যতে কিরূপ পন্থা অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ।

পূর্ব্ব বিবরণ।

এই বক্ষ্যমাণকালে যেরূপে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার হইয়াছে, তাহা ইংরাজদিগের উত্তেজনায়, ইংরাজী প্রথা অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে স্ত্রীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অথবা পিতৃ মাতৃ নিয়োগে যে লেখা পড়া শিখিতেন,তাহা দেশীয় প্রথা অনুসারে হইত।

আমরা, আমাদের বাল্যকালে, স্ত্রীদিগের লেখা পড়ার চর্চ্চা হইলে, কাহারো কাহারো মুখে শুনিতাম, "স্ত্রীরা লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হয়।" এই শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্র শুনিতাম। কিন্তু ইহার বল কিছু দেখিতে পাই নাই। যাঁহারা ইচ্ছা করিয়াছেন, তাঁহারাই স্ত্রীদিগকে লেখা পড়া শিখাইতে পারিয়াছেন। এক্ষণে যাঁহাদের বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছে, এমন কোন কোন অর্দ্ধবৃদ্ধ লোকের মুখে শুনি, তাঁহাদের মাতা শৈশব বয়স হইতে লেখা পড়ার চর্চ্চা করিতেন। তবে এই ক্ষীণ প্রবাদ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? বোধ হয়, কোন সধবা স্ত্রী লেখা পড়া শিখিবার পর দৈবাৎ ঐ দৌর্ভাগ্য দশায় পতিত হইলে, অপর স্ত্রীদিগের ঐরূপ শঙ্কা জন্মিয়া থাকিবে। অথবা পুরুষেরা কোন কোন শিক্ষিতা স্ত্রীর ব্যবহারে দোষ দর্শন করিয়া সাধারণতঃ স্ত্রীশিক্ষা বন্ধ করিবার উদ্দেশে স্ত্রীদিগের মনে ঐরূপ সংস্কার জন্মাইয়া দিয়া থাকিবেন।

কিন্তু ইহাতে, সধবাদিগের পক্ষে যেমন হউক, বিধবা স্ত্রীদিগের লেখা পড়া শিক্ষার পথ বন্ধ হয় নাই। অবকাশ ক্রমে এবং ইচ্ছা বা প্রয়োজন অনুসারে এদেশের সর্ব্বত্রই বিধবাগণ লেখাপড়ার চর্চ্চা করিতেন। তাঁহারা অবকাশ ক্রমে বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত, বা গীতগোবিন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক ভক্তিশাস্ত্র পাঠ করিতেন। কাহারো কাহারো প্রতিদিন শতাধিক দুর্গানাম বা হরিনাম লিখিবার নিয়ম ছিল। যাঁহাদের কিছু অধিক ভূসম্পত্তি ছিল, এমন অনেক স্ত্রী স্বহস্তে তাঁহাদের কর্ম্মচারীদিগের হিসাব নিকাশ পরীক্ষা বা নূতন আজ্ঞা প্রচার করিতেন। এখনো অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, বড় বড় গ্রামে, অন্যূন ২।৩টী করিয়া অশীতিবর্ষ দেশীয়া বৃদ্ধা স্ত্রী চক্ষুতে চসমা দিয়া ভাষা গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। ইদানীন্তন স্ত্রী শিক্ষার প্রচার পক্ষে যাঁহারা লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা, প্রাচীন প্রথার সহিত মিল রাখিবার চেষ্টায়, সহজেই প্রতিপন্ন করিতে পারিয়াছিলেন যে, "মৈত্রেয়ী, শকুন্তলা, অনুসূয়া,বাহ্বট রাজার কন্যা, দ্রৌপদী, ভগবতী রুক্মিণী, চিত্রলেখা, লীলাবতী, মালতী, কর্ণাট রাজার স্ত্রী, লক্ষ্মণসেনের স্ত্রী, খনা প্রভৃতি পূর্ব্বকার স্ত্রীসকল নানা শাস্ত্র পড়িয়া সেই সেই শাস্ত্রের পারদর্শীরূপে বিখ্যাত ছিলেন। এবং এখনকার রাণী ভবানী, হটী বিদ্যালঙ্কার, শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী, ইহারাও লেখা পড়া এবং নানা শাস্ত্র ও দর্শন বিদ্যাতে অতি সুখ্যাতি পাইয়াছেন। বিদ্যাশিক্ষাতে তাঁহাদের কোনরূপে মানহানি কিম্বা অখ্যাতি হয় নাই,বরং সুখ্যাতি বাড়িয়াছে।"

উপরের উদ্ধৃত অংশ সুবিখ্যাত স্যর

রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রণীত, ১৮২৪ সালে মুদ্রিত, "স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক" নামক পুস্তক হইতে গৃহীত হইল। ঐ পুস্তকে ব্যক্ত হইয়াছিল, "কলিকাতার রাজবাটীর প্রায় সকলেই লেখা পড়া বিদিত আছেন," আর "বড় বড় মানুষের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সকলেই লেখা পড়া করেন।"

এতদ্দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষাতে বিধবা হইবার আশঙ্কা অমূলক। তাহা ঊর্ণনাভের জালের ন্যায়, ধরিলেই ছিঁড়িয়া যাইত। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার উপায় বিধান দুর্ঘট হওয়াতে স্ত্রীশিক্ষার অনুরাগীগণ অভিলাষানুরূপ ফল প্রাপ্ত হন নাই।

ইদানীন্তন স্ত্রীশিক্ষার প্রারম্ভ।

পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বা স্বামীর নিকট, যথাসম্ভব বিদ্যা শিক্ষা করিতেন। যে কালের কথা আমরা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, এ সময়ে, এ দেশীয় ও বিদেশীয়, চারি সম্প্রদায়ের লোক, মহোৎসাহে ও দৃঢ়তা সহকারে, স্ত্রীদিগের অবস্থার উন্নতির জন্য, তাহার প্রথম সোপানস্বরূপ লেখাপড়া শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই চারি সম্প্রদায়ের লোক তখনকার ভাবানুসারে এই চারি নামে অভিব্যক্ত হইতে পারেন। (১) পৌরাণিক হিন্দু। (২) বৈদান্তিক হিন্দু। (৩) খ্রীষ্টাশ্রিত খ্রীষ্টান। (৪) নিরপেক্ষ খ্রীষ্টান। এই চারি প্রকার লোকে ১৮১৭ খৃঃ অব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপন করিয়া পুরুষদিগের শিক্ষার বিধান করেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীদিগের শিক্ষার জন্যও তাঁহারা ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

এই সময়ে (১৮১৭ খৃঃ অব্দে) স্কুলবুক সোসাইটি স্থাপিত হয়। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে "স্কুল সোসাইটি" নামক আর এক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্কুল সোসাইটীর চেষ্টায় নানাস্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হইত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পঠদ্দশায় এই স্কুল সোসাইটী দ্বারা সাহায্য পাইয়াছিলেন। এই সোসাইটীতে শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্তদেব এবং কৌন্সিলের মেম্বরগণ ও গবর্ণমেণ্টসংক্রান্ত সর্ব্বোচ্চ পদাধিষ্ঠিত অন্যান্য ব্যক্তি সভ্য শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। মিশনরিগণও এই সভার অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন। তৎকালীন মিশনরিগণ এতদ্দেশীয়দিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষা সাধারণ শিক্ষা প্রদান করিতে অধিক মনোযোগী হইতেন। এই সভা হইতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের সূত্রপাত হয়।

স্ত্রীশিক্ষার প্রারম্ভ বিষয়ে রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুরের রচিত উপরোক্ত পুস্তকে উক্ত হইয়াছে,—"প্রথম ইংরাজী ১৮২০ খৃঃ অব্দের জুন মাসে শ্রীযুক্ত সাহেব লোকেরা এই কলিকাতার নন্দন বাগানে যুবনাইল পাঠশাল নামে এক পাঠশালা করিলেন, তাহাতে আগে কোন কন্যা পড়িতে স্বীকার করিয়াছিল না, এইক্ষণে এই কলিকাতায় প্রায় পঞ্চাশটী স্ত্রীপাঠশালা হইয়াছে। তাহাতে প্রত্যেক পাঠশালায় ন্যূন সংখ্যাতে ১৬ জন কন্যা গণনা করিলেও ৮০০ কন্যার শিক্ষা হইতেছে।"

এই পুস্তকের লিখন অনুসারে জানা যাইতেছে যে ১৮২৪ খৃঃ অব্দে কলিকাতায় ৮০০ বালিকা লেখাপড়া শিখিয়াছিল। এই পুস্তকদ্বারা ইহাও বিদিত হওয়া যায় যে এই সকল পাঠশালার ছাত্রীগণ সামান্য লোকের কন্যা।

তাহারা নানাস্থানে ১৫।২০টী করিয়া একত্রিত হইয়া অধ্যয়ন করিত। এই কন্যারা ভদ্রলোকদিগের বাটীতে গিয়া তাহাদের কন্যাগণকে পড়াইতে পারিত। এই সকল দরিদ্র কন্যা সেলাই শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে এমন আশা হইয়াছিল যে, তাহারা অন্তঃপুরিকাগণকে সেলাই শিক্ষা করাইবে। ১৮২০ সালের পর ৪ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষার এত প্রচার কিরূপে হইল? এখন তাহারই অনুসন্ধান করিতে হইতেছে।

কলিকাতা, ফিমেল যুবেনাইল সোসাইটী।

Calcutta Female Juvenile Society

খ্রীষ্টান মিশন সংক্রান্ত প্রাচীন পুস্তক ও পত্রিকাদি প্রাপ্তি আমাদের পক্ষে দুর্ঘট। যাহা পাইয়াছি, তাহাতে দেখিতেছি, রাজা বাহাদুর কৃত স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থের উপরোক্ত প্রাথমিক স্ত্রীশিক্ষা বৃত্তান্তের মধ্যে দুএকটী কথার তফাৎ হয়। তথাপি তিনি ঐ বিষয়ে বিশেষ তত্ত্ব রাখিতেন বলিতে হইবে।

আমরা জানিতেছি,—১৮১৯ অব্দের মে মাসে "Calcutta Female Juvenile Society" নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কতকগুলি ইংরাজ কন্যা মিস্ ব্রাইটের এক বোর্ডিং স্কুলে থাকিতেন। তাহাদিগকে লইয়া পাদ্রি পিয়ার্স সাহেব নিজের পত্নী এবং ও আর কয়েকটী ইংরাজ রমণীর সহযোগে ঐ সভা স্থাপন করেন। পাদ্রি পিয়ার্স এই সোসাইটী স্থাপন উদ্দেশে ঐ স্ত্রীদিগকে যেরূপ উত্তেজনা করিয়াছিলেন, তাহা এই,—

"Dear Young Ladies,—
You are placed by divine Providence in a situation far superior to the Hindus and Musalmans by whom you are surrounded, and the command of God, which directs you to love your neighbour as yourselves, evidently includes that you should do as much for their happiness as you would expect them to do for yours, were you to change circumstances. We are sure, therefore, that as far as you are able, and your Parents and Friends approve, you will be happy to show your compassion for your ignorant and depraved neighbours. We recollect too, that you are females, and therefore, from the constitution of your natures, more apt to pity the miserable especially when the case of sorrow which is presented to you particularly respects your own sex.

* * *

We are confident, therefore, we shall anticipate your wishes, by proposing the formation of a small Society, for the promotion of Female Education amongst the Hindus. It is a pleasing fact that a few Hindu girls have lately met together to receive instruction in the city, and is used a learned native, with whom we are acquainted, that if any person would provide for their instruction, they knew that beside themselves, 8 or 10 more would willingly attend. You have therefore an opportunity, at a small expense, of securing to yourselves the honor of encouraging this first attempt, which without encouragement, will probably be frustrated—and thus of laying a foundation (if you should succeed) of the most permanent and extensive good."

Memoirs of the Rev. W. H. Pearce, Pages 97 and 99.

এই সোসাইটী দ্বারা কয়েকটী স্কুল স্থাপিত হইলে ১৮২১ সালে মিস্ কুক ইংলণ্ড হইতে শিক্ষা সংক্রান্ত কর্ম্ম করিবার জন্য কলিকাতায় আইসেন।

মিস্ কুক্ বা মিসেস্ উইলসন।

Miss Cooke or Mrs. Wilson

পূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে যে, পুরুষদিগের মধ্যে স্কুল স্থাপন করিবার জন্য সাহেব ও এদেশীয় ব্যক্তিদের স্কুল সোসাইটি নামক এক সভা ছিল। মিস্ কুক সেই সোসাইটির অধীনতায় সাধারণ শিক্ষায় পুরুষদিগের

সাহায্য করিবেন, এই অভিপ্রায়ে ইংলণ্ডস্থ কমিটি তাঁহাকে এদেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, স্কুল সোসাইটি লুপ্ত হইয়াছে, এবং ফিমেল যুবেনাইল সোসাইটি জন্ম লাভ করিয়া স্ত্রীশিক্ষা প্রচার আরম্ভ করিয়াছে। তিনি স্ত্রীজাতির প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ স্ত্রীদিগের শিক্ষার নিমিত্ত লাগিয়া পড়িলেন। ৺ কেশবচন্দ্র সেন বলিয়াছিলেন, মিস্ কুকের চেষ্টায় এক বৎসর মধ্যে ৮টী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাতে ২০৪ জন বালিকা সংগৃহীত হয়। এরূপে বৃদ্ধি হইলে ১৮২৪ অব্দে উক্ত রাজা বাহাদুরের পুস্তকের লিখিত ৫০টী স্কুল ও ৮০০ ছাত্রী সংখ্যা সঙ্গত হইতে পারে।

এই সকল বিদ্যালয়ে অধিকাংশ নীচ শ্রেণীর হিন্দু বালিকারা অধ্যয়ন করিত। অনেককে পয়সা দিয়া স্কুলে আনিতে হইয়াছে। অবশিষ্ট খ্রীষ্টানদিগের কন্যা।

মিস্ কুক চর্চ্চ মিশনরি সোসাইটির অধীনে কর্ম্ম করিতেন। তিনি পরে পাদ্রি উইলসনকে বিবাহ করিয়া মিসেস উইলসন নাম প্রাপ্ত হয়েন। তিনি যথার্থ লোকানুরাগিণী ছিলেন। তিনি আপনার পর ছোট বড় বিবেচনা না করিয়া সকলেরই অজ্ঞান মোচন ও দুঃখ দূর করিবার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করিতেন। হিন্দুসম্প্রদায়ের ভদ্রলোকেরা কন্যাগণকে তাঁহার স্কুলে পাঠাইতেন না। তাহাতে তাঁহার ক্ষতি বোধ হয় নাই। তিনি দরিদ্রা ও নিরাশ্রয়া কন্যাদিগকে লইয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেন। রসী, মতী, হীরা, ভক্তী, ধনী, প্যারী, ইত্যাদি নামধেয়া শিক্ষা-বিধায়ক গ্রন্থোক্তা দুঃখিনী বালিকাগণ এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পরে অন্তঃপুরস্থিতা কুলবধূদিগের শিক্ষাদানের যোগ্য হইয়াছিল।

Calcutta Female Juvenile Society বোধ হয় ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিল। কারণ ঐ সালে মিসেস্ উইলসনের Lady's Society নামে এক সভার কথা শুনা যায়। যুবেনাইল সোসাইটির সভ্যদিগকে লইয়াই তিনি নূতন নামে নূতন উদ্যমে ঐ সভা করিয়া থাকিবেন। ১৮২৬ সালে বিবি উইলসনের কলিকাতাস্থিত বালিকা বিদ্যালয়গুলি একত্র সন্নিবেশিত হইয়া সেন্ট্রাল স্কুল বা মধ্য বিদ্যালয় নামে অভিহিত হয়। এই সময়ে তিনি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য স্থানেও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

মিসেস্ উইলসন ও তাঁহার সহযোগিনী আর কতকগুলি বিবি অন্তঃপুরস্থিতা ভদ্রমহিলাদিগকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই সকল বিবি দ্বারা বাঙ্গালার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষাও চলিত। তখন কোন কোন উচ্চবংশীয়া হিন্দুকন্যা ইংরাজী ভাষাও উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন।

বিবি উইলসন যেমন হিন্দুকন্যাদিগের শিক্ষা বিধানের জন্য চেষ্টা করিতেন, তেমনি খ্রীষ্টান কুমারীগণেরও মূর্খতা দূর করিবার জন্য যত্ন করিতেন। যাহাতে অজ্ঞান বৃদ্ধলোকেরাও জ্ঞান পায়, পীড়িতেরা ঔষধ পায়, বিপন্ন ব্যক্তি উদ্ধার পায়, দীন দুঃখীর কষ্ট দূর হয়, তিনি তজ্জন্য অবিরাম পরিশ্রম করিতেন।

প্রথম অবস্থায় মিশনরীগণ, সহমরণ প্রথা ও কুমারী হত্যার উল্লেখ করিয়া হিন্দু কুলাঙ্গনাগণের বিষম দুরবস্থার বিবর

সমস্ত ইউরোপে ও আমেরিকার নানা দেশে ঘোষণা করিতেন। তাহাতে সেই সকল দেশের স্ত্রী ও পুরুষগণ দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া হিন্দু মহিলাদিগের ক্লেশরাশি বিমোচন জন্য মুক্ত হস্তে ধনদান করিতে লাগিলেন। বেপটিষ্ট মিশন সোসাইটি, চর্চ্চ মিশন সোসাইটি, লণ্ডন মিশন সোসাইটি এই প্রকরণে বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনেক সমিতির অর্থ ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সংগৃহীত অর্থ বা স্বকীয় দান, বিবি উইলসনের হস্তে আইসে। কি প্রকারে হিন্দু স্ত্রীদিগের অজ্ঞানাবস্থার ও ক্লেশপরম্পরার প্রতিকার করা হইবে, তাহা তখন ইংলণ্ডস্থ মিসন সভা ও অর্থদাতৃগণ বলিয়া দিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহারা এখানকার মিশনরিদিগকে সাবধান করিয়া দিতেন যেন কোন প্রকারে হিন্দুদিগের চিত্তে আঘাত দেওয়া না হয়। তৎকালীন বিবিদিগের, বিশেষতঃ মিসেস্ উইলসনের, সৌজন্য ও সদাশয়তায় সকলেই প্রীত হইতেন। পরে ১৮২৩।২৪ সাল হইতে যেমন এক একজন করিয়া হিন্দুসন্তান খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন, অমনি হিন্দু সমাজে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে এই সকল সাহেব-বিবির গোলযোগ হেতু হিন্দুগণ স্ত্রীশিক্ষাকে বিলাতী কাণ্ড মনে করিয়া তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। এই ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়াতে খ্রীষ্টান শিক্ষয়িত্রী ও হিন্দুছাত্রী পরস্পর বহু অন্তর হইয়া পড়িলেন।

ব্রাহ্মদিগের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার।

এই সময়কার ব্রাহ্মেরা বৈদান্তিক হিন্দু পর্য্যায়ে পরিগণিত হইতেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই আপনাপন কন্যাকে লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দিতেন। ১৮৪৯ অব্দের আগষ্ট মাসে নদীয়া জেলার অন্তর্গত সুখসাগর মহকুমায় তত্রত্য মুন্সেফ পদাধিষ্ঠিত ৺কাশীশ্বর মিত্র এক বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের অন্যান্য সভ্যেরা যে যে স্থানে অবস্থিতি করিতেন, তথায় তাঁহারা স্কুল, পাঠশালা, আলোচনা সভা, ব্রাহ্মসমাজ ও চিকিৎসালয় স্থাপন প্রভৃতি দেশহিতকর কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীশিক্ষারও উপায় বিধান করিতেন। তাঁহাদের চেষ্টায় ও সাহায্যে সেই সেই স্থলে এই সময়ে বা ইহার কিছুকাল পরে বালিকাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বেথুন বালিকা বিদ্যালয়।

হিন্দু ও খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে সদ্ভাবের খর্ব্বতা হইলে কলিকাতার মধ্যে বালিকা-বিদ্যালয়ের অভাব ঘটিতে লাগিল। স্ত্রীশিক্ষার এই অবস্থা দেখিয়া ১৮৪৯ অব্দে বেথুন সাহেব তন্নামপ্রসিদ্ধ বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করেন।

এই বিদ্যালয় সংক্রান্ত অপর কথা ব্যক্ত করিবার পূর্ব্বে এক্ষণকার ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষার দ্বন্দ্বের বিষয় বলা আবশ্যক।

বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টর অনুসারে গবর্ণমেণ্ট যখন এ দেশীয় ব্যক্তিগণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে উদ্যুক্ত হয়েন, তখন শিক্ষানুরাগী সাহেব ও এতদ্দেশীয়ব্যক্তিগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিলেন। এক দল সংস্কৃত ভাষায় ও আর এক দল ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা বিধান করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

এই শিক্ষাবৃক্ষের ফলেও মূলের অনুরূপ গুণ দৃষ্ট হইল। যাঁহারা প্রথমে সুশিক্ষা পাইলেন, তাঁহারাও দুই দলে বিভক্ত হইলেন। একদলের ইচ্ছা, ইংরাজী এ দেশের চলিত ভাষা হয়। আর এক দলের ইচ্ছা, বাঙ্গালাই পরিপুষ্ট হইয়া এদেশের সকল কার্য্যোপযোগিনী হয়। প্রথমোক্ত দল বলিতেন, 'বাঙ্গালায় ব্যাকরণ নাই, উহা শিক্ষা করা যায় না।" অপর দল বলিতেন, "শিশুর রসনা মাতৃদুগ্ধ পানের সহিত যে ভাষার অনুশীলন করে, বিদ্যারম্ভের পূর্ব্ব কালেই যে ভাষার অদ্ধভাগ তাহার কণ্ঠগত হয়, এবং তরুণ বা প্রৌঢ়কালে সাধ্যপর যত্নেও যাহা বিস্মৃত হইতে লোক অসমর্থ হয়, সেই পৈতৃকভাষা অভ্যাস করা সুলভ নহে, আর পৃথিবীর ভিন্ন প্রান্তবাসী পরজাতীয় ভাষা শিক্ষা করা সুলভ? ইহা কি প্রকারে মনুষ্যের মনোগত হয়?

প্রথমে সংস্কৃতের সহিত ইংরাজীর দ্বন্দ্ব ঘটিয়াছিল। এখন ইংরাজীর সহিত বাঙ্গালার দ্বন্দ্ব। পূর্ব্বে বৃদ্ধদিগের সৈনাপত্যে মহার্ঘ সংস্কৃত ভাষা হারিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে যুবকদিগের বলে সামান্য বাঙ্গালা ভাষারও জয় হইল। পূর্ব্ব সংগ্রামে যে প্রধান ব্যক্তি Macaulay ইংরাজীর পক্ষে ছিলেন, তাঁহারই পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তি Bethune, এখন বাঙ্গালার সপক্ষ। মূলে এই পরিবর্ত্তন ঘটাতে বাঙ্গালাই এ দেশের ভাষা রাজ্যের পাটরাণী হইলেন।

যদিও লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গদেশে ১০১টী বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষক ও পুস্তকের অভাবে তাঁহার উদ্দেশ্য মত কর্ম্ম হয় নাই, মহাত্মা বেথুন সাহেবের যত্নে ও সাহায্যে সেই অভাব পূরণ হইতে লাগিল।

বেথুন সাহেব তৎকালীন গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা সংক্রান্ত সভার সভাপতি ছিলেন। তিনি বাঙ্গালীদিগের স্বদেশীয় ভাষানুশীলনের প্রতি অতিশয় যত্ন করিতেন। যে সকল ছাত্র ইংরাজীতে কবিতা বা প্রবন্ধ লিখিতে ব্যগ্র হইত, তাহাদিগকে তিনি বলিতেন,—"যদি তোমরা আমার পরামর্শ গ্রহণ কর, তবে এ প্রকার প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা পরিত্যাগ কর। যদি তোমাদের গ্রন্থকার হইবার অনুরাগ ও তদুপযোগিনী ক্ষমতা থাকে, তবে স্বকীয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে অথবা ইংরাজী গ্রন্থের উত্তমোত্তম প্রস্তাব অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে স্থায়ীতর কীর্ত্তিলাভ করিতে পারিবে।"

এখন যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দান সময়ে মহোচ্চ পদাধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ, ছাত্রদিগের প্রবৃত্তি কোন্ দিকে চালিত হওয়া উচিত, তাহার উপদেশ দেন, এই সময়ে হিন্দুকলেজের পারিতোষিক দান উপলক্ষে তাহাই হইত। ১৮৪৭ অব্দে ডেপুটী গবর্ণর সর হরবর্ট মেডাক্ সাহেব হিন্দুকলেজের পারিতোষিক দান সভায় বঙ্গভাষার প্রতি সকলের অনুরাগ সম্বর্দ্ধন করিয়াছিলেন এবং এই ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনাকারীকে স্বয়ং স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভাব বিচার আবর্ত্ত।

এই ভাবা বিচার সূত্রে শিক্ষিত দলের

মধ্যে হিন্দু ও অহিন্দু অর্থাৎ স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভাব বিচার আরম্ভ হয়। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার অনুরাগী, তাহারা হিন্দু-পক্ষপাতী ছিলেন, যাঁহারা ইংরাজী ভক্ত, তাঁহারা হিন্দুর কিছুই ভাল বিবেচনা করিতেন না। এই ইংরাজী-ভক্তদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অপরপক্ষ আক্ষেপ করিয়া বলিতেন,—

"হিন্দু নাম অতি মনোরম শব্দ। হিন্দু হইয়া হিন্দু নাম লোপ করিবার বাসনা, ইহার পর যাতনার বিষয় আর কি আছে? জন্মভূমির হীন অবস্থা মোচনে যত্ন না করিয়া, তাহার প্রতি অনাদর করা, জননীর জীর্ণ শরীর সুস্থ না করিয়া তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা করা, ইহার অপেক্ষা হৃদয়-বিদীর্ণকারী ব্যাপার আর কি আছে?"

মাতৃভাষার সহিত জন্মভূমির একীভূত ভাব, একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি, একের দুর্গতিতে অপরের দুর্গতি। প্রথমেই এই তথ্য বিদিত হইয়াছিল।

বেথুন বালিকাবিদ্যালযের হিন্দুভাব।

এখন বুঝা যাইবে যে, এই বাঙ্গালা ভাষানুরাগী ব্যক্তিগণ যে ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাতে হিন্দুত্বের কত বল সংযোগ হইয়াছিল। ইহারা যাহা করিতেন, তাহা হিন্দুধর্ম্মসংগত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেন। বেথুন সাহেব এই সুশিক্ষিত হিন্দুসম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই সময়কার হিন্দু দলপতিগণ এই বেথুনী কাণ্ডের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া নানাপ্রকার প্রতিকূলাচরণ করিতেন। কিন্তু কৃতবিদ্যগণ তাহা গোঁড়ামির কার্য্য মনে করিয়া বিদ্যালয়ের পুষ্টিসাধনার্থ সর্ব্বান্তঃকরণে যত্ন করিতেন। স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষা শাস্ত্রসম্মত এবং প্রচুর ফলোপধায়ী, এই মর্ম্মে তাঁহারা শাস্ত্রবাক্য-সমন্বিত এবং উদাহরণ-সংযুক্ত নানাপুস্তক ও প্রবন্ধ প্রচারিত করিলেন। তাহাতে উহা হিন্দুদিগের শুভকর অনুষ্ঠান বলিয়া লোকের মনে ধারণা জন্মিল। ক্রমে ক্রমে বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বেথুন বালিকাবিদ্যালযের প্রতিষ্ঠা।

প্রথমে সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায়, পরে পটলডাঙ্গার গোলদীঘির দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে হেয়ার সাহেবের স্কুল গৃহে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। পরে উহা সিমুলিয়াস্থ বর্ত্তমান গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মহাসমারোহে উক্ত গৃহের ভিত্তিস্থাপন ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। প্রথমাবস্থায় হিন্দুসমাজের মধ্য শ্রেণীর লোকের কয়েকটী কন্যা এই বিদ্যালয়ে পড়িতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত কালেজের তৎকালীন অধ্যাপক পণ্ডিতবর মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহোৎসাহে স্বয়ং প্রতিদিন প্রাতঃকালে এই বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করিতেন। তখন উহা যেন মদনমোহনেরই বিদ্যালয়, এইরূপ প্রতীতি হইত।

এক বৎসর পরে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বেথুন সাহেব ঐ বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের সমস্ত ভার সুপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাহার অল্প দিন পরে বেথুন পরলোকে গমন করেন। তদবধি বিদ্যালয়টী এক প্রকার বিদ্যাসাগরেরই হইয়া রহিল।

ইংলণ্ডীয় কর্ত্তৃপক্ষের শিক্ষাবিষয়ক ১৮৫৪ অব্দের অনুজ্ঞাপত্র দ্বারা এদেশীয়দিগের শিক্ষাসংক্রান্ত উত্তম ব্যবস্থা হয়। তাহাতে প্রধান পদাধিষ্ঠিত রাজপুরুষদিগের লালিত পালিত এই বেথুন বিদ্যালয় প্রথমেই গবর্ণমেণ্টের অঙ্কাশ্রয় লাভ করে। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিধ চেষ্টা ও যত্নে উক্ত বিদ্যালয়ের প্রতি কলিকাতার প্রধান প্রধান লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় মতে তাঁহার উক্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন।

১৮৫৪ সাল অবধি ১৮৬৮ সাল পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয় এদেশীয় ব্যক্তিদিগের একটী সভার অধীন ছিল। রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, কুমার হরেন্দ্রকৃষ্ণ, বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ, বাবু হরচন্দ্র ঘোষ, এই সভার সভ্য ছিলেন। সিটন কার সাহেব ইহার সভাপতি এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইহার সম্পাদক ছিলেন।

একজন করিয়া ইংরাজ বিবি এই বিদ্যালয়ের লেডি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট থাকিতেন। বালিকাদিগকে বাঙ্গালার সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প ইংরাজী পড়ানও হইত।

এই বিদ্যালয়ে কোন ইতর লোকের কন্যা বা পতিতা কন্যাকে পড়ান হইত না। কোন বৈজাত্য ভাব ছিল না। তথাপি দেশীয়লোকেরা, ইহার ভাবী ফল মন্দ হইবে বলিয়া নানাকথা কহিতেন। যাহা হউক, ফলতঃ সময়ের গতিতে বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

বালিকাবিদ্যালযের ভাষা মাতৃভাষা।

বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষা সম্বন্ধীয় উপরোক্ত বিবাদে যাঁহারা বঙ্গভাষার পক্ষে ছিলেন, তাঁহারা বাস্তবিক বাঙ্গালার সুলেখক। ইতিপূর্ব্বে প্রায় ত্রিংশৎবর্ষ ব্যাপিয়া বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা ও তদ্দ্বারা বিবিধ জ্ঞানোপার্জ্জন জন্য যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছিল, তাহার লিখন প্রণালী তত ভাল ছিল না। বিশেষতঃ শিশুগণের প্রথম পাঠোপযোগী পুস্তকের বড় অসদ্ভাব ছিল। "সেই অসদ্ভাব নিরাকরণ ও বিশেষতঃ বালিকাগণের শিক্ষা সংসাধন করিবার আশয়ে" প্রধান সুলেখক উপরোক্ত মদনমোহন তর্কালঙ্কার শিশুশিক্ষার প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ, পরে পরে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকত্রয়ের পাঠিকাগণের মধ্যে বেথুন স্কুলের বালিকাগণই গ্রন্থকারের প্রথম অভিলক্ষিত ছিল। বাঙ্গালাভাষার পরম গুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ বোধোদয় পুস্তক, এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণের জন্য সঙ্কলিত হইয়াছিল। (তখন ইহার নাম ছিল,—শিশুশিক্ষা চতুর্থ ভাগ।) ইহার ৫ বৎসর পরে ১৮৫৬ সালে বিদ্যাসাগর মডেল স্কুলের পাঠার্থ বর্ণপরিচয়, কথামালা ও চারিতাবলী রচনা করেন। ইহাতে প্রতিপন্ন হইবে যে, তাঁহার কন্যারূপিণী বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীগণই তাঁহার সরল রচনার প্রথম গুণগ্রাহিণী হইয়াছিলেন। আর এতদ্দারা ইহাও বিদিত হইবে যে, আমাদের এক্ষণকার বাঙ্গালাভাষার মাতৃভাষা নাম সার্থক। যেহেতু ইহা মাতৃগণের ভাষার অনুযায়ী সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে তাঁহাদেরই লিখন পঠনে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন।

পুত্র অপেক্ষা কন্যাগণের দাবী অধিক বলবান। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্তঃকরণে এই দাবী জাগরূক থাকে। তিনি যখন, ১৮৫৫খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে হুগলি, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও নদিয়া, এই চারি-জেলার মডেল স্কুল স্থাপন করিবার ভার প্রাপ্ত হয়েন, তখন তিনি হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলার ৪০টীর অধিক বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এইরূপে উক্ত মহাত্মা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জেলায় বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন আরম্ভ হইয়াছিল।

বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন বিষয়ে রাজ পদাধিষ্ঠিত সাহেবদিগের অতিশয় আগ্রহ ছিল। তাঁহাদের প্রবর্ত্তনায় ও উৎসাহে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আন্তরিক অনুরাগ সমধিক বৃদ্ধি পায়। তিনি এই সুযোগে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় কতকগুলি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অত্রত্য গবর্ণমেণ্ট গোলযোগ করিয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সম্মত হইলেন না। তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ঋণজালে পড়িতে হইয়াছিল। পরে তিনি সেই বৃহত্তর কারখানা তুলিয়া দিয়া কতিপয় বড় বড় সাহেব ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সাহায্য লইয়া ২০টি বিদ্যালয়ের কার্য্য চালাইতে লাগিলেন। এই বালিকাবিদ্যালয় ব্যাপারে দান-সাগর বিদ্যাসাগরের নিজের পুস্তক ও অর্থ যে কত ব্যয় হইত, তাহার লেখা-জোখা নাই।

বেথুন সাহেব তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার ব্যয় নির্ব্বাহের কোন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তখন এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা পক্ষে ইংরাজদিগের সবিশেষ যত্ন জন্মিয়াছিল। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে বেথুন সাহেবের মৃত্যু হইলে তৎকালীন গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডেলহাউসী সেই বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয় স্বয়ং নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। যখন গবর্ণমেণ্ট বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয় সকলের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে অসম্মত হইলেন, তখন গবর্ণর-জেনেরাল-পত্নী লেডি ক্যানিং এবং বঙ্গের ভাবী লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর গ্রাণ্ট, বীডন, গ্রে প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর সাহেবেরা সেই সকল বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ চাঁদা দিতেন।

অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন জেলায় এতদ্দেশীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এক একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে লাগিলেন। Grant-in-aid বিধিতে গবর্ণমেণ্ট হইতে এই সকল বিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্য হইতে লাগিল।

স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক।

(School Book Society)

১৮৩০ হইতে ১৮৪০ বৎসর পর্য্যন্ত দশ বৎসরের মধ্যে স্কুলবুক সোসাইটি দ্বারা এবং এদেশীয়দিগের স্বকীয় চেষ্টায় যেমন ইতিহাসসার, গ্রীসদেশীয় ইতিহাস, ও বাঙ্গালার ইতিহাস প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছিল, তেমনি মিশনরিদিগের দ্বারাও রসায়ন, ভূবিদ্যা ও জ্যোতির্বিদ্যার কয়েকখানি পুস্তক বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। * এই সকল গ্রন্থের

* ১৮৪৬ সালে প্রেফেয়ারের ব্যাখ্যানুসারে ক্ষেত্রতত্ত্ব বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হয়। তাহাতে প্রথম পত্রে লীলাবতীর ছবি দেওয়া হইয়াছিল। লীলাবতীর পিতা তাঁহাকে এক কাষ্ঠফলকে লিখিয়া অঙ্ক শিক্ষা দিতেছেন, এই দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছিল।

ভাষা অতি কদর্য্য। ১৮৪৬ সালে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে, সুবিখ্যাত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাকল্পদ্রুম প্রকাশ করেন। বিদ্যাকল্পদ্রুমের প্রথম খণ্ডে রোম রাজ্যের ইতিহাস, ইংরাজী ও বাঙ্গালায় সঙ্কলিত হইয়াছিল। পুস্তকের প্রতি পত্রের এক দিকে ইংরাজী, অপর দিকে বাঙ্গালা। তাহাতে ইংরাজীর কথার প্রতিরূপ বাঙ্গালা শব্দগুলি একত্রে বসানমাত্র। কাহার সাধ্য, সে বাঙ্গালার একছত্র বুঝিতে পারে ? তখন স্কুলবুক সোসাইটীর দু একখানি বর্ণমালা বোধক ও গল্প পুস্তক এবং বটতলার রামায়ণ ও মহাভারত ভিন্ন স্ত্রীদিগের পাঠ্য আর কিছু পুস্তক ছিল না। ক্রমশঃ

শ্রীঈশানচন্দ্র বসু।

মার্শেয়েঝ। (১)

THE MARSEILLAISE

উচ্চ বা অনুচ্চ সকল ভাবুক হৃদয়েই এক এক সময়ে এক এক শুভ মুহূর্ত্ত আসে। ক্ষুদ্র মানব জীবনের সেই ক্ষুদ্র মুহূর্ত্ত এতই স্বর্গীয় ও অপার্থিব এবং দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ অবস্থা হইতে এতই উচ্চ ভাবময় যে, অনেক সময় সেই অসামান্য ক্ষণ প্রসূত কার্য্য দেখিয়া কার্য্যকর্ত্তা স্বয়ং আশ্চর্য্য হইয়া পড়ে এবং সে ইহার জনক, নিঃসন্দেহ ভাবে নিজেই তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না। অপরদিকে, সমুদয় জগৎ তাহার পানে চাহিয়া বিমুগ্ধ ও বিস্ময়াপন্ন হয়। বাস্তবিক, এই নশ্বর, ক্ষুদ্র মানব জীবনে ইহা এক অতি বিস্ময়পূর্ণ অলৌকিক ব্যাপার। মার্শেয়েঝ সংগীত জনৈক ভাবময় সামান্য সৈনিক পুরুষের ক্ষুদ্র জীবনের এক অসাধারণ ও শুভ মুহূর্ত্তের ফল। এই জন্য ইহা এত উচ্চ, এত অতুলনীয়। এই জন্যই ইহার চতুষ্পার্শ্বে এক চির-নূতন উৎসাহ-ব্যঞ্জক, স্বদেশ-প্রাণতাময় সার্ব্বভৌমিক ভাব বিরাজিত।

যৎকালে সমগ্র ফরাসীরাজ্য বিপ্লব-বহ্নিতে প্রধূমায়িত, সমগ্র ফরাসীজাতি অধীনতা শৃঙ্খল-পাশ ছিন্ন করিবার জন্য প্রযত্নবান, স্বাধীনতা সাম্য-মৈত্রবাদ যখন প্রত্যেক ফরাসীর জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া প্রত্যেক হৃদয়কে এক অদম্য উৎসাহ ও আবেগপূর্ণ স্বদেশপ্রাণতায় পরিপূর্ণ করিয়াছে, যখন শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন, বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী ও পুরুষ নির্ব্বিশেষে এক নূতন অননুভূতপূর্ব্ব অগ্নি-নিষেকে নিষেকিত, রাজতন্ত্রের উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচার প্রত্যেককে স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ করিয়াছে—সেই বিখ্যাত অগ্নিময় ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় এই অমর, মৃতসঞ্জীবক গানের জন্ম। তৎসাময়িক ফরাসীজাতির প্রত্যেকের উন্মত্ত হৃদয় ভাব এই সংগীতে পরিব্যক্ত। কুচক্রী, স্বদেশ-দ্রোহীর বিশ্বাসঘাতকদিগের চক্রান্তভয়ে ভয়ার্ত্ত, বিজাতীয় বিপক্ষগণের আক্রমণাশঙ্কায় বিচকিত, স্বদেশ ও স্বাধীনতা বিনাশ ভয়ে ত্রস্তপ্রাণ, ফরাসী সাধারণের হৃদয়ের সেই এক অবর্ণনীয় হতাশা ও ব্যাকুলতার স্বাভাবিক উদ্বেলতা, এই জাতীয় সংগীতের প্রত্যেক পংক্তিতে ঘৃণা, ক্রোধ, ভয়, নিরাশা পর্য্যায়ক্রমে সপ্রকাশিত। সেই জন্যই মার্শেয়েঝ সেই উচ্চ মুক্ত স্বাধী-

নতা, সেই উদার নীতিমূলক সাম্য-মন্ত্র, সেই মর্ম্মস্পর্শী, জীবন্ত, অকৃত্রিম, চিরনূতন স্বদেশ-বাৎসল্য-ভাব, বংশ পরম্পরায় জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে। সেই জন্যই মার্শেয়েঝ ফরাসীজাতীয় সংগীতের শ্রেষ্ঠতম আসন অধিকার করিয়া ভাব-প্রধান ফরাসীর জীবনের মূলভিত্তি হইয়া রহিয়াছে। মার্শে-য়েঝ রচনা কাল হইতে আজ শতাব্দী অতীত হইল, ইহা আজও ফরাসী প্রাণকে অগ্নিময় উত্তেজনায় উত্তেজিত করে। অত্যাচারী রাজকীয়তা অতীতের কোন সুদূর গর্ভে বিস্মৃতির গভীর আঁধারাচ্ছন্ন গুহা মধ্যে এক্ষণে বিলীন; ফরাসীদিগের মধ্যে এক্ষণে রাজা প্রজা, প্রভু দাস, স্বাধীন অধীন ভাব আর নাই। সাধারণ তন্ত্রের সমুজ্জ্বল সাম্যভাব সকলকেই স্বাধীনতার উচ্চ অধিকার প্রদান করিয়াছে। অতীতের স্বেচ্ছাচার শাসন, এবং নানাবিধ অত্যাচার ও বিভীষিকা এক্ষণে ফরাসী জাতিকে উত্যক্ত করিবার নাই। তথাপি আজও ফরাসী হৃদয় মার্শেয়েঝ শ্রবণে গভীর স্বদেশ প্রেমোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইয়া উঠে। আজও ফরাসী প্রাণ মার্শেয়েঝ সুরে ও তানে উন্মত্ত।

কিন্তু কেবলি ফরাসী প্রাণ নহে, অন্য হৃদয়, যাহার স্বার্থ ফরাসীর সহিত এক নহে, তাহাও মার্শেয়েঝ শ্রবণে অগ্নিময় হইয়া যায়। স্বাধীনতা, ও স্বদেশের নামে এপর্য্যন্ত ঈদৃশ সার্ব্বভৌমিক অগ্নি নিষেককারী ভাবপূর্ণ সংগীত আর রচিত হয় নাই। আমরা তাই শুনি, গর্ব্বিত ইংরাজ প্রকৃতিও, উৎসাহ ও উত্তেজনা প্রকাশ করিবার কালে অপর বাদ্য-যন্ত্রে মার্শেয়েঝ সুর চড়াইয়া উন্মাদকারী আলাপ করিয়া থাকে। আমরা তাই আজও শুনি, ইংরাজ শ্রমজীবিগণ যখন কোন বিশেষ উত্তেজনা ও উৎসাহ প্রকাশ করিবার জন্য, সময়ে সময়ে দলবদ্ধ হইয়া প্রকাণ্ড রাজপথ দিয়া মহা আড়ম্বরে চলিয়া যায়, তখন তাহারা অপর কোন সংগীত গাহে না, সর্ব্বোচ্চ জাতীয় সংগীত অগ্নিময় মার্শেয়েঝ গাহিতে গাহিতেই হৃদয়ের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। বাস্তবিক, এরূপ উত্তেজক, উন্মত্তকর, বীর-রসপূর্ণ জাতীয় সংগীত জগতের কোন জাতির ইতিহাসে কেহ কখন দেখে নাই। কার্লাইল এই সুবিখ্যাত সংগীত সম্বন্ধে এইরূপে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন :—

"Luckiest musical composition ever promulgated The sound of which will make the blood tingle in men's veins, and whole armies and Assemblages will sing it, with eyes weeping and burning, with hearts defiant of death, despot and devil"

"সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংগীত। শুনিলে মনুষ্যের শিরায় শোণিত জ্বলিয়া উঠে। সৈন্যদল ও সভা সমিতি গাহিতে গাহিতে উত্তেজিত প্রাণে কাঁদিয়া ফেলে এবং মৃত্যু, অত্যাচারী রাজা ও দানব-ভয় তুচ্ছ করিয়া অগ্রসর হয়।"

মার্শেয়েঝ সংগীতের গূঢ় মর্ম্ম অনুধাবন জন্য তৎসাময়িক বিপ্লবের একটু আভাস জানা আবশ্যক। আমরা সেই জন্য ফরাসী বিপ্লবের একটু সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত সন্নিবেশিত করিলাম।

হতভাগ্য ষোড়শ লুইর রাজত্বকালে অতি ভীষণ হত্যাকাণ্ডপূর্ণ ফরাসী বিপ্লবের সূচনা হয়। লুই আগষ্ট ১৭৭৪ অব্দে ফরাসী সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ভাগ্যদেবী তদীয় রাজত্বের প্রথমাবধি তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ন। কেননা, সিংহাসনাধিরোহণ কাল হইতেই রাজ-কোষ শূন্য। ধনাগারের এ শূন্যতা লুইর জীবন কাল মধ্যেও কখন পূর্ণ হয় নাই। রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য পুনঃ পুনঃ অমাত্য পরিবর্ত্তন করিয়াও তিনি ধনাভাব বিদূরিত

করিতে পারেন নাই। নবাগত মন্ত্রিগণ কেহ বা ঋণ দ্বারা কেহ বা নূতন কর স্থাপন দ্বারা বিধিমত চেষ্টা করিয়াও রাজস্বাভাব মোচন করিতে সক্ষম হন নাই। এদিকে দেশময় দুর্ভিক্ষের বিষম প্রকোপ বিস্তারিত। প্রজাপুঞ্জ অন্নাভাবে বিশীর্ণ ও জর্জ্জরিত। ১৭৮৭ অব্দে নূতন কর নির্দ্ধারণ জন্য প্রথম সম্ভ্রান্ত সভা আহুত হয়। এতাবৎ যাজক ও সম্ভ্রান্তগণ কোনরূপ কর প্রদান করিতেন না। দুস্থ প্রজাগণই রাজ্যের সমুদায় ব্যয় ভার বহন করিত। যাজক ও সম্ভ্রান্তগণের উপর কর সংস্থাপনোদ্দেশ্যেই পার্লেমেণ্ট সভা। কিন্তু ইহা রাজ-সচিবের প্রস্তাবিত কর-স্থাপন অনুমোদন করিল না। নূতন মন্ত্রী নিয়োজিত হইয়া অন্যোপায়ে ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব করিলে পার্লেমেণ্ট সভা উহাতেও প্রবল আপত্তি করিলেন। রাজা অসন্তুষ্ট হইয়া সভাভঙ্গ করিয়া দিলেন। কিন্তু সভ্যগণ অনতিবিলম্বে পুনরায় সভাগৃহে সমবেত হইলেন। পার্লে-মেণ্টসভা একেবারে উঠাইয়া দিবার ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। চক্রান্ত পরিপক্ক না হইতেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। সভা অহো-রাত্র অধিবেশন করিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। রাজা অবশেষে সৈন্য বল প্রয়োগ দ্বারা সভ্যদিগের কাহাকেও বন্দী এবং কাহাকেও সুদূর স্থানে স্থানান্তরিত করিয়া সভা ভঙ্গের আদেশ প্রচার করিলেন, প্রাদেশিক সমুদয় সভা সমিতি রাজাদেশের প্রতিবাদ করিল, এবং সাধারণ প্রজাপুঞ্জও ইহাদিগের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল।

১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে আগষ্ট মাসে রাজাদেশ প্রচার হইল যে "এতদিন যে সাধারণ সভা গঠন প্রস্তাবিত হইতেছিল, আগামী মে মাসে উহা প্রকৃত পক্ষে সংগঠিত হইবে।" সাধারণ সভার কার্য্য, সীমা ও ক্ষেত্র, ক্ষমতা ও অধিবেশন প্রভৃতি কতকগুলি আবশ্যকীয় বিষয়ের মীমাংসা জন্য দ্বিতীয় সম্ভ্রান্ত সভা আহুত হয়। (ডিসেম্বর ১৭৮৮)। কিন্তু এতৎ সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত মীমাংসা না করিয়াই সভা ভঙ্গ হইল। এদিকে রাজ্যময় সাধারণ প্রজাপুঞ্জের মধ্যে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রাজ্যময় প্রবল উৎসাহ ও আন্দোলনের প্রবাহ বহিতে লাগিল। এই সময় (জানুয়ারি ১৭৮৯) হইতেই ঐতিহাসিকগণ অগ্নিময় বিপ্লবের সূচনা গণনা করিয়া থাকেন।

দুর্ভিক্ষের প্রকোপ কোনরূপে প্রশমিত না হইয়া আরো পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। শস্যাভাবে প্রজাগণ হাহাকার করিতেছে। অন্ন-কষ্টে প্রপীড়িত হইয়া প্রজারা উন্মত্ত প্রায়। ক্ষুন্নিবৃত্তি জন্য লোকে চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করিয়াছে। নগরে, গ্রামে, পথে সর্ব্বত্রই দস্যু ভয় প্রবল হইয়া উঠি-য়াছে। বাণিজ্য ব্যবসায় স্থগিতপ্রায়। শ্রমজীবিগণ কর্ম্মাভাবে অলস, আহারাভাবে শীর্ণ ও উত্যক্ত। প্যারি মহানগরীর সর্ব্বত্র বিশুষ্ক বদন, শীর্ণ দেহ, মলিন বাস, দীর্ঘ-কেশ দস্যুগণ দলে দলে, দীর্ঘযষ্টি হস্তে রাজপথে পরিভ্রমণ করিতেছে। নির্ব্বাচনের মহা আন্দোলন ও হুলস্থূলের সহিত দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজার আর্ত্তনাদ ও বিরক্ত রব সংশ্লিষ্ট হইয়া সমুদয় ফরাসীরাজ্য এক ভীষণ প্রলয়কারী রুদ্র ভাবাপন্ন! বুভুক্ষিত প্রজাদিগের মধ্যে বিদ্রোহীতার ভাব ক্রমশঃ দেখা যাইতেছে।

দেশের এইরূপ অবস্থার মধ্যে সাধারণ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন আরম্ভ হইল। প্রজাগণ আশান্বিত হৃদয়ে প্রথম নির্ব্বাচনের সমূহ উদ্যোগ ও সহায়তা করিতে লাগিল। ৪ মে, ১৭৮৯, Versailles নগরে মহা সভায় সম্ভ্রান্ত, যাজক ও সাধারণ প্রজা প্রতিনিধিগণের প্রথম অধিবেশন হয়। সাধারণ প্রতিনিধিগণের সহিত সমুদয় ফরাসী জাতির সহানুভূতি। ইহারা রাজ্যের কার্য্য নির্ব্বাহে প্রধান শক্তি হইবার জন্য ইচ্ছুক। কিন্তু সম্ভ্রান্ত ও যাজক সভ্যগণের তাহাতে সম্পূর্ণ অমত। সুতরাং প্রথম হইতেই প্রজা-স্বার্থ নির্দ্দেশক প্রতিনিধি ও সম্ভ্রান্ত এবং যাজক সভ্য মধ্যে মনোবাদ। উভয় পক্ষের অসন্তোষকর সংঘর্ষণ জন্য কোন রাজকার্য্যই নিষ্পাদিত হয় না। ক্রমাগত সাত সপ্তাহ কাল প্রজা প্রতিনিধিগণ কেবল বক্তৃতা করিয়াই সময় যাপন করেন। কোন কার্য্যেরই মীমাংসা হইতে পায় না। অবশেষে মধ্যস্থস্বরূপ কতকগুলি যাজক-সভ্য, সম্ভ্রান্তগণ ও সাধারণ প্রতিনিধিগণের মিলন চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া, আপনারা সাধারণ প্রতিনিধি দলে মিলিত হইবার ভয় প্রদর্শন করিলেন। অনেক যাজক-সভ্য সাধারণ দলে কার্য্যতঃ মিলিতও হইলেন। প্রজা প্রতিনিধিগণ এক্ষণে অবশিষ্ট যাজক ও সম্ভ্রান্ত সভ্যদিগকে উপেক্ষা করিয়া, আপনাদের মধ্যে একজন সভাপতি নিযুক্ত করিলেন এবং আপনাদিগকে "জাতীয় মহাসভা" নামে অভিহিত করিয়া দেশের অভাব মোচন জন্য ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এতদিন সম্ভ্রান্ত ও যাজকদিগের প্রতিযোগীতা নিবন্ধন ক্লগ্নদেশের জন্য কোন হিতকর পন্থাই অবলম্বিত হইতে পারে নাই। জাতীয় মহাসভা এক্ষণে দুর্ভিক্ষ নিবারণ, সাম্রাজ্যের ঋণভার স্থিরীকরণ, সাম্বৎসরিক কর নিরূপণ প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য নিষ্পাদন জন্য সমিতি গঠন করিলেন। প্রজাবৃন্দ ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু অমাত্য সভা সশঙ্কিত হইলেন। মন্ত্রী-সভা জাতীয় মহাসভার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার অভিলাষী হইলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের বিরুদ্ধে মহাসভার গৃহদ্বার রুদ্ধ হইল। মন্ত্রীবর্গ প্রবেশাধিকার পাইলেন না।

এই সময়ে সাধারণ প্রতিনিধিগণ এক দিন অমাত্য সভার চাতুরী ও কৌশলে সভাগৃহে অধিবেশন করিতে পারেন নাই। তাঁহারা তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া সন্নিকটস্থ এক টেনিস ক্রীড়ার মুক্ত প্রাঙ্গণে সভা গঠন করিলেন। এই স্থানে অপমানিত প্রতিনিধিগণ দেশ হিতোদ্দেশ্যে এক গভীর প্রতিজ্ঞা পাশে পরস্পর আবদ্ধ হন। ইহাই সুবিখ্যাত "টেনিস প্রাঙ্গণের শপথ" নামে পরিচিত। (২০ জুন, ১৭৮৯)।

ইহার অব্যবহিত পরেই যাজক সভ্যের অধিকাংশ সাধারণ প্রতিনিধিগণের সহিত মিলিত হইলেন। সভাগৃহের পরবর্ত্তী অধিবেশনে রাজা স্পষ্টতঃ ঘোষণা করিলেন যে "যদি তোমরা তিন স্বতন্ত্র রাজ্য (সম্ভ্রান্ত, যাজক, সাধারণ) পরস্পর সমবেত ভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ না হও, আমি রাজা, আমার প্রজারা যাহাতে সুখী হয়, তাহাই করিব।" এই বলিয়া রাজা সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন, তৎসঙ্গে সম্ভ্রান্ত ও যাজক সভ্যগণও নিস্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। সাধারণ প্রতিনিধিগণ রাজার এই ঘোষণা বাক্যে নিতান্ত চঞ্চল হইয়া ইতিকর্ত্তব্য স্থির করিতে

পারিলেন না। অবশেষে মিরাবো নামক এক সুবক্তা বজ্র-গম্ভীরস্বরে বলিলেন—সাধারণ প্রতিনিধিগণ ফরাসী জাতিদ্বারা এখানে প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলে স্বদেশ-হিতকল্পে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁহারা কখনই সভা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন না। এমত সময়ে রাজদূত আসিয়া পুনরায় সভাস্থলে রাজাদেশ উল্লেখ করিয়া সকলকে সভাগৃহ পরিত্যাগ করিতে বলিল। মিরাবো রোযকষায়িত লোচনে অগ্নিময় স্বরে বলিলেন, রাজা যাহা বলিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাই বলিয়া গিয়াছেন এবং আমরাও তাহা শুনিয়াছি। তুমি কোথাকার কে, যে আমাদের নিকট তাহার পুনরুল্লেখ করিতে আসিয়াছ। যাও, যাঁহারা তোমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বলিও, আমরা প্রজাপুঞ্জের দৃঢ় ইচ্ছানুসারে এখানে সমবেত হইয়াছি। শস্ত্রবল প্রয়োগ ব্যতিরেকে আর কিছুতেই আমাদিগকে এখান হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারিবেক না। রাজদূত নিঃশব্দে পলায়ন করিল। সমুদয় ফরাসীজাতি রাজার ঈদৃশ আদেশে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

ভীরু, অস্থির সংকল্প লুই স্বীয় আদেশ অসম্মানিত হইতে দেখিয়াও কোনরূপ কঠিনতর পন্থা অবলম্বন করিতে মনস্থ করিলেন না। বরং যে সমুদয় সম্ভ্রান্ত ও যাজক সভ্য তৎকাল পর্য্যন্ত সাধারণ প্রতিনিধিগণের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, তিনি তাঁহাদের সকলকে সাধারণ প্রতিনিধিগণের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে সম্ভ্রান্ত ও যাজক সভ্যগণ সাধারণ প্রতিনিধিগণের সহিত মিলিত হইলেন। তখন, জাতীয় মহাসভারই জয় হইল। রাজাদেশ উপেক্ষিত রহিল। ইহা দেখিয়া অমাত্য সভা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, প্রজাবিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্ত রাজাকে মন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিলেন।

বিদেশ হইতে সৈন্ত আনীত হইতে লাগিল। দলে দলে বিদেশী সৈন্ত পারি ও ভারসেয়াঝ অভিমুখে আসিতেছে। উহাদের চরণোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশিতে আকাশ আচ্ছন্ন। উহাদিগের সমভিব্যাহারে বৃহৎ বৃহৎ কামান। ইহা সন্দর্শনে দেশময় মহাতঙ্কের রোল উঠিল। জাতীয় মহাসমিতি রাজার এবংবিধ সামরিক আয়োজন দেখিয়া স্তম্ভিত ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে,রাণীর প্রাসাদ হইতে একটা কামান জাতীয় মহাসভা গৃহের অভিমুখে স্থাপন করা হইয়াছিল! সৈন্তপুঞ্জের পদধ্বনি, অস্ত্র শস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দ, নিশাযোগে বিনাবাদ্যে সৈন্তগণের গমনাগমন—জাতীয় সমিতি ও নগরবাসী সকলের অন্তরে বিষম সন্দেহ ও আতঙ্ক জাগরিত করিল। এদিকে প্রজাগণ উপযুক্ত শস্যাভাবে ভুষি ও তৃণ সিদ্ধ করিয়া কোনমতে প্রাণ ধারণ করিতেছে। দস্যু ও তস্করের উপদ্রবে সকলেই শশব্যস্ত। খাদ্য খাদ্য করিয়া ক্ষুধার্ত্ত প্রজাবৃন্দ বিকটরবে উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতেছে। শস্যাগার লুণ্ঠিত হইতেছে। দাঙ্গা হাঙ্গামা দেশের সর্ব্বত্রই সংঘটিত হইতেছে। পারি মহানগরীতেও দস্যু ভয়ে কাহারও সম্পত্তি নিরাপদ নহে। রুটি-বিক্রেতারা লুণ্ঠনের ভয়ে দোকান একেবারেই বন্ধ করিয়াছে। আর, পথে পথে ক্ষুৎপিপাসাতুর, উন্মত্ত, বিরক্ত ও ক্রোধোদ্দীপ্ত লোকেরা লোলুপ

ব্যাঘ্র-সদৃশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পুলিস শান্তি স্থাপনে অক্ষম। সৈন্যদলও দাঙ্গা, কলহ নিবারণে অপারক। বিশেষতঃ অধিকাংশ অনর্থ শস্য লইয়াই। দেশীয় সৈন্যগণ, যাহাদের হয়ত পিতামাতা, ভাই ভগিনী, স্ত্রী পুত্র, অপর সাধারণের ন্যায় এই দেশব্যাপ্ত দুর্ভিক্ষের জ্বালায় কাতর, ক্ষুধা-পীড়িত প্রজাসাধারণের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া আদিষ্ট হইলেও বিদ্রোহীদের প্রতি গুলি বর্ষণ করে না। বরং বিরক্ত ভাবে বন্দুক মাটিতে নামাইয়া রাখে। তাহারা বলে "Cause of France is their Cause" সমগ্র ফরাসীজাতির দুঃখ দুর্দ্দশার কারণ যাহা, আমাদেরও তাই। এইরূপে দেশীয় সৈন্যগণ দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত সাধারণ প্রজার বিদ্রোহীতা দমন না করিয়া বরং তাহাদিগের সহিত সম্মিলিত হইল। এই সময়ে বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীগণ আপনাদের মধ্য হইতে কতকগুলি স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া এক একটি ক্ষুদ্রদল সংগঠন করে। ইহাদের উদ্দেশ্য দস্যু ও তস্কর-ভয় নিবারণ করা। মার্শেয়েল্ধ বন্দরস্থ অধিবাসীগণ সর্ব্বপ্রথমে এই উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। ক্রমে ইহাদের দৃষ্টান্ত সমুদয় ফ্রান্সের ভিন্ন ভিন্ন নগরে ও প্রদেশে অনুসৃত হয়। এই স্বেচ্ছা-প্রবৃত্ত সৈন্যদল হইতেই ভাবী "জাতীয় রক্ষক" সেনাদলের সূত্রপাত হয়। এককালে সমুদয় ফরাসীজাতি স্বদেশের জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়া স্বদেশ-হিতৈষী রক্ষক দলভুক্ত হইয়াছিল।

প্যারিস অধিবাসীরা রাজার বিদেশী সৈন্য আনয়ন, প্রজার দুর্দ্দশায় উদাসীনতা, জাতীয় মহাসমিতিকে শস্ত্রধারী সৈনিক পরিবেষ্টিত করিয়া ভীতি প্রদর্শন, জনহিতৈষী, সাধারণ প্রজাপক্ষীয় ব্যক্তিদিগকে পুলিস কর্ত্তৃক বিতাড়ন ইত্যাদিতে নিতান্ত কুণ্ঠিত ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া অবশেষে একদিন এক স্বদেশপ্রাণ বক্তার সমুৎসাহী ও ওজস্বী বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া বক্তৃতা-স্থল হইতেই অস্ত্র অস্ত্র করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইল। কথিত আছে, এই সময়ে দেশীয় কর্ম্মকারগণ দিবারাত্র কার্য্য করিয়া ৫৬০০০ ছাপান্ন সহস্র বল্লম ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে প্রস্তুত করিয়া স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত জাতীয় সৈন্যদিগকে প্রদান করিয়াছিল। বন্দুকের জন্য রাজার অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হইল। কিন্তু বারুদ বিনা বন্দুক কোন কার্য্যের হইবে না বলিয়া, প্রায় চল্লিশ সহস্র উন্মত্ত লোক বল্লম ও বন্দুকহস্তে বাষ্টাইল দুর্গ আক্রমণ করিল। ১৪ জুলাই ১৭৯০ প্রজাগণ দ্বারা বাষ্টাইল অধিকৃত হয়। এই ঘটনার পর হইতেই বিপ্লবাগ্নি অতি প্রবলবেগে জ্বলিতে আরম্ভ করে। বাষ্টাইল আক্রমণ ফরাসীজাতির পক্ষে অগ্নি-নিষেক স্বরূপ। এই অবধি সমুদয় ফরাসীজাতি এক অদম্য উন্মত্ততায় উন্মত্ত হইল। এক্ষণ হইতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই উত্তেজিত, দেশের জন্য প্রাণদানে কেহ মুহূর্ত্তের তরেও সঙ্কোচ মনে করে না। এই ঘটনা হইতেই সমুদয় ফরাসীজাতি জাতীয় রক্ষকস্বরূপ হইয়া দেশের শান্তি রক্ষার জন্য এবং দস্যু ও শত্রুদমন জন্য অস্ত্র গ্রহণ করিয়া "জাতীয় রক্ষক" "National Guard" নাম পরিগ্রহ করিল। এই সময় হইতেই প্রত্যেক ফরাসী Patriot বা স্বদেশহিতৈষী। এক সর্ব্বজনীন স্বদেশ-উপচিকীর্ষা ভাব সমুদয় ফরাসী হৃদয়ে সংক্রামিত হইল। এরূপ

দেশব্যাপ্ত, জাতি-প্রসারিত স্বদেশ-হিতৈষণা কেহ কখনও দেখে নাই।

জাতীয় মহাসভাব প্রাধান্য উত্তরোত্তর পবিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অধীনতা-বিমুক্ত সাধাবণ প্রজাপুঞ্জের উদ্দামভাবে আকাশ পূর্ণ হইয়া উঠিল। সম্ভ্রান্তগণ শশঙ্কিত চিত্তে স্বদেশ পবিত্যাগ কবিয়া পর-বাজ্যে আশ্রয় লইতে আবম্ভ কবিলেন। বাজা বিদেশীয় সৈন্যদ্বাবা বাজপ্রাসাদ-বক্ষা করিতে লাগিলেন। শতাধিক সুইস সৈন্য রাজার শবীর বক্ষক, ইহাদেব সংখ্যা দ্বিগুণিত হইল। জাতীয় রক্ষক দলসত্বেও বৈদেশিক সেনাগণ দলে দলে রাজধানী অভিমুখে আসিতে লাগিল। প্রজাব উপর রাজাব অবিশ্বাস এবং বাজার প্রতি প্রজাব অবিশ্বাস ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে লাগিল। বাজপ্রাসাদে কেবল অভিজাতগণেব ষড়যন্ত্র ও গুপ্ত পরামর্শ। বাজা সপবিবাবে ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়াব সামা-মধ্যস্থ মেটজ নগবে প্রস্থান কবিব.ব মন্ত্রণা ও উদ্যোগ কবিতে লাগিলেন। মেটজ নগবে বাজভক্ত বোইলো তত্রস্থ দুর্গেব সংস্কবণে নিয়োজিত। বোইলো জাতীয় সমিতিব লোক হইয়াও রাজানুগত। বাজাকে উন্মত্ত প্রজাসাধাবণেব অপমান, অত্যাচাব ও বিদ্রোহীতা হইতে মুক্ত কবিবাব জন্য বাজভক্ত বোইলো স্থির-প্রতিজ্ঞ ও বদ্ধ-পবিকর। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাজপ্রাসাদেব এই সমুদয় গুপ্ত মন্ত্রণা সাধাবণেও অপ্রকাশিত রহিল না। শীঘ্রই সকলে জানিতে পাবিয়াছিল।

জাতীয় মহাসভা প্রজাসাধারণের অবৈধ কার্য্য ও আচবণ এবং বিদ্রোহীতা নিবাবণ জন্য সম্যকরূপে চেষ্টা করিতেন। মহাসভাব অনুমত্যানুসারেই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত জাতীয় রক্ষকদল রাজপথে প্রহবীর কার্য্য করিত। কোনস্থানে কোনরূপ জনতা হইতে দিত না। কোনরূপ দাঙ্গা হাঙ্গামা হইবার পূর্ব্বেই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিত। সংবাদপত্রই বাজধানীর যাবতীয় সংবাদ দেশময় ব্যাপ্ত করিয়া দেয়। বিশেষ, এই সময়ে সংবাদপত্র বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইত। সংবাদ-পত্রের "চতুর্থ রাজশক্তি" নাম এই সময়ে সার্থক হইয়াছিল। লোকে স্বাধীনভাবে স্বাধীনমত প্রচাব করিত। সাধাবণ লোক সংবাদপত্র পাঠে দেশেব প্রকৃত অবস্থা ও তৎসম্বন্ধীয় নানামত অবগত হইত। অনেক উচ্ছৃঙ্খল ও অপরিমিত মতবাদী সম্পাদকগণ আপন আপন পত্রিকা স্তম্ভে বিদ্রোহাত্মক অনল উদ্গীবণ কবিতেন। অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, উত্তেজিত হৃদয়, ফবাসা সাধাবণ তদ্দ্বাবা অবৈধ উপায়ে অন্যায় এবং অসঙ্গত কার্য্য সাধনে উৎসাহিত হইত। এই নিমিত্ত জাতীয় রক্ষক অধিনায়ক পাবি নগবে বিনা লাইসেন্সে সংবাদ পত্র বিক্রয় রহিত কবিয়া দিলেন। পথে পথে যে সে আব সংবাদ পত্র ফিবি কবিতে পাবিত না। স্বাধীন প্রেসেব স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ কবিবার ক্ষমতাও সঙ্কোচ কবিয়া দিলেন। পুরুষেবা এইরূপে জাতীয় রক্ষক দ্বাবা শাসিত হইয়া অন্য কোনরূপ বিদ্রোহীতাচবণ করিতে পাবিত না। কিন্তু ফবাসী নাবীগণ জাতীয় রক্ষক দলের সতর্ক দৃষ্টিব অধীন ছিল না। তাহাদেব নিকট হইতে কেহ কোনরূপ অত্যাচার, অবৈধ কার্য্য, বা বিদ্রোহীতার আশঙ্কা করে নাই। কিন্তু বিপ্লব বহ্নি নারী হৃদয়েও সংক্রামিত হইয়াছে। নিম্ন শ্রেণীর, নিরক্ষরা স্ত্রীগণ স্ব স্ব স্বামী পুত্র সহোদরকে

প্রতিরুদ্ধ দেখিয়া, আপনারা তাহাদিগের পরিবর্তে দেশহিতকল্পে মত্ত হইল। নারীগণও সভাসমিতি আহ্বান করিয়া রাজনৈতিক বক্তৃতা ও আন্দোলনে ব্যাপৃত হইল। অবশেষে একদিন উন্মত্তা নারীগণ দ্বারা চালিত হইয়া পারিব যাবতীয় নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা গৃহ কার্য্যার্থে সচরাচর ব্যবহৃত অস্ত্র এবং বন্দুক, কামান, প্রভৃতি অপরবিধ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া, ভারসেয়াঝ প্রাসাদাভিমুখে প্রবল স্রোতের ন্যায় প্রধাবিত হইল। জাতীয় রক্ষক সৈন্য সে বেগ নিবারণে অক্ষম। সহস্র সহস্র বারনারী, শ্রমজীবি স্ত্রী উন্মত্তের ন্যায় বিকট রবে চীৎকার করিতে করিতে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিল এবং রাজা ও রাণীকে যৎপরোনাস্তি অপমানিত এবং লাঞ্ছিত করিয়া, প্রাসাদের সুসজ্জিত দ্রব্যাদি ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, রাজ পরিবারসহ পারিতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। (৫ অক্টোবর ১৭৮৯) ইহাই ইতিহাসে "স্ত্রীলোকদিগের বিদ্রোহ" বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। এই অবধি পারি বিদ্রোহের বিপ্লবের কেন্দ্র হইল। ক্রমশঃ

শ্রীপতিচরণ রায়।

সঙ্কীর্ণ অথবা সঙ্করজাতি।

প্রসঙ্গায়ত্ত আমরা বৈদ্যজাতিকে বর্ণসঙ্কর বলায়, আমাদের কোন কোন হিতৈষী বৈদ্যবন্ধু বিরক্ত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। বৈদ্যজাতিকে অম্বষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান থাকাতেই তজ্জাতিকে সরল বিশ্বাস ও জ্ঞানানুসারে বর্ণসঙ্কর বলা হইয়াছে, নতুবা অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। আমাদের বৈদ্যবন্ধুর প্রধান আপত্তি এই যে, ভগবদ্গীতাতে স্ত্রীপুরুষের পরস্পর ব্যভিচার দ্বারা সমুৎপন্ন সন্তান সন্ততিকে বর্ণসঙ্কররূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বৈদ্য বা অম্বষ্ঠ জাতি কোনরূপেই সেরূপ লক্ষণাক্রান্ত নহে। অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতি যে ভগবদ্গীতোক্ত বর্ণসঙ্কর, একথা আমরাও তো বলি না। ব্রাহ্মণের বিবাহিতা, অসবর্ণা বৈশ্যাস্ত্রী গর্ভজাত যে সন্তান, তাহারাই অম্বষ্ঠ। মন্বাদি শাস্ত্রে ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরন্তু বর্ণসঙ্কর শব্দে যে কেবল ভগবদ্গীতোক্ত প্রতিলোম জাতিকেই বুঝাইবে, এরূপ নহে, ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের বহির্ভূত সকল জাতিই সঙ্কীর্ণ বা সঙ্কর শব্দবাচ্য। এই সঙ্কীর্ণ বা সঙ্কর জাতি স্মৃতি অথবা পুরাণাদি শাস্ত্রে সামান্যতঃ দ্বিবিধ উক্ত হইয়াছে। প্রথম, অনুলোম, দ্বিতীয়, প্রতিলোম। দ্বিজাতির বিবাহিতা অসবর্ণা স্ত্রীগর্ভজাত সন্তানগণকে অনুলোম এবং উত্তমবর্ণের মাতাতে অধম বর্ণের পিতা হইতে অবৈধোৎপন্ন যে সন্তান, তাহাকে প্রতিলোম বলা যায়। সুতরাং বর্ণসঙ্কর বলিলেই যে, অম্বষ্ঠ বা বৈদ্যজাতিকে গালি দেওয়া হইল, এরূপ কথা কোনরূপেই বলা যাইতে পারে না। ভগবান মনু, চণ্ডাল হইতে অম্বষ্ঠ করণাদি সমুদায় জাতিকেই সঙ্কীর্ণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"আচণ্ডালাত্তু সংকীর্ণা অম্বষ্ঠ করণাদয়।" ইত্যাদি" এস্থলে অম্বষ্ঠ ও চণ্ডালকে এক-

মাত্র সঙ্কীর্ণ শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করিলেও যেমন অম্বষ্ঠও যাহা, চণ্ডালও তাহাই নহে, সেইরূপ বর্ণসঙ্কর বলিলে ভগবদ্গীতোক্ত ব্যভিচারোৎপন্ন জাতি ও অম্বষ্ঠ ও বৈদ্য-জাতি কদাপি একই পদার্থ হইতে পারে না। অতএব বৈদ্যকে বর্ণসঙ্কর বলায় আমাদের প্রাচীন বৈদ্যবন্ধু কেন যে আমাদের প্রতি অযথা বিবক্তি প্রকাশ কবিলেন, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। শাস্ত্র এবং লৌকিক ব্যবহার অনুসারেই আমবা বৈদ্য জাতিকে বর্ণসঙ্কব বলিতে বাধ্য হইয়াছি। পুবাণাদি শাস্ত্রে চতুর্বর্ণের বহির্ভূত অম্বষ্ঠাদি সমুদায় জাতিই যে বর্ণসঙ্কব রূপে উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। এস্থলে আমরা ইহাব প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি।

বক্ষ্যেসংকরজাতীনাং গৃহস্থানাংবিধিংপরং।
বিপ্রাৎ মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিযায়াং বিশস্ত্রিয়াং॥
জাতম্বষ্ঠস্তু শূদ্রায়াং নিসাদ পর্ব্বতোপিবা।
মাহিষ্যঃক্ষত্রিয়াজ্জাতো বৈশ্যায়াং ম্লেচ্ছসংগীতঃ॥
শূদ্রায়াং করণোবৈশ্যাৎ বিদ্যাদেব বিধিস্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎসূতো বৈশ্যাৎ বৈদেহকস্তথা॥
শূদ্রাজ্জাতস্তু চাণ্ডালং সর্ব্ববর্ণ বিগর্হিতং। ইত্যাদি॥
(গরুড়পুরাণ, ৯৬ অধ্যায়)

এই প্রমাণে মূর্দ্ধাভিষিক্ত হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমুদায় অনুলোম ও প্রতিলোম জাতিই যে বর্ণসঙ্কর রূপে উক্ত হইয়াছে, তাহা সুস্পষ্ট জানা যায়। বাচস্পত্যাভিধানে বর্ণসঙ্কর শব্দের যে অর্থ লিখিত হইয়াছে, এস্থলে তাহাও উদ্ধৃত করা গেল, যথা,— বর্ণসঙ্করঃ পুং। সম্ কৃ অপ্ বর্ণতঃ সংকরঃ। বিপ্রাদিভ্যো বর্ণেভ্যোহনুলোম জাতে প্রতিলোমজাতে মূর্দ্ধাভিষিক্তাদৌ মাগধ্যাদৌচ জাতিভেদে ইত্যাদি।

অমরকোষাভিধানের প্রসিদ্ধ টীকাকার মহেশ্বর আচার্য্য আচণ্ডালাত্ সংকীর্ণা অম্বষ্ঠ করণাদয় ইত্যাদি বচনের যে টীকা লিখিয়াছেন, তাহাও আমাদিগের কথার সম্পূর্ণ অনুকূল। যথা :—চণ্ডালো ব্রাহ্মণ্যাং শূদ্রাজ্জাত স্তমভিব্যাপ্য বক্ষ্যমানা অম্বষ্ঠ করণাদয়ঃ। আদিনা উগ্রাদয়ঃ সংকীর্ণাঃ। প্রতিলোমানুলোমজাতামিশ্রাঃ। একং। তেচ সংকরজাতীয়াঃ করণাম্বষ্ঠোগ্রমাগধমাদিষা, ক্ষত্তৃসূত, বৈদেহক, রথাকার, পারশব, চাণ্ডালাদ্যাঃ একাদশেতি।

উল্লিখিত টীকার অর্থ এই যে,চণ্ডাল হইতে বক্ষ্যমান অম্বষ্ঠ করণাদি সকলেই সঙ্কীর্ণ, অর্থাৎ প্রতিলোমানুলোম জাতত্ব হেতু মিশ্র-বর্ণ। ইহারা সঙ্কর জাতীয়। এস্থলে সঙ্কর জাতি ও বর্ণসঙ্কর যে একই কথা, ইহা বলা বাহুল্য। টীকাকার এস্থলে সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কর শব্দেরও কোন বিশেষ অর্থ করেন নাই।

অজয় নামক প্রসিদ্ধাভিধানে লিখিত আছে, যথা,—

"সংকীর্ণ সংকটেব্যাপ্তে কুত্রচিৎবর্ণ সংকরে।"

এতদ্দ্বারাও অনুলোম ও প্রতিলোম উভয় বর্ণেরই সঙ্করত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। মনুর প্রাচীন টীকাকার মেধাতিথি, দশম অধ্যায়ের ১৪ শ্লোকের টীকাতে অনুলোম প্রতিলোম উভয় জাতিকেই বর্ণসঙ্কর বলিয়াছেন। পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবত, সপ্তমস্কন্ধ, একাদশ অধ্যায়ের ২৮ শ্লোকে বর্ণসঙ্করের উল্লেখ আছে। পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের টীকাতে অনুলোম প্রতিলোম জাতিমাত্রকেই বর্ণসঙ্কর শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি পুরাণেও ইহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শুদ্ধেৎবিপ্রোদশাহেন জাতকে মৃতকে তথা।

ভূমিপো দ্বাদশাহেন বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহতঃ ॥
শূদ্রোমাসেন বেদেষু মাতৃবৎ বর্ণসংকরঃ। ইত্যাদি ॥
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ১৬ অধ্যায়)

অর্থ। জাতক এবং মৃতক অশৌচে ব্রাহ্মণ দশ দিনে, ক্ষত্রিয় দ্বাদশ দিনে, বৈশ্য পঞ্চদশ দিনে, শূদ্র একমাসে এবং বর্ণসঙ্কর মাতৃজাতি অনুসারে শুদ্ধ হন।

এই প্রমাণানুসারে অনুলোমই হউক, বা প্রতিলোমই হউক, বর্ণসঙ্কর জাতি মাত্রই যে জাতকমৃতক অশৌচাদিতে মাতৃবৎ অর্থাৎ মাতামহ জাতির ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাতে কোন সন্দেহ ও আপত্তি করিবার কারণ নাই। অম্বষ্ঠ, অথবা বৈদ্যজাতির যে বৈশ্যবৎ সংস্কারাদি সম্পন্ন হয়, প্রাগুক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বচনই তাহার বিশেষ প্রমাণস্থল। অতএব এস্থলে আমরা আমাদিগের বৈদ্যবন্ধু এবং বিজ্ঞ পাঠক সমাজকে এ বিষয়ের বিচারভার অর্পণ করিয়া লেখনীকে বিশ্রাম প্রদান করিতেছি। আমাদিগের জ্ঞান ও বিশ্বাস এই যে, বৈদ্যজাতিকে বর্ণসঙ্করৰূপে নির্দ্দেশ করিয়া আমরা শাস্ত্র ও দেশাচারের অবমাননা করি নাই। এবং এতদ্দ্বারা বৈদ্যজাতির প্রতি কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার করাও হয় নাই। অদ্য এইপর্য্যন্ত।

শ্রীগোবিন্দমোহন রায়।

পৃথিবীর বয়ঃক্রম কত ?

১২৯৮ সালের শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে পৃথিবীর পরিণাম আলোচিত হইয়াছে এবং তৎসঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতানুসারে সৃষ্টিপ্রক্রিয়াও সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই, পৃথিবীর বয়ঃক্রম কত ?

যখন পৃথিবীর উপাদান সৌরদেহ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, সে সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কত বয়ঃক্রম হইয়াছে, তাহা বিবেচ্য নহে। পৃথিবীর উপাদান স্বীয় শক্তি প্রভাবে একত্রিত হইয়া জল ও স্থলরূপে পরিণত হইল। পৃথিবীর উপবিভাগ নদ নদী পর্ব্বত উপত্যকা প্রভৃতি দ্বারা বিভূষিত হইল, জল বায়ুদ্বারা মৃত্তিকার স্তর সকল সঞ্চিত হইতে লাগিল, পৃথিবীতে এক্ষণকার ন্যায় জীব প্রবাহের আরম্ভ হইল। এক্ষণকার ন্যায় জীবগণের সঞ্চার হইয়া না থাকিলেও, পৃথিবী এরূপ জীবগণের বাসোপযুক্ত হইল। অর্থাৎ পৃথিবীর পরিণাম প্রবন্ধে যে অবস্থাকে পৃথিবীর শৈশবাবস্থা বলা গিয়াছে, সেই শৈশবকাল হইতে এক্ষণ পর্য্যন্ত কত শত বা কত কোটি বৎসর অতীত হইয়াছে, তাহাই এ প্রবন্ধের আলোচ্য।

আপাততঃ মনে হয়, এ প্রশ্নের মীমাংসা অসম্ভব। কিন্তু বর্ত্তমান ঘটনার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ বিচার করিয়া ভূত ভবিষ্যত ঘটনার কার্য্যকারণ নিরূপণ করা ন্যায়সঙ্গত। তবে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, আজকাল যে সকল নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কারণ কার্য্য উৎপাদন করিতেছে, সেই কারণ সেই সকল নিয়মানুসারেই ভূতকালেও কার্য্য করিয়াছে। বিশ্বজগতে আবহমান কাল একই নিয়মে

কার্য্য সংঘটিত হইতেছে কি না, সে তর্ক উত্থাপন করা এক্ষণকার উদ্দেশ্য নহে। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, আমরা কার্য্যতঃ ভৌতিক নিয়মের ব্যতিক্রম স্বীকার করি না।

পৃথিবীর জল স্থল বিভাগের পূর্ব্বে উহা অতীব উষ্ণ দ্রবপদার্থ ছিল। এক সময়ে এই পৃথিবী এক্ষণকার সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত উষ্ণ জড়পদার্থ ছিল। কালক্রমে অবিরত তাপবিকীরণ বশতঃ উহার বাষ্পরাশি হইতে জল উদ্ভূত হইল। সেই জলসমষ্টিই সমুদ্র নাম প্রাপ্ত হইযাছে। সঙ্গে সঙ্গে জল হইতে বায়ুরাশি পৃথক্ হইল। পরে স্থলের সঞ্চার। সূর্য্য-কিরণে জল বাষ্পীভূত হইতে লাগিল, বাষ্প জমিযা ভূ পৃষ্ঠে বৃষ্টিরূপে পতিত হইতে লাগিল। বায়ু বহিতে লাগিল, বৃষ্টি,নদী ও পবন ভূপৃষ্ঠ-ধ্বংস কার্য্যে নিযুক্ত হইল, ক্ষয়িত মৃত্তিকা স্তবরূপে সঞ্চিত হইতে লাগিল। অর্থাৎ পৃথিবীর আধুনিক অবস্থাব সূচনা বা জন্ম হইল। কত লক্ষ বা কত কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর এ অবস্থা ঘটিয়াছিল?

খ্রীষ্টান বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ 'বাইবেল' অবলম্বন কবিযা পৃথিবীর বয়ঃক্রম মোটে ৬০০০ ছয় সহস্র বৎসব মাত্র স্বীকাব কবিতেন। শুধু পৃথিবী কেন, সমুদায় বিশ্বজগতেবও ঐ বয়ঃক্রম অনুমান করিতেন। তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র এইরূপ কোন কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সূক্ষ্ম মীমাংসা করিবার পক্ষে অন্তরায় হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানের প্রখর জ্যোতিতে এ সমস্ত কল্পনা বহুদিন তিষ্ঠিতে পারিল না। জ্যোতিষশাস্ত্র অনন্ত অপরিমেয় 'দেশের' অস্তিত্বের প্রমাণ করিতেছে, ভূ-বিজ্ঞান এক প্রকাব অপবিমেয় কালের পরিচয় দিতেছে। পার্থিব ঘটনার আলোচনা করিতে করিতে অপরিমেয় ভূতকালের দিকে দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইল। পৃথিবীতে মানব সঞ্চারের পূর্ব্বে কত কোটি বৎসব অতীত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্ধাবণ করিবার পক্ষে প্রমাণ সকল সংগৃহীত হইতে লাগিল। এই সকল প্রমাণ বিচার করিয়া প্লেফেয়ার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পৃথিবীর ৬০০০ বৎসর বয়ঃক্রম পরিত্যাগ করিয়া ইহার বয়ঃক্রম অপবিমেয় অনুমান করিলেন।

জড়বিজ্ঞানবিদ্ বিখ্যাত পণ্ডিত লর্ড কেলভিন (সার উইলিয়াম টমসন) সাহেব প্রথমতঃ উক্ত ভ্রান্তির অপনোদনের চেষ্টা কবেন। তিনি বলেন, পৃথিবীব আভ্যন্তরিক তাপ প্রভৃতি আলোচনা কবিলে জানা যায়, কোন না কোন সময়ে পৃথিবীব জন্ম হইযাছে, সুতবাং উহা অনাদিকাল হইতে স্থায়ী নহে। কি কি প্রমাণ সাহায্যে পৃথিবীব বযঃক্রম স্থূলতঃ নিরূপিত হইতে পারে, তাহাই এক্ষণে আলোচ্য।

ত্রিবিধ উপায়ে এই বয়ঃক্রম নিরূপিত হইতে পাবে। (১) জড়বিজ্ঞান, (২) ভূবিজ্ঞান, (৩) জীব-বিজ্ঞান এই তিন বিজ্ঞান তিনটি পৃথক্ পথ দিয়া পৃথিবীর বয়ঃক্রম নিরূপণ কবিতেছে।

(১) জড়-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য।

লর্ড কেলভিন সাহেব জড়-বিজ্ঞানানুমোদিত যুক্তি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার গণনার ভিত্তিও আবার ত্রিবিধ।

(ক) পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তাপ।

সকলেই জানেন যে, ঋতুভেদে পৃথিবীর পৃষ্ঠ-দেশের উষ্ণতা পরিবর্ত্তিত হইলেও উহার কিয়দ্দূর নিম্নে গমন করিলে এমন এক

স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, যেখানে ঋতুভেদ বশতঃ উষ্ণতার তারতম্য হয় না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন গভীরতায় এই অপরিবর্ত্তনশীল উষ্ণতা দেখা যায়। সূর্য্যোত্তাপবশতঃ ভারতে ৪০ হাত নিম্নের মৃত্তিকার উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। ৪০ হাত নিম্নে মৃত্তিকার উষ্ণতা শতাংশিক তাপমানের ২৭°.২ অংশ। ইহার নিম্নে প্রতি ৪৪ হাত গভীরতায় ১° শ উষ্ণতা বর্দ্ধিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু বহুনিম্নে গমন করিলে দেখা যায়, ঐ হারে উষ্ণতা বর্দ্ধিত না হইয়া ক্রমশঃ কম হারে হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সমুদ্রের তলদেশের গড় উষ্ণতা ২।৩ অংশের বেশী নহে। এই উষ্ণতাই বোধ হয় পৃথিবীর কঠিন পৃষ্ঠদেশের গড় উষ্ণতা। যাহা হউক, লর্ড কেলভিন সাহেব এই উষ্ণতা ও উষ্ণতা বৃদ্ধির হার বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দ্রব অবস্থা হইতে জমিয়া পৃথিবীর কঠিনাকার ধারণ করিতে কম হইলে দুইকোটি বৎসর এবং বেশী হইলে চল্লিশ কোটি বৎসর লাগিয়াছে। অর্থাৎ পৃথিবীর বয়ঃক্রম দুই কোটি হইতে চল্লিশ কোটি বৎসরের মধ্যে। দুই কোটি বৎসরের কম হইলে আভ্যন্তরিক উষ্ণতা বৃদ্ধির হার উল্লিখিত হার অপেক্ষা বেশী হইত, এবং চল্লিশ কোটি বৎসরের বেশী হইলে উষ্ণতা আদৌ বর্দ্ধিত হইতে দেখা যাইত কিনা, সন্দেহ। যাহা হউক, তিনি এই সকল প্রমাণ সাহায্যে পৃথিবীর বয়ঃক্রম দশকোটি বৎসরের অধিক বলিতে চাহেন না। অধ্যাপক টেট সাহেব পৃথিবীর এত বয়ঃক্রমও স্বীকার করেন না। তিনি বলেন যে, পৃথিবীর কঠিনাকার ধারণ করিবার পর এক কিম্বা দেড় কোটি বৎসর গত হইয়াছে।

(খ) সমুদ্রের জোয়ার ভাটা বশতঃ পৃথিবীর আবর্ত্তনবেগের হ্রাস।

আপন মেরুদণ্ডে পৃথিবীর এক আবর্ত্তনের কালকে আমরা দিন বলি। চন্দ্রের আকর্ষণ বশতঃ দিবা রাত্রি বা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সমুদ্রে দুইবার জোয়ার ভাটা হইতেছে। পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে পৃথিবী আবর্ত্তন করিতেছে,সমুদ্রের জোয়ারও চন্দ্রের সঙ্গে পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। একবার ঘুরিতে পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টামাত্র লাগে। কিন্তু চন্দ্রের স্বীয় গতি বশতঃ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিয়া আসিতে জোয়ার ভাটায় ২৪ ঘণ্টা ৫০ মিনিট লাগে। সুতরাং সকলেই স্বীকার করেন, সমুদ্রের জোয়ার ভাটা পৃথিবীর আবর্ত্তনের পক্ষে অল্পাধিক বাধা দিতেছে। বাস্তবিক, যেমন গাড়ীতে 'ব্রেক' কসিলে গাড়ীর বেগ ক্রমশঃ হ্রাস হয়, সেইরূপ জোয়ার ভাটা পৃথিবীর পক্ষে 'ব্রেক' স্বরূপ কার্য্য করিতেছে। বস্তুতঃ, এইকারণ বশতঃ অহোরাত্রিমান * ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। এক সময়ে একবার আবর্ত্তন করিতে পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টাও লাগিত না এবং জোয়ারের ঘর্ষণ বশতঃ এক সময়ে অহোরাত্রিমান এক চন্দ্রমাসের সমান হইয়া পড়িবে। তখন জোয়ার ভাটা দৃষ্ট হইবে না। পৃথিবীর একই অংশ সর্ব্বদা চন্দ্রের সম্মুখীন থাকিবে। বস্তুতঃ চন্দ্রের একাংশ সর্ব্বদা পৃথিবীর অভিমুখে থাকিবারও এই কারণ।

* এস্থলে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, পৃথিবীর আবর্ত্তনকাল ব্যতীত কালপরিমাপক অন্য কোন উপায় আমরা ব্যবহার করি না। দিবস বলিতে পৃথিবীর আবর্ত্তনকাল বুঝায়। বহুপূর্ব্বে যখন পৃথিবী অল্প সময়ে একবার ঘুরিত, তখনও এক দিবসে ২৪ ঘণ্টা ছিল। তবে তখনকার একঘণ্টাকাল এখনকার একঘণ্টাকাল অপেক্ষা

এক্ষণে প্রশ্ন এই, কত শত বা কত কোটী বৎসরে পৃথিবী জমিয়া কঠিন হইয়াছে। পৃথিবীর মেরুদ্বয় চাপা। কত বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর কঠিনাবরণ হইলে মেরুদ্বয় এক্ষণকার ন্যায় চাপা হইতে পারে? মনে করা যাউক্, যেন একশত কোটি বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ কঠিন হইল। অঙ্কশাস্ত্র বলিতেছে, তখন পৃথিবী এখনকার বেগের অন্ততঃ দ্বিগুণবেগে আপন মেরুদণ্ডে ঘুরিত। অর্থাৎ তখন অহোরাত্রিমান ২৪ ঘণ্টার পরিবর্ত্তে ১২ ঘণ্টামাত্র ছিল। সে সময়ে পৃথিবী তত কঠিন হয় নাই। অধিকাংশ স্থানে তখনও উহা কোমল ছিল। উহার দ্বিগুণ বেগ বশতঃ পৃথিবীর নিরক্ষ বৃত্তমণ্ডলে এখনকার অপেক্ষা চারিগুণ অধিক কেন্দ্রাপসারিণী শক্তি ছিল। অর্থাৎ তাহা হইলে নিরক্ষ বৃত্তমণ্ডল আরও অধিক স্ফীত এবং মেরুদ্বয় আরও অধিক চাপা দৃষ্ট হইত। পৃথিবীর মেরুদ্বয় অল্প চাপা। সুতরাং বলিতে হইবে, কঠিন হইবার সময় পৃথিবীর যে বেগ ছিল, এখনও ইহার প্রায় সেই বেগই আছে। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া কেলভিন সাহেব বলেন যে, দশ কোটি বৎসর * পূর্ব্বে পৃথিবী কঠিন হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

(গ) সৌরতাপের উৎপত্তি ও উৎপত্তির কাল।

সূর্য্য অতীব উষ্ণ দীপ্তিমান্ দ্রবপদার্থ। উহা হইতে অবিরত তাপ বিকীর্ণ হইতেছে। ঐ তাপ কিরূপে উৎপন্ন হইল? অনাদি কাল হইতে সূর্য্যে তাপ থাকিতে পারে না। কোন না কোন সময়ে উহা উৎপন্ন হইয়াছে। কেন না যখন হইতে ঐ তাপের উৎপত্তি, তখন হইতে বিকীরণ দ্বারা তাহার হ্রাসের আরম্ভ হইয়াছে। পরীক্ষিত পদার্থের তাপভাণ্ডার অপরিমিত হইতে পারে না। আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জড়পিণ্ডের সংঘাতে সৌরদেহের ও সৌরতাপের উৎপত্তি হইয়াছে। সূর্য্যের বর্ত্তমান উষ্ণতা প্রায় ১৪০০০° শ। এক সময়ে সৌরদেহ পৃথিবীর কক্ষপথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সে সময় পৃথিবীর জন্ম হয় নাই। কিন্তু জন্মাবধিই সূর্য্যের তাপ বিকীর্ণ হইতেছে। যে হারে এক্ষণে তাপ বিকীর্ণ হইতেছে, পূর্ব্বেও সেই হারে হইলে কেলভিন সাহেব বলেন যে, সূর্য্যের বয়ঃক্রম দশ কোটি বৎসরের কম, এবং পঞ্চাশকোটি বৎসরের অধিক হইতে পারে না।

সৌরতাপের উৎপত্তির পর সৌরদেহে ভ্রাম্যমাণ জড়পিণ্ড পড়িতে পারে। এতদ্দ্বারা সূর্য্যের তাপভাণ্ডার কথঞ্চিৎরূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন, সৌর পদার্থের পরস্পর রাসায়নিক সংযোগ ঘটিতে পারে, তদ্দ্বারাও উহার তাপ বর্দ্ধিত হইতে পারে। শেষোক্ত দুইটি কারণ সূর্য্যের তাপোৎপত্তি পক্ষে কতদূর কার্য্যকর, তাহা জানা নাই। সুতরাং সূর্য্যের তাপোৎপত্তি ও ঐ সৌরদেহের উষ্ণতা বিচার দ্বারা সূর্য্যের যে বয়ঃক্রম নিরূপিত হইয়াছে, তাহা কিয়ৎপরিমাণে ভ্রমাত্মক হইতে পারে। যাহা হউক, যখন সূর্য্যের জন্মকাল নিরূপিত হইল, তাহার কন্যা পৃথিবীরও বয়ঃক্রম এক প্রকার জানা গেল। অর্থাৎ পৃথিবীর বয়ঃক্রম সূর্য্যের অপেক্ষা অনেক কম। এই সকল যুক্তি অবলম্বন করিলে জানা যায় যে, পৃথিবীর বয়ঃক্রম দুই কোটি বৎসরের বেশী

* টেট সাহেবের মতে এককোটি বৎসরমাত্র।

নহে। জড়বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত কেলভিন সাহেবের গণনা দ্বারা পূর্ব্বতন ভূ বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের পৃথিবীর বয়ঃক্রম গণনা অনেক খর্ব্ব হইয়াছে। তাঁহারা পৃথিবীর আদি-কাল দেখিয়াছেন এবং কেবল তাহাই নহে, সেই কালও অধিক নহে, একথা ঘোষণা করিতেছেন। ফলতঃ ২।১ কোটি বৎসরের ন্যূনাধিক্যে এরূপ প্রশ্নের মীমাংসায় বড় একটা আসে যায় না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, জড়-বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য প্রমাণও আছে। তন্মধ্যে ভূ-বিজ্ঞানের প্রমাণ এক্ষণে আলোচ্য।

(২) ভূ-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য।

এক্ষণে যে সকল পার্থিব পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, সেই সকল পরিবর্ত্তনের হার নির্দ্ধারণ করিলে, পূর্ব্বকালে সংঘটিত পরিবর্ত্তনের কাল নিরূপিত হইতে পারে। এই যুক্তি প্রণালী অবলম্বন করিয়া ভূ-বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ পৃথিবীর বয়ঃক্রম নিরূপণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কাল-পরিমাপক দুইটি পার্থিব পরিবর্ত্তন বর্ত্তমান রহিয়াছে। একদিকে ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষয়িত হইতেছে, অপরদিকে সেই ক্ষয়প্রাপ্ত মৃত্তিকা সঞ্চিত হইতেছে। সঞ্চিত মৃত্তিকা স্তরে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয় এবং ক্ষয়িত মৃত্তিকার সঞ্চয় পরস্পর সমান। এক স্থানে যাহার ক্ষয়, অন্য স্থানে তাহারই সঞ্চয় হইতেছে। বৃষ্টি এবং নদী দ্বারাই প্রধানতঃ ক্ষয়কার্য্য সাধিত হইতেছে। দেশের মৃত্তিকা নদী দ্বারা সমুদ্র বা হ্রদে বাহিত হইতেছে, তথায় তাহাই ভবিষ্যতের নব প্রদেশের ভিত্তি স্থাপন করিতেছে। বৃষ্টিপাতের তারতম্যে নদীকলেবরের হ্রাস বৃদ্ধি। সুতরাং বৃষ্টি-পাতই ভূপৃষ্ঠ ক্ষয়ের প্রধান কারণ বলা যাইতে পারে। ভূ বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ নানাবিধ কারণ বশতঃ বিবেচনা করেন যে, পূর্ব্বকালেও যে পরিমাণে ভূপৃষ্ঠে বৃষ্টি-পাত হইত, এক্ষণেও সেই পরিমাণেই হইতেছে। অতীব পূর্ব্বকালে, যখন পৃথিবী ও সূর্য্য এক্ষণকার অপেক্ষা অধিকতর উষ্ণ ছিল, তখন হয়ত বৃষ্টিপাত কিছু বেশী হইত। অতএব যখন একই কারণ একই পরিমাণে এক্ষণকার ন্যায় পূর্ব্বকালে বর্ত্ত-মান ছিল, তখন অবশ্য কার্য্যও একই পরি-মাণে সম্পাদিত হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে যে হারে ভূ ক্ষয় ও ভূ সঞ্চয় সংঘটিত হই-তেছে, সেই হারে পূর্ব্বকালেও হইয়াছিল, ধরিতে হইবে।

উপরে উক্ত হইয়াছে যে, ভূ ক্ষয় ও ভূ-সঞ্চয় নিরূপিত হইলে তথাকার ভূ-ক্ষয়ও নির্দ্ধারিত হইবে। কোন প্রদেশে নদী দ্বারা বৎসরে কি পরিমাণে মৃত্তিকা ও নদীজলে মিশ্রিত লবণাদি সামগ্রী বাহিত হইতেছে, তাহা নিরূপণ করিলে সেই প্রদেশের বাৎসরিক ভূ-ক্ষয় জানা যায়। এইরূপ হিসাব দ্বারা জানা যায়, "কেবল ৪ মাস বর্ষাতে গাজীপুরের নিকট গঙ্গানদী নয় অর্ব্বুদ মণ পলি বহন করিয়া আনিতেছে। গাজীপুরের উত্তর পশ্চিমে যে সকল স্থান হইতে জল আসিয়া গঙ্গার কলেবর গঠন করিতেছে, তাহার আয়তন প্রায় ১৪৩২২০ বর্গমাইল। ঐ সমস্ত স্থান হইতে প্রতি বৎসর ঐ হারে মৃত্তিকা ধৌত হইয়া আসিলে, ঐ স্থানে ১১৪৬ বৎসরে এক ফুট নিম্ন হইবে।" * চারিমাস বর্ষা-কাল ব্যতীত গঙ্গানদী অন্যান্য মাসেও

* মৎপ্রণীত সরল প্রাকৃতভূগোল।

মৃত্তিকা ও লবণাদি অল্লাধিক পরিমাণে বহন করিতেছে। সুতরাং ১৪৪৬ বৎসরের অপেক্ষা আরও অল্পসংখ্যক বৎসরে ভূপৃষ্ঠ এক ফুট নিম্ন হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ হিসাব দ্বারা জানা যায় যে, পো নদী ৭২৯ বৎসরে, রোণ নদী ১৫২৮ বৎসরে, মিসিসিপি নদী ৬০০০ বৎসরে এবং দানিয়ুব নদী ৬৮৪৬ বৎসরে, এক ফুট হারে ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষয় করিতেছে। সকল প্রদেশের বৃষ্টিপাত সমান নহে। যেথানে বৃষ্টিপাত বেশী, যেথানে দৈনন্দিন উষ্ণতার হ্রাস বৃদ্ধি সমধিক, সেথানে ভূমিক্ষয় কার্য্যও তদনুরূপ অধিক। সমভূমি অপেক্ষা পর্ব্বতময় প্রদেশে অধিক। এজন্য কোথাও বা ৭৩০ বৎসরে ১ ফুট, কোথাও বা ৬৮০০ বৎসরে ১ ফুট ভূমি ক্ষয়িত হইতেছে। যাহা হউক, এই ক্ষয়িত মৃত্তিকাই স্তরে পরিণত হইতেছে। সুতরাং ভূ পঞ্জরের জলোৎপন্ন স্তর সমূহের সঞ্চয়কাল নিরূপণ করিলে, পৃথিবীর বয়ঃক্রম মোটামুটি নিরূপিত হইবে। যেথানে জলোৎপন্ন স্তর সমূহ সম্যক্‌রূপে পরিপুষ্ট দেখা যায়, সেথানে সমুদায় স্তরের গভীরতা এক লক্ষ ফুটের কম দেখা যায় না। সুতরাং যদ্যপি স্তর সঞ্চয়ের প্রবল হারও ধরা যায়, তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে যে, সাত কোটি ৩০ লক্ষ বৎসর গত হইয়াছে। মৃদু হারে ধরিলে, পৃথিবীর বয়ঃক্রম ৬৮ কোটি বৎসরের কম হয় না।

কোথায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য লর্ড কেলভিন সাহেবের হিসাবে ২ কোটি বৎসর, আর কোথায় ভূবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের হিসাবে ৬৮ কোটি বৎসর! ভূবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ লর্ড কেলভিনের গণনায় সম্মত নহেন। অধ্যাপক টেট সাহেব গণিত ১ কোটি বৎসরের ত কথাই নাই। উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইবার জন্য অধ্যাপক হক্‌সলে সাহেব ১০ কোটি বৎসর পর্য্যন্ত দিতে চাহেন।

কিন্তু এক লক্ষ ফুট উচ্চ ভূমি ১০ কোটি বৎসরে সঞ্চিত হইয়া থাকিলে ১০০০ বৎসরে ১ ফুট ধরিতে হয়। তাহা হইলে, মৃদুহারে ১৮০০ বৎসরে ১ ফুট স্তরসঞ্চয় কাল পাওয়া যায় না। এজন্য ভূবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ হক্‌সলে সাহেবের প্রদত্ত কালের ছয়গুণ অধিক সময় চাহিতেছেন।

(৩) জীব-বিজ্ঞানের সাক্ষ্য।

জীব সকলের বিবর্ত্তন বা ক্রমবিকাশ স্বীকার করেন না, এরূপ লোক অতি বিরল। এক সময়ে লোকে মনে করিত যে, গো অশ্ব কুকুর প্রভৃতি প্রত্যেক জাতি প্রাণী, কিম্বা বট অশ্বত্থ আম্র শৈবাল প্রভৃতি প্রত্যেক জাতি উদ্ভিদ্ পৃথক্ ভাবে সৃষ্ট হইয়াছে। অতি পুরাকাল হইতে এক্ষণ পর্য্যন্ত জীবরাজ্যের প্রত্যেক জাতি ও বর্ণের ক্রমিক উন্নতি হইতেছে। কি হারে কোন জীব-বিশেষের ক্রমবিকাশ হইতেছে, তাহা জানিবার বিশিষ্ট উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ঐ হার জানা না থাকিলেও আমরা দেখিতেছি, মানবের ঐতিহাসিক সময়ের মধ্যে জীব-রাজ্যের কোন জাতির উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এই সময়ের মধ্যে কয়েক জাতি জীব নির্ব্বংশ হইয়াছে সত্য, কিন্তু কোন নূতন জাতির আবির্ভাব হইতে দেখা যায় না। মীসর দেশের প্রাচীন শবের সঙ্গে যে সকল ফল পুষ্প শস্যাদি পাওয়া যায়, তৎসমুদায় এখনও মীসর দেশে সেই ভাবেই বর্ত্তমান। সংরক্ষিত প্রাণীগণের আকার অবয়ব হইতে

আজ কালকার প্রাণীগণের আকার অবয়বে পার্থক্য দেখা যায় না। অর্থাৎ ৪।৫ সহস্র বৎসর গত হইল, তন্মধ্যে উদ্ভিদ্ বা প্রাণীগণের মধ্যে বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। সংরক্ষিত মানুষেরও আকার অবয়বে কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। ঐতিহাসিক সময় ছাড়িয়া ঐ সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন জাতীয় জীবের আকারের সহিত বর্ত্তমান সেই জাতীয় জীবের আকার তুলনা করিলেও বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। সমুদ্রজ বহুবিধ শম্বুকাদি বহু-নিম্নস্তর মধ্যে প্রোথিত দেখা যায়। তাহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি পূর্ব্বপুরুষগণের আকার হইতে বিচ্যুত হয় নাই। কয়েকটি জাতি ধ্বংস হইয়াছে সত্য, এবং সত্যই সমুদায় জীব-প্রবাহের ক্রমবিকাশ নিয়ত সম্পাদিত হইতেছে, তথাচ ৫।৬ সহস্র বৎসরে কোনরূপ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না।* এই সকল কারণ বশতঃ অনুমান করা যায় যে, জাতিগত পরিবর্ত্তন বহু বহু বৎসরে সংঘটিত হয়। স্তরসমূহের রক্ষিত জীবাবশেষ, জীবজগতের ক্রমবিকাশ ও নব-জীবের আবির্ভাব প্রভৃতি বিচার করিলে সহজেই বুঝা যায় যে, কত লক্ষ লক্ষ বৎসর হইল পৃথিবীতে জীব সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। বস্তুতঃ স্তরসঞ্চয়ের কাল ব্যতীত জীব-সৃষ্টির কাল নিরূপণ করিবার উপায় জীব-বিজ্ঞানের নাই। এ সম্বন্ধে জীব-বিজ্ঞানকে ভূ-বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে হয়। কাল সম্বন্ধে ভূ-বিজ্ঞান যাহাই বলিবে, জীব-বিজ্ঞানকে তাহাই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু জীব-বিজ্ঞানের কালনিরূপণের স্পষ্টতঃ কোন উপায় না থাকিলেও, উহা জীবগণের ক্রমবিকাশের নিতান্ত মৃদুগতি দেখাইতেছে এবং তৎসঙ্গে পৃথিবীর বয়ঃক্রম দুই এক কোটি বৎসর হইলে চলিবে না, বলিতেছে। বাস্তবিক ক্রমবিকাশের প্রধান ব্যাখ্যাকার দারবিন সাহেব বলেন যে, ৩০ কোটি বৎসর দিলেও আদি জীব হইতে এক্ষণকার জীবগণের ক্রমবিকাশ হওয়া সুকঠিন। তিনি আরও অধিক সময় চাহেন।"

পাশ্চাত্য আধুনিক বিজ্ঞানের সাক্ষ্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, (১) পৃথিবী দুই দশ সহস্র বৎসরের পুরাতন নহে, (২) কোটি কোটি অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ বৎসরের কিম্বা অনাদিকাল হইতে স্থায়ীও নহে, এবং (৩) ইহার বয়ঃক্রম ২ কোটি হইতে ৬০ কোটি বৎসরের মধ্যে।

ভূ-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ যাহাই বলুন, কেলভিন সাহেবের গণিত ফলে যতক্ষণ কোন ভ্রম প্রদর্শিত না হইতেছে, ততক্ষণ তাঁহার গণনা স্বীকার করিতে হইবে। তিনি তিনটি বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়া একই ফলে উপনীত হইয়াছেন। আর, পৃথিবীর মৃত্যু গণনা প্রবন্ধে দেখান গিয়াছে যে, এ পৃথিবীর এক্ষণে প্রৌঢ়াবস্থা চলিতেছে। উহার যাবতীয় শক্তির প্রাখর্য্য এক্ষণে হ্রাস হইয়াছে। শক্তি সমষ্টি অবিনশ্বর, সন্দেহ নাই। কিন্তু শক্তির ব্যয় বশতঃই জীব প্রবাহ চলিতেছে। সকল প্রকার শক্তির একতা

* ডাঃ গার্সন সাহেব মীসর দেশ হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি মনুষ্যকঙ্কাল দেখিয়া মনে করেন, যে সকল মনুষ্যের ঐ কঙ্কাল, তাহাদের হস্ত পদ আধুনিক নিগ্রো জাতির ন্যায় এবং মস্তক আধুনিক মীসরবাসীগণের ন্যায় ছিল। এই সকল কঙ্কাল অন্ততঃ ৬ সহস্র বৎসর পুরাতন। ৬ সহস্র বৎসরে ইহা নিতান্ত অল্প [illegible]র্ত্তন বলিতে হইবে।

প্রাপ্তি নিয়তঃই ঘটিতেছে। শক্তির বৈষম্য ক্রমশঃ হীন হইতেছে। পূর্ব্বতন যুগ সকলে ভৌতিক কার্য্য প্রবল বেগে ঘটে নাই, তাহা প্রমাণিত হয় নাই। ববং নানাবিধ প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে ভৌতিক কার্য্যের প্রবল বেগ ছিল। সুতরাং যখন ক্রমবিকাশের ভাষ্যকার হক্সলে সাহেব পৃথিবীর দশ কোটি বৎসর বয়ঃক্রমেই সন্তুষ্ট, তখন ভূ-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণকে তাহাই স্বীকার করিতে হইবে।

পৌরাণিক প্রমাণ।

আজকাল শব্দ প্রমাণের প্রতি শিক্ষিত লোকের তত আস্থা নাই। নচেৎ এখানে একবার আমাদের পৌরাণিক প্রমাণের আলোচনা করা যাইত। সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা যাইতেছে।

সূর্য্য-সিদ্ধান্তে কালবিভাগে এইরূপ দেওয়া আছে। ৪৩২০০০০ সৌর বৎসরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ হয়। এই চারি যুগকে এক মহাযুগ বলে। ৭১ মহাযুগে অর্থাৎ ত্রিশকোটি সপ্তষষ্টি বিংশতি সহস্র সৌর বৎসরে এক মন্বন্তর। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ব্রহ্মার এক দিন। দিবাবসানে ব্রহ্মার রাত্রি। রাত্রির পরিমাণ দিনের সমান। এইরূপ ৩৬০ অহোরাত্রে ব্রহ্মার এক বৎসর। এইরূপ ১০০ বৎসর ব্রহ্মার আয়ুঃ। ব্রহ্মার দিনের নাম কল্প এবং আয়ুষ্কালের নাম পর। এপর্য্যন্ত ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের পঞ্চাশ বর্ষ অতীত হইয়াছে। বর্ত্তমান কল্প ব্রহ্মার বাকী অর্দ্ধ আয়ুষ্কালের প্রথম দিবস। বর্ত্তমান কল্পের নাম শ্বেত বরাহ কল্প। এই শ্বেতবরাহ কল্পের ছয় মনু অতীত হইয়াছে। এক্ষণে বৈবস্বত নামক সপ্তম মনুর অধিকার চলিতেছে এবং বৈবস্বত মনুরও ২৭ যুগ গত হইয়াছে। অর্থাৎ বৈবস্বত মনুর প্রায় ১২ কোটি বৎসর অতীত হইয়াছে এবং প্রায় ১৮ কোটি বৎসর অবশিষ্ট আছে।

বিষ্ণুপুরাণাদি শাস্ত্রে সৃষ্টি ও প্রলয়কাল নিম্নলিখিত রূপে আছে। প্রলয় চারি প্রকার, প্রাকৃতিক, নৈমিত্তিক, আত্যন্তিক ও নিত্য। ব্রহ্মার একশত বৎসর পরমায়ুঃ শেষ হইলে প্রকৃতিতে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের যে লয় হয়, তাহাকে প্রাকৃতিক প্রলয় বলে। ব্রহ্মার দিবাবসানে তাঁহার যোগনিদ্রার নিমিত্ত যে প্রলয় হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। যোগীগণ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাতে যে লয় প্রাপ্ত হন, তাহাকে আত্যন্তিক প্রলয় এবং জগৎস্থিত প্রাণীগণ নিত্য নিত্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আয়ুক্ষয়ে যে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে নিত্য প্রলয় বলা যায়।

বিষ্ণুপুরাণের মতে সৃষ্টি ত্রিবিধ। প্রাকৃতিক প্রলয়াবসানে প্রকৃতি হইতে মহত্ত্বাদির সৃষ্টি হয়, তাহা প্রাকৃতিক সৃষ্টি। তৎপরে ব্রহ্মার প্রাতঃকালে যে রূপে স্থাবর জঙ্গমাদির সৃষ্টি হয়, তাহার নাম দৈনন্দিন সৃষ্টি এবং এই জগতে প্রতিদিন প্রাণীগণের যে উৎপত্তি হয়, তাহাকে নিত্যসৃষ্টি বলে।

এক্ষণে ব্রহ্মার শ্বেতবরাহ কল্পের সৃষ্টি চলিতেছে। সেই কল্পের কিঞ্চিদূর্ন দুইশত কোটি বৎসর অতীত হইয়াছে। উপরি উক্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মার দৈনন্দিন সৃষ্টিতে ত্রৈলোক্যের উৎপত্তি হয়। সৌর জগতের উৎপত্তিতে ব্রহ্মার দৈনন্দিন সৃষ্টি * মনে করিলে দেখা যায় যে, আধুনিক

* এরূপ মনে করিবার কয়েকটি কারণ আছে। হরিবংশ শ্রীমদ্ভাগবত ও পুরাণাদিতে দৈনন্দিনে প্রতে

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গণনালব্ধ সৌর বয়ঃক্রম, আমাদের জ্যোতিষ ও পুরাণ প্রভৃতির লিখিত বয়ঃক্রমের সহিত অনেক পরিমাণে এক রকম। এক মন্বন্তর কালের সহিত পৃথিবীর আয়ুকালের বিশেষ নৈকট্য দেখা যায়। প্রায় ত্রিশকোটি বৎসরে এক মন্বন্তর। তাহার প্রায় বার কোটি বৎসর অতীত, সুতরাং পৃথিবীর বয়ঃক্রম বার কোটি বৎসর বলা যায়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতেও পৃথিবীর বয়ঃক্রম দশ বার কোটি বৎসর।

আর একটি কথা মনে রাখা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান পৃথিবীর বা সূর্য্যের যে বয়ঃক্রম গণনা করিতেছে, তাহার ভিত্তি কিয়দংশে অনুমান ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কারণানুমান সম্বন্ধে যৎসামান্য ভ্রম থাকিলে, তাহার ফলও তদনুযায়ী ভ্রমপূর্ণ হইবে। বাস্তবিক গণিতশাস্ত্র পেষণযন্ত্র বিশেষ। তাহাতে যেরূপ দ্রব্য দেওয়া যায়, ফল তদনুরূপ পাওয়া যায়।

যাহা হউক, যদ্যপি আমাদের আলোচ্য কালই মন্বন্তর ধরা যায়, তাহা হইলে দুই একটা বিষয়ের অনৈক্য দেখা যায়। মন্বন্তরের আদিতে কিরূপ সৃষ্টি কার্য্য হয়, তাহা জানি না। তবে মনুসংহিতায় আছে,

> স্বায়ম্ভুবস্যাস্য মনোঃ ষড়্ বংশ্যা মনবোঽপরে।
> সৃষ্টবন্তঃ প্রজাঃ স্বাঃ স্বা মহাত্মানো মহৌজসঃ॥

যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহার সহিত আধুনিক মতের সৌরদেহ ও সৌরতাপের উৎপত্তির কিয়দংশ ঐক্য দেখা যায়। আর একটি কথা, প্রাচীন উন্নত-গ্রীক ও আর্য্যগণ পৃথিবীকে বিশ্বজগতের কেন্দ্রস্বরূপ মনে করিতেন।

> স্বায়ম্ভুবাদ্যাঃ সপ্তৈতে মনবো ভূরিতেজসঃ।
> স্বে স্বেঽন্তরে সর্ব্বমিদমুৎপাদ্যাপুশ্চরাচরং॥

স্বায়ম্ভুবাদি সাতটি মনু স্ব স্ব অধিকার কালে এই চরাচর সৃষ্টি করেন। এক এক মন্বন্তরে যে খণ্ডপ্রলয় হয়, তাহার সন্দেহ নাই। সূর্য্যসিদ্ধান্তে আছে,

> যুগানাং সপ্ততি সৈকা মন্বন্তরমিহোচ্যতে।
> কৃতাব্দ সংখ্যা তস্যান্তে সন্ধিঃপ্রোক্তো জলপ্লবঃ॥

এক এক মন্বন্তরের পরে পৃথিবী জলপ্লাবিতা হয়।

বৈবস্বত মন্বন্তরে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে,

> এবং সংস্তূয়মানস্তু দেবৈর্দ্দেবর্ষিভিস্তথা।
> মুমোচ স্বংতদা তেজস্তেজ সাংরাশিরব্যয়ঃ॥
> যৎ তস্য ঋগ্ময়ং তেজো ভবিতা তেন মেদিনী।
> (৭৮ অঃ)

তেজোরাশি অব্যয়স্বরূপ দিবাকর তৎক্ষণাৎ স্বকীয় তেজঃ মোচন করিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার যে তেজঃ ঋগ্বেদময়, তদ্দ্বারা মেদিনী সম্ভূত হইয়াছে।

পুনশ্চ, বৈবস্বত মনুর নাম হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এখন যে মনুর অধিকারকাল চলিতেছে, সূর্য্য হইতে তাহার জন্ম। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে,

> মনুং প্রখ্যাত যশস মনেক জ্ঞান পারগম্।
> বিবস্বতঃ সুতো যস্মাৎ তস্মাদ্বৈবস্বতস্তু সঃ॥

পাঠকবর্গ মিলাইয়া দেখিবেন, মন্বন্তরের সহিত আমাদের আলোচ্য ভূ-সৃষ্টিকালের কতদূর একতা আছে। যাহা হউক, পৌরাণিক মত অনেকাংশে যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতের সদৃশ, তাহার সন্দেহ নাই।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

সুপ্রসন্ন।*

১

সেই নিদাঘ-উষায়—
আকুল ভগন স্বরে,
"দে'জল দে'জল" করে,
অসহ পিপাসা তার মরম শুকায়—
বিস্ময়ে তুলিয়া আঁখি,
দেখেছি সে পোড়া পাখী,
কাতর চাতক সাধে নবঘন পা'য়,
দেখেছি সে মহাতৃষা নিদাঘ-উষায়।

২

আর, বরষা-সন্ধ্যায়—
জ্বালামুখ—বহ্নি জ্বলে,
পতঙ্গ ভুলিয়া চলে,
হেরিয়া অনন্ত শোভা অনন্ত শিখায়—
মরণ-পিপাসা-বিষে,
আঁখি অন্ধ, হারা দিশে,
পুড়ে ম'বে পরাণের পিপাসা মিটায়,
দেখেছি সে মহাতৃষা বরষা-সন্ধ্যায়।

৩

আর, যমুনা-বেলায়—
কোথায় বনের মাঝে
"আয় রাধে" বাঁশী বাজে,
ছুটে আসে পাগলিনী বিহ্বল হিয়ায়;
কুল, মান, লাজ, ভয়,
ভুলেছে সে সমুদায়,
পিপাসা আগুন তার পরাণ পোড়ায়,
দেখেছি সে মহাতৃষা যমুনা-বেলায়!

৪

আর, দারুণ ব্যথায়—
দূর রামগিরি-প'রে,
শত ধারা চোখে ঝরে,
গু'ণে দিন—পোড়া দিন আরো বেড়ে যায়;
তৃষায় আকুল বক্ষ
অলকা বঞ্চিত যক্ষ,
মেঘদূতে সাধে নিতি যেতে অলকায়,
দেখেছি সে মহাতৃষা যক্ষ-বেদনায়।

৫

আর—এ কি মুরলায়—
হতভাগা সুপ্রসন্ন
তৃষাকুল মতিচ্ছন্ন।
দিশাহারা মাতোয়ারা রূপের ছটায়!
অকূল সৌন্দর্য্য রাশি,
পরাণে উথলে আসি,
অসীম উচ্ছ্বাসে তার বিশ্ব ভেসে যায়!
মহান্ লাবণ্য-স্রোত,
ত্রিভুবনে ওতপ্রোত,
তরঙ্গে তরঙ্গে ছোটে হৃদি কলিজায়!
সে ঢেউ-তাড়না-বশে
পলকে ব্রহ্মাণ্ড খসে,
ক্ষুদ্র-নর-কাণ্ডজ্ঞান, দাঁড়াবে কোথায়?—
তাই, তৃষা নিরমম,
যুগান্ত অনল সম,
পুড়েগেল সরবস্ব পোড়া পিপাসায়!
পুড়ে গেল আত্মস্মৃতি,
পুড়েগেল ধর্ম্ম-নীতি,
পুড়িল মরম গ্রন্থি, আত্মা পুড়ে যায়!
তবু মিটিলনা তৃষা, সর্ব্বনেশে দায়।

৬

একে সর্ব্বনেশে দায়!—
বিজলী যে বক্ষে ধরে,
সে তো শুধু পুড়ে মরে—
সে তো কালান্তের কালে আলিঙ্গিতে চায়।

* নব্যভারত সম্পাদক মহাশয় কৃত "মুরলা" পাঠে লিখিত।

প্রাণ ভরা অনশন,
ঘুমভরা কুস্বপন,
কালকূট ভরা তার নিখিল ধরায়!
সমাজ চরণে দলে,
মানবে "পিশাচ" বলে,
উপাস্য দেবতা সেও চাহে না ঘৃণায়,
তবু বাড়ে পোড়া তৃষা, সর্ব্বনেশে দায়!
হায় কে হেন কোথায়—
আত্মহারা মাতোয়ারা,
কে আছে এমন ধারা,
ভাঙ্গে না কাহার বক্ষ বজ্র উপেখায়?
অবিশ্রান্ত অবিরাম,
কে সাধে এ প্রাণায়াম,
কে পারে এ পূর্ণাহুতি দিতে আপনায়?

স্বরগ নরক কার
অবিভেদ, একাকার,
অনন্ত পিপাসা কার প্রাণান্তে না যায়?
এ মমতা কার কবে,
"মোর সে পরের হবে"
ভেঙ্গেফেলে হৃদি-পিণ্ড সেই যাতনায়?
কে হেন সাধক বীর
ছিঁড়িয়া আপন শির,
ডুবায় সে রক্তনদে, ধ্যেয় দেবতায়!
কার এ তপস্যা-শক্তি,
অপার্থিব অনুরক্তি,
কেবা সাধি মহামৃত্যু আলিঙ্গিতে যায়?
দেবতা দানব হেন কে আছে কোথায়!!

শ্রীপ্রিয়প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী।

কিমাশ্চর্য্যম্।

একদিন মহাভারতের বনপর্ব্ব পড়িতে পড়িতে মনে হইল যে, এই যে আমি উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাভিমানী যুবক, আমাকে আসিয়া যদি বকরূপী যক্ষ, তাঁহার সেই এক বুড়ি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, তবে আমি কি যুধিষ্ঠিরের মত উত্তর দান করিয়া কৃতী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারিতাম না? পারিতাম না? বরং আমার উত্তর অধিকতর ন্যায় ও বিজ্ঞানসম্মত হইত; এবং যক্ষও বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া কৃতার্থ হইতেন।

"কোন্ বস্তু আদিত্যকে উন্নীত করে, কাহারা তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে বিচরণ করে, কে তাঁহাকে অস্তপ্রাপ্ত করায়, এবং কোন্ বস্তুতে তিনি প্রতিষ্ঠিত? অথবা জগৎ কি বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রতর কি?" এ সকল প্রশ্নের আজি যেমন জবাব করিতে পারি, যুধিষ্ঠির তেমন পারিয়াছিলেন কি? "সনাতন ধর্ম্ম কি", ইহার উত্তরে যুধিষ্ঠির যে বলিয়াছিলেন, যে গোরু সনাতন ধর্ম্ম, তাহা দ্বারা কি তাঁহার বুদ্ধিখানা উত্তবসদৃশ মনে হয় না? ভাবিলাম, আমার সঙ্গে সেই প্রাচীনকালের যুধিষ্ঠিরের তুলনা? কোথাকার সেই অনুন্নত দ্বাপর যুগের যুধিষ্ঠির, এবং I the heir of all the ages in the foremost files of time! যুধিষ্ঠিরে এবং আমাতে অনেক প্রভেদ, তিনি যুধি-স্থির, আমি জ্ঞান-স্থির। ভাবিতে ভাবিতে ক্ষুধার উদ্রেক হইল; সম্মুখে টেবিলোপরি আহারও প্রস্তুত। মনোক্ষোভে যাই ছুরি লইয়া রোষ্টের পাত্রটা টানিয়া লইতে গিয়াছি, অমনি দেখি, আজ রোষ্ট, জীবিত মুরগীরূপে সম্মুখে উপস্থিত। প্রথমটা চমকিয়া উঠিলাম, তাহার পর

বুঝিলাম যে, কমলাকান্তের নেপোলিয়নের মত, কলিযুগের বক, মুরগীরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছে। যে ব্যক্তি টনি, বুথ, ইলিয়টের কঠোর প্রশ্নের উত্তর দিয়া উপাধি-প্রস্ত, একটা টুলোরকমের বকের প্রশ্নে তাহার ভাবনা কি? মুরগী বা ছদ্মবেশধারী বককে বলিলাম, কি প্রশ্ন আছে বলিয়া ফেলুন, ক্ষুধায় পেট জ্বলিতেছে। মুরগী, তাহার প্রভাতোন্মেষকারী তীব্র স্বরে কহিল:—"ভাল তুমি যে মনে করিতেছ, তুমি যুধিষ্ঠির অপেক্ষা পণ্ডিত; আচ্ছা বল দেখি "কিমাশ্চর্য্যম্" প্রশ্নের তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহার উপর আর দ্বিতীয় কথা আছে কি? তিনি বলিয়াছিলেন যে, ভূতগণ প্রতিনিয়ত যম-মন্দিরে যাইতেছে, কিন্তু অবশিষ্টেরা তবুও মৃত্যুচিন্তা শূন্য, ইহাই আশ্চর্য্য। তুমি কি হে বিজ্ঞতাভিমানী যুবক, ইহার উপর আর কথা কহিতে পার?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, পারি বই কি, শুন:—আমার মতে আশ্চর্য্য কি, তাহা বলিতেছি। আমি বলি, কেহ কখনও মরে নাই, মরিতে কেহ কাহাকে দেখে নাই, অথচ লোকেরা মরণ ভয়ে ভীত, ইহাই সমধিক আশ্চর্য্য। তুমি যে আমার মৃত রোষ্টের ভস্ম হইতে পালক ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইয়াছ বলিয়া, একথা বলিতেছি, তাহা নহে। সেটা হয়তো আমার সূপকারের ঘি মস্‌লা আত্মসাৎ করিবার ফলে। কিন্তু হে বক, তুমি অবধান কর, আমি বলিয়া যাই।

কিছুই মরে না। প্রথম সৃষ্টিতে জগদুপাদান সামগ্রী যত ছিল, এখনও তাহাই আছে। পর্ব্বত ধূলিসাৎ হইয়া যায়, কিন্তু স্থলভাগ বাড়িয়া উঠে। ভূমিকম্পে একদিক ধ্বসিয়া যায়, অন্যদিক আবার উত্থিত হয়।

স্থল, দেয় বাহু নাড়া, ভূ, কম্পে, পেয়ে সে নাড়া,
সিন্ধু-গর্ভ হোতে উঠে দেশ জনপদ;
আহুত্রে পরাস্ত মানি সিন্ধু তারে দেয় আনি
মাণিক্য মুকুতা আদি আপন সম্পদ।

যাহাকে সহজ দৃষ্টিতে ধ্বংস বল, সেটা কেবল পরিবর্ত্তন মাত্র। এসকল কথা বিস্তারিত বুঝাইতে গেলে তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে; কারণ পাঠশালার ছাত্রেরাও একথা জানে। তোমাকে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কথাই বলিতেছি, শ্রবণ কর।

মনে কর, একজন লোক মরিয়া গেল; তাহার শারীর উপাদান, ভূত-গোষ্ঠীতে মিশ্রিত হইল, তাহার চিন্তা, কার্য্য, ধর্ম্ম-ভাব প্রভৃতি, অবিনাশী পরমাণু রাশির মত, শক্তিরূপে, সমাজশরীরে অক্ষয়গতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বুদ্ধদেবের শক্তি, কালিদাসের শক্তি এখনও আমাদিগের প্রাণমূলে জীবন্ত। আর একটা কথা আছে, সেটা সূক্ষ্মরূপে প্রণিধান না করিলে বুঝিতে পারিবে কি না, বলিতে পারি না। জগৎ উন্নতিশীল। অবিশ্রান্ত অনুন্নত এবং অবিকসিত অবস্থা হইতে, উন্নত এবং বিকসিত অবস্থার উদয় হইয়াছে। ক্ষুদ্র কীটাণুর ক্রমবিকাশে, জ্ঞান কর্ম্ম ও ধর্ম্মময় মনুষ্য। সেই মনুষ্য যখন মরিয়া যায়, তখন জড়রূপে, তাহার শরীর ভূত পরমাণু, বংশরূপে, তাহার জীবনীশক্তি; এবং পরোপকার ও সামাজিকতার ফলে, তাহার জ্ঞান কর্ম্ম ও ধর্ম্মের প্রভাব, চিরদিনের জন্য রহিয়া যায়।

এবং এতদ্দৃষ্টে আর একটা অনুমানও সঙ্গত হইতেছে। মনুষ্যের মনে দুইটী ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়; একটী তাহার পরোপকারিণীবৃত্তি, আর একটী তাহার আত্মরক্ষিণী বৃত্তি। এই আত্মরক্ষিণী

বৃত্তির মূলে আত্মভাব এবং আত্ম প্রত্যয় কার্য্য করিতেছে। পরোপকারিণীবৃত্তির চরিতার্থতাও, আত্মজ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, আমাদের পরোপকারিণীবৃত্তির ফল, সমাজস্তরে বহিয়া যায়; এবং এমন কিছুই নাই যাহা ধ্বংস বা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এরূপস্থলে আমাদিগের এই আত্মরক্ষিণীও পরোপকারিণীবৃত্তির মূলীভূত আত্মজ্ঞান বা আমিময় ভাবটুকু, একাকী বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, এ মীমাংসা অবৈজ্ঞানিক। সকলই যখন রক্ষা পায়, তখন আমার সুবিকসিত "আমি টুকু" নষ্ট হইবে কেন? সকল অবস্থায় যে আইন খাটিল, কেবলমাত্র একটি অবস্থায়, স্থিতি দেখিতে পাইনা বলিয়া, মৃত্যুর পর তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই, ববং সত্য বলিয়াই বিশ্বাস জন্মে। গণিতবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তও তাহাই। $n-1^{th}$ সংখ্যা পর্য্যন্ত যাহা সত্য, n^{th} সংখ্যায়ও তাহা অবশ্য সত্য।

তুমি আমার উত্তরে বলিতে পার যে, আজকাল বৈজ্ঞানিকেরা গণনা করিতেছেন যে, সমগ্র পৃথিবীটাই একেবারে ধ্বংসমুখে পড়িবে। যদি তাহা হয়, তবে জড় পরমাণুর হিসাবে তাহার অস্তিত্ব রূপান্তরিত হইয়া থাকিলেও, যখন জীব-গোষ্ঠীর ধ্বংস হইয়া গেল, তখন কোথায় বা রহিল সমাজ বা সমাজ-শরীর; এবং কোথায় বা রহিল, সেই সমাজশরীরস্থ মানবের জ্ঞান, কর্ম্ম ও ধর্ম্মের প্রভাব শক্তি। আর তাহাই যদি হইল, তবে সেই যুক্তি বা Induction লইয়া তোমার. আত্মার স্থিতির সিদ্ধান্ত কল্পনা নিরর্থক। এ কথার উত্তর দিতেছি:—

বৈজ্ঞানিকেরা বলিতেছেন যে, প্রথমতঃ ইন্ধন অভাবে, এবং দ্বিতীয়তঃ অবিরত তেজের বিকীরণ বশতঃ, আমাদিগের তেজোভাণ্ডার সূর্য্য, ক্রমে ক্রমে শীতল হইয়া পড়িবে। সুতরাং তেজের অভাবে সমুদায় উদ্ভিদ ও প্রাণী ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। কিন্তু এস্থলে একটী কথা বলি। আমাদের পৃথিবী প্রথমতঃ তেজোময় ছিল, ধীরে ধীরে বর্ত্তমান অবস্থায় পরিণত বা উন্নীত হইয়াছে। প্রাচীনকালে পৃথিবীতে যে প্রকারের প্রাণী ছিল, এখন তাহাদিগের বংশে বা ক্রমবিকাশে, পৃথিবীর পরিবর্ত্তিত অবস্থার সামঞ্জস্যে, অন্য প্রকার জীব এখানে বাস করিতেছে। ধীরে ধীরে যখন পৃথিবী শীতল হইয়া আসিবে, তখন আমাদিগের উন্নততর বংশধরেরা, অন্য প্রকার শারীরিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া যে, সেই পৃথিবীতে বাস করিতে পারিবে না, কে বলিল? তদ্ব্যতীত, আবার পৃথিবীর অভ্যন্তরে কেবলমাত্র ১৮ মাইল নিম্নে তরল তেজ সমষ্টি মাত্র। ওয়ালেস্ ও হিসাব মনে করেন যে, বাহ্যিক তেজোভাণ্ডারের ক্ষয় প্রাপ্তি হইলে উন্নততর বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই আভ্যন্তরীণ তেজ বাহির করিয়া লইয়া পৃথিবীর জীবন ধারণ সম্ভব হইতে পারিবে। নিরন্তর বিকীরণের ফলে, যখন সে তেজ টুকুও ধ্বংস পাইবে; তখন আবার অধিকতর জ্ঞানের প্রসাদে এবং অবস্থাজনিত পরিবর্ত্তিত দেহ ধারণ করিয়া, আমাদিগের ভবিষ্যৎবংশ জীবিত থাকিতে পারিবেন। সুতরাং আমাদের বংশপিণ্ড ধ্বংসের বড় আশঙ্কা দেখিতেছিনা। আশা করা যায় যে, যাহা আমাদিগের জ্ঞানে এখন অসম্ভব; তাহা ভবিষ্যতে সম্ভবপর হইবে। যদি পৃথিবী

যানের অনুপযুক্তও হয়; তবে এখন যেমন আমরা ম্যালেরিয়া পীড়িত স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে চলিয়া যাই; সেইরূপ তাহারা পৃথিবীটা ছাড়িয়া, আদি হইতে এতৎসময় পর্য্যন্ত সঞ্চিত জ্ঞানরাশি, মস্তকে বহন করিয়া, গ্রহান্তরে চলিয়া যাইবে। একথায় আশ্চর্য্য কিছুই নাই। জ্ঞানের বৃদ্ধিসহকারে যে, গ্রহান্তরের সহিত আমাদের গতায়াত সম্ভবপর হইবে, তাহা অনেক বৈজ্ঞানিক আশা করেন। মার্স্ দেবের সহিত আমাদের খবর বার্ত্তা চালান যাইতে পারে কি না, এখনই তাহার উদ্যোগে অনেকের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছে। এই হিসাবে সমাজ শরীরের ধ্বংস বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সুতরাং সেই যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আমার সেই আত্মস্থিতির কথাটাতেও অবিশ্বাস জন্মিতেছে না। জগৎকে যখন এতকাল ধরিয়া উন্নতিশীল দেখিয়া আসিলাম, তখন আমার এপ্রকার সিদ্ধান্তে আর "কিমাশ্চর্য্যম্"? উত্তর শ্রবণে আনন্দিত হইয়া, কুক্কুট পুনর্ব্বার বোষ্টরূপে প্লেটশায়ী হইলেন, এবং আমি যক্ষবরে ক্ষুধা প্রশমিত করিলাম।

শ্রীজ্ঞান স্থির।

হিন্দু আর্য্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস।

দার্শনিক যুগ।

প্রথম অধ্যায়।

সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্য বিস্তার—মগধের অভ্যুদয়।

তৃতীয় যুগের ইতিহাস সংগ্রহপক্ষে একটি নূতন সুযোগ আছে। এই সময়ে গ্রীকেরা ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সংগৃহীত বিবরণ পাঠে ভারত সম্বন্ধে অনেক প্রাচীনতত্ত্ব জানা যায়। বৈদিক যুগে হিন্দুগণ যখন পঞ্চনদ প্রদেশে রাজ্যবিস্তার করেন, তখন গ্রীকদিগের জাতীয় জীবনের উন্মেষ হয় নাই, গ্রীকসভ্যতার সূত্রপাত হয় নাই। মহাভারতীয় যুগেও ট্রয়জান যুদ্ধের নেতৃ গ্রীকগণ সুসভ্য হিন্দুদিগের কোন সংবাদ রাখিতেন না। এজন্য প্রথম দুই যুগের গ্রীক সাহিত্য হইতে ভারত সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। খ্রীঃ পূ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে পাইথোগরাস নামক গ্রীক প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং তিনিই প্রথমতঃ বিদ্যাচর্চ্চায় হিন্দুদিগের নিকট ঋণী। তাঁহার গ্রন্থ সমালোচনা করিলে তদানীন্তন ভারতের প্রচলিত ধর্ম্মমতের সহিত অনেকটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। আত্মার জন্মান্তরপরিগ্রহতত্ত্ব তিনি উপনিষৎ ও প্রচলিত হিন্দুবিশ্বাস হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্যাবলম্বন ও মাংসাহার নিষেধ বিধিও হিন্দুদিগের বিশ্বাস হইতে পরিগৃহীত। হিন্দু সুল্বসূত্রই তাঁহার জ্যামিতি শাস্ত্রের ভিত্তি। সাংখ্যদর্শন হইতেই তাঁহার সংখ্যাবিজ্ঞান মত উদ্ভূত হইয়াছিল। তদীয় পঞ্চভৌতিক তত্ত্বও প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয়জ্ঞান সন্দেহ নাই।

আদি গ্রীক ইতিহাসবেত্তা হিরোডটাস খ্রীঃ পূ ৫ম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তিনি কখনও ভারতে আইসেন নাই। ভারত

সম্বন্ধে তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার কথা গুলি অতি মূল্যবান। তাঁহার মতে সে সময়ে ভারতবাসীরা পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রধান জাতি। তাহারা অনেক উপজাতিতে বিভক্ত এবং তাহাদের মধ্যে বহুভাষা প্রচলিত। ভারতে অনেক স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়া থাকিত, এবং ভারতবাসীগণ তুলা নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিত। (৩য়, ৯৪-১০৬)। হিরোডটাসের গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, পারস্যরাজ দারাউস ভারতের কতকাংশ অধিকৃত করিয়াছিলেন; তাঁহার তরণী সকল সিন্ধুনদ দিয়া সমুদ্রে যাতায়ত করিত। (৪র্থ, ৪৪)

অবশেষে মেগস্থিনীস খ্রীঃ পূ ৪র্থ শতাব্দীতে ভারতে আইসেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলীপুত্র বা প্রাচীন পাটনায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তদীয় মূলগ্রন্থ এক্ষণে পাওয়া যায় না। তবে সেই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অনেক বিবরণ অন্যত্র পাওয়া যায়। ভারত ইতিহাসপক্ষে ইহা অতি মূল্যবান সামগ্রী, আমরা স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ করিব। দার্শনিক যুগের তিন শতাব্দীতে (খ্রীঃ পূ ৬ষ্ঠ, ৫ম ও ৪র্থ শতাব্দীতে) ভারতে যে কি প্রকার উচ্চশ্রেণীর সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পাইথোগরাস, হিরোডটাস এবং মেগস্থিনীস তাহার সাক্ষী।

মহাভারতীয় যুগের শেষভাগে গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ হইতে উত্তর বেহার পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র হিন্দুদিগের জিত, অধিকৃত ও হিন্দুকৃত হইয়াছিল। ১০০০ খ্রীঃ পূ তাঁহারা গাঙ্গাপ্রদেশ হইতে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব বেহারে, মালবে, দাক্ষিণাত্যে এবং গুজরাটে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে মহাভারতীয় যুগের শেষভাগে ও দার্শনিক যুগের প্রারম্ভে উপরোক্ত অনার্য্য প্রদেশ সকল ক্রমে হিন্দু সভ্যতা গ্রহণ করিতেছিল।

হিন্দু বিজয়তরঙ্গ যত প্রসারিত হইতে লাগিল, আদিমবাসীগণ তত উচ্চতর সভ্যতা ও উন্নততর ধর্ম্মের নিকট মস্তক অবনত করিতে লাগিল। নদ নদী উত্তীর্ণ হইয়া, অরণ্যানী ভেদ করিয়া, অনুর্ব্বর ভূমিকে সমুর্ব্বর করিয়া এবং জনশূন্য স্থানকে জনপূর্ণ করিয়া হিন্দুসভ্যতা অগ্রগামিনী হইতে লাগিল। যে স্থানে জনকতক হিন্দুবাস করিয়াছিলেন, সে স্থানে ক্ষমতাশালী হিন্দু-উপনিবেশ স্থাপিত হইল; যে স্থানে একজন হিন্দু-ধর্ম্মযাজক আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে স্থানে গ্রাম ও নগর ফুটিয়া উঠিল। যে স্থানে কয়েকজন মাত্র বণিক কোন অজ্ঞাত নদীপথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে স্থানে পণ্য সামগ্রীপূর্ণ তরণী সকল নদীতে কোলাহলময় করিয়া চলিতে লাগিল; যে স্থানে পূর্ব্বে কাষ্ঠজীবী কাট কাটিত, সেস্থানে বিস্তারিত ধান্য ও শস্যক্ষেত্র বায়ুকোলে হাসিতে লাগিল। এই প্রকারে আর্য্যগণের অভিযানে অনার্য্যগণ পলায়ন করিল। এই আর্য্যবিজয়ের যথাযথ বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করা দুষ্কর। তবে দুটী একটী ঘটনা পাঠককে নিম্নে উপহার দিতেছি।

সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বৌধায়ন জীবিত ছিলেন। তিনি একজন আদি সূত্রকার। তাঁহার গ্রন্থে আছে;—

"৯। যেখানে সরস্বতী নদী অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহাই আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম সীমা; পূর্ব্বসীমায় কালকবন; দক্ষিণে পারিপাত্র (বিন্ধ্যাচল) এবং উত্তরে হিমালয়; ঐ

স্থানের আচার ব্যবহার শাস্ত্রানুমোদিত।

"১০। কেহ কেহ বলেন, যমুনা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগই আর্য্যাবর্ত্ত।

"১১। বল্লভীগণ নিম্নলিখিত শ্লোক উদ্ধৃত করেন;—

"১২। পশ্চিমে নদী, পূর্ব্বে যেখানে সূর্য্যোদয় হয়, যতদূর কৃষ্ণসার গমনাগমন করে, ততদূর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বিরাজ করে।

"১৩। অবন্তী (মালব) অঙ্গ (পূর্ব্ব বেহার) মগধ (দক্ষিণ বেহার) সৌরাষ্ট্র (গুজরাট) দাক্ষিণাত্য, উপবৃত সিন্ধু এবং সৌবীব (দক্ষিণ পঞ্জাব)—এই সকল দেশের অধিবাসীগণ মিশ্রবর্ণ।

"১৪। যে ব্যক্তি আরত্তগণ (পাঞ্জাবের) কারস্করগণ (দক্ষিণ ভারতবর্ষের) পৌণ্ড্রগণ (উত্তর বঙ্গের) সৌবীরগণ, বঙ্গগণ (পূর্ব্ববঙ্গের) কলিঙ্গগণ (পূর্ব্বোপকূলের) এবং প্রাস্থনগণেব দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহাকে পুনষ্টোম বা সর্ব্বস্পৃষ্ট যজ্ঞ করিতে হইবে।" বৌধায়ন (১ম, ১, ২)

উদ্ধৃতাংশ পাঠে দার্শনিকযুগে হিন্দুরাজ্য কতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল এবং উহা কিরূপে তিনটী বিশিষ্ট চক্রে বিভক্ত ছিল, তাহা জানা যায়। প্রথম চক্র সরস্বতী হইতে বেহার এবং হিমালয় হইতে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয় চক্রেব অন্তর্গত দক্ষিণ পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মালব, দাক্ষিণাত্য, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বেহার। এই চক্র মিশ্রবর্ণের বাস বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ আর্য্য ও অনার্য্য হিন্দুগণ এ সকল প্রদেশে বাস করিত। তৃতীয় চক্রের অন্তর্গত পাঞ্জাবের আরত্তগণের প্রদেশ দক্ষিণভারত, উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ এবং উড়িষ্যা হইতে কৃষ্ণাপর্য্যন্ত পূর্ব্বোপকূল। কোন ব্যক্তি শেষ চক্রে ভ্রমণ করিতে আসিলেও তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। অর্থাৎ এই সকল প্রদেশের অধিকাংশ লোকই অনার্য্য ছিল। খ্রীঃ পূ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে তৃতীয় চক্রই হিন্দুরাজ্যের শেষ সীমা বুঝিতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বেই দাক্ষিণাত্য যে কেবল উপনিবেশিত হইয়াছিল, এমন নহে। বৌধায়নসূত্রে প্রতিপন্ন হয়, দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজ্য ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সকল বিদ্যালয়ের বিধি ব্যবস্থাও কতক পৃথক ছিল। বৌধায়ন সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্যবাসী এবং আর্য্যাবর্ত্তেব জন্ম যথেষ্ট সম্ভ্রম থাকিলে, তিনি দাক্ষিণাত্যের বিশেষ বিশেষ বিধি ব্যবস্থাব উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এরূপ একটী স্থান উদ্ধৃত করিতেছি।

"১। পাঁচটী বিষয়ে উত্তর ও দক্ষিণে ব্যবহারিক প্রভেদ আছে।

"২। দক্ষিণের প্রথাব উল্লেখ করিতেছি।

"৩। অদীক্ষিত ব্যক্তির সহিত আহার, সস্ত্রীক আহার, বাসি দ্রব্যাহার, মামাত ভগিনী বিবাহ বা পিসতাত ভগিনী বিবাহ দক্ষিণে প্রচলিত।

"৪। উত্তরের প্রথা এই যে পশুলোম ব্যবসায়, মদ্যপান, দন্ত বিশিষ্ট পশু বিক্রয়, অস্ত্রবিক্রয় এবং সমুদ্র গমন নিষিদ্ধ নহে।

"৫। অন্যত্র যে এই সকল প্রথা অবলম্বন করে, তাহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয়।

"৬। এই সকল প্রথার জন্য দেশাচারই মানিতে হইবে।

"৭। গৌতম বলেন যে উহা মিথ্যা।"

বৌধায়ন (১ম, ১, ২)

বৌধায়নের পরবর্ত্তী সূত্রকার আপস্তম্ব। তিনি দাক্ষিণাত্যবাসী, ৫ম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। আপস্তম্বের বসতি ও কার্য্যক্ষেত্র যে অন্ধ্র প্রদেশে ছিল, এ বিষয়ে অল্প সন্দেহই আছে। অন্ধ্ররাজ্য, কৃষ্ণা

ও গোদাবরীর মধ্যবর্ত্তী সমুদায় ভূভাগে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণাতীরে বর্ত্তমান অমরাবতীর নিকটে অন্ধ্রারাজ্যের রাজধানী ছিল। অন্ধ্রপ্রদেশের তৈত্তীরীয় আরণ্যকাবলম্বনেই আপস্তম্বের সূত্র রচিত। অদ্যাপি নাসিক, পুণা, আহমেদাবাদ, শতরা, সোলাপুর, কোল্‌হাপুর এবং দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মণগণ আপস্তম্বের মতানুসারেই চলিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগকে আপস্তম্বীয় বলে।

অতএব মহাভারতীয় যুগের শেষভাগে দাক্ষিণাত্যে যে বিজয় আরম্ভ হয়,সেই বিজয়-তরঙ্গই কয়েকশত বৎসর চলিতে পারে। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বঙ্গ ও দাক্ষিণাত্য এবং কৃষ্ণাপর্য্যন্ত সমুদ্রোপকূল জিত ও হিন্দুকৃত হয়। ৫ম শতাব্দীতে কৃষ্ণাতীরে প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপিত এবং সম্ভবতঃ কৃষ্ণার দক্ষিণে রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। খ্রীঃ পূ ৪র্থ শতাব্দীতে কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ প্রদেশ কুমারীকা পর্য্যন্ত হিন্দুয়ায়িত হইয়া পড়ে এবং চোল, চের ও পাণ্ড্যরাজ্য সংস্থাপিত হয়। ঐ শতাব্দীতে সিলিউকাসের দূতস্বরূপ মেগস্থিনিস ভারতে আসিয়া ৩১৭ হইতে ৩১২ খ্রীঃ পূ পাটলীপুত্রে বা প্রাচীন পাটনায় অবস্থিতি করেন। সমুদায় দক্ষিণ ভারত এই তারিখের পূর্ব্বে হিন্দুয়ায়িত হইয়াছিল, মেগাস্থিনিসের গ্রন্থেই তাহার প্রমাণ আছে।

মহাকাব্যযুগে যেমন কুরু, পাঞ্চাল, বিদেহ ও কোশলগণ পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন, খ্রীঃ পূ ৪র্থ শতাব্দীতে তেমন প্রাচ্য অর্থাৎ মগধগণ পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজধানী পাটলীপুত্রে ছিল। উহা ৯ মাইল দীর্ঘ এবং প্রায় ২ মাইল প্রস্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক কাষ্ঠ প্রাচীরে বেষ্টিত। প্রাচীরের অভ্যন্তর হইতে শরক্ষেপ করা যায়, এজন্য প্রাচীর সছিদ্র ছিল। প্রাচীরের সম্মুখে পরিখা খনিত হইয়াছিল।

পাটলীপুত্র রাজ্যের ভিতর দিয়া, মথুরা নগরীকে তটস্থ করিয়া, যমুনানদী প্রবাহিত হইত, এরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে উপলব্ধি হয় যে, কুরু ও পঞ্চালগণের বাসস্থান গঙ্গা যমুনার দোয়াব, এসময়ে সাকল্যই বিস্তৃত মগধ রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। মগধজাতি ভারতের অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ক্ষমতায় ও গৌরবে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। এবং তাহাদের রাজা চন্দ্রগুপ্তের ৬০০০০০ পদাতিক, ৩০০০০ অশ্ব এবং ৯০০০ গজ ছিল। "ইহা হইতেই তাঁহার বিপুল ক্ষমতার অনুমান হইতে পারে।"

দক্ষিণ বঙ্গের বিষয় বলিতে গিয়া মেগস্থিনিস বলিতেছেন, সমুদ্রের তীরে কলিঙ্গগণ, তদূর্দ্ধে মণ্ডু ও মালিগণ, গঙ্গার পতন স্থানে গঙ্গারাঢীয়গণ এবং গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী এক দ্বীপে মদগলিঙ্গীগণ বাস করিত। গঙ্গার পতনস্থান হইতে কৃষ্ণার পতনস্থান পর্য্যন্ত সমুদায় উপকূলভাগকে সেকালে কলিঙ্গ বলা হইত।

মেগস্থিনিস পার্থলিসকে কলিঙ্গ প্রদেশের রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পার্থলিসের নৃপতির ৬০,০০০ পদাতিক, ১০০০ অশ্বারোহী এবং ৭০০ গজ ছিল।

গঙ্গার মধ্যে এক বৃহদ্বীপে মদগলিঙ্গী (মধ্য কলিঙ্গ) নামে একজাতি বাস করিত। তৎপরে এক ক্ষমতাশালী রাজার অধিকার ছিল। এই রাজার ৫০,০০০ পদাতিক, ৪০০

অশ্ব এবং ৪০০ গজ ছিল। তৎপরে দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত অন্ধ্রগণ বাস করিত। কৃষ্ণা ও গোদাবরী মধ্যে উহাদের অভ্যুদয় হয় এবং মেগস্থিনিসের আগমনের পূর্ব্বে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত উহাদের ক্ষমতা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মেগস্থিনিস বলেন, এই জাতি বহু বিস্তৃত ও তাহাদের প্রাচীর বেষ্টিত ৩০ নগর ছিল। ইহারা রাজাকে ১০০০০০ পত্তি, ২০০০ অশ্ব এবং ১০০০ গজ প্রদান করিত।

পশ্চিম দিকে সিন্ধুনদ, প্রাচ্য রাজ্যের পশ্চিম সীমা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব দেখা যায় যে, ক্ষমতাশালী ও বহু-বিস্তৃত মগধ রাজ্যের অন্তর্গত সমুদায় পাঞ্জাব ও উত্তর ভারতবর্ষ পরিগণিত হইত।

আধুনিক রাজপুতনার অধিকাংশ তখনও অনার্য্য জাতির বাসস্থান ছিল। তাহারা ভয়াবহ অরণ্যে ব্যাঘ্রসহচর হইয়া বাস করিত এবং স্বভাবও ব্যাঘ্র সদৃশ হিংস্র ছিল। মরুভূমির চতুর্দ্দিকে যে সকল জাতির বসবাস ছিল, মেগস্থিনিস তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। আরাবলী পর্ব্বতের অধিবাসী জাতিবৃন্দেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি সর্ব্বোচ্চ গিরি ক্যাপিটালিয়াবাসী জাতি সকলেরও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ক্যাপিটালিয়া আবুপর্ব্বত এই রূপেই স্থিরীকৃত হইয়াছে। তিনি তাহার দক্ষিণে সৌরাষ্ট্রদিগের কথা বলিয়া গিয়াছেন। তাহাদের রাজধানী সমুদ্রতীরে ছিল এবং তাহা প্রধান বাণিজ্যস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সৌরাষ্ট্ররাজ ১৫০,০০০ পদাতিক, ৫০০০ অশ্ব এবং ১৬০০ গজের অধিপতি ছিলেন।

তাহার পর, পাণ্ড্যজাতির বিবরণ আছে। পাণ্ড্যগণ যে ভারতবর্ষের দক্ষিণে বাস করিতেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

মরু ও অরণ্য ভিন্ন সমুদায় ভারতবর্ষই মেগস্থিনিসের সময় যে কেবল পরিজ্ঞাত ছিল, এমত নহে। উপকূলভাগও তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল। গঙ্গার পতন স্থান হইতে গোদাবরীর পতন স্থান, তথা হইতে কোচিন; কোচিন হইতে পেরীমুলা অন্তরীপ বা বোম্বাই; এবং পেরীমুলা হইতে সিন্ধুর পতন স্থানের দূরত্ব মেগাস্থিনিস লিখিয়া গিয়াছেন।

সিংহল দ্বীপও মেগাস্থিনিসের সময় পরিজ্ঞাত ছিল। গ্রীকগণ উহাকে তপ্রবণী বলিতেন। পালী ভাষায় উহাকে তাম্বপন্নী এবং সংস্কৃতে তাম্রপর্ণী বলে। মেগাস্থিনিস বলেন, একটী নদ দ্বারা উক্ত দ্বীপ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং উহাতে বহু পরিমাণে স্বর্ণ ও মুক্তা পাওয়া যায়। সিংহলস্থ হস্তীগণ ভারতের হস্তী অপেক্ষা বৃহদাকার। মেগাস্থিনিসের পরবর্ত্তী গ্রন্থকার ইলিয়ান বলিতেছেন যে, তপ্রবণী বৃহৎ পার্ব্বত্য দ্বীপ এবং তালবৃক্ষে সুশোভিত, অধিবাসীগণ কুটীরে বাস করে, নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া হস্তী সকল বিক্রয়ার্থে কলিঙ্গ রাজের নিকট লইয়া যায়। ইলিয়ান অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় মেগাস্থিনিস হইতে জানিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

সৌভাগ্য ক্রমে সিংহলবাসীরা যে ঐতিহাসিক বিবরণ রাখিয়াছে, তাহা অনেকাংশে বিশ্বাসযোগ্য। ঐ বিবরণ বংশাবলীরআকারে লিখিত। মহাবিহারের বৌদ্ধাশ্রমে যে ভাষা গ্রন্থ ছিল, তাহা হইতে চতুর্থ শতাব্দীতে দীপবংশ এবং পরবর্ত্তী কালে দুইখানি মহাকাব্য রচিত হইয়াছিল। এই দুই

পুস্তক অনৈতিহাসিক নহে। এই দুই গ্রন্থানুসারে বিজয় কর্ত্তৃক সিংহল বিজয়ের বৎসর ৫৪৩ খ্রীঃপূ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই তারিখটী ঠিক বলিয়া গৃহীত না হইলেও স্বীকার করা যাইতে পারে যে, সিংহল বিজয় ৫ম শতাব্দীতে হইয়াছিল। বিজয় মগধান্তর্গত লালরাজ সুবন্ধুর পুত্র। মাতৃপক্ষে তিনি বঙ্গকলিঙ্গ রাজের সহিত অন্বিত ছিলেন। কিম্বদন্তী এই, অসৎকার্য্যে লিপ্ত থাকায় লোকে তাঁহার বধাদেশ প্রার্থনা করিলে, রাজা তাঁহাকে অনুচরবর্গের সহিত সমুদ্রে প্রেরণ করেন। এই উপলক্ষে সিংহল আবিষ্কৃত হয়।

বিজয়ের সংবাদ একেবারে সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলেও, ইহা বোধ হয় স্বীকার করা যায় যে, সিংহল দ্বীপের অস্তিত্ব বহু শতাব্দী হইতে হিন্দুদিগের জ্ঞাত ছিল। দার্শনিক যুগে সিংহল কলিঙ্গে বাণিজ্য চলিত এবং সিংহল হইতে মূল্যবান উৎপন্ন দ্রব্য ভারতে বিক্রয়ার্থে আসিত। ইহা দেখিয়া কোন উদ্যোগী বা নির্ব্বাসিত রাজকুমার সিংহলে যাইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। সিংহল আবিষ্কারের দুই শত বৎসরের পরে দেবনাংপ্রিয় তিষ্য সিংহলের সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, সিংহলবাসীরা তদবধি বৌদ্ধ হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা মগধরাজ্য সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলি। খ্রীঃ পূ ৫ম শতাব্দীতে শিশুনাগবংশীয় অজাতশত্রু রাজা ছিলেন। এই সময় গোতম বুদ্ধ মানবলীলা সম্বরণ করেন (৪৭৭ খ্রীঃ পূ)। অজাতশত্রু অতি পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। যে সকল তুরানীয় জাতি উত্তর হইতে ভারত আক্রমণ করিতেছিল, অজাতশত্রু তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেন। এবং তিনি পাটলিপুত্র বা পাটনা নগর নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার একশত বৎসর পর নন্দবংশীয় ৯ জন নৃপতি (৩৭০ হইতে ৩২০ খ্রীঃ পূ) মগধে রাজত্ব করেন। অনন্তর ভারতীয় কূটমন্ত্রী চাণক্যের সহায়তায় চন্দ্রগুপ্ত মগধের অধিপতি হন। তিনি সুদূর পশ্চিমে রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, সমুদায় উত্তর ভারত তাঁহার দণ্ডাধীন হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার ৬০০০০০ পদাতিক, ৩০০০০ অশ্বারোহী এবং ৯০০০ গজ ছিল বলিয়া মেগস্থিনিস উল্লেখ করেন, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। তাঁহাকে একদা মহাবীর আলেকজাণ্ডারের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের ভারত হইতে প্রত্যাগমনের অল্পকাল পরেই চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল আরম্ভ হইয়াছিল।

চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী বিন্দুসার ২৯১ হইতে ২৬৩ খ্রীঃ পূ রাজত্ব করেন। তৎপরে প্রাতঃস্মরণীয় অশোক সিংহাসনারূঢ় হন। তিনি ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট, সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজ্যবিস্তৃতি কিম্বা রাজ্য শাসনের জন্য তিনি এত যশস্বী নহেন। তাঁহার যশোরাশির কারণ অন্যতর। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ, বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারই তাঁহার খ্যাতির মূল। অশোকের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্ম অতি অল্পই প্রচারিত ও গৃহীত হইয়াছিল। অশোকের রাজকীয় যত্নে সমুদয় সভ্যজগতে উহার মহিমা প্রচারিত ও আদৃত হয়। অশোকপ্রণোদিত বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশাসন ভারতের সর্ব্বত্র প্রস্তরে ও গিরিগাত্রে খোদিত হইয়াছিল। তিনি মেসিডন, মিসর

ও গ্রীসদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। সিরিয়ার এণ্টিওকাস, মেসিডনের এণ্টিওগনস, মিসরের টলেমী-সৌরিণের মগস এবং এপিরসের আলেকজাণ্ডার তাঁহার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছিলেন। এ সকল কথা আমরা বৌদ্ধযুগের বিবরণে লিখিব।

দার্শনিক যুগে হিন্দুগণ কেবল রাজ্য বিস্তারেই ব্যস্ত ছিলেন,এমত নহে, জ্ঞানোৎকর্ষও এ যুগের এক বিশেষ লক্ষণ। কিন্তু এ যুগের জ্ঞানের বিশেষত্ব এই যে, উহা "ব্রাহ্মণ" সাহিত্যের স্থায় বিস্তৃত নহে। ইহা অতি প্রয়োজনীয় ভাবে সূত্রাকারে লিখিত। এই সূত্র সাহিত্যের বিদ্যালয় প্রায় সর্ব্বত্র স্থাপিত হইয়াছিল। চাবণ্য ব্যূহগ্রন্থে ঋক্‌বেদের ৫, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের ২৭, শুক্ল যজুর্বেদের ১৫, সামবেদের ১২ এবং অথর্ব্ববেদের ৯টী বিদ্যালয় বা চরণের উল্লেখ আছে। প্রত্যেক চরণের এক একটী বিশেষ সূত্রসংগ্রহ ছিল। কিন্তু সূত্র সাহিত্য ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ন্যায় অনেক লোপ পাইযাছে।

আমরা এখন ভিন্ন সূত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

১। বেদোক্ত যজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডের জন্য যে সকল সূত্র রচিত হইয়াছিল, তাহাকেই শ্রৌত সূত্র বলে। ঋক্‌বেদের অশ্বালায়ন ও সাংখ্যায়ন নামে ২, সামবেদের মশেক, লাট্যায়ন ও দ্রাহ্যায়ন নামে ৩, প্রাচীন বা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের বৌধায়ন, ভারদ্বাজ, আপস্তম্ব ও হিরণ্যকেশী নামে ৪ এবং নূতন বা শুক্ল যজুর্ব্বেদের কাত্যায়ন নামে ১ খানি সূত্রগ্রন্থ সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। মহাকাব্য যুগে শৌনক নামে এক বিখ্যাত পুরোহিত ছিলেন। প্রবাদ এই, আদি সূত্রকারগণ তাঁহারই শিষ্য। এই প্রবাদ সত্য হউক, আর মিথ্যা হউক, ইহা নিশ্চয়, মহাকাব্য যুগের ব্রাহ্মণ সাহিত্যের পর সূত্রসাহিত্যের উদ্ভব।

২। ধর্ম্মসূত্রে লৌকিক আচার ব্যবহার বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং ইতিহাস সংগ্রহপক্ষে ইহা মূল্যবান সহায়। ধর্ম্মসূত্রের মূল্য আরও এক কারণে অধিক। এই সূত্রগুলিই পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অনুসরণীয় মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর স্মৃতি প্রভৃতি নামে খ্যাত হইয়াছে। ধর্ম্মসূত্রের মধ্যে মানবসূত্র বা মনুকৃত সূত্র এখন পাওয়া যায় না। উহা গদ্যে ও পদ্যে লিখিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে যে মনুস্মৃতি বিদ্যমান আছে,উহা কেবল পদ্যেই লিখিত। ঋক্‌বেদের ধর্ম্মসূত্র বশিষ্ঠ, সামবেদের গৌতম, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের বৌধায়ন ও আপস্তম্ব প্রসিদ্ধ।

৩। পারিবারিক বিধিই গৃহ্যসূত্র নামে খ্যাত। ঋক্‌বেদের সাংখ্যায়ন ও অশ্বালায়ন গৃহ্যসূত্র, শুক্ল যজুর্ব্বেদের পারস্কর এবং সামবেদের গোভিল গৃহ্যসূত্রের সংক্ষিপ্ত ব্যাদিব প্রসিদ্ধ।

শ্রৌত, ধর্ম্ম ও গৃহ্যসূত্রকে একত্রে কল্পসূত্র বলে। প্রত্যেক চরণেই এক একখানি কল্পসূত্র ছিল। অনেক সূত্রগ্রন্থ কালে বিনষ্ট হইয়াছে। তবে আপস্তম্ব কৃত একখানি কল্প অদ্যাপি পূর্ণাবস্থায় পাওয়া যায়। ইহারই এক অংশের নাম শুল্বসূত্র। যজ্ঞীয় বেদি পরিমাণ শুল্বসূত্রে ব্যবস্থিত হইয়াছিল। শুল্বসূত্র হইতে জ্যামিতি বিদ্যার উদ্ভব।

৪। শিক্ষা বেদপাঠের উচ্চারণ বিধি।

প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক শাখার এক একটী প্রাতিশাখ্য ছিল। এই প্রাতিশাখ্যগুলি প্রায়ই লুপ্ত হইয়াছে। কেবল শৌনকের ঋকবেদের ও কাত্যায়নের শুক্লযজুর্বেদের এক এক প্রাতিশাখ্য পাওয়া যায়। কৃষ্ণ-যজু ও অথর্ব্বেরও এক একখানি প্রাতি-শাখ্য পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায় না। যাঁহারা কৃষ্ণযজুর্বেদের প্রাতিশাখ্যের অধ্যাপক ছিলেন, তন্মধ্যে এক বাল্মীকি।

৫। বেদে যে যে ছন্দের ব্যবহার হই-য়াছে, ছন্দ বলিতে তাহাই বুঝিতে হইবে। ছন্দও দার্শনিকযুগে স্ত্রাকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল। সামবেদের একখানি বিখ্যাত ছন্দগ্রন্থের নাম নিদানসূত্র। পিঙ্গলাঙ্গের ছন্দগ্রন্থ পরবর্ত্তীকালে লিখিত।

৬। ব্যাকরণে পাণিনিই শ্রেষ্ঠ। এজন্য অন্য বৈয়াকরণের নাম পাওয়া যায় না। তিনি ভারতের সুদূর পশ্চিমোত্তরে বাস করিতেন।

৮। নিরুক্ত বেদভাষ্য মাত্র। যাস্কই এ বিষয়ে খ্যাত। তিনি পাণিনির পূর্ব্ববর্ত্তী।

৯। বোধহয়, ভিন্ন ভিন্ন বেদের ভিন্ন ভিন্ন জ্যোতিষ ছিল। সকল জ্যোতিষই সূত্রযুগে প্রণীত। যজ্ঞের শুভক্ষণ লগ্নাদি নিরূপণ ও দৈবত কার্য্যের সময় নিদ্ধারণা-র্থেই জ্যোতিষের সৃষ্টি।

১০। অনুক্রমণী বেদের সূচীমাত্র। কাত্যায়নের ঋক্‌বেদের অনুক্রমণীতে ঋকের আদ্যাক্ষর, সংখ্যা রচয়িতা ও দেবতার নাম আছে। শৌনকেরও ঋকবেদের কয়েক খানি অনুক্রমণী ছিল, তন্মধ্যে একখানি অদ্যাপি পাওয়া যায়। যজুর্বেদের তিন খানি অনুক্রমণী ছিল। আর্ষেয় ব্রাহ্মণে সামবেদের এক অনুক্রমণী পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদেরও এক অনুক্রমণী পাওয়া গিয়াছে।

১১। দর্শনশাস্ত্রই সূত্রসাহিত্যের প্রধান-তম গৌরবস্থান। মহাকাব্য যুগের শেষ ভাগে ঈশ্বরের সত্বানিরূপণার্থে যে সকল আধ্যাত্মিক তত্বের আলোচনা হইয়াছিল, দার্শনিক যুগে তাহাই গভীরতর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে পরিণত হইয়া ষড়দর্শনের উৎপত্তির কারণ হয়। আপস্তম্ব তৎকৃত ধর্ম্মসূত্রে ইহার দুইখানি দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং দর্শন শাস্ত্র পরবর্ত্তীকালে পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোভিত হইলেও, দার্শনিক যুগে উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা প্রমাণিত হইতেছে। ব্যাকরণ ও দর্শনেই হিন্দুগণ অপেক্ষাকৃত নৈপুণ্য ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন।

১২। দার্শনিক যুগের শেষ ফল বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও বৌদ্ধসাহিত্য, সে সাহিত্যের প্রধান অংশকেও সূত্র কহে। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্ম মূলক, সুতরাং সমস্ত আসিয়াখণ্ডে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচারের সহিত হিন্দুদিগের মত ও বিশ্বাস ও আচার পদ্ধতি, এবং হিন্দুদিগের বিজ্ঞান ও সভ্যতা মানবজাতির মধ্যে প্রচা-রিত হইতে লাগিল।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

কবির জন্ম।

(গোবিন্দবাবুর কুঙ্কুম-কাব্য পাঠ করিয়া)

অহো মাদকতা ঘোর। খাইয়ে আফুর
কুঙ্কুমের, নেশায় হইনু চুর চুর।
জড়াইয়ে গেল বাণী, জড়াইয়ে গেল
দুই চক্ষু, ধীরে নিদ্রা আসি দেখা দিল।
সুপ্ত আত্মা, কাব্য-মদ-নেশায় আতুর,
দেখিল অদ্ভুত স্বপ্ন, মধুর মধুর।

কারণ-সমুদ্র-তটে বিরিঞ্চি বসিয়া
পদ্মাসনে, প্রাণী-বৃন্দ সৃজিয়া সৃজিয়া,
যেন কিছু শ্রান্ত—তবু নাহি পরিত্রাণ,
হে নিয়তি, রাজা তুমি, তুমিই মহান!

নীম ও নিসিন্দা আর ক্ষিপ্ত ডাল-কুত্তার-রুধিরে
সৃজিলা সমালোচক, ভাসি ধাতা নয়নের নীরে।
মুড়ো নোটে গাছে মরি আম্র-শাখা জোড়াতাড়া দিয়া,
বাঙ্গালির ঘরে ঘরে Novelist ফেলিলা সৃজিয়া,
আলুনি কড়ার ডালে পোড়াভাত মাখিয়া চুখিয়া,
সৃজিলেন বঙ্গ Punch রসোরাজে হাসিয়া হাসিয়া;
কাক ও জম্বুক-পিত্তে উকীল সৃজিয়া চতুর্মুখ,
আদিদেব পাইলেন অম্লমধু সুখ ও অসুখ!
জাঁতা দিয়া চূর্ণ করি কপোতের ক্ষুদ্র দেহ খানি,
হংসপুচ্ছ কাণে গোঁজা সৃজিলেন বঙ্গের কেরাণি,
মনু-পেতা বংশ-কঞ্চি, জড়াইয়া মোরগের ঠ্যাঙে।
সৃজিলেন বঙ্গ-আর্য্য—মচকায় তবু নাহি ভাঙে!
লইয়া সারীর গ্রীবা, শুকজিহ্বা, মেষের পরাণ,
বঙ্গের প্যাট্রিসিনি ধাতা সৃজিলেন, বিচিত্র, মহান!
চীৎকারের ভাণ্ডে দিয়া অপরূপ অঙ্গার-মশালা
বাঙ্গালির মহাকবি, কবিবর, বিধাতা সৃজিলা!
চতুর্মুখ ফিরাইয়া, পূর্ব্বদিকে বিরিঞ্চি আবার,
সৃজিলেন অন্য-সৃষ্টি-বিচিত্র সে সৃষ্টির ব্যাপার!
একমুষ্টি তুষানল, আন মুষ্টি আতপ তণ্ডুল,
লইয়া সৃজিলা ধাতা বঙ্গগৃহে বিধবা অতুল!

লইয়া মাখাল-ফল, লবণাক্ত জলধির নীর,
সৃজিলা অপূর্ব্ব দেহ হতভাগ্য কুলীন পত্নীর!
তার পর, আদিদেব, সুখে দুঃখে, ম্রিয়মাণ প্রাণে,
সৃজিতে কবির আত্মা, ক্ষণকাল বসিলেন ধ্যানে।
হেরিয়া সে মহাধ্যান, ব্রহ্মাণ্ডের কত শ্রেষ্ঠ প্রাণী,
আইল সে মহাতীর্থে, নতচক্ষে, যুগ্ম করি পাণি!
রাধা আসি ঢালি দিল চির প্রেম চির অভিমান,
জানকী ঢালিয়া দিল অশ্রুময় চিরদুঃখী প্রাণ,
বসন্তের পুষ্পরাশি ঢালি দিল অনঙ্গ অঙ্গনা,
পূর্ণচন্দ্র ঢালি দিল শারদীয় ব্যাকুল জ্যোৎস্না,
ঊষা দিল অরুণাক্ত অপরূপ প্রসূনের ডালি,
যামিনী আঁধারপুঞ্জ রাশি রাশি আনি দিল ঢালি,
অর্পিল মেনকা-রাণী মাতৃপ্রেম হাসিয়া কাঁদিয়া,
অর্পিল লক্ষ্মণদেব ভ্রাতৃপ্রেম হাসিয়া হাসিয়া,
অর্পিলেন বিশ্বামিত্র ব্রহ্মচর্য্য চিরজন্মার্জ্জিত,
বিচিত্র নৈবেদ্যরাশি হেরি ব্রহ্মা হইলা স্তম্ভিত!
লয়ে সেই সুখ দুঃখ, হাস কান্না পুণ্য রাশি রাশি,
সৃজিলা কবির আত্মা—অপূর্ব্ব সে সৃষ্টি অবিনাশী!
হে কবি তোমার তাই এক চক্ষে হাসিরাশি,
আন চক্ষে জল!
হৃদয়ের এক কোণে অভিমান, অন্যকোণে
মিনতি কেবল!
প্রভূত সাবিত্রী-তেজ এক হস্তে, অন্য কর
শিশু সম ক্ষীণ!
কেহ তোমাদের ভাবি করে পূজা, কেহ ভাবে
চণ্ডাল শ্রীহীন!
আজি যদি ক্রুশ দিয়া, বিঁধে ক্রূর বিশ্ববাসী
তোমার হৃদয়,
হে কবি, কালি গো পাবে মন্দারের মালা তুমি,
জানিহ নিশ্চয়!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

সাকার ও নিরাকারোপাসনা।

(২)

বিগত চৈত্র ও বৈশাখের নব্যভারতে উপরোক্ত শিরোনামে ২টী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি, আমি নিতান্ত মূর্খ, আমি এবিষয়ে যাহা বলিব, যদি ভ্রমসঙ্কুল হয়, অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিবেন। আলোচ্য বিষয়টী যখন নিতান্ত গুরুতর হইতেছে, তখন প্রথমতঃ সাকার ও নিরাকারোপাসনার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করি। আমি বলি, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা সাকারোপাসনা ও নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা নিরাকারোপাসনা। যাহার নাশ আছে, তাহা সাকার ও যাহার নাশ নাই, তাহা নিরাকার। ইহাতে লেখকের যাহা বক্তব্য থাকে বলুন।

প্রকাশিত প্রবন্ধের ৬২৬ পৃষ্ঠায় ১ম স্তম্ভের ১৯, ২০, ২১ ছত্রে লেখক বলেন, "প্রতিমা পূজা দেশ কাল বদ্ধ কল্পিত দেবতার পূজা, সেই জন্যই আপত্তি।" পুনবায় ৩০ পৃষ্ঠায় ২য় স্তম্ভে "সৃষ্টপদার্থ অবলম্বনে ঈশ্বরপূজা এবং প্রতিমা অবলম্বনে পূজা এ উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, কল্পনা ও সত্যের যত প্রভেদ, এ উভয়ের মধ্যেও তত প্রভেদ"। পরে ৩১ পৃষ্ঠায় "সুতরাং জগৎ কার্য্য অবলম্বনে পরমেশ্বরের পূজা যারপর নাই সহজ ও স্বাভাবিক। কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আছে বলিয়া জগৎ কার্য্য অবলম্বনে জগদীশ্বরের পূজা যেমন স্বাভাবিক, এতটা পুত্তলিকা অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর পূজা কখনই সেরূপ স্বাভাবিক নহে।" আবার ৬২৮ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের ১৬, ১৭, ১৮, ছত্রে—"এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত যে কোন পদার্থের অবলম্বনে সেই পরম পুরুষের পূজা হয়।" ইহাতে বোধ হয়, সাকারোপাসকের প্রতিমা বা বিগ্রহ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোন পদার্থ নহে; যদি না হয়, তবে উহা কি? বনের ফুল ও মালির প্রস্তুত বাগানের ফুল দেখিয়া যদি ঈশ্বরকে স্মরণ হয়, তবে একটা মৃত্তিকা স্তূপ ও মৃণ্ময়মূর্ত্তি দেখিয়া স্মরণ না হইলে তাহা কুসংস্কার নয় কি?

প্রবন্ধ পাঠে বোধ হয়, লেখক শক্তিতত্ত্বের একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত; জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয় যে, হস্তে, পদে, জলে, বায়ুতে ও তাড়িতে যে সকল শক্তি থাকার কথা বলিয়াছেন, উহাদিগের দার্শনিক নাম কি এবং ঐ সকল শক্তি উপাস্য কি না? যদি না হয়, তবে উপাস্য শক্তির সহিত উহাদিগের সম্বন্ধ কি?

মনের স্বভাব সম্বন্ধে লেখক একটী সুদীর্ঘ বিচার উক্ত প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "মন নিরাকার, অজড়; রূপ রসাদি গুণের কোনটাই মনে নাই, মনের স্বভাব জ্ঞান, ভাব ও

* বহুদিন এই প্রবন্ধ পাইয়াছি, নগেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ শেষ হয় নাই বলিয়া এতদিন রাখিয়াছিলাম, গণেশ বাবু তাহাতে দুঃখিত হওয়ায় এবার প্রকাশ করিলাম। ন, স।

ইচ্ছা; জড়ের স্বভাব আকৃতি বিস্তৃতি বেধ। জড়ের যাহা গুণ, তাহা মনে দেখিতে পাই না, মনের যাহা গুণ তাহা জড়ে দেখিতে পাই না"। ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, নিরাকার ও অজড়ের অসাধারণ লক্ষণ জ্ঞান ভাব ইচ্ছা কি না, ও জড় এবং সাকারের সাধারণ লক্ষণ আকৃতি বিস্তৃতি বেধ কি না? তারপর জড়ের গুণ মনে দেখিতে পান না বলেন, আমরা জানি, জড় ত্রিগুণাত্মক, অতএব জিজ্ঞাস্য এই, মনে ত্রিগুণের সত্তা উপলব্ধি হয় কি না? যদি জড়ে শব্দস্পর্শাদি গুণ থাকার কথা বলেন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, মনের ক্ষুধা তৃষ্ণা তেজের গুণ কি না ও কাম ক্রোধাদি আকাশের গুণ কি না? যদি মনে তেজ ও আকাশের সত্তা স্বীকার্য্য হয়, তবে শব্দ স্পর্শাদি গুণ কি প্রকারে অস্বীকার করা যায়? অবশেষে জিজ্ঞাস্য, মন গঠিত কি উপাদানে? নিরাকার মনের ক্ষয়ের স্বীকার করেন কি না, যদি না করেন, তবে সমাধি ও সুষুপ্তি কি প্রকারে সম্ভব হয়? মনের সাকারত্ব প্রতিপন্ন করিয়া লেখক প্রশ্ন করিয়াছেন, "মন দীর্ঘ, কি চতুষ্কোণ, কি ত্রিকোণ, কি আকার?" লেখক অন্যত্র বলিয়াছেন, "বায়ু অদৃশ্য হইলেও সাকার, উহা স্পর্শ দ্বারা অনুভূত হয়, তাড়িত এক প্রকার সূক্ষ্ম পদার্থ—সূক্ষ্ম জড়।" সাকার বায়ু দীর্ঘ, চতুষ্কোণ না ত্রিকোণ? সূক্ষ্ম জড় লম্বা না গোল? উহাদিগের আকৃতি বিস্তৃতি বেধ কি?

২৯ পৃষ্ঠায় লেখক জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি বলেন, "ব্রহ্মকে জগৎ ও জগৎকে ব্রহ্ম বলা যায় না। ব্রহ্মশক্তিও জগৎ হইতে পারে না, কারণ মূল পদার্থ ছাড়িয়া শক্তির স্বতন্ত্র সত্তা সম্ভব নহে, অতএব এ জগৎ তাঁহার সাময়িক ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ—তাঁহার সাময়িক প্রকাশ মাত্র—তাঁহার সৃষ্টিলীলা। উহা তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ নহে।" আবার বলিয়াছেন,—"ব্রহ্ম শক্তি জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে, বলিলে সৎস্বরূপ ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রকাশ হইয়াছেন, বলিতে হয়, ব্রহ্মের জ্ঞান, আনন্দ, প্রেম, দয়া, শান্তি, পবিত্রতা সকলই তাঁহার সৃষ্টি লীলায় প্রকাশ হইয়াছে, এ ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার সত্তায় সত্তাবান্"। অবশেষে ৩৩ পৃষ্ঠায় বলেন, অমূর্ত্তি ব্রহ্ম কখনও সমূর্ত্তি হইতে পারে না, কারণ মূর্ত্তি বিনাশশীল, মূর্ত্তির নাশের সহিত ব্রহ্মের নাশ হইতে পারে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান হইলেও, তাঁহার নিজের স্বরূপের নাশ করার শক্তি থাকা স্বীকার করা যায় না * বিশেষতঃ মূর্ত্তি ব্যাপ্য, তিনি সর্ব্বব্যাপী ইত্যাদি।

ইহাতে কি বুঝিব? বিশ্বের উপাদান কি হইল? ব্রহ্ম স্বয়ং না ব্রহ্মেতর কোন পদার্থ? আমরা লেখককে "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই বাক্যটীর ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করি। যদি চরাচর মূর্ত্তামূর্ত্ত সমস্তই ব্রহ্ম হয়, ভাল, যদি না হয়, তবে এই বিশ্বকে ব্রহ্মেতর পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে দ্বৈতবাদ আসিয়া পড়ে; আর যদি জগৎকে মিথ্যা বলেন, তবে লেখকের সত্তাও মিথ্যা, সুতরাং বিতণ্ডা নিষ্ফল।

* ২৮ পৃষ্ঠায় লেখক বলিয়াছেন, "এইহেতু বেদান্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে, ব্রহ্ম বিবর্ত্তে অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া প্রপঞ্চরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়া দ্বারা প্রকাশ করেন।" ইহাতে মূর্ত্তি নাশের শঙ্কা হয় কি?

তার পর, লেখক ৬২১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, "নিরাকারোপাসনা বিষয়ে লোকে বলিতেছে, নিরাকারোপাসনা কেমন করিয়া হইবে? নিরাকার কেমন করিয়া ভাবিব? নিরাকার ধ্যান কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে?" ইহার উত্তরে ৬২৫ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন, "নিরাকারবাদীর অবলম্বন নাই, একথা কে বলে? সাকারবাদীর অবলম্বন ক্ষুদ্র একটী প্রতিমূর্ত্তি, নিরাকারবাদীর অবলম্বন অখিল ব্রহ্মাণ্ড—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ।" ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, নিরাকারবাদীর অবলম্বন সাকার হইল কি নিরাকার হইল? আমার সংজ্ঞা অনুসারে ইনি নিরাকারোপাসক পদবাচ্য হইতে পারেন না। যদি জগতে কেহ সাকারোপাসক থাকে, তবে ইনিই স্পষ্টতঃ তিনি। আর প্রত্যেক পদার্থ অর্থে প্রতিমাবাদে বোধ হয় জগতের ইট, কাঠ, জল, পাথর, ঘসী, ঢেলা ইত্যাদি সমস্ত, প্রতিমাটা বাদ দিলেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না, রাস্তার একখানা পাথরের খোয়া বুঝাইবে, তথাপি সাকারোপাসকের নারায়ণ শিলা বুঝাইবে না, ইহারই বা মা'র পেঁচ কি? আর সাকারবাদীর প্রতিমূর্ত্তি অপেক্ষা একটা ঢেলা বা ঘসী আয়তনে বড় না ছোট? তবে সাকারবাদীর অবলম্বন ক্ষুদ্র একটী প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াছেন কেন? এ ক্ষুদ্রত্ব কি হিসাবের?

৬২১ পৃষ্ঠায় নগেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন যে, "শক্তির দ্বারা তুমি নানাপ্রকার কার্য্য করিতেছ; আমরা আপন হস্তে ও পদে যে শক্তি দ্বারা আমরা কাজ করি, তাহা ইন্দ্রিয়, আর ইন্দ্রিয় ও শক্তি এক পদার্থ কি না। "জলরাশি যে প্রবাহিত হইতেছে—উহাতে যে শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাহা নিরাকার।" আমরা বলি, গুণের দ্বারা প্রবাহিত হইতেছে, অতএব গুণ ও শক্তি এক কি না।

৬২২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, "মৃত্যুর সময় আত্মা স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম দেহে অধিবাস করে, প্রেততত্ত্ববাদীরা বলেন, তাহারা যে ছবি দিয়া থাকেন, তাহা মনের বা অঙ্গের ছবি নহে, সুতরাং উক্তরূপ ছবির উৎপত্তি আত্মার বা মনের সাকারত্ব প্রতিপাদন করে না।" প্রশ্ন এই যে, ঐ সূক্ষ্মদেহের উপাদান কি কি পদার্থ, ঐ সূক্ষ্মদেহ জড় কি অজড়? যদি অজড় হয়, তবে সূক্ষ্ম দেহীও অজড়, সুতরাং উহারা উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া যায় না কেন?

৬২৩ পৃষ্ঠায় জ্ঞানের বিষয় যেরূপ আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, জ্ঞানের ও বুদ্ধির লক্ষণের পার্থক্য কি?

নগেন্দ্র বাবুর একটী মীমাংসা এই যে, নিরাকার ব্যতীত সাকারকে জানা যায় না, সাকারকে নিরাকার জ্ঞান দেখাইয়া দেয়। ৬২৩ পৃষ্ঠায় বলেন "কেমন করিয়া জানিতে পারি যে, এই অসংখ্য অগণ্য সাকার পদার্থ রহিয়াছে? জ্ঞান দ্বারা। প্রথম প্রশ্ন, চক্ষুর দ্বারা সাকার পদার্থ দেখিয়া জানিলে হয় কি না যে সাকার পদার্থ রহিয়াছে, চক্ষু সাকার অতএব উক্ত জ্ঞানলাভে সাকারের প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হইতেছে কি না। দ্বিতীয় প্রশ্ন, পদার্থ ব্যতিরেকে পদার্থের জ্ঞান হয় কি না, যদি না হয়, তবে পদার্থ জ্ঞান সাকার সাপেক্ষ হইতেছে কি না।

আমরা জানি, শব্দ স্পর্শ রূপ রসাদি বিষয়ক সমস্ত জ্ঞানই সাকারের দ্বারা লব্ধ।

চিন্তাও সাকার-লব্ধ জ্ঞানের আন্দোলন। যদি জ্ঞান সাকারকে অপেক্ষা না করিয়া সমস্ত বহির্জগতের খবর দিতে পারে, তবে লোকে যে এত অধ্যয়ন ও দেশভ্রমণ করে, তাহা ত বৃথা। আমরা বুঝি, প্রথমতঃ জ্ঞানের গৃহীতৃত্ব ভিন্ন আর কিছুই থাকে না, পরে সাকার জগৎ হইতে ইন্দ্রিয়েরা যে সকল সংবাদ আহরণ করিয়া জ্ঞানকে উপহার দেয়, জ্ঞান তাহা সাদরে গ্রহণ করে, এইরূপে জ্ঞান দৃষ্টি লাভ করিয়া ইন্দ্রিয় হইতে প্রাপ্ত সংবাদের দ্বারা বহির্জগৎ জানিতে পারে, এই জন্য একটী অজ্ঞান বাঙ্গালীকে একটী ওকের গাছ দেখাইলে সে বলিতে পারে না যে সেটা ওকের গাছ, যে জানে সে চেনে।

৬২৭ পৃষ্ঠায় বলেন "এই অত্যদ্ভুত সুকৌশলময় পরম সুন্দর বিশ্ব ও ইহার অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থকে অবলম্বন করিয়া সেই পরম দেবতাকে দর্শন করিবে।" বিশ্বদর্শন করে এরূপ চক্ষু কাহার আছে? সুতরাং অংশ অবলম্বন করাই সঙ্গত হইতেছে। অংশ অবলম্বন করিয়া যে পূজা করিবে, সেই পূজা কি বলিয়া করিবে? ৬২৮ পৃষ্ঠায় বলেন "তিনি অনন্ত, মূর্ত্তি বলিলেই পরিমিত বুঝায়, সুতরাং তাঁহার মূর্ত্তি নাই।" সাকার নিরাকারের কথা যাক্। অনন্ত কি তুমি বোঝ? যাহা বোঝ না, তাহা উপাসনা করিবে কিরূপে? যদি অনন্তকে ক্ষুদ্র করিতে না পার, তবে তোমার উপায় কি?

আমি বলি, নিরাকার মূর্ত্তি অনন্ত, উপাসনা করিতে হইলে অনন্তকে সান্ত করিয়া লইতে হয়। সাকার ভাব সান্ত হইলেও বিস্তীর্ণতা প্রযুক্ত তাহার ধারণা করা যায় না, সুতরাং সময়ের ভাগকেও ক্ষুদ্র করিয়া লইয়া উপাসনা করিতে হয়। নিরাকার ও সাকার উভয় পক্ষে একথা সত্য কি না। সত্য হইলে "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মনো রূপ কল্পনা" এ উক্তি অসার বোধ হয় কি?

২৮ পৃষ্ঠায় লেখক বলেন, "ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য অন্য আর কি আছে যে, ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মন, মন হইতে পর যে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা, তাহাকে বুদ্ধির অধীন মন, মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয়, তাহার মধ্যে এক ইন্দ্রিয় যে চক্ষু, সেই চক্ষের গোচরযোগ্য করিয়া কহেন?" ইহাতে দেখিতেছি, মানুষ সামান্য একটু মাটীতে হাত বুলাইয়া ভগবানকে সৃজনের অপরাধী হইতেছে, কিন্তু যিনি স্বয়ং নিরাকার হইয়া, আবার এই সাকার বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছেন, তাঁহাকে অপরাধী করা হয় না কেন? বিশ্ব ত সাকারবাদী নির্ম্মাণ করে নাই।

লেখক মনকে নিরাকার বলেন, সুখ, দুঃখ, দয়া, প্রেম এগুলিও নিরাকার আবার স্বয়ং ঈশ্বরও নিরাকার। অতএব এই সকল ও অন্যান্য যত নিরাকার তিনি অবগত আছেন, তাহাদিগের পরস্পরের প্রভেদ কি? যদি প্রভেদ না থাকে, তবে ঈশ্বরে, মনে, সুখে দুঃখে পার্থক্য থাকে কিরূপে?

৩৩ পৃষ্ঠায় ব্যাপ্য ব্যাপকতা সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ একটী অবতারণা আছে, তৎসম্বন্ধে এই বলিতে পারি যে, শঙ্করাচার্য্য ৪৭ শ্লোকে বলেন—

"ব্যাপ্য ব্যাপকতা মিথ্যা, সর্ব্বমাত্মেতি শাসনাৎ"

তিনি উত্তম বুঝিয়াছিলেন কি না, পাঠকেরা বিচার করিবেন।

আমরা যেরূপ বুঝি, তাহাতে নিরাকারোপাসনা সাধনার চরম সীমা, উহার অন্য কোন দোষ নাই, এক দোষ এই যে, উহা আমার ন্যায় মূর্খ লোকদিগের পক্ষে কঠিন। বীরপুরুষেরা বলিতে পারেন, তুমি খোঁড়া দৌড়িতে পার না, তাই বলিয়া আমরা কি তোমার জন্য বসিয়া থাকিব? এ কথা সত্য, আমার জন্য তোমরা বসিয়া থাকিও না, তোমরা তোমাদিগের শক্তি অনুসারে চল, আমি আমার শক্তি অনুসারে চলি। যদি এমন নিয়ম কর, আস্তে চলা লোককে ফাঁসি দিবে, তাহা হইলে অন্যায় হইবে, কারণ খোঁড়া আমরা ৮৶০ আনা, পরাক্রান্ত আপনারা ৴০ মাত্র। তুমি ধনী লোক মণ্ডা মিঠাই খাও, আমি গরিব গুড় খাই, তাহাতে তুমি চট কেন? তুমি রাজা শাল গায়ে দেও, আমি গরিব কাঁথা গায়ে দিই, তাহাতে তোমার হানি কি? যদি তুমি প্রমাণ করিতে পার, আমি পাপ করিতেছি, তাহা হইলে আমি কাঁথা, গুড় ছাড়িতে পারি, যাবৎ তাহা না পারিতেছ, তাবৎ আমি তোমার কথা শুনিব না। তুমি জ্ঞানী মহাপুরুষ সত্য, কিন্তু তুমি কি বিবেচনা কর যে, কাঁথা গায়ে দিলে, গুড় খাইলে তোমার মহিমা কমে?

এই ত যাহা বুঝি, বলিলাম—উত্থানকারী দলের চেলা বলিয়া গৃহীত হইলাম কি না, জানি না। হিন্দুকে সাকারবাদীই বল আর, উত্থানকারীই বল, আমি যতদূর দেখিতে পাই, তাহাতে হিন্দুকে উভয়বাদী বলিয়া বোধ হয়।

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকৃত ধর্ম্ম—চরিত্রে।

১

বিশ্বনাথ কর্ম্মকার পরম বৈষ্ণব। বাঙ্গালায় পরম ভক্ত বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধ। পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, ললাটে দীর্ঘ তিলক, সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ। কোন প্রকার সাংসারিক কাজ করাকে তিনি পাপ বলিয়া মনে করেন। হরিনাম কীর্ত্তন মনন, ধ্যান ধারণা, পূজা অর্চ্চনায় তিনি অধিক সময় ব্যাপৃত থাকেন। হরিনামে দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হয়, কীর্ত্তনের সময় তাঁহার গগনভেদী "হরিবোল হরিবোল" ধ্বনিতে সকলের প্রাণ উড়িয়া যায়, নাম-কীর্ত্তন শুনিবামাত্র কখনও অচেতন হইয়া পড়েন, কখনও নব নব হাবভাব প্রকটিত করিয়া সকলকে চমকিত করেন। অবশ্য এ সকল তাঁহার ইচ্ছাকৃত নয়। ভাবোচ্ছ্বাসের সময় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকে না। ধর্ম্মানুষ্ঠান তাঁহার একটীও বাদ পড়ে না। তিনি সকল তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছেন, সকল অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া এখন ভক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু, এদিকে, তিনি একটী একটী করিয়া চারিটী বৈষ্ণবীর ঘর করিয়াছেন। টাকা ধার করিয়া পরিশোধ করা কখনও তাঁহার স্বভাব ছিল না, আজও নাই। পরের উপকার করাকে কুসংস্কার মনে করেন। আত্মীয় স্বজনের সেবা করা নিতান্ত অবৈধ বোধেই বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন। হরিনামের মালা সব সময়ে হাতে, ধর্ম্মজগতের বড় বড় কথা

সর্ব্বদাই মুখে মুখে। তবে একটু ক্রোধ, একটু লোভ, একটু অহঙ্কার, একটু পরশ্রী-কাতরতা, একটু পরনিন্দার ভাব সময়ে সময়ে তাঁহার ব্যবহারিক জীবনে যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ধর্ত্তব্য নহে। তিনি মানুষ মাত্রকেই ঘৃণার চক্ষে দেখেন, এবং বলেন, আর সব লোক পাপী। ইহাও গণনার যোগ্য নহে, কেননা তিনি যে ধার্ম্মিক। তিনি পরম ভক্ত বলিয়া চতুর্দ্দিকে প্রশংসিত। বৈষ্ণব মহলে বিশ্বনাথের গৌরবের সীমা নাই।

২

দীন মণ্ডল একজন দরিদ্র কৃষিজীবী। ধর্ম্মের বড় একটা ধার ধারে না—লেখা পড়া মোটেই জানে না। কিন্তু কথা বলিবার সময় তার মুখ হইতে যেন অমৃত বর্ষিত হয়। বিনয়ে তার সর্ব্বাঙ্গ মাখা। ২৫ বৎসর পূর্ব্বে সে একজনের তিনটি টাকা ধার করিয়াছিল, তাহা পরিশোধ না করিতে পারিয়া সে সদা বিমর্ষ। মনে হয়, যেন পৃথিবীতে তাহার সুখ নাই। কোন দিন তাহার মুখে কেহ মিথ্যা কথা শুনে নাই। দরিদ্র দীন মণ্ডল নিজের ছেলে মেয়ে কয়টী লইয়া দুঃখে দিন কাটায়, কিন্তু জমীদারের খাজনা কখনও বাকী রাখে না, কখনও মামলা মকদ্দমা করে না। কোন লোকের পীড়ার কথা শুনিলে দীন মণ্ডল সকলের আগে সেখানে হাজির হয়। কাহারও ঘরে আহারের জিনিস নাই শুনিলে অমনি ছুটিয়া দীননাথ সেখানে যায়। দীননাথ বড় বেশী কথা বলে না, কিন্তু কাহারও অভাবের কথা শুনিলে সে ঠিক থাকিতে পারে না; প্রাণপণে খাটিয়া অভাব দূর করে। যেরূপে হউক, অন্যের অভাব সে ঘুচাইবেই। অন্যের অভাব দূর করিতে সে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, কিন্তু তবুও তাহার নিরানন্দ নাই। দুঃখ কেবল ঐ ৩টী টাকা পরিশোধ হয় নাই! যাহার নিকট সে ঋণী, তাঁহার সংবাদ পাওয়া যায় না, সে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছে। দীন মণ্ডল বাঙ্গালার কোন দরিদ্র পল্লীতে অজ্ঞাতভাবে দিন কাটাইতেছে। দীনমণ্ডল দুঃখীর সন্তান, কাহারও প্রশংসা চায় না,—নিন্দাতেও ভ্রুক্ষেপ করে না।

৩

দীনমণ্ডলের জমীদার প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, খুব দুর্দ্দান্ত প্রতাপান্বিত ব্যক্তি। প্রতাপচন্দ্র ধনীর পোষ্যপুত্র, বাল্যকালে হরিহরপুরের জমীদার অপুত্রক অবস্থায় তাঁহাকে ১০০০৲ টাকায় ক্রয় করেন। প্রতাপের লেখা পড়ায় কখনও মতি ছিল না, অতি অল্প বড় লোকের ছেলেরই লেখা পড়ায় মতি দেখা যায়। সংসর্গ দোষে বাল্যকাল হইতে প্রতাপ চরিত্র দোষে দূষিত। প্রতিপালক পিতার মৃত্যুর পর অতুল সম্পত্তি তাহার হাতে পড়িয়াছে অবধি চতুর্দ্দিক হইতে বহু বন্ধু জুটিয়া প্রতাপচন্দ্রকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। অবৈতনিক উপদেষ্টা বা খোসামুদে-বহুল দেশে ধনী লোকের বন্ধুর অভাব নাই! এমন কুকর্ম্ম কাজ নাই, যাহা ইহারা করিতে পারে না বা করে নাই। প্রজার ঘরের সুন্দরী মেয়ে অপহরণ করা ইহাদের দৈনিক কার্য্য, অবস্থাপন্ন প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করা উদার ধর্ম্ম। দীন মণ্ডলের মত প্রজাকেও এজন্য অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে। দীন মণ্ডল জমীদারকে উপাস্য দেবতা এবং পিতার ন্যায় জ্ঞান করে, বহু বার অত্যাচরিত হইয়াও কোন কথা বলে নাই। আজকাল প্রতাপচন্দ্র নাম „কিনিবার জন্য কিছু প্রয়াসী হইয়াছেন—এজন্য রাজার

হাজার টাকা বড় বড় সভা সমিতিতে বা গবর্ণমেণ্টের কাজে দিতেছেন। বাহিরে প্রতাপের খুব নাম বাহির হইয়াছে। দয়ার অবতার বলিয়া সংবাদ পত্রে তিনি ঘোষিত হইতেছেন। দুঃখী দরিদ্রের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, প্রতাপচন্দ্র নাচ,বল প্রভৃতিতে আজ অকাতরে দান করিতেছেন, এবং সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট হইতে রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ঘরের লোকেরা, গ্রামের লোকেরা, দেশের লোকেরা প্রতাপকে পূর্ব্বের ন্যায়ই দেখে। দরিদ্র তাঁহার গৃহ-দ্বারে অনাহারে মরিলেও এক মুষ্টি ভিক্ষা পায় না। চরিত্র পূর্ব্ববৎ, ব্যবহার পূর্ব্ববৎ। কিন্তু হইলে কি হয়, প্রতাপ আজকাল বাহিরে বড় ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইতেছেন।

৪

হরষিতচন্দ্র সেন এক জন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। তাঁহার বড় প্রতিভা। তিনি তর্কে বা লেখায় জয় না করিয়াছেন, এমন লোক নাই। তিনি যাহার বিরুদ্ধে লাগেন, তাহারই সর্ব্বনাশ। তাঁহার বড়ই অহঙ্কার, তাঁহার সমতুল্য লোক এ ভূ-ভারতে নাই। কোন ভিক্ষুক তাঁহার বাড়ীতে এক মুষ্টি ভিক্ষা পায় না। কোন অতিথি এক দিন তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় পায় না। একই বিষয়ে দশ জায়গায় দশ প্রকার মত দিতে পারেন, দিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহার লজ্জা বা সঙ্কোচ নাই। দিবসে নহে, রাত্রে উইলসনের বাড়ীর খানার সহিত একটু মদ্যপান করেন। রাত্রে কখনও বাড়ীতে থাকেন না, এজন্য গৃহিণী বড় ক্রোধ করেন, কিন্তু বাহিরে এজন্য প্রশংসার হ্রাস নাই। বার মাসে তের পার্ব্বণ রীতিমত করিয়া থাকেন। লোকরঞ্জনার্থ মিথ্যা কথা বলা বা পর-উপকারার্থ খুব দেওয়া বা গ্রহণ করাকে বড়লোকের কাজ মনে করেন। হরষিতচন্দ্র একজন বিখ্যাত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত।

পরে পরে আমরা চারিটী চিত্র আঁকিলাম। এই চারি শ্রেণীর লোকের মধ্যে কে প্রকৃত মনুষ্য বা কে প্রকৃত ধার্ম্মিক? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আজ কাল বড়ই কঠিন। দেশে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এরূপ হাল্কা বায়ু প্রবাহিত হইতেছে যে, সর্ব্ব দোষে দূষিত এবং সর্ব্ব সৎকর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হইয়াও বাহ্য চটকে লোক ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। ধর্ম্ম বাহিরের ব্যাপার নহে, ধর্ম্ম অন্তরের জিনিস। ধর্ম্ম,জীবনে প্রতিফলিত হইলেই চরিত্র উৎপন্ন হয়, চরিত্র মানব-পুরে দেবশক্তি—অথবা চরিত্র মানবে ঈশ্বরত্ব। এই চরিত্রের আদর দিন দিন এ দেশে লোপ পাইতেছে, স্বেচ্ছাচারিতায় ধর্ম্মনীতি শিথিল হইতেছে, ঝুটামাল আদরে বিকাইতেছে, মহা মহা ধর্ম্মরথীদিগের ব্যবহারিক জীবনের কদর্য্যতায় মানুষ ভাব প্রবণতাকে ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া লইতেছে। কোন্ সময় হইতে, কি রূপে যে এই ভাব এ দেশে সংক্রামিত হইল, নির্ণয় করা বড় কঠিন। আমাদের বোধ হয়, সংসারাসক্তির উপর বৈরাগ্যের আধিপত্য সংস্থাপনে মহামতি শ্রীচৈতন্য একান্ত অন্তরে যে যত্ন করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি-প্রক্রিয়ার (Reaction) ফলে বৈষ্ণব সমাজ, দুর্নীতি-আসক্তির পূতিগন্ধময় পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া, ধর্ম্ম ও চরিত্রশূন্য ধর্ম্ম-ভাব এদেশে প্রচারে বা প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছে। সকলেই এখন ধর্ম্ম গেল, ধর্ম্ম গেল বলিয়া চিৎকার করে, অনেকেই বাহ্যি

ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, কিন্তু প্রকৃত চরিত্রবান লোক দিন দিন বিরল হইতেছে।

সম্প্রতি বিদেশীয় কোন বক্তা একদিন বাঙ্গালী চরিত্র ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছিলেন—"Bengalis are very emotional—they are very fond of weeping and crying" বাস্তবিক বৈষ্ণব-ভাবপ্রাবল্যে বঙ্গপ্রদেশ ভাবরাজ্যের দাস হইয়া পড়িয়াছে। এখন সর্ব্বত্র ভাব-সাধন, ধর্ম্ম-সাধন বলিয়া প্রশংসিত হইতেছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের নিগূঢ় সত্যরাজ্যে অতি অল্প লোক প্রবেশাধিকার পাইয়াছেন, অধিকাংশলোকই ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়া উচ্ছ্বাস-পূর্ণ, চরিত্র-শূন্য ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিতেছেন। আমরা দেখিতেছি,—দয়া ধর্ম্ম, ব্রত সংযম, প্রেম পুণ্য, এখন দিন দিন একটা বাহিরের উপকরণের ন্যায় হইয়া পড়িতেছে,—ধর্ম্ম গৈরিক বসনে, নিরামিষ আহারে, প্রাণ শূন্য অনুষ্ঠানে, চক্ষের জলে, উচ্চ ক্রন্দনে, অযৌক্তিক মহাপুরুষ পূজায়। ইন্দ্রিয়াদি দমনরূপ ব্রত-সংযম-নিষ্ঠা, সদাচার, বিনয়, নিরহঙ্কার ভাব, আড়ম্বরশূন্যতা, অন্তর্দৃষ্টি যশনিন্দা নিরপেক্ষতা এখন আর বড় একটা ধার্ম্মিকতার লক্ষণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয় না। একজন লোক যা তা কদর্য্য কার্য্য করিয়াও মুখে হরিনাম ও গায়ে বিভূতি মাখিয়া, নামাবলী গায়ে দিয়া সকলের মন হরণ করিতে পারে। দেখিতেছি, চরিত্রের আদর দিন দিন এই বঙ্গভূমিতে হ্রাস হইতেছে। ধনীর আদর, বিদ্বানের আদর, বা আর যাহা হউক, এই সবই আছে, কিন্তু প্রকৃত চরিত্রের আদর এই হতভাগ্য-দেশে এখন আর নাই। চরিত্রের আদর এ দেশে থাকিলে, হরবিত সেনের ন্যায় লোক এ দেশে সম্মান পাইত না, বা বিশ্বনাথ কর্ম্মকারও পূজা পাইত না; এবং প্রতাপচন্দ্র সর্ব্বত্র নিন্দিত হইতেন। এদেশের বড় বড় বিদ্বান দেখিয়াছি, এদেশের বড় বড় ধনী দেখিয়াছি—এমন কি, বড় বড় ধার্ম্মিকও দেখিয়াছি,—মিথ্যা কথা বলিতে, প্রতারণা করিতে, কথা বলিয়া কথা প্রত্যাহার করিতে, একবার প্রতিজ্ঞা করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে দেখি নাই, এমন লোক বড়ই বিরল। আমি, তুমি, সে—যার দিকে তাকাই, সকলেই এক দশা-গ্রস্ত। হায়, চরিত্রের আদর্শ মোটেই দেখি না! পাওনাদার বারম্বার আসিতেছে, বারম্বার সময়ান্তরে আসিতে বলিতেছি, কিন্তু একবারও কথা থাকিতেছে না। সমাজের খাতির রাখিতে যাইয়া সামান্য সামান্য ব্যাপারে মিথ্যা বলিতে একটুও উৎকণ্ঠা নাই। দুটা চারিটা পয়সার লোভ সম্বরণ করিতে এখন হতজ্ঞান হইয়া পড়িতেছি। লোকের প্রশংসার খাতিরে কতবার ব্যক্তিত্ব হারাইয়া কর্ত্তব্য ভুলিতেছি। সৎ সাহস নামক পদার্থটা এখন এ দেশে কল্পনার ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছে। অত্যাচার বা অন্যায় ব্যবহার দেখিয়াও কেহ তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিতে সাহস পায় না, সব যেন মৃত। অন্নাভাবে কত লোক হাহাকার করিতেছে, কতলোক, জমীদারের অত্যাচারে উৎসন্ন যাইতেছে, কত লোক অনাহারে মরিতেছে—কত বিধবার উষ্ণ অশ্রু মৃত্তিকায় পড়িয়া শুষ্ক হইয়া যাইতেছে—কত ভাই ম্যালেরিয়া-পীড়নে জর্জ্জরিত, হায়, সৎ ইচ্ছা বা সাহসের অভাবে—একবারও সেদিকে কেহ চাহিতেছে না! কার্য্যশূন্য লম্বা লম্বা প্রস্তাব মাথায় বহি, এবং

হরিনাম উচ্চারণ করিয়া চক্ষের জলে ভাসি, সকল কাজ কর্ম্মের ভার গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিয়া অলস দলে, বৈরাগীর দলে নাম লেখাইয়া ধার্ম্মিক চূড়ামণি হই। এত অভাব এ দেশে, কিন্তু আমাদের কোনই কর্ত্তব্য নাই! ঘরে, বাহিরে—হাটে বাজারে—সর্ব্বত্র অভাব-সাগরের ঢেউ খেলিতেছে দেখিয়াও আমরা নিশ্চিন্ত। আমারও প্রাণ নাই, চরিত্র নাই,—যাঁহাদিগকে আদর্শ মনে করিয়া অগ্রসর হই, দেখি, তাঁহাদেরও প্রাণ নাই, চরিত্র নাই। একটা লোকের চরিত্র-আদর্শ থাকিলেও এদেশ সেই আদর্শে জাগিত। মহা কপটতা বা প্রতারণার হস্ত হইতে রক্ষা পাইত।

চরিত্র জিনিসটা কি? চরিত্র, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব,—বীরের বীরত্ব,—পুরুষের বীর্য্য, রমণীর সতীত্ব। চরিত্র, পশুত্বে দেবত্ব, চরিত্র, নরকে স্বর্গ। স্বর্গের প্রেম ও পুণ্য, মর্ত্ত্যের নীতি ও কর্ম্ম চরিত্রে সম্মিলিত। প্রেম ও পুণ্য যখন আয়ত্ত, তখনই চরিত্র, নীতি ও কর্ম্ম যখন প্রতিপালিত, তখনই চরিত্র। সংযমরূপ কঠোর তপস্যায় রিপু চাঞ্চল্য বা সংসারাসক্তি যখন নির্ব্বাণ লাভ করে, তখন যে ধর্ম্মের উদয় হয়, সেই ধর্ম্মই চরিত্র। সেই ধর্ম্মের কথাই বলিতেছি, যে ধর্ম্ম শাস্ত্রে বা লোকমুখে নিবদ্ধ নহে, কিন্তু বিধাতার আদেশে বা অনুপ্রাণনে যাহা মনুষ্যে অবতীর্ণ। অর্থাৎ যাহা প্রতিজনের মধ্যেই স্বতন্ত্র। আর সেই নীতির কথাই বলিতেছি, যাহা মানব শাস্ত্রে বা কথায় সমাপ্ত নহে, কিন্তু মানব-চরিত্রে নিত্য নব শোভায় নব ভাবে প্রতিফলিত। এই ধর্ম্ম ও এই নীতি যখন জীবন-ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত, তখনই চরিত্রের উৎপত্তি। তাহা বাহিরের উচ্ছ্বাস নহে, তাহা বাহিরের আড়ম্বর নহে। তাহা হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে দেবশক্তি। তাহাই নরপুরে ঐশি শক্তি। ঈশা বুদ্ধ, নানক চৈতন্য, মুশা মহম্মদ, ম্যাট্‌সিনি পার্কার, কেশবচন্দ্র গ্ল্যাডষ্টোন, মুর বুথ এই চরিত্ররূপী ঐশি-শক্তি। ইঁহাদের তেজে জগৎ বিকম্পিত। এই চরিত্রের অভাবে অজেয় নেপোলিয়ন সেণ্ট হেলেনায় বন্দী, দুর্দ্দান্ত প্রতাপান্বিত জুলিয়স সিজর বন্ধুর হস্তে নিহত, মহা পরাক্রমশালী পার্ণেল ও বুলেঞ্জা জীবন্মৃত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহা তেজোয়ান স্যর চারলস্ ডিল্কে ইংলণ্ডে, এবং বিসমার্ক জর্ম্মণীতে নিস্তেজ। এই চরিত্রশক্তিতে যিনিশক্তি মান, পৃথিবী তাঁহার করতলস্থ, স্বর্গ তাঁহার অন্তরস্থ। তিনি মানুষ হইয়াও দেবতা, তিনি সংসারী হইয়াও স্বর্গবাসী। যে পাপের সেবা বারমাস করে,—পাপ সেবা, পাপ ভোজন করিয়া যাহার অস্থি মাংস পরি-পুষ্ট, পাপচিন্তা ও পাপ মননে যে সর্ব্বদা জর্জ্জরিত, ধর্ম্ম তাহার বাহ্যিক ব্যবহারে, বেশ পরিধানে, কিন্তু অন্তর শক্তিহীন। সংসারের প্রলোভন-সংগ্রামে সে সদা পরাজিত।

ধর্ম্ম, জীবনে প্রতিপালিত হইলে চরিত্রের উৎপত্তি হয়, বলিয়াছি, এই চরিত্র গঠিত হইলে বিশুদ্ধ প্রেম ও কর্ম্মের উৎপত্তি। ভাব রাজ্যে যাহা প্রেম, চরিত্ররাজ্যে তাহা পাপ। যেখানে চরিত্র আছে, সেখানে আত্মসংযম আছে, কথায় কথায় সেখান হইতে চক্ষের জল নির্গত হয় না, বাহিরের হা হুতাস দীর্ঘ-নিশ্বাস নাই, কিন্তু গভীর অন্তররাজ্যে সমবেদনা আছে, এবং সেই সমবেদনা হইতে উৎপন্ন কার্য্য করিবার ইচ্ছা আছে। অথবা চরিত্র যেখানে আছে, সেইখানেই অন্যের

দুঃখ অপনোদনে বাসনা আছে, চেষ্টা আছে। ধার্ম্মিক অলস ভাবে বসিয়া থাকেন, এ দৃষ্টান্ত এখনকার যুগে এদেশে দেখা যায়। কিন্তু পূর্ব্বে এদেশে এ দৃষ্টান্ত দেখা যাইত না। ধার্ম্মিকের ন্যায় কর্ম্মশীল প্রেমিক যোগী এই ভারতে আর ছিল না। যা কিছু মানুষের কর্ত্তব্য, সমস্তই ধার্ম্মিক-দিগকে সম্পন্ন করিতে হইত। সিদ্ধিলাভের পর অর্থাৎ চরিত্র লাভ হইলেই সাধকগণ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতেন। শাক্য বা শঙ্কর, কবির বা শ্রীচৈতন্য, নানক বা রামানন্দ, সকলেই সিদ্ধি বা চরিত্র লাভের পর প্রেমাবতার রূপ ধারণ করিয়া, ঐ দেখ, ভারতরাজ্যের মহা প্রচাররূপ কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ। চরিত্রবান সিদ্ধ ব্যক্তিরাই প্রকৃত কর্ম্মী, জ্ঞানী ও প্রেমিক, এবং প্রকৃত পক্ষে তাঁহারাই ধার্ম্মিক।

যাহা বলিবার, সংক্ষেপে বলিয়াছি। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে এক প্রকার দিগন্তব্যাপী ধর্ম্মান্দোলন চলিতেছে, ইহাতে আমরা সুখী, কিন্তু যতদিন এদেশের নরনারীকে প্রকৃত চরিত্রলাভে যত্নবান হইতে না দেখিব, ততদিন কিছুই হইতেছে না, মনে করিব। যে যতদিন বিশ্বনাথ কর্ম্মকার, হররিত চন্দ্র সেন ও প্রতাপচন্দ্র ঘোষের পরিবর্ত্তে দরিদ্র দীন মণ্ডলের ন্যায় কর্ম্মশীল সচ্চরিত্র ব্যক্তির আদর হইতে দেখিব, সেই দিন বুঝিব, কিছু হইতেছে। চরিত্রহীনতায় ভারত ডুবিয়া গিয়াছে, যে মহাত্মা ভারতকে বহির্মুখী ধার্ম্মিকতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া অন্তরমুখী ধর্ম্ম, চরিত্রধনে অধিকারী করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই আমাদের প্রণম্য। কবে সে দিন আসিবে, যে দিন এদেশের নরনারী প্রকৃত চরিত্রে অলঙ্কৃত হইয়া প্রেম এবং পুণ্য, জ্ঞান এবং কর্ম্মের জীবন্ত দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবে; কবে আধ্যাত্মিকতার স্বর্গীয় স্বাধীনতার প্রভাবে অহংজ্ঞান-সর্ব্বস্ব ভূমি পুণ্য ভূমিতে পরিণত হইবে! বিধাতাই জানেন, কবে সে দিন আসিবে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

নববধূ-সম্ভাষ।

১

আজো মোছেনিক' জল
আজো আঁখি ছল্ ছল্
সবারি নয়ন-কোণে আজো বারিধারা।
আজো সেই বুকে ব্যথা
আজো ওঠে তার কথা
সোণার প্রতিমা সেই গৃহ আলো-করা।

২

সচেতনে অচেতন
শোকে মগ্ন প্রাণ মন
আত্মীয় বান্ধব-জন সবাই কেমন।
তারি স্মৃতি জাগে মনে
নিদ্রা তন্দ্রা জাগরণে
একের অভাবে সব আঁধার ভুবন।

৩

সে গভীর দুঃখ-রাতি
এতদিনে পোহাল'কি
পূরব দিগন্তে আজি রবির প্রকাশ।
সুনীল আকাশ গায়
মরিকি আলোক ভায়
হাস্যময়ী নববধূ ঊষার বিকাশ!

৪

ঘুচে গেছে অভিশাপ
অন্ধকার মনস্তাপ
নিরানন্দ দুর্ব্বিপাক্ নাহিক এখন।

যা হ'বার গেছে হ'য়ে
এস পুণ্য-হাসি ল'য়ে
কাঁদিতে হয় না যেন আর গো তেমন।

৫

তব আগমনে বালা
সংসার-কুসুম ডালা
সাজান' গোছান' যেন থাকে চিরকাল।
নিত্য লক্ষ্মীরূপা হ'য়ে
আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা ল'য়ে
দাঁড়াও সবার মাঝে ঘুচুক্ জঞ্জাল।

৬

ধন-ধান্যে পূর্ণ ধরা
হোক্ আরো মনোহরা
আঁধার দরিদ্র গৃহ হোক্ পূর্ণ আলো।
সুখ-আশা হ'য়ে হীন
কাঁদিয়া গিয়েছে দিন
বেঁচে থাকা যে ক'দিন যায় যেন ভালো।

শ্রীচুনীলাল গুপ্ত।

একাকী।

১

ভুল এবে ভেঙ্গে গেছে, হায়।
প্রণয় সুষুপ্তি-হত, আজি বর্ষ যুগ গত,
তোমায় আমায়,—
ধীরে ধীরে শেষ-অশ্রু, স্মৃতির ধ্বনিত তান,
শুকায় মিলায়।
এখন বিস্ময়ে ভাবি, কি ভুমা যে করেছিনু
ধূম-বিন্দু-নীত!—
আঁধার, নিভৃত কুঞ্জ, জ্যোছনা-তটিনী-তীর
ঝাউ-মুখরিত,
মোদের মিলন-চিত্র এরা বুঝি এঁকে দিত,
পীত নীলিমায়?—
জানিতাম,—মোরা রাজা, এ'বিরাট্ বিশ্ব সব
পাদপীঠছা'য়!

২

ইন্দ্রজাল ছিঁড়িল ত্বরায়।।
খসিয়া এ'শ্লথ মুষ্টি, আবার উধাও সৃষ্টি,—
স্বপনে স্বপন!—
অশ্রান্ত-বিবর্ত্তচক্রে ক্ষুদ্র অন্তস্ফুট' যথা
অনন্ত জীবন।
আমার নীরন্ধ্র্‌ বাঁশী এ'ভীম-নিবাতে বুঝি
বাজিবে না আর!—
আমি কি সে' শেষ-নর?—হুঙ্কারিছে লয়ঘোরে
মুমূর্ষু সংসার?
তরলিত সন্ধ্যা-রাগ ঘুমন্ত ও বাপী-জল
চুমিছে কেমন।
এ'হেন প্রশান্তি-কোলে বিদগ্ধ বড়বা আমি,
ক্ষুব্ধ জাগরণ।

৩

মুরছিছে সায়াহ্ণ-তপন।
উড়াইয়া দিগ্‌বাস, রাঙ্গাইয়া নীলাকাশ,
সুরাঙ্গনা-কুল,
স্বরগ শিশির-ভরা হেম-কুম্ভ কাঁখে করি,'
আঁখি ছল্ ছল্,
নামিতেছে অস্তাচলে, জুড়া'তে তুষার-সেকে
দীপ্ত অর্য্যমন্,
মাখি' দিব্য-অবলেপে অনাদি কালের ওই
জীবন্ত-দহন।
তামসীর হিম-স্পর্শে দিবসের ক্ষীণতাপ
যাইছে নিবিয়া,
বিশাল-চৈতন্য-কেন্দ্রে আমারো এ'জড় হিয়া
উঠে নিশসিয়া।
ক্ষিপ্ত গ্রহটারে ছিঁড়ি,' রেখেছিলে হৃদে পূরে,।
গেছে পুনঃ ছুটে,
লৌহ-বন্ধনীও কালে উষার মলয় শ্বাসে,
বেণু রেণু টুটে।
গরবিনী পূরণিমা খরতর-আলো মুখে
লাজে মরে যায়,

ইন্দু-রোহিণীর প্রেম, উপরাগ-অবসানে,
নবীন খেলায়।
কন্দরে নিরুদ্ধ ছিনু, অকূল-সাগরে এবে,
মহাব্যোমছা'য়;
তুমি-আছ, বিশ্ব আছে, তোমারি বরণে আঁকা,
বিরহ কোথায়?
ভুল এবে ভেঙ্গে গেছে, হায়!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

অনন্ত সম্বন্ধ।

তোমারি আলোক তলে,
মোর
জীবন পোহাই;
ভরসা উদ্যম তুলি,
ল'য়ে
তোমারি দোহাই।

এ বিশাল রঙ্গভূমে,
আমি
খেলিবারে চাই;
খেলা ধূলা ভেঙ্গে যায়,
যদি
তোমারে না পাই।

সম্পদ যা কিছু আছে,
তাহা
তোমার করুণা;
টানে না যে প্রাণ-তরু
তোমা,
সে তরু তরু না।

যে গান গাহিয়া উঠি,
তাহা
প্রসাদ তোমার;
যখনি তোমায় চাই,
তুমি
তখনি আমার।

হৃদয় শ্যামল হয়,
শুধু
তোমার পরশে
অমৃত-সলিল ঝরে
প্রাণে,
তোমারি দরশে।

বল সখা কোন্ দিকে
পথ
নাহি পাই আমি?
সবচেঁয়ে জাগরণ
মম,
তুমি যবে স্বামী।

আমি ফুটে আছি ফুল
এই
জগতপাদপে,
বেঁচে রব পদতলে
নাহি
ঝরিব আদপে।

শ্রীহিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্মৃতি।

আবার এসেছ ফিরে?
সখা হে এসেছ ফিরে?
এই যে বুক পাতা আছে,এস গো জুড়াই হিয়া,
চেয়ে আছি অনুখণ বাহু দুটি পসারিয়া,
কভু যদি এসো ফিরে,
মনে পড়ে এ পুরাণে,
খাড়া আছি সদা তাই পথমাঝে আগুলিয়া,
মরমে উঠিছে ঢেউ ভাঙ্গা বুক বিদারিয়া।

২

তুমি ত স্বর্গের পাখী ধরা দিয়াছিলে বনে,
বনবাসে ছিনু যবে সাধের সেই কুঞ্জবনে,
দেবতার ছবি খানি
সেই দিন আঁকিয়াছি,

নিভৃতে রেখেছি তারে প্রেমকোষ আবরণে,
হৃদয়-পুতুল করি দিবানিশি সযতনে।

৩

যত স্নেহলতা দিয়া বাঁধিয়াছি এ কুটীরে,
থরে থরে সাজায়েছি অযুত মন্দার হারে,
চাঁদের অমিয়া লয়ে
ধোয়ায়েছি সারা ঘরে,
প্রাণের দোসর, তুমি আসিবে আবার ফিরে?
বল শুনি আববার আসিবে হেথায় ফিরে?

৪

অমরার জ্যোতিমাখা ওই পবিত্র আননে
ছুঁইতে, যাইতে কাছে সদা ভয় হয় মনে,
শত আয়োজনে তাই
ওপদে মিলিতে চাই
ধুইযে মলিন প্রাণ মন্দাকিনী ক্ষীরধারে,
অমর হইব সখা অনন্ত মিলন-পারে।

৫

এসো তবে দেবতা গো স্বর্গের দুয়ারে থাকি
হাত বাড়াইয়া দাও, ভর করি উঠি দেখি।
অতীতের অভিনয়,
কেন তাহে দুঃখ হয়?
অতীতের যাহা কিছু প্রাণে প্রাণে জাগে-
নাকি?
এখনো আমরা সেই অতীতের ছুটী পাখী।

৬

কালের চক্রেতে মোরা পড়িয়াছি দূরে স'রে,
জড়দেহ লয়ে হায়, হয়ে আছি দুই ধারে,
তা বলে কি খোয়ায়েছি
উভেরে উভয়ে আজি?
আঁখি মুদে দেখ সখা বাঁধা আছি একই
ডোরে,
সোহাগে গেঁথেছি হার, কেহ কি ছিঁড়িতে
পারে?

শ্রীসরলাবালা দত্ত।

"অতীত"।

অতীতের সিন্ধু নীরে যুগান্তর সাঁতারিয়া,
ভীষণ আবর্ত্তে পড়ি অবসন্ন প্রাণ,
উঠিতে পারে না আর, শ্রান্ত-দেহ-গুরুভার,
ভাসিতে ডুবিয়া পড়ে শিলার সমান,

১

একেত বিশাল বক্ষ আছে সিন্ধু প্রসারিয়া,
গভীর-অতলস্পর্শ তাহাতে আবার,
কতপাপ মগ্নগিরি, রয়েছে সিন্ধুরে ঘিরি,
ভাঙিছে জীবন-তরী আঘাতে তাহার।

২

বর্ত্তমান যতটুকু হুতাশে ফুরা'য়ে যায়,
নিভাইয়া মৃদুভাতি আশার আলোক,
কোথা জীবনের পথ, কোথাইবা ভবিষ্যৎ,
কল্পনায় মিলিতেছে দ্যুলোক ভূলোক।

৩

বিকল বিবশ প্রাণ ধরিবার না পাইয়া,
তুলিছে মরমভেদী ক্রন্দনের ধ্বনি,
কেহ শোনে কিনা শোনে, লক্ষ্য নাই তার
পানে,
শুনিতে ব্যাকুল শুধু আশ্বাসের বাণী।

৪

তিলে তিলে বর্ত্তমান অতীতে মিশিয়াছিল;
বিস্মৃতির আবরণে ঢাকিয়া জীবন,
আশা যে আছিল প্রাণে, চাহি ভবিষ্যের
পানে,
কে জানিত খু'লে যাবে সেই আবরণ?

৫

এ রহস্য মাঝে ওগো কে তুমি করিছ খেলা;
কেমনে আলোকে বল আনিলে আঁধার?
বর্ত্তমান নিয়ে প্রাণ, হ'তেছিল আগুয়ান্,
অতীতে ডুবিয়া কেন করি হাহাকার?

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী।

দুর্ব্বাসার প্রতি প্রিয়ম্বদা।

পরিহর, মুনিবর, রোষ পরিহর,
জ্বলন্ত ক্রোধাগ্নি তব
সম্বর সম্বর দেব,
দহিও না বসন্তের ফুল মনোহর!
মধুর উষার কোলে মেলেছে নয়ন,
প্রেম-সম্ভাষিয়ে অলি
কোথা তার গেছে চলি,
বিবশা সকল ভুলি ধ্যানে নিমগন।
আত্মহারা বালা আহা বিরহ-বিধুর,
শূন্যদৃষ্টি অর্থহীন,
ভাবনা-সাগরে লীন,
ধরিতে ধেয়েছে মন মধুপ চতুর।
পার্থিব ঘটনাচয় নাহি চোখে তার,
বিমলিন্ রূপরাশি,
নিবেছে অমিয় হাসি,
ঘিরেছে হৃদয়খানি বিষাদ-আঁধার।
ছলনা চাতুরী হীন ললনা-ললাম,
শান্তিময় তপোবনে
অশান্তি জাগিছে প্রাণে,
স্বামীর চরণ-ধ্যানে রত অবিরাম।
একান্ত সংসার-অজ্ঞ হেন সরলায়
ক্ষমাকর মুনিবর,
অভিশাপ পরিহর,
বাঁচাও তাহারে দেব চরণ-ছায়ায়।
যে পদ ত্রিদিবে পূজে দেব অগণন,
সেই পদ শকুন্তলা,
করেনি গো অবহেলা,
করে নাই অহঙ্কারে সে পদ হেলন।
আশীর্ব্বাদ দেহ দেব অবলা বালায়,
দাও হে চরণ-ধূলি,
অপরাধ যাও ভুলি,
ক্ষমাকর, ক্ষমাকর,—ধরিলাম পায়।

শ্রীমনোমোহন সেন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। সীতা-চরিত।—শ্রীযদুনাথ কাঞ্জিলাল প্রণীত, মূল্য ৷৷০। গত বৎসর আদর্শ সতী সীতার যে দুইখানি সুন্দর জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা তাহার একখানি। অতি সরল ও পবিশুদ্ধ ভাষায় এই অপূর্ব্ব জীবন ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে স্থানে স্থানে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। পুস্তকখানি স্কুলের পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে। বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষে এ পুস্তকের ন্যায় পাঠ্য পুস্তক বাঙ্গালায় বিরল।

২। পুলিস ও লোকরক্ষা।—শ্রীরামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৲। নব্যভারতে ইহার কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন, জিনিস কিরূপ। রামাক্ষয় বাবু একজন বহুদর্শী, বিজ্ঞ, পেন্সন-প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। এবিষয় সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় অভিজ্ঞতা অতি অল্প লোকের আছে। এবিষয় এত বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে বিস্মিত হইতে হয়। বিজ্ঞ, স্বদেশপ্রিয়, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের নিকট এই গভীর গবেষণা-পূর্ণ পুস্তক যে খুব আদৃত হইবে, সে পক্ষে সন্দেহ নাই।

৩। হিতপাঠ।—শ্রীবিপিন বিহারী রায় প্রণীত, মূল্য ।৵০। পুস্তকখানি আমরা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহা স্কুল-পাঠ্য-তালিকা ভুক্ত হওয়ার সম্পূর্ণ

উপযোগী হইয়াছে। বিবিধ নীতিপূর্ণ প্রবন্ধ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ভাষা বিশুদ্ধ ও সরল, রুচি পরিমার্জ্জিত।

৪। মিউনিসিপাল দর্পণ।—শ্রীসুন্দরীমোহন দাস, এম, বি, প্রণীত, মূল্য ৵০। অত্যাবশ্যকীয় বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায় সাধারণের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। কলিকাতাবাসীর ঘরে ঘরে এ পুস্তক রাখা প্রয়োজন।

৫। আলেখ্য।—শ্রীসীতানাথ নন্দী, বি, এ, প্রণীত। মূল্য ৸০। আলেখ্য নূতন ধরণের পুস্তক—১৪টী ছবি ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে, পুস্তকখানি গদ্যে লিখিত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা একখানি সুন্দর কাব্য। সীতানাথ বাবুর হৃদয়ের ছবি ইহাতে যেরূপ দেখিলাম, তাঁহাকে কবি বলিয়া আখ্যাত করাই উচিত। "সরোজের আত্মকাহিনী"তে গ্রন্থকারের কাব্যময় জীবন-তরুর যে অতি সুন্দর, অতি উদার ধর্ম্ম মত মুকুলিত হইয়াছে, তাহা আস্বাদন করিয়া বড়ই সুখী হইলাম। কোন কোন চিত্রে কিছু কিছু অস্পষ্ট ভাব প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া আমরা কিছু দুঃখিত হইয়াছি বটে, কিন্তু মোটের উপর সীতানাথ বাবুর নূতন ধরণের পুস্তক লেখার চেষ্টা সফল হইয়াছে। পুস্তকের ছাপা পরিপাটী, ভাষা প্রাঞ্জল এবং মধুর। এবং সকলের উপর রুচি ও ভাব অতি সুন্দর।

৬। পল্লিগ্রাম।—শ্রীসতীশচন্দ্র বসু প্রণীত, মূল্য ৸০। খুব মনোযোগের সহিত পল্লিগ্রাম পড়িল্যম। পড়িয়া মোটের উপর আশাতীত আনন্দ পাইলাম। পুস্তকখানি আত্মকাহিনী বিবৃতির ভাবে লিখিত, স্থানে স্থানে সে বিবৃতিতে কিছু রূপান্তর ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। পুস্তকের ভাষা, রুচি প্রায় সর্ব্বত্রই সুন্দর হইয়াছে, এরূপ পুস্তকে,৩৪ ও ৩৫ পৃষ্ঠায় পাঠক মহাশয়ের সহিত যে রসিকতা করা হইয়াছে, তাহা না থাকিলেই ভাল হইত। সতীশ বাবু প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন যে, পুস্তকের নামান্তর "হিন্দুধর্ম্মের মহিমা"। এ পুস্তক পাঠে কি "পল্লিগ্রাম-মহিমা" কি "হিন্দু-ধর্ম্ম মহিমা", কিছুরই তেমন পরিচয় পাইলাম না। এইত গেল পুস্তকের দোষের কথা। গুণের কথাও যথেষ্ট আছে। "মহিমা" ও "অমৃত" বাবুর বিশুদ্ধ প্রণয়কাহিনী অতি সুন্দররূপে এ পুস্তকে চিত্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের গল্প লেখার শক্তি অসাধারণ বলিয়া আমাদের প্রতীতি হইল। সকলের উপরে গ্রন্থকারের রুচির আমরা বড়ই পক্ষপাতী। ধৈর্য্য থাকিলে গ্রন্থকার কালে একজন বিখ্যাত লেখক হইতে পারিবেন, এ আশা করি।

৭। পল্লিগ্রাম।—ডাক্তার শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।০। পল্লিগ্রামের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য, বোধ করি, যদুবাবুর ন্যায় এদেশের আর কোন লোক এত মস্তিষ্ক চালনা করেন নাই। পৃথিবীতে বড় লোক কে? আমাদের মতে, যে গরিব দুঃখীর জন্য ভাবে ও খাটে। তুমি রাজা হও আর তুমি পণ্ডিত হও, দুঃখী দরিদ্রের জন্য যদি একবিন্দু অশ্রুপাতও না কর, তোমাকে দূর হইতে শত নমস্কার। যে দুঃখীর বন্ধু, যে বিপন্নের সহায়, সে নির্ধন ও অজ্ঞান হইলেও আমরা প্রকৃত বড়লোক বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে সর্ব্বদা লালায়িত। যদুবাবু একজন বঙ্গের প্রকৃত হৃদয়বান ব্যক্তি। তাঁহার শরীরপালন, তাঁহার ধাত্রীশিক্ষা এদেশের পল্লিতে পল্লিতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে, এই পল্লিগ্রাম

আরো যুগান্তর উপস্থিত করিবে। ইহাতে অনেক কাজের কথা প্রকৃত হৃদয়ের ভাষাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

৮। করঙ্ক বা প্রণয়ীর ভাগ্য।—ভগ্নতরী, আঁখিজল ইত্যাদি প্রণেতা প্রণীত, মূল্য ।০। এ পুস্তকে একটী সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। বেশী আড়ম্বর নাই, কেবল সুধীরেশচন্দ্রের বিফল স্বর্গীয় প্রণয় চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। পুস্তকখানি পড়িয়া খুব সুখী হইলাম।

৯। মুরলী।—সখা প্রেস হইতে প্রকাশিত। কয়েকটী চতুর্দ্দশপদী কবিতা ইহাতে আছে। অনেক গুলিতেই এখনকারমত অস্পষ্ট ভাবের আভাস পাওয়া যায়। গ্রন্থকার যদি একটু খোলা প্রাণ কাব্যে ঢালিতে পারেন, তবে বড় ভাল হয়।

১০। এটা কোন্ যুগ।—শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত, মূল্য ৵০। পুস্তকের নামেই বিষয় পরিব্যক্ত। গণেশ বাবুর চেষ্টা এবং যত্ন খুব আছে। ইহাতে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, সকলেরই চিন্তার বিষয়। কিন্তু যুগ নির্ণয়ে লাভালাভ কি, আমরা বুঝি না।

১১। সত্য-সঙ্গীত।—প্রথম খণ্ড, কমলাকান্ত ব্রহ্মদাস কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ।০। অনেকগুলি ভগবৎ বিষয়ক সঙ্গীত ইহাতে আছে। অনেকগুলিই সরল, অনেকগুলিই ভক্তিপূর্ণ। সাধকগণের পাঠ করা একান্ত উচিত।

১২। শৈব্যা।—শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর প্রণীত, মূল্য ৵০। শৈব্যা রাজা হরিশ্চন্দ্রের সহধর্ম্মিণী। এসম্বন্ধে আর অধিক লেখার প্রয়োজন নাই। শরৎবাবু পরিচিত লেখক, বিষয়ও পরিচিত। আমাদের বিবেচনায় আরো বিস্তৃতভাবে লিখিত হইলে ভাল হইত।

১৩। হিতকথা।—মূল্য ।৵০, রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। বঙ্গীয় বালক বালিকাদিগের পাঠার্থ। পুস্তকখানিতে কতকগুলি সুন্দর বিষয় সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। স্কুলপাঠ্যের উপযোগী হইয়াছে, কিন্তু মূল্য আর কিছু কম হইলে ভাল হয়।

১৪। নবতন্ত্র।—দীনসেবক প্রণীত, মূল্য ৵০। দাসাশ্রমের সাহায্যার্থ লিখিত। সুতরাং লেখকের সৎ ইচ্ছা পুস্তকের সহিত জগতে ব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কিছু আয় হইবে বলিয়া বোধ হয় না, কেননা, একপ পদ্যের আদর এদেশে নাই।

১৫। সরল পদ নির্ব্বাচন শিক্ষা।—শ্রীগণেশচন্দ্র লস্কর প্রণীত, মূল্য ।০। সরল ইংরাজী ব্যাকরণ শিক্ষা ইহার নাম দিলে ভাল হইত। ছাত্রদের কিছু কিছু উপকার হইবে, মনে হয়।

১৬। তীর্থযাত্রা।—রূপক-কাব্য, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে প্রণীত, মূল্য ॥০। অতি সরল পদ্যে কোন কোন ইংরাজি পুস্তকের ছায়াবলম্বনে ইহা লিখিত হইয়াছে। স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীদিগের পক্ষে খুব সুন্দর পুস্তক। পাঠ্যলিষ্ট ভুক্ত না হইলে, স্কুলের পারিতোষিকে সর্ব্বত্র এই নীতিপূর্ণ পুস্তক প্রদত্ত হয়, একান্ত বাঞ্ছনীয়।

১৭। অশ্রু।—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ৶০। দুঃখীর হৃদয় বেদনার কাহিনীর সমালোচনা করা উচিত নহে বলিয়া করিলাম না।

১৮। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মানবাত্মার স্বাধীনতা এবং এতদুভয়ের সামঞ্জস্য।—শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন প্রণীত; মূল্য ৶০। এই পুস্তকে ধর্ম্ম জিজ্ঞা-

সার একটী অতি জটিল প্রশ্ন মীমাংসার চেষ্টা করা হইয়াছে। কুঞ্জবাবুর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাইয়া আমরা বড়ই সুখী হইলাম, কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যাত মত খুব পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না।

১৯। আইন শিক্ষা।—ত্রয়োদশখানি নিত্য প্রয়োজনীয় আইনের স্থূল তাৎপর্য্য শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত, মূল্য ১।০। আইন শিক্ষার্থীদিগের পক্ষে এপুস্তকে খুব উপকার হইবে। ছাপা ইত্যাদি পরিপাটী।

২০। হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা।—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক আলবার্টহলে অভিব্যক্ত। দেবেন্দ্র বাবু এই বক্তৃতায় অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। এই বক্তৃতা নব্যভারতে মুদ্রিত করিবার জন্য আমরা জনৈক সদাশয় দেশানুরাগী মহৎ ব্যক্তির দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াছি। স্থানাভাব বশতঃ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিতেছি না বলিয়া দুঃখিত আছি। যদি ভবিষ্যতে স্থান পাই, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিব। এ পুস্তকের বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।

২১। গণিত-সোপান।—শ্রীযোগেশচন্দ্র সিংহ প্রণীত, মূল্য।৵০। ইহাতে অতি সুন্দর উপায়ে গণিত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। যোগেশবাবু একজন স্কুলের শিক্ষক, তিনি এ বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তি। তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে।

২২। বিধবার আশা।—বরাহনগর হিন্দু বিধবাশ্রমের জন্য লিখিত। এই পুস্তকে অতি সুন্দররূপে এই আশ্রমের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আশ্রমের প্রাণস্বরূপ। ইনি বাল্যকাল হইতে এ প্রদেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য; বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য খাটিতেছেন। এজন্য কত অর্থ তিনি ব্যয় করিয়াছেন, কত শরীরের রক্ত জল করিয়াছেন, কেহ তাহার ইতিহাস লেখে নাই; কিন্তু স্বদেশবাসীদিগের নিকট তৎপরিবর্ত্তে কেবল সর্ব্বজন সুলভ নিন্দা, ঘৃণা, নিরুৎসাহ পাইয়াছেন। ইংলণ্ড মহৎ ব্যক্তির মহত্ত্ব বুঝে, সুতরাং ইংলণ্ডের কতিপয় সদাশয় ব্যক্তি ইহার পৃষ্ঠপোষক। তাঁহাদের সহায়তায় এবং বিধাতার কৃপায়, এই বাঙ্গালা দেশে বিধবার উন্নতির এক কঠিন সমস্যা পূরণ করিতেছেন, এই একমাত্র ব্যক্তি—মহাত্মা শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কার্য্যক্ষেত্রে বঙ্গপ্রদেশ চিরনিদ্রিত, বক্তৃতাক্ষেত্রে বা ধর্ম্মসমাজে ভাবপ্রধান বাঙ্গালীর মত তেজীয়ানলোক আর কুত্রাপি দেখা যায় না। কথা অনেকেই বলে, কিন্তু কাজ করে, এ দেশের কই কোন্ লোক, আমরা জানি না। ব্রাহ্মসমাজ এক সময়ে এদেশের খুব সেবা করিয়াছিলেন, এখন ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তীব্র আলোচনার ফলে গত বৎসর হইতে কুষ্ঠাশ্রম, অনাথাশ্রম ও দাসাশ্রমের কথা শুনা যাইতেছে বটে, কিন্তু এ উৎসাহও কত দিন স্থায়ী হইবে, বিধাতাই জানেন। দেখিয়াছি—কত উৎসাহপূর্ণ প্রতিজ্ঞা অপ্রতিপালিত অবস্থায়ই নিবিয়া গিয়াছে! লোকেরা উৎসাহ দিতেছেন, ভালই, কিন্তু সেবাব্রতের অযথা প্রশংসা-লালসায় পাছে সর্ব্বনাশ ঘটে, আমাদের মনে এই আশঙ্কা হইতেছে। প্রশংসানিরপেক্ষভাবে চিরকাল সমানভাবে ব্রাহ্মসমাজের এক মহাবীর কাজ করিতেছেন, তিনি এই শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। কে তাঁহার সহায়? কে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে? লজ্জার কথা, এদেশের অতি অল্প লোক!! একাজে সেকাজে কত মহৎ-ব্যক্তি অকা-

তরে কত অর্থ ঢালিয়া দেয়, কিন্তু এই মহাত্মার দিকে ভ্রমেও কেহ তাকায় না? প্রকৃত ধার্ম্মিক, প্রকৃত বীর, প্রকৃত সৎ-কর্ম্মী, এইরূপে এদেশে উপেক্ষিত হইতেছেন। এ দুঃখ আমাদের রাখিবার ঠাঁই নাই। আমরা জানি না, ইহার ন্যায় আর দ্বিতীয় কর্ম্মী, দেশহিতৈষী ব্যক্তি এদেশে আছেন কি না? বিধাতা ইঁহার সহায় আছেন বলিয়া আজও ইনি কার্য্য করিতে পারিতেছেন, কিন্তু শরীর ভগ্ন হইয়াছে—আর কতদিন এরূপ পারিবেন? শুনিয়াছি, তাঁহার বরাহনগরের বাড়ী তিনি বিধবাশ্রমের জন্য উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, কে উদ্যোগী হইয়া তাহার বন্দোবস্ত করে? এমন সৎকাজ এরূপভাবে উপেক্ষিত হইতে দেখিলে কাহার না প্রাণে লাগে? কিন্তু হায়—আমরা বক্তৃতাবাগীশ—আমরা মৃত। বিধবার আশা পুস্তকখানি পড়িলে এই মহাত্মার যত্ন ও চেষ্টার কতক পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা যৎসামান্য। যে সাধু ইচ্ছা ইঁহার স্নায়ুতে স্নায়ুতে প্রবাহিত, আমরা জানি, তাহা কোন পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইবার নহে।

২৩। হ্যামলেট।—শ্রীললিতমোহন অধিকারী কর্ত্তৃক প্রণীত ও শ্রীহেমচন্দ্রনাথ বাগ্‌চি দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹।

গ্রন্থকার উৎসর্গ পত্রে লিখিয়াছেন:—
"পঙ্গুর যদ্যপি থাকে লঙ্ঘিবারে গিরি"।
বঙ্গ সাজে হ্যাম্‌লেট্ সাজাইতে পারি।"
তবে তিনি জানিয়া শুনিয়াও এরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে কেন মাতিলেন? সেক্সপীয়রের এরূপ দুর্দ্দশা দেখিলে চক্ষে জল আসে। গ্রন্থকারের ক্ষমতা সত্ত্বেও অনুবাদ আশানুরূপ হয় নাই। সেক্সপীয়রের অনুবাদ হইতে পারে না।

২৪। তরুবালা।—(মধুর রসাশ্রিত সামাজিক নাটক) ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত। কলিকাতা ৭৯ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে শ্রীঅমৃতলাল বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। তরুবালা একখানি ব্যঙ্গনাটক (Humourous play)। রোমাণ্টিক লভ্ ইহার ব্যঙ্গের বিষয়। অমৃত বাবুর মানব-চরিত্র বিশ্লেষণ ও ব্যঙ্গ করিবার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় আমরা "বিবাহবিভ্রাটে" বিশেষরূপে পাইয়াছি। কিন্তু এখানিতে পূর্ব্বাপর সমস্ত চিত্রগুলির সমতা রক্ষিত হয় নাই। তথাপি ইহাতে আমরা বিস্তর আমোদ পাইয়াছি। অমৃত বাবুর হাসাইবার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে "ভুল" (error) ব্যঙ্গের বিষয় না করিয়া folly ব্যঙ্গের বিষয় করাই ব্যঙ্গ কাব্যের উদ্দেশ্য। "অখিলের" ভুল হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সরলতা ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ ছিল। "হারাণের" প্রণয়বিকার বড়ই কৌতুকজনক—মোটামুটী "মধুর রস" ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

২৬। সুরাপান।—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা, বংশবাটী মাদক সেবন নিবারণী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। বক্তৃতা শুনিলে যেরূপ ভাব হয়, পাঠে তাহা উপলব্ধি করা অসম্ভব। তবে কাহারও কাহারও বক্তৃতা এত গভীর ভাব ও যুক্তিতে পরিপূর্ণ যে, সেগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পাঠ না করিলে তাহার মর্ম্মোদ্ধার করা কঠিন। "বার্কের" বক্তৃতাগুলি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। এখানি সেই জাতীয় নহে, যুক্তিগুলি সমস্তই পুরাতন এবং সামান্য। কিন্তু তাহা হইলেও এরূপ পুস্তক যতই প্রচার হয়, ততই মঙ্গল।

জীবাত্মার বিবর্ত্তনবাদ।

করুণাময় সর্ব্বশক্তিমান জ্ঞানস্বরূপ বিশ্বপতি কি আশ্চর্য্য, দুর্বোধ্য ও দুর্জ্ঞেয় কৌশলে এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার সৃষ্টির তত্ত্ব আলোচনা করিলে স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্য হইতে হয়। অধিক আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই এক একটী বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত। বিজ্ঞান, তাঁহার সৃষ্টিতত্ত্বের আবিষ্কার ও প্রয়োগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং তাঁহার কোন সৃষ্টিই বিজ্ঞানবিরোধী নহে। অর্থাৎ তাঁহারই নিয়মে তাঁহার সকল সৃষ্টি শাসিত। এই হেতু, আমরা, তাঁহার এক সৃষ্টি দেখিয়া, উক্ত জাতীয় অন্যান্য বিষয়ে অনুমান করিতে সমর্থ হই।

আমরা জড়জগতে দেখিতে পাই যে, এক শ্রেণীর পদার্থের অস্তিত্ব আছে, দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ আছে, কিন্তু বৃদ্ধি নাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর অস্তিত্ব আছে ও তাহারা বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় শ্রেণী অস্তিত্ব ও বৃদ্ধি সম্পন্ন ও ইতস্ততঃ গমনাগমন করে। চতুর্থ শ্রেণী অস্তিত্ব বৃদ্ধি, গতি, ও বোধ শক্তি সম্পন্ন। পঞ্চম শ্রেণীর এই কয়েকটী গুণের সহিত চিন্তা শক্তি আছে। ষষ্ঠ শ্রেণীর তৎসহকারে বাক্‌শক্তি, আধ্যাত্মিকতা ও দায়িত্ব জ্ঞান আছে। এত প্রভেদের মধ্যেও একতা, এত বৈচিত্র্যের মধ্যেও শৃঙ্খলা আছে। কেবল তাহাই নহে, নিম্ন শ্রেণী ধীরে ধীরে উচ্চ শ্রেণীতে গমন করিয়াছে। প্রথম শ্রেণীর পদার্থ মৃত্তিকা দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রধান উপাদান, এইরূপে উদ্ভিজ্জ জীবের প্রধান উপাদান, নিকৃষ্ট জীব উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট জীবের উপাদান, এবং ডার্বিনের মত সত্য হইলে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া উৎকৃষ্টতর জীবে পরিণত হয়। যদি বহির্জগতে সৃষ্টির মধ্যে এরূপ শৃঙ্খলা এবং সম্বন্ধ থাকে, তবে অন্তর্জগতে কি তাহার ব্যতিক্রম হইবে, দেখা যাউক।

সৃষ্টিতত্ত্ববিদেরা জানেন যে, মানব এক দিনে এ জগতে সৃষ্ট হয় নাই, এবং একেবারেই নূতন গঠিত হয় নাই, স্তরে স্তরে ক্রমোন্নতি দ্বারা মানবদেহ ও মানব মন গঠিত হইয়াছে এবং পৃথিবী সৃষ্টির কত লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে মানব আসিয়াছে, কে বলিবে? যদি তাহাই হইল, তবে মানবাত্মা কি কেবল নূতন আধ্যাত্মিক সৃষ্টি, পূর্ব্বে কিছুই ছিল না? একদিনে একবারে মানবাত্মা হইয়া উঠিল? কেহ কেহ বলিবেন, পরমেশ্বরের অনন্ত শক্তি, তিনি কি একবারে এক মানবাত্মা গঠনে অক্ষম? অক্ষম কি না, তাহা আমরা আলোচনা করিব না। কিন্তু তিনি কেন তাঁহার শৃঙ্খলা অতিক্রম করিবেন? তবে কি তাঁহার নিয়ম অপূর্ণ? কখনই নহে। যাহা কখনও করেন না, তাহা কি কেবল মানবাত্মার বেলাই করিবেন? এ কথা অগ্রাহ্য। মানব ও বানরের মনোবৃত্তি বিষয়ে এত সাদৃশ্য দেখা যায় যে, লোকে রহস্য করিয়া বলে যে, বানরেরা কেবল খাজানা দিবার ভয়েই কথা বলে না। কেবল বানরেরা কেন? আমরা অন্যান্য

জীব মধ্যেও বুদ্ধি ও উন্নত মনোবৃত্তির এরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হই যে, তাহাদিগকেও মানবের সহিত কোন কোন বিষয়ে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। কুকুরের প্রভুভক্তি, হস্তীর বুদ্ধি, সারস পক্ষীর পিতৃ মাতৃ ভক্তি ও অপত্য স্নেহ, অন্যান্য জীবগণের অপত্য বাৎসল্য কি মানবগণের সহিত উপমেয় নহে? কুকুরের ন্যায়পরতার এরূপ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, স্বীয় প্রভুরও অন্যায় কার্য্যের সহায়তা করে না, বরং প্রতিরোধই করিয়া থাকে। মহিষের যৌন-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে আশ্চর্য্য কিম্বদন্তী অবগত হওয়া যায়। হিংস্র জন্তুরাও সুপ্রবৃত্তির অস্পৃশ্য নহে, সিংহের কৃতজ্ঞতা, ব্যাঘ্র ও ভল্লুকের গর্ত্তে মানব শিশুর প্রতিপালন, প্রভৃতি বিষয়ে কতই না গল্প আমরা শুনিতে পাই। ইহা দ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি যে, ইতর প্রাণীর আত্মা কেবল মাধ্যাকর্ষণের ন্যায় শক্তিবিশেষ নহে, ইহা মানবাত্মার সদৃশ গুণে গঠিত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আবার বানরের উচ্চ শ্রেণীর জীব সিম্পাঞ্জি অপেক্ষা এস্কিমো জাতি অতি অল্পই শ্রেষ্ঠ। এস্কিমো হইতে গারো, সাঁওতাল, নিগ্রো প্রভৃতি উত্তরোত্তর উন্নত, সুতরাং এস্কিমোর আত্মা থাকিলে বানরের নাই কেন? পরন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, সভ্য নামে পরিচিত মানবের এত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, যাহা দেখিলে পশুরাও লজ্জিত হয়। তাহাদের যদি আত্মা থাকে, তবে পশুদের নাই কেন? যদি ঐ সকল নীচপ্রবৃত্তিপরায়ণ অঙ্গুন্নত মানবাত্মার অমরত্ব থাকে, তবে সিম্পাঞ্জির আত্মা অমর নহে কেন? সিম্পাঞ্জির আত্মা অমর হইলে অন্যান্য বানরের এবং বানরের আত্মা অমর হইলে অন্যান্য জীবের আত্মা কেন অমর নহে? সুতরাং আমার বিশ্বাস যে, ইতর জন্তুগণ মানবের ন্যায় অবস্থানুসারে উন্নত কি অবনত আত্মা সম্পন্ন, এবং প্রত্যেক জীবের আত্মাই ক্রমোন্নতি সহকারে কালে মানবাত্মায় পরিণত হইবে। হিন্দুরা বলিয়া থাকেন যে, আত্মা অশীতি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মানবাত্মায় পরিণত হয়। কিন্তু এ কথা লিখিতে সাহস হয় না। কারণ আমাদের মধ্যে এরূপ মহাত্মাও অনেক আছেন, যাঁহারা হিন্দুর বিপরীত মতই গ্রহণীয় মনে করেন, তাহার যুক্তিই যেন এই যে, তাহা হিন্দু শাস্ত্রের বিপরীত। এই শ্রেণীর জীবদিগকে যে আমি বুঝাইতে পারিব, এরূপ সাহস আমার নাই।

পুনর্জ্জন্মবাদের বিরোধীগণ যে সকল যুক্তি দেখাইয়া থাকেন, তন্মধ্যে স্মৃতির অভাবই প্রধান। অর্থাৎ যদি আমি পূর্ব্বজন্মে পশু ছিলাম, তবে সে কথা আমার স্মরণ নাই কেন? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে, মানবের ন্যায় নিৰ্ম্মল জ্ঞান পশুদের নাই। সুতরাং মানব যেমন আপনার অবস্থা উত্তমরূপে বুঝিতে পারে, পশুরা তদ্রূপ পারে না। সুতরাং পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি পরিষ্কার না হওয়াই সম্ভব। বিশেষতঃ স্মৃতি মস্তিষ্কের অংশবিশেষের গুণ, সুতরাং তাহা মস্তিষ্কের নাশের সহিত বিলুপ্ত হয়। কিন্তু মানবের পূর্ব্বজন্মের পশুত্বের কথা স্মরণ না থাকিলেও পাশব স্বভাব সে বিস্মৃত হয় না। পশুদের স্বাভাবিক জ্ঞান (instinct) মানবেও সংক্রামিত হইতে দেখা গিয়াছে। পশুরা চিন্তাশক্তি সম্পন্ন বলিয়া বিখ্যাত নহে।

সুতরাং পূর্ব্বজন্মের চিন্তা মানবের না আসাই সম্ভব। মানব যে সকল কার্য্য বিবেচনা না করিয়া অকস্মাৎ করিয়া থাকে, তাহাতে তাহার পাশব শক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। দৈনিক আচরণে কে না দেখিয়াছেন, কোন কোন মানব সিংহের ন্যায় তেজস্বী, কেহবা ব্যাঘ্রের ন্যায় হিংস্র, কেহ হস্তীর ন্যায় বলবান হইয়াও নিরীহ, কেহ কুকুরের ন্যায় প্রভুভক্ত, কেহ সারস পক্ষীর ন্যায় পিতৃ মাতৃ ভক্ত ইত্যাদি। মানব শিক্ষার বলে বা চরিত্র গঠনের চেষ্টায় কৃতকার্য্য হইতে পারে, কিন্তু এই পাশব ভাব তাহাকে পদে পদে ঘোর বিপদে ফেলে। এই পশু ভাবকে জয় করাতেই মানবের মনুষ্যত্ব। মানব-শিশু জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বেই রাগ দ্বেষাদির পরিচয় দিয়া থাকে। কে তাহাদিগকে তাহা শিখাইল? বরং মানব শিশু মানব মহত্ত্বের কোনও পরিচয়ই প্রথমে দেয় না। পশুত্বের পরিচয়ই অধিক দিয়া থাকে। ইহাতে এ অনুমান কি স্বভাবসিদ্ধ নহে যে, উক্তরূপ দ্বেষাদি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত?

পূর্ব্বজন্মে যদি মানব পশু ছিল, তবে অবশ্য এমন কোন পশু থাকিতে পারে, যাহারা মৃত্যুর পরেই মানব হইবে। যদি তাহা হয়, তবে মানব চরিত্র একই ছাঁচে ঢালা হইত। কিন্তু মানব চরিত্র তাহা নহে কেন? এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। তদুত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে, এই পুনর্জ্জন্ম যে কেবল এক জন্তু হইতেই হইবে, তাহার কোন কথা নাই। কেহ হস্তী জন্মের পর তবে মানব জন্ম প্রাপ্ত হয়, কেহ বানর জন্মের পরে, কেহ গো জন্মের পরে মানবত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং প্রত্যেকেই আপনাপন স্বাভাবিক গুণের পরিচয় দিয়া থাকে। একই পশুর মধ্যে কোনটা মানব জন্মে উন্নীত হয়, কোনটা অন্য জন্ম প্রাপ্ত হয়, এরূপ অসম্ভব নহে। পশুদের মধ্যেও চরিত্রগত উৎকর্ষ অপকর্ষ দেখা যায়। কোন গরুকে অন্য গো অপেক্ষা শান্ত ও নিরীহ দেখিতে পাওয়া যায়। কোনটা দুষ্ট ও রাগী। এইরূপ কোন কোন পশু সেই জাতীয় অন্য পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। সুতরাং সেই সকল উন্নত পশুই যে বিশ্বপতির নিয়মে উৎকৃষ্টতর জন্ম প্রাপ্ত হইবে, ইহা অসম্ভব নহে।

পুনর্জ্জন্ম-বিরোধীগণ পুনর্জ্জন্মবাদীদের একটী তর্কে হয় রবরাণ করিয়া উত্তর দিয়া থাকেন। প্রশ্নটী এই যে, মানব মধ্যে এত বিদ্যা বুদ্ধি ও চরিত্রগত পার্থক্য কোথা হইতে আসিল? জীবাত্মার বিবর্ত্তনবাদ মানিলে এ বিষয়ের উত্তরের জন্য কষ্ট পাইতে হয় না। কোন কোন ব্যক্তি বাস্তবিকই উন্নত মনীষা লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন, কেহ কেহ আবার অতি সামান্য বুদ্ধি বৃত্তির অধিকারী। তাহারা একরূপ শিক্ষার ও একরূপ পারিবারিক আদর্শের মধ্যে থাকিয়াও ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পরিচয় দিয়া থাকেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্টির সকল ভাই নেপোলিয়নের ন্যায় শক্তিশালী ছিলেন না, ওয়েলিংটনের ভ্রাতৃগণ সকলেই ওয়েলিংটন ছিলেন না। এরূপ দৃষ্টান্ত আরও শত শত দেখান যাইতে পারে।

এই জীবাত্মার বিবর্ত্তনবাদ ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী নহে। অথবা যাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহাই গ্রহণ

করিবেন, কারণ যাহা সত্য, তাহাই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম। ইহাতে ঈশ্বরের জ্ঞানের কি অন্য কোন স্বরূপের কোন অবজ্ঞা হয় না, বরং তাঁহার অদ্ভুত কৌশল ও অপার মহত্ত্ব প্রমাণ করে। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণ হয়, ভৌতিক জগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগতেরও কণামাত্রও অবিনশ্বর। ইহা আধ্যাত্মিক বিবর্ত্তনবাদ, অথচ মানবাত্মার অমরত্ব ও অনন্ত উন্নতির পথে বিঘ্ন নাই। মানবাত্মার কোন ক্ষমতারও খর্ব্বতা হয় না। অথচ সেই করুণাময় পিতার অপার কৌশল ও অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় দেয়। যিনি ধূলিকণা হইতে বটবৃক্ষ উৎপাদন করেন, যিনি অসৎ হইতে এই অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি যে পশু হইতে মানবকে সৃজন করেন না, বা করিতে পারেন না, এ কথা কেমন করিয়া বলিব। এতদিন মানব যাহাদিগকে ঘৃণা করিত, যাহাদিগকে পদদলিত করিত, আজ যদি সে জানে যে, এই পদার্থ হইতেই তাহার ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তি-সম্পন্ন জীব উৎপন্ন হয়, তবে সে কি উক্ত জন্তুদিগকে আর নিষ্ঠুরভাবে ব্যবহার করে? এতদ্দ্বারা সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব বর্দ্ধিত হয়। ভ্রাতৃভাব মানবের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ না থাকিয়া অসীম সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত হয়, এবং বিশ্বপতির সর্ব্বপিতৃত্ব ও অনন্ত শক্তি আরও উজ্জ্বলরূপে ঘোষিত হয়।

শ্রীপ্যারিশঙ্কর দাস গুপ্ত।

সহবাস-সম্মতি ও সমাজ। (৩)

এস্থলে প্রথমতঃ ইহাই দেখা আবশ্যক যে, এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচারের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না। বিচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সত্য নির্ণয়। যেখানে শাস্ত্রের সহায়তা ভিন্ন সত্য নির্দ্ধারণ সর্ব্বতোভাবে অসাধ্য, সেখানে শাস্ত্রই প্রকৃত অবলম্বন। কিন্তু এ পন্থা সর্ব্বত্র অনুসরণীয় নহে। প্রমাণ ত্রিবিধ; প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও উপমিতি। কিন্তু অনুমান প্রমাণও প্রত্যক্ষমূলক। পর্ব্বতে ধূম দৃষ্টে বহ্নির অনুমান করা যায়। কিন্তু যে কখনও অগ্নি প্রত্যক্ষ করে নাই, তাহার পক্ষে এ অনুমান অসিদ্ধ। সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণই সকল প্রমাণের মূল বলিতে হইবে। বস্তুতঃ যেখানে অগ্নি প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়, সেখানে ধূমের সত্তা না থাকিলেও অগ্নির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে না। সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞান (চাক্ষুষ, শ্রাবণ, ঘ্রাণজ, ত্বাচ, রাসন) সম্বন্ধে শাস্ত্রের সহায়তা নিষ্প্রয়োজন। নিম্ব তিক্ত কি মিষ্ট জানিতে হইলে উহা রসনায় আস্বাদন করা প্রয়োজন, না এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত কি, তাহাই দেখা কর্ত্তব্য? যাঁহারা শেষোক্ত মতাবলম্বী, তাঁহারাই সহবাস কাল নির্ণয় জন্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার অনুসরণ করেন। জিজ্ঞাসা করি, ইহাই যদি পাণ্ডিত্যের ফল হয়, তবে মূর্খতা আর কাহাকে বলে?

সর্ব্বজনপূজিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র এ সম্বন্ধে কি বলে, শুনুন;—

"যদি অপ্রাপ্ত পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুরুষ ঊনষোড়শ বর্ষ বয়স্কা বালাতে গর্ভাধান করে, তবে কুক্ষিস্থ অবস্থায় সে সন্তান নষ্ট হয়, অথবা ভূমিষ্ঠ হইলে অল্পকাল জীবিত

থাকে না, কিম্বা জীবিত থাকিলেও দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হয়।"
—সুশ্রুত।

"অর্থাৎ পূর্ণ ষোড়শ বর্ষা স্ত্রী পূর্ণ ত্রিংশ বর্ষ বয়স্কের সহিত সঙ্গতা হইলে যদি গর্ভাশয়, অপত্যমার্গ, রক্ত, বায়ু এবং হৃদয় পরিশুদ্ধ থাকে, তবে বীর্য্যবান্ পুত্রের জন্ম হইবে, ইহার ন্যূন বয়সে সন্তান হইলে অতিশয় রোগী হইবে।"—বাগ্‌ভট।

শারীরবিজ্ঞানবিদ্ প্রধান প্রধান ডাক্তারদিগের অভিমত এইরূপ।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ডন্‌কান বলেন,—
"বাল্যবিবাহে শারীরিক বিকাশ নষ্ট করে, স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং সাধারণতঃ প্রসূতির শরীর ভগ্ন হইয়া যায়। বাল্যবিবাহে উপযুক্ত কালের পূর্ব্বে প্রসব করিতে হয় বলিয়া প্রসব-যন্ত্রণা ও প্রসব কার্য্যের বিপদ বৃদ্ধি হয়।"

খ্যাতনামা ডাক্তার স্মিথ, এম-ডি, সাহেব বলেন,—
"ষোল বৎসরের পূর্ব্বে বালিকার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হয় না। গর্ভ ধারণ ও প্রসবের যন্ত্রসকল দৃঢ় ও ভালরূপ বিকশিত হয় না।"

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার আত্মারাম পাণ্ডুরং বলেন;—
"ঋতু হইলেই এরূপ মনে করা উচিত নহে যে, স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স হইয়াছে। যেহেতু উক্ত সময়ে গর্ভ ধারণ ও প্রসব যন্ত্রের ভাল বিকাশ হয় না।"

"বালিকাদিগের বিবাহের উপযুক্ত বয়স কি, এই প্রশ্নের উত্তরে নিঃসংশয়ে বলা যায়, ২০ বৎসর। এরূপ বলিবার শারীরতত্ত্ব বিষয়ক গুরুতর কারণ আছে। উক্ত বয়সে বিবাহ হইলে প্রসব যন্ত্রণায় মৃত্যুর সংখ্যা কমিয়া যায়।"

খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ও ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার, এম-ডি, মহাশয় বলেন,—
"স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলেই বুঝা যায় যে, তাহাদের যৌবন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ঋতুমতী হইলেই যে সুস্থ সন্তান প্রসব করিবার উপযোগিতা জন্মে, এরূপ মনে করা নিতান্ত ভ্রম।"

"অল্প বয়সে বিবাহের জন্যই স্ত্রীলোক নিতান্ত অল্প বয়সে ঋতুমতী হয়। যদি অল্প বয়সে বিবাহ উঠিয়া যায়, তাহা হইলে অল্প বয়সে ঋতুমতী হওয়াও উঠিয়া যাইবে।"

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার চার্লাস্, এম-ডি, বলেন,—
"বালিকা ঋতুমতী হইলেই যে তাহার বিবাহের বয়স হয়, এরূপ নহে। ঋতু হইলে কেবল এইমাত্র বুঝা যায় যে, তাহার যৌবন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত না তাহার শারীরিক যন্ত্র বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পরিণতি লাভ করে, সে পর্য্যন্ত সে যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না।"*

অপ্রাপ্তযৌবনা বালিকা অবৈধ সহবাসের ফলে জীবনে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এ সম্বন্ধে পরীক্ষিত দৃষ্টান্তও নিতান্ত বিরল নহে। আমাদের দেশের রমণীগণ "কুড়িতে হইলেই বুড়ী" হন। কুসুম-সুষমা-নিন্দিত ঢল ঢল লাবণ্য, কমনীয়তা ও সৌকুমার্য্য দেখিতে দেখিতেই বিশুষ্ক ও মলিন হইয়া যায়। এইরূপে স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদের শারীরিক ঈদৃশ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় যে, দেখিলে সহসা চিনিয়া উঠা যায় না। অকালগর্ভা এরূপ অনেক বালিকা আজ কাল প্রত্যক্ষ করা যায়, যাহাদের মুখাবয়ব ঠিক্ বালিকার ন্যায়, কিন্তু অন্যান্য অঙ্গের আকৃতিগত বৈলক্ষণ্যে চত্বারিংশৎ বর্ষীয়া প্রৌঢ়া বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ অকাল প্রসব হেতু স্ত্রীলোকের স্বাস্থ্য চিরজীবনের জন্য এরূপ নষ্ট হয় যে, তাহা আর পুনঃ সংস্কৃত হয় না। এবং যৌবনেই জরা আসিয়া দেহরাজ্য অধিকার করে। আজ কাল নানাবিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগে বঙ্গদেশীয়া রমণীগণ কিরূপ আক্রান্ত হইয়া থাকেন, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন। বস্তুতঃ

* বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদ। বাল্যবিবাহ বিষয়ে বক্তৃতা।

যে সমস্ত রোগের নাম গন্ধও এদেশে কস্মিন্ কালে শ্রুত হওয়া যায় নাই, অধুনা গ্রামে গ্রামে, পল্লিতে পল্লিতে, গৃহে গৃহে, সেই সমস্ত উৎকট রোগের বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া প্রাণ আতঙ্কে অধীর হয়। বস্তুতঃ অসাময়িক সহবাস ও অকাল প্রসব জন্যই যে এই সমস্ত রোগের এতাধিক বাহুল্য, শরীরতত্ত্ববিদ্ সুযোগ্য চিকিৎসকগণ তাহা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন।

প্রাণীজগতে জীব-সৃষ্টি প্রণালী অদ্ভুত রহস্যময়। প্রাচীন আয়ুর্ব্বিজ্ঞান-প্রণেতা মহর্ষিগণ সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক মীমাংসায় উপনীত হইয়া ইহার নিগূঢ় রহস্য উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। অজ্ঞমানব সেই সমস্ত শুভকর নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রতিনিয়ত তাহার ফলভোগ করিতেছে। বর্ত্তমান বঙ্গদেশবাসী এ বিষয়ের একমাত্র দৃষ্টান্ত স্থল। বিগত সার্দ্ধ শতাব্দীর সহিত বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিলে বাঙ্গালী জাতি যে বংশ পরম্পরা ক্রমে রুগ্ন, দুর্ব্বল, ক্ষীণকায় ও অল্পায়ু হইতেছে, এ সম্বন্ধে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই। ফলতঃ অপক্ব শুক্র শোণিতে উৎপাদিত সন্তান কদাপি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে না। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মূলধন ক্রমশঃ ব্যয়িত হইলে যেমন পরিশেষে তাহা একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়, আমাদের জাতীয় জীবনও সেইরূপ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। যে দেশে পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকাও দশম বর্ষ বয়স্ক বালকের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়, এবং অসময়ে স্বামীর ইন্দ্রিয়ানলে দেহ সমর্পণ করিয়া দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত না হইতেই প্রসূতির পদে পদার্পণ করে, সে দেশের লোক যে দিন দিন বালখিল্য জাতিতে পরিণত হইবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। এ দেশে এরূপ একটী প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যে, "কালে বেগুন গাছেও আকর্ষী দিয়া বেগুন পাড়িতে হইবে।" বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান অবস্থা যে তাহার পূর্ব্ব সূচনা মাত্র, ইহা বোধ হয়, তত্ত্বানুসন্ধায়ী ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন।

উদ্ভিজ্জ জগতেও এ বিষয়ের দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অঙ্কুরোৎপাদন সম্বন্ধে ভূমি, বীজ ও কালের উপযোগিতা আবশ্যক। হেমন্তে আশুধান্য, অথবা বর্ষারম্ভে মাষ বপন করিলে যেমন শস্য লাভের সম্ভাবনা থাকে না, উর্ব্বরক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ অঙ্কুর অথবা ঊষর ভূমিতে সুপক্ব বীজ রোপণ করিলেও তেমনি সতেজ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না। জায়ফল, লবঙ্গ, বেদানা, কিশ্‌মিশ্‌ ও জাফরাণ্‌ প্রভৃতি বৃক্ষ যে এদেশে একবারে উৎপন্ন না হয়, তাহা নহে, কিন্তু কোথাও তেমন মনোরম ফল পুষ্প প্রসবিণী হইতে দেখা যায় না। মালদহের আম্র ও শ্রীহট্টের কমলালেবু ভিন্নদেশে নীত হইলে তদুৎপন্ন বৃক্ষে যে ফল জন্মে, তাহাও তেমন সুমিষ্ট হয় না। ভূমির প্রকৃতিগত প্রভেদকেই অনেকে ইহার মূল কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, কিন্তু শুধু তাহাই নহে। সুপক্ব বীজের অভাবও ইহার অন্যতম কারণ বলিতে হইবে। কলমের চারার আম্র অধিকতর সুমিষ্ট হয়, ইহা কে না জানে? ভূমির অবস্থাগত প্রভেদ ইহার একমাত্র কারণ হইলে, এ স্থলে তাহার অন্যথা হওয়ার হেতু কি? বস্তুতঃ ভূমি ও বীজের উপযোগিতা অনুসারেই উদ্ভিদের প্রকৃতিগত প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি

অবস্থা ভেদেও যে গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, ইহাও সর্ব্বত্র পরিদৃশ্যমান। চারা গাছে যে শিমুল ফুল ফোটে, তাহার আয়তন ক্ষুদ্র এবং বর্ণও ঈষৎ গোলাপী আভাযুক্ত। কিন্তু বৃক্ষের পরিণত অবস্থায় যে পুষ্পোদ্গম হয়, তাহা রক্তজবা সদৃশ ঘোর লাল এবং আকারেও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। গোলাপ, বেলী, যূথিকা ও রজনীগন্ধ প্রভৃতি সুগন্ধি কুসুমেরও প্রথমাবস্থায় ততদূর সৌরভ থাকে না। কালে বৃক্ষ বল্লী সমূহ পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইলে পুষ্পগুলি অধিকতর সুশ্রী, সতেজ, লাবণ্যযুক্ত ও সুগন্ধবিশিষ্ট হয়। উদ্ভিদ্ রাজ্যে এইরূপ বয়ঃ কালাদি ভেদে পরিবর্ত্তন অহরহই সকলে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, সুতরাং সে সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

এ স্থলে এরূপ একটী অভিনব আপত্তি এই হইতে পারে যে, জীব-জগতে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যভিচার কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। [illegible] ও গর্ভ ধারণ ক্ষমতা জন্মিলেই প্রাকৃতিক অব্যর্থ নিয়মে স্ত্রী পুরুষ মিলিত হয়। কিন্তু শারীরিক সম্পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্ব্বে কাহাকেও অযথা প্রবৃত্তির বশীভূত হইতে দেখা যায় না। প্রাণী জগৎ সম্বন্ধে এ নিয়ম প্রকৃতি-সিদ্ধ। সুতরাং অকাল গর্ভ-ধারণ ও অসময়ে সন্তান উৎপাদন, ইহা কিরূপে স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে? এ যুক্তিটী আপাতত ন্যায়সঙ্গত বোধ হইলেও বাস্তবিক কতদূর বিজ্ঞান-বিরোধী, একটুকু অভিনিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলেই তাহা সহজে উপলব্ধি হইবে।

জড়জগতের নিয়মাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? মানব-জীবনে প্রয়োজন সাধনার্থ জগদীশ্বর নানা জাতি, উদ্ভিজ্জ, খনিজ, ধাতব ও পার্থিব পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে এমন একটী পদার্থও দৃষ্টিগোচর হয় না, যাহা কোন না কোন রূপে মানবের প্রয়োজন সাধনের উপযোগী নহে। সদ্য প্রাণনাশক উৎকট বিষও অবস্থাবিশেষে মৃত সঞ্জীবনীবৎ কার্য্য করে। কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় অবশ্য ব্যবহার্য্য অগ্নিও অযথা ব্যবহারে ভয়ানক অনিষ্টফল সমুৎপাদন করে। ভৌতিক পদার্থ সম্বন্ধে যেমন, মানবের প্রবৃত্তি সম্বন্ধেও ঠিক সেই অবস্থা। জগদীশ্বর মানবমনে যে সমস্ত প্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সমস্তই মঙ্গলের জন্য। কিন্তু তাহা যথাযথভাবে পরিচালনা করা অবশ্য মানবমাত্রেরই স্বেচ্ছাধীন। মানবজাতি জ্ঞানবলে দিন দিন উন্নত হইয়া প্রকৃতিকে আপনার আয়ত্তাধীন করিয়া লইতেছে। বস্তুতঃ প্রকৃতিই মানবের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। প্রাকৃতিক নিয়ম ভিন্ন ঐশ্বরিক বিধান আর কিছুই নহে। প্রকৃতি-গ্রন্থপাঠে বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গলময় আদেশ উপলব্ধি করিয়া, মানবজাতি স্বাস্থ্য, সুখ ও জীবনের উন্নতিপথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু পশু পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণী এই সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন হেতু দিন দিন হীন দশাগ্রস্ত ও অধঃপতিত। এমন অনেক পশু দেখা যায়, যাহাদের মধ্যে আদৌ শোণিত-সম্পর্ক বিচার নাই। অর্থাৎ মাতা, দুহিতা, ভগ্নী প্রভৃতিতেও তাহারা স্বচ্ছন্দভাবে উপগত হয়। এই শ্রেণীর জীব যে কাল-সহকারে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইবে, ইহা বিজ্ঞানের স্থিরতর সিদ্ধান্ত। কলিকাতা কৌতুকাগারে মহাকূর্ম্মের যে একটী বিশাল

কঙ্কাল পতিত রহিয়াছে, এই জাতীয় কূর্ম্ম আর এইক্ষণ কোথাও দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে যে সমস্ত পশু পক্ষ্যাদি বর্ত্তমান ছিল, প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, তাহাদের মধ্যে এইক্ষণ অনেকের বংশ লোপ হইয়াছে। কালে যে এইরূপ কতজাতি জীবের পদচিহ্ন ধরাধাম হইতে বিলুপ্ত হইবে, ভবিষ্যদ্দর্শী বিজ্ঞান তাহাও স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং পশ্বাদি জীব আদ্যঋতু অভিগামী বলিয়া যে মনুষ্যও এইরূপ পশুবৎ ব্যবহারে লিপ্ত হইবে, এ কথার কোন অর্থ নাই। ফলকথা, ইতর প্রাণীর দৃষ্টান্তে অবৈধ সহবাস-পরায়ণ হইলে, মানবজাতির পক্ষেও ঈদৃশ শোচনীয় পরিণাম অবশম্ভাবী।

যৌবন কালোচিত লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া আয়ুর্ব্বেদ-প্রণেতা মহর্ষিগণ বলিয়াছেন যে, "স্ত্রীলোকের অতি বাল্য দ্বাদশ বর্ষের পূর্ব্ব অর্থাৎ রজঃপ্রবৃত্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, তৎপরে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্ত বাল্য। * * * এই বাল্যেই যৌবনের সঞ্চার হইতে থাকে; এবং স্ত্রীলোকের ষোড়শ বর্ষের পর রজঃক্ষীণতা দূর হইয়া পূর্ণ যৌবন উপস্থিত হয়।" সুতরাং ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, রজঃযোগ যৌবনের প্রারম্ভ সূচক; কিন্তু গর্ভধারণের সম্ভাবিত কাল নহে। বালকের অঙ্গ সঞ্চালন ক্রিয়া অভ্যস্ত হইলেই কি তাহাকে কুঠার হস্তে বৃক্ষ ছেদন, অথবা পদ সঞ্চালন জন্য "ফুটবল" খেলায় নিয়োজিত করা উচিত? ইহাতে বরং চিরজীবনের জন্য তাহার বিকলাঙ্গ হইবার সম্ভাবনা। সহবাস-সম্মতি সম্বন্ধেও পুষ্পোদ্গমকাল নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। শারীরিক সম্পূর্ণতা প্রাপ্তির পূর্ব্বেই অনেক বালিকা অকালে গর্ভবতী হইয়া থাকে; তাহাদের পক্ষে প্রসব কার্য্য ভয়ানক বিপদজনক। স্বহস্তে স্ত্রী হত্যা ও সন্তান প্রসব জন্য প্রসূতি হত্যা, এতদুভয়ের মধ্যে কিছু ইতর বিশেষ নাই। উদ্বন্ধন মঞ্চে লম্বমান ব্যক্তির ন্যায় অকাল প্রসবা গর্ভিণী কিরূপ মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। শারীরিক যন্ত্রের উপযুক্ত বিকাশ অভাবে সহজ অবস্থায় তাহাদের প্রসব কার্য্য সমাধা হয় না। সুতরাং কঠিন অস্ত্র প্রয়োগে গর্ভস্থ সন্তান নিষ্কাশিত করিতে গিয়া, অনেক স্থলেই ভ্রূণহত্যা ও গর্ভিণী হত্যা এক সঙ্গেই সমাধা হইয়া থাকে। এই সমস্ত স্বতঃপ্রত্যক্ষ ঘটনা দৃষ্টেও যাহারা ঘৃণিত সামাজিক প্রথার পক্ষ সমর্থন করেন, তাঁহারা চক্ষু সত্ত্বে অন্ধ, সন্দেহ নাই।

অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকার পক্ষে স্বামী সহবাস কিরূপ ভীষণ ও রোমহর্ষণ ঘটনা, তাহা কল্পনা করিলেও হৃদয় স্তম্ভিত হয়। ভুক্তভোগী রমণীগণ যদি সেই সমস্ত ভীষণ কাহিনী সমাজের নিকট মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করে, তাহা হইলে বোধ হয় মৃতদেহে তাড়িৎ প্রবাহবৎ সমাজ-শরীর আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। উৎপীড়িতা বালিকাগণ অনেকে নানারূপ কুৎসিত রোগাক্রান্ত হইয়া চিরজীবনের জন্য শয্যাশায়ী হয়, কেহবা ক্ষত বিক্ষত দেহে ছিন্ন-কণ্ঠ কপোতীর ন্যায় ভীষণ যাতনায় ছটফট করিতে থাকে। আর কেহবা বাঙ্গালী জাতিকে অভিসম্পাত করিতে করিতে, ইহসংসার হইতে চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করে। হায়! নির্ম্মম কঠোর হৃদয়হীন সমাজ একবার

চক্ষু মেলিয়াও দেখে না। যাহারা মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে জানে না, স্বামীকৃত অত্যাচার নিবারণে যাহাদের কোনরূপ সামর্থ্য নাই, নীরবে অশ্রু বিসর্জন করাই যাহাদের একমাত্র সম্বল, তাহাদের প্রতি অত্যাচার করা ভয়ানক নৃশংস কার্য্য সন্দেহ নাই। ঐশ্বরিক নিয়মানুসারে সন্তান প্রসব করিতে গিয়া কর্কটীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়। কিন্তু স্বামীকৃত অবৈধ ব্যবহারে স্ত্রীজাতির জীবনান্ত হয়, এরূপ ঘৃণিত দৃষ্টান্ত ইতর প্রাণীর মধ্যেও কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তবে ইহা মনুষ্যোচিত কার্য্য বলিয়া কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? বস্তুতঃ ঈদৃশ অসভ্য, বর্ব্বরোচিত, পাশবিক প্রথাকেও যে অন্তরের সহিত ঘৃণা না করে, তেমন পাষণ্ড, কুলাঙ্গার, নরাধম কদাপি মনুষ্য নামের যোগ্য নহে।

শ্রীমহেশচন্দ্র সেন।

অতীত।

The thought of our past years in me doth breed
Perpetual benediction.—*Wordsworth*

১

মনে পড়ে, জীবনের প্রভাত-সময়,
এই সে পদার্থ সব,
অপার্থিব, অভিনব,
হেরি হেরি আঁখি ভরি ভুলিত হৃদয়,
এই সেই প্রাণ মন,
পুলকেতে অচেতন,
কি বিচিত্র কাহিনীতে হইত বিলয়।

২

শুনেছি শৈশবকালে কোকিলের গান,
দেখেছি সাঁজের বেলা
গীতিময়ী বীচি-খেলা,
হেরেছি তারকারাজি আকুল নয়ান,
সকল সৌন্দর্য্য-সার
শান্তি-সুধা জোছনার
হৃদয়েরও হৃদিমাঝে করিয়াছি পান।

৩

সবল জীবনে আমি দেখেছি সরল;
সরল শৈশব হৃদি
কিছু না বুঝিত যদি,
প্রাণ ভ'রে তবু ভালবাসিত কেবল;
কভু চাহি' শশধর
শূন্যে প্রসারিত কর,
কভু বা সন্তুষ্ট লভি তুচ্ছ ফুল ফল।

৪

হেরিলে ঊষার হাসি প্রভাত-গগনে,
জ্যোতির্ম্ময় রবি-ছবি
হেরিলে শৈশব-কবি,
কি জানি রে কি-যে তার ভাসিত নয়নে।
তাহারই পরশ পেতে
চাহিত ছুটিয়া যেতে,
চাহিত না পুন আর ফিরিতে ভবনে।

৫

আহা! শিশু প্রাণে সে কি আনন্দ আভাস,
শিশু হৃদে শিশু ভক্তি
আধ-আধ অভিব্যক্তি,
সন্ধ্যার অপরিস্ফুট কুসুমের হাস;—
যেমতি মেঘের গায়
অতি ক্ষীণ দেখা যায়
অগ্রগামী অরুণের লাবণ্য বিকাশ।

৬

ক্রমশঃ বাড়িয়া এল জীবনের বেলা,
বাল্যের রহস্য-চয়
যৌবনে পাইল লয়,
গাম্ভীর্য্যের অভিনয়ে হাস্যে অবহেলা;
শৈশব কাহিনী যত
সত্যে হ'ল উপহত,
প্রাণ-পথে আরম্ভিল দৃঢ়তর খেলা।

৭

বিচিত্র এ ভব-লীলা, বিচিত্র ধরণী,—
হাসিতে প্রাণের হাসি
দব অশ্রু নীরে ভাসি;
আনন্দ-উল্লাসে উঠে ক্রন্দনের ধ্বনি,—
বন্যা জল বরষায়
দুই দিনে ব'হে যায়,
শুষ্ক-ভূমে প'ড়ে থাকে সাধের তরণী।

৮

কত রত্ন ছিল মোর, হারাইনু হায়।
কত স্নেহ, কত গান
চিরতরে অবসান,
কত অমানিশা এল গ্রাসি' পূর্ণিমায়!
উন্মূল আশ্রয় তরু,
সংসার অসার মরু;
স্মৃতি শুধু কেঁদে কেঁদে যামিনী পোহায়।

৯

ছায়া মরীচিকা আজি রয়েছে জাগিয়া।—
শুষ্ক যেন ফুল-হার,
বিরহী সৌরভ তা'র
প্রেম ভরে চারি ধারে বেড়ায় কাঁদিয়া!
সৌন্দর্য্য-সলিলরাশি,
বহু দিন গেছে ভাসি,
ম্রিয়মান গতি-রেখা নীরবে পড়িয়া।

১০

কিন্তু ইথে এত সত্য আগে কে জানিত?
অশ্রুর অশনি-ঘায়
আত্ম বিশ্লেষণে, হায়,
বিশ্বের হৃদয় সাথে হ'নু পরিচিত;
ধ্বংস-জিহ্ব দাবানল
দগ্ধ করে বনস্থল,
উর্ব্বরতা মাত্র তাহে হয় বিবর্দ্ধিত।

১১

যদিও শৈশব স্বপ্ন হারা'য়ে যেগেছি,
তথাপি এ দগ্ধ মনে
জ্ঞানের উন্নতি সনে
অভিনব তত্ত্ব আজি খুঁজিয়া পেয়েছি;
ক্রন্দনেরও মাঝে থাকি,
সেই আশে লক্ষ্য রাখি,
তাই পুন আনন্দেতে ভাসিয়া চলেছি।

১২

বিপরীত, বিপরীত সৃষ্টির প্রকার।—
জন্ম-মৃত্যু, আশা-ভয়;
হাসি-রাশি, অশ্রুচয়,
নিদ্রা আর জাগরণ, আলো-অন্ধকার,—
অশুভ শুভের সনে
পরস্পর সঙ্ঘর্ষণে
অন্তহীন উন্নতির হ'তেছে বিস্তার।

১৩

অতি দূরে, দূরে সীমা র'য়েছে জাগিয়া,
উন্মত্ত ব্রহ্মাণ্ড তাই,
আশে পাশে দৃষ্টি নাই,
উল্লাসে অসীম বক্ষে নাচিয়া নাচিয়া,
অসীম সময় ধরে,
কোলে লয়ে চরাচরে,
সেই মহা লক্ষ্য পানে চলেছে ছুটিয়া।

১৪

এক দিন খুলে যাবে জ্ঞানের দুয়ার,
অনন্ত মূর্খতা মাঝে,
শত আশা সম্বরিয়ে,
সংশয়ে কাটাতে কাল হবে নাকি আর,

সময়ের আবর্ত্তনে
সর্ব্ব শুভ-সম্মিলনে,
পূর্ণতা উঠিবে জাগি, জীবন মাঝার।

১৫

তাই বলি, কবি, তোর নাই রে ভাবনা,
জানিস্ যতেক খেলা,
খেলে নে রে এই বেলা;
গান গা'রে যত প্রাণে জাগিছে বাসনা,
শান্ত করি চিন্তানল
উৎসাহে সমুখে চল্,
ভাবিলে কর্ত্তব্য কভু হ'বে না সাধনা।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু।

পুষ্পাঞ্জলি।

গঙ্গাজলে—আম্রবনে—পলাশী-প্রাঙ্গনে
বেঁধেছিলে সুর, কবি! যে দেব-বীণার,
তারি সে উদাত্ত নাদে "বঙ্গ-দরশনে'
হয়েছিল যুগব্যাপী অশনি-সঞ্চার।
ভুলে' চেয়ে—ভালবেসে'—কাঁদিয়া—জ্বলিয়া
বিকট তাড়িত-দাহে রমণী-মায়ার,
সাধিলে দীপক-রাগ কলিজা ছিঁড়িয়া,—
বাণী কুঞ্জ আজো লাল রুধিরে তোমার!
তোমারি স্বদেশী এবে ধরেছে ও' তান,
চিলাইর চিতা-বহ্নি উগারি ধারায়,—
আট বর্ষ ধরে' আজ গলায়ে পাষাণ,
"নব্যভারতে"র ভালে বাড়ব খেলায়।
কবি-কুঞ্জে এই দাব র'বে চিরদিন,
পূর্ব্ব-বাঙ্গালার কবি গোবিন্দ নবীন!

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

জাতীয় একতা।

পরস্পর পবিত্র ঐক্যবন্ধনের অভাবে ভারত বিজাতীয় শাসনে নিষ্পেষিত, এ কথার প্রকৃত হেতু সম্যক্ না বুঝিলেও, দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি হইতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। জগতের ইতিহাস উজ্জলচিত্রে ইহাই সপ্রমাণ করে যে, যে মুহূর্ত্তে আত্মস্বার্থের ঘৃণিত বাসনায় দেশের মেরুদণ্ড সদৃশ প্রধানগণ আপনাকে ভাসাইয়া দেন, সেই মুহূর্ত্তে রাজ্যের ভবিষ্য ভাগ্যগগন ঘোর তমোময় আকার ধারণ করে। প্রতীচ্য ভূখণ্ডের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার আবশ্যক নাই; স্বদেশেই, ভারতের পুণ্যক্ষেত্রেই এবম্বিধ নৈতিক অধঃপতনের জন্মভূমি। যে স্বার্থপরতা ও গৃহবিচ্ছেদের ঘোরতর পাপে ভারতের ভাগ্যলিপি এত অসম্ভব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, যাহার উন্নতির আশা আজ সুদূরপরাহত, যে আর্য্যবীরগণের মৃগেন্দ্র-শোভিত পতাকা একদিন ভারতভূমিতে দৃঢ় প্রোথিত হইয়াছিল, তখন কে ভাবিয়াছিল, সুদূর ম্লেচ্ছ রাজ্য হইতে এক অভিনব জাতি আর্য্য পতাকার নির্ম্মূল সাধন করিয়া সেই স্থানে ইস্লামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিবে? তখন কে মনে করিয়াছিল, পুণ্যতোয়া দৃষদ্বতীনীরে শেষ হিন্দু নৃপতি পৃথ্বিরাজের শোণিতপাতের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু স্বাধীনতার

গৌরব-রবি চিরদিনের তরে বিদায় গ্রহণ করিবে? যে চিতোর নগরী একদিন মহারথী বীরপুঙ্গবগণের উল্লাস উল্লম্ফনে ধ্বনিত হইত, একাধারে যে স্থল বীরত্বের সম্মাননা, আত্মসংযম শিক্ষার অদ্ভুত সাধনা, ও রমণীলাবণ্যের মধ্যেও অত্যাশ্চর্য্য কঠোরতার লীলাভূমি ছিল, তখন কে মনে করিয়াছিল, দস্যুপ্রধান আলাউদ্দীনের পৈশাচিক সাধনা একদিন ইহার রূপ-লাবণ্য, শোভা সৌন্দর্য্য ও বীরত্ব গৌরব-রাশিকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া ফেলিবে। তাই বলিতেছিলাম, যে মুহূর্ত্তে দেশের মেরু-দণ্ডকে নীতিবিহীনতা ও স্বার্থপরতার ভীষণাগ্নি স্পর্শ করে,সেই মুহূর্ত্তে তাহার মঙ্গলের আশা আর কদাপি থাকিতে পারে না। উপরোক্ত ঘটনাগুলি যদি ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, তবে প্রতিপন্ন হইবে, ইহার কোনটিই বিনাশের এ অবিসম্বাদিত কারণ-বহির্ভূত নহে।

পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের ভবিষ্যদ্বাণী ভারতক্ষেত্রে বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছে। হিন্দুস্থানের মানচিত্রে আজ সব লালে লাল। অসাধারণ প্রতিভাশালী, চতুর নৃপতি রণজিৎসিংহ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে গৃহ বিবাদরূপ ঘোরতর অগ্নি একদিন যুধিষ্ঠিরাদির ইন্দ্রপ্রস্থকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়া একমাত্র কালনেমির মহিমা ঘোষণা করিয়াছে, পঞ্জাব রাজ্যও একটিমাত্র জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সেই নীতিরই অনুসরণ করিবে। তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন, স্বার্থপরতা ও ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ ভারতবাসীর মজ্জাগত প্রকৃতি। ইহার পরিণামে পঞ্জাবের ঘোরতর অধঃপতন,মহাপুরুষ দিব্যচক্ষে তাহাও দেখিয়াছিলেন। তাঁহার অভাবে এমন চারিত্র্যবল কাহারও ছিল না, যাঁহার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া স্নেহ পঞ্জাবকে বিজাতীয় শক্তি সমূহের লোলুপ দৃষ্টি হইতে নিরাপদে রক্ষা করে। তাই তিনি হিন্দুস্থানের মানচিত্রে ব্রিটিশভারতের রাঙ্গা চিহ্ন দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"সব্‌লাল হো যায় গা।" বৃদ্ধের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাবের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্ত গমন করিলেন। অনৈক্যতার মহামন্ত্রে ভারতের গৌরব-প্রধান প্রবল শিখজাতির যতদূর অধঃপতন হইতে পারে, তাহা হইল। অসীম ক্ষমতাশালী স্বাধীন রাজার রাজপুত্র চিরজীবনের মত মাতৃভূমির নিকট বিদায় লইয়া দ্বীপান্তরিত হইলেন। এ অসম্ভব অধঃপতনের কারণ কি? 'জাতীয় প্রেমের অভাব' ইহার একমাত্র উত্তর। সের সিংহ প্রভৃতির ন্যায় সুসন্তানগণ অমানুষিক বীরত্বানুষ্ঠানে যে পথ পরিষ্কৃত করিয়া তুলিতেছিলেন, গোলাপসিংহ-প্রমুখ কুলাঙ্গার নারকীকুল আত্মস্বার্থের অলীক আশার মৃগতৃষ্ণিকায় মুগ্ধ হইয়া প্রাণপণ চেষ্টায় তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছিল। যে আলীবর্দ্দীখাঁর সুশাসনে একদিন বাঙ্গালায় অপার শান্তি বিরাজ করিত, বিজাতীয় শাসনেও যাঁহার অধীনে থাকিয়া বঙ্গবাসী অনেক স্বচ্ছন্দতা অনুভব করিত, একমাত্র সেই ব্যক্তির অভাবে বঙ্গে যে ষড়যন্ত্রের চক্র পরিচালিত হইয়াছিল, তাহার নিষ্পেষণে পতিত হইয়া তরুণ যুবা সিরাজ-উদ্দৌলার রাজ্যধন ও সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইল। যে চক্রের ভয়াবহ আবর্ত্তে পড়িয়া রাজ্যেশ্বরের মূল্যবান প্রাণ সংকটাপন্ন হইয়াছিল, তাহার মূল-কারণ, এই হতভাগ্য বাঙ্গালীজাতির

প্রভুদ্রোহিতা ও শৃগালধূর্ত্ততা। শতাব্দীর পর প্রকৃত সত্য-ইতিহাসের রহস্য সকল প্রকাশিত হইতেছে; বঙ্গেতিহাসে সিরাজের চরিত্র যেরূপ ঘৃণিত কালিমাময় রঞ্জিত হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান কালের অধিকাংশ শিক্ষিত জনগণ ঘোরতর সন্দিগ্ধ। রাজা অধিকাংশ স্থলে দেশীয় ব্যক্তিগণের ক্রীড়নক মাত্র। একথা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, বঙ্গে ব্রিটিসাধিকারের প্রাক্‌কালে তাৎকালিক জনগণের চরিত্র এতদূর অধঃপতিত হইয়াছিল যে, তাহারা পাপের নিকট পুণ্য, স্বাধীনতার নিকট পরাধীনতা, ভ্রাতৃ-সৌহার্দ্দের নিকট ভ্রাতৃদ্রোহিতা এবং পবিত্র একতারূপ প্রেমবন্ধনের নিকট পরস্পরের ঘোরতর অসূয়া বিক্রয় করিয়া অমানুষিকতার চূড়ান্ত অভিনয় করিয়াছিল। ইহাদেরই পাপাগ্নির সংস্পর্শে পতিত হইয়া হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলা ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইয়াছিল। প্রভুদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ড মীরজাফরালীখাঁর পাপানুষ্ঠান "ভারতে চির বিষাদরজনী" আবাহন করিয়া আনিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক গগনের দিকে একবার তাকাও। মোগলকুলপাংশন আলমগীর বাদসা যৎকালে তাঁহার বিশ্বগ্রাসী কুট রাজনৈতিক পতাকার মূলে সমগ্র ভারতীয় শক্তি সমূহকে একত্রিত করিতেছিলেন, সনাতন ধর্ম্ম, সনাতন আচার অনুষ্ঠানগুলিকে ছলে বলে ও প্রলোভনে যখন তিনি কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইতেছিলেন, এমন সময়, কি জানি কোন্ সাধারণ কলে, দক্ষিণ ভারতের পার্ব্বত্য কঙ্কণ প্রদেশে এক অমিত-তেজা মহা পরাক্রমশালী বীরপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, যাঁহার অমানুষিক বীরত্বাভিনয়ে একদিন দিল্লীর ময়ূর সিংহাসন টল্‌টলায়মান হইয়াছিল,—সর্ব্বগ্রাসী মোগল শাসননীতির কঠোর শৃঙ্খল-বন্ধন খণ্ড খণ্ড করিয়া যে সাধনা একদিন মহারাষ্ট্র প্রদেশে কিয়ৎকালের নিমিত্তও হিন্দু-বিজয়-পতাকা উড়াইয়াছিল, তখন অজানিত ভবিষ্যতের অন্ধকারময় যবনিকা উত্তোলন করিয়া কে একটিবারও ভাবিতে গিয়াছিল যে, এত অল্পকালের মধ্যেই প্রভুভক্তি বিস্মৃত হইয়া পেশোয়া বংশ শিবাজীর প্রাণ পোষিত আশালতাকে সমূলে উৎপাটিত করিবে। প্রভুদ্রোহিতারূপ ঘোরতর পাপাগ্নি দুরাচার দেশবৈরীদিগকে রাজ্যসুখ-ভোগ করিতে দিল না, ব্রিটেনিয়ার সন্তানকে রাজলক্ষ্মী আপন হস্তে রাজ্য ও ধন সম্পত্তির অধিকারী করিয়া দিলেন। প্রভুদ্রোহী কুলাঙ্গারগণের ইহাই উপযুক্ত পুরস্কার!

আমরা উপরে যে কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিলাম, তাহাতে সুস্পষ্ট অনুমিত হইতেছে যে, ভারতে সর্ব্বপ্রথম পরাধীনতার সূত্রপাত হয়, এই প্রকার চরিত্রহীনতার জন্য। স্বার্থপরতা এই চরিত্রহীনতারই অন্যতম পরিণাম, সুতরাং গৃহ বিবাদ প্রভৃতি ঘৃণিত দুরাচারিতাও ইহারই অনিবার্য্য ফলস্বরূপ। বীরক্ষেত্র ভারতে যে দিন এই চারিত্র্য-তেজের সম্মাননা হ্রাস পাইতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেই দিন হইতেই ভ্রাতৃবিচ্ছেদরূপ পাপ-অগ্নি ভারতক্ষেত্রে প্রধূমিত হইতেছিল। যে কুরুক্ষেত্রের মহা সমরাভিনয় একদিন ভারতবর্ষকে বীরশূন্য করিয়া ইহার ভবিষ্য চিত্রকে ঘোর তমসাবৃত করিয়াছিল, ন্যায়ের অনুসরণ করিলে বলিতে হয়, একপ্রাণতা ও ভ্রাতৃ-

প্রেমের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ। আজ বহুকাল আর্য্যভূমে বেদগানের অমৃতময় ঝঙ্কার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, জাতীয় একতার বিমোহন দৃশ্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, আর্য্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা প্রতিহত হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয়, শুভাদৃষ্টবশত ব্রিটিস্ অধিকার ভারতে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাই উনবিংশ শতাব্দীর অন্তিম কালে ভারতের অধিবাসী কিঞ্চিৎ পরিমাণে আপন দুরবস্থা, অভাব ও আবশ্যকতা বুঝিয়াছে। যে শরীর মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেও মৃতবৎ পড়িয়াছিল, আজ তাহাতে যেন একটু সজীবতার লক্ষণ দেখা দিয়াছে। যাহা বিকারগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা যেন কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। বাস্তবিক, ব্রিটিস শাসনের উনবিংশ শতাব্দী যে একটি উন্নতিশীল যুগ, তাহাতে আর সন্দেহ কি? পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইতিহাস শিক্ষার সুমহান্ ফললাভের সঙ্গে সঙ্গে এক বাক্যে ইহাও স্বীকার করিতে হইতেছে যে, বিলুপ্ত আর্য্যশাস্ত্র সকলের পুনরুদ্ধার সাধনে, আর্য্য-বিজ্ঞান দর্শনের আলোচনায় এবং সনাতন ধর্ম্মের সংস্কার কামনায় দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত জনগণ ব্যগ্র হইয়াছেন। দেশের যে কতদূর অধঃপাত হইয়াছে, অন্ততঃ মনে মনেও ভারতবাসী আজ তাহার কতকটা বুঝিয়াছে। যে জাতি কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেও রাজা ও প্রজা পরস্পরে খাদ্যখাদক সম্বন্ধ বলিয়া মনে করিত, আজ সেই জাতি আপনাপন জাতীয় স্বত্ব বুঝিয়াছে,—প্রজাসাধারণ, তাহাদিগের প্রাপ্য রাজার নিকট প্রকৃত বিবেচকের ন্যায় প্রার্থনা করিতেছে। তাই আজ ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় একত্রে সমবেত হইয়া Constitutional agitation এর তুমুল আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছে। যে জাতি বহুকাল জাতীয় দর্শন বিজ্ঞান ভুলিয়া একমাত্র বিজাতীয় সেবায় দেহ মন সমর্পণ করিয়াছিল, আজ সেই জাতির গৌরব কেশবচন্দ্র ও রামমোহন ধর্ম্মজগতে, সুদূর ইউরোপ খণ্ডেও, বিস্ময়ের আবির্ভাব করাইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ও লালমোহন ঘোষের রাজনৈতিক হুঙ্কারে ইংলণ্ডীয় পার্লামেণ্ট ধ্বনিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে সংবাদ পাইতে হইলে পূর্ব্বে যেরূপ আয়োজন করিতে হইত, সেখানে নব্যভারতের আলোক ও শিক্ষায় সুদূর পশ্চিম মুলতান হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত তাড়িৎবেগে সকল বিভিন্ন জাতির পারস্পরিক একতা-বন্ধন একতারে গ্রথিত হইতেছে। বোম্বাইবাসী ও বাঙ্গালী, মান্দ্রাজী ও মহারাষ্ট্রীয়, মুসলমান ও রাজপুত, তামিল ও তেলিগু জাতি নির্ব্বিশেষে বর্ণভেদ ভুলিয়া গিয়া এক রাজনৈতিক পতাকার মূলে সমবেত হইয়া অপূর্ব্ব ও অভিনব দৃশ্যের অভিনয় করিতেছে, এ হৃদয়োন্মাদকারী দৃশ্যও দেখিয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা অন্তর্নিহিত ভাবে থাকিয়া ধীর গতিতে ভারতীয় জনগণের হৃদয়ে আপনাপন অধিকার প্রাপ্তির আশা করিবার উপযুক্ত করিয়া তুলিতেছে। ইহা ভারতের চিরাগত পৌরাণিক শিক্ষার ফল নহে; ইংরাজী শিক্ষাই ইহার একমাত্র ফল। ভারতের প্রজাবৃন্দ যদি তাহাদিগের রাজনৈতিক প্রাপ্যাধিকারের জন্য সকরুণ চিৎকারও প্রকাশ করে, তাহা ত্রিংশৎ কোটী ব্যক্তির একীভূত দুঃখ চীৎকার শূন্যে বিলীন হয় না, তাহা ধরণীর কোনা-

হলই উত্থিত করে। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তজ্জন্য কদাপি স্তায়তঃ বিরক্ত হইতে পারেন না, যে হেতু তাঁহাদিগের শিক্ষাই আমাদিগকে রাজসিংহাসনের নিকট আপন দুঃখ ও অভাব বার্ত্তা জানাইতে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করিয়াছে।

জাতীয় মহাসমিতি (The National Congress) আমাদের দেশের যে এক নূতন দৃশ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এমন সুবিমোহন দৃশ্যও বুঝিবা ভারতে আর কেহ কোন দিন দেখে নাই। এই মহাসমিতি দ্বারা আমাদের দেশের কতটা উপকার হইবে, সে কথায় যদিও নানা মুনির নানা মত, তথাপি নিঃসন্দেহে ইহা বলা যাইতে পারে, জাতীয় একতা বন্ধনের যে ইহা পূর্ব্বাভাস, তৎপক্ষে সন্দেহ মাত্র নাই। ভারতীয় নানাজাতি সমূহ এক স্থানে সমবেত হইয়া কয়েক দিন পর্য্যন্ত যে আপনাপন প্রাণের কথা পরস্পরের নিকট আদান প্রদান করিয়া থাকেন, কংগ্রেসের অন্যান্য উদ্দেশ্যের সফলতা হউক আর নাই হউক, ইহাদ্বারা ভারতীয় জনগণকে যে ক্রমেই পবিত্র ঐক্যতার প্রেম-রজ্জুতে বান্ধিয়া না ফেলিবে, তাহা কে বলিতে পারে? এই অংশে আমরা জাতীয় মহাসমিতিকে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়া থাকি ও প্রাণের সহিত ইহার স্থায়িত্ব কামনা করি। কিন্তু আমরা অনেক দিন হইতেই জাতীয় মহাসমিতির হিতাকাঙ্ক্ষী ভাবে বলিয়া আসিতেছি, ইহাদ্বারা যাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে দেশ উন্নত হইতে পারে; এখনও সেরূপ কোন চেষ্টা হইতেছে না। ভারতের শিক্ষিত জনগণ সকলে একত্রিত হইয়াছেন, সুখের বিষয়; কিন্তু এই বিরাট একতারূপ সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারা দেশের দুঃখ ও দারিদ্র্যতার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করুন। কংগ্রেস হইতে প্রস্তাব হইতেছে, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যাহাতে ভারতীয় প্রজাগণ সদস্য-নিয়োগের অধিকার পায়, তাহার জন্য রাজার নিকট প্রার্থনা কর; সিবিল-সার্ব্বিস্ পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করিয়া ভারতবাসী ইংরাজ জাতির সহিত যাহাতে সমানে বসিতে পায়, তাহা কর, কিন্তু আমরা বলিতেছি, স্বদেশহিতৈষী ভ্রাতৃগণ, এই যে চক্ষুর সম্মুখে ভারতের অসংখ্য গরীব কৃষককুল দুর্ভিক্ষের নিদারুণ অত্যাচার সহ্য করিয়া অন্নাভাবে মরিতেছে, এ ভয়ঙ্কর ব্যাপারের কথা কি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সমবেত স্থলে একবার ভাবিয়া থাকেন? অন্নাভাবে প্রপীড়িত হইয়া ইহারা গভর্ণমেণ্টের নিকট ভিক্ষা চাহিতেছে, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট ইহার কি করিবেন? চক্ষুর সম্মুখে ঐ যে মধ্যবিৎ গৃহস্থের সন্তানগণ অভাবের দারুণ কশাঘাতে ব্যথিত হইয়া আপনাপন ভদ্রতার আবরণ কোনও উপায়ে রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে না, সে কথা কয়জন ভাবিয়া থাকেন? ইহার উপায় কি? কি করিলে এ সকল দুর্দ্দশা নিবারণ হইতে পারে, ইহার আলোচনাই বা কয়দিন হইয়া থাকে? এই যে অন্নাভাব, অত্যাচার, দারিদ্র্য, চরিত্রহীনতা ভীষণ ব্যাদানে সকলকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে, ইহার একটা পরামর্শ কোথায়? বলিতে বড় দুঃখ হয়, আজ বঙ্গদেশের, অথবা সমগ্র ভারতের ধনীগণ বিলাস-শয্যায় নিদ্রাভিভূত থাকিয়া দরিদ্রের

দুঃখগীতি শুনিতে পাইতেছেন না। 'রাজা' 'রায়বাহাদুর' উপাধি লইয়া গভর্ণমেণ্টের খয়ের খাঁ হইতে অনেকেই উৎসুক, কিন্তু হায়! প্রকৃত স্বদেশের উন্নতির জন্য আপন স্বার্থ ত্যাগ করিতেছেন, এমন মহৎব্যক্তি এ দগ্ধ দেশে কয়জন? ঘটিরাম ডিপুটী বাড়ীতে আসিলে বাঙ্গালার জমিদার হাকিম সেবায় দেহ মন চরিতার্থ করিয়া কৃতার্থ, কিন্তু অনাথিনী একমুষ্টি অন্নের প্রার্থী হইলে দ্বারোয়ানের প্রতি অর্দ্ধচন্দ্রের আজ্ঞা! বলিতে লজ্জা করে, লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ইন্দ্রিয় সেবার পরিচর্য্যায় এই ক্ষুদ্র বঙ্গদেশের অনেক ধনীর ঘরে জলস্রোতের মত ব্যয়িত হইতেছে, কিন্তু দুস্থ কৃষাণের কথা কেহ একটিবার ভাবে না। দুর্ভিক্ষের ভীষণ আগুনে দগ্ধ হইয়া দেশের মানুষ চোর ডাকাত হইতেছে, আর ধনীপুঙ্গবগণ ভাবিতেছেন, ঐ কংগ্রেস্-ওয়ালারাই ভারত উদ্ধার আস্তে আস্তে করিবে! জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনার অভিজ্ঞতা এ কথা নিশ্চিত বলিবে, যতদিন ভারতে বহির্বাণিজ্যের অন্তরায় আছে, যতদিন দেশে নীতিবিহীন শিক্ষার প্রাধান্য আছে, ততদিন ভারতের কংগ্রেস্ যদি আরও সহস্রগুণে শক্তি সঞ্চয় করে, তথাপি ইহার উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত। দেশীয় তন্তুবায় শিল্পীর সৌকর্য্যার্থ, ব্যবসা বাণি জ্যের উন্নতির জন্য যতদিন না দেশের ধনীলোক অম্লান-বদনে কোটী মুদ্রা প্রদান করিবে, ততদিন দেশের আশা ভরসার মোহিনী কল্পনা অজানিত ভবিষ্যতের ঘোর অন্ধকারে লুক্কায়িত। ততদিন ভারত "যে তিমিরে সে তিমিরে" থাকিবেই থাকিবে। আধুনিক সভ্যতার পর কিরণ যে জাপান বাসীর দেশে আজ তীব্র আলোক বিস্তার করিয়াছে, বড় অধিক দিনের কথা নয়, সে জাতি অজ্ঞান ও অসভ্যতার ঘোরান্ধকারে নিবদ্ধ ছিল। শতাব্দী পূর্ব্বে কল্পনার স্বপ্নময় চিত্রেও কেহ এ কথা ভাবিতে পারে নাই যে, কালে ইহারাই এক দিন য়ুরোপীয় শক্তি সমূহের সহিত সাহিত্য ও বিজ্ঞানে, বাণিজ্য ও ব্যবসায়, চরিত্র বলে অথবা সামরিক অভিনয়ে সমকক্ষতা প্রকাশ করিয়া ইদানীন্তন সভ্য জগৎকে চমৎকৃত করিবে! কি অগ্নিময় প্রতিজ্ঞার সঞ্জীবনী বলে একদিন জাপানের ধনীগণ আপনাপন সঞ্চিত সর্ব্বস্ব স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। মনুষ্যত্ব মানুষের এইখানে। ইহাঁরাই বুঝিয়াছিলেন, রাশীকৃত মুদ্রাস্তূপের উপরে বসিয়া থাকিলে দেশের সমষ্টীকৃত দুঃখভোগ গৌণকারণে তাঁহাকেও ভুগিতে হইবে; তাই একদিনে সাম্যের বিজয়ভেরী বাজিয়া উঠিয়া জাপানের লুক্কায়িত রাজলক্ষ্মীকে মুহূর্ত্তে আবাহন করিয়া আনিয়াছিল। কবে আমাদের ভাগ্যে সেই দিন, যথার্থ আসিবে, যে দিন ভারতের অধিবাসী জাতি নির্ব্বিশেষে, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল কথা ভুলিয়া গিয়া সকলেই সকলকার জন্য চিন্তা করিবে। দেশের ধনী সন্তানগণ আপনাপন চরিত্রকে নির্ম্মল করিয়া স্বদেশের জন্য সকল বিলাস বাসনায় জলাঞ্জলি দিতে শিখিবেন! ভারতের মন্দভাগ্যে কবে সেই দিন আসিবে!

সাধারণ জনগণ দেশের অস্থি, মজ্জা ও প্রাণ। আজ ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ, কি কারণেই বা দুর্ভিক্ষ, দুরাচারিতা ও অভাবের তীব্র দাহ মুহুর্মুহু ভারতকে দগ্ধ

করিতেছে, যদি প্রণিধান করিয়া এ সকল বিষয় দেখা যায়, তবে নিশ্চয় বুঝা যাইবে, দেশের পনের আনা লোক এ সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ। সাধারণে শিক্ষা বিস্তার আজও আশানুরূপ হয় নাই। যে সকল বিষয় লইয়া আলোচনা ও আন্দোলন হইয়া থাকে, ইহাদিগের সহিত তাহার কিছুমাত্র সংশ্রব নাই। সুতরাং দেশীয় কোন বিষয়ের কোন আলোচনায় অথবা পরামর্শে ইহাদিগের মতামত লইবার আবশ্যকতা থাকে না। অল্পজ্ঞ আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না, ভারতের পনের আনা লোককে বাদ দিয়া কি প্রকারে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবেন। ইহাদের সহিত হৃদয়ের একতা বন্ধনই বা কোথা হইতে হইবে? জাতীয় মহাসমিতি যদ্যপি ধনী ও দরিদ্র, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই উভয়ে ভেদবুদ্ধি করিয়া থাকেন, তবে আশা ফলবতী হইবে না। আমাদের জাতীয় মহাসমিতি স্বজাতি বিজাতি বিস্মৃত হইয়া, ধনী দরিদ্র ভুলিয়া গিয়া সমগ্র স্বদেশকে প্রেম ও প্রীতিবন্ধন দ্বারা একীকৃত করুন, দারিদ্র্য পীড়িত ভারতবাসীর অন্নাভাব মোচনের উপায় উদ্ভাবন করুন, ভারতীয় শিল্প বিজ্ঞানের উন্নতি বিধানে বদ্ধপরিকর হউন, নিরর্থক সিবিলসার্ব্বিস্ পরীক্ষার প্রতিযোগিতা দেখাইতে না গিয়া সুদূর ইউরোপ ভূমি হইতে কৃষিবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রস্তুত প্রণালীর অভিজ্ঞতা লইয়া আসিয়া ভারতের যুবকগণ স্বদেশে তাহারই সাধনা করিতে থাকুন, দেশীয় ধনীগণ এই সকল যুবকগণের কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দিন, সকলে তাহা হইলে বিস্ময়নয়নে দেখিতে পাইবে, ভারতের জাতীয় মহাসমিতি সহস্র চীৎকারেও যাহা করিতে পারে নাই, নীরবে তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। পুনরায় যাহাতে ভারতীয় যুবকগণ চরিত্রতেজে পৃথিবীর দৃষ্টান্তস্থল হইতে পারে, তাহার কামনা হউক, বর্ত্তমান ঈশ্বরবিহীন বিদ্যাশিক্ষা পদ্ধতির সংস্কার হউক, আমাদের প্রত্যেক অনুষ্ঠান ভগবানে সমর্পিত হউক। নাস্তিক ও অবিশ্বাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ভারতের বক্ষে আর পূতিগন্ধ বাড়াইয়া কাজ নাই। যে পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্য চটকে আমরা ভুলিয়াছি, আজ য়ুরোপীয় চিন্তাশীল ও চরিত্রবান জনগণ আপন সমাজের অভ্যন্তরে তাহারই ঘৃণিত ফলভোগে ব্যথিত বেদনা জানাইতেছেন। জাতীয় মহাপতন নাস্তিকতার অবশ্যম্ভাবী পরিণামফল, জানিয়া শুনিয়াই জর্ম্মান সম্রাট, বিদ্যালয়ের ঈশ্বর বিহীন শিক্ষা সংস্কারে এত ব্যাকুল হইয়াছেন। তাই বলিতেছি, আমাদের দেশহিতৈষীগণ, আমাদের জাতীয় মহাসমিতি, সকল প্রকার বাহ্যচটক ভুলিয়া অবহিতচিত্তে আজিকার মতন দিনে একবার ইহাই ভাবিতে থাকুন।

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

তত্ত্ববিচার ও অদ্বৈত মীমাংসা।*

প্রথম অধ্যায়।

আত্ম-তত্ত্ব।

আমি কি পদার্থ, ইহা জানিবার জন্য অনেকে সমুৎসুক। কিন্তু ইহা শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ের ন্যায় জানা যায় না। কারণ, আমি যাহা জানি তাহা আমি নহি, তাহার বিজ্ঞাতা আমি। বিজ্ঞাতা পদার্থকে আর কি দিয়া জানিবে? (বিজ্ঞাতারং তং কেন বিজানীয়াৎ)। আমার জিহ্বা নাই, এ কথা বলা যেমন কৌতুকাবহ, আমাকে আমি জানি না, ইহাও তদ্রূপ। কারণ যাহা জানিতে চাই, তাহা আমি নিজে। যাহা জানা যায়, তাহা আমি নই।

আমি বিজ্ঞাতা এবং আমি যাহা জানিতেছি, তাহা বিজ্ঞেয়। আমি জানিতেছি, সুতরাং আমি আছি, এই সিদ্ধান্ত ও স্বরূপ অস্তিত্ব জ্ঞান ব্যতীত আমি সম্বন্ধে অপর জ্ঞান হইতে পারে না।

উল্লিখিত বিষয়ের মর্ম্মাবধারণ করিতে পারিলে আত্মজ্ঞানের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃত 'আত্মজ্ঞান লাভ সাধনসাপেক্ষ। নিষ্পাপ জনগণ তত্ত্ববিচার' দ্বারা আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া অনাময় পদ প্রাপ্ত হন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জগৎ-তত্ত্ব।

এখন দেখা যাউক, বিজ্ঞেয় পদার্থ কিরূপে জ্ঞানগোচর হয়। বিজ্ঞেয় পদার্থ পঞ্চবিধ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। আমি একটি বৃক্ষ দেখিতেছি। সাধারণ বিশ্বাস এই যে, বৃক্ষ হইতে আলোক আসিয়া চক্ষুতে প্রতিফলিত হইতেছে ও শিরায় এক প্রকার অবস্থা উৎপাদন করিতেছে। সেই অবস্থার উপস্থিতি বশতঃ মস্তিষ্কে বৃক্ষের রূপ জ্ঞান হইতেছে। এবিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি শিরার অবস্থা বিশেষ মস্তিষ্কে উপনীত হয়, তবে শিরার বা তজ্জনিত মস্তিষ্কের অবস্থারই জ্ঞান জন্মিবে; বৃক্ষজ্ঞান জন্মিবার কোন কারণ দেখা যায় না। রূপ জ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণ মত যেরূপ অযৌক্তিক, শব্দ স্পর্শ রস ও গন্ধ সম্বলিতও তদ্রূপ। তবে একথা স্বীকার্য্য যে, যখন চক্ষু প্রকাশ না করিলে রূপজ্ঞান হয় না, তখন চক্ষুরুন্মীলনের সহিত রূপ জ্ঞানের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু তাই বলিয়া চক্ষুর উপর আলোক পড়িয়া যে বাহিরের জ্ঞান উৎপাদন করে, এই কল্পনা আমরা যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ ব্যতীত প্রকৃত মনে করিতে পারি না।

যখন বৃক্ষজ্ঞান উদিত হয়, তখন অন্য কোন জ্ঞান থাকে না। অহংজ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া যায়। এইরূপ ঘটজ্ঞানের সময়ও ঘটজ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞান

---

* অহং ইত্যাকার চিত্তবৃত্তি, এই প্রবন্ধের অহং শব্দের বাচ্য নহে। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় অহংবৃত্তির দ্রষ্টা বা উপাদান যিনি, তিনিই অহংশব্দ দ্বারা এই প্রবন্ধে লক্ষিত হইয়াছেন। পাঠকমহাশয় এই কথাটি বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবেন।

থাকে না। জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানোদয়ের সময় আমার অস্তিত্ব ছিল কি না? যদি বল ছিল না, তবে ঘটনাদি জ্ঞানের পর, আমি ঘট দেখিয়াছি, আমি পট দেখিয়াছি, ইত্যাকার জ্ঞানোদয় হইত না। অথচ ঘটপটাদি জ্ঞানের সময় "অহং" ইত্যাকার জ্ঞান যে অনুভূত হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। এই বিরুদ্ধ বিষয়ের মীমাংসা এই যে, আমিই অর্থাৎ অহং শব্দ লক্ষিত পদার্থই ঘটপটাদিরূপে পরিণত হইতেছি। মদতিরিক্ত অন্য বস্তু নাই। যেরূপ সমুদ্র মধ্যে তরঙ্গ উত্থিত হয়, সেইরূপ আমার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানোদয় হইতেছে।

ঘট পটাদির ন্যায় শরীরটিও আমার একটি জ্ঞান বিশেষ, অর্থাৎ আমি যেরূপ ঘটপটাদিরূপে পরিণত হইতেছি, সেইরূপ শরীরও আমারই বিবর্ত্তমাত্র। অতএব আমি যে কোন শরীর বিশেষে নিবদ্ধ আছি, এমত নহে।

বাস্তবিক আমি সকল পদার্থের উপাদান। যাহাকে আমরা বস্তু বা পদার্থ বলি, তাহা অহং পদার্থের পরিণতি।* স্বর্ণ নির্ম্মিত কবচকুণ্ডলাদিতে স্বর্ণ যেরূপ অধিকৃত ও সাধারণভাবে বিদ্যমান থাকে, জ্ঞেয় পদার্থ মাত্রেই জ্ঞান সেইরূপ বিদ্যমান আছে। ঘটজ্ঞানও জ্ঞান, পটজ্ঞানও জ্ঞান। বস্তুমাত্রই জ্ঞান বিশেষ মাত্র। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সকল বস্তুরই উপাদান অহং পদার্থ, এখন বলিতেছি যে, জ্ঞানই সকল বস্তুর উপাদান, ইহার মীমাংসা এই যে, আমিই জ্ঞানস্বরূপ। কারণ, জ্ঞান পদার্থ হয় জ্ঞাতা, নয় জ্ঞেয় (জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ব্যতীত অন্য প্রকার পদার্থই নাই)। জ্ঞাতা হইলেও অহং পদার্থ, জ্ঞেয় হইলেও অহং পদার্থের পরিণতি বলিয়া উহা হইতে ভিন্ন নহে। সুতরাং অহং পদার্থই জ্ঞান স্বরূপ অর্থাৎ চিন্ময়। এবং ইনিই বৃহৎ ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া ব্রহ্মপদবাচ্য।

অহং পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্বশালী ব্রহ্মনামক কোন পদার্থের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ করা যায় না। যদি বিদ্যমান থাকে, তবে তাহা পরিজ্ঞাত কি অপরিজ্ঞাত? পরিজ্ঞাত হইলে অবশ্যই তাহা অহং পদার্থের একটি বিবর্ত্ত, আর অপরিজ্ঞাত হইলে তাহার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব। যদি বল অনুমান দ্বারা তাহার বিদ্যমানতা সপ্রমাণ করা যায়। তাহার উত্তর এই— ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ব্যতীত অনুমান জন্মেনা, সুতরাং ব্রহ্ম অপরিজ্ঞাত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত হইলে তাহাতে অনুমান প্রমাণের প্রসর নাই।

নির্ব্বিশেষ জ্ঞান আর বিশুদ্ধ অস্তিত্ব একই কথা। অর্থাৎ যখন জ্ঞান কোন বিষয়াকারে বিশেষিত না হয়, তখন তাহা শুদ্ধ অস্তিত্ব ব্যতীত আর কিছুই নয়। সুতরাং আমিই সৎ-স্বরূপ ও চিৎস্বরূপ।

তৃতীয় অধ্যায়।

সৃষ্টিতত্ত্ব

অহংশব্দ লক্ষিত চিৎপদার্থ উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক বস্তুত্তরূপে প্রকাশিত হইয়া যখন স্বরূপ বিস্মৃত হন ও উপাধিকেই "আমি" বলিয়া বোধ করেন, তখন তাঁহার

---

* আমিই সকল পদার্থের উপাদান, এই কথার অর্থ এরূপ নহে যে, আমি রামচন্দ্র সকল পদার্থের উপাদান, তুমি যদুনাথ কোন পদার্থের উপাদান নহ। তুমি আমি প্রভৃতি সকল পদার্থ একমাত্র সৎ পদার্থের বিবর্ত্ত। এই পদার্থই অহং শব্দ দ্বারা এই প্রবন্ধে লক্ষিত হইয়াছে।

জীবসংজ্ঞা হয়। ব্রহ্ম বহুবিধ বিভিন্ন পদার্থে পরিণত হইতেছেন বলিয়া জীবও সাধারণ দৃষ্টিতে বহুবিধ ও বিভিন্ন। জীবদিগের ভিন্নতাবশতঃ উহাদিগের বুদ্ধি চেষ্টা প্রভৃতিও নানা প্রকার হইতেছে। চিৎপদার্থ মনুষ্য পশু পক্ষী প্রভৃতি উপাধিযুক্ত হইয়া সেই সকল বিভিন্ন শরীরে অহংজ্ঞান করিতেছেন। এবং তৎশরীরের অনুকূল বাসনা ও চেষ্টাজনিত সুখ দুঃখাদিতে বদ্ধ হইতেছেন। এই জন্যই এই সংসারে আমি মনুষ্য, আমি পশু ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞান অনুভূত হইতেছে।

যখন স্বর্ণ কুণ্ডল বলয়াদিতে পরিণত হয়, তখন উহার স্বরূপের কোন ব্যত্যয় হয় না। অথচ উহার কুণ্ডল বলয়াদি সংজ্ঞা হয় মাত্র। কিন্তু উপাধি মিথ্যা, কারণ কুণ্ডল বলয়াদির কোন স্থানেই স্বর্ণ ব্যতীত কুণ্ডলত্ব বা বলয়ত্ব দৃষ্ট হয় না। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেই কথা। তিনি নানাবিধ উপাধি গ্রহণ করিয়া পশু পক্ষ্যাদিরূপে প্রকাশিত হইতেছেন, কিন্তু পশু পক্ষ্যাদিরূপ উপাধি মিথ্যা। এক উপাদান কারণ ব্রহ্মই সত্য। সুতরাং ব্রহ্ম ভিন্ন অপর পদার্থের বিদ্যমানতা নাই।

ব্রহ্মের বিভাজক অন্য পদার্থ না থাকায়, বিভিন্ন উপাধি গ্রহণ করিলেও ব্রহ্মে বাস্তবিক ভিন্নতা নাই, ও ব্রহ্মের একত্ব অক্ষুণ্ণ আছে। বিবিধ অঘটন ঘটন পটিয়সী ব্রাহ্মী শক্তি মায়াবশতঃ এক হইয়াও দ্বিচন্দ্র ভ্রমের ন্যায় তিনি বহুরূপে প্রকাশিত হইতেছেন।

যে শক্তি প্রভাবে ব্রহ্ম নিরুপাধিক হইয়াও সোপাধিকরূপে, এবং এক হইয়াও বহুরূপে প্রকাশিত হইতেছেন, তাহাকে মায়া শক্তি বলে। তিনি মায়া শক্তিদ্বারা সোপাধিক হন বলিয়া তাঁহার মহিমার লাঘব হইতেছে না। কারণ মায়া শক্তি তাঁহারই শক্তি এবং উহা তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নয়। নিজ শক্তি দ্বারা নিজে লীলা করিতেছেন, ইহাতে আর গৌরবাগৌরবের প্রসঙ্গ কি?

দুগ্ধ অধিক সময় রাখিয়া দিলে উহা পচিয়া যায় ও উহাতে কীটের উৎপত্তি হয় ও তৎপর উহাতে অন্যান্য অবস্থা সংঘটিত হয়। একটি বীজ ভূমিতে বপন করিলে উহা হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুরের বৃক্ষ পরিণতি, পরে ফুল ফলাদির উৎপত্তি, তৎপর ঐ বৃক্ষের স্বতঃই ধ্বংস হয়। পদার্থের এই প্রকার বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্তির হেতুভূত শক্তি তত্তৎ পদার্থেই নিহিত আছে। এই শক্তি বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ ফুল ফলাদির উৎপত্তি করিয়া পরে বৃক্ষকে বিনাশ করিতেছে। সেই প্রকার মায়া শক্তি প্রভাবে স্বতঃই মহত্তত্ত্ব বা চৈতন্য শক্তির আবির্ভাব হইতেছে। তাহা হইতে অহং ইত্যাকার সমষ্টি অহংকার বৃত্তির উদয় হইতেছে। এই অহংকার তত্ত্ব ব্যষ্টি ভাবাপন্ন হইয়া সূক্ষ্ম ও স্থূলদেহে অভিনিবেশ বশতঃ ঘটে ঘটে জীবরূপে বদ্ধ হইতেছে। অহংকার তত্ত্ব হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পঞ্চ তন্মাত্র, উহাদের প্রত্যেকের সাত্ত্বিকাংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্,) ও রজঃ অংশ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ) উৎপন্ন হইতেছে। আবার উক্ত পঞ্চ তন্মাত্রের মিলিত সাত্ত্বিকাংশ হইতে মন ও উহাদের মিলিত রজঃ অংশ হইতে পঞ্চ প্রাণ (প্রাণ অপান উদান ব্যান সমান) আবির্ভূত

হইতেছে এবং এই পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চীকৃত হইয়া দৃশ্যমান পঞ্চ স্থূলভূতে পরিণত হইতেছে।

বৃক্ষ যেরূপ ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আপনিই বিনাশ পায়, সৃষ্টিও এই প্রকারে পরিস্ফুট হইয়া স্বতঃই ব্রহ্মে বিলীন হইতেছে। এই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অন্য কোন কারণ নাই। যেরূপ বীজ নিহিত শক্তি প্রভাবে বৃক্ষের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও ধ্বংস হইতেছে, সেই প্রকার ব্রাহ্মী শক্তি বশতঃই সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় ঘটিতেছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

ব্রহ্মে অজ্ঞানতা।

যেমন তরঙ্গ ফেন বুদ্বুদ্ প্রভৃতি জল হইতে অভিন্ন, সেইরূপ মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূল পঞ্চভূত পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। জীবও শিব অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়। অজ্ঞানতা প্রভাবে জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহে অহং জ্ঞান করিয়া সুখ দুঃখে নিমজ্জিত হইতেছে।

ব্রহ্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া জীবোপাধি গ্রহণ করিলেন, এ কথায় সংশয় হইতে পারে। কারণ ব্রহ্মে অজ্ঞানতা থাকা স্থূল দৃষ্টিতে অসম্ভব বোধ হয়, কিন্তু অজ্ঞানতা অভাব পদার্থ। তাহার বাস্তবিক উৎপত্তি কিম্বা ধ্বংস নাই। ভাব পদার্থের উৎপত্তি ধ্বংসের সহযোগে অভাব পদার্থের ধ্বংসোৎপত্তি কল্পিত হয় মাত্র। অপিচ অজ্ঞানতা অভাব পদার্থ বলিয়াই জ্ঞানের সহকারী। অজ্ঞানতা ব্যতীত খণ্ডজ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। যখন আমার বৃক্ষ জ্ঞান হইতেছে, তখন অন্যান্য সমস্ত পদার্থ সম্বন্ধে আমার অজ্ঞানতা রহিয়াছে। যদি বৃক্ষজ্ঞানের সহিত অন্যান্য সমস্ত বস্তুর জ্ঞান উদিত হইত, তবে বস্তুতঃ কিছুই জ্ঞান হইত না। সমস্ত জ্ঞানের যুগপৎ উদয় বাস্তবিক কোন জ্ঞানই নহে। উহা বিশুদ্ধ অস্তিত্ব মাত্র; সুতরাং ব্রহ্মপদার্থে যখন খণ্ড জ্ঞানের উদয় হইয়াছে, তখনই অজ্ঞানতার প্রভাব আছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

অন্যমত।

যাহারা এক সর্ব্বব্যাপী স্বতন্ত্র ব্রহ্ম স্বীকার করেন, তাহাদের মতেও অদ্বৈত মীমাংসা অপরিহার্য্য। কারণ, সৃষ্টপদার্থ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন স্বীকার করিলে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপকতা থাকে না। এমতাবস্থায় কেহ কেহ বলেন, সৃষ্টপদার্থ ব্রহ্মময় বটে কিন্তু উহার অংশ বলিয়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। এ কথাও অযৌক্তিক, কারণ কোন বস্তুকে অংশ করিতে তদতিরিক্ত অন্য বস্তুর প্রয়োজন। কিন্তু একমাত্র ব্রহ্ম স্বীকার করায় অন্যবস্তুর সত্ত্বা নিরাকৃত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মুক্তি।

মনে কর সুবর্ণনির্ম্মিত কবচকুণ্ডল বলয়ে বুদ্ধিশক্তির উদ্ভব হইল। যদি ইহাদিগের এই প্রকার বুদ্ধি হয় যে "আমি কবচ", "আমি কুণ্ডল", "আমি বলয়", তবে তাহাদের প্রত্যেকের অবস্থা ব্যতিক্রমে সুখ দুঃখাদির উদয় হইবে। কিন্তু যদি উহারা প্রত্যেকে "আমি স্বর্ণ" ইত্যাকার জ্ঞান করে, তবে উহারা সুখ দুঃখাদির অতীত অবস্থায় অবস্থান করিতে পারিবে। কারণ কবচাদির অবস্থা ব্যত্যয়ে সুবর্ণত্বের কোন ব্যতিক্রম হয় না। জীব সম্বন্ধেও সেই কথা। যদি আমরা প্রত্যেকে "আমি, রামচন্দ্র" বলিয়া শরীরে মিথ্যা অভিনিবেশ

(উপাধি মাত্রই মিথ্যা) করি, তবে শরীরের অনুকূল ও প্রতিকূল কার্য্য বশতঃ সুখ দুঃখে আবদ্ধ হই। আর যদি "আমি চিন্ময় ব্রহ্ম" ইত্যাকার জ্ঞান আমাদের হয়, তবে আমরা সুখ দুঃখের অতীত অমৃতত্ব লাভ করিতে পারি। এই পদই মোক্ষপদ।

এই ব্রহ্মজ্ঞান কেবলমাত্র যুক্তি তর্ক লভ্য নহে। কিন্তু সাধনসাপেক্ষ। সাধন-চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তি এই জ্ঞানের অধিকারী। বিগতপাপ শুদ্ধসত্ত্বজনগণ তত্ত্ববিচার দ্বারা এই জ্ঞান লাভ করেন।

শ্রীবিহারীলাল মুখোপাধ্যায়।

কেন আসি।

১

কেন গো আসি হেথা,
শুনিবে সখি,—
কেন গো আসি হেথা ?—
ঘুচাতে হৃদি-ব্যথা,
রূপের ফোয়ারাতে
জুড়াতে আঁখি,—
দেখিতে কাল চুলে,
দেখিতে আঁখি কোলে
কেমনে খেলে তারা
ভ্রমর-ভাতি,
কেমনে রাঙ্গা ঠোঁটে
মোহন হাসি ফোটে,
সাজায়ে চুণি মাঝে
মুকুতা-পাঁতি,
সুরভি শ্বাস ভরে,
কেমনে হৃদি থরে
সাগরে ঢেউ যেন
উঠিয়া পড়ে ;
ভুরুর বাঁকা টানে,
আকুলি মন প্রাণে,
কেমনে ক্ষণে নব
সুষমা গড়ে,
অলক-বাধা ফাঁসে
চুমিছে গাল পাশে,
যেন বা গোলাপেতে
ভ্রমর ভার ;
কবরী করি আলা,
হাসিছে কুঁদমালা,
যেন বা নিশিশিরে
তারার হার ;—
দেখিতে চলে যাওয়া,
শুনিতে কথা কওয়া,
স্বপনে দেখা রূপ
দেখিতে চোকে ;
লুটাতে রাঙা পায়,
কুসুম দল প্রায়
সুরভি ভাবগুলি
ফুটাতে বুকে !

২

কেন গো আসি হেথা ?—
রূপের দায় !
সুষমা-সরঃ-মাঝে,
নলিনী-হৃদি রাজে,
দেখিতে তীর হতে,
না ছুঁয়ে তায় ?

ভ্রমর-পংক্তি বুকে
ধরিয়ে মনোসুখে,
আবেশ বশে চারু
শরীর ঢলে,
নলিনী-হৃদি হেন
কাঁপিলে, দেখি যেন
রূপের ঢেউগুলি
খেলিয়ে চলে!
কেন গো দেখে সুখী?—
বল না, শশীমুখি,
কেন সে দেখে লোকে
সাঁঝের কালে,
তারকা-হীরা-বুটি
পরিয়ে নীল শাটি,
জোছনা-হাসি শশী
যখন ঢালে?

নয়নে ফুল ধনু,
বল না, ফুল তনু,
দেখিয়ে কেন লোকে
অবশ হয়,
যখন ফুলবধূ
বিলায়ে মন-মধু,
যখন বন-মাঝে
ফুটিয়ে রয়?—
পূরবে চাঁদ-ওঠা,
নীরবে ফুল ফোটা,
দেখিতে, সখি, বড়
ভাল গো বাসি,—
চকোরে সুধা খায়,
অলিতে দলে পায়,
আমি যে খালি তায়
দেখিতে আসি।

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

সাময়িক সাহিত্য।

এখনকার লোকে লোকের প্রশংসা করিতে প্রস্তুত নহেন। আবার দোষ দেখিলে সাহস করিয়া তাহাও ব্যক্ত ইচ্ছা করেন না। এটা উপস্থিত সময়ে রোগের মত হইয়া উঠিতেছে, তাই আমরা এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। সময় সময় ইহার প্রচারে যত্নপর হইব।

বিদ্যমানকালে নব্যভারত, সাহিত্য, অনুসন্ধান, সাধনা, জন্মভূমি, ভারতী, বামা-বোধিনী, সাহিত্যকল্পদ্রুম, শুচিন্তা, ধর্ম্মতত্ব, তত্বকৌমুদী—এই সকল সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মতত্ব, তত্বকৌমুদী, অনুসন্ধান—পাক্ষিক, আর সকলগুলিই মাসিক। এখন আর পূর্ব্বের মত তত্ববোধিনী পত্রিকা, বঙ্গদর্শন, বান্ধব, আর্য্যদর্শন, নবজীবন, জ্ঞানাঙ্কুর, প্রচার প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার ধরণ, ভাব-ভঙ্গী, প্রকাশ-নিয়ম দেখিতে পাইবার যো নাই। কি বিষয়াংশে কি মুদ্রাকার্য্যে—কোন অংশেই উহাদের সমকক্ষ পত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল বর্ত্তমান সময়ের নব্যভারত, বিষয়াংশে ও যথাসময়ে প্রচার—এই দুই কার্য্যে প্রাচীন পত্রিকা-গুলির স্মৃতিচিহ্ন বজায় রাখিয়াছেন। কি উপায় করিলে পত্রিকা অনিয়মিত প্রচার না হয়, তৎপক্ষেও নব্যভারত নূতন প্রণালীর

আবিষ্কার করিয়াছেন। উপন্যাস ও গল্প না লিখিলেও প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্র এদেশে এখন প্রচলিত হইতে পারে, ইহারও প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই নব্যভারত। নব্যভারতের লেখক-তালিকায় সর্ব্বশ্রেণীর লেখকই আছেন। বিশেষতঃ যাঁহারা লিপিনৈপুণ্যে অগ্রণী, এই সকল লোকের রচনা ইহাতে প্রচারিত হইতেছে। সুতরাং নব্যভারত যে চিন্তাশীল, তাহা আর ছুই বার করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। ইহাতে সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় বিষয়েরই সমাবেশ থাকে। নব্যভারতের অপক্ষপাতিতা একটা মহৎ গুণ। সাহিত্য সেই গুণ হইতে বঞ্চিত নয়। তবে নব্যভারত অপেক্ষা অনেক কম। সাধনাতেও ঐ গুণ আছে বটে, তাহা সাহিত্য অপেক্ষা আরও অনেক কম।

"জন্মভূমি"—সাধারণের জন্য লিখিত। ইহার বিস্তৃত সমালোচন যথাস্থানে লিখিত হইতেছে। সাধনার বিষয়—"অনুসন্ধান" পত্রে আমরা সংক্ষেপে স্বীয় মতামত প্রকটন করিয়াছিলাম, নব্যভারতেও ইহার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা হইয়াছিল। পুনরায় সে প্রসঙ্গ বিস্তারিতভাবে করা যাইবে। ইহা ঠাকুরদের সখের জিনিষ। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজন সিদ্ধ কি পরিমাণে হয়, ঠিক্ বলা যায় না। সাধনার প্রবর্ত্তক শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ বাবুর আত্মম্ভরিতার মাত্রার বাড়াবাড়ি না হইলে পত্রিকা সমাজের বিশেষ উপকারিণী হইত। ইহার আবির্ভাবে উপকার হইয়াছে।

"সাহিত্য"—জন্মভূমি ও সাধনার সংমিশ্রণে চালিত। নব্যভারতের ন্যায় চিন্তাপ্রসূত প্রবন্ধ অতি অল্পই থাকে। তাই বলিয়া "সাহিত্য" দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টি কোন কোন অংশে না হইয়াছে, এমন নয়। বাবু চন্দ্রনাথ বসু, ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি প্রকৃত খ্যাতিমান লেখকগণের লিখিত সন্দর্ভে আমাদের সমাজের অনল্প উপকার হইয়াছে, ইহা শত্রুকেও মুক্তকণ্ঠে অঙ্গীকার করিতে হইবে। বাবু উমেশচন্দ্র বটব্যাল, বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে তাদৃশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ না হইলেও, তাঁহার প্রস্তাব আমাদের নিকট উপাদেয়। যুবক লেখকগণও সামান্য কৃতী নন। সম্পাদক বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রথিতনামা না হউন, তাঁহার যথেষ্ট বিদ্যা-বিনয় আছে। তিনি নাম জাহিরের পাত্র নন। তাঁহার ছুই চারিটি প্রবন্ধ আমাদের ভাল লাগিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার টান থাকাই, তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। সে জন্য তাঁহার প্রশংসা করিতেছি না। বঙ্গভাসানুরাগ না থাকিলে, তাঁহার নিন্দা হইত। হিন্দু বিধবারা যেমন একাদশী করিয়া প্রশংসিত হন না, প্রত্যুত একাদশী লঙ্ঘনে যেমন তাঁহাদের প্রত্যবায়ভাগিনী হইবার কথা, সুরেশচন্দ্রের সাহিত্যানুরাগ না থাকাও সেইরূপ দোষের বিষয়। আশীর্ব্বাদ করি, তিনি অদম্য উদ্যমে পত্রিকা চালনে অগ্রসর হউন। সম্পাদকের অভিপ্রায় না হউক, পত্রিকার প্রকৃতি কতকটা না হিন্দু—না ব্রাহ্ম—দুয়ের মাঝামাঝি। ইহা এক শ্রেণীর লোকের প্রীতিকর বটে। ঈশ্বর তাঁহার সাহায্য করুন। নবীন সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নিত্যকৃষ্ণ বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। উভয়েই এম, এ, উপাধিধারী হইয়া বঙ্গজননীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, ইহাতে আমরা কি প্রার্থ

পুলকিত, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। কবিতা লেখকদের মধ্যে শ্রীমান্ অক্ষয়চন্দ্র বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ইত্যাদির নাম অসঙ্কোচে উল্লেখ করা যায়। "ভারতীর" এখন অনেক দিন হইতেই উন্নতির দিকে দৃষ্টি নাই। গল্প, উপন্যাস ও কবিতা বাদে কদাচিৎ দুই একটা পাঠযোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সময়ান্তরে অবকাশক্রমে ইহারও সুদীর্ঘ সমালোচনে ইচ্ছা রহিল। শ্রীমান্ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রভৃতির সন্দর্ভে পড়িবার বিষয় থাকে। আত্মাভিমানের পরিমাণ একটুকু কম হইলে, কৈলাসচন্দ্র বাবুর প্রস্তাবের সর্ব্বাঙ্গ-সৌষ্ঠব বাহির হইত। "বামাবোধিনী"—সাধারণতঃ বেশ চলিতেছে। তত্ত্ববোধিনী আর বামাবোধিনী পত্রিকা বহুকালের কাগজ। বামাবোধিনী-সম্পাদক বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, মহাশয় অতিরিক্ত নিরীহ বলিয়া সময়ে সময়ে পত্রিকার প্রবন্ধগুলির তেজোবত্তা প্রচারিত হইতে পায় নাই। বামাবোধিনী দ্বারা কেবল বামাকুলের কেন, অনেক অ-বামাদেরও প্রচুর উপকার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। বঙ্গ-সাহিত্যের যথোপযুক্ত সেবা, বামাবোধিনী দ্বারা হইয়াছে, হইতেছে। তত্ত্ববোধিনী অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদকতা হইতে বঞ্চিত হইয়াও সময়ে সময়ে তাহার—সমাজের কল্যাণ-সাধনে ব্যাপৃত আছেন। পণ্ডিতপ্রবর শ্রদ্ধাস্পদ কালীবর বেদান্তবাগীশ মহোদয়ের দার্শনিক ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে ইহা মধ্যে মধ্যে সমলঙ্কৃত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও ইহার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। শেষদশায় তাঁহার ভাষা-দোষ না ঘটিলে, তিনি বঙ্গভাষার কণ্ঠে "তত্ত্ববিদ্যা" "স্বপ্নপ্রয়াণের" ন্যায় আরও কত কত মণি-মাণিক্য পরাইয়া দিতে পারিতেন। এখনও তাঁহার নিকট অনেক ভাল কথা শোনা যাইতেছে। আশা করি, সাম্প্রদায়িকতার বন্ধন একটু শিথিল করিয়া তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে সংগ্রাম করিতে করিতে অগ্রসর হইবেন। সুপণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্যও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অল্প উপকারী নহেন। ধর্ম্মতত্ত্ব ও তত্ত্বকৌমুদী—সম্প্রদায় বিশেষের মুখপাত্র। এতদুভয় পত্রে সময়ে সময়ে উত্তম-উত্তম রচনা দেখা যায়। পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় এক জন নিপুণ লেখক, তাঁহার লিপি পারিপাট্যে ও প্রবন্ধ সঙ্কলন নৈপুণ্যে আমরা অনেক সময় অত্যধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকি। "অনুসন্ধান" ও "নব্য ভারত" দুই পত্রিকা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ-লেখকের অধিক বলা চলিবে না। কেন না, ষষ্ঠ বর্ষের চতুর্দ্দশ সংখ্যা পর্য্যন্ত "অনুসন্ধান" এই লেখকের সম্পাদকতায় পরিচালিত। তৎপরবর্ত্তী সংখ্যা হইতে তিনি অসঙ্কোচে মতামত দিতে পারিবেন।* তবে এইটুকু বলিতে পারা যায়, ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গভাষার কিছু উপকার আসিবে। এই সময়ের মধ্যে অনেক ভাল ভাল লেখকের অর্থাৎ বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর সুশিক্ষিত প্রসিদ্ধ বঙ্গভাষোৎসাহী বাবু ঈশানচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, আর্য্য-দর্শন, বান্ধব প্রভৃতির লেখক বাবু কৈলাস চন্দ্র ঘোষ, বিখ্যাত উপন্যাস লেখক বাবু

* ষষ্ঠ বর্ষের চতুর্দ্দশ সংখ্যার পর আমাদের 'অনুসন্ধানের' সঙ্গে সম্পর্ক নাই।—লেখক।

দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ, স্কুলের সব ইনস্পেক্টর বাবু মধুসূদন সরকার, সঞ্জীবনীর ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক বাবু রসিকলাল ঘোষ, "শৈলবালা" উপন্যাস প্রণেতা 'পরিব্রাজক' উপাধিধারী প্রভৃতি কৃতবিদ্যগণের প্রয়োজনীয় প্রস্তাব-নিচয় "অনুসন্ধান" পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। হোমারের অনুবাদ, কবি নরচন্দ্র, কবিকঙ্কণ ও তাঁহার চণ্ডীকাব্য, বিদ্যাপতি, রাজা রামমোহন রায় কিরূপ সমাজ-সংস্কারক ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ, চীনের বিবরণ, বর্ষ ও পর্ব্বত, বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা, কামরূপের প্রাচীন-তত্ত্ব—এই সকল প্রস্তাবে বঙ্গসাহিত্যের দেহের সুষমা-বৃদ্ধি বৈ কোন হানি করিবে না। সংবাদ-পত্রে ঐ সকল প্রবন্ধের মধ্যে কতকগুলির সুখ্যাতি হইয়াছিল। প্রাচীন-কবিপ্রবর বাবু কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, প্রিয়প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী, বাবু হেমচন্দ্র মিত্র বি, এল, বাবু চুণীলাল গুপ্তের কবিতাগুচ্ছ প্রশংসনীয়। বিমাতা উপন্যাস ও নলিনী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পও লোকের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। "সাহিত্য-কল্পদ্রুম"—যদি সময় মত প্রচারিত হইত, তবে ইহা দ্বারাও যথেষ্ট উপকার হইতে পারিত। ইহাতে মধ্যে মধ্যে ভাল ভাল ও প্রয়োজনীয় প্রস্তাবের সমাবেশ থাকিত। বিখ্যাত বিশ্বকোষের প্রধান সঙ্কলয়িতা শ্রীমান্ নগেন্দ্র চন্দ্র বসু, বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বি,এ, শ্রীমান্ ব্যোমকেশ মুস্তফি, শ্রীমান্ কালীচরণ মিত্র—এই কয়জনে ইহাতে অনেক উত্তম প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কয়জনেই তাদৃশ পরিচিত লেখক না হইলেও, উদীয়মান লেখক, তাহা মন খুলিয়া বলিতে পারি। উদ্যম থাকিলে, তাঁহারা সকলেই সুলেখক হইয়া উঠিবেন। বিশেষতঃ নগেন্দ্রচন্দ্র বাবু যেরূপ পরিশ্রমী, বিষয় সংগ্রহে যেমন পটু তাহাতে তাঁহার যথাযোগ্য প্রশংসা না করিলে, অনৌদার্য্য দোষে আমাদিগকে দূষিত হইতে হইবে। তাঁহার বয়স অল্প হউক, তাঁহারি নিকট অনেক প্রত্যাশা করা যায়।

"সুচিন্তা"ও অল্পে অল্পে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। কালে ইহা একখানি ভাল পত্রিকা হইয়া উঠিতে পারে।

অদ্য আমরা এই প্রবন্ধে আপাততঃ জন্মভূমির একটুকু বিস্তারিত উল্লেখ করিতেছি। জন্মভূমির ভাষা উল্লিখিত পত্রিকাগুলি অপেক্ষা বিশুদ্ধ।

"জন্মভূমি"—দ্বিতীয় বৎসর অতিক্রম করিয়া তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, সুতরাং জন্মভূমির আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক নয়। নব্যভারতে প্রথম বর্ষের জন্মভূমির কোন কোন বিষয়ের উল্লেখ হইয়াছিল। তাহা একদেশ-দর্শিতাময়—তৎপরে জন্মভূমির গুণের প্রশংসা করিয়া সেই লেখক কোন প্রবন্ধ লিখিলেন না দেখিয়া, আমরা এই সন্দর্ভ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। জন্মভূমিতে সাহিত্য, জীবনচরিত, বিচার, পুরাতত্ত্ব, গল্প ও কবিতা প্রভৃতি সাময়িক পত্রের আলোচ্য অনেক বিষয় আছে। তাই বলিয়া অনাবশ্যক বিষয়েরও অভাব নাই। দেশের যেরূপ রুচি, তাহার পরিপূরণ করিতে যাওয়াতেই, ঐ সকল বিষয়ের অবতারণা করিতে হইয়াছে।

পুরাবৃত্ত নামক প্রবন্ধে কলিযুগের সময় নিরূপণ ও সেই সঙ্গে যুধিষ্ঠিরাদির রাজ্য কোন্ সময়ে হইয়াছিল, তাহা সমন্বয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রবন্ধ পাঠ করিলেই লেখকের পরিশ্রম স্বীকার স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

এরূপ প্রবন্ধ যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু প্রবন্ধ-লেখক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা তাঁহার উপযুক্ত হয় নাই। "সাহিত্য-কল্পদ্রুম" পত্রিকায়, বি, এ, উপাধি-প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উহার যে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের মতের ঐক্য আছে। হুয়েন্‌সাঙ্‌ প্রবন্ধে লেখক যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নূতন না হইলেও, ইতিপূর্ব্বে তাহা ইংরেজিতে প্রকাশিত হইলেও, বঙ্গভাষার পক্ষে নূতন, সুতরাং তাহা লেখকের প্রশংসার কথা। ফলতঃ এই প্রস্তাবটী চিন্তাপূর্ণ। তবে লেখক কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। বিষয়টী পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক—সুতরাং প্রয়োজনীয়। "কায়স্থ" প্রবন্ধটী 'বিশ্বকোষের' কায়স্থ শব্দের সমালোচনা। ব্যক্তিবিশেষের মতে উহা ঠিক্ সমালোচন নয়—এক প্রকার প্রতিবাদ। জন্মভূমির এই প্রবন্ধ-রচয়িতা, পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করায়, ভাল মন্দ দুইই হইয়াছে। ভাল এই—তাঁহার লিখিত এই প্রতিবাদের আবার প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে,—সুতরাং তাহাতে বঙ্গভাষার উপকরণ ও অঙ্গসৌষ্ঠব বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। মন্দ এই—লেখক কেবল সংস্কৃতজ্ঞ বলিয়া ঐ পুরাতত্ত্ব সংক্রান্ত সন্দর্ভের আর উত্তর দিতে সাহসী হন নাই। ইংরেজি ভাষার সাহায্য বিনা প্রাচীনতত্ত্ব-বিষয়ক প্রস্তাবে জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা অল্প। ফলে, সুরুচি-সঙ্গত বাদ প্রতিবাদে ভাষার উপকার বৈ অপকার নাই। "দাক্ষিণাপথের অবরোধ প্রথা" প্রস্তাবটী প্রয়োজনীয়। "মুঙ্গের" প্রবন্ধও তাই। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী প্রবন্ধের ভাষা সরল ও উত্তম। সাময়িক পত্রে জীবনচরিত যত দূর লেখা যাইতে পারে, এই প্রবন্ধে তাহা হইয়াছে। আমরা লেখককে পরামর্শ দি, যদি তিনি কখন ইহাকে পুস্তকাকারে পরিণত করেন, তবে নায়কের চরিত্রের সকল দিক যেন দেখাইয়া দেন। সঙ্গীত প্রণেতা প্রসিদ্ধ রসিকচন্দ্র রায়, পণ্ডিত অযোধ্যানাথের জীবনবৃত্তান্ত, বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতের সঙ্গে তুলনাই হয় না। কিন্তু রসিকচন্দ্রের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখায় আমরা বিলক্ষণ তুষ্ট হইয়াছি। খাঁটি স্বদেশীয় জিনিস—ঐ রসিকচন্দ্র। কবিরাজ ব্রজেন্দ্রকুমারের জীবনী, সাময়িক পত্রের উপযুক্ত নয়—আর তাহার লেখার প্রণালীও অন্ততঃ সাময়িক পত্রিকার উপযোগিনী হয় নাই। 'বর্ণমালা-রহস্য' বিষয়ে আর অধিক কি বলিব? উহা আমাদের অতি মনোরম বোধ হইয়াছে। এরূপ সন্দর্ভে ভাষার উপকার হইবে। "আমার জীবনচরিত"—অতি সংক্ষ অথচ চিত্তাকর্ষক ভাষায় লিখিত। "আমাদের হাজত" প্রবন্ধটীর লেখক যে এক জন নিপুণ লোক, প্রবন্ধ-পাঠে তাহার আভাস পাওয়া যায়। লর্ড মেয়োর জীবনচরিত লিখিতে ইংরেজি পুস্তকেরই সাহায্য লইতে হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার সুশৃঙ্খলা করিতে লেখক বেশ প্রয়াস পাইয়াছেন। ভাষা কঠোর নয়—উহাতে অনেক বৃত্তান্তই প্রদত্ত হইয়াছে। "হস্তী" এই বিবরটী শুনিতে যেমন অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়, পাঠ করিলে তাহা বোধ না হইয়া কিছু শিক্ষা হইল, বোধ হইবে। "পশম" লেখাও মন্দ হয় নাই। ইহাতে অনেক বিষয়ের সংগ্রহ দৃষ্ট হইল। শঙ্করাচার্য্যের কাল নিরূপণ—

স্বাধীনভাবে গবেষণা দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের কাল যাহা নির্ণীত হইয়াছে, তাহা অতি-মাত্র আনন্দদায়ক। প্রস্তাব লেখক তাদৃশ পরিচিত না হইলেও, এই প্রবন্ধেই তাঁহার ক্ষমতার বিশিষ্টরূপ পরিচয় করিয়া দিতেছে। "ভারতী" পত্রিকায় বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ উহার যে সমালোচন বা প্রতিবাদ করিয়াছেন, অথবা উত্তর দিয়াছেন, তাহা ঠিক্ হয় নাই। "হিন্দুর প্রাত্যহিক কর্ম্ম" "হিন্দুর শৌচপ্রকরণ" "শাস্ত্রীয় তর্ক" "মনু-সংহিতার সার মর্ম্ম" বেদান্ত ও ন্যায়দর্শন ইত্যাদি শাস্ত্রীয় প্রবন্ধ মনোযোগ করিয়া পাঠ করা কর্ত্তব্য। এ সকল সর্ব্বজন মনোরম না হউক, এক সম্প্রদায়ের মনো-রঞ্জন করিতেছে। লুলু, কলিকাতা দর্শন, কর্ত্তার গৃহস্থালী ইত্যাদি আমাদের মতে অকিঞ্চিৎকর—সাময়িক পত্রের অনুপযুক্ত। "বাঙ্গালা ভাষা ও সংস্কৃত ব্যাকরণ"—এ শ্রেণীর প্রস্তাবের আমরা প্রশংসা করিব, তাহা বিচিত্র নয়। "অনুসন্ধানেই" আমরা "বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থা" প্রবন্ধের প্রচুর আলোচনা করিয়াছি, অতএব তদ্বিষয়ে আমাদের অভিপ্রায় পাঠকেরা বুঝিতেছেন। যেরূপ সরস করিয়া লিখিলে, ঐ শ্রেণীর প্রবন্ধ,লোকে পড়িবে, ইহা সে ধরণের লেখা নয়। ভরসা করি, লেখক, ভবিষ্যতে আরও দুই একটী এই প্রকার লেখা প্রকাশিত করিবেন। "যোবন্নার দুর্গাপূজা" গল্পটা আমাদের নিকট সরস বোধ হইল। "যোবন্নার" "একত্রে" "সপ্তমীর রাত্রে" "তাঁহার দ্বারাও" ইত্যাদি ভুল, জন্মভূমিতে আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি নাই। "সিপাহিবিদ্রোহে ভুক্ত-ভোগী"—এ প্রবন্ধ চর্ব্বিত চর্ব্বণ। কেন এই শ্রেণীর প্রস্তাব সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়, জানি না। উপন্যাসের মধ্যে "যমুনা" "দুই ভাই" "অশোকা" উল্লেখ-যোগ্য। গল্পগুলি আমাদের মিষ্ট লাগিল। "হিন্দুবিধবার" শেষাংশ ভাল লাগিয়াছে।

"মোহমুদ্গরের" যে পদ্যানুবাদ জন্ম-ভূমিতে ১২৯৯ সালের ভাদ্রে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা "অনুসন্ধানে" ১২৯৮ সালের ১৫ই ফাল্গুনে প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম জন্ম-ভূমিতে প্রকাশ পায় নাই। কেবল "শ্রী—নবদ্বীপ" ছাপা হইয়াছে। ঐ ব্যক্তির নাম শ্রীরাখালদাস অধিকারী। ঐ ব্যক্তি নবদ্বীপ হইতে "অনুসন্ধানে" ও "জন্মভূমিতে" যাহা ছাপান, তাহা নব্যভারতের অবিকল নকল।

যাহা অনুসন্ধানে মুদ্রিত হয়, তাহাই আবার 'নব্যভারতের' ১২৯৬ সালের শ্রাবণে পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। যাহার নিজের লিখিবার শক্তি নাই, সে আবার কেন পরকীয় যশে যশস্বী হইতে চায়, ভগবান্ বলিতে পারেন। শাস্ত্রে আছে,—

"কৃতপ্রবৃত্তিরন্যার্থে, কবির্বান্তং সমশ্নুতে।"

অর্থাৎ যে অন্যের রচনাকে নিজস্ব বলিয়া পরিচয় দেয়, সে বমি খায়।

এই সকল লোকের দমন হওয়া কর্ত্তব্য।

কবিতার মধ্যে "হাসে কি কমল-বন" "শূর্পনখার প্রতি লক্ষ্মণ" "শকুন্তলার প্রতি দুষ্মন্ত" ইত্যাদি কবিতা পাঠযোগ্য।

লেখকগণের মধ্যে বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়, ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, দুইটী মাত্র উত্তম প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়াছেন। বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ঠাকুরদাস মুখো-পাধ্যায়, হারাধচন্দ্র রক্ষিত, বিহারিলাল সরকার, হেমচন্দ্র মিত্র, বি, এল, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন—ত্রৈলোক্যনাথ মুখো-

পাধ্যায় একাধিক বার লেখনী চালনা করিয়াছেন। তাঁহাদের লেখাগুলিও ভাল হইয়াছে। বিহারিলাল বাবু ও হারাণচন্দ্র বাবু বিভিন্ন বিভাগে বেশ কাজ করেন। এস্থলে গুণানুসারে সকলের নাম নির্দ্দেশিত হইল, কেহ ভাবিবেন না। দুই এক জন ছাড়া আমাদের সহিত ঐ সকল লেখকের সঙ্গে পরিচয় নাই। অতএব আমরা যাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়াছি, তাহা গুণেরই প্রকৃত পরিচায়ক।

"জন্মভূমি" পত্রিকাকে কেহ কেহ যেমন অকিঞ্চিৎকর মনে করেন, ইহা তাহা নয়। প্রথম বৎসর অপেক্ষা দ্বিতীয় বৎসরে ইহার বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। ভরসা করিতে পারা যায়, তৃতীয় বর্ষে উত্তম উত্তম লেখকের ভাল ভাল অথচ প্রয়োজনীয় প্রস্তাব-নিচয় মুদ্রিত হইয়া জন্মভূমির গৌরব বর্দ্ধিত করিবে। আমরা যে যে উত্তমোত্তম লেখকের কথা বলিতেছি, তাহাতে আমরা কি বুঝি, এস্থলে তাহা বিশদ করা আবশ্যক। এক শ্রেণীর লেখক আছেন, যাঁহারা এককালে কোন কারণে নাম পাইয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহাদের আর সে প্রভা নাই। সুতরাং তাঁহাদের স্থান যাঁহারা পূরণ করিয়াছেন, সেই উদ্যমশীল নবীন লেখকগণই আমাদের "উত্তমোত্তম" শব্দের লক্ষ্য।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

অদৃষ্ট। (৩)

আত্ম-প্রতীতি যাহাই বলুক, কার্য্যতঃ আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে আমাদের যে কিছুমাত্র স্বাধীনতা আছে, বা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার কোন ক্ষমতা আছে, তাহা বোধ হয় না। যাহা করিব মনে করি, তাহা করা হয় না, প্রাতে উঠিয়া যে সঙ্কল্প করি, মধ্যাহ্নে আর তাহা স্থির থাকে না, আবার যাহা করিব না স্থির করিয়া রাখিয়াছি, ঘটনাক্রমে তাহাই করিতে বাধ্য হইতে হয়। আমরা প্রতিদিন জীবনে যে সকল কার্য্য করিয়া থাকি, তাহা প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত :—(১) কতক ইচ্ছায় করি, (২) কতক অনিচ্ছায় করি, (৩) আর যাহা কখন ভাবি নাই, চিন্তা করি নাই, এমন কার্য্যও অনেক করিয়া থাকি। যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করি, তাহা করিতে স্বতঃই যেন কেমন চেষ্টা হয়, মনে হয় যেন সে কার্য্যের কর্ত্তা আমি, তখন আমাকে স্বাধীন বলিয়াই জ্ঞান হয়, অনিচ্ছাপূর্ব্বক যাহা করি, তাহাতেও যদিও অনেক সময় চেষ্টা করিতে হয়, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে কে যেন ধাক্কা দিয়া সে চেষ্টা করাইয়া দেয়, নিতান্ত বাধ্য হইয়া যেন চেষ্টা করিতে হয়, তখন মনে হয়, আমরা সম্পূর্ণ পরাধীন, যাহা ভাবি নাই বা কখন চিন্তাও করি নাই, তেমন কোন কাজ করার সময় আমি করিতেছি, এ জ্ঞান থাকে না, কার্য্য শেষ হওয়ার পূর্ব্বে অনেক সময় কি করিতেছি, তাহা ভাবিয়া দেখিবারও অবকাশ হয় না, এ সকল কাজ ভাবিয়া করি না, করিয়া ভাবি, এবং ভাবিয়া দেখি, একটা কাজ করিয়াছি—করিয়াছি আমিই সত্য, কিন্তু অজ্ঞাতসারে কে যেন আমার দ্বারা করাইয়াছে, সে কাজ আমি করিলেও আমাকে তাহার কর্ত্তা

বলিয়া মনে হয় না, তখনও মনে হয়, আমরা পরাধীন।

আমাদের জীবনের তিন প্রকার কার্য্যের মধ্যে কেবল এক ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা করি, তদ্ভিন্ন অন্য দুই প্রকার কার্য্যে, অনিচ্ছার কার্য্যে, এবং অভাবনীয় কার্য্যে, আমাদের পরাধীনতা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক করি, তাহার কর্ত্তা আমি ভাবিয়া মনে করিতে পারি আমরা স্বাধীন —কিন্তু ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গেই চেষ্টা আসিয়া উপস্থিত হয়,এবং প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও যখন ইচ্ছানুরূপ ফল পাওয়া যায় না, তখন আবার মনে হয়, মানুষ কার্য্যকর্ত্তা হইলেও ফলদাতা বিধাতা, তিনি যাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, মানুষের চেষ্টায় বা মানুষের ইচ্ছায় তাহার অন্যথা হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

আত্মপ্রতীতি যাহাই বলুক, আমাদের প্রত্যেক কাজে, জীবনের প্রত্যেক ঘটনায়, আমরা দেখিতে পাই, যেন স্রোত মুখে পতিত তৃণকণার ন্যায় মানুষ এই কালস্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে, সময়ের পড়তা অনুসারে কখন উঠিতেছে, কখন ডুবিতেছে, এইরূপে উঠিয়া নামিয়া একদিন অনন্ত সাগরে যাইয়া মিশাইতেছে।

সময়ের যে একটা পড়তা আছে, তাহা আমরা তাস খেলায় দেখিতে পাই, তাস খেলার সহিত আমাদের এই সংসারলীলার অনেকটা মিল আছে, যখন যে পক্ষের পড়তা পড়ে,তখন প্রতিহাতে গোলাম নওলা প্রভৃতি ৫।৬ খানি বড় বড় রং এবং বদ রঙ্গেরও টেক্কা সাহেব প্রভৃতি ফেরাই আসিতেছে, প্রতিহাতে ছক্কা না হয় কাগজ হইতেছে। অপর পক্ষ কত হিসাব করিয়া খেলিতেছে,পড়তা ফেরানের জন্য কত চেষ্টা, কত তুক্‌তাক্ করিতেছে, কিন্তু হাতের পাঁচটী পর্য্যন্ত পাইতেছে না; এইরূপ দশ বিশ হাত গেল, ৫।৭ খানা ছক্কা পঞ্জা হইল, এমন সময় হয়ত একবার সাততুরুপ না হয় আটতুরুপ হইল, বুঝা গেল জিত পক্ষের উন্নতির চরম সীমা হইয়াছে, সাততুরুপ আটতুরুপের পর প্রায় পড়তা ফিরিয়া যায়।

এই সংসার-লীলাতেও দেখা যায়, সুখের দশায় মানুষ কেবল নিরবচ্ছিন্ন সুখ এবং দুঃখের দশায় নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ ভোগ করিতেছে, সুখের দশায় লোক দোষ করিলেও গুণ হয়, ভুল করিলেও তাহা ঢাকিয়া যায়। সে সময় কথায় বলে, ছাই মুটা ধরিলে তাহা সোণা মুটা হয়। বাস্তবিক সে সময় যাহা করা যায়, তাহাই যেন মঙ্গলের কারণ হইয়া দাঁড়ায়, আর দুঃখের দশায় ভাল করিলেও মন্দ হয়, দুঃখের দশায় পড়তা ফিরানের জন্য লোকে কত চেষ্টা করে, শান্তি, স্বস্ত্যয়নাদি কত দৈব কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, কিন্তু সুখের দশা ও দুঃখের দশা, এ উভয় দশারই যেন একটা নির্দ্ধারিত কাল আছে, সুখ ও দুঃখ যেন চক্রের মত ঘুরিতেছে, মানুষের অদৃষ্টচক্র ঘুরিয়া উপস্থিত দশার অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত যে সুখী, সে লক্ষ্মীদেবীকে পা দিয়া শতবার ঠেলিয়া ফেলিলেও কখনও তিনি তাহাকে ছাড়িয়া যাইবেন না, এবং যে দুঃখী সে শত গ্রহদেবতার পূজা করিলেও শনি কখন্ তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন না।

সময়ের এই পড়তা দেখিয়া বোধ হয়, এ জীবনে যাহা ঘটিবার, তাহা অদৃষ্টচক্রে আঁকা আছে, চক্রের গতি অনুসারে সময়

হইলে আপনা হইতেই যাহা হইবার, তাহা হইতেছে এবং যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিতেছে। ব্যাসদেব এক সময় যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন,—

"কর্ম্মানুষ্ঠান, যজ্ঞানুষ্ঠান বা অন্যান্য কর্ম্ম দ্বারা কিছুই লাভ হইতে পারে না, এবং এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে দান করিতেও পারে না। ভগবান বিধাতা যে সময়ে যে বস্তু যাহার প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই সময় সে অনায়াসেই তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইতে পারে। নির্দ্দিষ্ট সময় সমাগত না হইলে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া কিছুই লাভ করিতে সমর্থ হয় না. কিন্তু উপযুক্ত সময় সমাগত হইলে, নিতান্ত মূর্খেরাও ভূরি ভূরি অর্থ লাভ করে। অতএব কার্য্য কালসাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। সৌভাগ্যের সময় সমাগত না হইলে, কি শিল্প, কি মন্ত্র, কি ঔষধ কিছুতেই ফললাভ হইতে পারে না, কিন্তু সময় সমাগত হইলে সমুদয় কার্য্যই সুসিদ্ধ ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কাল সহকারে বায়ু প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত, জলধরপটল জল-সমাযুক্ত, অরণ্যস্থিত বৃক্ষসকল কুসুম-সুশোভিত-যামিনী জ্যোৎস্না বা অন্ধকারে সমাবৃত, এবং চন্দ্রমা ষোড়শ কলা পরিপূর্ণ হয়। উপযুক্ত সময় উপস্থিত না হইলে,কোনক্রমেই পাদপগণের ফলপুষ্পোদ্গম, নদী সমুদয়ের প্রবল বেগ,পশু পক্ষী ও পন্নগগণের মত্ততা, রমণীগণের গর্ভ, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শিশির প্রভৃতি ঋতুর সমাগম, প্রাণীগণের জন্ম মৃত্যু, বালকগণের মধুর বাঙ্নিষ্পত্তি, মানবগণের যৌবন লাভ, যত্ন সমারোপিত বীজের অঙ্কুরোদ্গম, ভগবান্ সূর্য্যের উদয় ও অস্তাচলে সমাগমন,এবং বীচিমালা-সঙ্কুল সাগরের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না।"

প্রতাপচন্দ্র রায়ের মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ৪৫ পৃষ্ঠা।

সময়ের গতি অনুসারে আমাদের অদৃষ্টচক্র প্রতিনিয়তই ঘুরিতেছে,রাশিচক্রের ন্যায় অদৃষ্টচক্রেরও নির্দ্দিষ্ট গতি আছে এবং অদৃষ্টচক্র ঘুরিবারও নিয়ম আছে। এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ব্যাপারই যদি নিয়মের অধীন হইয়া এক নির্দ্দিষ্ট গতিতে চলিতে থাকে, তাহা হইলে মানুষ যে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে থাকিয়া সেই নৈসর্গিক নিয়মের বহির্ভূত হইবে বা তাহার জীবনের গতি অনির্দ্দিষ্ট থাকিবে, ইহা কখন সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথাচরণ করিবার যে মানুষের কোন ক্ষমতা নাই, তাহা আমরা দেখাইব। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন কথা বলার পূর্ব্বে আর একটী কথা বলিব:—মানুষ অবস্থার দাস, উপরে যে আমরা সময়ের পড়তার কথা বলিয়াছি, এই অবস্থা সেই সময়ের নামান্তর মাত্র। অবস্থানুসারে আমাদের মনে সদসৎ নির্ব্বিশেষে নানাপ্রকার ইচ্ছার উদয় হইতেছে, মানুষ যে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে, তাহার কারণও অবস্থা, পরস্পর দুই প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলে অপেক্ষাকৃত বলবৎ অবস্থায় যেন মানুষকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, অকস্মাৎ কোন অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে মানুষ আর চিন্তা করিবার সময় না পাইয়া উপস্থিত মত যা হয় একটা কাজ করিয়া বসিতেছে—অবস্থানুসারে সাধু ব্যক্তি যে সে চোর, এবং অসাধু সাধু হইতেছে, পণ্ডিত মূর্খের ন্যায় গণ্য হইতেছে এবং মূর্খ পণ্ডিতের আসন পাইতেছে। ঐ যে ব্যক্তি রাজতক্তায় বসিয়া রাজমুকুট মাথায় পরিয়াছে, উটী রঙ্গের গোলাম, উহার তিনপুরুষ গোলামতী করিয়াছে, অদৃষ্ট ক্রমে আজ ও ব্যক্তি পোষ্যপুত্র হইয়া রাজা হইয়াছে। তাসের সাতা আটার ন্যায় অনেক জন অস্পর্শীয় অতি নীচ ঘৃণিত জাতি, সমাজে যাহারা বদরঙ্গের মধ্যে গণ্য ছিল, কখন কোন কাজে আসে নাই, আজ তাহারা টেক্কা সাহেবের উপরও আধিপত্য করিতেছে, অবস্থানুসারে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ-

জাতীয় লোক তাহাদের দাসত্ব স্বীকার করিতেছে।

একই মানুষ কেহ ধনীর ঘরে জন্মাইয়া গাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়া পরমসুখে কাল কাটাইতেছে, আবার কেহ নির্ধনীর ঘরে জন্ম লইয়া উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছে। কেহ অন্ধ, কেহ খঞ্জ, কেহ বা কুব্জ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছে, এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, অদৃষ্ট না মানিয়া থাকা যায় না। অনেকে বলিয়া থাকেন, পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি বা দুষ্কৃতি অনুসারে পরজন্মে লোকে সুখ বা দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে—পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল অনুসারেই যদি আমাদের বর্ত্তমান সুখ দুঃখের অবস্থার উৎপত্তি হয়, তাহা হইলেও সেই অদৃষ্ট মানিতে হইল—পূর্ব্ব-জন্মে যে যেমন কাজ করিয়াছে, তাহার ফল তখন হইতেই স্থির হইয়া আছে, পূর্ব জন্মের কর্ম্মফল পরজন্মে ভোগ করিতেই হইবে, তবে আর আমাদের স্বাধীনতা কোথায় থাকিল? এ কথার উত্তরে, কর্ম্মফল বাদীরা বলেন, এ জন্মে ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া স্তবস্তুতি দ্বারা তাঁহার মন নরম করিতে পারিলে এবং কুগ্রহের পূজা অর্চ্চনা করিয়া তাহাদের সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলে যে কর্ম্ম-ফলের জন্য তোমাকে আজ বাঘে কামড়াইত, সেই স্থলে তোমাকে বিড়ালে আঁচড়াইতে পারে—তাঁহাদের মত যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে সকল কর্ম্মেরই একটা ফল নির্দ্দিষ্ট আছে এবং সেই ফলের তারতম্য করিবার ক্ষমতাও মানুষের আছে,—উপায়, দৈবক্রিয়া। কর্ম্মফল-বাদীগণের মতে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতি ও দুষ্কৃতির পুরস্কার ও দণ্ডস্বরূপে এই জন্মে আমরা সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি, আমাদের এই ভবের যন্ত্রণা মোচন করিবার জন্য তাঁহারা যখন ঈশ্বর আরাধনা ও গ্রহদেবতার পূজা অর্চ্চনার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন বোধ হয়, আমাদের সুখ দুঃখের কর্ত্তাই ঈশ্বর—তিনি যদি কর্ত্তা হইলেন, তবে গ্রহদেবতারা আবার কে? তাঁহারা বোধ হয়, ঈশ্বরের অনুচর হইবেন, এ ভব কারাগারের অধ্যক্ষতা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ঈশ্বর বিচার কর্ত্তা, তিনি হাকিম—যিনি হাকিম, তিনি বিচার করিয়া দণ্ডের হুকুম দিলে অধীনস্থ অনুচরবর্গ দণ্ডবিধান করিয়া থাকে। আমা-দিগের এই ভবকারাগার পালনের কর্ত্তা ঈশ্বর, কিন্তু এ কারাগারের খাটুনি দেওয়ার ভার বোধ হয়, গ্রহদেবতার উপর আছে। ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া যদি এ ভবের যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলে, তবেই মঙ্গল, নচেৎ গ্রহদেবতাদের পূজা দরকার—ঈশ্বর তোমাকে বাঘ দিয়া খাওয়ানের হুকুম দিয়াছেন, কিন্তু গ্রহদেবতাদের ঘুস দিয়া বশ করিতে পারিলে, তাহারা তোমার উপর বাঘের পরিবর্ত্তে বিড়াল লেলাইয়া দিতে পারেন এবং কড়ি দুকাহন বা শাড়ী দুখানা বেশী দিলে হয়ত কামড়ানের পরিবর্ত্তে আঁচড়ানের ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু স্তবস্তুতি করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, তাহারা হয়ত তোমাকে একেবারে ছাড়িয়াও দিতে পারেন।

ঈশ্বর বিষয়ে এ ভাবে চিন্তা করিলে তাঁহাকে মানুষ হাকিম অপেক্ষাও নিকৃষ্ট পদবীতে নামাইয়া আনা হয়। মানুষ হাকিমও স্তবে তুষ্ট হইয়া কখনও কোন আসা-মীকে দোষী জানিয়া ছাড়িয়া দেন না, যাহা মানুষ করে না, তাহাই ঈশ্বর করিবেন, এ

কেমন কথা, আমরা বুঝিতে পারি না। আবার যাহাদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেছ, তাঁহারা যে মর্ত্ত্যের জেলওয়ার্ডারদের মত ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া শুনিয়া, তোমার নিকট কিছু ঘুস খাইয়া, তোমাকে ছাড়িয়া দিবেন, ইহাই বা কেমন কথা, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ধারণ হয় না। ঈশ্বর নির্গুণ পুরুষ, তাঁর রাগ নাই, ক্ষমা নাই, সুখ নাই, দুঃখ নাই, তুষ্টি নাই, বিরক্তি নাই, তাঁহার আরাধনা করিতে ইচ্ছা হয় কর, কিন্তু নিষ্কাম হইয়া তাঁর উপাসনা কর, সকাম উপাসনার কোন ফল নাই। ক্রমশঃ।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

মার্শেয়েজ। (২)

জাতীয় মহাসভাও রাজাসহ পারি মহা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। এখানেও সভার নিয়মিত অধিবেশন হইতে লাগিল। সভা এক্ষণে শাসন বিধি, ব্যবস্থা প্রণালী ও রাজ্য-সংগঠন-নীতি প্রণয়নে নিযুক্ত। প্রাদেশিক সভা সমিতি ও মিউনিসিপালিটির আইন, তন্ত্র, এবং উহাদিগের সহিত জাতীয় মহাসভার সম্বন্ধ ইত্যাদি বিধি ও নিয়ম বিধিবদ্ধ করিবার জন্য সভা এক্ষণে ব্যস্ত। কিন্তু সভার কার্য্য অব্যাহত ভাবে এখন সম্পন্ন হইবার নয়। সভ্যদিগের মধ্যে সে একপ্রাণতা নাই। বিভিন্ন মতের অবতারণা হইয়াছে। কতকগুলি সভ্য এখন রাজার পক্ষে, কতকগুলি উন্মত্ত প্রজার পক্ষে, কতকগুলি পরিমিত ও ন্যায়ানুগত এবং বৈধ শাসনের পক্ষে। প্রত্যেক দল স্ব স্ব মুখপত্র স্বরূপ সংবাদ-পত্রগুলে বিভিন্ন মতের পোষকতা করিতেছে। দেশময়, সমুদয় ফরাসীরাজ্যে, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, সংবাদ পত্র সহযোগে বিভিন্ন মত প্রচারিত। পারি ও অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরে স্বতন্ত্র দলের সভা-সমিতি ও সংবাদ পত্র প্রতিষ্ঠিত। প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বক্তৃতা, আন্দোলন ও সংবাদপত্র প্রচার বাহুল্যে ফরাসী দেশ পূর্ণ। রাজতন্ত্রপ্রিয় ও প্রজাতন্ত্রপ্রিয় দলের প্রতিপক্ষতা ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত। রাজপক্ষীয় ষড়যন্ত্রকারীরা ক্ষুৎপীড়িত, উচ্ছৃঙ্খল প্রজাদিগকে ন্যায়ানুমোদিত শাসন বিধির বিরুদ্ধাচরণ করিবার নিমিত্ত উৎসাহিত করিতেছে। শস্য সংগ্রহের পথে সমূহ অন্তরায় সংঘটন করিতেছে। পলায়িত এবং পররাজ্যে আশ্রিত চল্লিশ সহস্রেরও অধিক অভিজাতগণ এবং রাজপক্ষীয়গণ অস্ত্র ধারণ করিয়া অষ্ট্রিয়ার সম্রাট লিওপোল্ডকে, তদীয় ভগিনী, ফ্রান্সের রাণী Marie Antionetteর জন্য ফরাসী রাজ্য আক্রমণ করিবার মন্ত্রণা ও উৎসাহ দিতেছে। রাজ্যের সৈন্যগণ বেতনাভাবে বিদ্রোহিতা অবলম্বন করিতেছে। রাজভক্ত বলীয়ান ও সাহসী বৈলো মহাসভার নিয়োগে উচ্চতম সেনা-নেতৃত্বে নিযুক্ত হইয়াও সঙ্গোপনে উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে মেট্জ নগরে রাজার মুক্তির জন্য পলায়িত অভিজাতগণ ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের সহিত সংগোপনে মন্ত্রণা করিতেছে। Marquis de Bouille একজন দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, অসমসাহসী রাজানুরক্ত লোক। বৈলোর প্রকৃত স্বদেশানুরাগের প্রতি

অনেক দিন হইতেই সাধারণ লোকেরা সন্দিহান হইয়াছিল। তথাপি বৈলো স্বীয় উচ্চ সাহস ও প্রতিভার জন্য সাধারণ কার্য্য হইতে অপসৃত হয় নাই। জাতীয় মহাসভা অনেক সময় ইহার জন্য উত্যক্ত হইয়াছেন। যখন মহাসভার সকল সভ্য শপথ গ্রহণ করিল, বৈলো একাকী তাহা গ্রহণ করেন নাই। কেবল, যখন রাজা স্বহস্তে লিখিয়া অনুরোধ করিলেন যে বৈলো যেন তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শপথ গ্রহণ করেন, তখনই বৈলো শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমরবিভাগের প্রায় সমুদয় অভিজাত কর্ম্মচারীগণ বিদেশে পলায়ন করিয়াছিল। বৈলো কেবল একাকী তখনও পর্য্যন্ত মেট্জ-দুর্গে সসৈন্যে রাজার কুশলের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তখনও বৈলো একাকী আপন সহচর ও সৈন্যদিগকে এবং নগরবাসীদিগকে রাজভক্ত করিয়া রাখিয়া ভবিষ্যতের আঁধার পানে চাহিয়া হতভাগ্য রাজার উদ্ধার জন্য পারিস্থ রাজপক্ষীয় ব্যক্তিদিগের সহিত গোপনে পরামর্শ করিতে নিযুক্ত। নান্সীর সৈন্যগণ অনেকদিন বেতন না পাইয়া বিদ্রোহিতা প্রদর্শন করিলে, বৈলো স্বীয় অসীম সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দ্বারা সেই প্রজ্বলিত-প্রায় সেনা-বিদ্রোহ নিবারণ করেন। কিন্তু বিনা শোণিত পাতে তাহা সাধিত হয় নাই। সাধারণ প্রজাগণ নান্সীর এই হত্যাকাণ্ডের সহিত বৈলোর নাম সংসৃষ্ট করিয়া তাঁহাকে অত্যাচারী, রাজভক্ত ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। দেশময় জনরব রাষ্ট্র হইল,—

"Bouille, beginning to bestir himself in the rural cantonments eastward is but a royalist traitor; that Chateau Vieux and Patriotism are sold to Austria."

এদিকে রাজা লুই ও রাণী Marie Antionette, Tuilleries প্রাসাদে বলপূর্ব্বক আনীত হইয়া এবং জাতীয় রক্ষকবৃন্দদ্বারা আবেষ্টিত হইয়া আপনাদের বন্দী জীবনের তীব্রতা অনুভব করিতেছেন। চতুর্দ্দিকে বিদ্রোহাত্মক ভাবের পরিচয়। নান্সীর সেনা-বিদ্রোহ, উত্তর দক্ষিণে প্রজাদিগের উন্মত্ত দাঙ্গা হাঙ্গামা ও বিদ্রোহিতা, শপথ-পবিত্রক-বিমুখ ধর্ম্মযাজকদিগের দারুণ অসন্তোষ, ক্ষুধার্ত্ত শ্রমজীবিদিগের ধর্ম্মঘট ও বিবাদ ইত্যাদি অশুভবার্ত্তা প্রতিনিয়ত কর্ণে উপস্থিত হইতেছে। অস্থির-চিত্ত রাজা উত্তর পূর্ব্ব সীমান্তে রাজভক্ত বৈলোর নিকট পলায়ন-মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেখানে পৌঁছিয়া বিশ্বস্ত বৈলো, অনুগত অভিজাতগণ এবং কুটুম্ব অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের সহায়তায় প্রজাপুঞ্জের বিদ্রোহিতা নিবারণ করিয়া, অগ্ন্যুৎপাতের সমুদয় পূর্ব্ব লক্ষণযুক্ত বর্ত্তমান ফরাসীরাজ্য শস্ত্রের বলে শাসন করিয়া, পুনরায় শান্তিস্থাপন করিবেন, এই মহা স্বপ্ন দেখিতেছেন। এতদভিপ্রায়ে সীমান্ত-রক্ষা বৈলোসহ অতি সংগোপনে গুপ্ত-মন্ত্রণা চলিতে লাগিল। ছদ্মবেশী অভিজাত চরগণ নিশাযোগে প্রবেশ-পত্র (tickets of entrance) প্রদর্শন করিয়া জাতীয় রক্ষীদল পরিবেষ্টিত প্রাসাদ মধ্যে অনায়াসে প্রবেশ করিয়া ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। পারি অভিমুখে অনেক নূতন সম্ভ্রান্ত লোক আগমন করিতেছে। রাজকীয় লোকদের জন্য গোপনে অস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। রঙ্গালয়ে, রাজপথে, জোয়াখানায়, কফিপান-গৃহে, ক্লবপরিষদে, কল্পক অভিজাতগণ হস্তে গুপ্ত-তরবারী লইয়া একত্রিত সমাগত হইতেছে। এতাদৃশ আভিজাতো

সাধারণ প্রতিনিধি হইলেও এক্ষণে রাজ-পক্ষে ক্রীত। সিংহ-প্রকৃতি, তেজস্বী, বাগ্মী মিরাবো রাণীর কোমল হস্ত স্পর্শে মেষ-শাবক সদৃশ হইয়া রাজার জন্য স্বদেশ ও স্বজাতির স্বার্থ বলিদানে প্রস্তুত। রাণী সংগোপনে নির্জ্জনে মিরাবোসহ পরামর্শে নিযুক্ত। অর্থ-বশীভূত প্রজা-প্রতিনিধি বিশস্ত প্রাণে নিরাশ-ভগ্ন রাণীর হৃদয়ে আশার অমৃত ধারা সিঞ্চন করিয়া, অভয় দান দিতেছেন—"রাজ্যরক্ষা হইবে, ভয় নাই। মেট্‌জনগরে রাজভক্ত বৈলো সসৈন্যে তত্রস্থ দুর্গ সংরক্ষণ করিতেছে। সেখানে চল্লিশ সহস্র জার্ম্মাণ সৈন্য আসিয়া জুটিতে পারে। আমাদের চল্লিশ সহস্রের অধিক পলায়িত সম্ভ্রান্তগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া কবলেণ্টজ নগরে বাস করিতেছে। তাহারা সকলেই আমাদের সহিত মিলিত হইবে। ইহাদের সমবেত সাহায্যে ফ্রান্সের রাজ-কীয়তা নিশ্চয়ই নিরাপদ হইবে।" রাণীর নিরাশাপূর্ণ আঁধার হৃদয়ে উজ্জল আশার রশ্মি প্রতিভাত হইল। কিন্তু হায়! মিরাবো অনতিবিলম্বেই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। হতভাগ্য লুই ও মেরির আশা প্রদীপও নির্ব্বাপিত হইল।

রাজ-প্রাসাদের ষড়যন্ত্র ও ছদ্মবেশী সশস্ত্র সম্ভ্রান্ত চরগণের আগমন, বৈলো ও জার্ম্মাণ সৈন্য—সকলই অচিরে সাধারণ্যে বিদিত হইল। সহস্র সহস্র সংবাদ-পত্র পক্ষে দেশময় অবিলম্বে রাষ্ট্র হইয়া গেল। প্রজা-পুঞ্জ মহাতঙ্কে শশব্যস্ত হইয়া দিবারাত্র অতি সাবধানতা সহ যাপন করিতে লাগিল। এক দিবস অতি স্বাভাবিক সন্দেহ-দোলায় প্রত্যেক পারিসী হৃদয় আন্দোলিত হইল। রাজপরিবার লুই স্বাস্থ্যের জন্য St. Cloud এ যাইবেন ও তথায় আগামী ইষ্টার পর্ব্ব সম্ভোগ করিবেন, এই জনরব তুলিয়া এক দিন সপরিবারে স্থানান্তরিত হইবার সমুদয় আয়োজন করিলেন। কিন্তু সন্দিগ্ধ-মনা পারি অধিবাসীগণ বলপূর্ব্বক রাজার সে উদ্যম ভঙ্গ করিয়া দিল। রাজা ও রাণী শকট হইতে অবতরণ করিয়া অধোমুখে, ঘৃণা ও লজ্জায় এবং অবমাননায় ম্রিয়মাণ হইয়া প্রাসাদে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই ব্যর্থ মনোরথ, ব্যথিত-হৃদয়, ও অপমানিত রাজ পরিবার অন্ত এক দিবস নিশাযোগে বৈলো ও অন্যান্য রাজভক্ত সম্ভ্রান্তগণের সাহায্যে দূর ভ্রমণের সমুদয় আয়োজন স্থির করিয়া, ছদ্মবেশে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া মেট্‌জ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। (২০ জুন, ১৭৯১)। কিন্তু দুর্ভাগ্য রাজাকে পরিত্যাগ করিল না। পথি মধ্যে Drouet নামক এক পোষ্ট মাষ্টার ছদ্মবেশী রাজার মুখের সহিত এ্যাসিনিয়া নামক কাগজ-মুদ্রায় অঙ্কিত রাজ প্রতিমূর্ত্তির সাদৃশ্য দেখিয়া, রাজাকে চিনিতে পারিল এবং তত্রস্থ জাতীয় রক্ষীদল সাহায্যে Varennes নামক এক ক্ষুদ্র পল্লী-সমীপে রাজাকে ধৃত করিয়া পুনরায় পারি অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত করিল। রাজা নিতান্ত বন্দীবেশে, সহস্র সহস্র জাতীয় রক্ষক পরিবেষ্টিত হইয়া পারিতে প্রত্যাগমন করিলেন। (২৫ জুন, ১৭৯১)।

ইত্যবসরে জেকবিন সম্প্রদায় ও ছিন্ন-বাস (Sansculottie) প্রজাগণ প্রকাশ্য পথে প্ল্যাকার্ড লাগাইয়া Republic বা সাধারণতন্ত্র ঘোষণা করিয়া দিল। পলায়ন-পর রাজাকে অতঃপর সিংহাসনচ্যুত করি-বার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রাদেশিক বিভাগ

হইতে আবেদন-পত্র ও প্রতিনিধি সভ্য জাতীয় মহাসভা সন্নিধানে প্রেরিত হইল। উদ্ধত প্রকৃতি মার্শেলিজ প্রতিনিধিগণ স্পষ্টই বলিল, "আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ একটা লৌহদণ্ড ভূমধ্যসাগরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইহা যতদিন না পুনরায় সাগর-বক্ষে ভাসমান হয়, আমরা কখনই আর দাস হইব না।" এইরূপে ফ্রান্সের সর্ব্বত্র ভয়ানক আন্দোলন হইতে লাগিল।

বিদেশী রাজন্যবর্গ ফরাসী রাজার অপমান ও দুর্দ্দশা দেখিয়া, তদীয় সাহায্যার্থ সমবেত হইলেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাট, প্রসিয়ার রাজা এবং ফ্রান্সের পলায়িত রাজবংশীয় ব্যক্তিগণ এক লিখিত সন্ধিপত্র দ্বারা সম্মিলিত হইলেন। (২৭ আগষ্ট, ১৭৯১। ইহাই Pilnitz convention নামে খ্যাত। এই সন্ধিপত্রের কথা শুনিয়া সমুদায় ফরাসী জাতি অগ্নিময় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইল এবং এই অনল রাশি ক্রমশঃ এতই প্রবল হইয়াছিল যে, পরবর্ত্তী পঞ্চবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত ইহা নির্ব্বাপিত হয় নাই।

জাতীয় মহাসভার আইন প্রণয়ন কার্য্য শেষ হইয়া গেল। রাজা মহাসভা প্রণীত বিধি গ্রহণ করিলেন। কার্য্য শেষ হওয়াতে সভা বন্ধ হইল। (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৭৯১)।

নূতন বিধি অনুসারে Biennial Legislative নির্বাচন আরম্ভ হইল। নির্বাচিত সভ্যগণ অধিকাংশই নূতন। পুরাতন সভ্য অতি অল্পই পুনঃ নির্বাচিত হইয়াছিল। সম্রান্ত প্রতিনিধি কেহই প্রেরিত হয় নাই। তাহারা সকলেই এখন কবলেন্টজ নগরে পলায়িত। নির্বাচিত সভ্যগণ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। এক দল বৈধ, পরিমিত মতবাদী এবং প্রণীত বিধির পক্ষপাতী; অপরদল অপরিমিত মতবাদী ও নূতন বিধির যথেষ্ট সম্মাননা করিতে প্রস্তুত নহেন। পূর্ব্বোক্ত দল Girondists বা (বলিবার রীতি অনুসারে) plains নামে খ্যাত; শেষোক্ত দল Jacobins বা Mountain নামে আখ্যাত। এই শেষোক্ত দলের অধিকাংশই উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মত্ত, বিদ্রোহাত্মক ও বৈধ শাসনব্যভিচারী, দরিদ্র ও বুভুক্ষু (Sansculottie) পক্ষীয়। জেকবিন সম্প্রদায়ই উত্তরোত্তর দেশ-শাসনের সমুদয় ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং পরে তজ্জন্য বিপ্লবের কালে ভীষণ আত্ম-বিদ্রোহের মধ্যে নর-শোণিতের ধারায় ফ্রান্সের বক্ষ প্লাবিত হইয়াছিল।

দুর্ব্বল রাজা লুই বাহ্যতঃ প্রজাভয়ে মহাসভা প্রণীত বিধি গ্রহণ করিলেও, সম্রান্ত ও শপথ পরিগ্রহ-বিমুখ উৎপীড়িত ও অসন্তুষ্ট ধর্ম্মযাজকদিগের জন্য বাধ্য হইয়া আবার গোপনে প্রজাবিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। Tuilleries প্রাসাদে একটি গুপ্ত অষ্ট্রিয়ান কমিটি গঠিত হইল। কবলেন্টজ নগরাশ্রিত পলায়িত ফরাসী রাজবংশ ও অভিজাতগণ এবং অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ও প্রসিয়ার রাজার সহিত পরামর্শ চলিতে লাগিল। রাণী অহোরাত্র Cipher অক্ষরে কবলেন্টজ সহ পত্র লিখিতেছেন। কথিত যে, এই সময়ে সমুদায় ইয়ুরোপ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে মন্ত্রণা করিয়া সন্ধি করিয়াছিল। স্পেন, ইটালী, ডেনমার্ক, সুইডেন, রুসিয়া পর্য্যন্ত ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অষ্ট্রিয়া ও প্রুসিয়ার সহায়তার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। যুদ্ধের সমুদায় আয়োজন মহাসমারোহে হইতে লাগিল। [illegible]

"Arms are a-hammering at Liege; three thousand horses ambling hitherward from the fairs of Germany: cavalry enrolling, likewise foot-soldiers * * * Their route of march towards France and the Division of the Spoil is marked out &c."

আবার

"Ranked at Coblentz, from 15 to 20,000 (French nobles and dignitaries and Authorities) stand now brandishing their weapons with the cry on on!"

Carlyle, French Revo

ফরাসীগণ এই সব সংবাদ শুনিল। সংবাদ-পত্র স্তম্ভে ফ্রান্সের চতুঃপ্রান্তে সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গেল, চার লক্ষের অধিক বিদেশী যোদ্ধা, পঞ্চদশ সহস্র পলায়িত ফরাসী অভিজাত সহ ফ্রান্সের অভিমুখে আসিতেছে। ভীষণ সংগ্রাম ও হত্যার সংবাদে গ্রাম্য ফ্রান্স মহাতঙ্কে উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে প্রধাবিত হইল। অস্ট্রিয়ানগণ, অভিজাতগণ এবং সর্ব্বোপরি দস্যুগণ আসিতেছে, অতি নিকটে আসিতেছে, এই জনরব শুনিয়া লোকেরা গৃহ, কুটীর পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া আর্ত্তস্বর তুলিয়া পলাইতে লাগিল। কে কোথায় যায়, তাহার স্থিরতা নাই। এক ভয়ানক, অবর্ণনীয় উত্তাল বিভীষিকায় সমুদায় ফ্রান্স বিপর্য্যস্ত, বিকম্পিত ও ত্রাস্ত। কার্লাইল অতি সুন্দর ভাষায় এই সময়ের কথা লিখিয়াছেন।

"In the months of February and March, it is recorded, the terror, especially of rural France, had risen even to the transcendental pitch: not far from madness In town and Hamlet is rumour, of war, massacre: that Austrians, aristocrats, above all, that *the Brigands* are close by Men quit their houses and huts, rush fugitive, shrieking, with wife and child, they know not whither. Such a terror, the eye-witnesses say, never fell on a nation; nor shall again fall, even in Reigns of Terror expressly so-called. The countries of the Loire, all the central and south-east regions, start up distracted, 'simultaneously as by an electric shock';—for indeed grain too gets scarcer scarcer The people barricade the entrances of towns, pile stones in the upper stories, the women prepare boiling water; from moment to moment, expecting the attack. In the country, the alarm-bell rings incessant, troops of peasants, gathered by it, scour the highways, seeking an imaginary enemy They are armed mostly with scythes stuck in wood; and, arriving in wild troops at the barricaded towns, are themselves sometimes taken for Brigands'"

Carlyle, French Revo Part II p. 69.

সুবিখ্যাত ফরাসী গ্রন্থকার Taine তাঁহার French Revolution গ্রন্থে এই সময়ের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"And now the overthrow of this (the ascendency of the populace State) is announced to them, a league against them of foreign kings, the emigrants in arms, an invasion imminent, the Croats and Pandours in the field, hordes of mercenaries and barbarians crowding down on them again to put them in chains—From the workshop to the cottage there rolls along a formidable outburst of anger accompanied with national songs denouncing the plots of tyrant and summoning the people to arms.' —*Taine's Revo* p. 108, Vol. II

এই অগ্নিময় সময়ে মার্শেয়েজ সংগীতের জন্ম। বৈদেশিক ও স্বদেশীয় শত্রুগণের আক্রমণ, স্বাধীনতা লোপ ও পরাধীনতা আশঙ্কা ফ্রান্সের প্রত্যেক হৃদয়কে এই সময়ে আলোড়িত করিয়া রাখিয়াছিল। প্রত্যেক স্বদেশপ্রাণ, স্বদেশভক্ত ফরাসী এই মহাশঙ্কায় বিক্ষুব্ধ, বিকম্পিত, উত্তেজিত ও উদ্বেলিত। গৃহ, পরিজন, জন্মভূমি, স্বাধীনতা পরকবলিত হইবে, এই বিষম দুশ্চিন্তার পেষণে ফরাসীপ্রাণ উন্মত্ত। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ভদ্র, কৃষক, ধনী, নির্ধন বৃদ্ধ, যুবা, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা— সকলেরই নিরাশ প্রাণের বিষাদ-রেখা পাণ্ডু বদনে স্পষ্ট অঙ্কিত। এক অননুভূত পূর্ব্ব আতঙ্কে ফরাসীগণ বিহ্বল ও স্তম্ভিত। স্বদেশহিতৈষী কত্তেও, অসংখ্য স্বদেশ-বৎ-

গণ, স্বাধীনতা বিলোপাশঙ্কায় সশঙ্কিত ও বিক্ষুব্ধ ফরাসীর মধ্যে একজন। স্বদেশের আসন্ন বিপদে রুজের হৃদয়ও চিন্তিত ও ভয়াকুলিত। দেশব্যাপ্ত এক সর্ব্বজনীন ভয়-বিহ্বলতা, পরাধীনতার ঘৃণা কণ্টকময় শৃঙ্খল-বন্ধন ভীতি, বীরহৃদয়, ভাবপ্রবণ রুজের হৃদয়তন্ত্রীকেও ঘৃণা ও ক্রোধ নিরাশা ও ভীতির বিসদৃশ ভাব পরম্পরায় বিচলিত করিয়াছিল। রুজে বিখ্যাত কবি নাহেন। বস্তুতঃ তাঁহার অন্য পদ্য রচনার তেমন খ্যাতিও নাই। কিন্তু এই অমর সংগীতের রচয়িতা বলিয়া রুজে কেবল ফরাসী জাতীর ইতিহাসে নহে, সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে অমর হইয়াছেন। তাঁর উৎসাহ পূর্ণ, উত্তেজনাময় ভাবোদ্দীপ্ত হৃদয়ের এক অতি শুভ মুহূর্ত্তে, এক গভীর অসাধারণ মহেন্দ্রক্ষণে এই বিশ্ব উন্মাদকারী মৃত-সঞ্জীবক অমর সংগীত বিরচিত হইয়াছিল। রুজে তাই এই এক অতুল্য সংগীত দ্বারাই কাব্য-জগতে অমরত্বলাভ করিয়াছেন। ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীপতিচরণ রায়।

ফুল (কবিতা ও গান।) *

কবিতা রচনার উদ্দেশ্য নিজের ও অন্যের চিত্তে তদ্দ্বারা সুখ সঞ্চার করা। ইহার একটি মুখ্য—অপরটি গৌণ। নিজের সুখ মুখ্য লক্ষ্য—অপরের সুখ গৌণ কামনা। কবিতা যাঁহারা লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহারা তদ্দ্বারা অন্যকে সুখী করিয়া নিজে সুখী হইতে চাহেন। ফলতঃ মানবের কর্ম্মমাত্রেরই উদ্দেশ্য সুখ সম্ভোগ ও দুঃখ নিবৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং "কবিতা রচনার উদ্দেশ্য সুখপ্রাপ্তি," কেবলমাত্র এই কথা বলিলে, একপ্রকার কিছুই বলা হইল না। তাই, আমরা বলিয়াছি, কবিতা রচনার উদ্দেশ্য অন্যের চিত্তে সুখ সঞ্চার করিয়া নিজের চিত্ত সুখানুভব করা। আর কর্ম্মমাত্রেরই সাধারণ উদ্দেশ্য যাহা, তাহা পরিত্যাগ করিয়া বলিলে বলিতে হয়, কবিতা রচনার উদ্দেশ্য তৎপাঠকের চিত্তে সুখ সঞ্চার করা। যিনি যে পরিমাণে কবিতা দ্বারা অন্যের মনে সুখ সঞ্চার করিতে সক্ষম, তিনি সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ কবিতা-লেখক। এই হইল, সুখের পরিমাণ বা মাত্রা (Quantity) ভেদে কবিতার তুলনা। ইহা ছাড়া কবিতার আর এক প্রকার তুলনা আছে, সেটি কবিতা পাঠকের মনে উৎপন্ন সুখের গুণ (Quality) ভেদে। এক কথায়, কবিতার তুলনা তদ্দ্বারা পাঠকের চিত্তে সঞ্চারিত সুখের গুণ ও মাত্রা (Quality and quantity) ভেদেই করিতে হয়। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

সুখের মাত্রাভেদ কি, তাহা আর বলিব না। সহজেই তাহা বুঝা যায়। সুখের গুণ-ভেদ কি, তাহাই একটু বলিব। আমাদিগের যে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক,—আছে এবং যে পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে—বাক্য, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ—ইহার প্রত্যেকটি দ্বারাই মনে সুখ

* শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ১১ নং ভবন হইতে শ্রীশশিভূষণ রক্ষিত কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা।

সঞ্চারিত হইতে পারে। এই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারাই পাঞ্চভৌতিক জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ হয়। এই ইন্দ্রিয়গুলির আত্মা স্বরূপ" আমাদিগের মন অধিষ্ঠিত করিতেছে। কেহ কেহ এই মনকেও এক' ইন্দ্রিয় করিয়া "একাদশ ইন্দ্রিয়ধারী মানব" বলিয়া থাকেন। কেহ বা মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই চারিটিকেই অন্তরিন্দ্রিয় নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, এই চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয় দ্বারাই লোকের সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল সুখ এক প্রকারের নহে। কোন প্রকার সুখ পরিণামে তজ্জনিত দুঃখভোগের সম্ভাবনা বিরহিত, কোন প্রকার সুখ পরিণামে তজ্জনিত তদপেক্ষা গুরুতর দুঃখের সম্ভাবনা বিশিষ্ট, আবার কোন প্রকার সুখ পরিণামে তজ্জনিত তদপেক্ষা লঘুতর দুঃখের সম্ভাবনা বিশিষ্ট। কোন প্রকার সুখ আবার দীর্ঘকাল ভোগ্য, কোন প্রকার সুখ অল্পকাল ভোগ্য। আবার এই সঙ্গে মাত্রাভেদে সুখের প্রকারভেদ মিশ্রিত করিলে, তীব্র, তরল, ও পরিণাম ভেদে সুখের বিবিধ শ্রেণী কল্পিত হইতে পারে। ইহার দুই একটি অতি স্থূল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি।

ভগবানে ভক্তিজনিত সুখ, দয়াধর্ম্মের অনুশীলন জনিত সুখ, মনুষ্যে প্রীতিজনিত সুখ, এই সকল সুখই পরিণামে তজ্জনিত দুঃখভোগের সম্ভাবনা বিরহিত—দীর্ঘকাল ভোগ্য অতি প্রগাঢ় সুখ। আবার এদিকে কামুকের পরস্ত্রী গমন জনিত সুখ, চৌরের পরদ্রব্য অপহরণ জনিত সুখ—পেটুকের অতি ভোজন জনিত সুখ—ইহারাও সুখই বটে, কিন্তু ইহা অল্পকাল ভোগ্য ও পরিণামে তজ্জনিত দুঃখভোগের সম্ভাবনাযুক্ত সুখ। আবার উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট বিবিধ সুখেরই মাত্রাভেদ আছে। সামান্য দয়াধর্ম্মাদি জনিত সুখ অপেক্ষা ভগবদ্ভক্তি জনিত সুখ মাত্রায় বেশী। অতি ভোজন সুখ অপেক্ষা পরস্ত্রী সহবাসে সুখ বেশী। গুণভেদে সুখের শ্রেণী বিভাগ সহজ—পরিণামের ফল তারতম্যে তাহা সহজেই করিতে পারা যায়। মাত্রাভেদে সুখের প্রকারভেদ করা বড় কঠিন, কারণ তাহার নির্দ্দিষ্ট কোন আদর্শ নাই। একের পক্ষে যাহা অধিক মাত্রায় সুখপ্রদ হয়, অন্যের পক্ষে তাহা তদ্রূপ না হইতেও পারে। সে যাহা হউক—সুখের যে গুণ ও মাত্রাভেদে প্রকার ভেদ আছে, ইহা নিশ্চত। এখন আমরা কবিতা পাঠ জনিত সুখের কথা বলিব।

এই কবিতার সংজ্ঞা লইয়া অনেক গোল আছে। কেহ বিবিধ ছন্দোময়ী বচন গাঁথাকেই কবিতা বলিয়া থাকেন, কেহ বা রসযুক্ত ভাষণমালাকেই কবিতা বলিয়া থাকেন। কাহারও দৃষ্টি কেবলমাত্র বাক্যের বিন্যাস-বিলাস বা বহির্বেশ প্রভৃতি—কাহারও বা দৃষ্টি কেবলমাত্র বাক্যের ভাব গৌরব বা অন্তঃশক্তি প্রভৃতি। আমরা ইহার দুইকেই কবিতা বলি। নিয়মিত তান লয়যুক্ত ভাষা গ্রন্থিও কবিতা—তাহাতে চিত্তে সুখ সঞ্চারিত হয়—শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা। আর রসযুক্ত ভাষণমালাও কবিতা—তাহাতে চিত্তে সুখের সঞ্চার হয়, মনের ভাববিকাশ দ্বারা। আর, এই দুইটি গুণ, তানলয় ও ভাব গরিমা যাহাতে আছে, সেই-ই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবিতা। এতদ্ভিন্ন অলঙ্কারের জোরে কবিতা পদে প্রণয়িনীর দীর্ঘশ্বাসও অভিহিত হয়, বিরহিণীর নয়ন, জলও

অভিহিত। হয় ;—কুসুমও অভিহিত হয়, কামিনীও অভিহিত হয়, আর চিত্তবিক্ষোভী রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, গুণাত্মক সামগ্রী বা ঘটনাও অভিহিত হয়। কিন্তু আমাদের ব্যবহৃত কবিতা শব্দাত্মিকা ও অক্ষরাত্মিকা-পাঠকবর্গই এই কথাটি মনে রাখিবেন।

কবিতার এইরূপ সংজ্ঞা স্থির করিয়া, আমরা এক্ষণ পরীক্ষা করিয়া দেখিব, সেই কবিতা পাঠে পাঠকের মনে কেন এবং কিরূপে সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। প্রথমে দেখা যাউক, কবিতা পাঠে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয়ের পরিচালনা হইয়া থাকে। এ কথার উত্তর অতি সহজ। কবিতা পাঠে শ্রবণেন্দ্রিয় ও দর্শনেন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য কোন বহিরিন্দ্রিয় পরিচালিত হয় না। ইহার মধ্যে আবার কবিতা পাঠ জনিত দর্শনেন্দ্রিয় পরিচালনার কোন সুখই হইতে পারে না। তবে কি কবিতা পাঠজনিত সুখ কেবলমাত্র বাহিরের শ্রবণেন্দ্রিয় জনিত? তাহা নহে। কবিতা পাঠের সুখ সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয় জনিতই হইতে পারে। তাহাই এখন দেখাইতে চেষ্টা করিব।

যেমন আমাদিগের বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মসাধন হইয়া থাকে, তেমনই আবার মনেরও কতকগুলি গুণ দ্বারা ঐ প্রকার জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুকরণ হইয়া থাকে। মনের সেই সকল গুণ—স্মৃতি—কল্পনা, তুলনা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহার একটি সামান্য দৃষ্টান্ত এইখানে প্রদর্শন করিলেই চলিবে।

আমি অদ্য চক্ষু দ্বারা একটি ফুলের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিলাম—ত্বক দ্বারা তাহার কোমলতা স্পর্শ করিলাম, নাসিকা দ্বারা তাহার সুগন্ধ অনুভব করিলাম, জিহ্বা দ্বারা তাহার রস আস্বাদন করিলাম। কিন্তু কল্য আমার সম্মুখে এই ফুলটি উপস্থিত রহিল না—তথাপি মনের গুণ বিশেষ দ্বারা সেই চক্ষুর কার্য্য, ত্বকের কার্য্য, নাসিকার কার্য্য, ও জিহ্বার কার্য্য অনুকৃত হইতে পারিবে। মনের এই গুণ বিশেষকেই স্মৃতি বলে। তার পরে—কল্পনা ও তুলনা প্রভৃতি গুণ। এই সকল দর্শনতত্ত্বের অতিরিক্ত বর্ণন এখানে নিষ্প্রয়োজন। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কবিতা পাঠ জনিত সুখ, এই স্মৃতি তুলনা ও কল্পনা জনিত। মন কবিতা পাঠে বিবিধ প্রকার ইন্দ্রিয় সুখ স্মরণ ও সম্ভোগ করিতে সক্ষম। সুতরাং যেরূপ অন্য প্রকার সুখেরও গুণ মাত্রাভেদে তুলনা চলে, কবিতাপাঠ জনিত সুখেরও সেইরূপ গুণ মাত্রাভেদে তুলনা চলে। ফলতঃ এই গুণ ও মাত্রা উভয়বিধ বিচার দ্বারাই কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব ও নিকৃষ্টত্ব বিচারিত হওয়া উচিত।

কবিতার এবম্বিধ গুণ বিচারে অনেক শ্রেষ্ঠ কবির আসনও নিম্নে আনিতে হয়, অনেক নিকৃষ্ট কবির আসনও ঊর্দ্ধে উঠাইতে হয়। সাধারণতঃ মাত্রাভেদেই কবিতার তুলনা হইয়া থাকে। যে কবিতা যত রসোন্মেষকারী, যত সুখপ্রদ, সেই কবিতার আসন তত উচ্চে স্থাপিত হইয়া থাকে। ইহা আমার মতে অতি অবৈধ। মনে করুন, কাহারও কবিতা পাঠে আমার মনে প্রভূত সুখ সঞ্চারিত হইল। কিন্তু সে সুখ নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয়জ—কলুষিত ও বিকৃত। তাহাতে আমাকে পাপকার্য্যে প্রমত্ত করিতে চাহিল। আমি কি এই কবিতাকে প্রশংসা করিব? কার্য্যকারিতা

যা উৎপন্ন সুখের মাত্রা দ্বারা যদি বিচার করিতে হয়, তবে ইহাকেই শ্রেষ্ঠ কবিতা বলিতে হইবে। কিন্তু প্রকৃত বিচার ইহাতে হইল না। ইহার বিচারে সুখের প্রকারটা দেখিতে হইবে। নিকৃষ্ট সুখ অধিক মাত্রায় উৎপাদন করিতে যে নৈপুণ্য, যে পারদর্শিতার আবশ্যক না করিতে পারে, উৎকৃষ্ট সুখ অল্প মাত্রায় আমদানি করিতে তদপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্য ও পারদর্শিতা আবশ্যক করিতে পারে। কিন্তু বলিতে কি, এখন দেশে এই নিকৃষ্ট প্রকার সুখসঞ্চারকারিণী কবিতা-মালারই আদর অধিক—তাহারই ছড়াছড়ি অধিক। কোন কবিতা পড়িয়া লেখকের নৈপুণ্যবলে তুমি অতুলনীয় রূপ, অনিন্দনীয় যৌবনকান্তি, দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলে—অননুভূত ভালবাসার অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস অনুভব করিতে পাইলে—মনে তজ্জন্য কলুষিত আনন্দ উৎপন্ন হইল, চিত্ত বিমোহিত হইল, লেখককে বাহাবা দিলে—বলিলে "বা কি শ্রেষ্ঠ কবি!" কিন্তু এই শ্রেণীর কবিতার প্রতি লোকের ঘৃণা থাকা উচিত। যাঁহারা এইরূপ কবিতা লিখিয়া থাকেন—তাঁহারা ধর্ম্মের শত্রু, সুনীতির শত্রু, সমাজের শত্রু, পৃথিবীর শত্রু। এই যে প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন যে, এখনকার নব্য সম্প্রদায় কবিতা গ্রন্থ পড়িয়া বিকৃতমনা হইয়া যাইতেছে, তাহার মূলে জ্বলন্ত সত্য বিরাজিত। এই শ্রেণীর অধিকাংশ কবিতারই বিষয় "ভালবাসা"। কে না বলে, ভালবাসা একটি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি—কিন্তু যে পর্য্যন্ত ইহা ঈশ্বরাভিমুখী না হইবে, ধর্ম্মাভিমুখী না হইবে, সে পর্য্যন্ত ইহা অতি নিকৃষ্ট বৃত্তি। শোধিত সর্পবিষ অমৃত তুল্য হইলেও, অশোধিত সর্পবিষ হলাহল। এই ভালবাসার শ্রেষ্ঠত্বের দোহাই দিয়া- প্রেমের প্রশস্তভাব দোহাই দিয়া জগতে অসংখ্য লোক সঙ্কীর্ণ, কলুষিত ও বিকৃত প্রণয়ে পরিলিপ্ত হইতেছে। কবিগণ জগতের অসংখ্য লোকের এইরূপ কলুষিত প্রণয় উত্তেজিত করিয়া তাহাদিগকে অতল পাপসাগরে নিমজ্জিত করিতেছেন। সঙ্গীতের এই অশুভ ফল, লোকে হাতে হাতেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাই সেদিকে অভিভাবকগণের বেশ দৃষ্টি আছে। কিন্তু কবিতার এই অশুভ ফল প্রতি এখনও সেরূপ কাহারও দৃষ্টি পড়িতেছে না। হায় দুরদৃষ্ট। জগতের সর্ব্বত্রই ধর্ম্মের ভাগে অধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি। ধর্ম্মের কৃত্রিম ছায়াটুকু না পাইলেও, অধর্ম্ম এতদিন পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইত। আমি পাঠকবর্গকে এই শ্রেণীর কবিতাগুলি একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, ইহা পড়িতে পড়িতে মনোরাজ্যে কি এক সুন্দর বিলাসভবন গঠিত হয়। সেকালের নবাবের বিলাস ভবনও ইহার নিকট হারি মানে। দেখিতে পাইবেন, ইহা পড়িতে পড়িতে কবিতা-সুন্দরীগুলি কেমন তালে তালে অঙ্গভঙ্গী করতঃ হাবভাব প্রকাশ করিতেছে। কি সুন্দর বিলাস চেষ্টা। কি মনোহর ঢল ঢল ভাব, ছল ছল চাহনি, মৃদু মৃদু দোলনি! কোথায় লাগে ইহার কাছে মেনকা উর্ব্বশীর নৃত্য—রোহিণী সুন্দরীর প্রকোষ্ঠশোভিত কঙ্কণ শিঞ্জন সংমিশ্রিত তবলার মনোহর নিক্কণ? কিন্তু "কবিতা" কি কেবল এই শ্রেণীর সুখোৎপাদনেই সক্ষম? তাহা নহে। তাহা হইলে আমি কবিতাকে বারবিলা-

সিনীর ন্যায় অস্পৃশ্যই মনে করিতাম। কবিতার ক্ষমতা বিস্ময়করী। কবিতা মানবকে দেবতা করিতে পারে। কবিতা মানব মনে সুবুদ্ধির বিকাশ ও ধর্ম্মে উত্তেজনা প্রভৃতি জনিত শ্রেষ্ঠ সুখ প্রদান করিতে সক্ষম। তাই কবিতার এত আদর। রামপ্রসাদের সঙ্গীতময়ী কবিতায় স্বয়ং ভগবতী সাক্ষাৎ হইয়াছিলেন। কবিতায় মানব মনে স্বজন প্রীতি, স্বদেশানুরাগ, ভগবদ্‌ভক্তি, ঈশ্বরে বিশ্বাস সকলই বিকাশ করিতে সক্ষম। যে কবিতা তাহাই করিয়া মানব মনে সুখ সঞ্চারিত করে, তাহাই কবিতার রাণী। আর সব দাসী ও গণিকামাত্র।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, এই শ্রেণীর কবিতা এখন বড়ই দুষ্প্রাপ্য। যাহা আছে, তাহাও আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত মাত্রাধিকারে বড়ই অবনত। তবু আমরা ইহাকেই শ্রেষ্ঠ পদ দিতে ইচ্ছা করি।

আমাদের অদ্যকার আলোচ্য কবিতা গ্রন্থখানির নাম "ফুল"। ইহার পরিচয়স্থলে জনৈক প্রবীণ সমালোচক লিখিয়াছেন—

"ফুল বলিলেই কেবল বেলা, মল্লিকা, চামেলি, গোলাপ, গন্ধরাজ বুঝিতে হইবে না—রাজাজবা, নীলী অপরাজিতা প্রভৃতি যন্ত্রপুষ্পও ফুল বটে। যন্ত্রপুষ্পের সেবনে হৃদ্‌যন্ত্র উৎসারিত হয়। এই 'ফুলের' মধ্যে শ্মশান নামে ফুলটি সেইরূপ মহা-যন্ত্র-পুষ্প। ইহার সেবনে সেই মহাক্ষেত্র শ্মশানচারী সেই মহাদেবকেই মনে পড়ে।

* * * *

তাহাতেই বলিতেছিলাম, এমন যন্ত্র-পুষ্প দর্শনে মহাযন্ত্রীকেই মনে পড়ে। শ্রীমান হারাণচন্দ্রের এই ফুলদল মধ্যে এইরূপ যন্ত্র-পুষ্প দুই চারিটি আছে বলিয়াই, আমি ভাবুকবৃন্দের নিকট ইহার পরিচয় দিতেছি। অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।"

ইহা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত ও প্রকৃত সমালোচনা আর কিছুই হইতে পারে না। ইহার প্রতি কথা সার্থক—শেষের "অপরাধ গ্রহণ করিবেন না" পর্য্যন্তও অর্থযুক্ত। আমরা যাহা লিখিব, তাহা এই সংক্ষিপ্ত সুন্দর সমালোচনার বিস্তৃতি ও বিকৃতি ভিন্ন আর কিছুই হইবে না। তবু যে নামে প্রবন্ধ ধরিলাম, তাহার সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতেই হইবে।

"ফুল" ও "কবিতা"য় বড়ই সুন্দর সাদৃশ্য আছে। ফুলে ভগবানের পূজাও হয়, বিনোদিনীর বিলাস শয্যাও হয়। ইহা দেবাদিদেব মহাদেবের মস্তকেও স্থান পায়, বারবণিতা বিলাসিনীর কবরীতেও স্থাপিত হয়। কেহ বা ইহার পবিত্র আকৃতি, পবিত্র সুরভি দ্বারা ধীর মনে ভগবদ্ভক্তির বিকাশ করেন, কেহ বা ইহার কোমল স্পর্শ ও মাদক সুগন্ধ দ্বারা পাপ-লালসা পরিবর্দ্ধিত করেন। কবিতারও ঐরূপ দ্বিবিধ ব্যবহারের কথা আমরা বলিয়াছি। তাই বলিতেছিলাম—কবিতা ও ফুল অনেকটা একই প্রকারের বটে।

এখন দেখা যাউক, আমাদের হারাণ বাবু এই কবিতাকে কোন্ কার্য্যে প্রয়োগ করিয়াছেন। কবিতার নাম "ফুল" দেখিয়া আমরা কিন্তু প্রথম ভাবিয়াছিলাম, ইহা বুঝি দেব সেবার ফুল নহে, দেবী সেবার ফুল। কিন্তু গ্রন্থের উৎসর্গপত্র, সূচীপত্র ও পরিচয় পড়িয়াই আমাদের সে সংস্কার দূরীভূত হইল। এ ফুল দিয়া বিনা সূতায়মালা গাঁথিয়া হারাণ বাবু কাহারও কণ্ঠে স্থাপন করেন নাই—ইহা চন্দন-চর্চ্চিত করিয়া তিনি তাঁহার পিতৃদেবের পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছেন। পরে সূচীপত্রের বিষয় মধ্যেও ফুলের যে সকল নাম পাইলাম— তদ্দ্বারা কোন অরসিক অন্য পর্য্যন্তও প্রণয়ি-

নীর মালা বচে নাই। "সে প্রতিমা" ছাড়া কবরী ভূষণ আর একটি ফুলের নামও ইহাতে দেখিতে পাইলাম না। পবে পরিচয়ে জানিলাম যে ইহাতে ২।৪টি যন্ত্রপুষ্পও আছে। আশঙ্কা বিদুরিত হইলে আমবা গ্রন্থখানি পড়িতে লাগিলাম।

এই গ্রন্থ পড়িয়া আমরা যে প্রগাঢ় আনন্দ অনুভব করিয়াছি—এ কথা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয়। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বোক্ত গুণ বিচারে এ কবিতা অতি উচ্চ শ্রেণীর। ইহার আদ্যোপান্ত প্রায়ই ধর্ম্মভাব জড়িত। গ্রন্থকাব কবিতাকে আহ্বান করিয়া লিখিতেছেন,—

"কাব্যরস পানে মত্ত ভাবুক সুজনে,
ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান পথ দেখাও মা তুমি,
কঠোরতা—নির্ম্মমতা তোমার সেবনে,
যায় দূরে বিষয়ীর তমঃগুণ আমি।'

ইহা দ্বারাই এই কবি কিরূপ কবিতা-প্রিয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। সঙ্গীতেবও ইনি উচ্চ আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। ইনি পাঠকের মনে যে সুখ সঞ্চারিত করিতে চাহেন, তাহা অতি পবিত্র ও প্রগাঢ়। এই জন্য তাঁহাকে উচ্চাসন দিলে লজ্জিত বা অন্যের নিকট অপরাধী ভাবিবাব বিশেষ কোন কারণ নাই। তবে এই শ্রেণীর কবিতা লিখিয়া কার্য্যকরী করা, বড় কঠিন। এই শ্রেণীর কবিতা দ্বারা পাঠকের চিত্ত সংমোহন সামান্য ক্ষমতার কার্য্য নহে। তাই কবির প্রবন্ধেব নামে যে ভাবোন্মাদী-পনা হয়, প্রবন্ধের পরিচয়ে তাহা পরিবৃদ্ধি হয় না। সে ভাব হৃদয় স্পর্শ করে মাত্র—মন জড়াইয়া ধবে না। কবিব কবিতায় সঙ্গীতেব ইঙ্গিত বা স্বরলিপি আছে—স্বর-সংযোজনা নাই। তাহা পাঠকের করিয়া লইতে হইবে। ২।৪টি এমনই স্বরলিপি আছে যে, ভাবুক তদনুযায়ী সুর তান সংযোজনা করিয়া লইলে অতি অপূর্ব্ব সঙ্গীতই গীত হয়। সেইরূপ স্বরলিপিকেই অক্ষয় বাবু মহা যন্ত্র-পুষ্প বলিয়াছেন। সাধক তাহা পাইলে উপাসনার সিদ্ধকাম হইতে পাবেন।

আমরা এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত দেখিতে চাহি। বিলাস ভবনে বসিয়া ধীরোন্মত্তভাবে বিলাসিনীব নাচ গান ঢেব শুনিয়াছি—এখন এইরূপ একটু ভালবকমের হবি সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে চাহি। ভরসা কবি—এই হারাণ বাবুই কালে আমাদিগের সে আশা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়।

ভক্তিকথা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩৯৬। মঙ্গলস্বরূপে যাহার জলন্ত, জীবন্ত ও অটল বিশ্বাস ও তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, সে-ই রোগ শোকে, দুঃখ দরিদ্রতায়, তাঁহার মঙ্গল মূর্ত্তি দেখিয়া সুখী হয়। ঈদৃশ বিশ্বাস ও নির্ভরই আত্মার প্রকৃত বল। সেই বলে আমরা ঈশ্বর দর্শন ও তাঁহার পবিত্র সহবাস যেমন ভোগ করিতে পারি, তেমন আর কিছুতেই পারি না।

৩৯৭। যিনি সার্ব্বভৌমিকরূপে পূর্ণ-স্বরূপ ঈশ্বরকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য-

সাধন করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্ম। আর যিনি ঐকদেশিকভাবে ঐ দুইকার্য্য করেন, তিনি নিরাকারবাদী হইয়াও আধ্যাত্মিক পৌত্তলিকতা দোষে দূষিত হন। তাঁহার অপ্রশস্ত, অনুদার, ক্ষীণ, হীন মনঃপ্রাণ, ভূমা মহান্ ঈশ্বরের অসাম্প্রদায়িক ও বিশ্বব্যাপী ভাব ধারণ করিতে পারে না। তাঁহার সঙ্কীর্ণ মনঃপ্রাণ ব্রাহ্ম জীবনের অযোগ্য। তিনি অতি কৃপাপাত্র।

৩৯৮। যথার্থ ধর্ম্ম, জ্ঞান, তর্ক ও ভাষা-বিদ্যার ফল নহে। উহা ঋষি ও ভক্তদিগের জীবনগত সামগ্রী। ভক্তনাথ স্বয়ং উহা তাঁহাদিগকে দান করিয়া আসিতেছেন। যতই তাঁহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত পাঠে তাঁহাদিগের সেই লব্ধজ্ঞান জ্ঞাত হইবে ও তাহা নিজ জীবনে পরিণত করিতে পারিবে, ততই তোমার মঙ্গল হইবে, ততই সুখ শান্তি-লাভ করিবে, ততই ধার্ম্মিক হইবে।

৩৯৯। যিনি অনন্ত, তিনিই আবার আমাদিগের প্রতিজনের অন্তরের অন্তরতম! ইহাই তাঁহার আশ্চর্য্য মহিমা ও লীলা।

৪০০। মানব জীবনের আদর্শ পূর্ণ-মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বর, অপূর্ণ মনুষ্য নহে। সে যতই গুণশালী হউক না কেন, নির্দ্দোষ নহে। তদ্ব্যতীত বড বড লোকেরা বিশেষ বিশেষ কার্য্য ভার লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা কি প্রকারে সাধারণ ব্যক্তিবর্গের জীবনের আদর্শ হইবেন? আমরা তাঁহাদিগের বিশেষ বিশেষ গুণানুকরণে যত্নশীল হইব। কিন্তু সেই পূর্ণ মঙ্গলময় ও পূর্ণ পবিত্রস্বরূপের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা ও তাঁহার অভ্রান্ত জ্ঞানগর্ভ আদেশই আমাদিগের জীবনের আদর্শ। তাহাই আমাদিগের জীবনের নেতা, তাহাই আমাদিগের পরিচালক।

৪০১। আমাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল দুই ভাগে বিভক্ত। যথা উত্তম ও অধম।

কাম:—উত্তমাঙ্গ—কর্ত্তব্য জ্ঞানে বিহিত বিধানে সন্তানোৎপাদনের শক্তিচালন। অধমাঙ্গ—রিপুর উত্তেজনায় ন্যায্য বা অন্যায্যরূপে তৎ সন্তোষ সাধন।

ক্রোধ:—উত্তমাঙ্গ—স্থিরতর ও গম্ভীরভাবে অন্যায়াচরণের প্রতিবাদ। অধমাঙ্গ—রাগের উত্তেজনায় ক্ষিপ্তের ন্যায় ক্ষণিক ব্যবহার অথবা যাহার প্রতি রাগ হইয়াছে, প্রতিজ্ঞা সহকারে তাহার অনিষ্ট সাধনের চেষ্টা।

লোভ:—উত্তমাঙ্গ—ধর্ম্মের অবমাননা না করিয়া ইন্দ্রিয়-সুখ-সেব্য সামগ্রীর আহরণ ও ধনমানাদির অর্জ্জন। অধমাঙ্গ—অসদ্বিবেচনা ও অসদাচরণ দ্বারা পানাহারাদিতে মগ্ন হওয়া ও অর্থ ও মর্য্যাদা-লাভের চেষ্টা।

মোহ:—উত্তমাঙ্গ—ঈশ্বরকে না ভুলিবার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ইহ সংসারের সমস্ত কার্য্যসাধন। অধমাঙ্গ—তাঁহাকে ভুলিয়া এই ভবসংসারে মগ্ন হওয়া।

মদ:—উত্তমাঙ্গ—আপনার মান মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অহংজ্ঞান ও আত্মাদরের অধীন হইয়া চলা। অধমাঙ্গ—বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মানাদির অল্পবৃদ্ধিতে স্ফীত হইয়া অহঙ্কার অভিমানাদির অধীনতা নিবন্ধন অপরের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ।

মাৎসর্য্য:—উত্তমাঙ্গ—পরশ্রী দৃষ্টে আপনার শ্রীবৃদ্ধির ইচ্ছা ও চেষ্টা। অধমাঙ্গ—পরশ্রীকাতরতা।

৪০২। সাধক যতদিন না রিপুকুলের উত্তেজনায় উত্তেজিত না হইয়া, কেবল

ঈশ্বরাদেশ পালনোদ্দেশে ও কর্ত্তব্যজ্ঞানে তাঁহার জীবনের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারগ হন, ততদিন তিনি ঐ ষড়্‌রিপুর উত্তমাঙ্গাপেক্ষা উন্নত অবস্থাতে উপনীত হইতে পারিবেন না। ঐ অবস্থা লব্ধ হইলে পর ক্রমে ক্রমে তাঁহার ঈশ্বর-সহবাস স্পৃহা এতদূর বলবতী হইয়া উঠিবে যে, তিনি ব্যাকুলিত ও সরল প্রাণে তাঁহার মঙ্গলপূর্ণ চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া তাঁহার প্রেম-জলধিতে মগ্ন হইতে থাকিবেন। তখন তিনি নিষ্কাম ও অনাসক্ত হইয়া ঐ দেব-দুর্লভ ক্রিয়াতেই প্রবৃত্ত থাকিবেন। তখন তিনি আপনাকে হারাইয়া ঐশ্বরিক প্রেম পাথারের গভীর হইতে গভীরতর প্রবাহে প্রবাহিত হইয়া জগৎকে ব্রহ্মময় দেখিবেন ও কতই শান্তি, মঙ্গল, অমৃতানন্দাদি ভোগ করিতে থাকিবেন। ইহাই যথার্থ বৈরাগ্য, ইহাই সাধকের ইহজীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা।

তমোগুণ বিশিষ্ট লোকেরাই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগের অধমাবস্থার অধীন হইয়া চলে। যাহাদিগের রজঃগুণাধিক্য, তাহারাই ঐ প্রবৃত্তিদিগের উত্তমাঙ্গ পালনে সমর্থ হয়। সত্বগুণের বলেই পূর্ব্ববর্ণিত কর্ত্তব্য জ্ঞানে কার্য্য করিবার সামর্থ্য হয়।

যাঁহারা ঐ তিন গুণের অতীত উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রেমময়ের প্রেমপাথারে মগ্ন-ক্রিয়ায় উল্লিখিতরূপে রত হইতে পারেন।

৪০৩। সত্যরূপে অসত্যের পূজা করাই যথার্থ পৌত্তলিকতা। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বিশেষের চরিতার্থতা হেতু দেবমূর্ত্তির আরাধনাদি মানব সমাজের ভয়ানক অনিষ্টকারী। সাত্ত্বিকভাবে প্রতিমা পূজা তদ্রূপ নহে। ব্রহ্মজ্ঞানাভাবে ঐ প্রকার সকাম সাকারোপাসনা করা আত্মোন্নতির বিঘ্ন-প্রদায়ক।

৪০৪। ক্রোধ দ্বারা কামাদিকে পরাজয় করাই তাহার সার্থকতা।

৪০৫। মানব জীবনে ঈশ্বর পূজার নিম্নলিখিত কয়েকটী গতি দৃষ্ট হইয়া থাকে।

১। অনন্ত আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ নক্ষত্র, নদ নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, বন, উপবন, প্রসারিত প্রান্তর প্রভৃতি নানা নৈসর্গিক পদার্থ ঈশ্বরের প্রকাশিত মহিমাই তাহার উপাস্য হয়।

২। ঐ সকল পদার্থে ও নানা ঘটনায় তাঁহার জ্ঞানকৌশল ও মহান্ ও অদ্বিতীয় শক্তির পূজা সে করিয়া থাকে।

৩। সে সেই সর্ব্বশক্তিমানও সর্ব্বত্র বিদ্যমান ভূমাকে নির্জীব ও সজীব সমস্ত পদার্থের ও তাহার প্রাণের প্রাণরূপে দেখিয়া তাঁহার উপাসনা করে।

৪। সাধক তাহার পাপের জন্য সেই দয়াময়ের নিকট কাঁদিতে থাকে। তিনি তখন পাপহারী হরিরূপ ধারণ করিয়া তাহার কাতর প্রাণে প্রকাশিত হন ও তাহার পাপ হরণ করেন।

৫। সাধক কায়মনোবাক্যে সেই প্রেমময়ের প্রেম পাথারে মগ্ন হইতে থাকেন। সে মগ্নক্রিয়া ক্রমে বাড়িতে থাকে। তাহার আর শেষ নাই। ভক্ত গভীর হইতে গভীরতর জলে যতই প্রবেশ করে, ততই আর গভীর হইতে গভীরতর প্রবাহে সে প্রবাহিত হয়। এইরূপে সে মঙ্গলময়ের মঙ্গলপূর্ণ চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া অহংজ্ঞান হারায় ও তাঁহার প্রেমসুধা পান করিতে থাকে। ইহাই ইহ জীবনের চরম সাধন।

শ্রীকানাইলাল পাইন।

ঋষিদিগের ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্ত্ব ও নত্ব জ্ঞান।

কোন্ মানব, আত্মার দ্বার সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিয়া, আত্মার গভীরতম প্রদেশে স্বীয় জ্যোতিতে বিরাজমান পরম পুরুষের পরমরূপ প্রদর্শন করিতে পারিয়াছে? সেই আদি কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, কোন্ উপদেষ্টা সেই আদিদেবের স্বরূপ নিঃশেষে বর্ণনা করিতে সক্ষম হইয়াছেন? কে তাঁহার স্বরূপের অন্ত করিয়াছে? কোটী কোটী জগত যাঁহার এক ইঙ্গিতে মহাশূন্যের মধ্য দিয়া সবেগে ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, আমরা এই সামান্য পৃথিবীর ক্ষুদ্র জীব হইয়া সেই মহাপুরুষের স্বরূপ কি নিরূপণ করিব? কিন্তু যখন নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরের সহিত আমাদের নিকট-সম্বন্ধের বিষয় চিন্তা করা যায়, কিম্বা যখন বিপদের কশাঘাত আমাদের আত্মাকে তাঁহার চরণপ্রান্তে উপনীত করে, তখন, যদিও তাঁহার স্বরূপ আমরা সম্পূর্ণ ধারণা করিতে না পারি, তথাপি আমাদের আত্মা নিতান্ত নীরব থাকিতে পারে না। তখন আমরা তাঁহাকে ডাকিতে থাকি, "পিতা তুমি, পুত্র আমি,' জাগ্রত কৃপা তোমারি দীন জনে।" তখন তাঁহাকে পিতা বলিয়া, মাতা বলিয়া, সখা বলিয়া, প্রাণের প্রাণ বলিয়া, আত্মার আত্মা বলিয়া ডাকিলে তবে আত্মার তৃপ্তি হয়।

আজ আমরা যেমন ঈশ্বরের বিষয় জানিবার পিপাসু হইয়াছি, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋষিরাও এইরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া ধ্যানমগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা ধ্যানবলে যখন সেই জ্যোতির্ম্ময় "প্রাণস্য প্রাণং" পরম পুরুষের আভাস আত্মায় অনুভব করিলেন, তখন তাঁহাদের অন্তরে এক গভীর প্রশ্ন উত্থিত হইল যে, এই পরম পুরুষ কি? "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃকেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ। কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং কউ দেবো যুনক্তি॥" কাহার ইচ্ছায় প্রাণ কর্ম্ম করিতেছে, কাহার ইচ্ছায় লোকেরা বাক্য বলিতেছে, কোন্ দেবতা চক্ষু কর্ণকে উপযুক্ত বিষয় সমূহে নিয়োগ করিতেছেন? এই প্রশ্ন অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিন কালকে এক সূত্রে সম্বদ্ধ করিয়া দিতেছে। এই একই প্রশ্ন ছিল, আছে এবং থাকিবে। এই প্রশ্নের উত্তরে তলবকার ঋষি প্রথমেই বলিলেন যে "শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোহবাচং সউ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" এই পরমপুরুষ তিনিই, যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ এবং চক্ষুর চক্ষু। তিনি ধ্যানের উচ্ছ্বাসে দেখিলেন যে, আমাদের যাহা কিছু, সকলেরই মূলকারণ তিনি।

এইরূপ জ্ঞানকেই ঈশ্বর সম্বন্ধে ভাবপক্ষীয় জ্ঞান বলা যাইতে পারে—ইহাকেই আমরা তাঁহার সম্বন্ধে সত্ত্বজ্ঞান বলিব। এই সত্ত্বজ্ঞানই অধিকতররূপে প্রচার করা আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য—ইহারই উপর আমাদিগের অধিক ঝোঁক দেওয়া কর্ত্তব্য। পবিত্রহৃদয় ঋষি তলবকারের আত্মা হইতে প্রথমেই এই সত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হইল,—

"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোহবাচং সউ প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষুঃ।" এই সত্ত্ব-জ্ঞান আত্মাতে পরিস্ফুট হওয়াই ঈশ্বরে নির্ভর অবিচলিত থাকিবার এক প্রধান উপায়। এই সত্ত্বজ্ঞান যদি একবার আমাদের আত্মাতে মুদ্রিত হইয়া যায়, তবে আমরা চৈতন্যের ন্যায় বলিতে পারিব যে, যেখানেই যাইনা কেন, সর্ব্বত্র তাঁহাকেই দেখিতে পাই—তখন তাঁহাতেই আমাদের তৃপ্তি, তাঁহাতেই আমাদের সুখশান্তি সকলই।

ক্রমে ঋষিরা যখন এই সত্ত্বজ্ঞান আরও গভীররূপে আলোচনা করিতে লাগিলেন, তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে নত্ত্বজ্ঞানও তাঁহাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইতে লাগিল। পত্রের যেমন এ-পিঠ ও-পিঠ,দুই পিঠ আছে, সকল বিষয়ের যেমন এ-দিক ও-দিক দুই দিক্ আছে, ঈশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞানেরও তেমনি সত্ত্ব ও নত্ত্ব দুই দিক্ আছে। ঋষিরা যতই ঈশ্বরকে শ্রোত্রের শ্রোত্র, প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মারূপে বুঝিতে পারিলেন, ততই তাঁহারা ইহাও বুঝিতে লাগিলেন যে, পরিমিত পদার্থের কিছুই ঈশ্বর নামে অভিহিত হইতে পারে না। তাঁহারা বলিলেন, "অথাত আদেশোনেতি নেতি নহ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং।" (বৃহদারণ্যক শ্রুতি) ইহা নহে, ইহা নহে, এই রূপই ব্রহ্মের নির্দ্দেশ, ইহা নহে, ইহা অপেক্ষা তাঁহার অন্য উৎকৃষ্ট নির্দ্দেশ নাই। ঋষি তলবকার বলিলেন "যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধিনেদং যদিদমুপাসতে।" যিনি বাক্য দ্বারা বর্ণনীয় নহেন, যাঁহাদ্বারা বাক্য প্রেরিত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে যে কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখনো ব্রহ্ম নহে। "যন্মনসা নমনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং। তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধিনেদং যদিদমুপাসতে।" লোকে মনের দ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান, লোকে যাহা কিছু পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে, তাহা কখনো ব্রহ্ম নহে। পরিমিত কোনো পদার্থই যে ঈশ্বর নহে, এইরূপ জ্ঞানকেই আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে নত্ত্ব-জ্ঞান বলিতেছি, ইহাই ঈশ্বর সম্বন্ধে আমাদের চিরপ্রসিদ্ধ "তত্ত্ব জ্ঞান।"

ঋষিদিগের উক্তিতে ঈশ্বর বিষয়ক সত্ত্ব ও নত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল গভীর তত্ত্বলাভ করিলাম, আমরা তদতিরিক্ত কি বলিতে পারি? আমরা তাঁহাদিগেরই কথায় বলিতে পারি "ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যেনস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে।" যে সকল ব্রহ্মবাদী আচার্য্য আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা ইহাই শুনিয়াছি, ইহাতে আমাদিগের স্বকপোল-কল্পিত কিছুই নাই। এই জ্ঞান লাভ করাই হিন্দুধর্ম্মের চিরন্তন উপদেশ—ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহাই শিক্ষা দেন। ভারতবাসীর অন্তরে যখন এই সত্ত্ব ও নত্ত্ব-জ্ঞান দৃঢ় মুদ্রিত হইয়া যাইবে, তখনই ভারতের প্রকৃত উদ্ধার সাধিত হইবে। তখন আমরা সুদূর ভবিষ্যতে বর্ত্তমান থাকিয়া, সুদূর অতীতে সমাহিত তপোবর্দ্ধিত ঋষিদিগের সহিত এক হৃদয়ে সাবধান বেদমন্ত্রে ঈশ্বরের নিকট আত্ম-নিবেদন করিয়া পরম শান্তি লাভ করিব। তখন অতীত বর্ত্তমানকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিবে। এবং বর্ত্তমানও অতীতকে ভক্তি-ভরে আলিঙ্গন করিবে। ঈশ্বর সেই শুভদিন শীঘ্রই প্রেরণ করুন। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

স্বামী।

১

কোথাকার, কারছেলে কে জানিত তোমারে,
কোন্‌দেশ উজলিয়া বিরাজিতে সংসারে?
প্রবাসী বালিকা আমি,
কে চিনিত কেবা তুমি?
ঘুমন্ত পরাণে ছিনু আঁখি মুদি, কাতরে,
কোথা হ'তে এসে তুমি জাগাইলে আমারে?

২

কোন্ উপাদানে তুমি হইয়াছ গঠিত?
কি মহা কৌশলে তুমি হইয়াছ রচিত?
কোন্ মহামন্ত্র বলে,
প্রাণ মন কেড়ে নিলে?
নিরাশায় যে পরাণ নিরবধি ব্যথিত,
কেমনে করেছ তায় আশা বীজ নিহিত?

৩

ফুলের সুষমা বুঝি হু'করেতে তুলিয়া,
কোকিলের কণ্ঠ হ'তে মধুটুকু খুলিয়া,
অথবা নিকুঞ্জ বনে,
বসন্তের সমীরণে,
শ্যামের বাঁশরী হ'তে স্বরটুকু আনিয়া,
গড়েছেন বিধি তোমা বিরলেতে বসিয়া।

৪

কি এক সুধার উৎস দিয়াছ হে খুলিয়া,
খর স্রোতে প্রাণ মাঝে নিতি যায় বহিয়া!
সীমা হ'তে সীমান্তরে,
ভূতলে গগন'পরে
বহে সে অমিয়া ধারা; বিশ্ব যায় মাতিয়া,
অনন্ত তরঙ্গে যাই আপনারে ভুলিয়া!

কিবা মধুময় চিত্র হেরি ওই আননে,
তুচ্ছ মরজীবী আমি বর্ণিব তা কেমনে?
ফুট শতদল শত,
ও বদনে বিরাজিত,
হেন মনোমদ ছবি হেরি নাই জীবনে;
নয়নে রয়েছ লাগি—শয়নে কি স্বপনে!

শ্রীঅন্নদাসুন্দরী ঘোষ।

তিনখানি চিত্র।

(১)

কাল ভুজঙ্গিনী মত চরণ চুম্বিত বেণী,
কটিতে বসন সুচিকণ,
ফুটি'তাহা সৌন্দর্য্যের প্রদীপ্ত কিরণ ছটা
বাহিরায়, ঝলসে নয়ন।
গর্ব্বিত স্পর্দ্ধিত যেন উন্মত্ত উরসে হায়
বাসনার অনল উচ্ছ্বাস,
দৃষ্টিতে বিদ্যুৎ হানে কেবা স্থির ত্রিভুবনে,
সদা বিশ্ব বিজয়ের আশ।
শীলতার লেশ নাই, রুচি তার?—তার ভয়ে
অতি দূরে করে পলায়ন।
যেখানে যেরূপ ভাব, সেইরূপ মূর্ত্তি তার
যেন বহুরূপী কেমিলন্।
বিলাস সাগরে শয্যা, কিন্তু বুকে বাড়বাগ্নি,
শুষ্ক কণ্ঠ আকুল সদাই;
যাহা পায় পূরে বুকে, ব্রহ্মাণ্ড করিলে পান,
সে তৃষ্ণার বুঝি শান্তি নাই!

(২)

পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন দেহ বাস সমুদয়
অথচ সে বিলাসিতা নাই।
সৌন্দর্য্য গরব বটে আছে কিছু মনে মনে
যতক্ষণ মুকুরের ঠাঁই।

চোকে চোক পড়িলেই বসনে বদন ঢাকা,
ফিরে দেখ আর সেথা নাই।
চুরি ক'বে দেখিবাব সাধ কিন্তু চিরদিন,
'কোমলতা বেশী সব চাই॥
অথচ সহিষ্ণুতায় পাষাণো হারিয়া যায়;
চিরদিন ভয়-বিহ্বলতা।
হৃদে—প্রেমপারাবার, সংযমের বেলা-ভূমি,
ভাঙ্গনের ভয় নাহি কদা॥
রোগে শোকে, সুখে দুখে সূর্য্যমুখী মত সদা
এক রবিপানে চেয়ে রয়।
তাহারি অভাব হ'লে অমনি ঢলিয়া পড়ে
সে যেনগো আপনার নয়॥
তাহারি সুখের তরে সকলি করিতে পারে,
অথচ সে জানে না ঈর্ষায়।
দুরাকাঙ্ক্ষা নাই মনে,যা আছে তাতেই সুখী,
জীবনেতে এক শান্তি চায়॥

(৩)

মানুষের ধার করা আদর-মমতা-স্নেহ
পায় নাই, জানে না কেমন।
স্বভাবের অযাচিত অযত্ন লব্ধ স্নেহে
পালিত বর্দ্ধিত আজীবন॥
বিস্ময়-স্ফারিত নেত্রে ভীতি-শূন্য চেয়ে রয়,
বস্ত্র-ঢাকা লাজ নাহি জানে।
বিলোল কটাক্ষ নাই, কি এক সারল্য, মরি
ঢালা তার বদনে নয়নে।
'স্বর্গ পবিত্রতা ছানি' তুলিয়ে সৌন্দর্য্য-সার
দেহ, বুঝি, গঠিত তাহার।
বার মাস চেয়ে দেখ নাহি ঝলসিবে আঁখি
ছুঁতে সাধ হবে না তোমার।
নির্ম্মল নির্ঝর জলে সে বন সৌন্দর্য্য রাশি
প্রতিভাত হেরিলে কখন,—
বিমূঢ়,—চাহিয়া রয়, বুঝিতে পারে না, তার
সৌন্দর্য্যের কিবা প্রয়োজন।
বিস্ময় বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিলে সে মুখে কেহ
লুকাবার নাহিক প্রয়াস,
খোলা প্রাণ, খোলা ভাব, জড় সড় কিছু নাই
হৃদয় মধুর বার মাস।
জলধির মত তার অন্তরে প্রণয়-রত্ন,
সদা তারে লুকাইতে চায়।
সে জানে,সে ভাবে মনে,'দোষ যেন ভালবাসা,
দোষী সেই ভালবেসে চায়।'

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দান ও গ্রহণ।

এই ভারতবর্ষে সচরাচর দুই শ্রেণীর লোক দেখা যায়,—এক শ্রেণীর লোক অবিচারিত ভাবে দান করিতেছে, আর এক শ্রেণীর লোক ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে। যাঁহাদিগের ধনসম্পত্তি আছে, তাঁহারাই দিতেছেন; আর যাহাদের কল্পিত বা প্রকৃত অভাব সম্পত্তি, তাহারাই প্রত্যাশী হইয়া গ্রহণ করিতেছে। দাতারা দিয়া দিয়া ক্লান্ত, শ্রান্ত; গৃহীতারা পাইয়া পাইয়া বাসনার আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে, আরো পাইবার আশায় মাতিতেছে। দাতারা কি ভাবিতেছেন, গৃহীতারাই কি করিতেছে, একবার অনুধাবন করি।

মৌমাছি যেরূপ মধুচক্রকে সর্ব্বক্ষণ একাগ্রচিত্তে বেরিয়া থাকে, গৃহীতারা দাতাদিগকে, সেইরূপ, সর্ব্বক্ষণ আবেষ্টন করিয়া থাকে। ভিখারীর জন্যে, এই পৃথিবীর অনেক

ধনী লোক হস্তকে চিরকালের জন্য বিশ্রাম দিয়াছেন; দ্বারে অনাহারে লোক মরিলেও অনেক ধনী সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না। কেন না, তাঁহারা জানেন, যাঁহারা একবার হস্ত প্রসারণ করিয়াছেন, এ জীবনে আর তাঁহাদিগের হস্ত গুটানের সম্ভাবনা নাই,—বিষয় সম্পত্তি সমস্ত নীলামের করে সমর্পণ করিয়াও তাঁহারা নিষ্কৃতি পান নাই। তাঁহারা জানেন, অযথা দানে পুণ্যের পরিবর্ত্তে বৃথা মানুষকে অলস করা হয়, অথচ ভিখারীর মনোবাঞ্ছা কখনও পূর্ণ হয় না। ধন-স্পৃহা কখনও মানুষের কমে না। দশ পাইলে শত, শত পাইলে সহস্র, সহস্র পাইলে লক্ষ পাইতে মানুষের সাধ যায়। কেবল তাহাই নহে। এক জনকে দশ পাইতে দেখিলে, অপর ভিখারীর শত পাইতে বাসনা হয়। না পাইলে, দাতার চৌদ্দপুরুষের বাপান্ত করিয়া তবে সে ক্ষান্ত হয়। একজনকে তৃপ্ত কর, দশজন হাজির হইবে, দশজনকে তৃপ্ত কর, শত, শতকে কর, সহস্র ভিখারী তোমার দ্বারস্থ হইবে। এইরূপে ভারতবর্ষে কোটী কোটী ভিখারীর উদ্ভব হইয়াছে। বিনাক্লেশে দিনগুটানের ইহাপেক্ষা আর সহজ উপায় নাই? তুমি যত বড় ধনীই হওনা কেন, কত দিন তুমি এরূপ ভিখারীর অভাব দূর করিতে পারিবে, বলত? চেষ্টা করিতে পার, কিন্তু তাহার পরিণাম কি? যাহাকে দশ দিয়াছ, সে বলিতেছে, শত দিলে না কেন? যাহাকে শত দিয়াছ, সে আক্ষেপ করিয়া রটনা করিতেছে, সহস্র দিলে না কেন? দিয়া ত তুমি কেবল অপ-যশই ক্রয় করিতেছ; অথবা দিয়া দিয়া কেবল মানুষকে অলস করিতেছ, পৃথিবীর ইহাতে কোন উপকার নাই। মানুষের শক্তি, এই-রূপে, নিঃশেষ করিয়া তুমি নরহত্যাপরাধে অপরাধী হইতেছ। কৃপণ ধনীরা এইরূপ কথা বলেন। এই সকল কথার মধ্যে সত্য নাই, তাহা নহে, কিন্তু কোন কোন সদাশয় ধনী, ভাবোচ্ছ্বাসে, অপরের অভাব দেখিয়া ঠিক থাকিতে পারেন না, দিবার প্রবৃত্তিতে তিনি যেন মাতোয়ারা। পতঙ্গ আগুনে পড়িবার জন্য যেমন উল্লসিত, তিনিও অন্যের বাসনার আগুনে ঝাঁপ দিতে তেমনই লালায়িত। এই আগুনে পড়িতেছেন, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বশতঃ আর উঠিতে পারিতেছেন না, কাহার প্রকৃত অভাব, শেষে তাহাও ঠিক করিতে পারিতেছেন না। কাজেই অবি-চারিতভাবে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়া, অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াও নিষ্কৃতি পাই-তেছেন না। দেশের কি শোচনীয় অবস্থা।

আমরা একজন সদাশয় ধনীর কথা জানি। তিনি যেন দান করিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ইষ্ট বন্ধু ও কুটুম্ব-দিগকেও জানি। যাঁহাদিগকে জানি, তাঁহা-দিগের প্রায় সকলেই তাঁহার নিকট হইতে কিছু আদায়ের চেষ্টায় আছেন। এতদিন তিনি যাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন, এখন তাহাদের অভিসন্ধি বুঝিয়া কিছু অপ্র-তিভ হইয়াছেন। একদিন দুঃখ করিয়া তাই বলিতেছিলেন—"এখন লোক দেখিলেই ভয় হয়, মনে হয়, এও বুঝি কিছু চাহিতে আসি-তেছে। দিবানিশি, যে ব্যক্তি কাছে আসে, সে-ই কিছু চায়; হায়, টাকাকড়ি ত দূরের কথা, একটু নিঃস্বার্থ প্রেমও কেহ দেয় না। দিয়া দিয়া এখন শ্রান্ত হইয়াছি, আর কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। কিছু দিনের জন্য দান বন্ধ করি!" যে দিন বন্ধু এইরূপ বলিলেন, তার পর দিনই শুনিলাম,

তিনি আবার বহুজনকে টাকা দিয়াছেন। এই বন্ধু যতজনের উপকার করিয়াছেন, যতজনের সাহায্য করিয়াছেন, তিনি আর একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন, সে সকলেই তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা এবং নিন্দা ঘোষণা করিতেছে। আমরাও, তাঁহার প্রশংসা, কাহারও নিকট শুনি নাই। পাইয়া পাইয়া, সকলেই, তাঁহার নিকট হইতে আরো আদায়ের জন্য লালায়িত। আত্মমর্য্যাদা-বোধ এখন এত হীন হইয়াছে যে, ভিক্ষা করা এখন একশ্রেণীর লোকের স্বভাব হইয়াছে। বিবিধ প্রকারে তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া তবে যেন গৃহীতাদের ব্রত সাঙ্গ হইবে। দিন দিনই এজন্য লোকের গতায়াত বৃদ্ধি হইতেছে, দিন দিনই আবেদন সংখ্যা বাড়িতেছে। চক্ষুলজ্জায় বা ভাব-দায়ে তিনি হতবুদ্ধি হইয়া অকূল দান-সাগরে ভাসিতেছেন॥

আমরা একজন গৃহীতাকেও জানি। তিনি সার্ব্বভৌমিক উদার ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী। তিনি প্রেমিকও বটেন। তাঁহার ধারণা ও বিশ্বাস এই, জগৎ তাঁহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য। ধনী লোকদের ঘরের অতুল ধন রাশি যেন তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের সাহায্যের জন্যই। তিনি পাইয়াছেনও অনেক, কিন্তু অনেক চতুর লোক, তাঁহাকে সোজা পথ দেখাইয়া, কেবল অনুরোধ-পত্রে দয়ার ভার অপরের হাতে দিয়া, বিদায় করিয়া দিয়াছেন বলিয়া তিনি ইদানীং বড় বিরক্ত হইয়াছেন, একদিন আক্ষেপ করিয়া তাই বলিতেছিলেন, "লোকগুলো অধঃপাতে গিয়াছে, হাতে জোলাপ দিলেও কিছু বাহির হয় না।" এইরূপ গালাগালি দিবার পর-ক্ষণেই তাঁহাকে আবার অন্যের দ্বারস্থ হইয়া কিছু চাহিতে দেখিয়াছি। যে ব্যক্তি এক সময়ে অন্যকে গালি দেয়, সেই লোকই সময়ান্তরে অন্যের দ্বারস্থ হইয়া ভিক্ষা চায়। আত্ম-নির্ভরের এতই সম্মান। সে যেন নিজের হাতকে সদা উন্মুক্ত রাখিয়াছে—যেন যে চাহিতেছে, তাকেই সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতেছে। নিজের হাত গুটাইয়া, অন্যের দ্বারস্থ হওয়া ও অন্যকে এইরূপে গালি দেওয়া কিম্বা মানুষের দয়ার উপর জোর জবরদস্তি করা ধর্ম্ম কি না, জানি না, কিন্তু ইহা জানি, ইহার জন্যই অনেক দাতা কৃপণ হইয়াছেন, অনেক ধনী চিরদিনের জন্য দ্বার রুদ্ধ করিয়াছেন। অন্যদিকে, অনেক লোক, অবস্থা অনুকূল থাকা সত্ত্বেও, ভিখারীর দলে নাম লেখাইয়া অলসতার প্রশ্রয় দিতেছে। সকলেরই সীমা আছে। অবিচারিত দানেরও সীমা থাকা উচিত, অবিচারিত গ্রহণেরও সীমা থাকা উচিত। নিজের শক্তি সামর্থ্য প্রয়োগ করিয়াও কেহ উদরান্ন না পায়, সে ভিক্ষা করে, তবুও সহ্য হয়, কিন্তু নিজ শক্তি না খাটাইয়া, অন্যের দ্বারস্থ হওয়া যে কতদূর নীতি বিরুদ্ধ কাজ, কে না জানে? দান করিয়া রাজা পথের ভিখারী হইবেন, ইহাও ভাল নয়, ভিক্ষা করিয়া লোক অলসতার দুগ্ধনিভ শয্যায় শয়ন করিবে ও চর্ব্ব্য চুষ্য দ্বারা দেহ পুষ্ট করিবে, এবং অন্যের নিন্দা দ্বারা জিহ্বা কলুষিত করিবে, ইহাও ভাল নয়।

বুদ্ধিমান প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা, এই জন্য, উভয় শ্রেণীর মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান। তাঁহারা অন্যকে অনুরোধ-পত্র লিখিয়া দিয়া, দয়ার ভার অন্যহস্তে ন্যস্ত করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকেন। তাঁহারা মানুষকে স্বাবলম্বনের অতিরিক্ত

স্থানে যাইতে দিতে তত অভিলাষী নহেন। এইজন্য,সদাশয় ধনী এবং উদার (?) ভিখারী উভয়ই তাঁহাদিগকে কৃপা ও ঘৃণার চক্ষে দেখেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, তাঁহারা কি ঘোরতর অন্যায় করেন?

তোমার পিতার শ্রাদ্ধে ঘোরঘটা হয় না, তোমার পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা হয় না, তোমার কন্যাদায় উপস্থিত, কিম্বা তোমার তীর্থ দর্শন বা ধর্ম্মপ্রচার হয় না কিম্বা আর কোন ভাল কাজ হয় না,— তোমার দরিদ্রের সেবা কি দেবসেবা হয় না, সে জন্য ধনীর কি, বল ত? বিধাতা তোমারও হাত পা দিয়াছেন, তাঁহারও দিয়াছেন, তিনি হাত পা খাটাইয়া বা পুণ্যবলে তাঁহার পিতার অর্জ্জিত দশ টাকা পাইয়াছেন, তুমি তাহা পাইবার জন্য বিস্ফারিত নয়নে তাকাইয়া রহিয়াছ কেন? তোমার শক্তি খাটাইয়া দশ টাকা সঞ্চয় কর, ব্যয় কর, পিতৃদায়, কন্যাদায়, হইতে উদ্ধার হও। তুমি এত দিন চেষ্টা কর নাই, সে জন্য অন্যে দায়ী হইতে পারে না। তুমি একটা ধর্ম্মমত জীবনের সার করিয়া ধরিয়াছ, জগতের দ্বারে তোমার সেই মত দিতেই হইবে? কেহ বাধা দিতেছে না, দেও, প্রচার কর, কিন্তু সে জন্য অন্যের নিকট প্রত্যাশা কর কেন? বিধাতা তোমার কি সর্ব্বজন-সুলভ হাত পা দেন নাই? তুমি পরোপকার ব্রত লইয়াছ, ভাল কথা, তুমি অর্থোপার্জ্জন কর, চাকুরী করিয়া দশ টাকা উপার্জ্জন কর,—দরিদ্র-সেবায় অকাতরে তাহা ব্যয় কর, কে নিষেধ করে?—অন্যের দয়ার উপর জোরজবরদস্তি কর কেন? অন্যে অযাচিত-ভাবে তোমার সাহায্য করেন, ভালই, গ্রহণ কর, কিন্তু অন্যে সাহায্য করে না বলিয়া বৃথা নিন্দা কর কেন? দয়ার উপর কি জবরদস্তি চলে? কে তোমাকে ঐ ব্রত নিতে অনুরোধ করিয়াছে? গরীবের ছোট ভগ্নীরা (Little sisters of the poor) চাকুরী করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, সেই অর্থ অকাতরে দরিদ্রের জন্য ঢালিতেছেন। তাঁহাদের স্বামী সেবা নাই, পুত্র-সেবা নাই, জীবনে কেবল ঐ এক কাজ। আমরা নরাধম, ঐ দৃষ্টান্ত দেখিতে পারি, কিন্তু প্রাণে পুরিতে পারি না। আমাদের বৎসর বৎসর সন্তান উৎপাদন করিতে হইবে, এবং পরসেবার ভাণ করিয়া অন্যের দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে হইবে। এবং কেহ কিছু না দিলে, গালাগালির চোটে গগন ফাটাইতে হইবে। অহো দুর্ভাগ্য। যে দেশের রাস্তায় রাস্তায় কোটী কোটী ভিখারী অন্যের প্রত্যাশায় অলসভাবে দিন কাটায়, সেইদেশে আবার কত কত কর্ম্মক্ষম, জ্ঞানী, মানী, সুসভ্য ভিখারীর অভ্যুদয় হইতেছে॥

আমরা বড় কঠিন সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। ভিক্ষা করিয়া সংসার চালান যদি দোষের হয়, তবে ভিক্ষা করিয়া সৎকাজ, পরোপকার করাও দোষের। আমার পুত্র কন্যার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বিধাতা এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা প্রকৃতি সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন, এবং আমাকে কৃষকরূপে পাঠাইয়াছেন। আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিতে হইবে, তবে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। তোমার রাশি রাশি টাকা আছে, আমার তাহাতে কি? আমার খাকার আমাকেই পরিশ্রম

করিয়া সংগ্রহ করিতে হইবে। আমার স্ত্রী পুত্র পরিজনের জন্য আমার পরিশ্রম ও স্বোপার্জ্জন যদি প্রয়োজন, তবে অহেতুকী প্রেমের টানে আমার দুঃখী ভাই, আমার দরিদ্র পৃথিবীর ভার যখন আমার মস্তকে লইব, তখন তাঁহাদের জন্যও আমার ঐরূপই আবশ্যক। আমি যদি পৃথিবীর দুঃখী দরিদ্র লোককে আমার পুত্র কন্যার ন্যায় আপন স্থানে প্রতিপালন করিতে না পারি, তবে তাহাদের ভার আমার গ্রহণ করা উচিত নহে, কেননা, কেবল দয়াতে পরের উপকার হয় না,—প্রাণের টানে হয়। তাহারা যখন আমার নিজস্ব হইবে, তখনই তাহাদের জন্য আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে প্রবৃত্তি হইবে, এবং তখনই আমি তাহাদের সেবায় আসিব। নচেৎ আর যে সকল পরোপকার-ব্রত গ্রহণ, তাহা কেবল ভণ্ডামী মাত্র—কষ্ট-পরিশ্রম শূন্য সুলভ যশ লাভের পন্থা মাত্র। এ ব্রত-পালনে, এই কঠোর সময়ে, লোকের প্রশংসা পাওয়া যাইলে যাইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মের নিকট পুরস্কার বা পুণ্যলাভের আশা নাই। ধর্ম্মের নিকট পুরস্কার তখনই, যখন লোক নিষ্কাম হইয়া, আপন পুত্র কন্যার ন্যায় জগতের নরনারীর সেবা করিতে পারে। তাহাই পৃথিবীর স্বাবলম্বনের প্রথম সোপান—তাহাই বৈকুণ্ঠের মুক্তির পবিত্র সিঁড়ি।

পিতা পুত্র সম্বন্ধ, পৃথিবীর বড় মধুর পবিত্র সম্বন্ধ। পিতা দিতেছেন, পুত্র নিতেছেন। পিতার মনেও ক্লান্তির বা শ্রান্তির ভাব নাই, পুত্রের মনেও কামনা, আশা বা নিরাশা নাই। পিতা যাহা দেন, পুত্রের তাহাই শিরোধার্য্য, পুত্র তাহাতেই কৃতার্থ। পিতা দিতেছেন, তাঁহার কোন প্রত্যাশা নাই, দিবার জন্য কেহ তাঁহাকে অনুরোধও করিতেছেন না। এখানে কোনরূপ অনুরোধ উপরোধ নাই। না দিলেও পুত্র পিতার নিন্দা করেন না, বা বহু দিয়াও পিতা মনে করেন না যে খুব দিয়াছি। এখানে দান ও গ্রহণ আছে, কিন্তু উভয়ই মানুষকে স্বাবলম্বন পথে লইয়া যাইতেছে। পিতা, নিষ্কামভাবে দান করেন, পুত্র নিষ্কামভাবে গ্রহণ করেন। পিতা অসহায় শিশুকে মানুষ করিবার জন্য বিধাতার আদেশে খাটিতেছেন, পুত্র অসহায় অবস্থা হইতে নিজ শক্তির উপর দাঁড়াইবার জন্য বিধাতার ইচ্ছায় পিতার সাহায্য লইতেছেন। + এখানে দান ও গ্রহণ আছে, কিন্তু স্বাবলম্বনও আছে। এই রূপ দান ও গ্রহণই আদর্শ। ইহার মূলে স্বর্গের প্রেম। ভাবোচ্ছ্বাসে নহে, কিন্তু এই স্বর্গের প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া যদি মানুষ অযাচিতভাবে দান করে, তাহা সার্থক হয়, আর এই প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া বিনা প্রার্থনায় কিছু পাওয়া যাইলে যদি কেহ তাহা গ্রহণ করে, তবে স্বাবলম্বনে ব্যাঘাত হয় না। এই নিষ্কাম প্রেমের অভাবেই, ধনী, ভাবোচ্ছ্বাসে দান করিয়া, শেষে আক্ষেপ করেন, এবং ভিখারী বা প্রার্থী, পাইয়াও আশা-নিবৃত্তি না হওয়ায়, দাতার নিন্দা করিয়া রসনাকে কলুষিত করে।

আর একটী চিত্র আছে,—মানুষের লক্ষ্য, এই পৃথিবী নয়, এ পৃথিবীর ধন ঐশ্বর্য্য কিছুই নয়। মানুষের লক্ষ্য,

+ এইস্থল পাঠ করিবার সময় জমিদার পিতা পুত্রের কথা পাঠকগণ বিস্মৃত হইবেন; কেননা সেখানে স্বাবলম্বন ব্রতে ভয়ানক অন্তরায় আছে।

কেবল ঈশ্বর। ঈশ্বরমুখী প্রাণই নিষ্কাম প্রেমের আস্বাদন বুঝে। সে প্রাণ পৃথিবীর কিছুই চায় না, সে ধন ঐশ্বর্য্য টাকা কড়ি, যশ মান কোন দিকে তাকায় না, সে কেবল বিধাতার কৃপার জন্য লালায়িত। সে দান করেও তাঁহার ইচ্ছাতে, অথবা সে গ্রহণ করেও, তাঁহারই ইচ্ছায়। অথবা তাঁহারই জিনিস তাঁহার নিকট লইয়া তাঁহাকেই দেয়। সে, অভাব হইলেও কাহারও দ্বারে যায় না, পিতার চরণই ধরে, সে অতুল ঐশ্বর্য্য পাইলেও রাখে না, পিতার সন্তানদিগকে বাটিয়া দেয়। পাইলেও তাঁহার উল্লাস নাই, না পাইলেও ক্ষোভ নাই। দিলেও তাঁহার বিরক্তি নাই, খুব পাইতেও তাঁহার আসক্তি নাই। সে, সকল অবস্থার মধ্যে নিশ্চিন্ত মনে, একেরই লীলা দেখে এবং তাহাতে মজে। সে চায় ত পিতার নিকটই চায়, সে দেয় ত পিতার সন্তানকেই দেয়। ভাবো ...াস তাহার ...,' সে স্বর্গী। প্রেমে সঞ্জীবিত। এখানে ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই,—এখানে নিন্দা নাই, মান নাই। তাহার লক্ষ্য পৃথিবীর কিছুই নয়—লক্ষ্য, নীরবে দাঁড়াইয়া কেবল জগজ্জননীর পূজা, বিশ্বপিতার পূজা করা। লক্ষ্য—আপনার কাঙ্গাল ও বৃত্তিসমূহকে তাঁহার আনুগত্য খাটাইয়া তাঁহারই চরণে উৎসর্গ করা। লক্ষ্য—চিরকাল তাঁহারই চরণে জীবন প্রাণ ঢালিয়া দেওয়া। সেই অবলম্বনই স্বাবলম্বন, সেই স্বাবলম্বনই অধীনতা, সেই অধীনতাই মুক্তি। সে, প্রাণে মরিলেও, মানুষ জ্ঞানে মানুষের নিকট ভিক্ষা চাহিবে না। সে অনাহারে মরিলেও বলিবে—"Thy will be done." দিতে হয়, তিনিই দিবেন,—না দিতে হয়, তিনি দিবেন না,—সদা এই চিন্তায় বিভোর থাকিয়া যে ব্যক্তি সংসার-নিরপেক্ষ, বাসনা ও কামনা বির্হিত হইয়াছেন, তিনি, দাতাই হউন বা গৃহীতাই হউন, কিছুতেই তাঁহার চিত্তবিকার নাই। অর্থাৎ দান ও গ্রহণ, যখন বিধাতার ইচ্ছানুপ্রাণিত কাজ, তখনই তাহা পবিত্র ও পরম মঙ্গলের পথ, আর যখন মানুষের ইচ্ছা বা ভাব প্রসূত, তখনই নরক। তাঁহার ইচ্ছাতেই দিতেছি, যিনি মনে করেন, তিনিই প্রকৃত দাতা; তাঁহার ইচ্ছাতেই লইতেছি, যিনি ভাবেন, তিনিই প্রকৃত যোগী। অহংজ্ঞান সর্ব্বস্ব করিয়া যাহারা চলেন, তাঁহারাই পরিণামে দুঃখ পান। বিধাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, তাঁহার ইচ্ছাতে যখন মানুষ চলে, তখন দানে ক্লান্তি নাই, গ্রহণেও আসক্তি নাই, দানে অহঙ্কার নাই,—গ্রহণেও প্রার্থনা বা জোর জবরদাস্ত নাই। অথবা তখন অবিচারিত দানও থাকে না, অসংযত প্রার্থনা বা গ্রহণও থাকে না। কে দাতা, কে বা গৃহীতা, প্রকৃত ভক্ত সাধকের পক্ষে, ঈশ্বরানুগত সাধুব্যক্তির পক্ষে, তবে সকলেই একের ইচ্ছাচালিত দাস দাসী। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার, অন্নপূর্ণাই লুটাইয়া দিতেছেন। অন্নপূর্ণা, রূপান্তর ধারণ, আবার তাহা লইতেছেন। তাঁহার দিকে চাহিয়া, তাঁর ইচ্ছাতে যে দান করে, দানে তার ভাণ্ডার আরো পরিপূর্ণ হয়। তাঁর দিকে চাহিয়া তাঁর ইচ্ছাতে যে গ্রহণ করে, সে যাহা পায়, তাহাতেই তৃপ্ত, অল্প পাইলেও পুনঃ চায় না, সহস্র পাইলেও প্রয়োজনাতিরিক্ত গ্রহণ করে না। বাসনার আগুনে সে পুড়েনা, সে দয়ার উপর জোর জবরদস্তি চালাইতে চায় না। এই অবস্থায়

দুই জনই আবিস্মৃত, কামনা-রহিত। যশের কুহকে, তাহে প্রবোচনায় দাতা এখানে দান ব্রত লন নাই, গৃহীতাও কল্পিত ভেক ধরে নাই। যশ মানের কুহকে যেখানে দানবা গ্রহণ, সেখানে ক্লান্তি ও শ্রান্তি বোধ হওয়া অনিবার্য। যশ মানের কুহকে যেখানে সেবাব্রত বা ভেক গ্রহণ হইয়াছে সেখানে বাসনা-নির্ব্বাণ আকাশ কুসুম। সেখানে দানে কলঙ্ক,—অহঙ্কারের স্ফূর্ত্তি; গ্রহণে অলসতাব বৃদ্ধি,—স্বাবলম্বন ও আত্মমর্য্যাদা-নির্ব্বাণ। সেখানে দাতা দান করিয়া অহঙ্কারে মত্ত, মনে করেন, আমার ন্যায় আর দয়ালু লোক নাই, গৃহীতাও আমাকু মত, মনে করে, তাঁহাকে লোকে দিতে বাধ্য, তাঁহাকে দিবার জন্যই সকলের ধন ঐশ্বর্য্য। দানেও কলঙ্ক, হায়, এখানে গ্রহণেও কলঙ্ক!! নিষ্কাম ব্রত পালন, এ সংসারে, আজকালকার দিনে বড়ই শক্ত কথা হইয়া উঠিয়াছে। বিধাতার কি ইচ্ছা, কে জানে!!

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। কালাপানি বা হিন্দুমতে সমুদ্র যাত্রা, শ্রীঅমৃতলাল বসু প্রণীত, মূল্য।০ আনা। অমৃত বাবু বিদ্রূপাত্মক রচনায় বিশেষ পারদর্শী, এ বিষয় তিনি একজন পাকা লেখক। কালাপানিতে তাঁহার পূর্ব্ব সুনাম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

২। পুস্তকের তালিকা—সিকদার পাড়া বান্ধব পুস্তকালয় ও পাঠাগার। এই তালিকাতে ১৬৫৫ খানি বাঙ্গালা পুস্তকের নাম সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পুস্তকালয়ের দিন দিন উন্নতি হইতেছে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

৩। নীতিমালা—শ্রীতারকচন্দ্র ঘোষ প্রণীত, মূল্য ⁄০ আনা। শিশুদিগের উপযোগী ছোট ছোট নীতিকবিতাপূর্ণ পুস্তিকা, পুস্তকখানি ভাল হইয়াছে।

৪। মাতৃভক্তি ও মাতৃস্নেহেতেই মানবের মুক্তি, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ⁄০ আনা। বইখানি পড়িয়া বড়ই প্রীত হইলাম, কিন্তু ভাষা এবং ভাব সন্নিবেশে এখনও ত্রুটী আছে।

৫। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রশ্নোত্তর-শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত, মূল্য।০ আনা। মহামতি কর্ণেল অলকট্ সাহেব প্রণীত ইংরাজি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে এবং সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

৬। অনুপমা—স্বরকত রঙ্গভূমিতে অভিনীত সামাজিক নাটক, 'শৈলজা'-প্রণেতা, প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। সমাজ চিত্র খুব পরিস্ফুট না হইলেও নাট্যাংশে বইখানি বেশ হইয়াছে। গোবর্দ্ধন, জহরসিং এবং অনুপমার চরিত্র সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। হাস্যরসের অবতারণা থাকায় বইখানি পড়িতে পড়িতে বেশ আমোদ পাওয়া যায়।

৭। বিমলা—উপন্যাস, মূল্য ॥০ আনা, গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই, কোন শিক্ষিতা মহিলা প্রণীত। গ্রন্থকারের নূতন উদ্যম, সুতরাং কিঞ্চিৎ অসম্পূর্ণতা থাকিলেও বই খানি পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। ভাষা সতেজ, রুচি মার্জ্জিত।

৮। কমলা—নাটক, শ্রীরামলাল বন্দোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৸০ আনা। এই কাব্য গ্রন্থখানি পড়িয়া বড় আনন্দিত হইয়াছি, এইরূপ উচ্চ শ্রেণীর কবিতাময় নাটকের সংখ্যা বঙ্গ ভাষায় খুব বেশী নাই। ইহার ভাষা সরল এবং সরস, কবিতা মাধুর্য্য এবং গম্ভীরতাপূর্ণ।

৯। অবধূত-গীতা—মহর্ষি দত্তাত্রেয় কৃত, কাশীধাম হইতে শ্রীমান্ রাম রাম সংযমীর দ্বারা প্রকাশিত। পরমার্থ তত্ত্ববিষয়ক উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ। সরল সংস্কৃতে পুস্তকখানি লিখিত, কিন্তু তথাপি বাঙ্গালা অনুবাদ থাকিলে ভাল হইত।

১০। অকূটালনী হইতে কুতব প্রযন্ত—অর্থাৎ ইষ্টইণ্ডিয়া রেল-পথ সংলগ্ন কতিপয় প্রধান প্রধান স্থানের দ্রষ্টব্য পদার্থ সকলের পথ-